স্রষ্টার জন্যে লড়াই

মৌলবাদের ইতিহাস

ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদঃ শওকত হোসেন

'অসাধারণ...দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত ও দুর্দান্ত পাঠ্য...এটা এমন বই যা অপরিহার্য প্রমাণিত হবে...এইসব শক্তিশালী আন্দোলন কেমন করে বৈশ্বিক রাজনীতি ও আজকের সমাজগুলোকে প্রভাবিত করছে তার ভেতরের কথা জানতে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের জন্যে।'

–দ্য বাল্টিমোর সান

'আর্মস্ট্রং দারুণভাবে সফল...বিস্ময়কর গভীর জ্ঞান ও সহজবোধ্য লেখনী কৌশলের সাহায্যে অত্যন্ত জটিল, স্পর্শকাতর ও প্রায়শঃ দ্ব্যর্থবোধক একটি বিষয়ের আদর্শ নির্দেশিকা তৈরি করেছেন তিনি।'

–সান ফ্রান্সিস্কো এক্সামিনার অ্যান্ড ক্রনিকল ।

'ইহুদিবাদ, খৃস্টধর্ম ও ইসলামে জেগে ওঠা মৌলবাদের অন্যতম তীক্ষ্ণ, পাঠ্য এবং ভীবষ্যৎদর্শী বিবরণ।'

–দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ ।

'দর্শনীয় সাফল্য। আর্মস্ট্রং ব্যাপক তথ্যভাণ্ডার সংগ্রহ করেছেন, নিজস্ব কিছু ধারণা যোগ করেছেন এবং তাকে সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য করে তুলেছেন।

–র‍্যাবাই হ্যারল্ড কুশনার

হোয়েন ব্যাড থিংস হ্যাপেন টু গুড পিপল গ্রন্থের রচয়িতা।

'তথ্যপূর্ণ ও আলোকসঞ্চারী...আমাদের সাবাইকে [জোর দিয়ে বলছেন আর্মস্ট্রং] আধুনিক বিশ্বের সৃষ্ট ভীতির মোকাবিলা করতে হবে, এবং জোরাল সংস্কৃতি ব্যর্থ হলে, অন্যরা, অর্থাৎ মৌলবাদীরা সেটা করবেই। এটাই আসল বাণী, সমসাময়িক সমাজে সহজেই যা হারিয়ে গেছে, কেবল মাঝেসাঝে ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের মতো ব্যক্তিগণ আমাদের মনে করিয়ে দেন বিস্মৃত হয়ে নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনছি আমরা।'

–লস অ্যাঞ্জেলিস টাইমস ।

স্রষ্টার জন্যে লড়াই

মৌলবাদের ইতিহাস

স্রষ্টার জন্যে লড়াই

মৌলবাদের ইতিহাস

ক্যারেন আর্মস্ট্রং

অনুবাদ: শওকত হোসেন

লেখকের উৎসর্গ

জেনি ওয়েম্যানকে

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার মেয়ে আয়েশা তাসনিম আলীকে।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৯
নতুন ভূমিকা ১৩
সূচনা ১৯

প্রথম পর্ব: প্রাচীন ও নতুন বিশ্ব

১. *ইহুদি: অগ্রপথিক (১৪৯২–১৭০০)* ৩১
২. *মুসলিম: রক্ষণশীল চেতনা (১৪৯২–১৭৯৯)* ৬৯
৩. *ক্রিশ্চান: সাহসী নতুন জগৎ (১৪৯২–১৮৭০)* ১০৫
৪. *ইহুদি ও মুসলিম : আধুনিক হলো (১৭৯০–১৮৭০)* ১৫১

দ্বিতীয় পর্ব: মৌলবাদ

৫. *যুদ্ধরেখা (১৮৭০–১৯০০)* ১৯৯
৬. *মৌল বিষয় (১৯০০–২৫)* ২৪০
৭. *প্রতি-সংস্কৃতি (১৯২৫–৬০)* ২৮০
৮. *সংগঠন (১৯৬০–৭৪)* ৩২৩
৯. *আক্রমণ (১৯৭৪–৭৯)* ৩৭৯
১০. *পরাজয়? (১৯৭৯–৯৯)* ৪২৮

পরিশিষ্ট ৪৮৮
নির্ঘণ্ট ৪৯৬
তথ্যসূত্র ৫০৭
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৫৫৮

অনুবাদকের কথা

বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় মৌলবাদ প্রসঙ্গটি ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ৯/১১ পরবর্তী পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মকে নির্বিচারে মৌলবাদ অ্যাখ্যা দিয়ে খোদ ধর্মের বিরুদ্ধে সকল শক্তি প্রয়োগের একটি প্রবণতা গোটা বিশ্বজুড়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর তিনটিতেই মৌলবাদের প্রবল উপস্থিতি থাকলেও এবং খৃস্ট ও ইহুদি ধর্মের মৌলবাদের ভয়ঙ্কর চেহারা সত্ত্বেও বিশ্ব-মিডিয়ার একপেশে প্রচারণার ফলে বর্তমানে কেবল ইসলাম ধর্মই মৌলবাদ ও ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা এমন যেন ইসলাম ছাড়া আর কোনও ধর্মের অস্তিত্ব নেই; যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্যে ইসলামী সন্ত্রাসবাদই দায়ী। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যেন ধার্মিকতা, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদের আর কোনও পার্থক্য নেই।

কিন্তু আসল ব্যাপার যে তা নয়, মৌলবাদ যে ধর্মের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অভিব্যক্তি, আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার প্রতি ধার্মিকদের বিশেষ সাড়া হিসাবে যার জন্ম, বর্তমান বিশ্বের ধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সুনামখ্যাত ব্রিটিশ গবেষক-লেখক ক্যারেন আর্মস্ট্রং সেটাই তুলে ধরেছেন বর্তমান গ্রন্থে। কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে, মৌলবাদ কোনওভাবেই নতুন ঘটনা নয় বা কেবল ইসলামই মৌলবাদের আসরে আক্রান্ত নয়। বিগত প্রায় কয়েকশো বছর ধরে, আধুনিকায়নের সূচনাকাল হতে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আবির্ভাবে অস্তিত্ব বিনাশের আশঙ্কায় ধর্মের টিকে থাকার সংগ্রাম থেকেই জন্ম হয়েছিল মৌলবাদের। পৃথিবীর সকল দেশের, সকল ধর্মের মানুষই, অন্তত কিছু সংখ্যক মানুষ, ধর্মের অখণ্ডতা রক্ষার নামে আধুনিকতার সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছে। আবার যুগে যুগে রাষ্ট্রও উপর হতে আধুনিকতা চাপিয়ে দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করছে ধর্মকে, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পশ্চাদপদতার সমার্থক বিচার করে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্য, ব্যতিক্রম নেই কোথাও। মৌলবাদ যেন আধুনিক মানুষেরই অপরিহার্য সঙ্গী। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একে নির্মূল করার প্রয়াস বিজ্ঞান সম্মত নয় বলেই মনে হয়। মৌলবাদকে প্রতিহত বা নির্মূল করা নয়, প্রয়োজন একে সংশোধন করা। এর জন্যে মৌলবাদের চেহারা, তার আদিরূপ বা ইতিহাসটুকু জানা জরুরি। ইতিহাসের দীর্ঘ সময় জুড়ে মৌলবাদের উৎপত্তি হতে শুরু করে

AMARBOI.COM

পর্যায়ক্রমে এর বিকাশ জানতে পারলে ধর্মের এই অসুস্থ অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশোধন প্রয়াস সহজতর হবে বলে মনে হয়। বাংলাদেশের পাঠকদের মৌলবাদের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্বের মৌলবাদ সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের সুবিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ *ব্যাটল ফর গড: আ হিস্ট্রি অভ ফান্ডামেন্টালিজম*-এর বাংলা অনুবাদ *স্রষ্টার জন্যে লড়াই: মৌলবাদের ইতিহাস* পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত।

উল্লেখ্য, মূলগ্রন্থে বহু দার্শনিক, ধর্মীয় ও কারিগরি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্যে আমি যথাসম্ভব বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। ধর্মগ্রন্থের, বিশেষ করে পবিত্র কোরানের আয়াতের নির্ভুল অনুবাদের খাতিরে মুহম্মদ হাবীবুর রহমানের *কোরান শরীফ: সরল বঙ্গানুবাদ*-এর সাহায্য নিয়েছি।

মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত না হলেও পয়গম্বর মুহাম্মদ-এর নামের শেষ (স) চিহ্ন ব্যবহার করেছি। পাঠকদের কাছে পয়গম্বর ও নবীগণের নামের শেষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ বাণী ব্যবহারের অনুরোধ থাকল।

পাঠকদের একটি বিশ্বস্ত মূলানুগ ও সাবলীল অনুবাদ উপহার দেওয়ার চেষ্টা ছিল আমার। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি। পাঠক সামান্য উপকৃত হলেও নিজের শ্রম স্বার্থক জানব। যে কোনও রকম ভুল-ত্রুটি আমাদের গোচরে আনলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের প্রয়াস নেওয়া হবে।

বইটি আরও আগে বের হওয়ার কথা ছিল। দেরি হবার কারণ প্রসঙ্গে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। এই বইটিসহ আমার অনূদিত আরও কিছু বই বের হওয়ার কথা ছিল আজিজ সুপার মার্কেটের সন্দেশ নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে। পাণ্ডুলিপিও জমা দিয়েছিলাম। এমনি এক সময় সহসা সুপ্রিয় অনুবাদক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট অনুবাদক জনাব জি.এইচ. হাবীবের কাছে জানতে পারি সন্দেশে' স্বত্বাধিকারী লুৎফর রহমান চৌধুরীর অপকর্মের ফিরিস্তি। জনাব লুৎফর রহমান অনুবাদকদের প্রতারিত করে বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা থেকে অনূদিত গ্রন্থের বিপরীতে অনুবাদকদের নামে বরাদ্দ ও প্রেরিত প্রচুর অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। এ খবর জানতে পেরে আমি নরওয়ের নরলা, কানাডিয়ান কাউন্সিল ফর ট্রান্সলেশন, ডাচ ফাউন্ডেশন ফর ট্রান্সলেশন, ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে জনাব লুৎফর রহমানের অপকর্মের জ্বলন্ত প্রমাণ যোগাড় করি। তাতে জানা যায় এই তথাকথিত সাহিত্যসেবী আসলে একজন নিম্নশ্রেণীর তস্কর ছাড়া আর কিছুই নন। তিনি বিভিন্ন

AMARBOI.COM

বিদেশী প্রকাশনা সংস্থা ও লেখকদের এজেন্টদের সাথে নামী-অনামী লেখকদের বাংলাদেশের পাঠকদের সাথে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার নামে খুবই সামান্য অর্থের বিনিময়ে লাইসেন্স (স্বত্ব নয়) হাতিয়ে নেন। তারপর অনুবাদকদের সাথে নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট বইটি অনুবাদ করানোর জন্যে নামকাওয়াস্তে চুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু সেই চুক্তির কথা গোপন করে তিনি উল্লেখিত বিদেশী সাহিত্য সংস্থাগুলোর কাছে অনুবাদকের সত্যিমিথ্যার মিশেল জীবনবৃত্তান্ত ও জাল স্বাক্ষরসহ সম্পূর্ণ ভিন্ন মিথ্যা চুক্তিপত্রের অনুলিপি জমা দিয়ে অনূদিত গ্রন্থের বিনিময়ে অনুবাদকের নামে বরাদ্দ অর্থের জন্যে আবেদন করেন এবং অনুবাদককে কিছুই না জানিয়ে সেই অর্থ বেমালুম তছরুপ করেন। এভাবে এপর্যন্ত তিনি বহু লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই ঘৃণ্য কাজ করে আসছেন। তাঁর এমনি প্রতারণার ফাঁদ থেকে বাংলাদেশের কোনও অনুবাদক রেহাই পাননি। *নদে* উপন্যাসের অনুবাদক আনিস পারভেজ, *সোফির জগৎ* ও *শত বর্ষের নিঃসঙ্গতা*র নন্দিত অনুবাদক জি.এইচ. হাবীব, *একটি অপহরণ সংবাদ* ও *বাগদাদে একশ দিন*-এর অনুবাদক সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সুরেশ রঞ্জন বসাক, *লাইফ অভ পাই* ও *টিন রঙা শাড়ী*র অনুবাদক শীতব্রত বর্মণ, *তাশ রহস্য*-এর অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মণ, *ক্যালি গ্যাংয়ের আসল ইতিহাসে*র অনুবাদক সালেহা চৌধুরীসহ কেউই বাদ যাননি। অথচ প্রকাশ্যে নিজেকে তিনি সাহিত্যসেবী হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন, ভান করেন সাহিত্যের সেবা করতে গিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া, ভারতীয় পূর্বপ্রকাশিত বিভিন্ন অনুবাদও তিনি তাঁর নিকটাত্মীয়দের নামে প্রকাশ করে বর্ণিত সংস্থাগুলো থেকে অনুদানের অর্থ আদায় করে নিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিষয়টি অনুবাদকদের মাঝে জানাজানি হওয়ার পরও এবং প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও (বর্ণিত সংস্থাসমূহের ওয়েব সাইটে অনুসন্ধান করলেই এই অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ মিলবে) তিনি বিষয়টি অস্বীকার করে গেছেন। অনেক চেষ্টা করেও আমি ও অন্য অনুবাদকগণ প্রাপ্য অনুদানের টাকা তো বটেই অন্যান্য অনূদিত গ্রন্থের বিনিময়ে চুক্তিমাফিক প্রতিশ্রুত অর্থও পাইনি। তিনি চুক্তিভঙ্গ ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন বলে পূর্বপ্রকাশিত অনূদিত গ্রন্থ প্রত্যাহারের কথা লিখিতভাবে জানানো সত্ত্বেও তিনি সেগুলোর বিপনন অব্যাহত রেখেছেন এবং দাখিল করা পাণ্ডুলিপি ফেরত চাইলেও ফেরত দেননি; যে কারণে অত্যন্ত পরিশ্রম সপেক্ষ হলেও এ বইটি দ্বিতীয়বার অনুবাদ করতে হয়েছে। আমার আরও কয়েকটি অনূদিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখনও অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছেন, বারবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তাতে কান দেননি। বাংলাদেশের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখা এবং প্রতারণা থেকে দেশের অনুবাদকদের বাঁচাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন এটাই

WWW.AMARBOI.COM

কাম্য। আমি আন্তরিকভাবে আশাবাদী যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা যথা-ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশের সাহিত্য জগৎকে লুৎফর রহমান চৌধুরীর মতো নিম্নশ্রেণীর তস্করের কবল থেকে উদ্ধার করে নিবেদিতপ্রাণ লেখক ও অনুবাদকদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষায় এগিয়ে আসবেন। পাঠক, লেখক ও অনুবাদকগণকে এই প্রকাশককে সামাজিকভাবে বর্জন করার আহ্বান জানাই। পাঠকদের একটি অন্যায় সম্পর্কে অবহিত করার জন্যেই এখানে এত কথা বলতে হলো। কারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটার কারণ হলে আমি সেজন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। প্রসঙ্গত, এই বক্তব্যের জন্যে রোদেলার প্রকাশক দায়বদ্ধ নন।

ধন্যবাদ সবাইকে

শওকত হোসেন
মালিবাগ, ঢাকা
e-mail: saokot_nccbl@yahoo.com

AMARBOI.COM

নতুন ভূমিকা

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখটি বিশ্বকে চিরতরে পাল্টে দেওয়া দিন হিসাবে ইতিহাসে স্থান করে নেবে। এই দিনই মুসলিম সন্ত্রাসীরা বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনের একটি অংশ ধ্বংস করে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছিল। স্পষ্টতই টেলিভিশনে প্রচারের উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত কাজ ছিল এটা। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের জ্বলন্ত টাওয়ারজোড়া এবং পরবর্তী দর্শনীয় ধস সম্ভবত একবিংশ শতাব্দীর আইকনে পরিণত হবে। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কোনও বিদেশী শক্তির হাতে আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু কোনও জাতি রাষ্ট্র নয়, বা পারমানবিক মিসাইলও নয়, বরং স্রেফ পেননাইফ আর বক্স কাটার হাঁকানো ধর্মীয় চরমপন্থীদের হাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হামলা হলেও প্রথম বিশ্বে আমাদেব সবার উদ্দেশ্যেই সতর্কবাণী ছিল এটা। এক নতুন ধরনের নগ্নতা, আক্রম্যতা বোধে আক্রান্ত হয়েছি আমরা, নিষ্ঠুরতার মাত্র এক মাসের কিছু বেশি সময় পর যখন আমি লিখছি, এখনও এটা স্পষ্ট নয় যে কীভাবে এই ঘটনাটি আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করবে। পরিবর্তিত এই বিশ্বে একটা ব্যাপার ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোনও কিছুই আর আগের মতো থাকবে না। সেপ্টেম্বর ১১-এর আগে যেসব অগ্রাধিকার ও উদ্বেগ আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল সেগুলোকে এখন অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। আমরা ভীতিকর অস্বস্তিকর এক পরিবর্তনের মুখে পড়েছি।

অবশ্য মৌলবাদের গতিশীলতায় পরিবর্তন আসেনি। আক্রমণের ব্যাপকতা সম্পর্কে কারও পক্ষেই পূর্বধারণা করা সম্ভব ছিল না, কারণ তা ছিল ধারণাতীত। তবে এটা ছিল মৌলবাদীদের ঈশ্বরের পক্ষে তাদের চলমান যুদ্ধে নতুনতম ও সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আক্রমণ। এই পৃষ্ঠাগুলোতে আমি যেমন তুলে ধরার প্রয়াস পাবো, প্রায় শতবছর ধরে ক্রিশ্চান, ইহুদি ও মুসলিমরা এক উগ্র ধরনের ধার্মিকতা গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিল যার লক্ষ্য আধুনিক সেক্যুলার সংস্কৃতিতে অবনমিত ঈশ্বর ও ধর্মকে প্রান্তরেখা থেকে আবার মধ্যমঞ্চে ফিরিয়ে আনা। এইসব 'মৌলবাদী', যেমন তাদের আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, ধর্মের প্রতি উৎসগতভাবে বৈরী এক বিশ্বে বিশ্বাসের পক্ষে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সেক্যুলার আধুনিকতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তারা; এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন

AMARBOI.COM

করেছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাধারণভাবে পণ্ডিত ও ধারাভাষ্যকারগণ ধরে নিয়েছিলেন যে সেক্যুলারিজমই আগামীর আদর্শ এবং ধর্ম আর কখনওই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। কিন্তু মৌলবাদ এই প্রবণতাকে উল্টে দিয়েছে, ক্রমশঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্বের উভয় ক্ষেত্রেই ধর্ম এমন এক শক্তিতে পরিণত হয়েছে যাকে প্রতিটি সরকার গুরুত্বের সাথে নিতে বাধ্য হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ১১-এর প্রলয়কাণ্ডকে এই গ্রন্থে বর্ণিত মৌলবাদের ইতিহাসের যৌক্তিক পরিণাম হিসাবে দেখা যেতে পারে। প্রায়শঃই লোকে যেমনটা ভেবে থাকে, মৌলবাদ কোনও সচেতন পশ্চাদপদতা নয়। এটা অতীতে ফিরে যাওয়া নয়। এইসব মৌলবাদ আবিশ্যকভাবেই আধুনিক আন্দোলন এবং নিজ সময় ছাড়া অন্য কোনও কালেই শেকড় গাড়তে পারবে না। এটা ছিল সেক্যুলার আধুনিকতার বিরুদ্ধে পরিচালিত সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করী অক্রমণ, এরচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্য আর বেছে নিতে পারত না সন্ত্রাসীরা। সেপ্টেম্বর ১১-র চেয়ে আর কখনওই মৌলবাদীরা মিডিয়ার এমন দক্ষ সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। প্রথম বিমানের ধ্বংসে সচেতন হয়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ মানুষ ততক্ষণে যার যার টিভি সেটের সামনে বসে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের দাক্ষিণ টাওয়ারে দ্বিতীয় প্লেনের হামলে পড়া দেখতে হাজির হয়ে গিয়েছিল। মৌলবাদীরা আধুনিক বাবেল মনে হওয়া প্রকৃতির বিরোধিতা করে গড়ে তোলা অসাধারণ ভবন ধ্বংস করার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়েছে। মৌলবাদীদের কাছে এই ধরনের কাঠামো ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঠেকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগন ধর্মীয় অভিশাপের মুখে তাসের ঘরের মতো জমিনে লুটিয়ে পড়েছে। মর্মান্তিক আঘাত ছিল এটা। কেবল হাজার মানুষ প্রাণই হারায়নি, বরং আমেরিকার গর্বিত স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও আস্থা টাওয়ারগুলোর সাথে সাথে ধসে পড়েছে। মানুষ আর কোনওদিনই সেপ্টেম্বর ১০-এর মতো নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারবে না। দশকের পর দশক এয়ারপ্লেনগুলো মানুষকে এক ধরনের অতিমানবীয় মুক্তির বোধ যুগিয়েছে, তাদের মেঘের অনেক উপরে বসে থাকতে সক্ষম করে তুলেছে, প্রাচীনকালের দেবতাদের মতোই ক্ষিপ্র বেগে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে পেরেছে তারা। কিন্তু এখন তাদের অনেকেই আকাশে উড়তে ভয় পাচ্ছে। ওদের মাটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে, নিয়ে আসা হয়েছে আসল রূপে, ওদের সেক্যুলার ডানা ছেঁটে দেওয়া হয়েছে এবং ভয়ঙ্করভাবে ফুটো করে দেওয়া হয়েছে আত্মবিশ্বাস।

প্রধান সন্দেহভাজন ওসামা বিন লাদেন মৌলিক চিন্তাবিদ নন। তাঁর ধ্যানধারণা সম্পূর্ণই মিশরিয় মৌলবাদী সৈয়দ কুতবের ধারণা ভিত্তিক। এই গ্রন্থের

AMARBOI.COM

অষ্টম অধ্যায়ে তাঁর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুতবের পরিভাষা ব্যবহার করে বিন লাদেন ঘোষণা করেছেন যে, সেপ্টেম্বর ১১-র ঘটনাপ্রবাহ বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত থাকার বিষয়টিই তুলে ধরেছে: একটি ঈশ্বরের পক্ষে, অন্যটি তাঁর বিপক্ষে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ব দুটি ভিন্ন শিবিরে ভাগ হয়ে আছে, সেটা বিন লাদেনের বর্ণনা মোতাবেক না হয়ে থাকলেও। অনেক দশক ধরে আধুনিকতার সুযোগ সুবিধা উপভোগ ও সমর্থন করে আসছে যারা আর আধুনিক সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া মৌলবাদীরা পরস্পরে প্রতি চরম বিতৃষ্ণার সাথে দুর্বোধ্যতার মহাগহ্বরের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে। সেপ্টেম্বর ১১-র নিষ্ঠুরতা কেবল ভুল বোঝাবুঝির মাত্রাটুকু কতটা গভীর এবং ভিত্তি কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে সেটাই তুলে ধরে। এটা সভ্যতার সংঘাত নয়, মৌলবাদ সব সময়ই আন্তর্সমাজ বিরোধ। যেন এই বিষয়টিকে জোরাল করে তুলতেই আমেরিকান ক্রিশ্চান মৌলবাদী জেরি ফলওয়েল ও প্যাট রবার্টসন প্রায় সাথে সাথেই ঘোষণা করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্যুলার মানবতাবাদীদের পাপের জন্যে এই ট্র্যাজিডি ছিল ঈশ্বরেরই বিচার–এমনি দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম ছিনতাইকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খুব একটা ভিন্ন কিছু নয়।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে আমি তুলে ধরেছি যে মৌলবাদ বিদায় নিচ্ছে না, বরং এটা আধুনিক দৃশ্যপটেরই অংশ, এবং এমন এক বাস্তবতা যার মোকাবিলা করা আমাদের শিখতে হবে। মৌলবাদের ইতিহাস দেখায় যে, এই উগ্র ধার্মিকতা আমরা অগ্রাহ্য করলেই মিলিয়ে যায় না। মৌলবাদের হুমকির অস্তিত্ব নেই ভান করা বা মুষ্টিমেয় উন্মাদ লোকের অদ্ভুত ধারণা হিসাবে মৌলবাদকে সেক্যুলার বিতৃষ্ণার সাথে নাকচ করে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। ইতিহাস আরও দেখায় যে, মৌলবাদকে দমন করার প্রয়াস স্রেফ তাকে আরও চরম রূপ দেয়। এটা পরিষ্কার, সকল ধর্মবিশ্বাসের মৌলবাদীরা কী প্রকাশ করতে চাইছে উপলব্ধি করার জন্যে আমাদের মৌলবাদী ইমেজারিসমূহকে বোধগম্য করে তুলতে হয়েছে। কারণ এইসব আন্দোলন এক ধরনের উদ্বেগ ও অসন্তোষ তুলে ধরে যা কোনও সমাজই উপেক্ষা করে থাকতে পারে না। সেপ্টেম্বর ১১-র পর থেকে বিশ্বের বহু স্থানে ক্রমেই চরম রূপ ধারণ করতে চলা মৌলবাদী আন্দোলনসমূহকে উপলব্ধি করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিশ্চান রাইটের সদস্যরা ১৯৭০ দশকের মৌলবাদের সীমা অতিক্রম করে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আমি জেরি ফলওয়েল ও মরাল মেজরিটিকে অনেক পিছে ফেলে যাওয়া রিকন্সট্রাকশনিজম ও ক্রিশ্চান আইডেন্টিটি আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছি। এগুলো উত্তর-মৌলবাদের

AMARBOI.COM

একটি ধরন, যা ঢের বেশি ভীতিকর, অনমনীয় ও চরম। একইভাবে ছিনতাইকারীরা যেন ইসলামি মৌলবাদের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের ভয়ঙ্কর পরিবর্তন তুলে ধরেছে বলে মনে হয়। বিন লাদেন সৈয়দ কুতবের প্রচলিত মৌলবাদী পরিভাষায় কথা বললেও ছিনতাইকারীরা, বিন লাদেনের যাদের কুতবিয় পরিভাষায় 'ভ্যানগার্ড' আখ্যায়িত করেছেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মৌলবাদের আবির্ভাব ঘটাতে পারত, এমন কিছু অতীতে যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। প্রথম বিমানের চালক মিশরিয় ছিনতাইকারী মুহাম্মদ আতা ছিল প্রায়-মদ্যপ ধরনের, বিমানে আরোহনের আগেও ভদকা খাচ্ছিল সে। পেনসিলভেনিয়ায় ক্র্যাশ করা বিমানের অভিযুক্ত লেবানিজ পাইলট জিয়াদ জাররাহিও মদ্যপ ছিল, হামবুর্গে নিয়মিত নাইটক্লাবে যাতায়াত করত সে। ছিনতাইকারীরা লাস ভেগাসের বিভিন্ন ক্লাব ও নারীসঙ্গও উপভোগ করত।

এইসব তথ্য বের হয়ে আসার সাথে সাথে খুব অদ্ভুত কিছু ব্যাপার ঘটছে বলে আমি সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। মুসলিমদের পক্ষে ধর্মীয়ভাবে অ্যালকোহল পান নিষিদ্ধ। একজন মুসলিম শহীদ পেট ভর্তি ভদকা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে, এমন ধারণা ১৯৯৪ সালে হেবরনের গ্রেট মস্কে হামলা চালিয়ে উনত্রিশজন মুসলিমকে হত্যা করার আগে শুকরের মাংস ও ডিম দিয়ে নাশতা সারা বারুচ গোল্ডম্যানের মতো ইহুদি মৌলবাদীর আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার মতোই অচিন্তনীয়। কোনও ধার্মিক মুসলিম বা ইহুদিই এই ধরনের আচরণে নিজেকে জড়িত করার কথা ভাবতে পারে না। বেশির ভাগ মৌলবাদীই অর্থডক্স জীবন অনুসরণ করে, অ্যালকোহল, নাইটক্লাব আর শিথিল রমনী হচ্ছে *জাহিলিয়াহ*র বৈশিষ্ট্য, অজ্ঞ, ঈশ্বরবিহীন বর্বরতা মুসলিম মৌলবাদীরা সৈয়দ কুতবের নির্দেশ অনুসরণ করে যাকে কেবল বর্জনেরই শপথ গ্রহণ করেনি, বরং নিশ্চিহ্ন করারও শপথ নিয়েছে। ছিনতাইকারীরা যেন কেবল ধর্মের যেসব মৌল বিধানকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছিল সেগুলোকেই অমান্য করার পথে যায়নি, বরং প্রচলিত মৌলবাদীদের অনুপ্রাণিতকারী নীতিমালাকেও পদদলিত করেছে।

পরের পাতাগুলোয় আমি বহু উন্মূলতাবাদী আন্দোলনের বর্ণনা দিয়েছি যেখানে জনগণ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রবল উদ্বেগ ও পরিবর্তনের পর্যায়ে পবিত্রতম রীতিনীতি লঙ্ঘন করে গেছে। এখানে সপ্তদশ শতকের মেসায়াহ চরিত্র শাব্বেতাই যেভি, তাঁর শিষ্য জ্যাকব ফ্রাংক ও 'পবিত্র পাপের' পক্ষে বক্তব্যদানকারী সপ্তম শতকের ইংল্যান্ডের বিপ্লবী পয়গম্বরগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সময় এতটাই মরিয়া ছিল যে, সম্পূর্ণ নতুন কিছুর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রাচীন মূল্যবোধসমূহ আর কাজে লাগছিল না; কেবল প্রাচীন রীতিনীতির পাইকারী লঙ্ঘনের ভেতর দিয়েই অর্জনযোগ্য নতুন বিধান ও নতুন স্বাধীনতা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

AMARBOI.COM

আমি আরও দেখিয়েছি যে, মৌলবাদের অধিকতর চরম রূপে এক ধরনের অন্তস্থঃ ধ্বংসাত্মক প্রবণতা রয়েছে। তিনটি ধর্ম বিশ্বাসের সবকটাতেই মৌলবাদীরা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্নকরণের কল্পনা লালন করেছে। অনেক সময়, যেমন দশম অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছি, পরিকল্পিতভাবেই স্বয়ং-ধ্বংসাত্মক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বাধ্য করা হয়ে থাকে তাদের। ১৯৭৯ সালে ডোম অভ রক উড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে জুইশ আন্ডারগ্রাউন্ডের পরিকল্পনা এর জ্বলন্ত নজীর। এই ঘটনার ফলে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিনাশ ঘটতে পারত। এই ইহুদি মৌলবাদীরা এক পৌরাণিক বিশ্বাসে চালিত হয়েছে। এই পৃথিবীর বুকে তারা প্রলয় ঘটাতে পারলে ঈশ্বর তখন মহাকাশ থেকে নিস্কৃতি অবতরণ করাতে 'বাধ্য' হবেন। আবার, মুসলিম আত্মঘাতী বোমারুদের চেয়ে ব্যাপক ধ্বংসবাদী কর্মকাণ্ড কল্পনা করা কঠিন। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক স্তরে ১৯৮০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশন কেলেঙ্কারীর সৃষ্টিকারী জিম ও ট্যামি ফেয় বেকার এবং জিমি সোয়াগনের বিচিত্র অ্যান্টিকসমূহ জেরি ফলওয়েলের অধিকতর সুবোধ মৌলবাদের বিরুদ্ধে ঢের চরম ধ্বংসবাদী বিদ্রোহ তুলে ধরে। এটাও উত্তর-মৌলবাদের একটা রূপ ছিল যা 'পবিত্র পাপের উন্মূলতার অন্বেষণ তুলে ধরে। সেপ্টেম্বর ১১-র ছিনতাইকারীরাও সম্ভবত এমন একটা অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল যেখানেও তারাও মুসলিম উন্মূলতা– উত্তর-মৌলবাদের একটি ধরন গড়ে তুলছিল, কোনও কিছুকেই আর পবিত্র ভাবতে পারছিল না ওরা। একবার এই পর্যায়ে পৌঁছে গেলে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও অশুভ আচরণকেও ইতিবাচক শুভ কাজ হিসাবে দেখা হতে পারে।

সে যাই হোক, সেপ্টেম্বরের ভয়ঙ্কর হামলা দেখায় যে, লোকে যখন ঘৃণা ও হত্যাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে ধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করে, সকল মহান বিশ্ব ধর্মের সহানুভূতিময় নৈতিকতাকে বিসর্জন দেয়, তখন তারা এমন এক পথে যাত্রা করে যেখানে বিশ্বাসের পরাজয় ফুটে ওঠে। এই আগ্রাসী ধার্মিকতা এর আরও অধিকতর চরম উপাদানকে নৈতিকতার অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারে যা আমাদের সবাইকেই বিপদাপন্ন করে তোলে। তিনটি ধর্ম বিশ্বাসের মৌলবাদীরা যদি আরও রেডিক্যাল ও ধ্বংসাত্মক বিশ্বাস আলিঙ্গন করতে শুরু করে থাকে, সেটা সত্যিই ভীতিকর একটা পরিবর্তন হবে। সুতরাং, এই গভীর হতাশার পেছনে কী লুকিয়ে আছে ও কোন জিনিসটা মৌলবাদীদের তাদের কর্মকাণ্ডে বাধ্য করে, সেটা বুঝতে পারাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখনও এটা ঠিক যে মৌলবাদীদের কেবল একটা সামান্য অংশই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়, বাকি সবাই তাদের চোখে বিশ্বাসের প্রতি পরিহাসময় মনে হওয়া এক পৃথিবীতে ধর্মীয় জীবন যাপন করার প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের অব্যাহত অজ্ঞতা ও বিতৃষ্ণা যদি আরও বিপুল সংখ্যক মৌলবাদীকে সহিংসতার পথে ঠেলে দেয়, সেটা হবে খুবই দুঃখজনক। আসুন আমরা এই ভীতিকর সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্যে যা কিছু সম্ভব করার প্রয়াস পাই।

AMARBOI.COM

সূচনা

বিগত বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের অন্যতম চমকপ্রদ পরিবর্তন ছিল প্রতিটি প্রধান ধর্মীয় ঐতিহ্যেই জনপ্রিয়ভাবে 'মৌলবাদ' নামে পরিচিত এক ধরনের উগ্র ধার্মিকতা। অনেক সময় এর প্রকাশ মারাত্মক হতে দেখা যায়। মৌলবাদীরা মসজিদে প্রার্থনাকারীদের গুলি করে হত্যা করেছে, অ্যাবরশন ক্লিনিকে কর্মরত ডাক্তার ও নার্সদের খুন করেছে, নিজেদের প্রেসিডেন্টদের গুলি করে মেরেছে, এমনকি শক্তিশালী সরকারেরও পতন ঘটিয়েছে। মৌলবাদীদের খুব অল্প সংখ্যার সংখ্যালঘু অংশই এইসব সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে থাকে, কিন্তু সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় ও নিয়মনিষ্ঠরাও যেন বিভ্রান্ত বোধ করছে, কারণ তাদের যেন আধুনিক সমাজের অধিকাংশ মূল্যবোধের সাথেই চরমভাবে বিরোধিতায় মত্ত মনে হয়। গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, শান্তিরক্ষা, বাক-স্বাধীনতা কিংবা গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে মৌলবাদীদের কোনও অবকাশ নেই। ক্রিশ্চান মৌলবাদীরা প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন আবিষ্কারকে প্রত্যাখ্যান করে, জোর দিয়ে বলে বুক অভ জেনেসিসই সবদিক থেকে বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ভুল। অনেকেই অতীতের শৃঙ্খল ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে যখন, এমন একটা সময়ে ইহুদি মৌলবাদীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠোরভাবে প্রত্যাদিষ্ট বিধান পালন করে চলেছে, মুসলিম নারীরা পশ্চিমা নারীদের স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে বোরখা ও চাদরে নিজেদের আবৃত্ত করছে। মুসলিম ও ইহুদি মৌলবাদীরা উভয়ই প্রবলভাবে সেক্যুলারিস্ট হিসাবে সূচিত আরব-ইসরায়েল বিরোধকে চরমভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে। তাছাড়া, মৌলবাদ কেবল মহান একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়। বুদ্ধ, হিন্দু ও এমনকি কনফুসীয় মৌলবাদীও রয়েছে। উদার সংস্কৃতির বহু কষ্টে আহরিত অন্তর্দৃষ্টি যাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, যা ধর্মের নামে যুদ্ধ ও হত্যা করে এবং রাজনীতি ও জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে পবিত্রকে টেনে আনার সংগ্রাম করে।

এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণ বহু পর্যবেক্ষককে হতবাক করে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী বছরগুলোতে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, সেক্যুলারিজম অপরিবর্তনযোগ্য প্রবণতা, ধর্মবিশ্বাস আর কোনওদিনই বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে না। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, মানবজাতি আরও যৌক্তিক হয়ে উঠবে, তাদের আর ধর্মের প্রয়োজনই হবে না বা একে জীবনের

AMARBOI.COM

একেবারেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত রেখেই সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু ১৯৭০ দশকের শেষের দিকে মৌলবাদীরা সেক্যুলার আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ধর্মকে প্রান্তিক অবস্থান থেকে একেবারে মধ্যমঞ্চে তুলে নিয়ে আসে। অন্ততপক্ষে এই দিক থেকে তারা লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ধর্ম আবারও এমন এক শক্তিতে পরিণত হয়েছে যাকে কোনও সরকারের পক্ষেই আর নিরাপত্তার সাথে উপেক্ষা করে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। মৌলবাদ পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছে বটে, কিন্তু কোনওভাবেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। এটা এখন আধুনিক দৃশ্যপটের অত্যাবশ্যক অংশে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বলয়ে নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করবে। সুতরাং, এই ধরনের ধার্মিকতার মানে কী, কীভাবে এবং কোন কারণে এর বিকাশ ঘটল, আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের তা কী জানাতে পারে এবং কেমন করে সবচেয়ে ভালোভাবে এর মোকাবিলা করা যেতে পারে সেটা বোঝার চেষ্টা করা খুবই জরুরি।

কিন্তু সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে বহুল-সমালোচিত খোদ 'মৌলবাদ' কথাটির দিকে আমাদের একটু সংক্ষিপ্ত নজর দেওয়া প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোতে আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টরাই সবচেয়ে প্রথম এই পরিভাষাটি ব্যবহার করে, তাদের কেউ কেউ নিজেদের অন্য অধিকতর 'উদার' প্রটেস্ট্যান্টদের থেকে ভিন্ন হিসাবে তুলে ধরার জন্যে 'মৌলবাদী' আখ্যায়িত করতে শুরু করেছিল। তাদের মতে উদারবাদীরা ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাসকে বিকৃত করছিল। মৌলবাদীরা মৌলবিশ্বাসে ফিরে যেতে চেয়েছে ও ক্রিশ্চান ঐতিহ্যের 'মৌল বিষয়'গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। একে তারা ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক ব্যাখ্যা ও বিশেষ কিছু বিশ্বাসকে মেনে নেওয়ার সাথে একীভূত করে নিয়েছিল। 'মৌলবাদ' পরিভাষাটি তখন থেকেই অন্য বিশ্ব ধর্মের সংস্কারবাদী আন্দোলনসমূহকে এমনভাবে বর্ণনা করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে আসছে যা মোটেও সন্তোষজনক নয়। এটা যেন বোঝাতে চায় মৌলবাদী এর সব ধরনের প্রকাশে সম্পূর্ণই একরৈখিক। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। প্রতিটি 'মৌলবাদ' নিজেই একটি আইন এবং এর নিজস্ব গতিশীলতা রয়েছে। পরিভাষাটি এমন ধারণাও দেয় যে, মৌলবাদীরা উৎসগতভাবে রক্ষণশীল, অতীতচারী; কিন্তু তাদের ধারণাসমূহ আবিশ্যিকভাবেই আধুনিক ও দারুণভাবে উদ্ভাবনী ধরনের। আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টরা তাদের 'মৌলবিশ্বাসে' ফিরে যেতে চেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেটা তারা করেছে লক্ষণীয়ভাবে আধুনিক কায়দায়। এমনও যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, এই ক্রিশ্চান পরিভাষাটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অগ্রাধিকার বিশিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলিম ও ইহুদি মৌলবাদ মূলতঃ মতবাদ নিয়ে তেমন একটা সচেতন নয়, এটা

আবিশ্যিকভাবেই ক্রিশ্চান সংশ্লিষ্ট বিষয়। 'মৌলবাদে'র আক্ষরিক অনুবাদ থেকে আমরা *উসুলিয়াহ* শব্দ পাই, যার মানে দাঁড়ায় ইসলামি আইনের বিভিন্ন বিধান ও নীতিমালার উৎস নিয়ে গবেষণা।[১] পশ্চিমে 'মৌলবাদী' হিসাবে তকমা পাওয়া বেশিরভাগ অ্যাক্টিভিস্টই ইসলামি বিদ্যাচর্চায় নিয়োজিত নয়, তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। সুতরাং 'মৌলবাদ' কথাটির ব্যবহার ভ্রান্তিকর।

অন্যরা অবশ্য এই বলে যুক্তি তুলে ধরেন যে, কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, 'মৌলবাদ' কথাটি টিকে থাকতেই এসেছে। আমি পরিভাষাটি যে সঠিক নয় তার সাথে একমত পোষণ করেছি, তবে আন্দোলনসমূহকে শনাক্ত করতে এটা কাজে লাগে, এবং তাদের ভেতরকার পার্থক্য সত্ত্বেও জোরাল পারিবারিক সাদৃশ্য রয়েছে। মার্টিন এ. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী তাঁদের বিশালাকার ছয় খণ্ডের গ্রন্থ *ফান্ডামেন্টালিস্ট প্রজেক্টে*র ভূমিকায় যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, সকল 'মৌলবাদ' নির্দিষ্ট কিছু প্যাটার্ন অনুসরণ করে চলে। আধ্যাত্মিকতার যুদ্ধংদেহী ধরন এগুলো, অনুমিত সঙ্কটের প্রতি সাড়া হিসাবে এদের উদ্ভব ঘটেছে। তারা এমন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত যাদের সেক্যুলারিস্ট বিশ্বাসসমূহ খোদ ধর্মের প্রতি বৈরী বলে বোধ হয়। মৌলবাদীরা এই যুদ্ধকে প্রচলিত রাজনৈতিক সংগ্রাম মনে করে না, বরং একে মহাজাগতিক শুভ ও অশুভ শক্তির ভেতরকার লড়াই হিসাবে কল্পনা করে। এরা নিশ্চিহ্নতার ভয়ে ভীত; তাই অতীতের নির্দিষ্ট কিছু মতবাদ ও অনুশীলনের নির্বাচিত পুনর্জাগরণের মাধ্যমে নিজেদের আসন্নছাড়া পরিচয়কে সংহত করার প্রয়াস পায়। দূষণ এড়াতে তারা প্রায়ই প্রতি-সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের মূলধারা হতে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়, কিন্তু মৌলবাদীরা বাস্তবতা বর্জিত স্বাপ্নিক নয়। তারা আধুনিকতার যন্ত্রভিত্তিক যুক্তিবাদকে আত্মস্থ করে নিয়েছে, ক্যারিশম্যাটিক নেতার নির্দেশনায় তারা এইসব 'মৌলবিশ্বাসকে' পরিমার্জিত করে যাতে বিশ্বাসীদের কর্মপরিকল্পনার যোগান দেওয়ার মতো একটি আদর্শ নির্মাণ করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত পাল্টা লড়াই করে তারা, ক্রমবর্ধমান সংশয়বাদী এক বিশ্বকে আবার পবিত্র করে তোলার প্রয়াস পায়।[২]

আধুনিক সংস্কৃতির প্রতি এই বৈশ্বিক সাড়ার নিগূঢ়ার্থ অনুসন্ধানের জন্যে তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস ইহুদিবাদ, খৃস্টধর্ম ও ইসলামে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা অল্প কয়েকটি মৌলবাদী আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই আমি। এদের একটির থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা আলাদাভাবে পর্যালোচনা না করে আমি এসবের বিকাশকে সময়ানুক্রমিকভাবে পাশাপাশি অনুসন্ধান করতে চাই, যাতে এগুলো কতটা গভীরভাবে একই রকম সেটা বুঝতে পারি। আমি বিষয়টিকে আরও বেশি গভীরতায় পরীক্ষা করার আশা করি, যাতে অধিকতর সাধারণ সামগ্রিক জরিপের

তুলনায় অনেক বেশি ফল মিলবে। আমি যেসব আন্দোলন বেছে নিয়েছি সেগুলো হলো, আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদ, ইসরায়েলের ইহুদি মৌলবাদ এবং সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত মিশর ও শিয়া ইরানের মুসলিম মৌলবাদ। আমি এটা দাবি করছি না যে আমার আবিষ্কারসমূহ আবিশ্যিকভাবে মৌলবাদের অন্যান্য ধরনের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী এই বিশেষ আন্দোলনগুলো কীভাবে সাধারণ ভীতি, উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়েছে সেটা তুলে ধরার আশা করছি, যা আধুনিক সেক্যুলার বিশ্বের অদ্ভুত কঠিন জীবনের বিশেষ কিছু সমস্যার প্রতি সাড়া হিসাবে অস্বাভাবিক মনে হয় না।

সব যুগ ও ঐতিহ্যে সব সময়ই এমন লোক থাকে যারা তাদের সময়ে আধুনিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মৌলবাদ আবিশ্যিকভাবেই বিংশ শতাব্দীর আন্দোলন। পশ্চিমে প্রথম আবির্ভূত বৈজ্ঞানিক ও সেক্যুলার সংস্কৃতির বিপক্ষে এটি একটি প্রতিক্রিয়া। পাশ্চাত্য সম্পূর্ণ নজীরবিহীন ও একেবারেই ভিন্ন ধরনের সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে, তবে তখন থেকেই তা বিশ্বের অন্যান্য এলাকায়ও শেকড় গেড়েছে। সুতরাং, এর প্রতি ধর্মের সাড়াও অনন্য ছিল। আমাদের নিজস্ব কালে বিকশিত মৌলবাদী আন্দোলনসমূহের আধুনিকতার সাথে একটি প্রতীকী সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, কিন্তু একে বাদ দিতে পারে না। পশ্চিমা সভ্যতা জগৎ পাল্টে দিয়েছে। ধর্মসহ কোনও কিছুই আর আগের মতো হয়ে উঠতে পারবে না। সারাবিশ্ব জুড়ে মানুষ এই নতুন অবস্থার সাথে যুঝে চলেছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক সমাজের জন্যে পরিকল্পিত ধর্মীয় ঐতিহ্যকে নতুন করে মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছে তারা।

প্রাচীন বিশ্বে একই ধরনের ক্রান্তিকাল গেছে, যার মেয়াদ ছিল মোটামুটিভাবে ৭০০ থেকে ২০০ বিসিই পর্যন্ত; ইতিহাসবিদগণ একে অ্যাক্সিয়াল যুগ বলেন, কারণ মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই সময়টি। খোদ সময় পর্বটি ছিল হাজার হাজার বছরের অর্থনৈতিক ও সেই সুবাদে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফল ও সংশ্লেষ। বর্তমান ইরাকের সুমের ও প্রাচীন মিশরে এর সূচনা ঘটেছিল। বিসিই চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রাব্দের জনগণ তাদের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ফসল ফলানোর বদলে কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফলানোয় সক্ষম হয়ে উঠেছিল। এর সাহায্যে তারা বাণিজ্য পরিচালনা করে আরও আয় অর্জন করতে পারত। এই বিষয়টিই তাদের প্রথম সভ্যতা গড়ে তুলতে, শিল্পকলার বিকাশ ও ক্রমবর্ধমানহারে শক্তিশালী রাজনীতির বিকাশে সক্ষম করে তুলেছিল: নগর, নগর-রাষ্ট্র ও শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য। কৃষিভিত্তিক সমাজে ক্ষমতা আর স্থানীয় রাজা বা

পুরোহিতদের করায়ত্ত ছিল না; এর কেন্দ্রবিন্দু অন্তত আংশিকভাবে হলেও প্রতিটি সংস্কৃতির সম্পদের উৎস বাজার এলাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। এমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ শেষতক আবিষ্কার করতে শুরু করে যে তাদের পূর্বপুরুষদের দারুণভাবে উপকারে আসা প্রাচীন প্যাগান মতবাদ এখন আর তাদের অবস্থার সাথে খাপ খাচ্ছে না।

অ্যাক্সিয়াল যুগের নগর ও সাম্রাজ্যে সাধারণ জনগণ প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও বিস্তৃত দিগন্তের অধিকারী হয়ে উঠছিল, ফলে স্থানীয় কাল্টসমূহকে সীমিত ও সংকীর্ণ মনে হতে শুরু করেছিল। ঈশ্বরকে কিছু সংখ্যক দেবতার মাঝে সীমিত ভাববার বদলে মানুষ ক্রমবর্ধমানহারে একজন মাত্র বিশ্বজনীন দুর্জ্ঞেয় সত্তা ও পবিত্রতার উৎসের উপাসনা শুরু করেছিল। তাদের হাতে প্রচুর অবসর ছিল বলে আরও সমৃদ্ধ অন্তস্থঃ জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়ে উঠেছিল, সেই অনুযায়ী তারা এমন এক আধ্যাত্মিকতার আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করে যা কেবল বাইরের উপাদানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকবে না। সবচেয়ে সংবেদনশীলরা কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রতীয়মান হওয়া সামাজিক অবিচারের কারণে অস্বস্তিতে ভুগছিল; সাধারণ কৃষকদের উপর নির্ভরশীল ছিল সেটা যারা উঁচু সংস্কৃতি থেকে কোনওভাবেই কোনও রকম সুবিধা পেত না। পরিণামে পয়গম্বর ও সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটে, এঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে সহানুভূতির গুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জোর দিতে শুরু করেন: প্রতিটি মানুষের মাঝে পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা ও সমাজের অধিকতর নাজুক সদস্যদের বাস্তবভিত্তিক সেবা প্রদানের সদিচ্ছা প্রকৃত ধার্মিকতার পরীক্ষায় পরিণত হয়। এইভাবে অ্যাক্সিয়াল যুগে মানবজাতিকে পথনির্দেশনা দিয়ে চলা মহান কনফেশনাল ধর্মবিশ্বাসসমূহ সভ্য সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভারতে বুদ্ধধর্মমত ও হিন্দুধর্ম, দূরপ্রাচ্যে কনফুসিয় মতবাদ ও তাওবাদ। এগুলোর প্রধান পার্থক্য সত্ত্বেও অ্যাক্সিয়াল যুগের এইসব ধর্মের ভেতর অনেক সাধারণ মিল ছিল: একক সর্বজনীন দুর্জ্ঞেয় ধারণার বিকাশ ঘটাতে এগুলো সবই প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, এক ধরনের অন্তস্থঃ আধ্যাত্মিকতার চর্চা করেছে এবং বাস্তবভিত্তিক সহানুভূতির প্রতি জোর দিয়েছে।

আজকের দিনে, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা একই ধরনের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। আধুনিক কালের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এর শেকড় প্রোথিত, যখন পশ্চিম ইউরোপের মানুষ ভিন্ন ধরনের সমাজের বিবর্তন ঘটাতে শুরু করেছিল। কৃষি উদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল নয়, এই সমাজ সম্পদকে সীমাহীনভাবে পুনরুৎপাদনে সক্ষম করে তোলা প্রযুক্তির নির্ভর ছিল। সত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন জ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী ধর্মীয় পরিবর্তনের ফলে এর

WWW.AMARBOI.COM

আগের চারশত বছরের বিপুল সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের সাথে অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ অগ্রসর হয়েছে। এবং আরও একবার ধর্মীয় পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছিল। সারা বিশ্বে জনগণ জানতে পারছিল যে তাদের নাটকীয়ভাবে বদলে যাওয়া পরিবেশে বিশ্বাসের প্রাচীন ধরন আর কাজ করছে না। মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় আলোকন ও সান্ত্বনার যোগান দিতে পারছে না এগুলো। ফলে নারী-পুরুষ অ্যাক্সিয়াল যুগের সংস্কারক ও পয়গম্বরদের মতো ধার্মিক হয়ে ওঠার, অতীতের দর্শনের উপর ভিত্তি করে এমনভাবে নিজেদের গড়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছে যা মানবজাতিকে নিজেদের জন্যে নির্মিত এক নতুন বিশ্বে নিয়ে যাবে। এইসব আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম–আপাত তাকে যতই পরস্পরবিরোধী মনে হোক না কেন–মৌলবাদ।

আমরা ধারণা করে নিতে চাই যে, অতীতের মানুষ (মোটামুটিভাবে) আমাদের মতোই ছিল; কিন্তু আসলে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন অনেক ভিন্ন ছিল। বিশেষ করে ভাবনা, কথোপকথন ও জ্ঞান অর্জনের দ্বিমুখী ধারা গড়ে তুলেছিল তারা, পণ্ডিতরা যার নাম দিয়েছেন *মিথোস* ও *লোগাস*।[৩] দুটোই ছিল আবশ্যক: সত্যি অর্জনের ক্ষেত্রে উভয়কেই সম্পূরক মনে করা হত, দুটোরই তাদের ক্ষমতার বিশেষ অঞ্চল ছিল। মিথকে মৌল বিষয় মনে করা হত; আমাদের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সময়হীন ও ধ্রুব মনে করা বিষয়সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল তা। জীবনের উৎস, সংস্কৃতির ভিত্তি ও মানব মনের গভীরতর স্তরে দৃষ্টি দিত তা। বাস্তব বিষয়আশয়ের সাথে মিথের কোনও সম্পর্ক ছিল না, ছিল অর্থের সাথে। আমাদের জীবনের এক ধরনের তাৎপর্য খুঁজে না পেলে, আমরা মরণশীল নারী-পুরুষ অনায়াসে হতাশায় ডুবে মরি। সমাজের *মিথোস* মানুষকে এক প্রেক্ষিতের যোগান দেয় যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অর্থ তুলে ধরে। এটা চিরন্তন ও সর্বজনীনের প্রতি তাদের মনোযোগ চালিত করে। আমরা যাকে অবচেতন মন বলব, এটা তাতেও প্রোথিত ছিল। আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হবে বলে মনে করা হয়নি এমন সব বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী ছিল মনস্তত্ত্বের প্রাচীন ধরন। মানুষ পাতালে অবতরণ করে গোলকধাঁধায় সংগ্রামরত বা দানবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত বীরদের কাহিনী বর্ণনার সময় অবচেতন বলয়ের অস্পষ্ট এলাকাসমূহকে আলোয় তুলে নিয়ে আসত, একেবারেই যৌক্তিক মনের অনুসন্ধানে যা বোধগম্য ছিল না; তবে আমাদের অভিজ্ঞতা ও আচরণের উপর যার গভীর প্রভাব ছিল।[৪] আমাদের আধুনিক সমাজে মিথের মৃত্যুর ফলে আমাদের অন্তস্থঃ জগতের মোকাবিলা করতে সাইকোঅ্যানালিসিসের বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করতে হয়েছে।

AMARBOI.COM

যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে মিথকে তুলে ধরা সম্ভব নয়; এর আন্তর্দৃষ্টিসমূহ অধিকতর স্বজ্ঞাপ্রসূতঃ শিল্পকলা, সঙ্গীত, কবিতা বা ভাস্কর্যের মতো। কেবল কাল্ট, আচার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারণ করা হলেই মিথ বাস্তবে পরিণত হয়, উপাসকদের উপর নান্দনিকতার ভিত্তিতে কাজ করে, তাদের ভেতর পবিত্র তাৎপর্যের বোধ জাগিয়ে তোলে ও অস্তিত্বের গভীরতর প্রবাহ উপলব্ধিতে সক্ষম করে তোলে। মিথ ও কাল্ট পরস্পরের সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে কোনটার আবির্ভাব আগে ঘটেছে সেটা পণ্ডিতি বিতর্কের বিষয় হতে পারেঃ পৌরাণিক বিবরণ নাকি এর সাথে সংশ্লিষ্ট আচার।[৫] মিথ আবার অতীন্দ্রিয়বাদের সাথেও সম্পর্কিত ছিলঃ স্বজ্ঞাপ্রসূত অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকল সংস্কৃতিতে বিকশিত মনোসংযোগ ও একাগ্রতার ধাপবিশিষ্ট অনুশীলনের মাধ্যমে মনের গভীরে অবতরণ। কাল্ট বা মরমী চর্চা ছাড়া ধর্মের মিথসমূহ বিমূর্ত রয়ে যায় ও অবিশ্বাস্য ঠেকে, ঠিক যেমন আমাদের বেশিরভাগের কাছেই সঙ্গীতের সুর অস্পষ্ট রয়ে যায় ও এর সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্যে বিভিন্ন যান্ত্রিক অনুষঙ্গ দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে।

প্রাক-আধুনিক বিশ্বে ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তারা আসলে কী ঘটেছিল তা নিয়ে আমাদের চেয়ে কম আগ্রহী ছিল। তারা বরং ঘটনার নিগূঢ় অর্থের ব্যাপারেই বেশি সংশ্লিষ্ট ছিল। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকে সময়ের দূরবর্তী প্রান্তের অনন্য সাধারণ ব্যাপার হিসাবে দেখা হত না, বরং একে অটল, সময়হীন বাস্তবতার প্রকাশ মনে করা হত। এই কারণে ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করার প্রবণতা দেখাত, কারণ সূর্যের নিচে কোনও কিছুই নতুন ছিল না। ঐতিহাসিক বিবরণসমূহ চিরন্তন মাত্রাকে বের করে আনার প্রয়াস পেত।[৬] এভাবে প্রাচীন ইসরায়েলিরা মিশর থেকে পালিয়ে লোহিত সাগর অতিক্রম করার সময় আসলে কী ঘটেছিল সেটা আর আমরা জানতে পারি না। পরিকল্পিতভাবেই এই কাহিনীকে মিথ হিসাবে লেখা হয়েছে, এবং একে যাত্রার অন্যান্য কাহিনী, গভীরে প্লাবিত হওয়া ও এক নতুন বাস্তবতা সৃষ্টির জন্যে দেবতাগণের সাগর দুই ভাগ করার কাহিনীর সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর পাসওভার সেদারের আচারে ইহুদিরা এই মিথের অভিজ্ঞতা লাভ করে, এই উৎসব ওদের জীবনে কাহিনীটিকে নতুন করে ফিরিয়ে এনে একে তাদের নিজেদের কাহিনীতে পরিণত করতে সাহায্য করে। কেউ বলতে পারেন ঐতিহাসিক ঘটনাকে এইভাবে মিথে পরিণত করা না হলে, এবং অনুপ্রেরণাসৃষ্টিকারী কাল্টে রূপান্তরিত না করলে তা ধর্মীয় হতে পারবে না। ঠিক বাইবেলে যেভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, মিশর থেকে এক্সোডাস সেভাবেই ঘটেছিল কিনা, এই প্রশ্ন উত্থাপন বা একে সত্যি প্রমাণ করার জন্যে বৈজ্ঞানিক বা ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দাবি করা গল্পের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে

AMARBOI.COM

ভুলভাবে গ্রহণ করার শামিল হবে। এটা হবে *মিথোস*-কে *লোগোসে*-র সাথে গুলিয়ে ফেলার মতো।

*লোগোস*ও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। *লোগোস* হচ্ছে এই বিশ্বে নারী-পুরুষকে কর্মক্ষম রাখার যৌক্তিক, বাস্তবভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা। আজকের দিনে পশ্চিমে আমরা হয়তো *মিথোসের* বোধ হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু *লোগোসের* সাথে আমরা বেশ ভালোভাবেই পরিচিত। এটাই আমাদের সমাজের ভিত্তি। মিথের বিপরীতে *লোগোস*-কে অবশ্যই বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে ও বাইরের বাস্তবতার সাথে মিলতে হবে, যদি একে কার্যকর হতে হয়। জাগতিক বিশ্বে একে দক্ষতার সাথে ক্রিয়াশীল থাকতে হবে। আমরা যখন কোনও কিছু করতে যাই, কোনও কাজ সম্পাদন করতে চাই বা অন্য লোককে বিশেষ কোনও কাজে সম্মত করাতে চেষ্টা করি তখনই এই যৌক্তিক, আলোচনামূলক যুক্তি প্রয়োগ করে থাকি। *লোগোস* বাস্তবভিত্তিক। সূচনা ও ভিত্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপকারী *মিথের* বিপরীতে *লোগোস* দৃঢ়তার সাথে সামনে অগ্রসর হয় ও প্রাচীন দর্শনকে ব্যাখ্যা করার লক্ষ্য নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করে, পরিবেশের উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে, ও আনকোরা কিছু আবিষ্কার করে এবং নতুন কিছু উদ্ভাবন করে।[৭]

প্রাক আধুনিক বিশ্বে *মিথোস* ও *লোগোস* উভয়কেই অপহার্য মনে করা হত। একটি ছাড়া অন্যটি অচল হয়ে পড়ত। কিন্তু তারপরেও এদুটো ছিল আবিশ্যিকভাবেই ভিন্ন; পৌরাণিক ও যৌক্তিক আলোচনাকে গুলিয়ে ফেলা বিপজ্জনক মনে করা হত। ভিন্ন ভিন্ন ছিল তাদের কাজ। মিথ যৌক্তিক ছিল না; এর বর্ণনা প্রায়োগিকভাবে তুলে ধরা যাবে বলে মনে হত না। এটা অর্থের একটা পরিপ্রেক্ষিত যোগাত যা আমাদের কর্মকাণ্ডকে মূল্যবান করে তুলত। *মিথোসকে* বাস্তবভিত্তিক কোনও নীতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করবেন আপনি, এমনটা ভাবা হত না। সেটা করে থাকলে ফলাফল ভয়াবহ রকম মারাত্মক হয়ে উঠতে পারত; কারণ মনের অন্তস্থঃ বিশ্বে যা চমৎকারভাবে কাজ করে সেটা চট করে বাইরের কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ, পোপ দ্বিতীয় আরবান যখন ১০৯৫ সালে প্রথম ক্রুসেডের ডাক দেন, তার পরিকল্পনা ছিল *লোগোসের* বলয়ের। তিনি চেয়েছিলেন ইউরোপের নাইটরা যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাত বন্ধ করে ও পাশ্চাত্য ক্রিশ্চান বিশ্বের ভিত্তি বিনষ্ট না করে চলে। এবং সেই শক্তিটুকু যেন তারা মধ্যপ্রাচ্যে ব্যয় করে তাঁর চার্চের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু এই সামরিক অভিযান লোক মিথলজি, বাইবেলিয় উপকথা ও প্রলয়বাদী ফ্যান্টাসির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেলে বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়ায় তার পরিণতি; বাস্তবক্ষেত্রে, সামরিক দিক থেকে

AMARBOI.COM

ও নৈতিকভাবেও। দীর্ঘ ক্রুসেডিয় কর্মকাণ্ডের দীর্ঘ সময় জুড়ে ব্যাপারটা এমন ছিল যে যখনই *লোগোস* আধিপত্য বজায় রেখেছে তখনই ক্রুসেডাররা সাফল্যের মুখ দেখেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে চমৎকার তৎপরতা দেখিয়েছে তারা, মধ্যপ্রাচ্যে উপযোগি কলোনী প্রতিষ্ঠা করেছে এবং স্থানীয় জনগণের সাথে অনেক বেশি ইতিবাচকভাবে মিশতে শিখেছে। তবে যখনই ক্রুসেডাররা তাদের নীতির ভিত্তিতে পৌরাণিক বা নিগূঢ় দর্শন তৈরি করতে গেছে, সাধারণত তারা পরাস্ত হয়েছে ও ভয়ানক সব নিষ্ঠুরতার জন্ম দিয়েছে।[৮]

লোগোসের নিজস্ব সীমাবদ্ধতাও ছিল বৈকি। মানুষের বেদনা বা বিষাদের প্রশমন ঘটাতে পারত না এটা। যৌক্তিক যুক্তি-তর্ক ট্র্যাজিডির কোনও অর্থ করতে পারত না। *লোগোস* মানব জীবনের পরম মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর যোগাতে পারেনি। একজন বিজ্ঞানী বিভিন্ন বস্তুকে আরও কার্যকরভাবে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারতেন, ভৌত বিশ্ব সম্পর্কে আবিষ্কার করতে পারতেন অসাধারণ সব নতুন তথ্য, কিন্তু তিনি জীবনের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারতেন না।[৯] এটাই ছিল মিথ আর কাল্টের রাজত্ব।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এমন বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে যে তারা ভাবতে শুরু করেছিল যে *লোগোসই* সত্যি জানার একমাত্র উপায়, *মিথোসকে* তারা মিথ্যা ও কুসংস্কার বলে নাকচ করে দিতে শুরু করে। এটাও ঠিক যে যে নতুন বিশ্ব নির্মাণ করতে যাচ্ছিল তারা সেটা প্রাচীন পৌরাণিক আধ্যাত্মিকতার গতিশীলতার সাথে বিরোধমূলক হয়ে উঠেছিল। আধুনিক বিশ্বে আমাদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বদলে গেছে, ক্রমবর্ধমান হারে মানুষ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকেই কেবল সত্যি হিসাবে দেখতে শুরু করায় তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসের *মিথোসকে* প্রায়শঃই *লোগোসে* পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছে। মৌলবাদীরাও একই প্রয়াস পেয়েছে। এই বিভ্রান্তি আরও বেশি করে সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

আমাদের বিশ্ব কীভাবে বদলে গেছে সেটা আমাদের বুঝতে হবে। সুতরাং, এই বইয়ের প্রথম অংশ পঞ্চদশ শতকের শেষে ও সপ্তম শতকের গোড়ায় ফিরে যাবে, যখন পশ্চিম ইউরোপের জনগণ তাদের নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ঘটাতে যাচ্ছিল। ধর্মবিশ্বাসের প্রাচীন ধরনগুলো কীভাবে কাজ করত বোঝার জন্যে আমরা প্রাক আধুনিক কৃষিভিত্তিক সমাজের পৌরাণিক ধর্মানুরাগও পর্যালোচনা করব। সাহসী নতুন বিশ্বে প্রচলিত ধারায় ধার্মিক থাকা ক্রমবর্ধমানহারে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আধুনিকায়ন সব সময়ই একটা বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া ছিল। সমাজের মৌলিক পরিবর্তন যখন বিশ্বকে অচেনা ও শনাক্তের অতীত করে তোলে মানুষ তখন বিচ্ছিন্ন

AMARBOI.COM

ও দিশাহারা বোধ করতে শুরু করে। আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার ক্রিশ্চান, ইহুদি জনগণ ও মিশর ও ইরানের মুসলিমদের উপর আধুনিকতার প্রভাব অনুসন্ধানের চেষ্টা করব। তাহলেই আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে মৌলবাদীরা ধর্মবিশ্বাসের এই নতুন ধরন সৃষ্টি করতে যাওয়ার সময় তারা আসলে কী করার চেষ্টা করছিল জানার মতো একটা অবস্থানে পৌঁছাতে পারব আমরা।

মৌলবাদীরা মনে করে তারা বুঝি তাদের পবিত্রতম মূল্যবোধকে আক্রান্তকারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। যুদ্ধের সময় সংঘাতে লিপ্ত থাকে যারা তাদের পক্ষে একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা দারুণ কঠিন হয়। আমরা দেখব যে, আধুনিকায়ন সমাজের মেরুকরণের দিকে চালিত করেছে, তবে অনেক সময় বিরোধের অবনতি ঠেকাতে আমাদের অবশ্যই অন্যপক্ষের বেদনা ও দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার প্রয়াস পেতে হবে। আমাদের ভেতর যারা—আমিসহ—আধুনিকতার স্বাধীনতা ও সাফল্য ভোগ করে থাকি তাদের পক্ষে ধর্মীয় মৌলবাদীদের ক্ষেত্রে সেসবের কারণে সৃষ্ট দুর্গতি বোঝা কঠিন। তবু আধুনিকায়ন প্রায়শঃই মুক্তি নয় বরং আক্রমণাত্মক হামলা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আধুনিক বিশ্বে ইহুদি জাতির তুলনায় খুব কমসংখ্যকই ভোগান্তির স্বীকার হয়েছে; সুতরাং, পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে আধুনিকায়নবাদী পাশ্চাত্য সমাজের সাথে তাদের বেদনাদায়ক সাক্ষাতের ঘটনা দিয়ে শুরু করাই সবচেয়ে মানানসই হবে, যা কোনও কোনও ইহুদিকে পরে নতুন বিশ্বে সাধারণ বিষয়ে পরিণত হবে এমন নানা ধরনের রণকৌশল, অবস্থান ও নীতিমালার উদ্ভাবনের পথে চালিত করেছিল।

AMARBOI.COM

প্রথম পর্ব

প্রাচীন ও নতুন বিশ্ব

AMARBOI.COM

১. ইহুদি: অগ্রপথিক (১৪৯২-১৭০০)

১৪৯২ সালে স্পেনে তিনটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সেই সময় এই ঘটনাগুলোকে অসাধারণ মনে করা হয়েছিল, কিন্তু পেছনে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারি এসব ছিল পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে ধীরে ধীরে বেদনাদায়কভাবে জন্ম নিতে চলা এক নতুন সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। এই বছরগুলো আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং ১৪৯২ সাল আমাদের বেশ কিছু চিন্তা-ভাবনা ও দোলাচলেরও উপরও আলোকপাত করে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল জানুয়ারির ২ তারিখে, এই দিন ক্যাথলিক সম্রাট-সম্রাজ্ঞী রাজা ফার্দিনান্দ ও রানি ইসাবেলার সেনাবাহিনী, যাদের বিয়ে সম্প্রতি প্রাচীন ইবারিয় পেনিসুলার রাজ্য আরাগন ও কাসলকে একসূত্রে বেঁধেছিল, নগর রাষ্ট্র গ্রানাদা দখল করে নেয়। গভীর আবেগের সাথে নগরবাসীরা নগর প্রাচীরে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রিশ্চান পতাকা ওড়ানো প্রত্যক্ষ করে। খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে গোটা ইউরোপ জুড়ে বিজয়ের সুরে ঘণ্টা বাজতে শুরু করে, কারণ ক্রিশ্চান বিশ্বে গ্রানাদাই ছিল শেষ মুসলিম শক্তঘাঁটি। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তবে অন্তত ইউরোপ থেকে মুসলিমদের বহিষ্কার করা গেছে। ১৪৯৯ সালে স্পেনের মুসলিমদের ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ বা দেশত্যাগের মধ্যে যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, এরপর কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপ মুসলিম শূন্য হয়ে থাকবে। গুরুত্ববহ এই বছরের দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ৩১শে মার্চ, এই দিন ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা এডিক্ট অভ এক্সপালশান স্বাক্ষর করেন; স্পেনকে ইহুদি মুক্ত করাই ছিল এর লক্ষ্য। ব্যাপ্টিজম বা দেশত্যাগের ভেতর যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তাদের। অনেক ইহুদিই 'আল-আন্দালুসের' (প্রাচীন মুসলিম রাজ্যকে এ নামেই ডাকা হত) সাথে নিজেদের এমনভাবে সম্পর্কিত মনে করত যে, ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে

AMARBOI.COM

স্পেনেই থেকে যায় তারা, কিন্তু আনুমানিক ৮০,০০০ ইহুদি সীমানা পেরিয়ে পর্তুগালে পাড়ি জমায়, অন্যদিকে ৫০,০০০ ইহুদি পালিয়ে যায় নতুন মুসলিম অটোমান সাম্রাজ্যে। এখানে তাদের স্বাগত জানানো হয়।[১] তৃতীয় ঘটনাটি ক্রিশ্চানদের গ্রানাদা অধিকার করে নেওয়ার সময় উপস্থিত এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। আগস্ট মাসে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার অনুগ্রহভাজন ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভারতের সাথে নুতন বাণিজ্য-পথ আবিষ্কারের লক্ষ্যে জাহাজ ভাসান, কিন্তু তার বদলে আমেরিকা আবিষ্কার করে বসেন তিনি।

এইসব ঘটনা যুগপৎ প্রাথমিক আধুনিক কালের মাহাত্ম্য ও বিনাশ প্রতিফলিত করে। কলম্বাসের অভিযান যেমন জোরালভাবে দেখিয়েছে যে, ইউরোপের জনগণ এক নতুন বিশ্বের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। ওদের দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছিল, এপর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অজানা এবং ভৌগলিক বলয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল তারা। এই সাফল্য তাদের বিশ্বের অধিপতিতে পরিণত করবে। কিন্তু আধুনিকতার অন্ধকার দিকও ছিল। ক্রিশ্চান স্পেন ছিল ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী ও অগ্রসর রাজ্য। ক্রিশ্চান বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিকাশমান বিভিন্ন রাষ্ট্রের মতো একটি আধুনিক কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্র নির্মাণের পথে ছিলেন ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা। এমন একটি রাষ্ট্র মধ্যযুগকে বৈশিষ্ট্যায়িত করে তোলা গিল্ড, কর্পোরেশন বা ইহুদি সম্প্রদায়ের মতো প্রাচীন স্বায়ত্তশাসিত, স্ব-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহ্য করতে পারে না। গ্রানাদা অধিকারের ভেতর দিয়ে স্পেনের একীভূতকরণের প্রক্রিয়ার পরপরই জাতিগত পরিশুদ্ধির একটি প্রক্রিয়া শেষ করা হয়। ইহুদি ও মুসলিমরা তাদের আবাস হারায়। কিছু কিছু মানুষের কাছে আধুনিকায়ন ছিল ক্ষমতায়ন, মুক্তিদায়ী এবং উত্তেজনাকর। অন্যরা একে নির্যাতনমূলক, আগ্রাসী ও প্রলয়ঙ্করী হিসাবে প্রত্যক্ষ করেছে এবং করে যাবে। পাশ্চাত্য আধুনিকতা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এই একই প্যাটার্ন অব্যাহত থাকবে। এই আধুনিকায়ন কর্মসূচি ছিল আলোকসৃষ্টিকারী, শেষ পর্যন্ত তা মানবিক মূল্যবোধসমূহকে উপরে তুলে ধরবে, কিন্তু তা আগ্রাসীও ছিল। বিংশ শতাব্দীতে প্রাথমিকভাবে আধুনিকতাকে আক্রমণ হিসাবে প্রত্যক্ষকারীরাই পরিণত হবে মৌলবাদীতে।

কিন্তু সেটা তখনও দূর ভবিষ্যতের গর্ভে। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে ইউরোপের জনগণের পক্ষে তাদের সূচিত পরিবর্তনের ব্যাপকতা উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তী তিন শো বছরের পরিক্রমায় ইউরোপ কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবেই সমাজসমূহের পরিবর্তন ঘটাবে না, বরং এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সংগঠিত করবে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ পরিণত হবে যুগের বিধানে, ধীরে ধীরে

মন ও হৃদয়ের পুরোনো আলখেল্লাকে বিতাড়িত করবে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা গ্রেট ওয়েস্টার্ন ট্রান্সফর্মেশন হিসাবে আখ্যায়িত এই সময়কালের উপর আলোকপাত করব। তবে এর পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য উপলব্ধির আগে প্রাক আধুনিক কালের মানুষ কীভাবে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করত সেটা দেখতে হবে। স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সোৎসাহে ছাত্র ও শিক্ষকগণ ইতালিয় রেনেসাঁর নানা নতুন ধারণা নিয়ে আলোচনায় মেতে ছিলেন। ম্যাগনেটিক কম্পাস বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের নবতর ধারণার মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্য ছাড়া কলম্বাসের অভিযান সম্ভব ছিল না। ১৪৯২ সাল নাগাদ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ দর্শনীয়ভাবে কার্যকর হয়ে উঠছিল। মানুষ আগের চেয়ে ঢের বেশি পরিপূর্ণভাবে গ্রিকরা যাকে *লোগোস* আখ্যায়িত করেছে তার সম্ভাবনা আবিষ্কার করছিল, সব সময়ই যা একেবারে নতুন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণেই ইউরোপিয়রা সম্পূর্ণ নতুন এক বিশ্ব আবিষ্কার করে, পরিবেশের উপর অভাবনীয় নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে শুরু করে। কিন্তু তখনও তারা *মিথোস*কে নাকচ করে দেয়নি। বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় ছিল কলম্বাসের, কিন্তু তখনও তিনি প্রাচীন পৌরাণিক বিশ্বেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। তিনি ধর্মান্তরিত এক ইহুদি পরিবারের সন্তান ছিলেন বলেই মনে হয়, ইহুদিবাদের মরমী ঐতিহ্য কাব্বালায় তাঁর আগ্রহ রয়ে গিয়েছিল; কিন্তু আবার ধর্মপ্রাণ ক্রিশ্চান ছিলেন তিনি; ক্রাইস্টের পক্ষে গোটা বিশ্বকে অধিকার করতে চেয়েছেন। ভারতে পৌঁছানোর পর জেরুজালেমের সামরিক অধিকার লাভের জন্যে সেখানে একটি ক্রিশ্চান ঘাঁটি স্থাপনের আশা করেছিলেন তিনি। ইউরোপের মানুষ আধুনিতার পথে যাত্রা শুরু করেছিল, কিন্তু আমাদের মতো পূর্ণাঙ্গ আধুনিক হয়ে ওঠেনি। ক্রিশ্চান ধর্মের বিভিন্ন মিথ যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক অভিযানে তখনও ওদের কাছে অর্থ যোগাচ্ছিল।

তাসত্ত্বেও ক্রিশ্চান ধর্ম বদলে যাচ্ছিল। স্পেনিয়ার্ডরাই কাউন্সিল অভ ট্রেন্ট সূচিত কাউন্টার রিফর্মেশনের (১৫৪৫-৬৩) নেতায় পরিণত হবে। এটা ছিল পুরোনো ক্যাথলিজমকে নতুন ইউরোপের সংহত দক্ষতার সাথে এক তলে আনয়নকারী একটি আধুনিকায়ন কর্মসূচি। আধুনিক রাষ্ট্রের মতো চার্চ অধিকতর কেন্দ্রিভূত সংস্থায় পরিণত হয়। কাউন্সিল পোপ ও বিশপদের ক্ষমতার সংস্কার করে, প্রথমবারের মতো মতবাদগত সমরূপতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল বিশ্বাসীর উদ্দেশ্যে একটি ক্যাটেশিজম জারি করা হয়। যাজকদের আরও উন্নত মানের শিক্ষিত হয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁরা আরও কার্যকরভাবে ধর্ম শিক্ষা দিতে পারেন। সাধারণ মানুষের লিটার্জি ও ভক্তি প্রকাশের বিভিন্ন অনুশীলনকে যৌক্তিক করা হয়; এক শতাব্দী আগেও অর্থপূর্ণ ছিল যেসব আচার সেগুলো এখন আর নতুন

AMARBOI.COM

যুগের জীবনযাত্রায় কাজ আসছিল না বলে বাতিল করে দেওয়া হয়। স্পেনের বহু ক্যাথলিক ওলন্দাজ মানবতাবাদী দেসিদেরিয়াস ইরাসমাসের (১৪৬৬-১৫৩০) রচনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। মৌলবিষয়ে ফিরে গিয়ে ক্রিশ্চান ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর শ্লোগান ছিল, *আদ ফন্তেস:* 'ফিরে চলো ঝর্নায়!' ইরাসমাসের বিশ্বাস ছিল প্রাথমিক চার্চের প্রকৃত ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাস প্রাণহীন কিছু মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বের নিচে চাপা পড়ে গেছে। পরবর্তীকালের বিভিন্ন সংযোজন ছিন্ন করে উৎসে—বাইবেল ও ফাদার্স অভ দা চার্চ—ফেরার মাধ্যমে ক্রিশ্চানরা গস্পেলের সজীব মূল বিষয় উদ্ধার করবে ও এক নবজন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

কাউন্টার রিফর্মেশনের প্রধান স্পেনিয় অবদান ছিল অতীন্দ্রিয়। অনেকটা মহান নাবিকদের ভৌত বিশ্বে নতুন নতুন অঞ্চল আবিষ্কার করে চলার মতো ইবারিয়ার অতীন্দ্রিয়বাদীরা আধ্যাত্মিক জগতের অভিযাত্রীতে পরিণত হয়। অতীন্দ্রিয়বাদ ছিল *মিথোসের* আওতাভুক্ত, যৌক্তিক অংশের কাছে দুর্গম অবচেতন জগতেই এর কর্মকাণ্ড, ভিন্ন কৌশলে প্রত্যক্ষ করতে হত একে। তাসত্ত্বেও স্পেনের অতীন্দ্রিয়বাদী সংস্কারকগণ আধ্যাত্মিকতার এই ধরনটিকে কম আগোছাল ও অন্তর্মুখী, এবং অপরিপক্ক পরামর্শকদের উপর কম নির্ভরশীল করতে চেয়েছিলেন। জন অভ দ্য ক্রস (১৫৫২–৯১) অধিকতর সন্দেহজনক ও কুসংস্কারমূলক ভক্তি উৎখাত করে অতীন্দ্রিয়বাদী প্রক্রিয়াকে অনেকটা পদ্ধতিগত রূপ দেন। নতুন কালের অতীন্দ্রিয়বাদীদের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে অগ্রসর হওয়ার সময় কী প্রত্যাশা করতে হবে সেটা জানার প্রয়োজন ছিল, তাদের অবশ্যই অন্তস্থঃ জীবনের বিভিন্ন সংকট ও বিপদের মোকাবিলা করার কৌশল শিখতে হত ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের কার্যকর ও নিয়মিত ব্যবহার জানতে হত।

অবশ্য আরও আধুনিক ও অত্যাসন্ন বিভিন্ন পরিবর্তনের আভাস ছিল সাবেক সৈনিক ইগনাশিয়াস অভ লায়োলা (১৪৯১-১৫৫৫) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোসায়েটি অভ জেসাস। এই সংঘ এমন এক ধরনের দক্ষতা ও কার্যকারিতা ধারণ করত যা আধুনিক পশ্চিমের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। ইগনাশিয়াস বাস্তব ক্ষেত্রে *মিথোসের* শক্তি পরীক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর জেস্যুইটদের জন অভ দ্য ক্রস উদ্ভাভিত দীর্ঘ ধ্যানমূলক অনুশীলনের অবকাশ ছিল না। তাঁর *স্পিরিচুয়াল এক্সারসাইজ* তিরিশ দিন মেয়াদী সময়-দক্ষ একটি পদ্ধতিগত নির্জনবাসের ব্যবস্থা দিয়েছিল, ফলে প্রত্যেক জেস্যুইট অতীন্দ্রিয়বাদের একটি ঝটিকা শিক্ষা লাভ করত। পরিপূর্ণভাবে যিশুতে দীক্ষা লাভের পর একজন ক্রিশ্চান তার অগ্রাধিকারসমূহ বিন্যস্ত করে নিতে পারলে, কর্মক্ষেত্রে নামতে প্রস্তুত হতে পারত। পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ও সংগঠনের উপর এই গুরুত্বারোপ নতুন বিজ্ঞানের মতোই ছিল।

WWW.AMARBOI.COM

ঈশ্বরকে এক গতিশীল শক্তি হিসাবে প্রত্যক্ষ করা হত, যা সারাবিশ্বের জেস্যুইটদের অনেকটা অভিযাত্রীদের মতোই পরিচালিত করত। ফ্রান্সিস হাবিয়ের (১৫০৬-৫২) জাপানকে, রবার্ট দি নোবিলি (১৫৭৭-১৬৫৬) ভারতকে, এবং মেত্তিও রিক্কি (১৫৫২-১৬১০) চীনকে ইভাঞ্জেলাইজ করেছেন। প্রাথমিক আধুনিক স্পেনে ধর্মকে তখনও পেছনে ফেলে আসা হয়নি। নিজেকেই নিজে সংস্কারে সক্ষম ছিল তা, এবং নিজস্ব আওতা ও আদর্শকে আরও সামনের দিকে নিয়ে যেতে আধুনিকতার বিভিন্ন অন্তর্দৃষ্টি আত্মস্থ করতে পারছিল।

সুতরাং, প্রাথমিক আধুনিক স্পেন ছিল আধুনিকতার অগ্রসর প্রহরীর অংশ। তবে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলাকে এইসব শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। এ যাবত স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন রাজ্যকে একত্র করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন তাঁরা; পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করতে হচ্ছিল সেগুলোকে। ১৪৮৩ সালে এই দুই রাজন্য তাঁদের একীভূত অঞ্চলে আদর্শগত সমরূপতা নিশ্চিত করতে নিজস্ব স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের প্রচলন করেন। একটি আধুনিক পরম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছিলেন তাঁরা, কিন্তু তখনও তাঁদের হাতে প্রজাদের অবারিত বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা দেওয়ার মতো সম্পদ ছিল না। ইনকুইজিটররা ভিন্নমতাবলম্বীদের খুঁজে বের করে তাদের 'হেরেসি' (ধর্মহীনতা) ত্যাগে বাধ্য করতেন: এই শব্দটির আদি গ্রিক অর্থ ছিল 'কারও নিজের পথে যাওয়া।' স্প্যানিশ ইনকুইজিশন অতীতের বিশ্বকে ধরে রাখার প্রাচীন কোনও প্রয়াস ছিল না। আধুনিকায়নের প্রতিষ্ঠান ছিল এটা, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজা-রানি এর পত্তন ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা খুব ভালো করেই জানতেন, ধর্ম একটি বিস্ফোরক ও বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হতে পারে। ইংল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে প্রটেস্ট্যান্ট শাসকগণ একইভাবে তাঁদের ক্যাথলিক 'ভিন্নমতাবলম্বীদের' প্রতি খড়গহস্ত ছিলেন; তাদেরও রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ বিবেচনা করা হয়েছিল। আমরা দেখব, এই ধরনের নির্যাতন ছিল আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ারই অংশ। স্পেনে ইনকুইজিশনের প্রধান শিকার ছিল ইহুদিরা; এই অধ্যায়ে আমরা আগ্রাসী আধুনিকতার প্রতি ইহুদি জনগণের সাড়াই আলোচনা করব। তাদের অভিজ্ঞতা বিশ্বের অন্যান্য অংশের মানুষ কীভাবে আধুনিকতার প্রতি সাড়া দেবে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন উপায়ের অনেকগুলোই তুলে ধরে।

আল-আন্দালুসের পুরোনো মুসলিম এলাকার স্প্যানিশ *রিকনকুইস্তা* ইবারিয়ার ইহুদিদের পক্ষে ছিল রীতিমতো বিপর্যয়। ইসলামি রাষ্ট্রে ইহুদিবাদ, ক্রিশ্চানিটি ও ইসলামের মতো তিনটি ধর্ম পাঁচ শো বছরেরও বেশি কাল একসাথে সম্প্রীতির ভেতর বাস করে এসেছে। বিশেষ করে ইহুদিরা স্পেনে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক রেনেসাঁ উপভোগ করেছে, ইউরোপের বাকি অংশে ইহুদি জনগণের নিয়তিতে

AMARBOI.COM

পরিণত হওয়া বিভিন্ন হত্যালীলার শিকার হতে হয়নি তাদের।[৪] কিন্তু ক্রিশ্চান সেনাবাহিনী ইসলামের আরও অনেক অনেক ভূখণ্ড অধিকার করে পেনিনসুলা ধরে ক্রমে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে অ্যান্টি-সেমিটিজমকেও সাথে করে নিয়ে আসছিল তারা। ১৩৭৮ ও ১৩৯১ সালে আরাগন ও ক্যাস্তিলের ইহুদি সম্প্রদায় ক্রিশ্চানদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল, ইহুদিদের জোর করে দীক্ষা দানের ঝর্নার কাছে এনে মরণ যন্ত্রণা দিয়ে ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিল তারা। আরাগনে দোমেনিকান ফ্রায়ার ভিনসেন্ত ফেরারের (১৩৫০-১৪১৯) ধর্মপ্রচারণা নিয়মিতভাবেই অ্যান্টি-সেমিটিক দাঙ্গা উস্কে দিত। ফেরার র‍্যাবাই ও ক্রিশ্চানদের ভেতর বিভিন্ন বিতর্কেরও আয়োজন করতেন, ইহুদি ধর্মকে খাট করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। কোনও কোনও ইহুদি নির্যাতন এড়াতে স্বেচ্ছায় ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। সরকারীভাবে তারা *কনভার্সোস* (কনভার্টস) নামে পরিচিত ছিল, যদিও ক্রিশ্চানরা তাদের মারিনোস ('শুয়োর') বলে ডাকত, গালির ভাষা হলেও ধর্মান্তরিতদের কেউ কেউ একে অহঙ্কারের তকমা হিসাবে ধারণ করেছিল। র‍্যাবাইগণ ধর্মান্তরের ব্যাপারে ইহুদিদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম দিকে 'নিউ ক্রিশ্চানরা'–*কনভার্সোসদের* যেনামে ডাকা হত–সম্পদশালী ও সফল হয়ে উঠেছিল। উচ্চপদস্থ যাজকে পরিণত হয়েছিলেন কেউ কেউ, অন্যরা সেরা পরিবারে বিয়ে করে, আবার অনেকেই ব্যবসাবাণিজ্যে লক্ষণীয় সাফল্য লাভ করে। 'পুরোনো ক্রিশ্চান'রা ইহুদিবাদী ক্রিশ্চানদের সমাজের উপরের দিকে তীব্র অসন্তোষের চোখে দেখায় এতে এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়। ১৪৪৯ ও ১৪৭৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মারানোদের বিরুদ্ধে ঘনঘন দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে, তাদের হত্যা করা হয়েছে, সম্পদের বিনাশ সাধন করা হয়েছে কিংবা শহর ছাড়া করা হয়েছে।[৫]

এই ধরনের ঘটনাপ্রবাহে সতর্ক হয়ে ওঠেন ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা। ইহুদিদের ধর্মান্তরকরণ তাদের ঐক্যবদ্ধ রাজ্যকে কাছাকাছি আনার বদলে বরং নতুন করে বিভাজনের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। 'নতুন ক্রিশ্চানদের' কারও কারও আবার তাদের পুরোনো ধর্মবিশ্বাসে ফিরে গোপনে ইহুদি মতে জীবনযাপন করার সংবাদে অসন্তুষ্ট বোধ করেছেন ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা। বলা হয়ে থাকে, তাঁরা অন্য *কনভার্সোদের* আবার পুরোনো ইহুদি বলয়ে ফিরিয়ে নিতে প্রলুব্ধ করতে একটা গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই গোপন ইহুদিদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ইনকুইজিটরদের, শুয়োরের মাংস খেতে অস্বীকৃতি বা শনিবারে কাজে যাবার অস্বীকৃতির মতো কর্মকাণ্ড থেকে যাদের শনাক্ত করা সম্ভব। সন্দেহভাজনরা নিজেদের অবিশ্বাস স্বীকার ও অন্যান্য গোপন 'জুদাইযার'দের সম্পর্কে খবর না দেওয়া পর্যন্ত তাদের উপর নির্যাতন চালানো হত। এর ফলে ইনকুইজিশনের প্রথম

AMARBOI.COM

বার বছর সময়কালে আনুমানিক ১৩,০০০ *কনভার্সো* নিহত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিহত, বন্দি বা যাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তাদের অনেকেই ছিল বিশ্বস্ত ক্যাথলিক, তাদের মোটেই কোনওরকম ইহুদি প্রবণতা ছিল না। এই অভিজ্ঞতা বহু *কনভার্সোকে* তাদের নতুন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তিক্ত ও সংশয়বাদী করে তোলে, এবং সেটা অস্বাভাবিক নয় মোটেই।[৬]

১৪৯২ সালে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা গ্রানাদা অধিকার করার সময় ওই নগর-রাষ্ট্রে একটি নতুন ও উল্লেখযোগ্য ইহুদি সম্প্রদায়কে পেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা ভেবেছিলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, ইহুদি সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে এই দুই রাজণ্য এডিক্ট অভ এক্সপালশনে স্বাক্ষর দেন। স্প্যানিশ ইহুদি সম্প্রদায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আনুমানিক ৭০,০০০ ইহুদি ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করে ইনকুইজিশনে আক্রান্ত হতে রয়ে যায়; অবশিষ্ট ১৫০,০০০ ইহুদি, আমরা যেমন দেখেছি, চলে যায় নির্বাসনে। স্পেনের ইহুদি সম্প্রদায়ের বিনাশ জেরুজালেমে ৭০ সিই'র মন্দির ধ্বংসের পর জাতির উপরে নেমে আসা সবচেয়ে বিরাট বিপর্যয় হিসাবে বিশ্বজুড়ে শোকের সাথে প্রত্যক্ষ করা হয়। ইহুদিরা সেই সময় তাদের দেশ হারিয়ে প্যালেস্তাইনের বাইরে সম্মিলিতভাবে ডায়াসপোরা নামে পরিচিত বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায়ে বাস করতে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেই থেকে ইহুদি জীবনে নির্বাসন এক বেদনাদায়ক লাইটমোটিফ হয়ে ছিল। ১৪৯২ সালে স্পেন থেকে বিতাড়নের ঘটনা ঘটেছিল ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে একের পর এক ইহুদিদের উৎখাতের ঘটনা ঘটার এক শতাব্দীর পর। ভিয়েনা ও লিনয থেকে ১৪২১ সালে উৎখাত করা হয় তাদের, কোলন থেকে ১৪২৪ সালে; অসবার্গ থেকে ১৪৩৯ সালে, ১৪৪২ সালে বাভারিয়া থেকে ও রাজধানী শহর মোরাভিয়া থেকে ১৪৫৪ সালে। পেরুগিয়া (১৪৮৫), ভিসেনযা (১৪৮৬), পারমা (৪৮৮), মিলান ও লুক্কা (১৪৮৯) ও ১৪৯৪ সালে তাসকানির মতো প্রধান প্রধান শহর থেকে ইহুদিদের বিতাড়ন করা হয়েছিল। আস্তে আস্তে পোল্যান্ডে পা রাখার মতো একটা শক্ত জায়গা প্রতিষ্ঠা করছে ভেবে পুবে ভেসে যেতে থাকে ইহুদিরা।[৭] নির্বাসনকে এই সময় ইহুদি জীবনের অপরিহার্য অসুখ বলে মনে হচ্ছিল।

নিশ্চিতভাবেই উৎখাতের পর অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তরে বিভিন্ন আফ্রিকান ও বালকান প্রদেশে আশ্রয় নেওয়া স্প্যানিশ ইহুদিদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এটা। মুসলিম সমাজের সাথে চলতে অভ্যস্ত ছিল তারা, কিন্তু স্পেনের—বা সেফরাদ, ওরা যেনামে ডাকত—পরাজয় এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। এইসব সেফারদিক ইহুদিরা মনে করেছিল যে খোদ তারা ও বাকি সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে।[৮] নির্বাসন যেমন আধ্যাত্মিক তেমনি ভৌত স্থানচ্যুতিও বটে। নির্বাসিতদের জগৎ

AMARBOI.COM

সম্পূর্ণ অজানা এবং সেকারণে অর্থহীন। সমস্ত স্বাভাবিক সমর্থন ছিনিয়ে নেওয়া সহিংস উদ্বাস্তু হওয়ার ঘটনা আমাদের জগৎ ভেঙে দেয়, আমাদের পরিচয়ের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিতে সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলো থেকে আমাদের চিরকালের জন্যে ছিন্ন করে ও স্থায়ীভাবে এক অচেনা পরিবেশে ছুঁড়ে দেয়, যাতে করে আমাদের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে খোদ অস্তিত্বই বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে। নির্বাসন মানুষের নিষ্ঠুরতার সাথে সম্পর্কিত হলেও একজন ন্যায়পরায়ণ ও দয়াময় ঈশ্বরের যে জগৎ নির্মাণের কথা সেখানে অশুভের সমস্যা নিয়ে নানা জরুরি প্রশ্নও উঠে আসে।

সেফারদিক ইহুদিদের অভিজ্ঞতা উৎখাত ও স্থানচ্যুতির চরম ধরন ছিল, পরবর্তীকালে মানুষ আগ্রাসী আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এর স্বাদ পাবে। আমরা দেখব যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এক ভিন্ন পরিবেশে শেকড় বিস্তার করেছিল। সংস্কৃতিকে তা এমন ভীষণভাবে বদলে দিয়েছিল যে অনেক মানুষই নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও দিশাহারা বোধ করেছে। পুরোনো পৃথিবীকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল আর নতুন বিশ্ব এতটাই অচেনা ছিল যে, লোকে তাদের একসময়ের চারপাশের পরিচিত পরিবেশও আর চিনতে পারছিল না। নিজেদের জীবনের কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না। সেফারদিকদের মতো অনেকের মনেই এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেঁথে গিয়েছিল যে, তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। এই বিভ্রান্তি ও বেদনার ভেতর অনেকেই যেনও কোনও স্প্যানিশ নির্বাসিতের মতোই আচরণ করেছে। ধর্মের শরণাপন্ন হয়েছে তারা। কিন্তু তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে যাওয়ায় তাদের প্রবলভাবে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভাষা দেওয়ার জন্যে ধর্মবিশ্বাসকে নতুনভাবে বিকশিত করতে হয়েছিল।

কিন্তু এর জন্যে সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে নির্বাসিত ইহুদিরা জানতে পারে, প্রচলিত ইহুদি ধর্মমত তাদের জন্যে কিছুই করেনি। বিপর্যয়কে নজীরবিহীন মনে হয়েছে। তারা আবিষ্কার করে যে, পুরোনো ধার্মিকতা আর কাজে আসছে না। কেউ কেউ মেসিয়ানিজমের আশ্রয় নিয়েছে। শত শত বছর ধরে একজন মেসায়াহর অপেক্ষা করে আসছিল ইহুদিরা: রাজা ডেভিডের বংশে একজন মনোনীত রাজা, যিনি তাদের দীর্ঘ নির্বাসনের অবসান ঘটাবেন, আবার প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাদের। ইহুদিদের কিছু কিছু ঐতিহ্যে মেসায়াহর আবির্ভাবের ঠিক আগের একটা পর্যায়ে উত্তাল এক পর্বের উল্লেখ ছিল। বালকানে আশ্রয় নেওয়া কোনও কোনও সেফারদিক নির্বাসিতের কাছে মনে হয়েছে যে, ওদের উপর ও ইউরোপে তাদের আরও অসংখ্য স্বজাতির উপর নেমে আসা এই ভোগান্তি ও নিপীড়ন কেবল একটা জিনিসই তুলে ধরতে

পারে: এটা নিশ্চয়ই পয়গম্বর ও সাধুদের মুখে উচ্চারিত সেই বিচারের কাল, একে তারা 'মেসায়াহর প্রসব বেদনা' আখ্যায়িত করেছে, কারণ এই যন্ত্রণাদায়ক মুক্তির ভেতর দিয়েই আবির্ভাব ঘটবে নতুন জীবনের।[৯] অন্য যারা আধুনিকতার আগমনে তাদের জগৎ ধ্বংস হয়ে গেছে মনে করেছিল, তারাও মিলেনিয়াল আশার বিকাশ ঘটাবে। কিন্তু মেসিয়ানিজম সমস্যা-সঙ্কুল, কারণ এপর্যন্ত একজন অত্যাসন্ন ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের আশা পোষণ করা প্রতিটি মেসিয়ানিক আন্দোলনই হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে। সেফারদিক ইহুদিরা আরও সন্তোষজনক সমাধান বের করে এই টানাপোড়েন এড়িয়ে গেছে। এক নতুন *মিথোস* গড়ে তোলে তারা।

সেফারদিকদের একটা দল বালকান্স থেকে প্যালেস্তাইনে পাড়ি জমিয়েছিল। এখানে গালিলির সেফেদে বসতি গড়ে তারা। কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, মেসায়াহর আবির্ভাব ঘটার সময় গালিলিতেই নিজেকে প্রকাশ করবেন তিনি। সবার আগে তাঁকে স্বাগত জানাতে সেখানে হাজির থাকতে চেয়েছিল স্পেনিয় নির্বাসিতরা।[১০] তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, একজন সাধুসুলভ শীর্ণ অ্যাশকেনাযিয় ইহুদি ইসাক লুরিয়ার (১৫৩৪-৭৩) মাঝে তাঁকে পেয়েছে। সেফেদে বসতি গেড়েছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম নতুন এই মিথ উল্লেখ করেন। এভাবে তিনি এক নতুন ধরনের কাব্বালাহর প্রতিষ্ঠা করেন যা এখনও তাঁর নাম ধারণ করে আছে। আমরা আধুনিকরা বলব যে, খোদ লুরিয়াই এই মিথ সৃষ্টি করেছিলেন, মানুষের অবচেতনে আকাঙ্ক্ষা ও ভীতির সাথে যারপরনাই নিবিড়ভাবে অভ্যস্ত থাকায় এমন একটি কাল্পনিক কাহিনী তৈরি করতে সক্ষম হয়ে উঠেছিলেন তিনি যা কেবল সেফেদের নির্বাসিতদের মাঝেই নয় বরং গোটা পৃথিবীর ইহুদিদের মাঝে স্বস্তি ও আশার সঞ্চার করতে পেরেছিল। কিন্তু আমাদের এমন কথা বলার কারণ, মূলত আমরা যৌক্তিক ভিত্তিতে কথা বলে থাকি। ফলে প্রাক-আধুনিক পৌরাণিক বিশ্বদৃষ্টিতে প্রবেশ কঠিন আবিষ্কার করি। লুরিয়ার শিষ্যরা তিনি সৃষ্টির এই মিথ 'তৈরি করেছেন' মনে করেনি, বরং তারা মনে করেছে মিথটি নিজেই তাঁর মাঝে নিজেকে প্রচার করেছে। লুরিয়ানিক কাব্বালাহর আচার ও অনুশীলনে অভ্যস্ত নয় এমন কোনও বহিরাগতের কাছে এই সৃষ্টি-কাহিনী আজগুবী *ঠেকে*। তার উপর এই কাহিনীর সাথে বুক অভ জেনেসিসের সৃষ্টি কাহিনীর কোনওই মিল নেই; কিন্তু একজন কাব্বালিস্ট সেফেদের কাছে—লুরিয়া নির্দেশিত আচার ও ধ্যানমূলক অনুশীলনে মগ্ন, কিন্তু তারপরও নির্বাসনের পুরো এক প্রজন্ম পরেও সেই ঘটনার ধাক্কায় দিশাহারা—*মিথোস* নিখুঁত অর্থ প্রকাশ করেছে। এটা এমন এক সত্যকে তুলে ধরেছে বা 'উন্মুক্ত' করেছে যা আগে থেকেই স্পষ্ট ছিল বটে কিন্তু প্রাক-আধুনিক কালের ইহুদিদের অবস্থার সাথে এমন জোরের সাথে সাড়া দিয়েছে যে নিমেষে

AMARBOI.COM

কর্তৃত্ব লাভ করেছে। তাদের অন্ধকার জগৎকে আলোকিত করে তুলেছে এটা ও জীবনকে কেবল সহনীয় নয়, আনন্দময়ও করে তুলেছে। লুরিয়া সৃষ্টি মিথের মুখোমুখি হওয়ামাত্র একজন আধুনিক মানুষ জানতে চাইবে, 'সত্যিই কি এমনটা ঘটেছিল?' ঘটনাপ্রবাহকে এতটাই অসম্ভব মনে হয় এবং যার প্রমাণ করা যাবে না বলে একে আমরা প্রমাণের দিক থেকে মিথ্যা হিসাবে নাকচ করে দেব। কিন্তু তার কারণ আমরা কেবল সত্যির যৌক্তিক ভাষ্যকে গ্রহণ করে থাকি বলে, আরও কোনও ধরন থাকতে পারার বোধ হারিয়ে ফেলায়। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলেছি, একে আমরা অসাধারণ সব ঘটনার পর্যায়ক্রমিক সংঘটন হিসাবে দেখি। কিন্তু প্রাক-আধুনিক বিশ্বে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাকে একক হিসাবে নয়, চিরন্তন বিধানের নজীর, সময়হীন স্থির বাস্তবতার প্রকাশ হিসাবে দেখা হত। কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা বারবার সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল, কেননা সকল পার্থিব ঘটনাপ্রবাহই অস্তিত্বের মৌল বিধান প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বাইবেলে একটি নদী অলৌকিকভাবে অন্তত দুটি ঘটনায় দুই ভাগ হয়ে ইসরায়েলিদের এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছে: ইসরায়েলের সন্তানগণ প্রায়শঃই মিশরে 'যাতায়াত করে' এবং তারপর প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরতি যাত্রা শুরু করে। বাইবেলের অন্যতম পৌনঃপৌনিক ঘটনা নির্বাসন। স্পেনিয় বিপর্যয়ের পর যা গোটা ইহুদি অস্তিত্বকে রঞ্জিত করেছে বলে মনে হয়েছে এবং অস্তিত্বের একেবারে মূল ভিত্তিতে ভারসাম্যহীনতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। লুরিয়ানিক কাব্বালাহ সকল মিথোলজির বেলায় অবশ্যম্ভাবী এইসব মৌল বিধানের অন্যতম মনে হওয়া নির্বাসনকে পরখ করে এর পূর্ণ তাৎপর্য উন্মোচনের জন্যে সূচনায় প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করেছে।

লুরিয়া'র মিথে এক স্বেচ্ছানির্বাসনের ভেতর দিয়ে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটছে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী হলে কীভাবে বিশ্ব অস্তিত্বমান থাকতে পারে, এই জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে এর শুরু। জবাব হচ্ছে যিমযুম ('প্রত্যাহার')-এর মতবাদ: অসীম ও দুর্জ্ঞেয় গডহেড, কাব্বালিস্টরা যাকে বলে এন সফ ('অন্তহীন'), বিশ্বকে স্থান করে দিতে, যেমন বলা হয়েছে, নিজের মাঝে একটা এলাকা উন্মুক্ত করার জন্যে নিজের মাঝে নিজেই সঙ্কুচিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং, সৃষ্টির সূচনা ঘটেছিল ঐশী একটা ঘটনার ভেতর দিয়ে: সৃষ্টির ভেতর ও তাদের সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করার আবেগময় ইচ্ছা থেকে এন সফ নিজেরই একটা অংশের উপর নির্বাসন চাপিয়ে দিয়েছিলেন। জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত শৃঙ্খলাপূর্ণ, শান্তিময় সৃষ্টির বদলে এটা ছিল আদিম বিস্ফোরণ, বিপর্যয় ও মিথ্যা সূচনা, সেফারদিক নির্বাসিতদের কাছে যাকে তাদের যাপিত বিশ্বের অনেক বেশি সঠিক মূল্যায়ন মনে হয়েছে। লুরিয়

প্রক্রিয়ার গোড়ার দিকের পর্যায়ে এন সফ যিমযুমের মাধ্যমে সৃষ্ট শূন্যতাকে ঐশী আলো দিয়ে পূরণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু আলো বয়ে নিয়ে যাবার কথা ছিল যেসব 'পাত্র' বা 'নল'-এর, চাপে সেগুলো ভেঙে যায়। ঐশী আলোর স্ফুলিঙ্গসমূহ ঈশ্বর নয়, এমন সব বস্তুর মহাগহ্বরে পতিত হয়। 'পাত্রের ভাঙনের' পর স্ফুলিঙ্গের কিছু অংশ গডহেডের কাছে ফিরে যায়, কিন্তু অবশিষ্টগুলো অশুভ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ঈশ্বরহীন বলয়ে বন্দি হয়ে থাকে, এন সফ যাকে যিমযুম প্রক্রিয়ার সময় নিজের ভেতর থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। এই বিপর্যয়ের পর সৃষ্টিকর্ম অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে, সবকিছু উল্টাপাল্টা জায়গায় পড়ে যায়। আদমকে সৃষ্টি করার সময় তিনি এই পরিস্থিতি শুধরে নিতে পারতেন, তাহলে প্রথম সাব্বাতেই ঐশী নির্বাসনের অবসান ঘটতে পারত। কিন্তু আদম পাপ করলেন, তারপর থেকেই ঐশী স্ফুলিঙ্গসমূহ বস্তুগত বিষয়ে বন্দি হয়ে পড়ে; আর পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্যে আমরা যে সত্তার সবচেয়ে কাছাকাছি যেতে পারি, সেই শেকিনাহ্ গডহেডের সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এক চিরস্থায়ী নির্বাসনে জগৎময় ঘুরে বেড়াতে থাকেন।[১১]

এটা কল্পগল্প, কিন্তু সেফেদের কাব্বালিস্টদের যদি জিজ্ঞেস করা হত যে আদৌ ব্যাপারটা এভাবেই ঘটেছিল বলে তারা বিশ্বাস করে কিনা, প্রশ্নটিকেই অপর্যাপ্ত মনে করত তারা। মিথের বর্ণিত আদিম ঘটনাটি সুদূর অতীতে কোনও এক সময় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনামাত্র নয়। এমন একটা ঘটনা বর্ণনা করার মতো কোনও ধারণা বা শব্দ আমাদের জানা নেই, কারণ আমাদের যৌক্তিক সমাজ সময়কে কঠোরভাবে পর্যায়ক্রমিক হিসাবে দেখে। প্রাচীন গ্রিসের এলিউসিসের উপাসকদের যদি জিজ্ঞেস করা হত যে, প্লেটো সত্যিই পারসেফোনকে পাতালে নিয়ে বন্দি করে রাখায় তাঁর মা দিমিতার মেয়ের শোকে দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়িয়েছেন কিনা, তাহলে এমনি ধারার প্রশ্নে তারা সন্ত্রস্ত বিস্মিত হয়ে যেত। তারা কেমন করে নিশ্চিত হবে যে পারসেফোনের মিথে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে পৃথিবীতে ফিরে গিয়েছিলেন কিনা? কারণ এই *মিথোসের* তুলে ধরা জীবনের মৌলিক ছন্দ আসলে ঘটছিল। জমিনের ফসল তোলা হয়েছে, ভূগর্ভস্থ পাত্রে রাখা হয়েছে ভুট্টার বীজ ঠিক সময়ে বপন করা হয়েছে এবং শেষে শস্য বেড়ে উঠেছে।[১২] *মিথোস* ও ফসল তোলার ঘটনা, উভয়ই বিশ্ব সম্পর্কে মৌল এবং বিশ্বজনীন একটা কিছুর দিকে ইঙ্গিত দেয়, অনেকটা ইংরেজি শব্দ 'নৌকা' আর ফরাসি শব্দ '*বাতেউ*'র মতো; দুটোই এমন এক বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে যা উভয় পরিভাষার অতীত ও স্বাধীন। সেফারদিক ইহুদিরা সম্ভবত একই ধরনের জবাব দিত। নির্বাসন ছিল অস্তিত্বের মৌল বিধি। আপনি যেদিকে তাকাতেন, ইহুদিরা ছিল উন্মূল বিদেশি।

AMARBOI.COM

এমনকি জেন্টাইলরাও ক্ষতি, হতাশা ও জগতে তারা ঠিক অভ্যস্ত নয়, এমন এক ধরনের অভিজ্ঞতার লাভ করেছে–প্রথম মানুষ জাতির আদিম স্বর্গ হতে নির্বাসিত হওয়ার বিশ্বজনীন মিথে যেমন প্রত্যক্ষ করা গেছে। লুরিয়ার জটিল সৃষ্টি কাহিনী এটা তুলে ধরেছে ও সম্পূর্ণ নতুনভাবে একে স্পষ্ট করে তুলেছে। শেকিনাহর নির্বাসন ও স্থানচ্যুত মানুষ হিসাবে তাদের নিজস্ব জীবন ভিন্ন দুটি বাস্তবতা ছিল না, বরং ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। যিমযুম দেখিয়েছে যে সত্তার একেবারে ভিত্তি মূলেই নির্বাসন খোদাই হয়ে আছে।

লুরিয়া লেখক ছিলেন না, জীবদ্দশায় খুব সামান্য সংখ্যক লোকের কাছেই তাঁর শিক্ষা অবহিত ছিল।[১৩] কিন্তু শিষ্যরা উত্তরপুরুষের জন্যে তাঁর রচনাবলী রক্ষা করেছেন ও অন্যরা তা ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ১৬৫০ সাল নাগাদ লুরিয় কাব্বালাহ্ এক গণআন্দোলনে পরিণত হয়; সেই সময় এটাই ছিল ইহুদিদের মাঝে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভকারী একমাত্র আদর্শিক ব্যবস্থা।[১৪] যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিকভাবে একে প্রমাণ করা সম্ভব ছিল বলে এমনটা ঘটেনি, কেননা নিশ্চিতভাবেই সেটা সম্ভব ছিল না। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই জেনেসিসের সাথে এর বিরোধ ছিল স্পষ্ট। কিন্তু আমরা যেমন দেখব, ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক পাঠ একটা আধুনিক ধারণা, পৌরাণিক সচেতনতার উপর যৌক্তিক মনের জয়লাভের ফলেই এর বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক কালের আগের ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমরা সবাই তাদের পবিত্র টেক্সটের দারুণ রকম রূপক, প্রতীকী ও নিগূঢ় ব্যাখ্যার রসআস্বাদন করত। ঈশ্বরের বাণী অসীম হওয়ায় তার নানা রকম অর্থ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা ছিল। সুতরাং, বাইবেলের সরলার্থ হতে লুরিয়ার সরে যাওয়া দেখে ইহুদিরা বিচলিত বোধ করেনি, যেমনটা অনেক আধুনিক ব্যক্তি করবে। তাঁর মিথ কর্তৃত্বের সাথে তাদের প্রতি সাড়া দিয়েছে, কারণ এটা তাদের জীবনকে ব্যাখ্যা করেছে, অর্থের যোগান দিয়েছে তাদের। অস্তিত্ব লাভ করতে চলা আধুনিক জগৎ হতে উৎখাত হয়ে ইহুদিদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল অস্তিত্বের মৌল বিধানের সাথে মানানসই। এমনকি খোদ ঈশ্বর নির্বাসনে কষ্ট পেয়েছেন, একেবারে সূচনা থেকেই সৃষ্টির সমস্ত কিছুই স্থানচ্যুত হয়েছিল, ঐশী স্ফুলিঙ্গ বস্তুতে বন্দি হয়েছে আর জীবনের এক সর্বব্যাপী সত্যি অশুভের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে শুভ। এছাড়া, ইহুদিরা প্রত্যাখ্যাত ও অস্পৃশ্য ছিল না, বরং নিস্তার প্রক্রিয়ায় তারাই কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালনকারী। মোজেসের বিধান তোরাহর বিভিন্ন নির্দেশনার সযত্ন পালন ও সেফেদে বিকশিত বিভিন্ন আচার সম্পাদন এই বিশ্বজনীন নির্বাসনের অবসান ঘটাতে পারে। ইহুদিরা এভাবে গডহেডের সাথে শেকিনাহর 'পুনঃস্থাপন' *(তিক্কুন)*, ইহুদি জাতিকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরিয়ে নেওয়া

ও বিশ্বের বাকি অংশকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করার কাজে সাহায্য করতে পারে।[১৫]

ইহুদিদের কাছে মিথটি গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। অনেকেই আবিষ্কার করেছিল যে, হলোকাস্টের ট্র্যাজিডির পর তারা ঈশ্বরকে কেবল যিমযুমের কষ্টসওয়া অক্ষম ঐশী সত্তা হিসাবে দেখছিল, যিনি আর সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে নেই।[১৬] বস্তুতে আটকা পড়া ঐশী স্ফুলিঙ্গের ইমেজারি ও *তিক্কুনের* পুনঃস্থাপনের মিশন এখনও আধুনিক মৌলবাদী ইহুদি আন্দোলনসমূহকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। সকল সত্যি মিথের মতো লুরিয় কাব্বালাহ ছিল এক উন্মোচন, ইহুদিদের দেখিয়ে দিয়েছিল তাদের জীবন আসলে কী, কী তার অর্থ। মিথটি এর নিজস্ব সত্যি ধারণ করে। এবং কোনও গভীর স্তরে স্বপ্রকাশিত। এটা যেমন যৌক্তিক প্রমাণ গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি এর তার কোনও প্রয়োজনও নেই। আজকের দিনে আমাদের উচিত হবে লুরিয় কাব্বালাহকে প্রতীক বা উপমা হিসাবে আখ্যায়িত করা, কিন্তু সেটাও একে যৌক্তিকভাবে বন্দি করারই শামিল হবে। মূল গ্রিকে 'প্রতীক' শব্দটির মানে ছিল দুটি বস্তুকে এক করা যাতে তারা অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই পশ্চিমের লোকজন কোনও আচার বা আইকন 'কেবল প্রতীকমাত্র' বলতে শুরু করল, তখনই এমনি বিচ্ছেদের উপর গুরুত্ব আরোপকারী আধুনিক চেতনা আবির্ভূত হয়েছিল।

প্রথাগত ধর্মে মিথ কাল্ট হতে অবিচ্ছেদ্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ধ্যানমূলক অনুশীলনের ভেতর দিয়ে তা উপাসকদের ইহজাগতিক জীবনে চিরন্তন বাস্তবতাকে হাজির করে। এর প্রতীকীবাদের শক্তি সত্ত্বেও লুরিয়ানিক কাব্বালাহ নির্বাসিতের মাঝে এক ধরনের দুর্জ্ঞেয়র বোধ জাগিয়ে তোলার মতো চমৎকার আচারের মাধ্যমে প্রকাশ করা না হলে ইহুদি অবস্থার প্রতি এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত না। সাফেদে কাব্বালিস্টরা লুরিয়ার ধর্মতত্ত্বকে নতুন করে নির্মাণ করতে বিশেষ ধরনের আচার উদ্ভাবন করেছিল। নিজেদের শেখিনাহর সাথে পরিচিত করে তুলতে তারা রাত জাগত, তাঁকে তারা বিশ্বময় দুর্গতের মতো ঘুর বেড়ানো ঐশী উৎসের আকাঙ্ক্ষাকারী নারী হিসাবে কল্পনা করত। মাঝ রাতে ঘুম থেকে জেগে পায়ের জুতো খুলে কান্নাকাটি করত ইহুদিরা, ধুলোয় মুখ ঘঁষত। এইসব আচরিক কর্মকাণ্ড নিজস্ব শোক ও পরিত্যাগের বোধ তুলে ধরার কাজে সহায়তা করেছে তাদের ও ঐশী সত্তার সহ্য করা ক্ষতির সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করতে সাহায্য করেছে। সারারাত জেগে শুয়ে থাকত তারা, প্রেমিকের মতো ঈশ্বরকে ডাকত, যা নির্বাসিতের ভোগান্তির মূল মানুষের দুর্গতির মূলে অবস্থিত বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় বিলাপ করে চলত। প্রায়শ্চিত্তের অনুশীলনও–উপবাস, বেত্রাঘাত, বরফে গড়াগড়ি খাওয়া–*তিক্কুনের* অংশ হিসাবে পালন করা হত। পল্লী এলাকায় দীর্ঘ পথ হাঁটতে বের হত

কাব্বালিস্টরা, শেকিনাহর মতো ঘুরে বেড়াত, নিজেদের উন্মূল বোধের অভিনয় করত। ইহুদি বিধানে জোর দেওয়া হয়েছে যে, সমবেতভাবে অন্তত দশ জন পুরুষ মিলে পালন করলে প্রার্থনা গভীরতম শক্তি ও অর্থ পেতে পারে। কিন্তু বিশ্বে তাদের বিচ্ছিন্নতা ও নাজুক দশার প্রকৃত বোধ পরিপূর্ণভাব উপলব্ধি করার জন্যে সাফেদে ইহুদিদের বিচ্ছিন্নভাবে প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই একাকী প্রার্থনা ইহুদি ও সমাজের বাকি অংশের মাঝে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি করে তাকে ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার জন্যে তৈরি করে দিয়েছে এবং ক্রমাগত ইহুদি জনগণের অস্তিত্বকে হুমকি দিয়ে চলা এক বিশ্বে বিপজ্জনক বিচ্ছিন্নতাকে নতুন করে উপলব্ধি করার বেলায় তাদের সাহায্য করেছে।[১৭]

কিন্তু লুরিয়া কোনও রকম উন্মত্ততাকে আশ্রয় না দেওয়ার ব্যাপারে অটল ছিলেন। অবশ্যই যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু পরিমাণ আনন্দ লাভ না করতে পারছে ততক্ষণ কাব্বালিস্টদের শৃঙ্খলিত, পদ্ধতিগত উপায়ে বিষাদের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। মাঝরাতের আচার সবসময়ই ভোরে শেকিনাহ ও এন সফের চূড়ান্ত পুনর্মিলনের উপর ধ্যানের ভেতর দিয়ে শেষ হত, যার অর্থ স্বর্গের সাথে মানুষের বিচ্ছিন্নতার অবসান। কাব্বালিস্টকে তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ঐশী সত্তার পার্থিব মন্দির বলে বিশ্বাস করার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[১৮] সকল বিশ্বধর্মই জোর দিয়ে বলে যে বাস্তবিক সহানুভূতির বোধ না জাগালে কোনও আধ্যাত্মিকতাই বৈধ নয়। লুরিয়ার কাব্বালাহ এই দর্শনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। অন্যদের আঘাত দেওয়া ভুল, যৌন হয়রানি, বিরূপ গুজব, কারও সতীর্থকে অসম্মান করা ও বাবা-মাকে অমর্যাদা করার ক্ষেত্রে কঠিন সাজার ব্যবস্থা ছিল।[১৯]

সবশেষে অধিকাংশ বিশ্বধর্ম বিকশিত অতীন্দ্রিয় অনুশীলনের দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল কাব্বালিস্টদের। দক্ষ কাব্বালিস্টকে তা মনের গভীরতর অঞ্চলে প্রবেশাধিকার লাভ ও স্বজ্ঞামূলক অন্তর্দৃষ্টি লাভে সাহায্য করেছে। সাফেদে ঈশ্বরের নাম গড়ে তোলা বিভিন্ন হরফের দক্ষ, বিস্তারিত বিনির্মাণের উপর ধ্যান কেন্দ্রিভূত ছিল। এই 'মনোসংযোগ' *(কাওয়ানোত)* কাব্বালিস্টকে নিজের ভেতর ঐশী সত্তার একটা আভাস লাভে সক্ষম করে তুলত। নেতৃস্থানীয় কাব্বালিস্টরা বিশ্বাস করতেন, সে একজন পয়গম্বরে পরিণত হবে, ঠিক লুরিয়ার মতোই এক নতুন *মিথোস* উচ্চারণে সক্ষম হয়ে উঠবে এবং এপর্যন্ত আলোর মুখ না দেখা সত্যির উন্মোচন ঘটাবে। এইসব *কাওয়ানোত* কাব্বালিস্টের জন্যে যারপরনাই আনন্দ বয়ে আনত। লুরিয়ার অন্যতম শিষ্য হাইম ভিতাল (১৫৪২-১৬২০) বলেছেন পরমানন্দের অবস্থায় আনন্দ ও বিস্ময়ের বোধ নিয়ে থরথর করে কেঁপেছেন তিনি। কাব্বালিস্টরা

বিভিন্ন দৃশ্য দেখেছে ও আনন্দময় দুর্জ্ঞেয়র অনুভূতি লাভ করেছে যা নিষ্ঠুর ও অচেনা মনে হওয়া একটা সময়ে বিশ্বকে বদলে দিয়েছে।[২০]

বাস্তব বলয়ে যৌক্তিক চিন্তাভাবনা বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে, কিন্তু তা আমাদের বিষাদ প্রশমিত করতে পারে না। স্পেনিয় বিপর্যয়ের পর কাব্বালিস্টরা আবিষ্কার করেছিল যে আল-আন্দালুসের ইহুদিদের ভেতর জনপ্রিয় দর্শনের যৌক্তিক অনুশীলন তাদের বেদনার প্রশমন ঘটাতে পারছে না।[২১] জীবনকে মনে হয়েছে অর্থহীন; আর জীবনে অর্থ না থাকলে মানুষ হতাশায় ডুবে যেতে পারে। জীবনকে সহনীয় করে তুলতে *মিথোস* ও অতীন্দ্রিয়বাদের শরণাপন্ন হয়েছিল নির্বাসিতরা; এটা তাদের বেদনা, ক্ষতি ও আকাঙ্ক্ষার অবচেতন উৎসের সাথে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম করে তোলে ও এমন এক দৃশ্যের সাথে তাদের জীবনকে বেঁধে দিয়েছিল যা তাদের জন্যে স্বস্তি বয়ে এনেছে।

অবশ্য এটা লক্ষণীয় যে, ইগনাশিয়াস অভ লায়োলার বিপরীতে লুরিয়া ও তাঁর শিষ্যগণ ইহুদিদের রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কোনও বাস্তব পরিকল্পনা নির্মাণ করেননি। কাব্বালিস্টরা ইসরায়েলের ভূমিতে থিতু হয়েছিল, কিন্তু তারা যায়নিস্ট ছিল না। লুরিয়া ইহুদিদের পবিত্র ভূমিতে পাড়ি জমানোর মাধ্যমে নির্বাসনের ইতি টানার তাগিদ দেননি। তিনি তাঁর মিথলজি বা অতীন্দ্রিয় দর্শনকে সক্রিয় কর্মকাণ্ডের নীলনকশা সৃষ্টি করার মতো কোনও আদর্শ গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করেননি। *মিথোসের* কাজ ছিল না এটা, এই ধরনের সমস্ত বাস্তব পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল *লোগোসের* এখতিয়ার—যৌক্তিক আলোচনামূলক চিন্তাভাবনা। লুরিয়া জানতেন, তাঁর মিশন হচ্ছে ইহুদিদের অস্তিত্বমূলক ও আধ্যাত্মিক হতাশা থেকে রক্ষা করা। পরে এইসব মিথকে রাজনীতির বাস্তব বিশ্বে প্রয়োগ করা হলে তার ফল ছিল প্রলয়ঙ্করী, যেমনটা আমরা এই অধ্যায়ে দেখতে পাব।

কাল্ট বিহীন, প্রার্থনা বিহীন ও আচার বিহীন মিথ ও মতবাদের কোনও অর্থ থাকে না। কাব্বালিস্টদের কাছে মিথকে বোধগম্য করে তোলা বিশেষ অনুষ্ঠান ও আচার বিনা লুরিয়ার সৃষ্টি-কাহিনী অর্থহীন একটা গল্পই রয়ে যেত। কেবল কোনও ধরনের ধর্মীয় শাস্ত্রীয় পরিপ্রেক্ষিতেই একটি ধর্মীয় বিশ্বাস অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষ যদি এই ধরনের আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত হয়, তারা তবে বিশ্বাস হারাবে। ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ইবারিয় পেনিনসুলায় থেকে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কিছু সংখ্যক ইহুদির বেলায় ঠিক তাই ঘটেছিল। ধ্যান করে না, আচার অনুষ্ঠান পালন করে না বা আনুষ্ঠানিক লিটার্জিতে অংশ নেয় না, এমনি অনেক আধুনিক মানুষের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটেছে যারা পরে আবিষ্কার করেছে যে ধর্মের মিথগুলো তাদের কাছে কোনও অর্থ বহন করছে না। *কনভার্সোদের* অনেকেই নিজেদের

ক্যাথলিসিজমের সাথে একাত্ম করে নিতে পেরেছিল। কেউ কেউ প্রকৃতপক্ষেই, যেমন সংস্কারক হুয়ান দে ভালদেস (১৫০০-৪১) ও হুয়ান লুইস ভিভে (১৪৯২-১৫৪০)-এর মতো ব্যক্তিরা কাউন্টার রিফর্মেশনের নেতায় পরিণত হয়েছিলেন ও প্রাথমিক কালের আধুনিক সংস্কৃতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন ঠিক যেভাবে কার্ল মার্ক্স, সিগমান্ড ফ্রয়েড, এমিলি দার্কহেইম, আলবার্ট আইনস্টাইন ও লুদভিগ ভিগেইন্তাইনের মতো সেক্যুলারায়িত ইহুদিরা মূলধারার সমাজে একীভূত হওয়ার পর পরবর্তীকালের আধুনিকতায় অবদান রেখেছেন।

এই প্রভাবশালী *কনভার্সোদের* অন্যতম বর্ণাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন তেরেসা অভ আভিলা (১৫১৫-৮২), জন অভ দ্য ক্রসের শিক্ষক ও পরামর্শদাতা এবং ডক্টর অভ চার্চ উপাধি লাভকারী প্রথম নারী। স্পেনে আধ্যাত্মিকতার সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রপথিক ছিলেন তিনি। তিনি বিশেষ করে ভালো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ও প্রায়শঃই অদক্ষ আধ্যাত্মিক নির্দেশকদের হাতে অস্বাস্থ্যকর অতীন্দ্রিয় অনুশীলনের শিকার হওয়া নারীদের ধর্মীয় বিষয়ে যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, হিস্টিরিয়াসুলভ ঘোর, দিব্যদৃষ্টি ও উন্মত্ততার সাথে পবিত্রতার কোনও সম্পর্ক নেই। অতীন্দ্রিয়বাদ চরম দক্ষতা, শৃঙ্খলিত মনোসংযোগ, ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও প্রফুল্ল, বিচক্ষণ শারীরিক অবস্থা দাবি করে এবং তাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ও সতর্কভাবে স্বাভাবিক জীবনে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে। জন অভ দ্য ক্রসের মতো তেরেসা ছিলেন আধুনিকায়নকারী ও মেধাসম্পন্ন অতীন্দ্রিয়বাদী, তবু তিনি ইহুদি ধর্মে থেকে গেলে তাঁর পক্ষে এই গুণটি গড়ে তোলা সম্ভব হত না, কারণ কেবল পুরুষদেরই কাব্বালাহ অনুশীলনের অনুমতি ছিল। তারপরেও কৌতূহলোদ্দীপকভাবে তাঁর আধ্যাত্মিকতা ইহুদিবাদীই রয়ে গিয়েছিল। *দ্য ইন্টেরিয়র ক্যাসল*-এ সাতটি স্বর্গীয় দরবারের ভেতর দিয়ে আত্মার ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর যাত্রাপথের বিবরণ দিয়েছেন তিনি। এই প্রকল্পের সাথে ইহুদি বিশ্বে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দী সিই পর্যন্ত বিকশিত থ্রোন মিস্টিসিজমের লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। নিবেদিতপ্রাণ ও বিশ্বস্ত ক্যাথলিক ছিলেন তেরেসো, কিন্তু তারপরেও ইহুদির কায়দায় প্রার্থনা করতেন, নানদেরও একইভাবে প্রার্থনা করার শিক্ষা দিতেন।

তেরেসার ক্ষেত্রে ইহুদিবাদ ও ক্রিশ্চানিটি সফলভাবে মিশে যেতে পেরেছিল, কিন্তু কম মেধা সম্পন্ন অন্য *কনভার্সোরা* বিরোধ মোকাবিলা করেছে। এমনি একটি ঘটনা হচ্ছে প্রথম গ্র্যান্ড ইনকুইজিটর তোমাস দে তোরকেমাদা (১৪২০-৯৮)-র।[২২] তিনি যেমন উৎসাহ নিয়ে স্পেন থেকে ইহুদিবাদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন সেটা হয়তো অবচেতনভাবে তাঁর নিজের মন থেকেই পুরোনো

AMARBOI.COM

ধর্মবিশ্বাসকে উৎক্ষিপ্ত করার প্রয়াস হয়ে থাকবে। বেশিরভাগ মারানোই নিপীড়নের মুখে ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। মনে হয় তাদের অনেকেই কখনওই পুরোপুরিভাবে নতুন ধর্মবিশ্বাস মেনে নিতে পারেনি। এটা মোটেও তেমন বিস্ময়কর নয়; কেননা দীক্ষা দেওয়ার পর ইনকুইজিটরদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের অধীনে ছিল তারা, তুচ্ছ অভিযোগে যখন তখন আটক হওয়ার ভয়ে ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালানো, কিংবা শেলফিশ খেতে অস্বীকৃতি কারাদণ্ড, নির্যাতন, মৃত্যু কিংবা আর কিছু না হোক সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির মতো ব্যাপারে পর্যবসিত হতে পারত। ফলে অনেকেই ধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলা ক্যাথলিক মতবাদের সাথে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মানিয়ে নিতে না পারেনি তারা। ১৪৯২ সালে স্পেন থেকে ব্যাপক উৎখাতের পর স্পেনে আর ধর্মাচারী ইহুদির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। মারানোরা গোপনে ইহুদি ধর্ম চর্চা করতে চাইলেও ইহুদি বিধান বা অনুশীলন শিক্ষার কোনও উপায় ছিল না তাদের হাতে। এর পরিণামে কোনও ধর্মের প্রতিই সত্যিকারের আনুগত্য ছিল না তাদের। সেক্যুলারিজমের বহু আগেই নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মের প্রতি নির্লিপ্ততা বাকি ইউরোপে মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়। আমরা ইবারিয় পেনিনসুলার মারানো ইহুদিদের ভেতর এইসব আবিশ্যিকভাবে আধুনিক প্রবণতার উদাহরণ দেখতে পাই।

ইসরায়েলি পণ্ডিত ইরমিয়াহু ইয়োভেলের মতে ধর্মের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠাটা মারানোদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল।[23] এমনকি ১৪৯২ সালের ব্যাপক উচ্ছেদের আগেও বিখ্যাত স্প্যানিশ পরিবারের সদস্য পেদ্রো এবং ফার্নান্দো দে লা কাবেল্লেরিয়ার মতো কেউ কেউ নিজেদের স্রেফ রাজনীতি, শিল্পকলা ও সাহিত্যে জড়িয়ে নেন, ধর্মে তাঁদের কোনও রকম আগ্রহ না থাকার আভাস দেন তাঁরা। প্রকৃতপক্ষেই পেদ্রো প্রকাশ্যে ভুয়া ক্রিশ্চান হওয়ার ব্যাপারে গলাবাজি করতেন; তিনি দাবি করতেন ব্যাপারটা তাঁকে পবিত্র আইন ও নিয়মকানুন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ করে দিয়েছে।[24] ১৪৯২ সালের অল্প কিছুদিন আগে আলবারো দে মন্তালবান নামে এক লোককে লেন্টের সময় পনির ও মাংস খাওয়ার অপরাধে ইনকুইজিটরদের সামনে হাজির করা হয়; এভাবে সে কেবল ক্রিশ্চান উপবাসই ভঙ্গ করেনি, বরং ইহুদি বিধানও লঙ্ঘন করেছে, যেখানে মাংস ও দুধ জাতীয় খাবার একসাথে খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্পষ্টই কোনও ধর্মের প্রতিই তার কোনও অঙ্গীকার ছিল না। এই ক্ষেত্রে আলবারো জরিমানা দিয়ে পার পেয়ে যায়। ক্যাথলিসিজমে ঠেলে দেওয়ায় তার আর তেমন একটা উষ্ণ বোধ হওয়ার কারণ ছিল না। গোপনে ইহুদি ধর্মাচার পালনের দায়ে ইনকুইজিশনের

AMARBOI.COM

হাতে নিহত হয়েছিল তার বাবা-মা। ওদের লাশ কবর থেকে তুলে আনার পর হাড়গোড় পোড়ানো হয়; সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।[২৫] ইহুদি ধর্মের সাথে এমনকি ক্ষীণ সম্পর্ক রাখতে ব্যর্থ হয়ে আলবারো ধর্মীয় শূন্যতার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। সত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধ হিসাবে শেষ পর্যন্ত পরকালের মতবাদের ইচ্ছাকৃত ও পৌনঃপৌনিক অস্বীকৃতির অপরাধে ইনকুইজিশনের হাতে কারাবন্দি হয় সে। 'আমাকে এখানেই আরামে থাকতে দাও,' একাধিকবার বলেছিল সে। 'কারণ এর পর আর কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই।'[২৬]

আলবারোর বিশ্বাস বোঝায় যে তার মেয়েজামাই ট্র্যাজিকমিক রোমান্স *লা সেলেস্তিনা*'র রচয়িতা ফার্নান্দো দে রোয়াসও (c. ১৪৬৫–১৫৪১) সন্দেহের আওতায় এসে পড়েছিল। ফলে সম্মানিত ক্রিশ্চানিটির একটা সযত্ন ভাব ধারণ করেছিল সে। কিন্তু ১৪৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর *লা সেলেস্তিনায়* স্থূল বাড়াবাড়ির আড়ালে এক ধরনের ক্ষীণ সেক্যুলারিজমের আভাস দেখতে পাই আমরা। ঈশ্বর বলে কেউ নেই। ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় মূল্যবোধ। কিন্তু ভালোবাসার মরণ ঘটলে বিরান ভূমিতে পরিণত হয় বিশ্ব। নাটকের শেষে প্লেবেরিও মেয়ের আত্মহত্যার জন্যে মাতম করছে, কেবল সেই তাকে জীবনের একটা অর্থ যোগাত। 'হে পৃথিবী, হে পৃথিবী,' উপসংহার টানছে সে, 'যখন তরুণ ছিলাম, ভেবেছিলাম তোমাকে আর তোমার কর্মকাণ্ডকে পরিচালনার কোনও নিয়ম কানুন আছে।' কিন্তু এখন

> তোমাকে ভ্রান্তি, ভীতিকর মরুভূমি, বুনো জানোয়ারের আস্তানা, লোকে কেবল ঘুরে বেড়ায় এমন একটা খেলার মতো লাগছে...পাথুরে প্রান্তর, সাপে ভরা ময়দান, ফুলে ভরা কিন্তু বিরান বাগিচা, উদ্বেগের ফোয়ারা, অশ্রুজলের নদী, কষ্টের সাগর, ব্যর্থ আশা মনে হচ্ছে।[২৭]

পুরোনো ধর্ম পালন করতে না পেরে, ইনকুইজিশনের অত্যাচারে নতুন ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রোয়াস এমন এক হতাশায় ডুবে গিয়েছিল যে নিয়মকানুনের আর কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না সে, পাচ্ছিল না কোনও পরম মূল্যও।

ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা ইহুদিদের আর যাই হোক সংশয়বাদী অবিশ্বাসী হয়ে যাবার ব্যাপারটা চাননি মোটেই। কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ কাহিনী জুড়ে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা যে ধরনের নিপীড়ন আরোপ করেছিলেন সেটা নেতিবাচক ফল দিয়েছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে তৈরি হওয়ার আগেই চলমান বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করার প্রয়াস এমন সব ধারণা বা চর্চার পথ খুলে দেয় যা কিনা খোদ

AMARBOI.COM

নিপীড়নকারী কর্তৃপক্ষের চোখে দারুণভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে দাঁড়ায়। ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা ছিলেন আগ্রাসী আধুনিকায়নবাদী, সব ধরনের ভিন্ন মত দমন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁদের ইনকুইজিশনাল পদ্ধতি গোপন ইহুদি দল গঠন ও প্রথমবারের মতো ইউরোপে সেক্যুলারিজম ও নাস্তিক্যবাদের ঘোষণার দিকে চালিত করেছে। পরে কিছু সংখ্যক ক্রিশ্চানও এই ধরনের ধর্মীয় স্বেচ্ছাচারে এতটাই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল যে তারাও প্রত্যাদিষ্ট ধর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সেক্যুলারিজমও সমান হিংস্র হতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে প্রগতির নামে সেক্যুলার রীতিনীতি আরোপ উগ্র মৌলবাদের উত্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করেছে, অনেক সময় সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর পক্ষে যা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৪৯২ সালে খৃস্টধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো প্রায় ৮০,০০০ ইহুদিকে পর্তুগালে আশ্রয় দিয়েছিলেন রাজা দ্বিতীয় হোয়াও। এইসব পর্তুগিজ ইহুদি এবং তাদের উত্তরপুরুষদের ভেতরই নাস্তিক্যবাদের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ নাটকীয় নজীর দেখতে পাই। এই ইহুদিদের কেউ কেউ মরিয়াভাবে তাদের ইহুদি ধর্মকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পর্যাপ্ত কাল্ট না থাকায় সেটা অসম্ভব বা কঠিন আবিষ্কার করেছে। ১৪৯২ সালে পর্তুগালে পালিয়ে যাওয়া ইহুদিরা স্প্যানিশ *কনভার্সো*দের চেয়ে কঠিন ছিল: বিশ্বাস ত্যাগ করার বদলে দেশান্তরী হওয়ার পথ বেছে নিয়েছিল তারা। ১৪৯৫ সালে প্রথম ম্যানুয়েল সিংহাসনে আসীন হলে শ্বশুর-শাশুড়ির কারণে তিনি রাজ্যের ইহুদিদের জোর করে ব্যাপ্টাইজ করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হন, তবে এক প্রজন্মের জন্যে তাদের ইনকুইজিশন থেকে রেহাই দিয়ে আপোস করেন। এই পর্তুগিজ মারানোরা গোপন সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় পেয়েছিল, এই সংগঠনে একটি সংখ্যালঘু অংশ গোপনে ইহুদি ধর্ম পালন করে চলে ও অন্যদেরও পুরোনো ধর্মবিশ্বাসে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পায়।[২৮]

কিন্তু ইহুদি ধর্মান্তরিত এইসব মারানো বাকি ইহুদি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ক্যাথলিক শিক্ষা লাভ করেছিল তারা, ফলে তাদের কল্পনার জগৎ ক্রিশ্চান প্রতীক ও মতবাদে পরিপূর্ণ ছিল। প্রায়শঃই তারা ক্রিশ্চান পরিভাষায় ইহুদি ধর্ম নিয়ে কথা বলত। উদাহরণ স্বরূপ, তারা বিশ্বাস করত, জেসাস নয় বরং মোজেসের আইনের কারণেই তারা রক্ষা পেয়েছে, ইহুদি ধর্মে এই ধারণার তেমন কোনও মূল্য নেই। ইহুদি বিধানের অনেক কিছুই তারা বিস্মৃত হয়েছিল। বছর পেরুনোর সাথে সাথে ইহুদিবাদ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধিও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। অনেক সময় অ্যান্টি-সেমিটিক ক্রিশ্চানদের বিভিন্ন যুক্তি সম্বলিত রচনাই ছিল তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা লাভের একমাত্র উৎস। শেষ পর্যন্ত তারা যার চর্চা শুরু করে সেটা হচ্ছে সঙ্কর ধর্মবিশ্বাস যা প্রকৃত ইহুদি বা ক্রিশ্চান ধর্মের কোনওটাই ছিল না।[২৯] এদের এই

AMARBOI.COM

টানাপোড়েন আজকের দিনে উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক লোকের টানাপোড়েনের চেয়ে ভিন্ন নয়, যাদের কেবল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা রয়েছে, কিন্তু আধুনিকতার আগ্রাসনে তাদের জীবন যাত্রার প্রথাগত ধারা অবদমিত হওয়ার ফলে তারা আর প্রাচীন পদ্ধতির সাথেও খাপ খাওয়াতে পারছে না। একই রকম বিচ্ছিন্নতার বোধে আক্রান্ত হয়েছিল পর্তুগালের মারানো ইহুদিরা। তাদের অন্তস্থঃ সত্তার সাথে অনুরণিত হয়নি এমন এক আধুনিকায়িত সংস্কৃতিতে নিজেদের মিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল তারা।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে কিছু সংখ্যক ইহুদিকে ইবারিয় পেনিনসুলা ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। স্প্যানিশ কলোনীগুলোর কোনও কোনওটায় এবং সেইসাথে দক্ষিণ ফ্রান্সে ইতিমধ্যে একটা মারানো ডায়াসপোরা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এখানকার ইহুদিদের তখনও তাদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া হচ্ছিল না। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহুদি ধর্মপ্রচারকারী মারানোরা ভেনিস, হামবুর্গ ও—পরে—লন্ডনের মতো বিভিন্ন জায়গায় অভিবাসন করে। এইসব জায়গায় তারা প্রকাশ্যে ইহুদি ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিল। সবচেয়ে বড় কথা, ইনকুইজিশনের কবল থেকে পালিয়ে ইবারিয় শরণার্থীরা আমস্টার্ডামে হাজির হতে শুরু করেছিল, এটা তাদের নতুন জেরুজালেমে পরিণত হয়। নেদারল্যান্ডস ছিল ইউরোপের সহিষ্ণুতম দেশ। বিকাশমান বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের একটি প্রজাতন্ত্র দেশটি স্পেন থেকে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের সময় ইবারিয় মূল্যবোধের বিপরীতে এক ধরনের উদার পরিচয় গড়ে তোলে। ১৬৩৭ সালে ইহুদিরা এই দেশের পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করে। বেশির ভাগ ইউরোপিয় শহরের মতো এখানে তারা আর ঘেটো-বন্দি ছিল না। ওলন্দাজরা ইহুদিদের বাণিজ্যিক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছে। ফলে ইহুদিরা বিশিষ্ট ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়ে জেন্টাইলদের সাথে মুক্তভাবে মেলামেশা শুরু করে। প্রাণবন্ত সামাজিক জীবন, অসাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা প্রকাশনা শিল্প ছিল তাদের।

অনেক ইহুদিই সন্দেহাতীতভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ লাভের জন্যেই আমস্টারডামে পাড়ি জমিয়েছিল, কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইহুদি ইহুদিবাদের পূর্ণাঙ্গ চর্চা বজায় রাখতে উদগ্রীব ছিল। সেটা অবশ্য সহজ ছিল না। ইবারিয়া থেকে আগত 'নব্য ইহুদিদের' ব্যাপকভাবে অজ্ঞ হয়ে থাকা ধর্ম সম্পর্কে নতুন করে শিক্ষা নিতে হচ্ছিল। ওদের ফিরিয়ে আনার এক চ্যালেঞ্জিং কাজ পেয়েছিলেন র‍্যাবাইরা, ঐতিহ্যের সাথে আপোস না করেই বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার জন্যে ওদের রেয়াত দিচ্ছিলেন তাঁরা। তাঁদের কল্যাণেই কিছু প্রাথমিক উদ্বেগ সত্ত্বেও বেশির ভাগ ইহুদিই ফিরে আসতে পেরেছিল। পূর্বপুরুষের ধর্মে প্রত্যাবর্তন

AMARBOI.COM

উপভোগ করছে বলে আবিষ্কার করেছিল তারা।[৩০] উল্লেখযোগ্য নজীর ছিলেন মেটাফিজিক্সের প্রফেসর ওরোবিও দে কাস্ত্রো, বছরের পর বছর স্পেনে গোপন ইহুদি ধর্ম প্রচারক রয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ইনকুইজিশনের হাতে আটক ও অত্যাচারিত হয়েছেন, তিনি বিশ্বাস প্রত্যাহার করেছেন ও ভুয়া ক্রিশ্চান হিসাবে তুলুজে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। শেষে প্রতারণা ও দ্বৈত জীবন কাটাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে ১৬৩০ সালে ইহুদিবাদের শক্তিশালী অ্যাপোলজিস্ট ও অন্য প্রত্যাবর্তনকারী মারানোদের শিক্ষক হতে আমস্টারডামে চলে আসেন তিনি।[৩১]

ওরোবিও অবশ্য একটা পূর্ণ জনগোষ্ঠীর বর্ণনা দিয়েছেন যারা প্রথাগত ইহুদিবাদের আইনকানুন ও রীতিনীতির সাথে মানিয়ে ওঠা কঠিন আবিষ্কার করেছে, ওদের কাছে তা অর্থহীন ও অযথা ভার মনে হয়েছে। ওরোবিওর মতোই ইবারিয়ায় যুক্তিবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, গণিত ও ওষুধবিজ্ঞানের মতো আধুনিক বিজ্ঞান পাঠ করেছে তারা। কিন্তু, অধৈর্যভাবে জানাচ্ছেন ওরোবিও, 'ওদের ছিল অনেক অহঙ্কার, গর্ব ও ঔদ্ধত্য, দারুণভাবে সব বিদ্যা অর্জন করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।'

> ওরা মনে করে পবিত্র আইনে প্রকৃত শিক্ষিতদের কাছ থেকে শিখতে রাজি হলে ওরা শিক্ষিত মানুষের পরিচয় হারিয়ে ফেলবে, তাই তারা যেসব বিষয় বোঝে না সেগুলোকে অস্বীকার করে বিরাট জ্ঞানীর ভাব ধরে।[৩২]

দশকের পর দশক ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতায় বাসকারী এইসব ইহুদি তাদের নিজস্ব যৌক্তিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের কোনও লিটার্জি, সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় জীবন ও তোরাহর 'পবিত্র আইন' পালনের আচরিক অভিজ্ঞতা ছিল না। অবশেষে আমস্টারডামে পৌঁছানোর পর প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ কার্যকর ইহুদি সম্প্রদায়ের মাঝে নিজেদের আবিষ্কার করে স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত বোধ করেছে। বহিরাগত কারও চোখে পেন্টাটিউকের ৬১৩টি নির্দেশনাকে খামখেয়ালি ও প্রাচীন ঠেকেছে। কোনও কোনও নির্দেশনা অচল হয়ে গিয়েছিল, কারণ সেগুলো পবিত্র ভূমির চাষাবাদ বা মন্দিরের লিটার্জির সাথে সম্পর্কিত ছিল, ডায়াসপোরায় যা আর প্রয়োগযোগ্য ছিল না। দুর্বোধ্য খাদ্য বিধি ও পবিত্রতা অর্জনের নিয়মের মতো অন্যান্য বিধিবিধানও নিশ্চয়ই আধুনিক পর্তুগিজ মারানোদের চোখে বর্বরোচিত ও অর্থহীন মনে হয়েছে; যৌক্তিকভাবে চিন্তাভাবনা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল বলে র‍্যাবাইদের ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া কঠিন ঠেকেছে তাদের কাছে। কমন এরার প্রথম শতাব্দীতে সংকলিত মৌখিক সাঙ্কেতিক আইন হালাখাহ আরও বেশি অযৌক্তিক ও

খামখেয়ালি বলে মনে হয়েছে, তার কারণ এর এমনকি বাইবেলিয় অনুমোদন পর্যন্ত ছিল না।

কিন্তু মোজেসের আইন তোরাহর নিজস্ব একটা *মিথোস* ছিল। এটি ছিল লুরিয় কাব্বালাহর মতোই নির্বাসনের স্থানচ্যুতির প্রতি সাড়া। বিসিই ষষ্ঠ শতাব্দীতে মন্দির ধ্বংস করে, ওদের ধর্মীয় জীবনকে পর্যুদস্ত করে ইসারয়েলের জনগণকে বাবিলনে নির্বাসনে পাঠানো হলে আইনের টেক্সট এক নতুন 'মন্দিরে' পরিণত হয়েছিল। স্থানচ্যুত জনগণ এখানে ঐশী সত্তার একটা বোধকে লালন করেছে। বিশ্বকে পরিচ্ছন্ন ও নোংরা, পবিত্র ও অপবিত্র হিসাবে গ্রন্থিত করা ছিল বিধ্বস্ত জীবনকে আবার সুশৃঙ্খলিত করার কাল্পনিক পুনঃস্থাপন। নির্বাসনে থাকার সময় ইহুদিরা আবিষ্কার করেছিল যে, আইনের পাঠ তাদের এক ধরনের গভীর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার যোগান দেয়। আধুনিক মানুষের মতো ইহুদিরা স্রেফ তথ্যের জন্যে টেক্সট পাঠ করত না: এটা ছিল পাঠের প্রক্রিয়া–প্রশ্ন-উত্তর, উত্তপ্ত বিতর্ক ও সূক্ষ্ম বিষয়ে মগ্ন হওয়া–যা তাদের ঐশী সত্তার বোধ যোগাত। তোরাহ ছিল ঈশ্বরের বাণী, এতে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে, মোজেসের কাছে স্বয়ং ঈশ্বরের উচ্চারিত বাণী অন্তর দিয়ে স্মৃতিতে গেঁথে নিয়ে সেগুলোকে জোরে উচ্চারণ করে নিজেদের সত্তার ভেতর ঐশী সত্তাকে টেনে আনছিল ওরা, প্রবেশ করছিল পবিত্র বলয়ে। আইন একটা প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, এখানেই ওরা শেখিনাহর দেখা পেয়েছিল। ওদের জীবনের সূক্ষ্মতম ক্ষেত্রে আইনের পালন স্বর্গীয় সত্তা নিয়ে আসত: যখন তারা খেত, হাতমুখ ধুতো, প্রার্থনা করত বা স্রেফ সাব্বাথের সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিশ্রাম করত।

মারানোদের বাধ্য হয়ে জীবনভর যার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল এর কোনওটাই হুট করে সেই যৌক্তিক চিন্তাভাবনা দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। এই ধরনের পৌরাণিক ও কাল্টসুলভ অনুশীলন ছিল অজানা। নব্য ইহুদিদের কেউ কেউ, অভিযোগ করেছেন ওরোবিও, 'বর্ণনার অতীত নাস্তিকে' পরিণত হয়েছিল। ওরা, এটা নিশ্চিত যে, আমাদের বিংশ শতাব্দীর ধারণা মোতাবেক নাস্তিক ছিল না, কারণ তখনও তারা দুর্জ্ঞেয় উপাস্যে বিশ্বাস করছিল। কিন্তু বাইবেলের ঈশ্বর ছিলেন না তিনি। মারানোরা পরবর্তীকালের আলোকন *ফিলোসফদের*[৩৪] উদ্ভাবিত ডেইজমের মতো একটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক বিশ্বাস গড়ে তুলেছিল। এই ঈশ্বর ছিলেন সমস্ত কিছুর প্রথম কারণ, অ্যারিস্টটল যাঁর অস্তিত্ব যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছিলেন। সব সময়ই ইনি যৌক্তিকভাবে আচরণ করে এসেছেন। তিনি মানুষের ইতিহাসে ভ্রান্তিপূর্ণভাবে হস্তক্ষেপ করেন না, বিচিত্র অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে প্রকৃতির বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করেন না বা পর্বতশীর্ষে অস্পষ্ট বিধান অবতীর্ণ করেন না।

AMARBOI.COM

তাঁর বিশেষ ধরনের আইনি বিধান প্রকাশ করার প্রয়োজন পড়েনি, কারণ প্রকৃতির নিয়মকানুন সবারই বোধগম্য ছিল। মানুষের যুক্তি স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের ঈশ্বরের ধারণাই কল্পনা করতে চেয়ে এসেছে। অতীতে ইহুদি ও মুসলিম দার্শনিকগণ বলতে গেলে ঠিক এমনই একজন উপাস্যকে হাজির করেছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে বিশ্বাসীদের কাছে তা কখনওই খুব ভালোভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। ধর্মের দিকে থেকে তা ব্যবহারযোগ্য ছিল না, কেননা প্রথম কারণ মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন কিনা তাতেই সন্দেহের অবকাশ ছিল, কারণ তাঁর পক্ষে পূর্ণাঙ্গ নয় এমন কোনও কিছুর কথা ভাবাও সম্ভব ছিল না। এমন একজন ঈশ্বরের পক্ষে মানুষের দুঃখদুর্দশার বেলায় কোনও কিছু বলার ছিল না। সেজন্যে আপনার প্রয়োজন পৌরাণিক ও কাল্টিক আধ্যাত্মিকতা, মারানোদের সেটা অজানা ছিল।

আমস্টারডামে ধর্মবিশ্বাসে ফিরে যাওয়া বেশির ভাগ মারানো কোনও কোনও মাত্রায় হালাখিয় আধ্যাত্মিকতা শিখতে সক্ষম হয়। কিন্তু কারও কারও বেলায় পরিবর্তন অসম্ভব *ঠেকেছে*। করুণতম ঘটনাগুলোর অন্যতম ছিল, উরিয়েল দা কোস্তার ঘটনা। *কনভার্সো* পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি, শিক্ষা লাভ করেছিলেন জেস্যুইটদের কাছে, কিন্তু ক্রিশ্চান ধর্মকে তিনি নির্যাতনমূলক, নিষ্ঠুর ও গস্পেলের সাথে সম্পর্ক বিবর্জিত সম্পূর্ণ মানব রচিত নিয়ম ও মতবাদে নির্মিত বলে আবিষ্কার করেছিলেন। দা কোস্তা ইহুদি ঐশীগ্রন্থের শরণাপন্ন হন ও নিজের জন্যে ইহুদি ধর্মের খুবই আদর্শগত যৌক্তিক ধারণা গড়ে তোলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমস্টারডামে পৌঁছানোর পর সমসাময়িক ইহুদিধর্মমত ঠিক ক্যাথলিক মতবাদের মতোই মানব রচিত আবিষ্কার করে হতবাক হয়ে যান, কিংবা তাই দাবি করেছিলেন তিনি।

সম্প্রতি পণ্ডিতগণ দা কোস্তার বক্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, প্রায় নিশ্চিতভাবেই যতটা আবছাই হোক না কেন ইহুদিবাদের হালাখিয় ধরনের সাথে আগেও তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল, যদিও সম্ভবত হালাখাহ কতটা গভীরভাবে স্বাভাবিক ইহুদি জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছিল সেটা তিনি উপলব্ধি করে উঠতে পারেননি। তবে আমস্টারডামের ইহুদি জীবনধারার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে দা কোস্তার অক্ষমতার বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পরকালের জীবন সংক্রান্ত মতবাদ ও ইহুদি বিধানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। এখানে তিনি ঘোষণা করেন, তিনি কেবল মানবীয় যুক্তি ও প্রকৃতিক বিধানেই বিশ্বাস করেন। অনেক বছর র‍্যাবাইরা একঘরে করে রেখেছিলেন তাঁকে। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার আগ পর্যন্ত করুণ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেছিলেন দা

কোস্তা, পরে তাঁকে আবার গ্রহণ করা হয়, আবার সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু আসলে দা কোস্তা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাননি। কোনও রকম যৌক্তিক অর্থ সৃষ্টি করে না এমন সব আচার মেনে চলা অসম্ভব ঠেকেছিল তাঁর পক্ষে। আরও দুবার সমাজচ্যুত হয়েছিলেন তিনি। অবশেষে ১৬৪০ সালে হতাশায় পরাস্ত, ভগ্ন অবস্থায় নিজেই নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

দা কোস্তার ট্র্যাজিডি দেখায় যে, ইউরোপে তখনও পর্যন্ত ধর্মীয় জীবনের বিকল্প কোনও সেক্যুলার রীতির অস্তিত্ব ছিল না। আপনি অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারতেন বটে, কিন্তু খুবই ব্যতিক্রমী মানুষ না হলে (দা কোস্তা যা ছিলেন না), ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বাইরে টিকে থাকতে পারতেন না। সমাজচ্যুত থাকার বছরগুলোতে দা কোস্তা চরমভাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছেন, ইহুদি ও ক্রিশ্চানরা তাঁকে সমানভাবে বর্জন করেছিল, পথেঘাটে বাচ্চারা তাঁকে টিটকারী মারত।[৩৫]

কিছুটা কম করুণ হলেও মোটামুটি সমান বাঙ্ময় ছিল হুয়ান দ্য প্রাদোর ঘটনা। ১৬৫৫ সালে আমস্টারডামে আসেন তিনি। প্রায়ই দা কোস্তার পরিণতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। বিশ বছর পর্তুগালের গোপন ইহুদি সংগঠনের সদস্য ছিলেন তিনি, কিন্তু ধারণা করা হয়, ১৬৪৫ সালের দিকেই ডেইজমের মারানো ধরনের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন তিনি। মেধাবী বা পদ্ধতিগত চিন্তাবিদের কোনওটাই ছিলেন না প্রাদো। তবে তাঁর অভিজ্ঞতা দেখায়, কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করে ইহুদিবাদের মতো কনফেশনাল কোনও ধর্ম মেনে চলা অসম্ভব। উপাসনার জীবন, কাল্ট ও অতীন্দ্রিয় গুরুত্ববিহীন প্রাদো কেবল এই উপসংহারে উপনীত হতে পেরেছিলেন যে, 'ঈশ্বর' কেবল প্রকৃতির বিধানের অনুরূপ। তারপরেও আরও দশ বছর তিনি গোপন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর কাছে 'ইহুদিধর্ম' যেন বন্ধুবর্গের মতো, একটা নিবিড়ভাবে গঠিত দলে তাঁর দেখা নিবিড় বন্ধনের অভিজ্ঞতা যা তাঁর জীবনের অর্থ যোগান দিয়েছে, কারণ তিনি যখন আর্মস্টারডামে পৌঁছে সেখানকার র‍্যাবাইদের প্রতি বিরূপ ধারণা লাভ করেন, তারপরেও ইহুদি সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেই থাকতে চেয়েছিলেন। দা কোস্তার মতো প্রাদো অনেক বছর নিজের চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা ও পছন্দমতো উপাসনা করার অধিকার টিকিয়ে রেখেছিলেন। 'ইহুদি ধর্ম' সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা ছিল। আসল ব্যাপারের মুখোমুখি হয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। জোরালভাবে আপত্তি তুলে ধরেছিলেন প্রাদো। ইহুদিরা কেন ভাবে যে ঈশ্বর কেবল তাদেরই বেছে নিয়েছেন? এই ঈশ্বর আসলে কী? ঈশ্বরকে বর্বরোচিত কাণ্ডজ্ঞানহীন কতগুলো আইন চাপিয়ে দেওয়া এক ব্যক্তি না ভেবে বরং প্রথম কারণ হিসাবে চিন্তা করাই কি অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত নয়? প্রাদো পরিণত হন বিব্রতকারীতে। র‍্যাবাইরা ইবারিয়া থেকে আগত

AMARBOI.COM

নব্য ইহুদিদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন (অনেকের সাথেই প্রাদোর ভাবনার মিল ছিল), তাঁর ডেইজম বরদাশত করতে পারছিলেন না তাঁরা। ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৫৭ তারিখে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়; কিন্তু তারপরেও সমাজ ত্যাগে অস্বীকার গেছেন তিনি।

এটা ছিল সম্পূর্ণ সমন্বয়ের অতীত দুটো দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত। তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাদো ও র‍্যাবাইগণ, উভয়ই সঠিক ছিলেন। প্রচলিত ইহুদিবাদের কোনও অর্থ করতে পারেননি প্রাদো, মনের অতীন্দ্রিয় ছাঁচ হারিয়ে ফেলেছিলেন; কাল্ট ও আচারের মাধ্যমে ধর্মের গভীরতম অর্থ খুঁজে বের করার সুযোগ পাননি কোনওদিন। সব সময়ই তাঁকে যুক্তি ও নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়েছে; এখন আর তা পরিত্যাগ করতে পারেননি। তবে র‍্যাবাইরাও সঠিক ছিলেন। প্রাদোর ডেইজমের সাথে তাঁদের চেনা ইহুদিবাদের কোনও ধরনের সাথেই মিল ছিল না। প্রাদো একজন 'সেক্যুলার ইহুদি' হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ধরনের কোনও কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। প্রাদো বা র‍্যাবাইদের কারও পক্ষেই একে সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এটা ছিল একদিকে পুরোপুরিভাবে যৌক্তিক বিশ্বদৃষ্টি ও অন্যদিকে কাল্ট ও মিথে গড়ে ওঠা ধর্মীয় মানসিকতার সংঘাতের একটি ধারার প্রথমটি।

এইসব নীতিগত সংঘাতে প্রায়শঃ যেমন হয়, কোনও পক্ষই খুব ভালো আচরণ করেনি। উদ্ধত মানুষ ছিলেন প্রাদো, র‍্যাবাইদের প্রকাশ্যে গালি দিতেন। একবার তলোয়ার নিয়ে সিনাগগে তাঁদের উপর হামলে পড়ারও হুমকি দিয়েছিলেন। র‍্যাবাইরাও কম সম্মানের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। প্রাদোর পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছিলেন তাঁরা। এই গুপ্তচর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আরও রেডিক্যাল রূপ নেওয়ার খবর দিয়েছিল। সমাজচ্যুত হওয়ার পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ধর্ম হচ্ছে আবর্জনা; এবং তথাকথিত 'প্রত্যাদেশ' নয়, যুক্তিই হবে সব সময় সত্যের একক বিচারক। প্রাদো কীভাবে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন সেটা কেউ জানে না। তাঁকে সমাজ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। অ্যান্টওয়ার্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। কেউ কেউ বলেন, তিনি এমনকি ক্যাথলিক চার্চের সাথে আপোসরফায় পৌঁছুনোর প্রয়াসও পেয়েছিলেন। তাই যদি হয়, তা ছিল মরিয়া পদক্ষেপ, যা আবারও দেখায় যে সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন সাধারণ গঠনের মানুষের পক্ষে ধর্মের সীমানার বাইরে অবস্থান করা কতখানি অসম্ভব ছিল।[৩৬]

প্রাদো ও দা কোস্তা, এরা দুজনই ছিলেন আধুনিক চেতনার অগ্রদূত। তাঁদের কাহিনী দেখায়, কনফেশনাল ধর্মের *মিথোস* মনের অধিকতর স্বজ্ঞামূলক অংশের চর্চাকারী প্রার্থনা ও আচারের আধ্যাত্মিক অনুশীলন ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

AMARBOI.COM

কেবল যুক্তি দুর্বল ডেইজমের জন্ম দিতে পারে, অচিরেই যা প্রত্যাখ্যাত হয়, কারণ আমরা যখন বিষাদের মুখোমুখি হই বা বিপদে পড়ি তখন তা কোনও কাজে আসে না। প্রাদো ও দা কোস্তা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন কারণ তাঁরা ধর্ম অনুশীলনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু আমস্টারডামের আরেক মারানো ইহুদি দেখিয়েছেন যে খোদ যুক্তির অনুশীলনই এতটা আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে যার ফলে মিথের প্রয়োজন কমে আসে। এই পৃথিবীই ধ্যানের একমাত্র বস্তুতে পরিণত হয়। এবং মানুষই, ঈশ্বর নন, সব বস্তুর মানদণ্ডে পরিণত হয়। কোনও ব্যতিক্রমী নারী বা পুরুষের মাঝে খোদ যুক্তি চর্চা এক ধরনের অতীন্দ্রিয় আলোকন এনে দিতে পারে। এটাও আধুনিক অভিজ্ঞতারই অংশ ছিল।

র‍্যাবাইরা প্রাদোকে সমাজচ্যুত করার সময়ই বারুচ স্পিনোযার বিরুদ্ধে বিচার কাজেরও সূচনা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেইশ বছর। প্রাদোর বিপরীতে স্পিনোযা আমস্টারডামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পর্তুগালে ইহুদি ধর্মপ্রচারকের জীবন যাপন করেছিলেন তাঁর বাবা-মা। আমস্টারডামে আসার পর তাঁরা অর্থডক্স ইহুদিবাদে ধর্মান্তরিত হতে পেরেছিলেন। ফলে স্পিনোযাকে কখনওই ধাওয়া বা নির্যাতনের শিকার হতে হয়নি। সব সময়ই উদার আমস্টারডামে বাস করেছেন তিনি, জেন্টাইল বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে যাতায়াত ছিল। বিনা বাধায় নিজ ধর্মবিশ্বাসের চর্চা করার সুযোগ ছিল। অসাধারণ কেতার তোরাহ স্কুলে প্রথাগত শিক্ষা লাভ করেন তিনি। তবে আধুনিক গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যায় পড়াশোনা করেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের জীবন স্থির হয়েছিল স্পিনোযার, তাঁকে নিবেদিতপ্রাণ ধার্মিক বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ১৬৫৫ সালে আমস্টাডামে প্রাদোর আগমনের অল্প পরেই আকস্মিকভাবে সিনাগগে প্রার্থনায় যাওয়া বন্ধ করে দেন তিনি, সন্দেহের কথাকে ভাষা দিতে শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বাইবেলের তিনি টেক্সটে স্ববিরোধিতা রয়েছে, তাই ঐশী উৎসের নয়, এটা মানব রচিত বলেই প্রমাণিত হয়। তিনি প্রত্যাদেশের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে যুক্তি দেখান যে 'ঈশ্বর' স্রেফ খোদ প্রকৃতির সামগ্রিকতা। শেষ পর্যন্ত ২৭শে জুলাই, ১৬৫৬ তারিখে র‍্যাবাইগণ স্পিনোযার বিরুদ্ধে সমাজচ্যুতির ফরমান জারি করেন। প্রাদোর বিপরীতে স্পিনোযা সমাজে থাকার অনুরোধ জানাননি। চলে যেতে পেরে খুশি ছিলেন, ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের আওতার বাইরে সফলভাবে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনকারী প্রথম ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি।

প্রাদো বা দা কোস্তার চেয়ে স্পিনোযার পক্ষে জেন্টাইল বিশ্বে বেঁচে থাকা অনেকাংশে সহজতর ছিল। মেধাবী ছিলেন তিনি, পরিষ্কারভাবে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে পারতেন এবং প্রকৃত স্বাধীন মানুষ হিসাবে এর সাথে সম্পর্কিত

AMARBOI.COM

অনিবার্য নৈঃসঙ্গকে ধারণ করতে পেরেছেন। নেদারল্যান্ডসে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি, ক্ষমতাশালী পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁকে যুক্তিসঙ্গত রেয়াত দিয়েছেন। ফলে হতদরিদ্র অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়নি তাঁকে। প্রায়শঃ যেমন মনে করা হয়, স্পিনোযা বেঁচে থাকার তাগিদে লেন্স ঘঁষতে বাধ্য হননি, বরং অপটিক্সে নিজের কৌতূহল নিবৃত্ত করতেই একাজ করেছিলেন। তখনকার সময়ের বেশ কয়েকজন নেতৃত্বস্থানীয় জেন্টাইল বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরেও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি রয়ে গিয়েছিলেন। ইহুদি ও জেন্টাইলরা সমানভাবে তাঁর ধর্মহীনতাকে হয় ভয়ঙ্কর বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবে আবিষ্কার করেছে।[৩৭]

কিন্তু তাসত্ত্বেও স্পিনোযার নাস্তিক্যবাদে আধ্যাত্মিকতা ছিল, কারণ জগৎকে তিনি ঐশী ভাবতেন। জাগতিক বাস্তবতায় ব্যাপ্ত ঈশ্বরের একটা ছবিই স্পিনোযাকে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ করে রেখেছিল। *শর্ট ট্রিটাইজ অন গড-এ* (১৬৬১) যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, দার্শনিক গবেষণা ও চিন্তাভাবনাকে এক ধরনের প্রার্থনা মনে করতেন তিনি। এই উপাস্য জানবার মতো কোনও বস্তু নয়, বরং আমাদের ভাবনার নীতি। এ থেকে অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে, আমরা যখন জ্ঞান অর্জন করে আনন্দ বোধ করি সেটা ঈশ্বরের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক ভালোবাসা *মাত্র*। প্রকৃত দার্শনিক, স্পিনোযা বিশ্বাস করতেন, তিনি যাকে স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান বলেছেন, তার চর্চা করবেন, অন্তর্দৃষ্টির একটা ঝলক আলোচনার ভেতর দিয়ে সংগ্রহ করা তার সমস্ত তথ্যকে সমন্বিত করবে, এবং এটা ছিল এমন এক অভিজ্ঞতা স্পিনোযা যাকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করেছেন। এই অভিজ্ঞতাকে তিনি বলেছেন 'স্বর্গসুখ' (বিটিচ্যুড): এই পর্যায়ে দার্শনিক বুঝতে পারবেন যে তিনি ঈশ্বর হতে অবিচ্ছেদ্য ও মানুষের মাধ্যমেই ঈশ্বর অস্তিত্ববান। এটা ছিল অতীন্দ্রিয় দর্শন, জন অভ দ্য ক্রস ও তেরেসা অভ আভিলার চর্চিত আধ্যাত্মিকতার যৌক্তিক ভাষ্য হিসাবে দেখা যেতে পারত একে। কিন্তু এই ধরনের ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টির কোনও ফুরসত স্পিনোযার ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন একজন দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করতে গিয়ে মানুষ তার নিজ প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। পরবর্তী কালের দার্শনিকগণ স্পিনোযার স্বর্গসুখের পরমানন্দের অনুসন্ধানকে বিব্রতকর আবিষ্কার করে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করবেন। তা সত্ত্বেও এ বিশ্ব জগতের প্রতি মনোসংযোগ ও অতিপ্রাকৃতকে অস্বীকার যাওয়ার ভেতর স্পিনোযা ইউরোপের অন্যতম প্রথম সেক্যুলারে পরিণত হয়েছিলেন।

অনেক আধুনিক মানুষের মতো স্পিনোযা সব ধরনের আনুষ্ঠানিক ধর্মকে বিতৃষ্ণার সাথে দেখতেন। তাঁর সমাজচ্যুতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করলে একে

তেমন একটা বিস্ময়কর বলা যাবে না। প্রত্যাদিষ্ট ধর্মবিশ্বাসসমূহকে 'বিশ্বাসপ্রবণতা ও কুসংস্কারের স্তূপ' ও 'অর্থহীন রহস্যের জটলা' হিসাবে নাকচ করে দিয়েছেন তিনি।[৩৮] বাইবেলিয় টেক্সটে নিজেকে মগ্ন করে নয়, যুক্তির বাধাহীন ব্যবহারে আনন্দ লাভ করেছেন; ফলে ঐশীগ্রন্থসমূহকে তিনি সম্পূর্ণই বস্তুগত দৃষ্টিতে দেখেছেন। একে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ হিসাবে দেখার বদলে স্পিনোযা জোরের সাথে বলেছেন যে, বাইবেলকে অন্য যেকোনও টেক্সটের মতোই পড়তে হবে। বৈজ্ঞানিকভাবে বাইবেল পাঠকারীদের ভেতর তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি এর ঐতিহাসিক পটভূমি পরীক্ষা করেছেন, সাহিত্যিক ঘরানা পরখ করেছেন, ও রচয়িতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।[৩৯] আপন রাজনৈতিক ধারণা পরখ করতেও বাইবেল ব্যবহার করেছেন। পাশ্চাত্য আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে চলা ইউরোপের সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ তুলে ধরা ব্যক্তিদের ভেতর অন্যতম ছিলেন স্পিনোযা। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রিস্টরা ইসরায়েলের রাজার চেয়ে বেশি ক্ষমতা হাতে পাবার পর রাষ্ট্রের আইন-কানুন শাস্তিমূলক ও প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। আদিতে ইসরায়েল রাজ্য ধর্মতান্ত্রিক ছিল, কিন্তু স্পিনোযার দৃষ্টিভঙ্গিতে, ঈশ্বর ও সাধারণ জনগণ একই থাকায় মানুষের কণ্ঠস্বরই ছিল সার্বভৌম। পুরোহিতরা ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পর আর ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি।[৪০] কিন্তু স্পিনোযা লোকানুবর্তী ছিলেন না। অধিকাংশ প্রাক আধুনিক দার্শনিকের মতোই অভিজাতবাদী ছিলেন তিনি, সাধারণ জনগণকে যৌক্তিক চিন্তাভাবনায় অক্ষম মনে করতেন। তাদের কোনও ধরনের আলোকন যোগাতে এক জাতীয় ধর্মের প্রয়োজন পড়বে, কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট আইনের ভিত্তিতে নয়, বরং ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ববোধ ও উদারতার স্বাভাবিক নীতিমালার ভিত্তিতে এই ধর্মকে অবশ্যই সংস্কার করতে হবে।[৪১]

সন্দেহাতীতভাবে স্পিনোযা ছিলেন আধুনিক চেতনার অন্যতম বাহক। পরবর্তী সময়ে সেক্যুলার ইহুদিদের এক ধরনের নায়কে পরিণত হবেন তিনি। ধর্ম থেকে নীতির ভিত্তিতে তাঁর যাত্রাকে তারা শ্রদ্ধা করেছে। কিন্তু জীবদ্দশায় স্পিনোযার কোনও ইহুদি অনুসারী ছিল না; যদিও এটা স্পষ্ট যে, বহু ইহুদিই তখন মৌলিক পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত ছিল। মোটামুটি স্পিনোযার সেক্যুলার যুক্তিবাদ গড়ে তোলার সময়টিতেই এক মেসিয়ানিক উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়েছিল ইহুদি জগৎ যুক্তিকে যা হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে বলে মনে হয়েছে। আধুনিক কালের অন্যতম প্রথম মিলেনিয়াল আন্দোলন ছিল এটা, নারী-পুরুষকে পবিত্র অতীতের সাথে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ নতুন কিছুর দিকে অগ্রসর হতে ধর্মীয় উপায় যুগিয়েছিল। আমাদের কাহিনীতে প্রায়ই এটা লক্ষ করব আমরা। অল্প সংখ্যক লোকই

আধুনিকতার সেক্যুলারিস্ট দর্শন উপস্থাপনকারী অভিজাত দার্শনিকদের বুঝতে সক্ষম ছিল। বেশির ভাগই ধর্মের উপর ভরসা করে নতুন বিশ্বে যাত্রা করেছিল, যা তাদের অতীতের সাথে এক ধরনের সান্ত্বনামূলক ধারাবাহিকতার বোধ দিয়েছে ও পৌরাণিক কাঠামোয় আধুনিক *লোগোস*কে ভিত্তি দিয়েছে।

এটা প্রতীয়মান যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ অনেক ইহুদিই বিচ্ছিন্নতার একটা অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। আমস্টারডামের মারানো সম্প্রদায়ের মতো ইউরোপের আর কোনও ইহুদিই স্বাধীনতা ভোগ করেনি। স্পিনোযা জেন্টাইলদের সাথে মিশতে পেরেছিলেন ও নতুন বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই তাঁর রেডিক্যাল নতুন প্রস্থান সম্ভব হয়েছিল। ক্রিশ্চান জগতের অন্যান্য জায়গায় ইহুদিরা মূলধারার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ কোনও ইহুদিই 'ঘেটো' নামে পরিচিত বিশেষ ইহুদি এলাকার বাইরে থাকতে পারত না। এর মানে ছিল ইহুদিদের অনিবার্যভাবে অন্তর্মুখী জীবন যাপন করতে হত। বিচ্ছিন্নতা অ্যান্টিসেমিটিক সংস্কার উস্কে দিয়েছিল। ইহুদিরা স্বভাবতই নিপীড়নকারী জেন্টাইল বিশ্বের বিরুদ্ধে তিক্ততা ও সন্দেহের মাধ্যমে সাড়া দিয়েছিল। ঘেটোগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ জগতে পরিণত হয়। ইহুদিদের নিজস্ব স্কুল, নিজস্ব সামাজিক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান, নিজস্ব স্নানঘর, কবরস্থান ও কসাইখানা ছিল। ঘেটোগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও স্বপরিচালিত ছিল। নির্বাচিত র‍্যাবাই ও প্রবীনদের *কেহিলা* (গোষ্ঠীগত সরকার) ইহুদি আইন মোতাবেক নিজস্ব আদালত পরিচালনা করত। কার্যত ঘেটো ছিল রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র, পৃথিবীর ভেতরে আরেক পৃথিবী। বাইরের জেন্টাইল সমাজের সাথে ইহুদিদের যোগাযোগ ছিল প্রায়শঃ তাদের সেই ইচ্ছাও–ছিল কম। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় নাগাদ মনে হয় যে অনেকেই তাদের সীমাবদ্ধতায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সাধারণত অস্বাস্থ্যকর, নোংরা এলাকায় ছিল ঘেটোগুলোর অবস্থান। উঁচু দেয়ালে ঘেরাও করা ছিল সেগুলো, যার মানে ছিল জনসংখ্যার আধিক্য, কিন্তু সীমানা সম্প্রসারণের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এমনকি রোম বা ভেনিসের অপেক্ষাকৃত বড় ঘেটোতেও বাগান করার মতোও কোনও জায়গা ছিল না। নিজেদের জন্যে জায়গা বাড়ানোর একটা উপায়ই ছিল ইহুদিদের: আগের দালানের উপর নতুন করে আরেক তলা নির্মাণ, এবং প্রায়শঃই সেটা অপর্যাপ্ত ফাউন্ডেশনের উপর, ফলে সবকিছু ধসে পড়ত। অগ্নিকাণ্ড ও রোগশোকের হুমকি ছিল সারাক্ষণ। ইহুদিদের ভিন্ন পোশাক পরতে বাধ্য করা হত। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মোকাবিলা করতে হয়েছে তাদের। প্রায়শঃই ফেরিঅলা বা দর্জির কাজই ছিল তাদের সামনে একমাত্র উন্মুক্ত পেশা। বৃহৎ আকারের কোনও বাণিজ্যিক উদ্যোগের অনুমতি ছিল না। ফলে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ

AMARBOI.COM

দানের উপর নির্ভর করে থাকত। সূর্যালোক ও প্রকৃতির সাথে সম্পর্করহিত ইহুদিরা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওরা মানসিকভাবেও বন্দি ছিল। ইউরোপের বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সাথে তাদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। ওদের নিজস্ব স্কুলগুলো ভালো ছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে ক্রিশ্চান জগতের শিক্ষাকার্যক্রম আরও উদার হয়ে উঠছিল যখন, ইহুদিরা তখনও কেবল তোরাহ ও তালমুদে পাঠে মগ্ন ছিল। কেবল নিজস্ব টেক্সট ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মগ্ন থাকায় ইহুদিদের শিক্ষায় চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার একটা প্রবণতা ছিল।[৪২]

ইসলামি বিশ্বের ইহুদিরা ক্রিশ্চান বিশ্বের ইহুদিদের মতো নিষেধাজ্ঞার অধীন ছিল না। *জিম্মি*'র ('প্রতিরক্ষা প্রাপ্ত সংখ্যালঘু') মর্যাদা পেয়েছিল তারা, যতক্ষণ ইসলামি রাষ্ট্রের আইন ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করছে ততক্ষণ এটা তাদের নাগরিক ও সামরিক প্রতিরক্ষা দিয়েছে। ইসলামের ইহুদিরা নির্যাতিত হয়নি; অ্যান্টি-সেমিটিজমের কোনও ঐতিহ্য ছিল না, *জিম্মি*রা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হলেও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল ওদের, নিজেদের আইন অনুযায়ী নিজস্ব কর্মকাণ্ড চালাতে পারত ওরা; ইউরোপের ইহুদিদের তুলনায় ঢের ভালোভাবে মূলধারার সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিতে পারত।[৪৩] কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ দেখাবে, এমনকি ইসলামি বিশ্বের ইহুদিরাও অস্থির হয়ে উঠছিল, আরও বৃহত্তর মুক্তির সন্ধান করছিল তারা। ১৪৯২ সাল থেকে ইউরোপে একের পর এক বিপর্যয়ের সংবাদ পাচ্ছিল তারা, তারপর ১৬৪৮ সালে পোল্যান্ডে ইহুদিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নির্যাতনের খবরে রীতিমতো সন্ত্রস্ত ওঠে। বিংশ শতাব্দীর আগে আর যার কোনও তুলনা মিলবে না।

পোল্যান্ড সম্প্রতি বর্তমানের ইউক্রেনের সিংহভাগ এলাকা অধিভুক্ত করে নিয়েছিল; এখানে নিজস্ব প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে কৃষক সমাজ অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলেছিল। এই 'কস্যাক'রা পোলিশ ও ইহুদিদের সমানভাবে ঘৃণা করত, এরা প্রায়শঃই পোলিশ অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে জমিন দেখাশোনা করত। ১৬৪৯ সালে কস্যাক নেতা বরিস শ্মিয়েলনিকি পোলদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। পোলিশ ও ইহুদি সম্প্রদায়ের উপর সমান তালে আক্রমণ পরিচালনা করা হয় তখন। ১৬৬৭ সালে অবশেষে যুদ্ধের অবসান ঘটলে, বিবরণী আমাদের জানায়, ১,০০,০০০ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল ও ৩০০ ইহুদি মহল্লা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। এই সংখ্যাগুলো অতিরঞ্জিত হয়ে থাকলেও শরণার্থীদের চিঠি ও কাহিনী বিশ্বের অন্যান্য এলাকার ইহুদিদের ত্রস্ত করে তোলে। এইসব চিঠি আর কাহিনীতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে চালানো হত্যালীলার কথা বলা হয়; ইহুদিদের

জবাই করা হয়েছে, গণকবরে ইহুদি নারী-শিশুকে জ্যান্ত পুঁতে মারা হয়েছে, ইহুদিদের হাতে রাইফেল ধরিয়ে দিয়ে একজনকে অন্যের উপর গুলি চালানোর হুকুম দেওয়া হয়েছে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, এইসব ঘটনা নিশ্চয়ই দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সেই 'মেসায়াহর প্রসব বেদনাই' হবে। ফলে মেসিয়ানিক নিস্তারকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে লুরিয় কাব্বালাহর বিভিন্ন আচার ও প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুশীলনকে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরেছিল তারা।[৪৪]

শ্মিয়েলনিকি হত্যাকাণ্ডের খবর বর্তমান তুরস্কের স্মিরনায় এসে পৌঁছলে শহরের বাইরে হাঁটতে হাঁটতে ধ্যানমগ্ন এক যুবক এক স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর শুনতে পান। কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছিল যে, স্বয়ং তিনি 'ইসরায়েলের ত্রাণকর্তা, মেসায়াহ, ডেভিডের ছেলে, জ্যাকবের ঈশ্বরের মনোনীতজন।'[৪৫] শাব্বেতাই যেভি ছিলেন তরুণ পণ্ডিত ও কাব্বালিস্ট (যদিও এই পর্যায়ে লুরিয় কাব্বালাহয় অভিজ্ঞ ছিলেন না): ছোট একটা অনুসারী গোষ্ঠীর সাথে নিজের চিন্তভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি; কিন্তু আনুমানিক বিশ বছর বয়সে পৌঁছানোর পরপরই এমন সব লক্ষণ দেখাতে শুরু করেছিলেন বর্তমানে আমরা যাকে ম্যানিক ডিপ্রেসিভ হিসবাবে আখ্যায়িত করব। কিছুদিনের জন্যে নিখোঁজ হয়ে যেতেন তিনি, অন্ধকার ছোট কামরায় প্রবল দুঃখে ডুবে যেতেন, কিন্তু বিষণ্ণতার এই পর্যায়গুলো 'আলোকনের' এক উন্মত্ত পর্যায়ে প্রতিস্থাপিত হত। এই সময় অস্থির হয়ে উঠতেন তিনি, ঘুমোতে পারতেন না, তাঁর মনে হত কোনও উচ্চতর শক্তির সংস্পর্শে চলে গেছেন। অনেক সময় তোরাহর বিভিন্ন নির্দেশনা অমান্য করতে বাধ্য হতেন, যেমন প্রকাশ্যে ঈশ্বরের নিষিদ্ধ নাম উচ্চারণ করতেন; বা অকোশার খাবার খেতেন। কেন এইসব 'অদ্ভুত কাজ' করছেন বলতে পারতেন না তিনি, তবে তাঁর মনে হত ঈশ্বর কোনও কারণে তাঁকে দিয়ে এসব করাচ্ছেন।[৪৬] পরে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে, এইসব নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নিস্তারমূলক: ঈশ্বর 'অচিরেই জগৎকে ঠিক করার জন্যে নতুন আইন ও নতুন নির্দেশনা দেবেন তাঁকে।'[৪৭] এইসব লঙ্ঘন ছিল 'পবিত্র পাপ'; এগুলোকে লুরিয় কাব্বালিস্টরা *তিক্কুনের* কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করত। এমন হতে পারে যে, এসব প্রথাগত ইহুদি জীবন ধারার বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ তুলে ধরেছে ও সম্পূর্ণ নতুন কিছুর জন্যে অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত শাব্বেতাইয়ের আচার-আচরণ স্মিরনার ইহুদিদের পক্ষে সহ্যের অতীত হয়ে দাঁড়ায়। ১৬৫০ সালে শহর ত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। এরপর পনের বছর মেয়াদী একটা পর্বের সূচনা করেন। পরে একে 'অন্ধকার বছর' আখ্যায়িত করেছিলেন। এই সময় অটোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে

AMARBOI.COM

বেড়িয়েছেন তিনি, এক শহর থেকে চলে গেছেন আরেক শহরে। নিজের মেসিয়ানিক বৃত্তি সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেননি, হয়তো বা বিশেষ ব্রতের ধারণাই বিসর্জন দিয়ে থাকতে পারেন। ১৬৬৫ সালের দিকে নিজের দানোর কাছ থেকে মুক্ত হয়ে র‍্যাবাই হতে চেয়েছিলেন তিনি।[৪৮] চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে পরিচিত করে তোলা গাযার এক মেধাবী কাব্বালিস্টের কথা জানতে পেরে তাঁর সাথে দেখা করতে রওয়ানা হয়ে যান। এই র‍্যাবাই নাথান আগেই শাব্বেতাইয়ের কথা শুনেছিলেন: সম্ভবত একই সময়ে পরস্পরের কাছে অপরিচিত অবস্থায় জেরুজালেমে থাকার সময়। শাব্বেতাইয়ের 'অদ্ভুত কাজকর্মের' একটা কিছু নিশ্চয়ই নাথানের কল্পনায় ঠাঁই করে নিয়েছিল, কারণ অতিথির আগমনের অল্প আগে তাঁর সম্পর্কে একটা দৈববাণী পান তিনি। সম্প্রতি লুরিয় কাব্বালাহয় দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি, এবং পুরিমের ঠিক আগে নিজেকে বন্দি করে উপবাস পালন করে শ্লোক আবৃত্তি করার মাধ্যমে ধ্যানে বসেছিলেন। এই ধ্যানের সময় শাব্বেতাইকে দিব্যচোখে দেখতে পান তিনি ও স্বকণ্ঠে তাঁকে চিৎকার করে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করতে শুনতে পান। 'আর প্রভু এইরকম কহেন! তোমার ত্রাণকর্তার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করো। শাব্বেতাই যেভি তাঁর নাম। তিনি ক্রন্দন করবেন, হ্যাঁ, গর্জন করবেন, আমার শত্রুকে পরাস্ত করবেন।'[৪৯] সত্যিই শাব্বেতাই যখন তাঁর বাড়ির দরজায় এসে হাজির হলেন, নাথান একে কেবল ভবিষ্যদ্বাণীসুলভ সেই দিব্যদর্শনের প্রমাণ হিসাবেই কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

কেমন করে নাথানের মতো একজন মেধাবী মানুষ এই বিষণ্ন, বিপর্যস্ত মানুষটিকে নিজের ত্রাতা ভাবতে পেরেছিলেন? লুরিয় কাব্বালাহ মোতাবেক একেবারে সূচনাতেই মেসায়াহ যিমযুমের আদি প্রক্রিয়ার সময় সৃষ্ট ঈশ্বরহীন বলয়ে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং 'অন্য পক্ষের' অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য হয়েছিলেন মেসায়াহ। কিন্তু এখন, কাব্বালিস্টদের প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুশীলনের কল্যাণে নাথান বিশ্বাস করেছিলেন, এই দানবীয় শক্তিগুলো মেসায়াহর উপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছে। সময়ে সময়ে তাঁর আত্মা নিজেকে মুক্ত করে শূন্যে ভেসে যায় এবং মেসিয়ানিক যুগের নতুন বিধান অবতীর্ণ করে। কিন্তু এখনও বিজয় সম্পূর্ণ হয়নি। সময়ে সময়ে মেসায়াহ আবারও অন্ধকারের শিকারে পরিণত হন।[৫০] এসবই শাব্বেতাইয়ের ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার সাথে যেন নিখুঁতভাবে মিলে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছে। তিনি পৌঁছানোর পর নাথান তাঁকে বললেন, সমাপ্তি আসন্ন। অচিরেই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর বিজয় পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে, ইহুদি জনগণের পক্ষে মুক্তি নিয়ে আসবেন তিনি। পুরোনো আইন রদ হয়ে যাবে, এক সময়ের নিষিদ্ধ কাজ ও পাপ পবিত্র হয়ে যাবে।

প্রথমে নাথানের এই কল্পনা-বিলাসের সাথে তাল মেলাতে রাজি হননি শাব্বেতাই, কিন্তু ক্রমে তরুণ র‍্যাবাইয়ের বাগ্মীতার কাছে পরাস্ত হন তিনি, এসব অন্তত তাঁর বিচিত্র আচরণের একটা ব্যাখ্যা যুগিয়েছিল তাঁকে। ২৮শে মে, ১৬৬৫ নিজেকে মেসায়াহ ঘোষণা করেন শাব্বেতাই। আর নাথানও সাথে সাথে অচিরেই ত্রাণকর্তা অটোমান সুলতানকে পরাস্ত করবেন, ইহুদিদের নির্বাসনের অবসান ঘটাবেন ও তাদের আবার পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন, সকল জেন্টাইল জাতি তাঁর কাছে নতি স্বীকার করবে ঘোষণা দিয়ে মিশর, আলেপ্পো ও স্মিরনায় চিঠি পাঠান।[৫১] দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এই খবর। ১৬৬৬ সাল নাগাদ ইউরোপের প্রায় সমস্ত বসতি, অটোমান সাম্রাজ্য ও ইরানে শেকড় গেড়ে বসে মেসিয়ানিক উন্মাদনা। উন্মত্ত সব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল: ইহুদিরা সহায়সম্পদ বিক্রি করে প্যালেস্তাইনে পাড়ি জমানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়ে। সময়ে সময়ে মেসায়াহ কোনও উপবাস দিনের প্রথা বাতিল করেছেন বলে শুনতে পেত তারা, তখন মিছিল করে নেমে আসত রাস্তায়, নাচত। নাথান এই বলে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, ইহুদিদের সাফেদের প্রায়শ্চিত্তমূলক আচার পালন করে সমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করতে হবে। ইউরোপ, মিশর, ইরান, বালকান, ইতালি, আমস্টারডাম, পোল্যান্ড ও ফ্রান্সে ইহুদিরা উপবাস পালন করে, রাত্রি জাগরণ করে, বরফ শীতল পানিতে ডুবে থাকে, বিছুটি পাতায় গড়াগড়ি খায় এবং গরীবদের ভিক্ষা দিতে থাকে। এটা ছিল আধুনিকতার গোড়ার দিকে সূচিত অনেকগুলো মহাজাগরণের (গ্রেট অ্যাওয়াকেনিং) অন্যতম। এই সময় লোকে সহজাত প্রবৃত্তির বশেই বড় ধরনের পরিবর্তন আসার কথা জানতে পারে। খোদ শাব্বেতাই সম্পর্কে খুব অল্প লোকই বিস্তারিত জানত। আর নাথানের দুর্বোধ্য কাব্বালিস্টিক দিব্যদর্শন সম্পর্কে ওয়াকিবহালের সংখ্যা ছিল আরও কম; মেসায়াহ এসেছেন এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আশা পূরণ হতে চলেছে, এটা জানাই যথেষ্ট ছিল।[৫২] এইসব আনন্দমুখর মাসে ইহুদিরা এতটাই আশা ও প্রাণশক্তিতে জেগে উঠেছিল যে ঘেটোর কর্কশ, সীমিত জীবন মিলিয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছুর স্বাদ লাভ করেছিল তারা, অনেকের জীবনই আর কখনও আগের মতো হবে না। নতুন সম্ভাবনার আভাস পেয়েছিল ওরা, একেবারে নাগালের ভেতর মনে হয়েছে সেটা। নিজেদের মুক্ত ভেবে অনেক ইহুদিই ধরে নিয়েছিল পুরোনো জীবন চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়েছে।[৫৩]

শাব্বেতাই বা নাথানের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অধীনে আগত ইহুদিরা পরিচিত জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাখ্যান বোঝানো সত্ত্বেও তোরাহকে বাতিল করতে প্রস্তুত আছে বলে দেখিয়েছে। মেসায়াহর রাজকীয় জোব্বা গায়ে সিনাগগে গিয়ে শ্যাব্বেতাই যখন কোনও উপবাস প্রথা বাতিল করেছেন, ঈশ্বরের নিষিদ্ধ নাম

AMARBOI.COM

উচ্চারণ করেছেন, অকোশার খাবার খেয়ছেন বা সিনাগগে ঐশীগ্রন্থ পাঠ করার জন্যে মহিলাকে আহ্বান জানিয়েছেন, লোকে পরমানন্দে মেতে উঠেছে। তবে সবাই গ্রস্ত হয়নি অবশ্যই–প্রত্যেক মহল্লাতেই র‍্যাবাই ও সাধারণ মানুষ ছিলেন যাঁরা এইসব পরিবর্তনে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ধনী-গরীব সকল শ্রেণীর মানুষ শাব্বেতাইকে গ্রহণ করে নিয়েছিল ও তাঁর নৈতিকতা বিরোধিতাকে স্বাগত জানিয়েছে। আইন ইহুদিদের রক্ষা করতে পারেনি, এখনও তাতে অক্ষম বলেই মনে হচ্ছে। ইহুদিরা এখনও নির্যাতিত। এখনও নির্বাসিত; জাতি নতুন মুক্তির জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল।[৫৪]

অবশ্য, খুবই বিপজ্জনক ছিল ব্যাপারটা। লুরিয় কাব্বালাহ ছিল মিথ, বাস্তব রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এইভাবে এর রূপায়নের কথা ছিল না, বরং আত্মার অন্তস্থঃ জীবন আলোকিত করে তোলার কথা ছিল। *মিথোস* ও *লোগোস* সম্পূরক কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের উপাদান, এদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ছিল। রাজনীতি ছিল যুক্তি ও যৌক্তিকতার এখতিয়ার। মিথ একে অর্থ যুগিয়েছে। কিন্তু নাথান যেভাবে ইসাক লুরিয়ার অতীন্দ্রিয়বাদী দিব্যদৃষ্টিকে তরজমা করেছেন, সেভাবে আক্ষরিকভাবে অনূদিত হবে বলে মনে করা হয়নি। ইহুদিরা নিজেদের শক্তিশালী, মুক্ত ও নিয়তির নিয়ন্তা ভেবে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পরিপার্শ্ব বদলায়নি। তখনও দুর্বল, নাজুক ও শাসকদের সুনামের উপর নির্ভরশীল ছিল তারা। অন্ধকারের শক্তির সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত মেসায়াহর লুরিয়ানিক ইমেজ ছিল অশুভের বিরুদ্ধে সর্বজনীন সংগ্রামের শক্তিশালী প্রতীক, কিন্তু যখন এই ইমেজকে বাস্তব, আবেগের দিক থেকে অপ্রকৃতিস্থ কোনও ব্যক্তিতে কঠিন চেহারা দেওয়ার প্রয়াস পাওয়া হয়, তার ফল কেবল বিপর্যয়করই হতে পারে।

সত্যিই তাই প্রমাণিত হয়েছিল। ১৬৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নাথানের আশীর্বাদ নিয়ে সুলতানের মুখোমুখি হতে রওয়ান হন শাব্বেতাই। বোধগম্যভাবেই বুনো ইহুদি উৎসাহের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন সুলতান, যৌক্তিকভাবেই বিদ্রোহের আশঙ্কা করছিলেন তিনি। গ্যালিপোলির কাছে শাব্বেতাই অবতরণ করার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যাওয়া হয়, হাজির করা হয় সুলতানের সামনে। মৃত্যুদণ্ড বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ভেতর যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তাঁকে। সারা পৃথিবীর ইহুদিদের সন্ত্রস্ত করে ইসলাম বেছে নেন শাব্বেতাই। ধর্মদ্রোহীতে পরিণত হন মেসায়াহ।

এখানেই ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল। বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শাব্বেতাইয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, প্রবল গ্লানি নিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবন ও তোরাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণে ফিরে যায় তারা; পুরো দুঃখজনক ব্যাপারটাকে ভুলে যাওয়া প্রয়াস পায়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু একটা দল মুক্তির স্বপ্ন

AMARBOI.COM

বিসর্জন দিতে পারেনি। ওরা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, ওই উত্তেজনাকর মাসগুলোয় ওদের মুক্তির অভিজ্ঞতা স্রেফ কুহক ছিল, এক ধর্মদ্রোহী মেসায়াহর সাথে মানিয়ে নিতে পেরেছিল তারা, ঠিক আদি ক্রিশ্চানরা যেভাবে সাধারণ অপরাধীর মতো মৃত্যুবরণকারী একজন মেসায়াহর একই রকম কেলেঙ্কারীজনক ধারণাকে মেনে নিয়েছিল।

প্রবল বিষণ্ণতার একটা সময় পার করে নিজস্ব ধর্মতত্ত্বে পরিবর্তন আনেন নাথান। মুক্তির সূচনা ঘটেছে, ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, কিন্তু একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। অপবিত্রতার আরও গভীর বলয়ে অবতরণে বাধ্য হয়েছেন শাব্বেতাই, স্বয়ং তিনি অশুভের রূপ ধারণ করেছেন। এটাই ছিল 'চূড়ান্ত পবিত্র পাপ,' *তিক্কুনের* শেষ কাজ।[৫৫] শাব্বেতাইয়ের প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে যাওয়া শাব্বেতিয়রা ভিন্ন ভিন্নভাবে এই পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দেয়। আমস্টারডামে খুবই জনপ্রিয় ছিল নাথানের ধর্মতত্ত্ব: এবার মেসায়াহ ইহুদিবাদের মূলকে আঁকড়ে থেকে মারানোতে পরিণত হয়েছেন, বাইরে বাইরে ইসলামের অনুসারী হওয়ার ভান করছেন।[৫৬] অনেক আগে থেকেই তোরাহ নিয়ে সমস্যায় আক্রান্ত মারানোরা মুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ামাত্র এর অবসান কামনা করেছে। অন্য ইহুদিরা বিশ্বাস করেছে যে, মেসায়াহ সম্পূর্ণ মুক্তি না আনা পর্যন্ত তাদের তোরাহ অনুসরণ করতে হবে; তবে এরপর এক নতুন আইনের প্রবর্তন করবেন তিনি, যা সবদিক থেকেই পুরোনো আইনের বিরোধিতা করবে। রেডিক্যাল শাব্বেতিয়দের একটা ছোট গোষ্ঠী আরও সামনে অগ্রসর হয়েছিল। সাময়িক ভিত্তিতেও আর পুরোনো আইনে প্রত্যাবর্তন করতে পারছিল না তারা, তাদের বিশ্বাস ছিল ইহুদিদেরও মেসায়াহকে অনুসরণ করে অশুভের বলয়ে গিয়ে ধর্মদ্রোহীতে পরিণত হতে হবে। মুলধারার ধর্ম বিশ্বাস বেছে নেয় তারা–ইউরোপে ক্রিশ্চান ধর্ম এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম–কিন্তু আপন ঘরের সীমানায় ইহুদিই রয়ে গেছে।[৫৭] এই রেডিক্যাল ইহুদিরা একটা আধুনিক সমাধানও দেখতে পেয়েছিল: অনেক ক্ষেত্রেই বহু ইহুদি জেন্টাইল সংস্কৃতির সাথে মিশে যাবে, কিন্তু ভিন্ন স্তরে বিচ্ছিন্ন রেখে নিজেদের বিশ্বাস ব্যক্তিকরণ করেছে।

শাব্বেতিয়রা ভেবেছিল শাব্বেতাই বুঝি মহাকষ্টে তাঁর দ্বৈত জীবন যাপন করছেন, কিন্তু আসলে মুসলিম পরিচয়ে দারুণ সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। ইসলামের পবিত্র আইন শরীয়াহ পাঠ করে দিন কাটাচ্ছিলেন আর সুলতানের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টাদের ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। অতিথিদের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাঁকে, দরবার বসাতেন তিনি, সারা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ইহুদি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। শাব্বেতাইয়ের অনন্য ধার্মিকতার কথা বলত তারা। অনেক সময় শাব্বেতাইকে নিজের বাড়িতে

AMARBOI.COM

তোরাহ স্ক্রোল হাতে হাইম গাইতে দেখা যেত; লোকে তাঁর ভক্তি ও অন্য লোকের অনুভূতিতে তাঁর সহানুভূতির সাথে প্রবেশের ক্ষমতায় বিস্ময়ে অভিভূত হত।[৫৮] শাব্বেতাই গোষ্ঠীর ধারণা আর নাথান গোষ্ঠীর ধারণা একেবারেই ভিন্ন ছিল এবং জেন্টাইলদের প্রতি ঢের বেশি ইতিবাচক। শাব্বেতাই যেন সকল ধর্মবিশ্বাসকেই বৈধ বিবেচনা করেছিলেন। নিজেকে ইসলাম ও ইহুদিবাদের ভেতর সেতুবন্ধ হিসাবে কল্পনা করেছেন তিনি; আবার খৃস্টধর্ম ও জেসাসকে নিয়েও অভিভূত ছিলেন। অতিথিরা জানিয়েছেন যে, অনেক সময় তিনি মুসলিমের মতো আচরণ করতেন, অবার অনেক সময় র‍্যাবাইয়ের মতো। অটোমানরা ইহুদি উৎসব পালনের অনুমতি দিয়েছিল তাঁকে। শাব্বেতইকে প্রায়ই এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে তোরাহ স্ক্রোল নিতে দেখা যেত।[৫৯] সিনাগগে শাব্বেতাই ইহুদিদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করতেন; কেবল তাহলেই, বলতেন তিনি, পবিত্র ভূমিতে ফিরে যেতে পারবে তারা। ১৬৬৯ সালে লেখা এক চিঠিতে বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারটি জোরের সাথে অস্বীকার করেন শাব্বেতাই, তিনি মন্তব্য করেন, ইসলাম ধর্ম 'প্রকৃতই সত্যি,' তাঁকে জেন্টাইল ও ইহুদি উভয় পক্ষের জন্যে মেসায়াহ হিসাবে পাঠানো হয়েছে।[৬০]

১৬৭৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর শাব্বেতাইয়ের মৃত্যু ছিল শাব্বেতিয়দের জন্যে এক প্রবল আঘাত, কারণ এতে মুক্তির সমস্ত আশাই তিরোহিত হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে। তাসত্ত্বেও গোষ্ঠীটি গোপনে অস্তিত্ব বজায় রাখে; তারা দেখিয়ে দেয় যে মেসিয়ানিক বিস্ফোরণ কোনও হুজুগে ঘটনা ছিল না; বরং ইহুদি অভিজ্ঞতার কোনও মৌলিক জায়গা স্পর্শ করেছে। অনেকের কাছে এই ধর্মীয় আন্দোলন একটা সেতুবন্ধ ছিল যা তাদের পরে যৌক্তিক আধুনিকতায় উত্তরণের কঠিন পর্ব পার হতে সাহায্য করবে। অনেকেই যেমন দ্রুততার সাথে তোরাহকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল, এবং এক নতুন বিধানের স্বপ্ন দেখার বেলায় শাব্বেতিয়দের অটলতা দেখায় যে পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্যে তৈরি ছিল তারা।[৬১] শাব্বেতাই ও শাব্বেতিয় মতবাদের উপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থের লেখক গারশোম শোলেম যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এই ক্ষুদ্র শাব্বেতিয় গোষ্ঠীই ইহুদি আলোকন বা সংস্কার আন্দোলনের অগ্রপথিকে পরিণত হবে। প্রাগের জোসেফ হোয়াইটের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তিনি। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনিই প্রথম পূর্ব ইউরোপে আলোকনের ধারণার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। শাব্বেতিয় ছিলেন তিনি। হাঙেরিতে সংস্কার আন্দোলন সূচিতকারী আরন শোভিনও তরুণ বয়সে শাব্বেতিয় ছিলেন।[৬২] শোলেমের তত্ত্বের বিরোধিতা করা হয়েছে; একে প্রত্যাক্ষভাবে সত্যি বা মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে এটা মেনে নেওয়া হয় যে, শাব্বেতিয়বাদ

AMARBOI.COM

প্রচলিত রাব্বিনিক কর্তৃত্বকে খাট করার বেলায় ভালো ভূমিকা রেখেছে এবং ইহুদিদের টাবু ও অসম্ভব মনে করা পরিবর্তনের কথা ভাবতে শিখিয়েছে।

শাব্বেতাইয়ের মৃত্যুর পর দুটো রেডিক্যাল শাব্বেতিয় আন্দোলন ইহুদিদের প্রধান ধর্মে গণ ধর্মান্তরের দিকে চালিত করেছিল। ১৬৮১ সালে অটোমান তুরস্কের আনুমানিক ২০০ পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। *দোনমেহদের* ('ধর্মান্তরিত') এই গোষ্ঠীটির নিজেদের সিনাগগ ছিল, তবে মসজিদেও প্রার্থনা করত তারা। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে তুঙ্গ সময়ে গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৫,০০০ জনে।[৬৩] উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এটি ভেঙে যেতে শুরু করে, সদস্যরা এই সময় আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষা লাভ করছিল ও ধর্মের প্রয়োজন আছে মনে করছিল না। কিছু সংখ্যক *দোনমেহ* তরুণ ১৯০৮ সালের সেক্যুলারিস্ট তরুণ তুর্কি বিদ্রোহে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনগুলোর দ্বিতীয়টি ছিল আরও ভয়ঙ্কর ও তা মিথের আক্ষরিক অনুবাদের ফলে গড়ে ওঠা নৈরাজ্যবাদের নজীর দেখিয়েছে। জ্যাকব ফ্রাংক (১৭২৬-৯১) বালকান সফরের সময় শাব্বেতিয়বাদে দীক্ষা লাভ করেন। নিজ দেশ পোল্যান্ডে ফেরার পর এক গোপন গোষ্ঠী গড়ে তোলেন তিনি যার সদস্যরা প্রকাশ্যে ইহুদি বিধান পালন করত, কিন্তু গোপনে নিষিদ্ধ যৌন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকত। ১৭৫৬ সালে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হলে ফ্রাংক প্রথমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন (তুরস্কে এক সফরকালে) এবং সদলবলে আবার ক্যাথলিক মতবাদে দীক্ষা নেন।

ফ্রাংক স্রেফ তোরাহর নিষেধাজ্ঞা ঝেড়ে ফেলেননি, বরং ইতিবাচকভাবে অনৈতিকতাকে আলিঙ্গন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে তোরাহ কেবল সেকেলেই নয়, বরং বিপজ্জনক ও অর্থহীন হয়ে গেছে। কমান্ডমেন্টসমূহ মৃত্যুর আইন, সুতরাং একে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। পাপ ও লজ্জাহীনতাই মুক্তি লাভ ও ঈশ্বরকে পাওয়ার একমাত্র পথ। নির্মাণ করতে নয়, বরং 'ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করতেই'[৬৪] এসেছেন ফ্রাংক। তাঁর অনুসারীরা সকল ধর্মীয় বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল: 'তোমাদের বলে দিচ্ছি, যোদ্ধাদের অবশ্যই ধর্মহীন হতে হবে, যার মানে তোমাদের অবশ্যই নিজের শক্তিতে মুক্তি লাভ করতে হবে।'[৬৫] আজকের দিনের অনেক রেডিক্যাল সেক্যুলারিস্টের মতো ফ্রাংক সকল ধর্মকেই ক্ষতিকর হিসাবে দেখেছেন। তাঁর আন্দোলন গড়ে ওঠার সাথে সাথে ফ্রাংকবাদীরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে, এক বিরাট বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল তারা যার ভেতর দিয়ে অতীত ভেসে যাবে, জেগে উঠবে এক নতুন পৃথিবী। ফরাসী বিপ্লবকে তারা তাদের স্বপ্নের সত্যতার আলামত ও তাদের পক্ষে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ভেবেছে।[৬৬]

ইহুদিরা আধুনিক কালের বহু ভঙ্গিমারই আভাস দিয়েছে। ইউরোপের আগ্রাসীমূলক আধুনিকায়নের সমাজের সাথে বেদনাদায়ক সংঘাত তাদের

AMARBOI.COM

সেক্যুলারিজম, সংশয়বাদ, নাস্তিক্যবাদ, যুক্তিবাদ, নৈরাজ্যবাদ, ইহত্ত্ববাদ ও ধর্মের ব্যক্তিকরণের মতো নানা ধারণার দিকে চালিত করেছে। অধিকাংশ ইহুদির কাছে পশ্চিমে গড়ে উঠতে থাকা উন্নয়নের পথটি ধর্মের ভেতর দিয়েই অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু এই ধর্ম বিংশ শতাব্দীতে আমরা যে ধর্মের সাথে অভ্যস্ত তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। অনেক বেশি পৌরাণিক ভিত্তিক ছিল তা; আক্ষরিকভাবে ঐশীগ্রন্থ পাঠ করত না এবং নতুন নতুন সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল, যেগুলোর কোনও কোনওটা নতুন কিছুর সন্ধানের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর মনে হয়েছে। প্রাক আধুনিক সমাজে ধর্মের ভূমিকা বোঝার জন্যে আমাদের মুসলিম জগতের দিকে নজর দিতে হবে, আধুনিকতার গোড়ার দিকে তার নিজস্ব উত্থান-পতনের পর্যায় অতিক্রম করছিল এই ধর্ম এবং ভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিকতা গড়ে তুলছিল যা আধুনিক কালেও মুসলিমদের প্রভাবিত করে চলবে।

AMARBOI.COM

২. মুসলিম: রক্ষণশীল চেতনা (১৪৯২–১৭৯৯)

১৪৯২ সালে পশ্চিমে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হতে চলা নতুন ব্যবস্থার অন্যতম শিকার ছিল ইহুদিরা। ওই গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলোর অন্য শিকার ছিল স্পেনের মুসলিমরা, ইউরোপে ঘাঁটি হারিয়েছিল তারা। কিন্তু ইসলাম কোনও দিক থেকেই পরাস্ত শক্তি ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে তখনও তা বিশ্ব পরাশক্তি ছিল। যদিও সুঙ রাজবংশ (৯৬০-১২৬০) চীনকে সামাজিক জটিলতা ও শক্তির দিক থেকে ইসলামি জগতের চেয়ে অনেক উঁচু স্তরে নিয়ে গিয়েছিল ও ইতালিয় রেনেসাঁ এক সাংস্কৃতিক আলোকনের সূচনা ঘটিয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যকে সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম করে তুলবে, তবু মুসলিমরা প্রথম দিকে অনায়াসে এইসব চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে পেরেছে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। মুসলিমরা গোটা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু তারা মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকায় এমন বিস্তৃত ও কৌশলগতভাবে ছড়িয়ে ছিল যে এই সময় ইসলামী জগৎকে আধুনিককালের গোড়ার দিকের সভ্য জগতের অধিকাংশ এলাকার ধ্যানধারণা তুলে ধরা বিশ্ব ইতিহাসের একটি মাইক্রোকোসম হিসাবে দেখা যেতে পারে। মুসলিমদের পক্ষে এটা ছিল এক উত্তেজনাকর ও উদ্ভাবনী কাল: ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনটি নতুন ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল: এশিয়া মাইনর, আনাতোলিয়া, ইরাক, সিরিয়া, ও উত্তর আফ্রিকায় অটোমান সাম্রাজ্য; ইরানে সাফাভিয় সাম্রাজ্য; ও ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য। প্রতিটি সাম্রাজ্য ইসলামি আধ্যাত্মিকতার ভিন্ন ভিন্ন চেহারা তুলে ধরেছিল। মুঘল সাম্রাজ্য ফালসাফাহ নামে পরিচিত সহিষ্ণু বিশ্বজনীন দার্শনিক যুক্তিবাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে; সাফাভিয় শাহগণ এপর্যন্ত অভিজাত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস শিয়া ধর্মমতকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করেছিলেন; এবং সুন্নী ইসলামের প্রতি ভীষণভাবে অনুগত রয়ে যাওয়া অটোমান তুর্কিরা পবিত্র মুসলিম বিধান শরীয়াহর ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

AMARBOI.COM

এই তিনটি সাম্রাজ্য ছিল এক বিচ্যুতি। তিনটিই প্রাথমিক আধুনিক প্রতিষ্ঠান ছিল, পদ্ধতিগতভাবে আমলাতান্ত্রিক ও যৌক্তিক নির্ভুলতার সাথে এগুলো পরিচালিত হত। গোড়ার দিকের বছরগুলোতে অটোমান রাষ্ট্র ইউরোপের অন্য যেকোনও রাজ্যেও চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী ছিল। সুলতান দ্য ম্যাগনিফিশেন্টের (১৫২০-৬৬) শাসনামলে তা শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছায়। গ্রিস, বালকান্স ও হাঙেরি হয়ে পশ্চিমে রাজ্য বিস্তৃত করেন সুলাইমান। ইউরোপের অভ্যন্তরে তাঁর অগ্রযাত্রা কেবল ১৫২৯ সালে ভিয়েনা অধিকারে ব্যর্থতার কারণেই প্রতিহত হয়েছিল। সাফাভিয় ইরানে শাহগণ অনেক সড়ক ও কারাভানসরাই নির্মাণ করেন ও অর্থনীতিকে সংহত রূপ দেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশকে সামনের কাতারে নিয়ে আসেন তাঁরা। সবগুলো সাম্রাজ্যই ইতালিয় রেনেসাঁর সমমানের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ উপভোগ করেছে। অটোমান স্থাপত্যকলা, সাফাভিয় শিল্পকলা ও তাজমহলের জন্যে এক মহান সময় ছিল ষোড়শ শতাব্দী।

কিন্তু তাসত্ত্বেও এসবই ছিল আধুনিকায়নের পথে চলা সমাজ, এরা কোনও রেডিক্যাল পরিবর্তন বাস্তবায়ন করেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়া বিপ্লবী রীতিনীতির অংশীদার ছিল না তারা। বরং এই সাম্রাজ্যগুলো যা প্রকাশ করেছে তাকে আমেরিকান পণ্ডিত মার্শাল জি.এস. হজসন বলেছেন ইউরোপসহ সকল প্রাক আধুনিক সমাজেরই বৈশিষ্ট্য 'রক্ষণশীল চেতনা'।[১] প্রকৃতপক্ষেই এই সাম্রাজ্যগুলো ছিল রক্ষণশীল মানসিকতার শেষ রাজনৈতিক প্রকাশ; প্রাক আধুনিক কালের সবচেয়ে অগ্রসর রাষ্ট্র ছিল বলে বলা যেতে পারে এগুলো তার সমগ্রকে তুলে ধরেছে।[২] আজ রক্ষণশীল সমাজ বিপদে রয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্য রীতি কার্যকরভাবে অধিকার করে নিয়েছে তাকে কিংবা রক্ষণশীল থেকে আধুনিক চেতনায় উত্তরণের কঠিন পথে অগ্রসর হচ্ছে। অধিকাংশ মৌলবাদই এই বেদনাদায়ক উত্তরণের প্রতি সাড়া। সুতরাং, এই মুসলিম সাম্রাজ্যের তুঙ্গ অবস্থায় রক্ষণশীল চেতনাকে পরখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমরা এর আবেদন ও শক্তি এবং সেই সাথে সহজাত সীমাবদ্ধতাগুলোও উপলব্ধি করতে পারি।

পাশ্চাত্য (পুঁজি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে) সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সভ্যতা নিয়ে আসার আগে, উনবিংশ শতাব্দীর আগে যার অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়নি, সকল সংস্কৃতিই অর্থনৈতিকভাবে উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এর মানে, যেকোনও কৃষি নির্ভর সমাজের বিস্তার ও সাফল্যের একটা সীমাবদ্ধতা ছিল, কেননা শেষ পর্যন্ত তার সম্পদ ও দায়িত্ব ফুরিয়ে ফেলবে। বিনিয়োগের জন্যে প্রাপ্য পুঁজির সীমাবদ্ধতা ছিল। বিরাট পুঁজির প্রয়োজন হতে পারে এমন যেকোনও উদ্ভাবনকে নাকচ করে দেওয়া হত, কারণ লোকের সমস্ত কিছু ভেঙে ফেলে, কর্মচারীদের বহাল

রেখে আবার নতুন করে শুরু করার কোনও উপায় ছিল না। পশ্চিমে আজ যাকে আমরা নিশ্চিত ধরে নিই, আমাদের সংস্কৃতির আগের কোনও সংস্কৃতিই অব্যাহত উদ্ভাবনকে সামাল দিতে পারেনি। এখন আমরা আমাদের বাবা-মায়ের প্রজন্ম থেকে বেশি জানবার প্রত্যাশা করি, আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, আমাদের প্রজন্ম ক্রমেই আরও প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর হয়ে উঠবে। আমরা ভবিষ্যৎমুখী, আমাদের সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আগামীর দিকে তাকাতে হয় ও আগামী প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে এমন বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। এটা স্পষ্ট হবে যে, আমাদের এই সমাজ স্থিতিশীল একরোখা যুক্তিবাদী ভাবনার ফল। এটা *লোগোসের* সন্তান, যা সবসময়ই সামনে তাকায়, আরও জানতে চায় ও আমাদের ক্ষমতার সীমানা বাড়াতে চায়। কিন্তু কোনও যৌক্তিক ভাবনাই একটি আধুনিক অর্থনীতি ব্যতীত এই আগ্রাসীভাবে উদ্ভাবনী সমাজ গড়ে তুলতে পারত না। নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব করে তোলার জন্যে পাশ্চাত্য সমাজগুলোর পক্ষে অবকাঠামো বদলে ফেলা অসম্ভব নয়, কেননা পুঁজির অবিরাম পুনর্বিনিয়োগের ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের মৌল সম্পদ বাড়িয়ে তুলতে পারি যাতে তারা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে তাল মেলাতে পারে। কিন্তু কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে এটা সম্ভব ছিল না, এখানে লোকে ইতিমধ্যে যা কিছু অর্জিত হয়েছে তাকেই টিকিয়ে রাখতে শক্তি ব্যয় করত। একারণে প্রাক আধুনিক কালের 'রক্ষণশীল' প্রবণতা কোনও মৌল ভীরুতা থেকে উৎপন্ন হয়নি, বরং এই ধরনের সংস্কৃতির বাস্তবসম্মত মূল্যায়নই তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা মূলত পালাক্রমিক জানার ব্যাপার ছিল, এখানে কোনওরকম মৌলিকত্বকে উৎসাহিত করা হত না। কারণ সমাজ সাধারণভাবে ধারণ করতে পারত না বলে ছাত্রদের কোনও রেডিক্যাল নতুন ধারণা ভাবতে উৎসাহিত করা হত না; সুতরাং, এই ধরনের ভাবনা সামাজিকভাবে বিধ্বংসী হয়ে গোটা সম্প্রদায়কে বিপদাপন্ন করে তুলতে পারত। রক্ষণশীল সমাজে সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বাক স্বাধীনতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত।

আধুনিকদের মতো ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর বদলে প্রাক আধুনিক সমাজগুলো অনুপ্রেরণার জন্যে অতীতের দিকে মুখ ফেরাত। অবিরাম উন্নয়নের প্রত্যাশার বদলে ধরে নেওয়া হত যে পরবর্তী প্রজন্ম অনায়াসে অতীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। সাফল্যের নতুন চূড়ায় আরোহণের বদলে সমাজগুলো আদিম নিখুঁত অবস্থা থেকে অবনত হয়েছে বলে মনে করা হত। এই কল্পিত সোনালি যুগকে সরকার ও ব্যক্তি বিশেষের জন্যে আদর্শ মনে করা হত। অতীতের এই আদর্শের কাছাকাছি যাওয়ার ভেতর দিয়েই কেবল কোনও সমাজ তার সম্ভাবনাকে পূর্ণ করতে পারত। সভ্যতাকে সহজাতভাবে নাজুক মনে করা হত। সবাই জানত,

AMARBOI.COM

পঞ্চম শতকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপের মতো যেকোনও দেশই বর্বর কালে পতিত হতে পারে। ইসলামি বিশ্বে আধুনিক কালের গোড়ার দিকে ত্রয়োদশ শতকের মঙ্গোল আগ্রাসনের স্মৃতি তখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি। গণহত্যা, আগুয়ান দস্যু দলের হাত থেকে বাঁচতে সাধারণ মানুষের পলায়ন, ব্যাপক দেশান্তর, একের পর এক মহান ইসলামি শহরের ধ্বংসলীলা তখনও সন্ত্রাসে স্মরণ করা হচ্ছিল। লাইব্রেরি ও শিক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্রও ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল।

সেই সাথে শত শত বছরের কষ্টে সংগৃহীত জ্ঞানও হারিয়ে গিয়েছিল। মুসলিমরা সামলে নিয়েছিল; সুফি অতীন্দ্রিয়বাদীরা এক আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণে নেতৃত্ব দেন, যা লুরিয় কাব্বালাহর মতোই উপশমকারী বলে প্রমণিত হয়েছে; তিনটি নতুন সাম্রাজ্য ছিল সেই পুনরুজ্জীবনেরই নিদর্শন। অটোমান ও সাফাভিয় রাজবংশগুলোর মূল নিহিত ছিল মঙ্গোল যুগের ব্যাপক স্থানচ্যুতির ভেতর, দুটোই জন্ম নিয়েছে উগ্র *গাযু* রাষ্ট্রে, এগুলো সর্দার যোদ্ধার হাতে পরিচলিত হত ও প্রায়শঃই কোনও সুফি ত্বরিকার সাথে সম্পর্কিত ছিল। প্রলয়ঙ্করী ঘটনার সময় যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই সাম্রাজ্যগুলোর শক্তি ও সৌন্দর্য ছিল ইসলামি মূল্যবোধের পুনরুত্থান ও মুসলিম ইতিহাসের আবার সঠিক পথে প্রত্যাবর্তনের গর্বিত উচ্চারণ। কিন্তু এমন মাত্রার বিপর্যয়ের পর প্রাক আধুনিক সমাজের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা আরও প্রকট হয়ে ওঠাটাই ছিল স্বাভাবিক। লোকে সম্পূর্ণ নতুন কিছুর সন্ধান করার বদলে বরং যা কিছু হারিয়ে গেছে তাকেই আবার ধীরে ধীরে কষ্টের সাথে ফিরে পাবার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, সুন্নি ইসলামে–ধর্মের অধিকাংশ মুসলিমের অনুসৃত ভাষ্য, অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম–এই মর্মে ঐকমত্য স্থাপিত হয় যে *'ইজতিহাদের দুয়ার'* ('স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগ') রুদ্ধ হয়ে গেছে। এতদিন পর্যন্ত মুসলিম জুরিস্টদের কোরান বা কোনও প্রতিষ্ঠিত ট্র্যাডিশনে স্পষ্ট জবাব দেওয়া হয়নি এমনসব আদর্শ ও বিধিবিধান সংক্রান্ত উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান বের করার লক্ষ্যে নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রয়োগের অনুমতি ছিল। কিন্তু আধুনিক কালের গোড়ার দিকে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঐতিহ্য রক্ষার জন্যে সুন্নি মুসলিমরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে স্বাধীন ভাবনার আর প্রয়োজন নেই। সমস্ত উত্তর তৈরি রয়েছে, শরীয়াহই সমাজের স্থায়ী নীল নকশা; *ইজতিহাদের* প্রয়োজনও নেই, তা কাঙ্ক্ষিতও নয়। মুসলিমদের বরং অবশ্যম্ভাবীভাবে অতীতের অনুসরণ *(তাকলিদ)* করতে হবে। নতুন সমাধান সন্ধানের পরিবর্তে তাদের উচিত হবে প্রতিষ্ঠিত আইনি সারগ্রন্থে প্রাপ্য বিধির প্রতি নতি স্বীকার করা। আইন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন *(বিদাহ)*-কে আধুনিক

AMARBOI.COM

কালের গোড়ার দিকে সুন্নি ইসলামি জগতে ক্রিশ্চান পাশ্চাত্যের মতবাদগত বিষয়ে ধর্মদ্রোহের মতোই বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও বিপজ্জনক মনে করা হত।

প্রবল রকম প্রতিমাবিরোধী আধুনিক পাশ্চাত্যের সাথে এরচেয়ে বেশি বেমানান প্রবণতা কল্পনা করা কঠিন। আমাদের যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতার উপর ইচ্ছাকৃত বাধা আরোপ এখন ঘৃণিত। পরের অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখব, লোকে কেবল এই ধরনের বাধা ছুঁড়ে ফেলতে প্রস্তুত হলেই আধুনিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। পাশ্চাত্য আধুনিকতা *লোগোসের* ফল হয়ে থাকলে *মিথোস* কীভাবে প্রাক আধুনিক বিশ্বের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল চেতনার সহায়ক ছিল সেটা বোঝা সহজ। পৌরাণিক ধ্যানধারণা অতীতমুখী, সামনে তাকায় না। পবিত্র সূচনা, আদিম ঘটনা, কিংবা মানুষের জীবনের ভিত্তির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। নতুন কিছুর সন্ধান করার বদলে মিথ অটল কোনও কিছুর দিকে দৃষ্টি দেয়। আমাদের জন্যে এটা কোনও 'সংবাদ' বয়ে আনে না, বরং সবসময় কী ছিল সেই কথা বলে। গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কিছুই চিন্তা করা হয়ে গেছে, অর্জিত হয়েছে। আমাদের পূর্ব পুরুষদের কথার উপর, বিশেষ করে পবিত্র টেক্সটের উপর ভিত্তি করে আমরা বেঁচে থাকি, আমাদের যা কিছু জানার তার সবই তা জানিয়ে দিয়েছে। এটাই ছিল রক্ষণশীল কালের চেতনা। কাল্ট, আচরিক অনুশীলন ও পৌরাণিক বিবরণ ব্যক্তিকে কেবল তার গভীরতর অবচেতনে অনুরণন তোলা অর্থই যোগাত না, বরং কৃষি নির্ভর সমাজে টিকে থাকার জন্যে জরুরি প্রবণতা ও এর সহজাত সীমাবদ্ধতাকে শক্তিশালী করে তুলত। শাব্বেতাই যেভি কেলেঙ্কারী যেমন স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, মিথের বাস্তব পরিবর্তন ঘটানোর কথা নয়। এটা মনের একটা অবস্থা তৈরি করে যা চলমান পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয় ও সমরূপতা অর্জন করে। অনিরুদ্ধ উদ্ভাবনকে স্থান দিতে অপারগ সমাজে এটা আবশ্যক ছিল।

পরিবর্তনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানকারী পাশ্চাত্য সমাজে বসবাসকারী মানুষের পক্ষে যেমন মিথোলজির ভূমিকা বোঝা কঠিন—এমনকি অসম্ভব; তেমনি গভীর ও জোরালভাবে রক্ষণশীল আধ্যাত্মিকতায় গড়ে ওঠা মানুষের পক্ষেও আধুনিক সংস্কৃতির অগ্রসর গতিশীলতা গ্রহণ করা দারুণভাবে কঠিন—এমনকি অসম্ভবও। আবার, এখনও প্রথাগত পৌরাণিক মূল্যবোধে লালিত জাতিকে বোঝাও আধুনিকতাবাদীর পক্ষে যারপরনাই কঠিন। আমরা যেমন দেখব, বর্তমান ইসলামি বিশ্বে কোনও কোনও মুসলিম দুটো বিষয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। প্রথমত, তারা পাশ্চাত্য সমাজের ধর্মকে রাজনীতি থেকে, চার্চকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নকারী সেক্যুলারিজমকে ঘৃণা করে; দ্বিতীয়ত, অনেক মুসলিমই তাদের সমাজ ইসলামের পবিত্র আইন শরীয়া আইন অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া দেখতে চায়। এটা আধুনিক চেতনায় গড়ে ওঠা

AMARBOI.COM

মানুষের চোখে দারুণভাবে বিভ্রান্তিকর; তারা যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই ভেবে ভীত যে একটা যাজকীয় প্রতিষ্ঠান তাদের চোখে স্বাস্থ্যকর সমাজের জন্যে আবিশ্যিক অবিরাম প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে। এরা চার্চ ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নকরণের সুবিধা ভোগ করেছে, তাই ইনকুইজিশনের মতো কোনও প্রতিষ্ঠান '*ইজতিহাদের* দুয়ার বন্ধ করে দিচ্ছে' ভেবে শিউরে ওঠে। একই ভাবে প্রত্যাদেশ মারফত পাওয়া স্বর্গীয় বিধানের ধারণাও আধুনিক রীতিনীতির সাথে বেমানান। আধুনিক সেক্যুলারিস্টরা কোনও অতিমানবীয় সত্তা কর্তৃক মানবজাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া অপরিবর্তনীয় আইনের ধারণা বিতৃষ্ণার উদ্রেককারী মনে করে। তারা মনে করে, আইন *মিথোস* থেকে নয়, বরং *লোগোস* থেকে উদ্ভুত। এটা যৌক্তিক ও বাস্তবভিত্তিক, চলমান অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যে একে সময়ে সময়ে পরিবর্তনযোগ্য হতে হবে। সুতরাং, এইসব মূল ইস্যুই আধুনিকতাবাদীদের মুসলিম মৌলবাদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

অবশ্য তুঙ্গ অবস্থায় শরীয়া আইনের ধারণা দারুণভাবে সন্তোষজনক ছিল। এটা ছিল ইসলামি আইনের প্রতি আনুগত্য থেকে বৈধতা লাভ করা অটোমান সাম্রাজ্যের সাফল্য। সুলতানকে শরীয়াহ আইনের রক্ষক হিসাবে শ্রদ্ধা করা হত। এমনকি সুলতান ও বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের নিজস্ব *দিওয়ান*-খাস মহল-যেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হত-থাকলেও শরীয়াহ আদালতের (অটোমানরাই প্রথম একে পদ্ধতিগতভাবে সংগঠিত করেছিল) সভাপতিত্বকারী *কাজিরাই* বিচারকের সীলমোহর হিসাবে বিবেচিত হতেন। *কাজি*, তাদের পরামর্শক *মুফতি* ও *মাদ্রাসায়* ইসলামি জুরিসপ্রুডেন্সের শিক্ষাদানকারী পণ্ডিতগণ *(ফিকহ্)* সবাই ছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। তাঁরা সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মতোই সরকারের পক্ষে আবশ্যক ছিলেন। সুলতানের কর্তৃত্ব ধর্মীয় পণ্ডিত *উলেমাদের* মাধ্যমে মধ্যস্থতা করা হত বলে বিভিন্ন আরব প্রদেশের বাসিন্দারা তুর্কিদের আধিপত্য মিনে নিতে পেরেছিল, এদের পেছনে ইসলামি আইনের পবিত্র কর্তৃত্ব ছিল। সুতরাং সেই হিসাবে ইস্তাম্বুল ও বিভিন্ন প্রদেশের ভেতর *উলেমাগণ* সুলতান ও প্রজাদের ভেতর সম্পর্কের একটা উপায় ছিলেন। তাঁরা ক্ষোভের কথা সুলতানের কানে তুলতে পারতেন ও এমনকি ইসলামি বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলে তাঁকেও ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। সুতরাং, *উলেমারা* অটোমান রাষ্ট্রকে নিজেদের রাষ্ট্র মনে করতে পারতেন; আর সুলতানগণ অংশীদারি তাঁদের ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল বলে তাঁদের উপর যাজকদের আরোপিত বাধা মেনে নিতেন।[৪] অটোমান সাম্রাজ্যের মতো আর কখনওই শরীয়া আইন রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে এভাবে প্রধান ভুমিকা রাখতে পারেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্যের

সাফল্য দেখিয়েছে যে, ইসলামি আইনের প্রতি আনুগত্য সত্যিই তাঁদের সঠিক পথে নিয়ে এসেছিল। অস্তিত্বের মৌল নীতিমালার সাথে একই ছন্দে অবস্থান করছিলেন তাঁরা।

সকল রক্ষণশীল সমাজ (যেমন ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে) এক সোনালি যুগের মুখাপেক্ষী থাকে; অটোমান সাম্রাজ্যের সুন্নি মুসলিমদের জন্যে সেটা ছিল পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) (c. ৫৭০-৬৩২সিই) ও তাঁর অব্যবহিত পরের প্রথম চার *রাশিদুন* ('সঠিকপথে পরিচালিত') খলিফা। তাঁরা ইসলামি আইন অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করেছিলেন। ধর্ম ও রাষ্ট্রের কোনও বিচ্ছিন্নতা ছিল না। মুহাম্মদ (স) ছিলেন একাধারে ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক প্রধান। সপ্তম শতাব্দীর আরববাসীদের জন্যে তাঁর নিয়ে আসা প্রত্যাদিষ্ট ঐশীগ্রন্থ কোরান জোর দিয়েছে যে, একজন মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায়বিচার ভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ গঠন করা যেখানে দরিদ্র ও দুস্থ জনগণের প্রতি সম্মানের সাথে আচরণ করা হবে। এর জন্যে প্রয়োজন সকল ক্ষেত্রে *জিহাদের* (একটি শব্দ 'পবিত্র যুদ্ধে'র পরিবর্তে–যেমনটা পাশ্চাত্যবাসীরা প্রায়ই ধরে নেয়–যার অনুবাদ হওয়া উচিত 'প্রয়াস' বা 'সংগ্রাম'।): আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত, সামরিক ও অর্থনৈতিক। আল্লাহকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজ গঠনের মাধ্যমে ও মানবজাতির জন্যে তাঁর পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করে মুসলিমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংহতি অর্জন করবে যা তাদের আল্লাহর একত্বের বোধ জাগাবে। জীবনের কোনও একটি দিককে ঝেড়ে ফেলে তাকে এই ধর্মীয় 'প্রয়াসে'র আওতার বাইরে ঘোষণা করা হবে প্রধান ইসলামি গুণ এই একীভূতকরণের *(তাওহিদ)* নীতির মারাত্মক লঙ্ঘন। এটা স্বয়ং আল্লাহকেই অস্বীকার করার শামিল হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং, ধর্মপ্রাণ কোনও মুসলিমের পক্ষে রাজনীতি হচ্ছে ক্রিশ্চানরা যাকে বলবে অপসুদীক্ষা। এটা এমন এক কর্মকাণ্ড যাকে পবিত্রায়িত করতেই হবে যাতে তা আল্লাহকে পাওয়ার একটি উপায়ে পরিণত হয়।

মুসলিম সম্প্রদায় অর্থাৎ *উম্মাহর* বিভিন্ন উদ্বেগ শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে বাধ্যতামূলক ইসলামের পাঁচটি আবশ্যকীয় অনুশীলন 'স্তম্ভে' *(রুকন)* স্পষ্ট করা হয়েছে। ক্রিশ্চানরা যেখানে অর্থডক্সিকে সঠিক বিশ্বাস মনে করে, মুসলিমদের সেখানে ইহুদিদের মতো অর্থপ্র্যাক্সির, ধর্মীয় অনুশীলনের সর্বজনীনতা এবং বিশ্বাসকে গৌণ বিষয় হিসাবে দেখা প্রয়োজন। পাঁচটি স্তম্ভ অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিমকে *শাহাদাহ* (আল্লাহ'র একত্বে বিশ্বাস ও মুহাম্মদের (স) পয়গম্বরত্বের পক্ষে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি) উচ্চারণ করতে হয়, দৈনিক পাঁচবার প্রার্থনা করা, সমাজে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করার জন্যে কর প্রদান *(যাকাত)* করা, দরিদ্রদের উপবাসে থাকার কষ্টের স্মরণে রমযান মাসে উপবাস পালন এবং

পরিস্থিতি অনুকূল হলে মক্কায় *হাজ্জ* তীর্থযাত্রা পালন। উম্মাহর রাজনৈতিক স্বাস্থ্য স্পষ্টত যাকাত ও রমযানের উপবাসের মূখ্য বিষয়। কিন্তু আবিশ্যিকভাবেই সাম্প্রদায়িক ঘটনা *হাজ্জে* এটা জোরালভাবে উপস্থিত, এই সময় উম্মাহর ঐক্যকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে ও ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য মুছে ফেলার জন্যে তীর্থযাত্রী সর্বজনীন শাদা পোশাক পরে।

আরবীয় হিজাজের কেন্দ্রে মক্কায় অবস্থিত চৌকো আকৃতির উপাসনাগৃহ কাবাহ *হাজ্জের* মুল মনোযোগের বিষয়। কাবাহ এমনকি মুহাম্মদের (স) আমলেও বহু প্রাচীন ছিল, সম্ভবত আদিতে আরবীয় প্যাগান দেবনিচয়ের পরম ঈশ্বর আল্লাহ'র প্রতি নিবেদিত ছিল। মুহাম্মদ (স) কাবাহয় বার্ষিক তীর্থযাত্রার আনুষ্ঠানিকতাকে ইসলামিকরণ করেছেন, একেশ্বরবাদী তাৎপর্য দান করেছেন। এখন পর্যন্ত *হাজ্জ* মুসলিম সমাজের এক জোরাল অভিজ্ঞতা দান করে। কাবাহর কাঠামো মনস্তাত্ত্বিক জি.সি. জাঙ (১৮৭৫-১৯৫১) কর্তৃক আবিষ্কৃত আর্কিটাইপাল তাৎপর্যমণ্ডিত জ্যামিতিক প্যাটার্নের সাথে খাপ খায়। অধিকাংশ প্রাচীন শহরের কেন্দ্রে উপাসনালয় পবিত্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে, জাদের অস্তিত্বের পক্ষে যাকে আবশ্যক মনে করা হত। এটা মরণশীল নারী-পুরুষের নাজুক ও অরক্ষিত শহুরে সমাজে অধিকতর সক্ষম আদিম বাস্তবতাকে বয়ে আনত। প্লুতার্ক, ওভিদ, দিওনিসাস অভ হেলিকারনাসাসের মতো ধ্রুপদি লেখকগণ বৃত্তাকার বা চৌকো হিসাবে উপাসনাগৃহের বর্ণনা দিয়েছেন, এটা মহাবিশ্বের অত্যাবশ্যক কাঠামোকে নতুন করে গড়ে তোলে বলে বিশ্বাস করা হত। এটা সেই প্যারাডাইম যা তুমুল বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে এবং একে টেকসই করে বাস্তবতা দান করেছে। জাঙ বিশ্বাস করতেন যে, চৌকো বা বৃত্তের ভেতর যেকোনও একটিকে বেছে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, বাস্তবতার ভিত্তি মহাজাগতিক শৃঙ্খলাকে তুলে ধরা জ্যামিতিক চিত্র, তিনি বিশ্বাস করতেন, বৃত্তের ভেতর প্রবেশ করানো একটা চতুর্ভুজ।[৫] উপাসনাগৃহে পালিত আচারগুলো উপাসককে মহাবিশ্বের মৌল নীতিমালা ও আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করে সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে ও একে বিভ্রান্তি বা কুহকের ফাঁদে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে তাদের সহজাত বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ভরা জগতে স্বর্গীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। মক্কার কাবাহ ঠিক আর্কিওটাইপের সাথে মিলে যায়। গ্রানিটের চৌকো কাঠামো ঘিরে তীর্থযাত্রীরা সাতবার আচরিক প্রদক্ষিণে দৌড়ে বেড়ায়। এর চারটে কোণ পৃথিবীর কোণের প্রতিনিধিত্ব করে, পৃথিবীকে ঘিরে সূর্যের ঘূর্ণনের ধরনকে অনুসরণ করে তারা। নারী বা পুরুষ তার সম্পূর্ণ সত্তার জীবনের মৌল ভিত্তির কাছে

AMARBOI.COM

কেবল অস্তিত্বগত আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়েই *(ইসলাম)* একজন *মুসলিম* (যিনি আত্মসমর্পণ করেছেন) সমাজে প্রকৃত মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে।

তীর্থযাত্রায় গেছে এমন একজন মুসলিমের কাছে এখনও সর্বোচ্চ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হজ্জ এভাবে গভীরভাবে রক্ষণশীল চেতনায় পরিপূর্ণ। সকল প্রকৃত *মিথোই*-এর মতো পৌরাণিক আদর্শজগতের অবচেতন বিশ্বে প্রোথিত *হাজ্জ* মুসলিমদের সেই মৌল উপাদানের কথা মনে করিয়ে দেয় যা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে কারও পক্ষে এর বাইরে যাওয়া অসম্ভব। এটা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের চেয়ে গভীরে যেতে, বস্তুনিচয়ের আবিশ্যিকভাবে স্বাভাবিক ধর্মে আত্মসমর্পণ ও নিজেদের মতো স্বাধীনভাবে অগ্রসর না হতে সাহায্য করে। সম্প্রদায়ের সমস্ত যৌক্তিক কর্মকাণ্ড−রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য বা সামাজিক সম্পর্ক−পৌরাণিক প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে স্থাপিত ও পরে মুসলিম বিশ্বের হৃদয়ে অবস্থিত কাবাহ এইসব যৌক্তিক কর্মকাণ্ডকে অর্থ ও পরিপ্রেক্ষিত দান করেছে। কোরানও এই রক্ষণশীল মনোভাব তুলে ধরেছে। এটা বারবার জোরের সাথে বলেছে যে, মানুষের কাছে এটা কোনও নতুন সত্যি বয়ে আনছে না, বরং মানবজীবনের অত্যাবশ্যাক বিধিবিধানকেই প্রকাশ করছে। এটা এরই মধ্যে জানা সত্যিরই 'স্মারক'।[৬] মুহাম্মদ (স) মনে করেননি যে তিনি একটি নতুন ধর্ম তৈরি করছেন, বরং বিশ্বাস করেছেন যে, এই আরবীয় গোত্রের কাছে মানবজাতির আদিমতম ধর্মকেই নিয়ে আসছেন; এর আগে কখনও এদের কাছে কোনও পয়গম্বর প্রেরণ করা হয়নি, তাদের নিজস্ব ভাষায় কোনও ঐশীগ্রন্থও ছিল না। কোরানের দৃষ্টিতে প্রথম পয়গম্বর আদমের কাল থেকেই কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে তার শিক্ষা দিতে আল্লাহ্ পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক জাতির কাছে বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন।[৭] সহজাতভাবে স্বর্গীয় বিধির কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতিগতভাবেই *মুসলিম* পশু-পাখি, মাছ বা গাছের বিপরীতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে, ইচ্ছে করলে সে এই বিধানকে অমান্য করতে পারে।[৮] তারা যখন এইসব মৌল বিধানকে অমান্য করে দরিদ্রের উপর নির্যাতনকারী সুষ্ঠুভাবে সম্পদ বণ্টনে অস্বীকারকারী স্বেচ্ছাচারী সমাজ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখনই তারা তাদের সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে। কোরান আমাদের জানাচ্ছে অতীতের মহান সব পয়গম্বর−আদম, নোয়াহ্, মোজেস, জেসাস এবং আরও অনেকে−কীভাবে আল্লাহ'র সেই একই বাণী উচ্চারণ করেছেন। এখন কোরান আরবদের কাছে সেই একই স্বর্গীয় বাণী এনে দিয়েছে, তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার চর্চা করার নির্দেশ দিচ্ছে যা তাদের অস্তিত্বের মৌল বিধির সাথে সমন্বিত করবে। মুসলিমরা যখন আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী চলে, সবকিছু যেমন হওয়া উচিত ছিল সেইভাবে বস্তুনিচয়ের ধারার সাথে চলার

AMARBOI.COM

বোধ জাগে তাদের ভেতর। আল্লাহ'র বিধান অমান্য করাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিবেচনা করা হয়েছে: এ যেন কোনও মাছ জমিনে বাস করার প্রয়াস পাচ্ছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে অটোমানদের বিস্ময়কর সাফল্যকে নিশ্চয়ই তাদের প্রজাদের চোখে তারা যে এই মৌল নীতিমালার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবে ফুটে উঠেছিল। একারণেই তাদের সমাজ এমন দর্শনীয়ভাবে কাজ করেছে। অটোমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় শরীয়াহ আইনকে দেওয়া নজীরবিহীন প্রাধ্যান্যকেও এই রক্ষণশীল চেতনায় দেখা হয়েছিল। আধুনিকতার সূচনায় মুসলিমরা স্বর্গীয় আইনকে তাদের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্নকারী বিষয় মনে করেনি, এটা ছিল পৌরাণিক আদর্শজগতের আচরিক ও কাল্টিক বাস্তবায়ন, যা তাদের পবিত্রের সংস্পর্শে নিয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করেছে। মুহাম্মদের (স) পরলোকগমনের পরবর্তী শতাব্দীগুলোয় ধীরে ধীরে মুসলিম আইনের বিকাশ ঘটেছে। কোরানে খুব কমই বিধানের অস্তিত্ব রয়েছে আর পয়গম্বরের পরলোকগমনের এক শো বছরের ভেতর মুসলিমরা হিমালয় থেকে পিরেনীজ পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করছিল বলে অন্য যেকোনও সমাজের মতোই এর জটিল আইনি ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকায় এটা ছিল একটা সৃজনশীল উদ্যোগ। শেষ পর্যন্ত ইসলামি জুরিসপ্রুডেন্সের চারটি ধারা গড়ে ওঠে। সবগুলোই প্রায় একই ধরনের, এদের সমানভাবে বৈধ মনে করা হয়। পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করে এই বিধানব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ গ্রহণের সময় *ইসলামের* নিখুঁত ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। নবম শতাব্দীতে খুব সতর্কতার সাথে পয়গম্বরের শিক্ষা ও আচরণ সংক্রান্ত প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন *(হাদিস)* সংগ্রহ করা হয়, মুসলিমরা তাঁর বাণী ও ধর্মীয় অনুশীলনের *(সুন্নাহ)* একটা নির্ভুল রেকর্ড লাভ করে সেটা নিশ্চিত করতে যত্নের সাথে যাচাই করা হয়েছে। আইনি মতবাদগুলো মুহাম্মদীয় এই প্যারাডাইমগুলোকে তাদের আইনি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করে যাতে সারা বিশ্বের মুসলিমরা পয়গম্বর যেভাবে কথা বলতেন, খেতেন, হাতমুখ ধুতেন, ভালোবাসতেন ও প্রার্থনা করতেন তার অনুকরণ করতে পারে। এইসব বাহ্যিক বিষয়ে পয়গম্বরের অনুকরণের ভেতর দিয়ে তারা আল্লাহর কাছে তাঁর অন্তস্থঃ আত্মসমর্পণের নাগাল পাবার আশা করেছিল।[৮] প্রকৃত রক্ষণশীল চেতনায় মুসলিমরা অতীতের এক নিখুঁত বিষয়ের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিচ্ছিল।

মুসলিম বিধানের অনুশীলন ঐতিহাসিক চরিত্র মুহাম্মদকে (স) মিথে পরিণত করে তাঁকে তিনি যে কালে বেঁচেছিলেন সেই কাল থেকে মুক্ত করে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের ব্যক্তি জীবনে তুলে এনেছে। একইভাবে এই কাল্টিক পুনারাবৃত্তি মুসলিম সমাজকে আল্লাহর কাছে নিখুঁত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে একজন মানুষের কেমন

হওয়া উচিত তার নজীরে পরিণত হওয়া ব্যক্তি মুহাম্মদের (স) নৈকট্য লাভের ভেতর দিয়ে প্রকৃত *ইসলামি* করে তুলেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল আগ্রাসনের সময় নাগাদ শরীয়াহ আধ্যাত্মিকতা শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সারা মুসলিম বিশ্বে শেকড় বিস্তার করেছিল, সেটা খলিফা ও *উলেমাগণ* এটা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কারণে নয়, বরং এটা নারী-পুরুষকে নুমিনাসের অনুভূতি দিয়েছিল ও তাদের জীবনকে অর্থ দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল বলে। অতীতের প্রতি এই কাল্টিক উল্লেখ অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর জীবনধারার প্রতি প্রাচীন আনুগত্যের কাছে বন্দি করেনি। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অটোমান সাম্রাজ্য তর্কসাপেক্ষে সবচেয়ে আধুনিক রাষ্ট্র ছিল। সময়ের হিসাবে এটা অসাধারণ দক্ষ ছিল, এক নতুন ধরনের আমলাতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছে ও প্রাণবন্ত জীবনধারাকে উৎসাহিত করেছে। অটোমানরা অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি উদার ছিল। পাশ্চাত্য নৌচলাচল বিজ্ঞান তাদের সত্যিই উত্তেজিত করে তুলেছিল, অভিযাত্রীদের বিভিন্ন আবিষ্কারে রীতিমতো আলোড়িত হয়েছে; এবং গানপাউডার ও আগ্নেয়াস্ত্রের মতো পাশ্চাত্য সামরিক আবিষ্কার আয়ত্ত করতে তারা উদগ্রীব ছিল।[10] *উলেমাদের* দায়িত্ব ছিল এইসব উদ্ভাবনকে মুসলিম আইনে মুহাম্মদীয় প্যারাডাইমের অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতির অনুসন্ধান করা। জুরিপ্রুডেন্সের গবেষণা (*ফিকহ*) মানে কেবল প্রাচীন টেক্সট পাঠের ব্যাপার ছিল না, বরং এর চ্যালেঞ্জিং একটা মাত্রা ছিল। এবং এই সময় পর্যন্ত ইসলাম ও পশ্চিমের ভেতর কোনও পার্থক্য ছিল না। ইউরোপও রক্ষণশীল চেতনায় ডুবে ছিল। রেনেসাঁ মানবতাবাদীরা *আদ ফন্তেসে*, উৎসে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, সাধারণ মরণশীলের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম থেকে বের হয়ে আসা কার্যত অসম্ভব। নতুন নতুন আবিষ্কার সত্ত্বেও ইউরোপিয়রা অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত রক্ষণশীল রীতিনীতিতেই শাসিত হয়েছে। পাশ্চাত্য আধুনিকতা ভবিষ্যৎমুখী যুক্তিবাদ দিয়ে জীবনের পশ্চাদমুখী পৌরাণিক ধারাকে প্রতিস্থাপিত করার পরেই কেবল কোনও কোনও মুসলিম ইউরোপকে অচেনা ভাবতে শুরু করবে।

এছাড়া, রক্ষণশীল সমাজকে সম্পূর্ণ স্থবির কল্পনা করে নেওয়াটা ভ্রান্তি হবে। গোটা মুসলিম ইতিহাস জুড়ে *ইসলা* ('সংস্কার') ও *তাজদিদ* ('নবায়ন')-এর আন্দোলন চলেছে, প্রায়শঃই এগুলো ছিল সম্পূর্ণই বিপ্লবী।[11] উদাহরণ স্বরূপ, দামাস্কাসের আহমাদ ইবন তাঈমিয়াহর (১২৬৩-১৩২৮) মতো একজন সংস্কারক '*ইজতিহাদের* দুয়ার রুদ্ধ করার' সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। মঙ্গোল আগ্রাসনের আগে ও পরে জীবন যাপন করেছেন তিনি, মুসলিমরা এই সময় প্রবল আচ্ছন্ন দশা থেকে মুক্ত হয়ে সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়াস

পাচ্ছিল। সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কালে বা ব্যাপক রাজনৈতিক বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরপর সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমন সময়ে পুরোনো সমাধান আর কাজে আসে না, সুতরাং সংস্কারকগণ *ইজতিহাদের* যৌক্তিক ক্ষমতা ব্যবহার করে স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে থাকেন। ইবন তাঈমিয়াহ শরীয়াকে হালনাগাদ করতে চেয়েছিলেন যাতে করে তা এই খোলনলচে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে মুসলিমদের সত্যিকারের প্রয়োজন মেটাতে পারে। কিন্তু তাঁর কর্মসূচি অাবিশ্যিকভাবে রক্ষণশীল রূপ ধারণ করেছিল। ইবন তাঈমিয়া বিশ্বাস করতেন যে, সঙ্কট উত্তরণের জন্যে মুসলিমদের অবশ্যই উৎসে, অর্থাৎ কোরান ও পয়গম্বরের সুন্নাহ্য় ফিরে যেতে হবে। পরবর্তীকালের সকল ধর্মীয় সংযোজন বাতিল করে মূলে ফিরে যেতে চেয়েছেন তিনি। অর্থাৎ, আদিম মুসলিম আদর্শরূপে ফিরে যেতে পবিত্র বিবেচিত হতে শুরু করা অনেক মধ্যযুগীয় জুরিপ্রুডেন্স *(ফিকহ্)* ও দর্শন বাতিল করে দিয়েছিলেন। এই প্রতিমাবিরোধিতা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং ইবন তাঈমিয়া বাকি জীবন কারাগারে কাটান। বলা হয়ে থাকে যে, আটককারী তাঁকে কলম ও কাগজ না দেওয়ায় ভগ্ন হৃদয়ে মারা গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁকে ভালোবেসেছিল, তাঁর আইনি সংস্কার ছিল উদার ও রেডিক্যাল, তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের স্বার্থই তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন।[১২] তাঁর অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান জনপ্রিয় স্বীকৃতির প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। ইসলামি ইতিহাসে এমন আরও অনেক সংস্কারক রয়েছেন। আমরা আমাদের বর্তমান কালের কোনও কোনও মুসলিম মৌলবাদীকে *ইসলাহ* ও *তাজদিদের* এই ঐতিহ্যে কাজ করতে দেখব।

অন্য মুসলিমরা নিগূঢ় আন্দোলনের মাঝে নতুন ধর্মীয় ধারণা ও অনুশীলনের সন্ধান করতে পেরেছিল। এসব সাধারণ জনগণের কাছে গোপন রেখেছিল তারা, কেননা তাদের ধারণা ছিল এসবকে ভুল বোঝা হতে পারে। অবশ্য, তারা ধর্ম সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণার কোনও পার্থক্য দেখতে পায়নি। তাদের বিশ্বাস ছিল, তাদের আন্দোলনসমূহ কোরানের শিক্ষার সম্পূরক ছিল এবং সেগুলোকে নতুন প্রাসঙ্গিকতা দিয়েছে। ইসলামের তিনটি প্রধান নিগূঢ় ধরন হচ্ছে, সুফিবাদের অতীন্দ্রিয়বাদী অনুশীলন, ফালসাফাহর যুক্তিবাদ ও শিয়া ধর্মমতের কিছুটা রাজনৈতিক ধার্মিকতা। এই অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তারিত অনুসন্ধান করব। কিন্তু ইসলামের এই নিগূঢ় ধরনগুলোকে যত উদ্ভাবনীমূলক বা মূলধারার শরীয়া ধার্মিকতা থেকে যতই বিচ্ছিন্ন মনে হোক না কেন, মরমীরা বিশ্বাস করত যে তারা *আদ ফন্তেসে* ফিরে যাচ্ছে। কোরানের ধর্মে গ্রিক যুক্তিবাদের নীতিমালা প্রয়োগের প্রয়াস লাভকারী ফালসাফাহর প্রচারকরা সময়হীন সত্যির

আদিম সর্বজনীন ধর্মবিশ্বাসে ফিরে যেতে চেয়েছে, তাদের ধারণা ছিল ওই ধর্ম বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধর্মের আগেও বিরাজ করত। সুফিরা বিশ্বাস করেছে যে, অতীন্দ্রিয় পরমানন্দ পয়গম্বর কোরান গ্রহণ করার সময় যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটায়, তারাও মুহাম্মদের (স) আদি আদর্শের সাথে একাত্ম হচ্ছে। শিয়াদের দাবি, কেবল তারাই কোরানে উল্লিখিত সামাজিক ন্যায়বিচারের আবেগের চর্চা করে, কিন্তু দুর্নীতিবাজ মুসলিম শাসকগণ তাকে উপেক্ষা করে গেছেন। নিগূঢ়বাদীদের কেউই আমাদের ধারণা অনুযায়ী 'মৌলিক' হতে চায়নি, সবাইই মূলে ফিরে যাওয়ার রক্ষণশীল দিক থেকে মৌলিক, কেবল সেটাই মানুষকে পূর্ণাঙ্গতা ও পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে বিশ্বাস করা হত।[১৩]

এই গ্রন্থে আমরা যেসব দেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তাদের ভেতর একটি মিশর। ১৫১৭ সালে এই দেশটি অটোমান সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। প্রথম সেলিম সেই সময় সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সময় দেশটি অধিকার করে নিয়েছিলেন। সুতরাং শরীয়া ধার্মিকতা মিশরে প্রধান ছিল। কায়রোর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আল আযহার সুন্নি বিশ্বে *ফিকহ* গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে। কিন্তু অটোমান শাসনের শতাব্দীগুলোয় ইস্তাম্বুলের পেছনে পড়ে যায় মিশর, আপেক্ষিকভাবে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার অস্তিত্ব। আধুনিক কালের সূচনা লগ্নে এই দেশটির অবস্থা সম্পর্কে খুব কমই জানি আমরা। ১২৫০ সাল থেকে এই অঞ্চল মামলুকদের শাসনাধীন ছিল-এরা ছিল কিশোর বয়সে বন্দি করে ইসলামে ধর্মান্তরিত কর্সিকান দাসদের নিয়ে সংগঠিত একটা ক্র্যাক সামরিক বাহিনী। একই ধরনের দাস-বাহিনী জানেসারিরা ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের সামরিক মেরুদণ্ড। তুঙ্গ সময়ে মামলুকরা মিশর ও সিরিয়ায় এক প্রাণবন্ত সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছে। মিশর ছিল মুসলিম বিশ্বের অন্যতম অগ্রসর দেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলুক সাম্রাজ্য কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সহজাত সীমাবদ্ধতার কাছে নতি স্বীকার করে নেয়, এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এর পতন শুরু হয়। মামলুকরা অবশ্য মিশরে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়নি। অটোমান সুলতান প্রথম সেলিম আলেপ্পোর মামলুক গভর্নর খায়ের বে'র সাথে জোট বেঁধে দেশটি দখল করে নেন। এই রফার অধীনে খায়ের বে-কে অটোমান বাহিনী প্রত্যাহৃত হওয়ার পর ভাইসরয় নিয়োগ করা হয়েছিল।

গোড়ার দিকে অটোমানরা মামলুকদের সামাল দিতে পেরেছিল, দুটি মামলুক বিদ্রোহকে দমন করেছিল তারা।[১৪] তবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে অটোমানরা তাদের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ফেলতে যাচ্ছিল। ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি প্রশাসনে পতন ডেকে আনে এবং ক্রমশঃ বেশ কয়েকটা বিদ্রোহের পর মামলুক

অধিনায়করা *(বে)* মিশরের আসল শাসক হিসাবে আবির্ভূত হন, যদিও সরকারীভাবে ইস্তাম্বুলের অধীন ছিলেন তাঁরা। *বে*-গণ উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন সামরিক ক্যাডার গড়ে তুলেছিলেন, এই বাহিনী তুর্কি গভর্নরের বিরুদ্ধে অটোমান সেনাবাহিনীতে মামলুক বাহিনীর একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় ও তার জায়গায় নিজেদের একজনকে ক্ষমতায় বসায়। সুলতান এই নিয়োগের বৈধতা দান করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে সংক্ষিপ্ত একটা পর্যায় বাদে মামলুকরা দেশের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পেরেছিল। ওই সময় জানেসারিদের একজন ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলেন। তবে মামলুক শাসন ছিল অস্থিতিশীল। *বে*-তন্ত্র দুটো উপদলে বিভক্ত ছিল, ফলে সারাক্ষণ অস্থিরতা ও অন্তর্দলীয় কোন্দল লেগেই থাকত।[১৫] এই গোটা উত্তাল সময় জুড়ে প্রধান শিকার ছিল মিশরের সাধারণ জনগণ। বিদ্রোহ ও উপদলীয় সহিংসতার সময় তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, করের ভারে পঙ্গু হয়ে গেছে তারা। তুর্কি বা সারকাসিয়ান, যাই হোক না কেন, শাসকদের সাথে তারা কোনওরকম ঐক্য বোধ করতে পারেনি, এরা ছিল বিদেশী ও জনগণের কল্যাণে কোনও আগ্রহ ছিল না তাদের। জনগণ ক্রমবর্ধমানহারে *উলেমা*দের শরনাপন্ন হচ্ছিল: মিশরিয় ছিলেন তাঁরা, শরীয়ার পবিত্র শৃঙ্খলার প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁরাই মিশরিয় জনগণের প্রকৃত নেতায় পরিণত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে *বে*-দের ভেতরকার বিরোধ আরও প্রকট আকার ধারণ করলে মামলুক নেতৃবৃন্দ আবিষ্কার করেন যে, জনগণকে তাদের শাসন মেনে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যে *উলেমা*দের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই।[১৬]

*উলেমা*রা ছিলেন মিশরিয় সমাজের শিক্ষক, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী। প্রতিটি শহরে এক থেকে সাতটি *মাদ্রাসা* (ইসলামি আইন ও ধর্মতত্ত্ব পাঠের বিশ্ববিদ্যালয়) ছিল, এগুলোই ছিল দেশের শিক্ষকের যোগানদার। বুদ্ধিবৃত্তির মান খুব উন্নত ছিল না। প্রথম সেলিম মিশর দখল করে নেওয়ার পর প্রচুর মূল্যবান পাণ্ডুলিপিসহ বহু নেতৃস্থানীয় *উলেমা*কে সাথে করে ইস্তাম্বুলে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অটোমান সাম্রাজ্যের একটা পশ্চাদপদ প্রদেশে পরিণত হয়েছিল মিশর। অটোমানরা আরব পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়নি। মিশরিয়দের বাইরের পৃথিবীর সাথে কোনও যোগাযোগ ছিল না। মামলুক শাসনের সময় সমৃদ্ধি লাভ করা মিশরিয় দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ওষুধবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অধঃপতিত হয়ে পড়েছিল।[১৭]

কিন্তু শাসক ও সাধারণ জনগণের ভেতর যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম থাকায় *উলেমা*গণ যাপরনাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। এদের বেশিরভাগই এসেছিলেন *ফেলাহীন* কৃষক শ্রেণী থেকে, তাই পল্লী অঞ্চলে তাদের প্রভাব ছিল উল্লেখ করার মতো। কোরান স্কুল ও *মাদ্রাসায়* গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা;

শরীয়া আদালতসমূহ বিচার ব্যবস্থার মুল কেন্দ্র থাকায় *উলেমাগণ* আইনি ব্যবস্থায়ও একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতেন। এছাড়া, *দিওয়ানে*[৮] গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদের অধিকারী ছিলেন তাঁরা এবং শরীয়াহর অভিভাবক হিসাবে সরকারের বিরুদ্ধে মূল বিরোধিতারও নেতৃত্ব দিতে পারতেন। বিখ্যাত *মাদ্রাসা* আল-আযহারের অবস্থান ছিল বাজারের পাশে, *উলেমাদের* সাথে বণিক শ্রেণীর শক্তিশালী সম্পর্ক ছিল। সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাইলে তারা আযহারের মিনার থেকে বাজানো ঢাকের আওয়াজেই বাজার বন্ধ করে দিতে পারত ও লোকজনকে রাস্তায় নামিয়ে আনতে পারত। উদাহরণ স্বরূপ, ১৭৯৪ সালে আযহারের রেক্টর শেখ আল-শারকাভি এক নতুন করারোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, একে নির্যাতনমূলক ও অনৈসলামিক ঘোষণা করেছিলেন তিনি। তিন দিন পরে *বে*-গণ কর প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১৯] কিন্তু সরকার উৎখাত করে *উলেমাদের* সরকার গঠনের লক্ষ্যে অভ্যুত্থান পরিচালনার কোনও বাস্তব হুমকি ছিল না। *বে*-গণ সাধারণত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন। মব ভায়োলেন্স প্রায়শঃই মামলুক সেনাবাহিনীর পক্ষে তেমন কোনও চলমান চ্যালেঞ্জ ছিল না।[২০] তা সত্ত্বেও, *উলেমাদের* প্রাধান্য মিশরিয় সমাজকে একটা লক্ষযোগ্য ধর্মীয় চরিত্র দান করেছিল, ইসলামই মিশরের জনগণকে একমাত্র নিরাপত্তার যোগান দিয়েছিল।[২১]

অষ্টম শতাব্দীর শেষ নাগাদ মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা ছিল যারপরনাই মূল্যবান। এই সময় নাগাদ অটোমান সাম্রাজ্য মারাত্মক অবনতির শিকারে পরিণত হয়। এর ষোড়শ শতকীয় সরকারের অসাধারণ দক্ষতা বিশেষ করে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় অযোগ্যতার জন্ম দেয়। বিস্ময়করভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছিল পাশ্চাত্য জগৎ। অটোমানরা আবিষ্কার করে যে তারা এখন আর আগের মতো ইউরোপের সাথে সমান তালে লড়তে পারছে না। পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল, সেটা রাজনৈতিক দুর্বলতার কালে ঘটছিল বলে নয়, বরং ইউরোপে গড়ে উঠতে থাকা এক নতুন সমাজের কোনও পূর্ব নজীর না থাকায়।[২২] সুলতানগণ মানিয়ে নেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রয়াস ছিল বাহ্যিক। উদাহরণ স্বরূপ, সুলতান তৃতীয় সেলিম (১৭৮৯-১৮০৭ সাল পর্যন্ত শাসন করেন) পাশ্চাত্য হুমকিকে কেবল সামরিক ভিত্তিতে বিবেচনা করেছেন। ১৭৩০-এর দশকে ইউরোপিয় ধাঁচে সেনাবাহিনীকে গড়ো তোলার ব্যর্থ প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ১৭৮৯ সালে সিংহাসনে আরোহণ করার পর সেলিম ফরাসী নির্দেশকসহ বেশ কয়েকটি সামরিক স্কুল খোলেনঃ ছাত্ররা এখানে ইউরোপিয় ভাষা ও গণিত, নৌচলাচল, ভূগোল ও ইতিহাসের বইয়ের সাথে

AMARBOI.COM

পরিচিত হয়ে ওঠে।[২৩] অল্প কিছু সামরিক কৌশল শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞানের ভাসা ভাসা জ্ঞান অবশ্য পাশ্চাত্য হুমকিকে সামাল দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়নি। কারণ ইউরোপিয়রা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবন ও চিন্তা ধারার বিকাশ ঘটিয়েছিল; ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন কেতায় কাজ করছিল তারা। তাদের নিজস্ব কৌশলে তাদের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে অটোমানদের প্রয়োজন ছিল সমাজের ইসলামি কাঠামো ভেঙে একেবারে নতুন ধরনের যৌক্তিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো ও অতীতের সাথে সমস্ত পবিত্র সম্পর্ক ছেদ করতে প্রস্তুত থাকা। অভিজাত গোষ্ঠীর অল্প কিছু মানুষের পক্ষে হয়তো এই পরিবর্তন অর্জন করা সম্ভব ছিল, ইউরোপিয়দের যার জন্যে প্রায় তিনশো বছর লেগেছিল; কিন্তু সাধারণ জনগণকে কীভাবে তাঁরা এমন রেডিক্যাল পরিবর্তন মেনে নিতে ও উপলব্ধি করতে সম্মত করাতেন, যাদের মনমানসিকতা রক্ষণশীল রীতিনীতিতে পরিপূর্ণ?

ইউরোপের সীমান্তে যেসব জায়গায় অটোমান পতন অনেক বেশি প্রকট ছিল, সেখানকার জনগণ বরাবরের মতোই পরিবর্তন ও অস্থিরতার প্রতি সাড়া দিয়েছিল–ধর্মীয় কায়দায়। আরবীয় পেনিনসুলায় মুহাম্মদ ইবন আব্দ আল-ওয়াহহাব (১৭০৩-৯২) ইস্তাম্বুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মধ্য আরব ও পারসিয়ান গাল্ফ এলাকায় নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হন। আব্দ আল-ওয়াহহাব ছিলেন টিপিক্যাল ইসলামি সংস্কারক। মধ্যযুগীয় জুরিসপ্রুডেন্স, অতীন্দ্রিয়বাদ ও দর্শন প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করে কোরান ও সুন্নাহয় প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে সঙ্কট মোকাবিলার প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে এসবই যেহেতু আদি ইসলাম থেকে বিচ্যুতি, তাই আল-ওয়াহহাব অটোমান সুলতানদের ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাঁদের বিশ্বাসীদের আনুগত্য লাভের অযোগ্য ও মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের শরীয়া রাষ্ট্র সঠিক নয়। তার বদলে আল-ওয়াহহাব সপ্তম শতাব্দীর প্রথম মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে খাঁটি ধর্মের একটা ছিটমহল সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। এটা ছিল আক্রমণাত্মক আন্দোলন, বাহুবলে জনগণের উপর চেপে বসেছিল। এইসব সহিংস ও প্রত্যাখ্যানমূলক ওয়াহহাবীয় শিক্ষা আরও ব্যাপক পরিবর্তন ও অস্থিরতার কাল বিংশ শতাব্দীর দিকে কিছু সংখ্যক মৌলবাদী ইসলামি সংস্কারকদের হাতে ব্যবহৃত হবে।[২৪]

মরোক্কোর সুফি সংস্কারক আহমাদ ইবন ইদ্রিসের (১৭৮০-১৮৩৬) সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, আমাদের কালেও যার অনুসারী রয়েছে। অটোমান সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জীবনের বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে তাঁর সমাধান ছিল সাধারণ জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা ও তাদের ভালো মুসলিমে পরিণত করা। উত্তর আফ্রিকা ও ইয়েমেনে প্রচুর সফর করেছেন তিনি, সাধারণ জনগণের উদ্দেশে তাদের নিজস্ব ভাষায় বক্তব্য

AMARBOI.COM

রেখেছেন, সমবেত প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন ও অনৈতিক অনুশীলন থেকে তাদের বের করে আনতে চেয়েছেন। তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলন ছিল এটা। ওয়াহহাবী পদ্ধতি নিয়ে কাজ করার অবকাশ ছিল না ইবন ইদ্রিসের। তাঁর চোখে শক্তি নয়, শিক্ষাই ছিল মূল চাবকাঠি। ধর্মের নামে মানুষ হত্যা অবশ্যই ভ্রান্তি। অন্য সংস্কারকগণ একই পথে কাজ করেছেন। আলজেরিয়ায় আহমাদ আল-তিগরানি (মৃ. ১৮২৪), মদিনায় মুহাম্মদ ইবন আব্দ আল-করিম শামীম (মৃ. ১৭৭৫) এবং লিবিয়ায় মুহাম্মদ ইবন আলি আল-সানুসি (মৃ. ১৮৩২)–এদের প্রত্যেকে *উলেমা*দের পাশ কাটিয়ে ধর্মকে সরাসরি মানুষের কাছে নিয়ে গেছেন। এটা ছিল জনমুখী সংস্কার, তাঁরা তাঁদের চোখে অভিজাতপন্থী ও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করেছেন; আব্দ আল-ওয়াহহাবের বিপরীতে মতবাদগত পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না তাঁরা। জনগণকে মূল কান্টে ফিরিয়ে নিয়ে ও তাদের নৈতিকভাবে জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করে জটিল *ফিকহে*র চেয়ে অনেক কার্যকরভাবে সমাজের অসুস্থতাকে দূর করা যাবে।

শত শত বছর ধরে সুফিগণ শিষ্যদের তাদের নিজস্ব জীবনে মুহাম্মদীয় প্যারাডাইম নতুন করে সৃষ্টি করার শিক্ষা দিয়ে এসেছেন; তারাও জোর দিয়ে বলেছেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথই হচ্ছে সৃজনশীল ও অতীন্দ্রিয় কল্পনা: মানুষের সুফিবাদের ধ্যানমূলক অনুশীলনের সাহায্যে অবশ্যই নিজের মতো থিওফ্যানি সৃষ্টি করার দায়িত্ব রয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এইসব সংস্কারকগণ–পণ্ডিতরা যাদের 'নিও-সুফি' বলে আখ্যায়িত করেছেন–আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করার শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের আর পণ্ডিত ও বিদ্বান যাজকের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। ইবন ইদ্রিস এমনকি যত মহানই হোন না কেন, পয়গম্বর বাদে সকল মুসলিম সাধুর কর্তৃত্ব পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করার মতো পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এভাবে তিনি মুসলিমদের যা কিছু নতুন তাকে মূল্য দিতে ও শ্রদ্ধার আলখেল্লাহ ঝেড়ে ফেলার উৎসাহ দিয়েছেন। অতীন্দ্রিয় অনুসন্ধানের লক্ষ্য আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া নয়, বরং পয়গম্বরের মানবীয় চরিত্রের সাথে গভীরভাবে একীভূত হওয়া–যিনি আল্লাহর কাছে নিজেকে এমনি নিখুঁতভাবে উন্মুক্ত করে তুলেছিলেন। প্রাথমিকভাবে এগুলো আধুনিক প্রবণতা ছিল। নিও-সুফিগণ পয়গম্বরের আদিআদর্শ ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী থাকলেও তারা যেন দুর্জ্ঞেয়মুখী নয় বরং মানবমুখী ধর্মবিশ্বাসের বিকাশ ঘটাচ্ছিলেন এবং শিষ্যদের যা কিছু নতুন ও উদ্ভাবনী শক্তির তাকে প্রাচীনের মতোই মূল্য দিতে শেখাচ্ছিলেন। পশ্চিমের সাথে ইবন ইদ্রিসের কোনও যোগাযোগ ছিল না, তিনি কখনওই তাঁর

লেখায় ইউরোপের কথা উল্লেখ করেননি, পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান বা তার প্রতি কোনও আগ্রহেরও প্রকাশ ঘটাননি। কিন্তু সুন্নি ইসলামের পৌরাণিক অনুশীলন তাঁকে ইউরোপিয় আলোকনের কিছু কিছু নীতিমালাকে আলিঙ্গন করতে চালিত করেছে।[২৫]

ইরানের ক্ষেত্রেও একই রকম ছিল ব্যাপারটা। এই দেশের এই সময়ের ইতিহাস মিশরের তুলনায় ভালোভাবে লিখিত আছে। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাফাভিয়রা ইরান জয় করে শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রের সরকারী ধর্মে পরিণত করে। এর আগে পর্যন্ত শিয়া মতবাদ বুদ্ধিবৃত্তিক ও অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় অভিজাত আন্দোলন ছিল; নীতিগতভাবে শিয়ারা রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিল। ইরানে সব সময়ই কিছু প্রধান শিয়া কেন্দ্র ছিল, তবে বেশির ভাগ শিয়াই ছিল আরব, পারসি নয়। সুতরাং, ইরানে সাফাভিয় পরীক্ষা ছিল এক বিস্ময়কর উদ্ভাবন। সুন্নি ও শিয়াদের ভেতর কোনও মতবাদগত বিরোধ নেই, পার্থক্যটা স্পষ্টতই আবেগজাত। সুন্নিরা মূলত মুসলিম ইতিহাসের বেলায় আশাবাদী, অন্যদিকে শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি ট্র্যাজিক: পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) বংশধরদের পরিণতি শুভ ও অশুভ, ন্যায়বিচার ও স্বৈরাচারের মাঝে মহাজাগতিক যুদ্ধের একটা প্রতীকে পরিণত হয়েছে, যেখানে দুষ্টই যেন সব সময় জয় লাভ করছে বলে মনে হয়। সুন্নিরা যেখানে মুহাম্মদের (স) জীবনকে মিথে পরিণত করেছে, শিয়ারা তাঁর বংশধরদের জীবনকে পুরাণে পরিণত করেছে। শিয়া বিশ্বাস উপলব্ধির জন্যে—যা না হলে ১৯৭৮-৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের মতো ঘটনাবলী বোধের অতীত—আমাদের অবশ্যই সংক্ষেপে শিয়া বিশ্বাসের বিকাশ বিবেচনা করতে হবে।

৬৩২ সালে পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) পরলোকগমন করার সময় উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্যে কোনও ব্যবস্থা রেখে যাননি। তাঁর বন্ধু আবু বকর *উম্মাহ্*র সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মাধ্যমে খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। অবশ্য কেউ কেউ বিশ্বাস করত যে, মুহাম্মদ (স) হয়তো তাঁর নিকটতম পুরুষ আত্মীয় আলি ইবন আবি তালিবই তাঁর উত্তরাধিকারী হোক, এটাই চাইতেন, তিনি ছিলেন তাঁর পোষ্য, চাচাত ভাই ও মেয়ে জামাই। কিন্তু ৬৩৬ সালে চতুর্থ খলিফা হওয়ার আগ পর্যন্ত আলিকে বিভিন্ন নির্বাচনে ক্রমাগত বাদ দিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শিয়ারা অবশ্য প্রথম তিন খলিফার শাসনকে স্বীকার করে না। আলিকেই তারা প্রথম ইমাম ('নেতা') আখ্যায়িত করে থাকে। আলির ধার্মিকতা ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি তাঁর অফিসারদের উদ্দেশে ন্যায়বিচার ভিত্তিক বিচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে চিঠি লিখেছেন। অবশ্য ৬৩৬ সালে দুঃখজনকভাবে এক মুসলিম চরমপন্থীর হাতে নিহত হন তিনি। শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে এই ঘটনা শোকের সাথে স্মরণ করে থাকে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী

WWW.AMARBOI.COM

মুয়াবিয়াহ খেলাফতের সিংহাসন দখল করে নেন এবং দামাস্কাস ভিত্তিক অধিকতর ইহজাগতিক উমাঈয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আলির বড় ছেলে হাসান, শিয়ারা যাঁকে দ্বিতীয় ইমাম বলে থাকে, রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৬৬৯ সালে মদিনায় পরলোকগমন করেন। কিন্তু ৬৮০ সালে খলিফা মুয়াবিয়াহ মারা গেলে ইরাকের কুফায় আলির দ্বিতীয় ছেলে হুসেইনের পক্ষে বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উমাঈয়াদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ এড়াতে হুসেইন মক্কায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করেন, কিন্তু নতুন উমাঈয়া খলিফা ইয়াযিদ তাঁকে হত্যা করাতে মক্কার পবিত্রতা লঙ্ঘন করে পবিত্র নগরে দূত পাঠায়। তৃতীয় শিয়া ইমাম হুসেইন এই অন্যায় ও অপবিত্র শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দায়িত্ব মনে করেন। স্ত্রী ও সন্তানসহ পঞ্চাশ জনের একটা দল নিয়ে কুফার পথে রওয়ানা হন তিনি, ভেবেছিলেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পয়গম্বরের উত্তরাধিকারীদের এই করুণ মিছিলের দৃশ্য উম্মাহকে আবার ইসলামের সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু আরব দশম মাস মুহররমের আশুরার পবিত্র উপবাসের দিনে উমাঈয়া বাহিনী কুফার বাইরে কারবালার প্রান্তরে হুসেইনের ক্ষুদ্র বাহিনীকে ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করে। সবার শেষে নিহত হন হুসেইন, তখন তাঁর কোলে ছিল তাঁর শিশু পুত্র।[২৬]

কারবালা ট্র্যাজিডি নিজস্ব কাল্ট গড়ে তুলবে এবং প্রত্যেক শিয়ার ব্যক্তিগত জীবনের এক সময়হীন ঘটনা, মিথে পরিণত হবে। ইয়াযিদ পরিণত হয়েছে স্বৈরাচার ও অন্যায়ের মূর্ত প্রতীকে। দশম শতাব্দী নাগাদ সাধারণভাবে শিয়ারা আশুরার উপবাসের দিন হুসেইনের শাহাদাৎ বরণের বার্ষিকী পালন করে থাকে, তারা কাঁদে, নিজেদের শরীরে আঘাত করে মুসলিম রাজনৈতিক জীবনের দূষণের চিরন্তন বিরোধিতা ঘোষণা করে। কবিগণ শহীদ আলি ও হুসেইনের সম্মানে মহাকাব্যিক শোকগীতি আবৃত্তি করে থাকেন। এভাবে শিয়ারা কারবালার *মিথোসের* উপর ভিত্তি করে প্রতিবাদের ধার্মিকতা গড়ে তুলেছে। এই কাল্ট শিয়া দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিষয় সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি আবেগঘন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রেখেছে। আশুরা আচারের সময় শিয়ারা যখন ভাবগম্ভীর মিছিলে হেঁটে যায়, তখন তারা হুসেইনকে অনুসরণ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এমনকি মৃত্যু বরণ করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা দেয়।[২৭]

এই মিথ ও কাল্ট গড়ে উঠতে কিছুদিন সময় লেগেছিল। কারবালার পরের প্রথম কয়েক বছর হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া হুসেইনের ছেলে আলি এবং তাঁর ছেলে মুহাম্মদ (যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম ইমাম নামে পরিচিত) মদিনায় চলে যান, তাঁরা কোনও রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেননি। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রথম ইমাম আলি উমাঈয়া শাসনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠা অনেকের কাছেই ন্যায়ের প্রতীকে পরিণত

হয়েছিলেন। আব্বাসিয় উপদল যখন শেষ পর্যন্ত ৭৫০ সালে উমাঈয়া খেলাফত উৎখাত করে তাদের নিজেদের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে (৭৫০-১২৬০), প্রথমে নিজেদের তারা শিয়া-ই আলি (আলির দল) বলে দাবি করেছিল। শিয়ারা আবার কিছু অদ্ভুত আঁচঅনুমানের সাথেও সম্পর্কিত ছিল, বেশির ভাগ মুসলিমই যাকে 'চরম' (*গুলুউ*) মনে করে। ইরাকে মুসলিমরা এক প্রাচীন ও আরও জটিল ধর্মীয় জগতের সংস্পর্শে এসেছিল এবং কেউ কেউ ক্রিশ্চান, ইহুদি বা যোরোস্ট্রিয় মিথলজিতে আকৃষ্ট হয়। কোনও কোনও শিয়া বলয়ে আলিকে জেসাসের মতো ঈশ্বরের অবতার হিসাবে দেখা হত; শিয়া বিদ্রোহীরা মনে করত তাদের নেতারা মারা যাননি বরং আত্মগোপনে (বা 'অকাল্টেশন') আছেন; একদিন তাঁরা ফিরে আসবেন, অনুসারীদের বিজয়ের পথে নিয়ে যাবেন। অন্যরা স্বর্গীয় আত্মার মানুষের সত্তায় অবতরণ ও তাকে স্বর্গীয় জ্ঞান দেওয়ার ধারণায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।[২৮] এইসব মিথ এক পরিবর্তিত রূপে শিয়া নিগূঢ় দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

হুসেইনের সম্মানে সৃষ্ট কাল্ট এক ঐতিহাসিক ট্র্যাজিডিকে শিয়া মুসলিমদের ধর্মীয় দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা মিথে পরিণত করেছে। এটা মানুষের খোদ অস্তিত্বে অব্যাহত কিন্তু অদৃশ্য শুভ ও অশুভের ভেতরকার সংগ্রামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে; আচার অনুষ্ঠান হুসেইনকে তাঁর সময়ের বিশেষ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করে তাঁকে এক জীবিত সত্তায় পরিণত করে; তিনি পরিণত হন গভীর সত্যের প্রতীকে। কিন্তু শিয়াবাদের পুরাণকে বাস্তব বিশ্বে বাস্তবিকভাবে প্রয়োগ করা যাবে না। এমনকি আব্বাসিয় শাসকদের মতো শিয়ারা ক্ষমতা দখল করতে পারলেও রাজনৈতিক জীবনের কর্কশ বাস্তবতা বোঝায় যে তারা ওইসব উচ্চমার্গীয় আদর্শের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করতে পারছিলেন না। আব্বাসিয় খলিফাগণ ইহজাগতিক দিক থেকে অত্যন্ত সফল ছিলেন, কিন্তু ক্ষমতায় আরোহণের পর অল্প সময়ের ভেতরই শিয়া রেডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি বিসর্জন দিয়ে সাধারণ সুন্নিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের শাসন উমাঈয়াদের তুলনায় খুব বেশি ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়নি; কিন্তু প্রকৃত শিয়াদের পক্ষে বিদ্রোহ করা ছিল অর্থহীন, কারণ প্রয়োজনের খাতিরেই যেকোনও বিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হত। প্রকৃতপক্ষেই হুসেইনের মিথ যেন বোঝাতে চেয়েছে স্বৈরাচারী শাসকের বিরোধিতা করার যেকোনও প্রয়াসই ব্যর্থ হতে বাধ্য, সেটা ন্যায়বিচারের পক্ষে যত ধার্মিক ও উৎসাহী হোক না কেন।

ষষ্ঠ শিয়া ইমাম জাফর আস-সাদিক (মৃ. ৭৬৫) এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলে আনুষ্ঠানিকভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনিই *উম্মাহর* একমাত্র বৈধ নেতা (ইমাম) হলেও কোনও অর্থহীন বিরোধে জড়ানো সত্যিকারের কাজ নয়, বরং ঐশীগ্রন্থের অতীন্দ্রিয়

ব্যাখ্যায় শিয়াদের পথ নির্দেশ করাই তাঁর দায়িত্ব। আলির বংশের প্রত্যেক ইমাম, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর প্রজন্মের আধ্যাত্মিক নেতা। ইমামদের প্রত্যেকে তাঁর পূবসুরী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি তাঁকে স্বর্গীয় সত্যের গোপন জ্ঞান *(ইলম)* দিয়ে গেছেন। সুতরাং একজন ইমাম ভ্রান্তির অতীত আধ্যাত্মিক নির্দেশক ও নিখুঁত বিচারক। এভাবে শিয়ারা রাজনীতি ছেড়ে কোরানের প্রতিটি শব্দের পেছনে লুকানো গোপন *(বাতিন)* প্রজ্ঞা অনুভব করতে ধ্যানের কৌশল চর্চা করার মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। শিয়ারা ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদে সন্তুষ্ট ছিল না, নতুন দর্শনের ভিত্তি হিসাবে টেক্সটকে কাজে লাগাত তারা। তাদের ঐশী অনুপ্রাণিত ইমামের প্রতীকীবাদ পবিত্র সত্তার শিয়া অনুভূতি তুলে ধরে যা একজন অতীন্দ্রিয়বাদী এই উত্তাল বিপজ্জনক বিশ্বে সর্বব্যাপী ও সুগম হিসাবে আবিষ্কার করে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপযোগী মতবাদ ছিল না এটা, একে তারা আনাড়ীভাবে ব্যাখ্যা করে বসতে পারত; তো শিয়াদের অবশ্যই তাদের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নিজের কাছে রাখতে হবে। জাফর আস-সাদিক কর্তৃক বিকশিত ইমামতির মিথলজি ছিল একটি কল্পনানির্ভর দর্শন যা ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক ও বাস্তব ভিত্তিক অর্থের অতীতে অনুসন্ধান ও ইতিহাসকে অদৃশ্যের *(আল-গায়েব)* অটল, আদিম বাস্তবতা হিসাবে দেখে। দীপ্তিহীন যেখানে কেবল একজন মানুষকে দেখেছে, ধ্যানী শিয়া জাফর আস-সাদিকের মাঝে স্বর্গীয় আভাস দেখতে পেয়েছে।[২৯]

ইমামত দৈনন্দিন জীবনের খুঁত ও ট্র্যাজিক পরিস্থিতিতে আল্লাহ'র ইচ্ছা বাস্তাবায়নের চরম অসুবিধাও প্রতীকায়িত করেছে। জাফর আস-সাদিক কার্যকরভাবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, ধর্মবিশ্বাসকে ব্যক্তি পর্যায়ে এনে একে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বলয়ে সীমিত করেছেন। এটা তিনি করেছেন ধর্মকে বাঁচাতে ও এমন বিশ্বে একে বেঁচে থাকতে সক্ষম করে তুলতে যাকে আবিশ্যিকভাবেই এর প্রতি বৈরী মনে হয়। এক গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণা থেকেই এই সেক্যুলারাইজেশন নীতির উদ্ভব ঘটেছিল। শিয়ারা জানত ধর্মের সাথে রাজনীতির মিশ্রণ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এক শতাব্দী পরে এটা করুণভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৮৩৬ সালে আব্বাসিয় খলিফাগণ বাগদাদের আনুমানিক ষাট মাইল দক্ষিণে সামারায় রাজধানী সরিয়ে নেন। ততদিনে আব্বাসিয়দের শক্তি ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিল, খলিফা গোটা মুসলিম বিশ্বের নামমাত্র শাসক থাকলেও সাম্রাজ্য জুড়ে মূল কর্তৃত্ব ছিল স্থানীয় আমির ও সর্দারদের হাতে। খলিফাগণ মনে করলেন এমন একটা অস্থির সময়ে তাঁদের পক্ষে পয়গম্বরের উত্তরাধিকারী ইমামদের এভাবে মুক্ত থাকতে দেওয়া সম্ভব নয়। ৮৪৮ সালে খলিফা আল-

AMARBOI.COM

মুতাওয়াক্কিল দশম ইমাম আলি আল-হাদিকে মদিনা থেকে সামারায় তলব করেন। এখানে তাঁকে গৃহবন্দি করা হয়। তিনি ও তাঁর ছেলে একাদশ ইমাম হাসান আল-আশারি শিয়াদের সাথে কেবল প্রতিনিধি *(ওয়াকিল)*-র মারফত যোগাযোগ রাখতে পারছিলেন। বাগদাদের বাণিজ্য এলাকা আল-কার্খ-এ থেকে আব্বাসিয় কর্তৃপক্ষের মনোযোগ এড়াতে ব্যবসা করত তারা।[৩০]

৮৭৪ সালে একাদশ ইমাম পরলোকগমন করেন, সম্ভবত খলিফার ইঙ্গিতে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল তাঁকে। তাঁকে এমন ভীষণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়েছিল যে শিয়ারা তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না। তাঁর কি কোনও ছেলে ছিল? যদি না থাকে তো কে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে? তাঁর বংশধারা কি শেষ হয়ে গেছে? যদি তাই হয়, তার মানে কি তবে শিয়ারা অতিন্দ্রীয় নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে? প্রবল হয়ে উঠেছিল আঁচঅনুমান, তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় মতবাদ জোরের সাথে জানাল যে, হাসান আল-আশারির সত্যিই একজন ছেলে ছিল, আবু আল কাসিম মুহাম্মদ, দ্বাদশ ইমাম; জীবন বাঁচাতে আত্মগোপন করেছেন তিনি। আকর্ষণীয় সমাধান ছিল এটা, কারণ এখানে বোঝানো হয়েছে যে কিছুই বদলায়নি। শেষ দুজন ইমাম কার্যত অগম্য ছিলেন। এখন গোপন ইমাম তাঁর *ওয়াকিল* উসমান আল-আমরির মারফত জনগণের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পারবেন। এই *ওয়াকিল* আধ্যাত্মিক পরামর্শ দিতে পারবেন, যাকাতের দান সংগ্রহ করবেন, ঐশীগ্রন্থ ব্যাখ্যা করবেন ও আইনি সিদ্ধান্ত দেবেন। কিন্তু এই সমাধানের আয়ু ছিল সীমিত। দ্বাদশ ইমামের জীবিত থাকার সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ামাত্র শিয়ারা আবার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে শুরু করল। তারপর ৯৩৪ সালে বর্তমান প্রতিনিধি আলি ইবন মুহাম্মদ আস-সামারি গোপন ইমামের কাছ থেকে শিয়াদের জন্যে এক বার্তা নিয়ে এলেন। তিনি পরলোকগমন করেননি। বরং আল্লাহ অলৌকিকভাবে তাঁকে আড়াল করেছেন; শেষ বিচারের আগে আগে ন্যায়বিচারের যুগের সূচনা ঘটাতে আবার ফিরে আসবেন তিনি। এখনও তিনি শিয়াদের ভুলের অতীত নির্দেশক ও *উম্মাহ্*র একমাত্র বৈধ শাসক রয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাসীদের সাথে তিনি আর প্রতিনিধি মারফত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বজায় রাখতে পারবেন না। শিয়াদের তাঁর দ্রুত প্রত্যাবর্তন আশা করা ঠিক হবে না। তারা তাঁকে কেবল 'দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাবার পর ও পৃথিবী স্বৈরাচারে পরিপূর্ণ হলেই আবার দেখতে পাবে।'[৩১]

গোপন ইমামের 'অকাল্টেশনে'র মিথ যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কেবল অতীন্দ্রিয়বাদ ও আচরিক অনুশীলনের প্রেক্ষাপটেই এটা অর্থ প্রকাশ করে। আমরা যদি গল্পটি *লোগোস* হিসাবে বুঝে থাকি, বাস্তব ঘটনার মামুলি বিবরণ হিসাবে যদি আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, সবরকম প্রশ্ন উঠে আসে। ইমাম

AMARBOI.COM

গেছেন কোথায়? তিনি পৃথিবীতেই আছেন নাকি কোনও ধরনের মধ্যবর্তী বলয়ে? সেখানে তাঁর জীবন কেমন হতে পারে? তিনি কি ক্রমেই বুড়িয়ে যাচ্ছেন? বিশ্বাসীরা তাঁকে দেখতে বা তাঁর কথা শুনতে না পেলে কেমন করে তিনি তাদের পথ দেখাবেন? যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে মনের অধিকতর স্বজ্ঞামূলক শক্তির উপর নির্ভরশীল *বাতিন* বা ঐশীগ্রন্থের গোপন অর্থের সুশৃঙ্খল অনুশীলনে সংশ্লিষ্ট এমন কোনও শিয়ার কাছে এইসব প্রশ্ন ভোঁতা মনে হবে। শিয়ারা তাদের ঐশীগ্রন্থ ও মতবাদ আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করেনি। তাদের সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা অদৃশ্যের *(আল-গায়েব)* প্রতীকী অনুসন্ধানে পরিণত হয়েছিল যা বাইরের *(যাহির)* ঘটনাপ্রবাহের আড়ালে থাকে। শিয়ারা এক অদৃশ্য, দুর্বোধ্য আল্লাহর উপাসনা করে থাকে, কোরানের গুপ্ত অর্থের সন্ধান করে, এক গোপন ইমামের আকাঙ্ক্ষায় ছিল তারা, ন্যায় বিচারের জন্যে অন্তহীন কিন্তু অদৃশ্য লড়াইতে অংশ নিয়েছে এবং ইসলামের এক নিগূঢ় ভাষ্য চর্চা করেছে যাকে পার্থিব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছে।[৩২] এই ব্যাপক ধ্যানমুখী জীবনই ছিল অকাল্টেশনের মানে তুলে ধরা পটভূমি। গোপন ইমাম মিথে পরিণত হয়েছিলেন, স্বাভাবিক ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে সময় ও কালের সীমা থেকে মুক্ত করা হয়েছে; প্যারাডক্সিকালি তিনি ও অন্যান্য ইমাম মদিনা বা সামারায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করার সময় যতখানি ছিলেন তারচেয়ে ঢের বেশি উজ্জ্বল সত্তায় পরিণত হয়েছিলেন। অকাল্টেশন এমন এক মিথ যা আমাদের পবিত্রের বোধকে অধরা ও হতবুদ্ধিকরভাবে অনুপস্থিত রূপে তুলে ধরে। জগতে উপস্থিত থাকলেও এটা এর অংশ নয়; স্বর্গীয় প্রজ্ঞা মানুষ থেকে অবিচ্ছেদ্য (কারণ মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কেবল ঈশ্বরসহ কোনও কিছু সম্পর্কে ধারণা করতে পারি), কিন্তু আমাদের তা সাধারণ নারী-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। অন্য যেকোনও মিথের মতো অগোছাল যুক্তি দিয়ে অকাল্টেশন বোঝা যাবে না, যেন বা তা স্বয়ংপ্রকাশিত সত্যি বা যৌক্তিক প্রদর্শনীর উপযুক্ত। বরং তা মানুষের ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় একটি মিথকে তুলে ধরে।

যেকোনও নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতার মতো শিয়া মতবাদ এই পর্যায় পর্যন্ত কেবল অভিজাত গোষ্ঠীর ব্যাপার ছিল। অতীন্দ্রিয় ধ্যানের মেধা ও চাহিদা সম্পন্ন অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দুঃসাহসী মুসলিমরাই এতে আকৃষ্ট হচ্ছিল বেশি। কিন্তু শিয়াদের অন্য মুসলিমদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সুন্নি ইসলামের আচার ও অনুশীলন যেখানে সুন্নি মুসলিমদের জীবন যেমন সেভাবেই মেনে নিয়ে আদর্শ জগতের রীতিনীতি মোতাবেক চলতে সাহায্য করেছে সেখানে শিয়া অতীন্দ্রিয়বাদ স্বর্গীয় অসন্তোষ তুলে ধরেছে। অকাল্টেশনের মতবাদ প্রচারিত হওয়ার অল্প পরেই বিকাশ লাভ করা প্রথম দিকের ট্র্যাডিশনসমূহ দশম শতাব্দীতে

বহু শিয়ার অনুভূত হতাশা ও অক্ষমতা তুলে ধরেছে।[৩৩] একে বলা হত 'শিয়া শতাব্দী', কারণ ইসলামি সাম্রাজ্যের বহু অধিনায়ক যারা কোনও এক বিশেষ এলাকায় কার্যকর ক্ষমতা ভোগ করতেন তাদের প্রায় সবারই শিয়া মতবাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু সেকারণে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। কোরানের পরিষ্কার শিক্ষা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে জীবন তখনও ছিল অন্যায় ও সমতাহীন। প্রকৃতপক্ষেই, সকল ইমামই শিয়াদের চোখে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অবৈধ শাসকগোষ্ঠীর হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। ট্র্যাডিশন আছে যে, উমাঈয়া ও আব্বাসিয় খলিফারা হুসেইনের পরের প্রত্যেক ইমামকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন। আরও ন্যায়বিচার ভিত্তিক ও উদার সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে শিয়ারা শেষ যুগে গোপন ইমামের চূড়ান্ত আবির্ভাব *(যুহুর)*-এর উপর ভিত্তি করে পরকালতত্ত্বের বিকাশ ঘটায়, যখন তিনি ফিরে এসে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন ও চূড়ান্ত বিচারের আগে ন্যায়বিচার ও শান্তির এক সোনালি যুগের প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু সমাপ্তির জন্যে এই আকাঙ্ক্ষার মানে শিয়ারা রক্ষণশীল রীতি ত্যাগ করে ভবিষ্যৎমুখী হয়ে গেছে, এমন ছিল না। তারা আদি আদর্শ জগতের প্রতি এত প্রবলভাবে সজাগ ছিল, পরিস্থিতির যেমনটা হওয়া উচিত ছিল, তাদের চোখে সাধারণ রাজনৈতিক জীবন অসহনীয় ঠেকেছে। গোপন ইমাম এই বিশ্বে নতুন কিছু নিয়ে আসবেন না, তিনি স্রেফ মানুষের ইতিহাসকে পরিশুদ্ধ করবেন যাতে মানুষের কর্মকাণ্ড অস্তিত্বের মৌলিক নীতিমালার অনুগামী হয়। একইভাবে ইমামদের 'আবির্ভাব' গভীরতর অর্থে সব সময় অস্তিত্ব ছিল এমন কিছুকে প্রকাশ করবে মাত্র, কারণ গোপন ইমাম শিয়ার জীবনে এক ধ্রুব অস্তিত্ব, তিনি আল্লাহর অধরা আলোকে এক অন্ধকার স্বৈরাচারী পৃথিবীতে তুলে ধরেন এবং তিনিই আশার একমাত্র উৎস।

ষষ্ঠ ইমাম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিসর্জন দিয়ে ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর সূচিত অকাল্টেশন শিয়া ইতিহাসের পুরাণে রূপান্তরের কাজটি শেষ করেছিল। মিথ বাস্তবভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে কোনও নীল নকশার যোগান দেয় না, বরং বিশ্বাসীকে তার সমাজের দিকে চোখ ফেরাতে ও অন্তস্থঃ জীবনকে বিকাশ করতে শেখায়। অকাল্টেশনের মিথ শিয়াদের চিরকালের মতো বিরাজনীতি করে দিয়েছিল। জাগতিক শাসকদের শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে অর্থহীন ঝুঁকি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই শিয়াদের। যাকে আত্মগোপনে যেতে হয়, চলমান বিশ্বে বাস করতে অক্ষম ন্যায়বিচারক একজন ইমামের ইমেজ শিয়াদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতাই তুলে ধরে। যুগের প্রকৃত প্রভু গোপন ইমামের কর্তৃত্বকে ছিনিয়ে নিয়েছে বলে এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে যেকোনও সরকারকেই

AMARBOI.COM

অবৈধ বিবেচনা করতে হয়েছে। সুতরাং, পার্থিব শাসকদের কাছ থেকে কিছুই আশা করার ছিল না, যদিও বেঁচে থাকার স্বার্থে শিয়াদের অবশ্যই ক্ষমতাসীনদের সাথে সহযোগিতা করতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করবে তারা, কেবল 'দীর্ঘ সময় শেষে' শেষ যুগেই পৃথিবীতে আসন্ন এক ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা করবে। তারা কেবল ইমামদের সাবেক 'প্রতিনিধি'দের স্থান গ্রহণকারী শিয়া *উলেমা*দের একক কর্তৃত্বই মেনে নেবে। শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা ও স্বর্গীয় আইনে দক্ষতার কারণে *উলেমা*গণ গোপন ইমামের সহকারীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তাঁর নামে বক্তব্য রাখতেন। কিন্তু সকল সরকারই অবৈধ থাকায় *উলেমা*দের অবশ্যই রাজনৈতিক পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল।[৩৪]

এভাবে শিয়ারা নীরবে রাজনীতির পূর্ণাঙ্গ সেক্যুলারাইজেশন সমর্থন দিয়েছিল যাকে তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি নীতির লঙ্ঘন মনে হতে পারে, যেখানে রাষ্ট্র ও ধর্মের এজাতীয় বিচ্ছিন্নতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এক ধর্মীয় দর্শন থেকে এই বিচ্ছিন্নতার মিথলজির উদ্ভব হয়েছে। প্রায় সকলেই গুপ্তহত্যার শিকার, কারাবন্দি, দেশান্তরী এবং সবশেষে খলিফাদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়েছেন এমন ইমামদের কিংবদন্তী রাজনীতি ও ধর্মের মৌল সমন্বয়হীনতা তুলে ধরে। রাজনৈতিক জীবন *লোগোসের* এখতিয়ার, একে অবশ্যই ভবিষ্যৎমুখী, বাস্তবভিত্তিক হতে হবে, একে আপোস করতে জানতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে, যৌক্তিক ভিত্তিতে সমাজকে সংগঠিত করতে হবে। একে ধর্মের চরম চাহিদা ও জমিনে জীবনের গম্ভীর বাস্তবতার ভেতর ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। প্রাক আধুনিক কৃষিভিত্তিক সমাজ একটি মৌলিক বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত ছিল, এটা কৃষকদের শ্রমের উপর নির্ভর করত যারা সভ্যতার ফল ভোগ করতে পারত না। অ্যাক্সিয়াল যুগের (c. ৭০০-২০০ বিসিই) মহান কনফেশনাল ধর্মগুলোর সবকটাই এই টানাপোড়েনে ব্যস্ত ছিল, একে সামাল দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। সম্পদের পরিমাণ যেখানে অপ্রতুল আর যেখানে প্রযুক্তি ও যোগাযোগের অভাব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কঠিন করে তোলে, সেখানে রাজনীতি অনেক বেশি নিষ্ঠুর ও আগ্রাসীভাবে বাস্তবভিত্তিক হয়ে ওঠে। সুতরাং, যেকোনও সরকারের পক্ষে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী সরকার পরিচালনা বা এর ঘাটতিসমূহ দুঃখজনকভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া স্বর্গীয় প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক ইমামদের অস্তিত্ব সহ্য করা ছিল অসম্ভব। ধর্মীয় নেতারা যাচ্ছেতাই অপচয়ের বিরুদ্ধে নিন্দা, সমালোচনা বা প্রতিবাদ জানাতে পারতেন, কিন্তু এক ধরনের করুণ অর্থে পবিত্রকে হয় প্রান্তিকায়িত বা সীমার ভেতর রাখতে হয়েছে, যেমন করে খলিফাগণ সামারার আসকারী দুর্গে ইমামদের আটক করে রেখেছিলেন। কিন্তু এক আদর্শের প্রতি শিয়া ভক্তিতে মাহাত্ম্য ছিল যাকে অবশ্যই

টিকিয়ে রাখার দরকার ছিল, যদিও গোপন ইমামের মতো সেটা ছিল সুপ্ত এবং বর্তমানে স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্বে কাজ করতে অক্ষম।

শিয়া মতবাদ পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হলেও তার মানে তা অযৌক্তিক ছিল না। আসলে শিয়াবাদ সুন্নাহর চেয়ে ইসলামের অধিকতর যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিয়ারা আবিষ্কার করেছিল যে, তারা মুতাযিলি নামে পরিচিত সুন্নি ধর্মতাত্ত্বিকদের সাথে সহমত পোষণ করে। কোরানের বিভিন্ন মতবাদকে যৌক্তিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এরা। অন্যদিকে মুতাযিলিরাও শিয়া মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। প্যারাডক্সিকালি অকাল্টেশনের অযৌক্তিক মতবাদ শিয়া *উলেমাদের* সুন্নি *উলেমাদের* চেয়ে কর্মকাণ্ডের বাস্তব জগতে তাদের অনেক বেশি ক্ষমতা প্রয়োগের স্বাধীনতা দিয়েছিল। গোপন ইমাম আর নাগালের মধ্যে না থাকায় বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হত তাদের। সুতরাং, শিয়া মতবাদে সুন্নাহর মতো *'ইজতিহাদের* দুয়ার' কোনওদিনই রুদ্ধ হয়নি।[৩৫] এটা ঠিক, শিয়ারা প্রথমে ইমাম অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় মানসিকভাবে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ একজন বিশিষ্ট ও জ্ঞানী শিয়া যাজক ঠিক *মুজতাহিদ* হিসাবেই পরিচিত ছিলেন, *ইজতিহাদের* যৌক্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষমতাশালী বলে মনে করা হত তাঁকে।

অবশ্য শিয়া যুক্তিবাদ আমাদের বর্তমান পাশ্চাত্যের সেক্যুলারাইজড যুক্তিবাদ হতে ভিন্ন ছিল। শিয়ারা প্রায়শঃই সমালোচনামূলক চিন্তাবিদ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, একাদশ শতাব্দীর পণ্ডিত মুহাম্মদ আল-মুইদ ও মুহাম্মদ আল-তুসি পয়গম্বর ও তাঁর কয়েকজন সহচরের *হাদিস* প্রতিবেদনের সঠিকতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, তাঁদের মতবাদের সমর্থনে এইসব অবিশ্বস্ত ট্র্যাডিশন উদ্ধৃত করা যথেষ্ট হবে না, বরং তার বদলে যাজকদের উচিত হবে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা; কিন্তু তারপরেও তাঁদের তুলে ধরা যৌক্তিক বক্তব্য আধুনিক সংশয়বাদীকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ, তুসি ইমামতের মতবাদ 'প্রমাণ' করতে গিয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যেহেতু আল্লাহ শুভ ও তিনি আমাদের মুক্তি চান, তো এটা বিশ্বাস করাই যুক্তিসঙ্গত যে তিনিই আমাদের অনির্বচনীয় পথ-নির্দেশ যোগাবেন। নারী-পুরুষ সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করতে *পারে*, কিন্তু স্বর্গীয় বিধি এই বিষয়টিকে আরও জরুরি করে তোলে। এমনকি তুসিও অকাল্টেশনের পক্ষে যুক্তি খুঁজতে গিয়ে দিশাহারা বোধ করেছেন।[৩৬] কিন্তু শিয়াদের কাছে এটা অস্বস্তিকর ছিল না। *মিথোস* ও *লোগোস*, যুক্তি ও প্রত্যাদেশ, পরস্পর বিরোধী ছিল না, বরং স্রেফ একটি অপরটি থেকে ভিন্ন এবং সম্পূরক। আধুনিক পশ্চিমে আমরা যেখানে সত্যির উৎস হিসাবে মিথোলজি ও অতীন্দ্রিয়বাদকে নাকচ

করে কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করে থাকি; তুসির মতো একজন চিন্তাবিদ চিন্তার উভয় পথকেই বৈধ ও প্রয়োজনীয় হিসাবে দেখেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, অতীন্দ্রিয় ধ্যানে মগ্ন থাকার সময় নিখুঁত অর্থ প্রকাশকারী মতবাদসমূহ ইসলামি প্রেক্ষিতেও যুক্তিসঙ্গত। ধ্যানের অন্তর্মুখী কৌশলসমূহ এমন অন্তর্দৃষ্টির যোগান দেয় যেগুলো তাদের নিজস্ব বলয়ে সঠিক, কিন্তু সেগুলোকে *লোগোসের* সৃষ্টি কোনও গাণিতিক সমীকরণের মতো যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ করা যাবে না।

পঞ্চদশ শতকের শেষ নাগাদ, আমরা যেমন দেখেছি, বেশিরভাগ শিয়াই আরব ছিল এবং শিয়াবাদ বিশেষত ইরাকে দুটি উপাসনালয়ের শহর যথাক্রমে ইমাম আলি ও ইমাম হুসেইনের প্রতি নিবেদিত নাজাফ ও কারবালায় শক্তিশালী ছিল। বেশিরভাগ ইরানিই ছিল সুন্নি, যদিও ইরানি শহর কুম সব সময়ই শিয়াদের কেন্দ্র ছিল। রাঈ, কাশা ও খোরাশানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিয়ার বাস ছিল। তো সুফিবাদের সাফাভিয় ধরনের নেতা উনিশ বছর বয়স্ক শাহ ইসমাইলকে স্বাগত জানানোর মতো ইরানি ছিল। ১৫০১ সালে তাব্রিয দখল করেন তিনি ও পরের এক দশকের মধ্যেই ইরানের বাকি অংশ অধিকার করে নেন। তিনি ঘোষণা করেন, শিয়া মতবাদই নতুন সাফাভিয় সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র ধর্ম হবে। নিজেকে সপ্তম ইমামের বংশধর দাবি করেছিলেন ইসমাইল, যা তাঁকে অন্য মুসলিম শাসকদের যা ছিল না সেই বৈধতা দিয়েছে বলে বিশ্বাস করতেন।[৩৭]

কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবেই শিয়া ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি ছিল। 'দ্বাদশবাদী' (দ্বাদশ ইমামের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার কারণে) অধিকাংশ শিয়া বিশ্বাস করত যে, গোপন ইমামের অনুপস্থিতিতে কোনও সরকারই বৈধ হতে পারে না।[৩৮] তাহলে কেমন করে 'রাষ্ট্রীয় শিয়াবাদ' থাকতে পারে? এতে অবশ্য ইসমাইলের কোনও সমস্যা হয়নি। দ্বাদশবাদী অর্থভক্তি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা ছিল না তাঁর। মঙ্গোল আগ্রাসনের অব্যবহতি পরে প্রতিষ্ঠিত অতীন্দ্রিয় ভ্রাতৃসংঘ সাফাভিয় গোষ্ঠী মূলত সুফি সংস্থা ছিল কিন্তু প্রাচীন শিয়া মতবাদের বহু 'চরম' *(গুলুউ)* ধারণা গ্রহণ করেছিল। ইসমাইল বিশ্বাস করতেন যে, ইমাম আলি স্বর্গীয় ছিলেন, এবং স্বর্ণযুগের উদ্বোধন ঘটাতে অচিরেই ফিরে আসবেন শিয়া মেসায়াহ। তিনি হয়তো শিষ্যদের এও বলে থাকতে পারেন যে, তিনিই সেই গোপন ইমাম, অড়াল ছেড়ে বের হয়ে এসেছেন। সাফাভিয় ব্যবস্থা ছিল প্রান্তিক, জনপ্রিয়তামুখী বিপ্লবী দল, শিয়া বিশেষ নিগূঢ় ধারা থেকে অনেক ভিন্ন।[৩৯] শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসমাইলের কোনও রকম দ্বিধা ছিল না, জাফর আস-সাদিকের আমল থেকেই শিয়ারা যেমন করে আসছিল, সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একটা সভ্য *মোদাস ভিভেন্দি*'র খোঁজ করার বদলে ধর্মান্ধভাবে সুন্নি বিরোধী ছিলেন তিনি। অটোমান ও সাফাভিয় সাম্রাজ্যে এক নতুন উপদলীয়

AMARBOI.COM

অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়েছিল; একই সময়ে ইউরোপে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের ভেতর দেখা দেওয়া বিবাদের চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না সেটা। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অটোমানরা তাদের এলাকায় শিয়াদের প্রান্তিকায়িত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ইসমাইল যখন ইরানে আবির্ভূত হন, তিনিও সমানভাবে সেখানকার সুন্নাহকে নিশ্চিহ্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন।[৪০]

অবশ্য সাফাভিয়দের এটা আবিষ্কার করতে বেশি সময় লাগেনি যে, বিরোধী অবস্থানে থাকার সময় মেসিয়ানিক 'চরমপন্থী' আদর্শ কাজে এলেও এখন ক্ষমতায় আসার পর সেটা জুৎসই ঠেকছে না। প্রাচীন গুলুউ ধর্মতত্ত্ব মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাহ প্রথম আব্বাস (১৫৮৮-১৬২০) আমলাতন্ত্র থেকে চরমপন্থীদের বরখাস্ত করেন। দ্বাদশবাদী অর্থডক্সি প্রচারের জন্যে আরব থেকে শিয়া *উলেমাদের* আমদানি করেন তিনি। নতুন রাজধানী ইস্পাহান ও হিল্লায় তাঁদের জন্যে *মাদ্রাসা* নির্মাণ করেন, তাঁদের পক্ষে সম্পত্তি অর্পণ করেন *(ওয়াকফ)* ও উপহার হাতে তাঁদের উপহার দেন। গোড়ার দিকে এই পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন ছিল, কারণ নতুন অভিবাসী হিসাবে *উলেমারা* শাহর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু অনিবার্যভাবে শিয়া মতবাদের প্রকৃতি পাল্টে দিয়েছিলেন। শিয়ারা সব সময়ই সংখ্যালঘু দল ছিল। তাদের নিজস্ব *মাদ্রাসা* ছিল না, সব সময়ই একে অন্যের বাড়িতে পড়াশোনা করেছেন, বিতর্ক করেছেন। এখন শিয়ারা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছিল। ইস্পাহান শিয়া মতবাদের সরকারী বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়।[৪১] শিয়ারা সব সময়ই এর আগে সরকার থেকে দূরে অবস্থান করেছে, কিন্তু এখন *উলেমাগণ* ইরানের শিক্ষা ও আইনি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং আরও নির্দিষ্টভাবে সরকারের ধর্মীয় দায়িত্বও হাতে তুলে নিয়েছিলেন। প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র ছিল ইরানিদের সমন্বয়ে গঠিত, তখনও সুন্নাহর প্রতি অনুগত ছিল তারা, সুতরাং, তাদের আরও বেশি সেক্যুলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইরানি সরকারে সেক্যুলার ও ধর্মীয় বলয়ে একটা চলমান বিভাজন দেখা দিয়েছিল।[৪২]

উলেমাগণ অবশ্য সাফাভিয় রাষ্ট্র সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। তখনও তাঁরা সরকারী পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলেন, নিজেদের প্রজা হিসাবে দেখতেই পছন্দ করতেন। সুতরাং, তাদের অবস্থান ছিল অটোমান *উলেমাদের* চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু সহজাতভাবে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। শাহদের উদারতা ও পৃষ্ঠপোষকতা *উলেমাদের* অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন করে দিয়েছিল। অটোমান ও তাদের উত্তরাধিকারীরা যেখানে সব সময়ই ভর্তুকী প্রত্যাহার বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দিয়ে *উলেমাদের* নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, সেখানে শিয়া *উলেমাদের* এভাবে ভয় দেখানোর উপায় ছিল না।[৪৩] ইরানি জনগণের মাঝে শিয়া মতবাদ ছড়িয়ে

পড়ার সাথে সাথে তাঁরা এই বাস্তবতা থেকে লাভবান হচ্ছিলেন যে শাহগণ নন, বরং তাঁরাই গোপন ইমামের একমাত্র প্রকৃত মুখপাত্র। অবশ্য গোড়ার দিকের সাফাভিয়রা *উলেমা*দের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইরানের জনগণ পুরোপুরি শিয়া মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার আগে যাজকগোষ্ঠী সম্পূর্ণ নিজেদের মতো হয়ে উঠতে পারেনি।

কিন্তু ক্ষমতা দুর্নীতিগ্রস্ত করে। *উলেমা*গণ সাফাভিয় সাম্রাজ্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার সাথে সাথে অনেক বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ ও এমনকি গোঁড়া হয়ে উঠতে লাগলেন। শিয়া মতবাদের কিছু অধিকতর আকর্ষণীয় গুণাবলী চাপা পড়ে যায়। এই নতুন কঠোর পন্থা মূর্ত করে তোলেন সর্বকালের অন্যতম ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী *উলেমা* মুহাম্মদ বাকির মজলিসি (মৃ. ১৭০০)। শত শত বছর ধরে শিয়ারা ঐশীগ্রন্থের এক ধরনের উদ্ভাবনী প্রকৃতির কৌশল অনুসরণ করে এসেছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় ও দার্শনিক আঁচঅনুমানের প্রবল বিরোধী ছিলেন মজলিসি। দুটোই ছিল প্রাচীন নিগূঢ়বাদী শিয়া মতবাদের মূলধারা। তিনি ইরানে অবশিষ্ট সুফিদের উপর নিরলসভাবে নির্যাতনের সূচনা করেন ও ফালসাফাহ নামে পরিচিত দার্শনিক যুক্তিবাদ ও ইস্ফাহানে অতীন্দ্রিয় দর্শন দমন করার প্রয়াস পান। এভাবে অতীন্দ্রিয়বাদ ও দর্শনের প্রতি এক গভীর অবিশ্বাসের সূচনা করেছিলেন তিনি এখনও যা বর্তমান ইরানে টিকে আছে। কোরানের নিগূঢ় পাঠে মগ্ন হওয়ার বদলে শিয়া পণ্ডিতদের ইসলামি জুরিসপ্রুডেন্স *ফিকাহ*র প্রতি মনোনিবেশে উৎসাহিত করা হয়েছে।

হুসেইনের সম্মানে আয়োজিত আচরিক মিছিলের অর্থও পাল্টে দিয়েছিলেন মজলিসি।[৪৪] আরও বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল এসব: এখন সবুজ কাপড়ে ঢাকা উটের পিঠে ইমামের পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে ক্রন্দনরত নারী ও শিশুরা বসে থাকে, সৈনিকরা আকাশের দিকে ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে, গভর্নর, গণ্যমান্য লোকজন ও মানুষের জটলা ইমাম ও তাঁর শাহাদৎ বরণকারী সহচরদের প্রতীক কফিন অনুসরণ করে, এরা ছুরি দিয়ে নিজেদের আঘাত হেনে আহত করে।[৪৫] কারবালা কাহিনীর দারুণ আবেগঘন বর্ণনা–*রাওদা-খানি* ('রাওদাতের আবৃত্তি') নামে পরিচিত বিশেষ অনুষ্ঠানে ইরাকি শিয়া ওয়াইজ কাশিফট (মৃ. ১৫০৪) রচিত *রাওদাহ আশ-শাহাদা রাওদা-খানি জমায়েতে* আবৃত্তি করা হত, জনতা জোরে চিৎকার করে বিলাপ করত, কাঁদত। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে লড়াই করার জনগণের ইচ্ছা তুলে ধরায় এইসব আচারের সবসময়ই এক ধরনের বিপ্লবী সম্ভাবনা ছিল। এখন অবশ্য, জনগণকে হুসেইনকে একটা নজীর হিসাবে দেখার জন্যে উৎসাহিত করার পরিবর্তে মজলিসি ও তাঁর যাজকগোষ্ঠী শিক্ষা দিতে লাগলেন যেন তাঁকে একজন পৃষ্ঠপোষক

AMARBOI.COM

হিসাবে বিবেচনা করা হয় যিনি তাঁর মৃত্যুর জন্যে শোক প্রকাশ করার মাধ্যমে ভক্তি দেখাতে পারলে তাদের বেহেশতে গমন নিশ্চিত করতে পারবেন। এবার স্থিতাবস্থার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে আচার অনুষ্ঠানগুলো জনগণকে শক্তিমানের পক্ষে আনুকূল্য দেখিয়ে কেবল নিজেদের স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখার শিক্ষা দিয়েছে।[৪৬] এটা ছিল পুরোনো শিয়া আদর্শের নপুংসকীকরণ ও অবমূল্যায়ন; এটা রক্ষণশীল রীতিনীতিকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। জনগণকে অস্তিত্বের মৌল বিধিবিধান ও ছন্দের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করার বদলে কাল্টকে কেবল বিপুল জনগোষ্ঠীকে সামাল দিয়ে রাখার কাজে লাগানো হয়েছে। এটা এমন এক পরিবর্তন ছিল যা সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে দেখায় যে, বিধ্বংসী রাজনৈতিক ক্ষমতা ধর্মের কী ক্ষতি করতে পারে।

মজলিসির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ইস্ফাহানে মির দামাদ (মৃ. ১৬৩১) ও শিষ্য মোল্লাহ সদ্রা (মৃ. ১৬৪০) হাতে বিকশিত অতীন্দ্রিয় দর্শন। সদ্রা এমন একজন চিন্তাবিদ ছিলেন ভবিষ্যৎ ইরানি প্রজন্মের উপর যার গভীর প্রভাব সৃষ্টি হবে।[৪৭] মির দামাদ ও মোল্লাহ সদ্রা *উলেমাদের* কারও কারও নতুন অনমনীয় মনোভাবের দারুণ বিরোধী ছিলেন। একে তাঁরা শিয়া মতবাদ, এমনকি প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের সামগ্রিক বিকৃতি বলে বিবেচনা করেছেন। প্রাচীন কালে শিয়ারা ঐশীগ্রন্থের গোপন অর্থ সন্ধানের সময় নীরবে মেনে নিয়েছিল যে স্বর্গীয় সত্যি সীমানাহীন, নতুন নতুন ধারণা সব সময়ই সম্ভব; কোরানের কোনও একক ব্যাখ্যা যথেষ্ট হতে পারে না। মির দামাদ ও মোল্লা সদ্রার চোখে সত্যিকারের জ্ঞান কোনওদিনই বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার ব্যাপার ছিল না। কোনও সাধু বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষই, তিনি যত মহান বা বিশিষ্টই হোন না কেন, সত্যির উপর একচেটিয়া অধিকার দাবি করতে পারেন না।

তাঁরা স্পষ্টভাবে রক্ষণশীল বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে মিথোলজি ও যুক্তি উভয়ই মানব জীবনের পক্ষে আবশ্যক, একটি দিয়ে সম্পূরক না হলে অপরটি হারিয়ে যায়। মির দামাদ ছিলেন স্বভাব বিজ্ঞানী এবং ধর্মতাত্ত্বিকও। মোল্লা সদ্রা *উলেমাদের* পৌরাণিক স্বজ্ঞার দর্শনকে খাট করার জন্যে ও যৌক্তিক চিন্তার গুরুত্বকে বিসর্জন দিতে সুফিদের সমালোচনা করেছেন। প্রকৃত দার্শনিককে অ্যারিস্টটলের মতো যুক্তিবাদী হতে হবে, কিন্তু তারপরই তাঁকে নিজেকে অতিক্রম করে সত্যের এক নিগূঢ় কল্পনা নির্ভর উপলব্ধিতে পৌঁছুতে হবে। উভয় চিন্তকই অবচেতনের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, একে তাঁরা এমন এক পর্যায় হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা ইন্দ্রিয়জ ধারণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিমূর্ততায় অস্তিত্ববান। অতীতে সুফি দার্শনিকগণ এই মনস্তাত্ত্বিক অঞ্চলকে *আলম আল-মিথাল* বা খাঁটি ইমেজের

AMARBOI.COM

জগৎ হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। দিব্যদৃষ্টির বলয় এটা, আমরা যাকে অবচেতন বলব সেখান থেকে আগত, স্বপ্ন ও সম্মোহনী ইমেজারিতে যা মনের চেতন স্তরে উঠে আসে, কিন্তু অতীন্দ্রিয়দের কোনও কোনও অনুশীলন ও স্বজ্ঞামূলক চর্চার মাধ্যমেও যার নাগাল পাওয়া সম্ভব। মির দামাদ ও মোল্লা সদ্রা দুজনই জোর দিয়ে বলেছেন যে, যৌক্তিক বিশ্লেষণে ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেলেও এইসব দিব্য দর্শন কেবল ধারণাগত কল্পনা নয়, বরং এসবের সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা রয়েছে।[৪৮] এগুলোকে 'কাল্পনিক' বলে অবাস্তব হিসাবে বাতিল করার বদলে–একজন আধুনিক যুক্তিবাদী যেমনটা করতে পারে–আমাদের উচিত হবে আমাদের অস্তিত্বের এই পার্থক্যের দিকে নজর দেওয়া। সচেতন নির্মাণের পক্ষে এর অবস্থান অনেক গভীরে, কিন্তু আমাদের আচরণ ও ধারণার উপর এর গভীর প্রভাব রয়েছে। আমাদের স্বপ্ন *বাস্তব*, এগুলো আমাদের একটা কিছু বলে; স্বপ্নে আমরা কাল্পনিক কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করি। মিথোলজি ছিল অবচেতনের অভিজ্ঞতাকে ইমেজারিতে সংগঠিত করার প্রয়াস, নারী-পুরুষকে যা এইসব মৌলিক অঞ্চলকে তাদের নিজস্ব সত্তার সাথে সম্পর্কিত করতে সফল করে তুলত। বর্তমানে লোকে অবচেতন মনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একই ধরনের ধারণা পেতে সাইকোঅ্যানালিস্টের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। দামাদ ও মোল্লা সদ্রা জোরের সাথে বলেছেন যে, কেবল যৌক্তিকভাবে, প্রকাশ্যে ও আইনসম্মভাবে ধারণা করা কিছুই একমাত্র সত্যি নয়। এর একটা অন্ত স্থঃ মাত্রা রয়েছে যা আমাদের স্বাভাবিক চেতন মনের কর্মকাণ্ড দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

এটা অনিবার্যভাবে কোনও কোনও *উলেমাকে* কট্টরপন্থী শিয়াদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে দিয়েছিল। মোল্লা সদ্রাকে ইস্ফাহান থেকে বিতাড়িত করে তারা। দশ বছর কুমের কাছে এক ছোট গ্রামে বাস করতে বাধ্য হন তিনি। এই নির্জনবাসের সময় বুঝতে পারেন যে, অতীন্দ্রিয় দর্শনের প্রতি ভক্তি সত্ত্বেও ধর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এখনও বড় বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক রয়ে গেছে। জুরিসপ্রুডেন্স *(ফিকহ)* বা বাহ্যিক ধর্মতত্ত্বের পাঠ কেবল ধর্ম *সম্পর্কে* আমাদের তথ্য যোগাতে পারে, এটা ধর্মীয় অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য আলোকন বা ব্যক্তিগত পরিবর্তন এনে দিতে পারে না। কেবল মনোসংযোগের অতীন্দ্রিয় অনুশীলন গুরুত্বের সাথে চর্চা শুরু ও আপন সত্তার মাঝে গভীরভাবে *আলম আল-মিথালে* অবতরণের পরই তাঁর হৃদয়ে 'আগুন জ্বলে উঠেছিল' এবং 'স্বর্গীয় জগতের আলোক আমার সামনে জ্বলে ওঠে...আমি আগে বুঝতে পারিনি এমন সব রহস্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয়ে উঠি,' তাঁর মহৎ সৃষ্টি *আল-আসফার আল-আরবা'হ*-তে (দ্য ফোর জার্নিজ অভ সোউল) পরে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

AMARBOI.COM

সদ্রার অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা মানুষের পক্ষে এই জগতেই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা সম্ভব বলে নিশ্চিত করেছিল তাঁকে। কিন্তু রক্ষণশীল চেতনার প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ায় তিনি যে সম্পূর্ণতার কথা কল্পনা করেছিলেন সেটা নতুন ও উচ্চতর এক পর্যায়ে উত্তরণ নয় বরং আব্রাহাম ও অন্যান্য পয়গম্বরের আদি খাঁটি দর্শনে প্রত্যাবর্তন ছিল। সকল অস্তিত্বের উৎস আল্লাহয়ও প্রত্যাবর্তন ছিল এটা। কিন্তু তাঁর মানে এই ছিল না যে অতীন্দ্রিয়বাদী এই জগৎকে ত্যাগ করেছেন। *দ্য ফোর জার্নিজ অভ দ্য সোউল*-এ এক ক্যারিশম্যাটিক রাজনৈতিক নেতার অতীন্দ্রিয় অভিযাত্রার বর্ণনা করেছেন তিনি। প্রথমে তাঁকে অবশ্যই মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ'র উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে। এরপর স্বর্গীয় বলয়ে ভ্রমণ করবেন তিনি যতক্ষণ না আল্লাহ'র বিভিন্ন গুণাবলী নিয়ে ধ্যান করে সেগুলোর অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের ব্যাপারে সহজাত চেতনায় পৌঁছেন। এভাবে আল্লাহ'র মুখাবয়বের দিকে চোখ রেখে তিনি বদলে যান ও একশ্বরবাদের আসল অর্থ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও ইমামদের অনুভূত বোধের অনুরূপ এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। তৃতীয় যাত্রায় নেতা আবার মানব জাতির কাছে ফিরে এসে আবিষ্কার করেন যে, এখন তিনি জগৎকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখছেন। তাঁর চতুর্থ ও চূড়ান্ত অন্বেষণ হচ্ছে এই জগতে আল্লাহ'র বাণী প্রচার করা, স্বর্গীয় আইন প্রতিষ্ঠার নতুন পথ বের করা ও আল্লাহ'র ইচ্ছা অনুযায়ী সমাজকে নতুন করে নির্মাণ করা।[৫০] এটা এমন এক দর্শন যা সমাজের পূর্ণতাকে যুগপৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সম্পর্কিত করে। অতীন্দ্রিয় ও ধর্মীয় গুরুত্ব ছাড়া এই মর্ত্য জগতে ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। ইহজগতে সমাজকে পরিবর্তিত করতে অত্যাবশ্যক যৌক্তিক প্রয়াস একে অর্থ প্রদানকারী পৌরাণিক ও অতীন্দ্রিয় পরিপ্রেক্ষিত হতে অবিচ্ছেদ্য আবিষ্কার করে দ্বাদশবাদী শিয়ামতবাদে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার সংশ্লেষ ঘটিয়েছে মোল্লা সদ্রার দর্শন। মোল্লাহ সদ্রা এভাবে শিয়া নেতৃত্বের এক নতুন আদর্শের প্রস্তাব রেখেছিলেন আমাদের কালেও ইরানের রাজনীতিতে যার গভীর প্রভাব অব্যাহত থাকবে।

মোল্লা সদ্রার দর্শনের অতীন্দ্রিয় রাজনৈতিক নেতার ঐশী অন্তর্দৃষ্টি থাকতে পারে, কিন্তু তার মানে এই ছিল না যে তিনি শক্তি দিয়ে নিজের মত ও ধর্মীয় অনুশীলন অন্যের উপর চাপিয়ে দেবেন। তেমন কিছু করলে সদ্রার দৃষ্টিতে তিনি ধর্মের সত্যির মূল সত্তাকে অস্বীকার করেছেন। *উলেমা*দের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রবল বিরোধিতা করেছেন সদ্রা। সপ্তম শতাব্দীতে ইরানে ক্রমশ শেকড় ছড়াতে থাকা এক নতুন ধারণার কারণে বিশেষভাবে অস্বস্তিতে ভুগছিলেন তিনি। কিছু কিছু *উলেমা* এই সময় বিশ্বাস করেছিলেন যে, *উলেমা*রাই গোপন ইমামদের একমাত্র আনুষ্ঠানিক মুখপাত্র হওয়ায় বেশির ভাগ মুসলিমই নিজে থেকে বিশ্বাসের মৌল বিষয়সমূহ

AMARBOI.COM

(উসুল) ব্যাখ্যা করতে অক্ষম, সাধারণ জনগণকে তাই এমন একজন *মুজতাহিদ* নির্বাচন করতে হবে যিনি *ইজতিহাদের* ('স্বাধীন যুক্তিপ্রয়োগ') চর্চা করার ক্ষমতা রাখেন বলে প্রতীয়মান এবং তাঁর আইনি শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই নিজেদের আচরণকে গড়ে তোলা উচিত। *উসুলিদের*–এই মতবাদের অনুসারীদের এই নামেই ডাকা হত–এইসব দাবি শুনে ভীত হয়ে উঠেছিলেন সদ্রা।[৫১] তাঁর দৃষ্টিতে এমন দাসত্বমূলক অনুকরণের *(তাকলিদ)* উপর নির্ভরকারী যেকোনও ধর্ম সহজাতভাবে 'দূষিত'।[৫২] সকল শিয়াই পয়গম্বর ও ইমামদের ট্র্যাডিশন *(আকবার)* বোঝার ক্ষমতা রাখে এবং প্রার্থনা ও আচারআচরণের ভেতর দিয়ে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে নিজেরাই সমাধান বের করার উপযুক্ত।

সপ্তদশ শতাব্দী গড়িয়ে যাবার সাথে সাথে উসুলি ও তাদের বিরোধীদের সংঘাত আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সাফাভিয় শক্তির তখন পতন শুরু হয়েছে, সমাজ ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। সাধারণ জনগণ শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপযুক্ত শক্তি *উলেমাদের* মুখাপেক্ষী হয়ে ছিল, কিন্তু আপন ক্ষমতার প্রকৃতি নিয়ে নিজেদের ভেতরই বিরোধে লিপ্ত ছিলেন তাঁরা। এই পর্যায়ে অধিকাংশ ইরানি উসুলিদের বিরোধিতা করেছে, অতীতের ঐতিহ্যের উপর নির্ভরকারী তথাকথিত আকবারিদের অনুসরণ করেছে। আকবারিরা *ইজতিহাদের* প্রয়োগের নিন্দা জানিয়ে কোরান ও সুন্নাহর সংকীর্ণ আক্ষরিক অর্থের পৃষ্ঠপোষকতা করত। তারা জোর দিয়ে বলেছে যে, সকল আইনি সিদ্ধান্তকে অবশ্যই কোরান, পয়গম্বর বা ইমামদের সুস্পষ্ট বিবৃতি ভিত্তিক হতে হবে। এমন কোনও ঘটনা যদি ঘটে যার বেলায় কোনও স্পষ্ট বিধি নেই, মুসলিম জুরিস্ট অবশ্যই নিজের বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর না করে বরং বিষয়টি সেক্যুলার আদালতে পাঠাবেন।[৫৩] উসুলিরা অধিকতর নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে চেয়েছিল। ইসলামি ট্র্যাডিশনের অনুসৃত নীতিমালার ভিত্তিতে জুরিস্টগণ নিজস্ব যুক্তির ক্ষমতা প্রয়োগ করে বৈধ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারতেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে আকবারিরা এমনভাবে অতীতে জড়িয়ে পড়বে যে ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স আর নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। গোপন ইমামের অনুপস্থিতিতে, যুক্তি দেখিয়েছে তারা, কোনও জুরিস্টই শেষকথা বলতে পারবেন না, আর কোনও পূর্ব নজীরই বাধ্যতামূলক হবে না। প্রকৃতপক্ষেই, তাঁরা এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, অতীতের সম্মানিত কর্তৃত্বকে অনুসরণ করার বদলে বিশ্বাসীদের সব সময়ই কোনও একজন জীবিত *মুজতাহিদের* বিধান মেনে চলা উচিত। উভয় পক্ষই সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার একটা সময়ে রক্ষণশীল চেতনায় স্থির থাকার প্রয়াস পাচ্ছিল এবং উভয়ই প্রধানত স্বর্গীয় বাণী নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। আকবারি বা উসুলিদের কেউই বুদ্ধিবৃত্তিক সমরূপতার উপর জোর দেয়নি; এটা ছিল

স্রেফ আচরণ বা ধর্মীয় অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসীকে কার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে, ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থের কাছে নাকি কোনও *মুজতাহিদের* কাছে সেই প্রশ্ন। তবু দুই পক্ষই একটা কিছু হারিয়েছিল। আকবারিরা আইনে মূর্ত আদিম স্বর্গীয় আজ্ঞাকে অতীতের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে, পরিণত হয়েছে অক্ষরবাদীতে; আবিশ্যিকভাবে প্রাচীন শিয়া মতবাদের প্রতীকী ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক হারিয়ে গিয়েছিল। তাদের চোখে বিশ্বাস পরিণত হয়েছিল বাহ্যিক কিছু নির্দেশনার ধারায়। মানুষের যুক্তির উপর অনেক বেশি আস্থা ছিল উসুলিদের, তাদের ধর্মের *মিথোসে* এখনও তা প্রোথিত আছে। কিন্তু বিশ্বাসীকে তাদের রায় মেনে নিতে হবে বলে জোর দিয়ে তারা মোল্লা সদ্রার ব্যক্তির পবিত্র স্বাধীনতায় বিশ্বাস খুইয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাষ্ট্রের দুর্বলতা পুষিয়ে দিতে পারস্যে এমন একটা আইনি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল, নেমে আসছিল অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং পরবর্তীকালের শাহদের অযোগ্যতা রাষ্ট্রকে নাজুক করে তুলেছিল। ১৭২২ সালে আফগান গোত্রগুলো ইস্ফাহানে হামলা চালায়, শেহাত অসম্মানের সাথে আত্মসমর্পণ করে শহরটি। এক গোলযোগের যুগে প্রবেশ করে ইরান। কিছুদিনের জন্যে এমনও মনে হয়েছিল যে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে এর অস্তিত্বও বুঝি থাকবে না। উত্তর দিক থেকে আগ্রাসন চালায় রাশানরা, পশ্চিম থেকে অটোমানরা। সুলতান হুসেইন শাহর তৃতীয় ছেলে দ্বিতীয় তাহমাস্প অবশ্য ইস্ফাহানের অবরোধ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। ইরানি আফসার গোত্রের সর্দার নাদির খানের সহায়তায় আগ্রাসীদের বিতাড়নে সফল হন তিনি। ১৭৩৬ সালে নাদির খান তাহমাস্পকে উৎখাত করে নিজেকেই সম্রাট ঘোষণা করেন। ১৭৪৮ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার আগে পর্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু প্রায়শঃই দক্ষতার সাথে দেশটি শাসন করেছেন তিনি। তুর্কমান কাজার গোত্রের আকা মুহাম্মদ খান নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেওয়ার আগ পর্যন্ত এক অন্ধকার অরাজক অন্তবর্তীকালীন সময় উপস্থিত হয়েছিল। ১৭৯৪ সালে শাসন সংহত করতে সক্ষম হন তিনি।[২৪] বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ক্ষমতায় অবস্থান করে নতুন কাজার রাজবংশ।

এই বিষণ্ন বছরগুলোয় আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পরিবর্তন ঘটে। নাদির খান ইরানে আবার সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন, ফলে নেতৃস্থানীয় *উলেমারা* ইস্ফাহান ছেড়ে ইরাকে অটোমান সাম্রাজ্যের মাজার শহর নাজাফ ও কারবালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। একে প্রথমে বিপর্যয় মনে হলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা *উলেমাদের* পক্ষে উপহার প্রমাণিত হয়েছে। কারবালা ও নাজাফে আরও বড় ধরনের

AMARBOI.COM

স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হয়ে ওঠেন তাঁরা। তাঁরা রাজনৈতিক শাহদের নাগালের বাইরে ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ছিলেন। ক্রমে দরবারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো অনন্য অবস্থানে পৌঁছে বিকল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হন।[৫৫] এই সময়ের দ্বিতীয় প্রধান পরিবর্তন ছিল বিশিষ্ট পণ্ডিত ওয়াহিদ বিহবেহানি (১৭০৫–৯২)-এর কিছুটা সহিংস পদ্ধতিতে অর্জিত উসুলিদের বিজয়। *ইজতিহাদের* ভূমিকা অনেক স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন তিনি, জুরিস্টদের পক্ষে এর প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন। উসুলি অবস্থান মেনে নিতে অস্বীকারকারী যেকোনও শিয়াকে বিধর্মী হিসাবে নিষিদ্ধ করা হত, বিরোধিতাকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছে। কারবালা ও নাজাফে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘাতে কিছু সংখ্যক আকবারি প্রাণ হারায়। ইস্ফাহানের অতীন্দ্রিয় দর্শনও বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সুফিবাদকে এমন বর্বরভাবে দমন করা হয়েছিল যে, বিহবেহানির ছেলে আলি সুফি-ঘাতক নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু, আমরা যেমন দেখেছি, ধর্মীয় বিষয়ে জোরজবরদস্তি সাধারণত উল্টো ফল দেয়, অতীন্দ্রিয়বাদ আত্মগোপনে চলে যায় এবং স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ চালিয়ে যাওয়া ভিন্নমতাবলম্বী ও বুদ্ধিজীবীদের ধ্যানধারণাকে আকার দিতে থাকে। বিহবেহানির বিজয় ইরানি *উলেমাদের* পক্ষে রাজনৈতিক বিজয় ছিল। অরাজকতার উত্তাল সময়ে উসুলি অবস্থান জনপ্রিয় ছিল, কেননা এটা কিছু পরিমাণ শৃঙ্খলা নিয়ে আসার ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্বের যোগান দিয়েছিল তাদের। *মুজতাহিদগণ* রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসতে সক্ষম ছিলেন, জনগণের মাঝে কখনওই ক্ষমতা হারাননি। কিন্তু ইমামদের আচরণ ও আদর্শ থেকে দূরবর্তী হওয়ায় স্বৈরাচারী উপায়ে অর্জিত বিহবেহানির বিজয় এক ধরনের ধর্মীয় পরাজয় ছিল।[৫৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অটোমান ও ইরানি সাম্রাজ্য উভয়ই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। কৃষি নির্ভর সভ্যতার সম্পদ ফুরিয়ে যাওয়ার অনিবার্য নিয়তি বরণ করে নিচ্ছিল এরা। অ্যাক্সিয়াল যুগের সময় থেকেই রক্ষণশীল চেতনা নারী-পুরুষকে গভীর স্তরে এই ধরনের সভ্যতার সীমাবদ্ধতা মেনে নিতে সাহায্য করে এসেছে। এর মানে এই ছিল না যে, রক্ষণশীল সমাজগুলো স্থবির ও অদৃষ্টবাদী ছিল। এই আধ্যাত্মিকতা ইসলামি বিশ্বে ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সাফল্য বয়ে এনেছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শৈল্পিক প্রয়াস এক ধরনের পৌরাণিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদিত হয়েছিল, যা ইউরোপে বিকাশ লাভ করতে থাকা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল্যবোধের কাছে অচেনা হয়ে দাঁড়াবে। আধুনিক ইউরোপের বহু আদর্শ মুসলিমদের পক্ষে অনুকূল হবে। আমরা দেখেছি, তাদের ধর্মবিশ্বাস এমন প্রবণতার বিকাশ ঘটাতে উৎসাহিত করেছিল যা

AMARBOI.COM

আধুনিক পাশ্চাত্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী প্রবণতার অনুরূপ: সামাজিক ন্যায় বিচার, সাম্যবাদ, ব্যক্তির স্বাধীনতা, মানবীয় ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা, সেক্যুলার রাজনীতি, ব্যক্তিমুখী বিশ্বাস ও যৌক্তিক ধারণার চর্চা। কিন্তু নব্য ইউরোপের অন্যান্য বৈশিষ্টগুলো রক্ষণশীল রেওয়াজে গড়ে ওঠা মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিমরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইউরোপিয়দের পেছনে পড়ে গিয়েছিল, এই সময় ইসলামি সাম্রাজ্যগুলোও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, সেগুলো ইউরোপিয় রাষ্ট্রগুলোর কাছে নাজুক হয়ে দাঁড়ায়; এসব রাষ্ট্র বিশ্ব আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে প্রয়াস চালানোর প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে ভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে ব্রিটিশরা; এক নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল ফ্রান্স। ১৯শে মে, ১৭৯৮, নেপোলিয়ন বোনাপার্তে প্রাচ্যে ব্রিটিশ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার লক্ষ্যে তুলন থেকে ৩৮,০০০ লোক ও ৪০০ জাহাজ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করল ফরাসী নৌবহর। ১লা জুলাই আলেকজান্দ্রিয়ার সৈকতে ৪,৩০০ সেনা অবতরণ করালেন নেপোলিয়ন, পরদিন ভোরের অল্প পরেই দখল করে নিলেন গোটা শহর।[৫৭] এভাবে মিশরে একটা ঘাঁটি পেয়ে যান তিনি। সাথে করে পণ্ডিত, আধুনিক ইউরোপিয় সাহিত্যের একটা লাইব্রেরি, একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও আরবী হরফঅলা একটা ছাপাখানা নিয়ে এসেছিলেন নেপোলিয়ন। পশ্চিমের নতুন বৈজ্ঞানিক, সেক্যুলারিস্ট সংস্কৃতি আক্রমণ হানল মুসলিম বিশ্বে, কোনও কিছুই আর আগের মতো থাকবে না।

AMARBOI.COM

৩. ক্রিশ্চান: সাহসী নতুন জগৎ (১৪৯২–১৮৭০)

ইহুদিরা যখন স্পেন থেকে তাদের বহিষ্কারের বেদনাদায়ক পরিণতি নিয়ে সংগ্রাম করছে এবং মুসলিমরা তিনটি মহান সাম্রাজ্য গড়ে তুলছিল সেই একই সময়ে পশ্চিমের ক্রিশ্চানরা এমন এক পথে পা রাখতে যাচ্ছিল যা তাদের প্রাচীন বিশ্বের পবিত্রতা ও নিশ্চয়তা থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। এটা ছিল এক উত্তেজনাময় কাল, আবার অস্বস্তিকরও বটে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্রিশ্চান জগতের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল প্লেগের মহা মড়ক এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ভেতরকার শত বর্ষের যুদ্ধ ও ইতালিয় গৃহযুদ্ধের মতো অব্যাহত সংগ্রামে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল ইউরোপের দেশগুলো। ইউরোপিয়রা ১৪৫৩ সালে অটোমানদের হাতে ক্রিশ্চান বাইযান্টিয়ামের অধিকার, আভিগনন ক্যাপ্টিভিটির পাপাল কেলেঙ্কারী ও মহাবিবাদ প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল–এই সময় অন্তত তিনজন পন্টিফ একই সময়ে নিজেদের সেইন্ট পিটারের উত্তরাধিকারী দাবি করে বসেছিলেন–অনেককেই যা প্রাতিষ্ঠানিক চার্চের উপর বিশ্বাস হারাতে প্ররোচিত করেছিল। সাধারণ মানুষ অস্পষ্টভাবে নিজেদের আর নিরাপদ ভাবতে পারছিল না, এখন আর আগের মতো করে ধার্মিক হতে পারছে না বলে আবিষ্কার করেছিল তারা। কিন্তু তারপরেও এটা আবার মুক্তি ও ক্ষমতায়নেরও একটা কাল ছিল। ইবারিয় অভিযাত্রীরা এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছিল: জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা স্বর্গ উন্মুক্ত করছিলেন এবং এক নতুন কারিগরি দক্ষতা পরিবেশের উপর ইউরোপিয়দের হাতে বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ তুলে দিচ্ছিল এর আগে যা কেউই অর্জন করতে পারেনি। রক্ষণশীল চেতনা যেখানে নারী-পুরুষকে সতর্কতার সাথে নির্ধারিত সীমানার ভেতর অবস্থান করার শিক্ষা দিয়েছিল, পাশ্চাত্য ক্রিশ্চান জগতের নতুন সংস্কৃতি সেখানে দেখিয়ে দিয়েছিল, পরিচিত জগতের বাইরে পা রাখা সম্ভব, সেটা কেবল বেঁচে থাকার জন্যে নয়, বরং সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যেও। শেষ পর্যন্ত প্রাচীন পৌরাণিক

AMARBOI.COM

ধর্মকে অসম্ভব করে তুলবে তারা এবং পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে আসলে উৎসগতভাবে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বৈরী ছিল মনে হবে।

কিন্তু তাসত্ত্বেও পাশ্চাত্য সমাজের পরিবর্তনের এই প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাপারটা এমন ছিল না। ক্রান্তিকালের অভিযাত্রী, বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন যে ধর্মকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার বদলে তাঁরা আসলে ধার্মিক হওয়ার নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করছেন। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁদের কিছু সমাধান পর্যালোচনা করে সেগুলোর গভীরতর তাৎপর্য বিবেচনা করব। তবে স্পষ্ট করে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আধুনিক চেতনার যাঁরা মুখপাত্রে পরিণত হয়েছিলেন তাঁরা নিজেরা এটা সৃষ্টি করেননি। ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপে এবং পরে এর আমেরিকান উপনিবেশসমূহে একটি জটিল প্রক্রিয়া কার্যকর ছিল যা সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা ও জগৎকে দেখার দৃষ্টিকে বদলে দিচ্ছিল। প্রায়শঃই পরিবর্তন ধীরে ধীরে ও অলক্ষে ঘটেছে। অসংখ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঠিক সেই মুহূর্তে চূড়ান্ত পরিবর্তনকারী মনে হয়নি এমন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ঘটনা ঘটছিল, কিন্তু সেগুলোর সম্মিলিত প্রভাব হয়ে দাঁড়াবে চূড়ান্ত। এসব আবিষ্কারই একটা বাস্তবভিত্তিক, বৈজ্ঞানিক চেতনায় বৈশিষ্ট্যায়িত ছিল, যা ক্রমশঃ রক্ষণশীল পৌরাণিক রীতিনীতি অচল করে দিয়েছে এবং বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে ঈশ্বর, ধর্ম, রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণে প্ররোচিত করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকান উপনিবেশসমূহকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এইসব পরিবর্তনকে স্থান করে দিতে হয়েছে। সুদূরপ্রসারী অন্য যেকোনও সামাজিক পরিবর্তনের কালের মতো সহিংস সময় ছিল এটা। চলছিল বিধ্বংসী যুদ্ধ এবং বিপ্লব, সহিংস উচ্ছেদ, প্রত্যন্ত এলাকায় বিরাজনীতিকরণ ও জঘন্য ধর্মীয় সংঘাত। তিন বছরের পরিক্রমায় ইউরোপিয় ও আমেরিকানদের তাদের সমাজ আধুনিকায়িত করতে নিষ্ঠুর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়েছে। রক্তপাত, নির্যাতন, ইনকুইজিশন, বিতাড়ন, দাসত্বে বন্দি এবং নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটেছে। যেসব দেশ বর্তমানে আধুনিকায়নের বেদনাদায়ক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেই একই রক্তাক্ত উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করছি আমরা।

কৃষির যৌক্তিকীকরণ ছিল এই প্রক্রিয়ার একটা ছোট্ট অংশ মাত্র, কিন্তু বর্ধিত ফসল ও স্বাস্থ্যবান গবাদিপশুর দল প্রত্যেকের জীবনের উপর প্রভাব ফেলেছে। অন্য আরও বিশেষায়িত উন্নয়নও ছিল। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বানাতে শুরু করেছিল মানুষ: কম্পাস, টেলিস্কোপ, ম্যাগনিফাইং লেন্স, ইত্যাদি এক নতুন জগৎকে তুলে ধরেছে এবং আরও উন্নত ম্যাপ, চার্ট ও নৌপরিচালনার কৌশল তৈরির কাজে লাগানো হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ মাইক্রোস্কোপিস্ট আন্তনি ভ্যান লিভেনহোক

AMARBOI.COM

প্রথমবারের মতো ব্যাক্টেরিয়া, স্পারমাতোযা এবং অন্যান্য অণুজীব প্রত্যক্ষ করেন; তাঁর পর্যবেক্ষণ একদিন প্রজনন ও বিকৃতির প্রক্রিয়ার উপর নতুন আলো ফেলবে। কেবল রোগ দুরীকরণেই এর বাস্তবভিত্তিক প্রভাব পড়বে না, বরং জীবন-মৃত্যুর মৌলিক এলাকাগুলোকেও পৌরাণিক উপাদান হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ওষুধ বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল; উনবিংশ শতাব্দীর বেশ অনেকটা সময় পর্যন্ত অন্ধের মতো থেরাপি প্রয়োগ অব্যাহত থাকলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে পয়ঃনিষ্কাষণের ব্যাপারে সচেতনতা বেড়ে উঠছিল এবং প্রথমবারের মতো বেশ কিছু রোগ শানাক্ত করা হয়েছিল। ভূ-বিজ্ঞানের বিকাশ সূচিত হয়েছিল, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির মতো বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা এইসব ঘটনা সংক্রান্ত পৌরাণিক বিবেচনাকে পিছনের কাতারে ঠেলে দেবে। যান্ত্রিক সরঞ্জামের উন্নতি ঘটে। ঘড়ি ও হাতঘড়ি আরও বেশি মাত্রায় নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। এই উন্নয়ন সময়ের সেক্যুলারাইজেশনের দিকে নিয়ে যাবে। গাণিতিক ও পরিসংখ্যানিক কৌশলের প্রয়োগ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ধারণা যোগাচ্ছিল। ১৬৫০ ও ১৬৬০ এর দশকে 'সম্ভাব্য' শব্দটির অর্থ বদলে যেতে শুরু করে। এটা আর রক্ষণশীল কালের মতো 'কর্তৃপক্ষের সমর্থনপুষ্ট' বোঝানোর বদলে 'সুস্থ আলামতের ভিত্তিতে সম্ভাব্য' হয়ে দাঁড়াল। ভবিষ্যত সম্পর্কে এই স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি ও আস্থা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও আমলাতান্ত্রিক যৌক্তিকীকরণের এক নতুন যাত্রায় প্ররোচিত করবে। ব্রিটিশ পরিসংখ্যানবিদ উইলিয়াম পেত্রি এবং জন গ্রান্ট বিশেষ করে জীবায়ুর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপের লোকজন জীবন বীমা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।[১] এসবই উৎসগতভাবে রক্ষণশীল চেতনার পরিপন্থী।

এসব উন্নয়নের কোনওটিকেই আলাদাভাবে চূড়ান্ত মনে হয়নি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এসবের প্রভাব ছিল আমূল পরিবর্তন সুলভ। ১৬০০ সাল নাগাদ ইউরোপে এমন ব্যাপক মাত্রায় উদ্ভাবন ঘটছিল যে প্রগতিকে অপরিবর্তনীয় মনে হয়েছে। কোনও একটি ক্ষেত্রে আবিষ্কার প্রায়শঃই অন্য ক্ষেত্রে আবিষ্কার উস্কে দিত। প্রগতি অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ অর্জন করেছিল। জগতকে অপরিবর্তনীয় ও মৌলিক বিধির অধীন ভাবার বদলে ইউরোপিয়রা আবিষ্কার করছিল যে প্রকৃতিকে বিস্ময়করভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে তারা। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে, এমনভাবে তাদের বস্তুগত প্রয়োজন মেটাচ্ছে যেমনটা আগে কখনও পারেনি। কিন্তু জনগণ জীবনের যৌক্তিকীরণের সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার সাথে সাথে *লোগোস* গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল ও *মিথোস* হয়ে গেল তুচ্ছ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল মানুষ। ভীতিকর পরিণাম ছাড়াই পরিবর্তনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারছিল তারা। উদাহরণ স্বরূপ, অব্যাহত উদ্ভাবনের উপর

AMARBOI.COM

ভিত্তি করে এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবার দৃঢ় আশাবাদ নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে পুনর্বিনিয়োগে প্রস্তুত ছিল ধনীকশ্রেণী। পুঁজিবাদী অর্থনীতি পাশ্চাত্যকে অনির্দিষ্টভাবে এর সম্পদ প্রতিস্থাপিত করতে সক্ষম করে তুলেছে, ফলে কৃষি ভিত্তিক প্রাচীন সমাজগুলোর সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত হয়ে গেছে। সমাজের এই যৌক্তিকীকরণ ও প্রযুক্তিকরণ শিল্প বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে যখন, সেই সময় নাগাদ পশ্চিমারা অব্যাহত প্রগতি সম্পর্কে এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল যে অনুপ্রেরণার জন্যে তারা অতীতের দিকে তাকানোর বদলে জীবনকে বরং ভবিষ্যতের আরও বৃহত্তর সাফল্যের দিকে ভীতিহীন অগ্রযাত্রা হিসাবে দেখেছে।

এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক পরিবর্তন জড়িত ছিল। এজন্যে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিকে বেশ নিচু স্তরে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। সাধারণ লোক প্রিন্টার, মেশিনিস্ট ও ফ্যাক্টরির শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল, তাদেরও কিছু মাত্রায় দক্ষতার আধুনিক মানদণ্ড অর্জন করতে হয়েছিল। অধিক সংখ্যক লোকের কিছু পরিমাণ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক সাক্ষরতা অর্জন করে, আর এটা ঘটার পর তারা অনিবার্যভাবেই সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর ভূমিকা দাবি করতে থাকে। আরও অধিকতর গণতান্ত্রিক ধারার সরকার আবশ্যক হয়ে উঠবে। কোনও জাতি তার সকল জনশক্তিকে আধুনিকায়িত করে এর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে চাইলে তাকে ইহুদিদের মতো এ যাবৎ বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিকায়িত গোষ্ঠীসমূহকে মূলধারার সংস্কৃতিতে নিয়ে আসতে হবে। নব্য শিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণী আর কখনওই প্রাচীন ক্ষমতা পরম্পরার কাছে নতি স্বীকার করবে না। পাশ্চাত্য সেক্যুলার সংস্কৃতিতে পবিত্র মূল্যবোধে পরিণত হওয়া গণতন্ত্র, সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন মানবাধিকারের আদর্শসমূহ জটিল আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। এসব স্রেফ রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদদের স্বপ্নের চমৎকার আদর্শ ছিল না, বরং অন্তত অংশত হলেও আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাথমিক আধুনিক ইউরোপে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন ছিল আন্তসম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ারই অংশ, প্রতিটি উপাদান অন্যটির উপর নির্ভরশীল ছিল।[2] কোনও আধুনিক সমাজকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রই সবচেয়ে দক্ষ ও ফলপ্রসু উপায় বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যেসব পূর্ব ইউরোপিয় দেশ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি গ্রহণ না করে বাইরের গোষ্ঠীসমূহকে মূলধারায় আনতে অধিকতর নির্মম কৌশল বেছে নিয়েছিল প্রগতির মিছিলে তাদের অনেক পেছনে পড়ে যাওয়া থেকেই এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।[3]

AMARBOI.COM

সুতরাং, এটা ছিল একটা মুগ্ধকারী কাল, আবার কষ্টকর রাজনৈতিক পরিবর্তনের কালও ছিল তা, লোকে ধার্মিকতার সাথে একে আত্মস্থ করার প্রয়াস পেয়েছিল। এমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্পষ্টভাবে কাজ করছিল না বলে ধর্মবিশ্বাসের প্রাচীন মধ্যযুগীয় ধরনগুলো আর স্বস্তি যোগাতে পারছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর ক্যাথলিক সংস্কারের মতো ধর্মকে আরও দক্ষ ও সংহত করে তোলারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক আধুনিক কালের সংস্কার দেখিয়েছে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া বেশ ভালোভাবে ক্রিয়াশীল থাকলেও ইউরোপিয়রা তখনও রক্ষনশীল চেতনা ধারণ করছিল। আমাদের বিবেচিত মহান মুসলিম সংস্কারকদের মতো প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারকগণও অতীতে ফিরে যাবার মাধ্যমেই পরিবর্তনের কালে নতুন সমাধান খোঁজার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৩৬), জন কালভিন (১৫০৯-৬৪) ও হালড্রিচ যিইংউলি (১৪৮৪-১৫৩১), এঁরা প্রত্যেকেই ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশনের ঝর্নাধারা *আদ ফন্তাসের* দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। ইবন তাঈমিয়াহ কোরান ও সুন্নাহর খাঁটি ইসলামে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে যেখানে মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্ব ও *ফিকহ* প্রত্যাখ্যান করেছেন, মার্টিন লুথার সেখানে একইভাবে মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক ধর্মতাত্ত্বিকদের আক্রমণ করে বাইবেল ও ফাদারস অভ চার্চের খাঁটি ক্রিশ্চান ধর্মে ফিরে যেতে চেয়েছেন। সুতরাং, রক্ষণশীল মুসলিম সংস্কারকদের মতো প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারকগণ ছিলেন একাধারে বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল। তখনও তাঁরা আসন্ন নতুন বিশ্বের অধীনে ছিলেন না, বরং বেশ ভালোভাবেই প্রাচীন কালে প্রোথিত ছিলেন।

কিন্তু তাসত্ত্বেও নিজ কালেরই মানুষ ছিলেন তাঁরা, এটা ছিল পরিবর্তনের সময়। গোটা এই গ্রন্থ জুড়ে আমরা দেখব, আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া নিদারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারে। জগৎ বদলে যাবার সাথে সাথে মানুষ নিজেদের দিশাহারা ও পরাস্ত আবিষ্কার করে। *ইন মিদিয়াস রেস*-এ বসবাস করে সমাজ কোন দিকে এগোচ্ছে বুঝে উঠতে পারে না তারা, বরং সামঞ্জস্যহীনভাবে পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। পরিবর্তনের ব্যাপক চাপে তাদের জীবনকে কাঠামো ও তাৎপর্য প্রদানকারী প্রাচীন মিথোলজি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার সাথে সাথে তারা আত্মপরিচয় হারানো ও বিবষকারী হতাশার অভিজ্ঞতা লাভ করে। আমরা যেমন দেখব, সবচেয়ে সাধারণ আবেগসমূহ হচ্ছে অসহায়ত্ব, নিশ্চিহ্নতার আতঙ্ক চরম পরিস্থিতিতে যা সহিংসতায় বিস্ফোরিত হতে পারে। লুথারের মাঝে আমরা এর খানিকটা দেখতে পাই। জীবনের গোড়ার দিকে যন্ত্রণাকর হতাশার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। মধ্যযুগীয় কোনও ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠান ও অনুশীলনই তাঁকে মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত করে তোলা, তাঁর ভাষায়, *ত্রিস্তিশিয়া* ('বিষাদ')-

কে স্পর্শ করতে পারছিল না, মৃত্যুকে তিনি সামগ্রিক নিশ্চিহ্নকরণ মনে করতেন। যখনই তাঁর উপর এই কালো ত্রাস নেমে আসত, তিনি আর ৯০ নম্বর শ্লোক পাঠ করতে পারতেন না, যেখানে মানব জীবনের বিস্তৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ও মানুষকে ঈশ্বরের ক্রোধ ও ক্ষোভ দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। গোটা জীবন মৃত্যুকে ঈশ্বরের ক্রোধের প্রকাশ হিসাবে দেখে এসেছেন লুথার। তাঁর বিশ্বাসে প্রতিপন্ন করার ধর্মতত্ত্বে মানবজাতিকে নিজ নিষ্কৃতি লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম ও ঈশ্বরের দয়ার উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল বলে বর্ণনা করেছেন। কেবল নিজেদের অক্ষমতা উপলব্ধি করেই তারা রক্ষা পেতে পারে। বিষণ্নতা থেকে মুক্তি পেতে পৃথিবীতেই যতবেশি ভালো কাজ করা সম্ভব সেটা করতে ভয়ঙ্কর এক কর্মযজ্ঞে মেতে উঠেছিলেন লুথার, কিন্তু ঘৃণায়ও[৪] আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। তাঁর ঘৃণা পোপ, তুর্কি, ইহুদি, নারী ও বিদ্রোহী কৃষকদের উপরও চালিত হয়েছে–ধর্মতাত্ত্বিক সকল প্রতিপক্ষের কথা না বললেও চলে–লুথারের ক্রোধ আমাদের কালের অন্য সংস্কারকদের অনুরূপ হয়ে দাঁড়াবে, যাঁরা এক নতুন বিশ্বের বেদনার সাথে সংগ্রাম করেছেন এবং যাঁরা এমন এক ধর্ম বিকশিত করেছেন যেখানে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রায়শঃই অন্য মানুষের প্রতি ঘৃণা দিয়ে ভারসাম্য লাভ করে।

যিউইংলি ও কালভিনও তাঁদের মাঝে নবজন্ম লাভ করার বোধ জাগানো এক নতুন ধর্মীয় দর্শনের দেখা পাওয়ার আগে চরম অক্ষমতার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনই নিশ্চিত ছিলেন যে নিজেদের নিস্তার লাভের জন্যে তাঁদের করার মতো কিছুই নেই, মানবীয় অস্তিত্বের দুঃখকষ্টের সামনে তাঁরা সম্পূর্ণ অসহায়। দুজনই ঈশ্বরের পরম সার্বভৌমত্বের উপর জোর দিয়েছেন, আধুনিক মৌলবাদীরা পরবর্তী সময়ে প্রায়ই যেমন করবে।[৫] লুথারের মতো যিউইংলি ও কালভিনকে নিজেদের ধর্মীয় জগৎ পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে। এমনকি অলক্ষে কিন্তু অপরিবর্তনীয়ভাবে ব্যাপক পরিবর্তনের অধীন হয়ে পড়া বিশ্বের পরিস্থিতির সাথে ধর্মকে মানানসই করে তোলার জন্যে অনেক সময় চরম ব্যবস্থার আশ্রয়ও নিতে হয়েছে তাঁদের।

সেই সময়ের মানুষ হিসাবে সংস্কারকগণ ঘটে যাওয়া পরিবর্তনসমূহকে তুলে ধরেছেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চ ত্যাগ করে তাঁরা এই পর্যায় থেকে পাশ্চাত্য ইতিহাসকে তুলে ধরা অন্যতম প্রাথমিক স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আমরা যেমন দেখব, নতুন রীতি স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণাঙ্গ মুক্তির দাবি করেছে এবং এই বদলে যাওয়া পৃথিবীতে প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারকগণও ক্রিশ্চানদের পক্ষে একই দাবি করেছেন, যাদের অবশ্যই চার্চের শাস্তিমূলক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই পছন্দ মোতাবেক বাইবেল পাঠ ও ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা থাকতে হবে। (অবশ্য *তাঁদের* শিক্ষার

AMARBOI.COM

বিরোধিতাকারীর বেলায় তিন জনই অনমনীয় হয়ে উঠতে পারতেন: লুথার বিশ্বাস করতেন যে 'ধর্মদ্রোহমূলক' বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত, আর কালভিন ও যিউইংলি ভিন্নমতাবলম্বীদের হত্যা করতে প্রস্তুত ছিলেন)। তিনজনই দেখিয়েছেন যে, এই যুক্তির কালে ধর্মের প্রাচীন প্রতীকী উপলব্ধি ভেঙে পড়তে যাচ্ছিল। রক্ষণশীল আধ্যাত্মিকতায় কোনও প্রতীক ঈশ্বরের বাস্তবতায় অংশ গ্রহণ করত, নারী-পুরুষ পার্থিব বস্তুতে পবিত্রকে অনুভব করত; প্রতীক ও পবিত্র এভাবে ছিল অবিচ্ছেদ্য। মধ্যযুগে ক্রিশ্চানরা সাধুদের রেলিক্সে স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ও ইউক্যারিস্টিক রুটি ও মদকে অতীন্দ্রিয়ভাবে ক্রাইস্টের সাথে অবিচ্ছেদ্য মনে করেছে। কিন্তু এখন সংস্কারগণ ঘোষণা দিয়েছেন যে, রেলিক্সগুলো আসলে প্রতিমা, ইউক্যারিস্ট 'স্রেফ' প্রতীক, ধর্মসভা একে অতীন্দ্রিয়ভাবে উপস্থিত করা ক্যালভারির উৎসর্গের স্মারক নয়, বরং একটা সাধারণ স্মৃতিচিহ্নমাত্র। তাঁরা এমনভাবে ধর্মের মিথ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিলেন যেন সেগুলো লোগোস; মানুষ যেমন দ্রুততার সাথে সংস্কারকদের অনুসরণ করেছে তাতে বোঝা যায় ইউরোপের ক্রিশ্চানদের অনেকেই অতীন্দ্রিয় সংবেদনশীলতা খোয়াতে শুরু করেছিল।

ধীরে ধীরে সেক্যুলারাইজ হতে শুরু করেছিল ইউরোপের জীবন। প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারকগণ ধর্মীয় প্রয়াসের প্রাবল্য সত্ত্বেও সেক্যুলারাইজ হতে চলছিলেন। সংস্কারকগণ রক্ষণশীলের মতোই প্রাথমিক উৎস অর্থাৎ বাইবেলে ফিরে যাবার দাবি করলেও আধুনিক কায়দায় ঐশীগ্রন্থ পাঠ করছিলেন তাঁরা। সংস্কৃত ক্রিশ্চানদের স্রেফ নিজের বাইবেলের উপর ভরসা করে একাকী ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে, কিন্তু মুদ্রণের উদ্ভাবনের ফলে প্রত্যেকের পক্ষে একটা বাইবেল যোগাড় সহজ হয়ে ওঠা ও তাদের বাইবেল পাঠে সক্ষম করে তোলা সেই সময়ের বিকাশ লাভ করা সাহিত্যের আগে এটা সম্ভব ছিল না। ক্রমবর্ধমান হারে তথ্যের অনুসন্ধানে ঐশীগ্রন্থসমূহ আক্ষরিকভাবে পাঠ করা হচ্ছিল, ঠিক যেভাবে আধুনিকায়িত প্রটেস্ট্যান্টরা অন্যান্য টেক্সট পাঠ শিখছিল। নীরব, একাকী পাঠ ক্রিশ্চানকে ব্যাখ্যার ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতি ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করবে। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর গুরুত্বারোপ সত্যকে আধুনিক পাশ্চাত্য মানসিকতার বৈশিষ্ট্য অধিকতর ভাবগত করে তুলতে সাহায্য করবে। কিন্তু বিশ্বাসের গুরুত্বের প্রতি জোর দিলেও লুথার ভীষণভাবে যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন যুক্তি আসন্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের প্রতি বৈরী হয়ে উঠতে পারে। তাঁর রচনায়–যদিও কালভিনের রচনায় নয়–আমরা দেখতে পাই, যুক্তি ও মিথলোজির প্রাচীন সম্পূরকতার দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষয়ে যাচ্ছিল। স্বভাবজাত ঝগড়াটে কায়দায় লুথার সঘৃণায় অ্যারিস্টটল সম্পর্কে কথা বলেছেন, ইরাসমাসের বিরুদ্ধে

AMARBOI.COM

নিন্দা ঝেড়েছেন, যাকে তিনি যুক্তির মূর্ত রূপ মনে করতেন, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যুক্তি কেবল নাস্তিক্যবাদের দিকেই ঠেলে দিতে পারে। যুক্তিকে ধর্মীয় বলয় থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করতে গিয়ে লুথারই ছিলেন একে সেকুলারাইজকারী অন্যতম প্রথম ইউরোপিয়।[৬]

লুথারের চোখে ঈশ্বর যেহেতু চরম রহস্যময় ও গোপন, সুতরাং জগৎ ঐশী অস্তিত্ব হতে শূন্য। লুথারের দিউস অ্যাবসকন্দিতাসকে মানবীয় প্রতিষ্ঠান বা ভৌত বাস্তবতায় আবিষ্কার করা যাবে না। মধ্যযুগীয় ক্রিশ্চানরা চার্চে পবিত্রের অনুভূতি লাভ করেছিল, লুথার যাকে এখন অ্যান্টিক্রাইস্ট ঘোষণা করেছেন। এখন কি স্কলাস্টিক ধর্মতত্ত্ববিদদের (লুথারের তীব্র ক্রোধের লক্ষ্যও বটে) মতো করে মহাবিশ্বের অলৌকিক শৃঙ্খলা লক্ষ করে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা যাবে?[৭] লুথারের রচনায় ঈশ্বর এখন ধর্মীয় তাৎপর্যহীন হয়ে ওঠা ভৌত জগৎ থেকে সরে যেতে শুরু করেছিলেন। লুথার রাজনীতিকেও সেক্যুলারাইজ করেছেন। জাগতিক বাস্তবতা যেহেতু আধ্যাত্মিক বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিরোধী, চার্চ ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে, প্রত্যেককে অন্যের সঠিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রকে সম্মান করতে হবে।[৮] লুথারের আন্তরিক ধর্মীয় দর্শন তাঁকে চার্চ ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার পক্ষে কথা বক্তব্য দানকারী অন্যতম প্রথম ইউরোপিয়ানে পরিণত করেছিল। কিন্তু তবু ধার্মিক হওয়ার এক নতুন উপায় হিসাবেই রাজনীতির সেক্যুলাইজেশন শুরু হয়েছিল।

লুথারের ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের বিষয়টি এসেছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চের নিপীড়নমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর চরম বিতৃষ্ণা থেকে, নিজস্ব বিধি ও অর্থডক্সি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য চার্চ রাষ্ট্রকে ব্যবহার করছিল। ঈশ্বর বিহীন পৃথিবী সংক্রান্ত লুথারের দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার ছিলেন না কালভিন। যিউইংলির মতো তিনি বিশ্বাস করতেন, মঠে আশ্রয় নেওয়ার বদলে ক্রিশ্চানদের উচিত হবে রাজনীতি ও সামাজিক জীবনে অংশ নিয়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসকে প্রকাশ করা। কালভিন উদীয়মান পুঁজিবাদী শ্রমনীতিকে শ্রমকে পবিত্র আহ্বান আখ্যা দিয়ে ব্যাপ্টাইজ করেছিলেন, মধ্যযুগীয় ভাবনার মতো একে পাপের স্বর্গীয় শাস্তি হিসাবে দেখেননি। কালভিন স্বাভাবিক জগতের প্রতি লুথারের বিতৃষ্ণারও অংশীদার ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরকে তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব; জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও প্রাণীবিদ্যা পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। প্রাথমিক আধুনিক কালের কালভিনবাদীরা প্রায়শঃই ভালো বিজ্ঞানী ছিলেন। কালভিন বিজ্ঞান ও ঐশীগ্রন্থের ভেতর কোনও বিরোধিতা লক্ষ করেনি। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাইবেল ভূগোল বা বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে কোনও আক্ষরিক জ্ঞান প্রচার করছে না, বরং সীমাবদ্ধ মানুষের বোধগম্য ভাষায় অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। বাইবেলিয় ভাষা হচ্ছে

AMARBOI.COM

বালবাতিভ ('বালসুলভকথা'), অন্য কোনওভাবে প্রকাশ করার পক্ষে যারপরনাই জটিল সত্যের পরিকল্পিত সরলীকরণ।[৯]

প্রাক আধুনিক কালের মহান বিজ্ঞানীরা কালভিনের আস্থার অংশীদার ছিলেন। নিজেদের গবেষণা ও আলোচনাকে তাঁরা পৌরাণিক, ধর্মীয় কাঠামোতে দেখেছেন। পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) বিশ্বাস করতেন তাঁর বিজ্ঞান 'মানুষের চেয়েও বেশি ঐশ্বরিক।'[১০] কিন্তু তাসত্ত্বেও তাঁর হেলিওসেন্ট্রিক বিশ্বের মতবাদ প্রাচীন পৌরাণিক ধারণার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাত ছিল। তাঁর বিস্ময়কর প্রকল্প এতটাই চরম ছিল যে, তাঁর নিজ সময়ে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তা হজম করতে পেরেছে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থানের বদলে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ আসলে সূর্যের চারপাশে প্রচণ্ড গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি যে স্বর্গীয় বস্তুসমূহ চলছে, সেটা স্রেফ উল্টোদিকে পৃথিবীর ঘোরার প্রক্ষেপণ। কোপার্নিকাসের তত্ত্ব অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জার্মান পদার্থবিদ ইয়োহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) এর সমর্থনে গাণিতিক প্রমাণ যোগাতে সক্ষম হন, অন্যদিকে পিসিয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গালিলিও গালিলি (১৫৬৪-১৬৪২) টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে কোপার্নিকাসের প্রকল্প হাতে কলমে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি নিজেই এই যন্ত্রটির উন্নতি সাধন করেন। ১৬১২ সালে গালিলিও যখন তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন, বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। ইউরোপের সমস্ত লোক নিজেরা টেলিস্কোপ বানিয়ে স্বর্গ পর্যবেক্ষণ শুরু করেছিল।

ইনকুইজিশন গালিলিওকে স্তব্ধ করে দেয়। মত প্রত্যাহারে বাধ্য করে তাঁকে। কিন্তু তাঁর কিছুটা রগচটা স্বভাবও সাজা প্রাপ্তিতে কিছু অবদান রাখে। প্রাথমিক আধুনিক কালে মানুষ সহজাতভাবে বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেনি। কোপার্নিকাস যখন ভাটিকানে প্রথমবারের মতো তাঁর প্রকল্প পেশ করেন, পোপ একে অনুমোদন দিয়েছিলেন। এই তত্ত্বে কালভিনের কোনও সমস্যা হয়নি। বিজ্ঞানীগণ তাঁদের অনুসন্ধানকে আবশ্যিকভাবে ধর্মীয় বিবেচনা করেছেন। এযাবত কোনও মানুষেরই জানার সুযোগ হয়নি, এমন সব রহস্য উন্মোচন করে চলার সময় কেপলার নিজেকে 'স্বর্গীয় উন্মাদনায়' আচ্ছন্ন মনে করেছেন, গালিলিও নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর গবেষণা ঐশী অনুপ্রেরণাজাত।[১১] তখনও তাঁরা নিজেদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মানানসই দেখতে পাচ্ছিলেন, *মিথোস* যেমন ছিল *লোগোস*-এর সম্পূরক।

তারপরেও বিপ্লবের সূচনা ঘটিয়েছিলেন কোপার্নিকাস। মানুষ আর কখনওই আর আগের মতো তাদের দেখতে বা তাদের ধারণাকে বিশ্বাস করতে পারবে না।

AMARBOI.COM

এতদিন পর্যন্ত লোকে নিজেদের ইন্দ্রিয়জ প্রমাণের উপর নির্ভর করতে সক্ষম ভাবত। বিশ্বের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে অদৃশ্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে তারা, তবে এইসব বাহ্যিক চেহারা একটি বাস্তবতার অংশ বলে নিশ্চিত ছিল। জীবনের মৌলিক বিধান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার জন্যে বিকশিত মিথসমূহ তাদের অভিজ্ঞতার সত্যের সাথে মানানসই ছিল। ইলিউসিসের গ্রিক উপাসকরা পারসেফোনের কাহিনীকে তাদের পালন উপযোগি ফসলের মৌসুমের সাথে মেলাতে পেরেছিল; কাবাহকে ঘিরে প্রতীকীভাবে দৌড়ে বেড়ানো আরবরা পৃথিবীকে ঘিরে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথের সাথে নিজেদের এক রেখায় নিয়ে আসতে পারত এবং এভাবে অস্তিত্বের মৌল নীতিমালার সাথে ছন্দবদ্ধ থাকার কথা ভাবত। কিন্তু কোপার্নিকাসের পর সন্দেহের বীজ রোপিত হয়েছিল। প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে, পৃথিবী, যাকে স্থির *মনে হয়েছিল*, আসলে প্রবল বেগে ছুটছে; গ্রহগুলোকে ঘুরছে মনে হওয়ার কারণ লোকে সেগুলোর প্রতি তাদের নিজস্ব দৃষ্টি প্রক্ষেপিত করছিল: যাকে বাস্তবভিত্তিক ধরে নেওয়া হয়েছিল তা আসলে সম্পূর্ণই ভাবগত ছিল। যুক্তি আর *মিথ* আর এক তলে রইল না; প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত নিবিড় *লোগোস* যেন সাধারণ মানুষের ধারণাকে অবমূল্যায়িত করতে শুরু করেছিল এবং ক্রমবর্ধমান হারে তাদের শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীল করে তুলছিল। মিথ যেখানে মানুষের কর্মকাণ্ড জীবনের অত্যাবশ্যক অর্থের সাথে আবদ্ধ হিসাবে দেখিয়েছে, নতুন বিজ্ঞান হঠাৎ করেই নারী-পুরুষকে মহাবিশ্বের এক প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছিল। তারা আর বস্তুনিচয়ের কেন্দ্রে ছিল না, বরং মহাবিশ্বের এক বৈশিষ্ট্যহীন গ্রহে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের, যা আর তাদের প্রয়োজনকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছিল না। এক বিষণ্ণ দৃশ্য ছিল এটা, যার সম্ভবত নতুন সৃষ্টিবিজ্ঞানকে পুরোনোটির মতো অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্যে একটা মিথের প্রয়োজন ছিল কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মিথলজিকে অপদস্থ করতে শুরু করেছিল। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২–১৭২৭) পরীক্ষণ ও রহস্য উদ্ধারের বিকাশমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবল ব্যবহারের সাহায্যে পূর্বসুরিদের আবিষ্কারসমূহের সংশ্লেষ ঘটিয়েছিলেন। অভিকর্ষের ধারণাকে গোটা সৃষ্টিকে একসাথে ধরে রাখা এবং স্বর্গীয় বস্তুগুলোকে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরতকারী বিশ্বজনীন শক্তি ধরে নিয়েছিলেন নিউটন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, এই ব্যবস্থা ঈশ্বর, অর্থাৎ মহান 'মেকানিকের' অস্তিত্বের প্রমাণ রাখে, যেহেতু মহাবিশ্বের জটিল পরিকল্পনা দুর্ঘটনাক্রমে আবির্ভূত হয়নি।[12] প্রাক আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতো নিউটন মানুষের কাছে তাঁর ধারণামতে জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ও নিশ্চিত ধারণা পৌছে দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর 'ব্যবস্থা'

AMARBOI.COM

বস্তুগত বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ মিলে গেছে এবং মানবীয় জ্ঞানকে আগের চেয়ে বহুদূর নিয়ে গেছে। কিন্তু *লোগোসের* জগতে সম্পূর্ণ মগ্ন নিউটনের পক্ষে মানুষকে এক ধরনের সত্যির পথ দেখানোর মতো অন্য আরও কোনও স্বজ্ঞা প্রসূত ধারণার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কঠিন করে তুলেছিল। তাঁর চোখে মিথলজি ও রহস্য ছিল চিন্তার আদিম ও বর্বর কায়দা। 'এটা ধর্মের ক্ষেত্রে মানবজাতির উত্তপ্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অংশ,' বিরিক্তর সাথে লিখেছেন তিনি। 'সব সময়ই রহস্য প্রিয় হওয়ায় যেটা তারা সবচেয়ে কম বোঝে তাকেই বেশি পছন্দ করে।'[১৩]

ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাস থেকে পৌরাণিক মতবাদসমূহকে উৎখাত করার প্রশ্নে এক রকম বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন নিউটন। তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, ট্রিনিটি ও ইনকারনেশনের অযৌক্তিক মতবাদ ষড়যন্ত্র, জালিয়াতি ও প্রতারণার ফলমাত্র। তাঁর মহান গ্রন্থ *ফিলোসোফিয়া নেচারালিস প্রিন্সিপিয়া* (১৬৮৭) রচনার সময় *ফিলোসফিকাল অরিজিন অভ জেন্টাইল ফিলোসফি* নামে এক বিচিত্র নিবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলেন নিউটন, যেখানে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, নোয়াহ এক কুসংস্কারমুক্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে কোনও প্রত্যাদিষ্ট ঐশীগ্রন্থ, রহস্য ছিল না, বরং কেবল একজন উপাস্য ছিলেন যাঁকে প্রাকৃতিক বিশ্বের যৌক্তিক ধ্যানের সাহায্যে জানা সম্ভব ছিল। পরের প্রজন্মসমূহ এই খাঁটি ধর্মকে কলুষিত করেছে। চতুর্থ শতাব্দীতে বিবেকহীন ধর্মবেত্তাদের হাতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ট্রিনিটি ও ইনকারনেশনের মতবাদ যোগ হয়েছে এতে। প্রকৃতপক্ষেই, বুক অভ রেভেলেশন ট্রিনিটি মতবাদের উদ্ভবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছে–'তোমাদের পাশ্চাত্যের এই অদ্ভুত ধর্ম,' 'তিনটি সমান ঈশ্বরের কাল্ট'–ধ্বংসের অশ্লীলতা।[১৪] কিন্তু তারপরেও ধার্মিক লোক ছিলেন নিউটন এবং তখনও একটি যৌক্তিক আদিম ধর্মের অনুসন্ধানে একটা মাত্রা পর্যন্ত রক্ষণশীল চেতনায় বন্দি ছিলেন। কিন্তু আগের প্রজন্মের মতো নিজের ধর্ম বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারছিলেন না তিনি। চতুর্থ শতাব্দীর গ্রিক অর্থডক্স ধর্মবিদগণ যে পরবর্তীকালের ইহুদি কাব্বালিস্টরা যেভাবে *মিথোস* তৈরি করেছিল ঠিক সেভাবে ট্রিনিটি মতবাদ সৃষ্টি করেছিলেন, এটা বুঝতে অক্ষম ছিলেন তিনি। গ্রেগরি অভ নিসা যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার তিনটি *হিপোস্তাসে* কোনও বস্তুগত সত্য নয়, বরং স্রেফ স্বর্গীয় প্রকৃতি *(অউসা)* মানবীয় মনের সীমাবদ্ধতার সাথে যেভাবে খাপ খাইয়ে নেন তাকে বর্ণনা করার জন্যে 'আমাদের ব্যবহৃত পরিভাষা' মাত্র।[১৫] প্রার্থনা, ধ্যান ও লিটার্জির কাল্টিক পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে এটা কোনও অর্থ প্রকাশ করে না। কিন্তু নিউটন কেবল ট্রিনিটিকে যৌক্তিক পরিভাষায় দেখেছেন, মিথের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা ছিল না, তাই এই মতবাদকে বাদ দিতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন তিনি।

আজকের দিনে বহু ক্রিশ্চানের ট্রিনিটির ধর্মতত্ত্ব নিয়ে সমস্যার মুখে পড়ার বিষয়টি দেখায় যে, যুক্তির দিক দিয়ে তারা নিউটনের পক্ষপাতিত্বের অংশীদার। নিউটনের অবস্থান সম্পূর্ণ বোধগম্য। তিনি ছিলেন পশ্চিমের অন্যতম প্রথম সারির ব্যক্তি যিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের পদ্ধতি ও অনুশীলন সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। তাঁর সাফল্য ছিল আকাশ-ছোঁয়া আর এর ফল ছিল যেকোনও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মতোই আচ্ছন্নকারী। তিনি গবেষণার সময় বলতে অভ্যস্ত ছিলেন যে, 'হে ঈশ্বর, আমার ধারণা আপনিই আপনার কথা ভাবেন!'[১৬] আক্ষরিকভাবেই স্বজ্ঞাপ্রসূত অতীন্দ্রিয় সচেতনতার পক্ষে কোনও সময় ছিল না, যেটা হয়তো তাঁর প্রগতিকে ব্যাহত করতে পারত। পাশ্চাত্য পরীক্ষানিরীক্ষার চোখ ধাঁধানো ও প্রবল সাফল্যের কারণে মানুষের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যুক্তি ও মিথ পরস্পরের বেমানান হয়ে উঠছিল।

সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ প্রগতি এতটাই নিশ্চত হয়ে ওঠে যে, বহু ইউরোপিয়ই তখন সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎমুখী হয়ে উঠেছিল। অতীতকে সম্পূর্ণ নাকচ করে নতুন করে শুরু করার জন্যে প্রস্তুত থাকার বিষয়টি আবিষ্কার করেছিল তারা। আগ্রসর হওয়ার গতিবেগ ছিল রক্ষণশীল চেতনার ভিত্তিভূমি পৌরাণিক পশ্চাদপসরণের ঠিক বিপরীত। নতুন বিজ্ঞানকে ভবিষ্যৎমুখী হতে হয়েছে: এভাবেই তা কাজ করে। কোপার্নিকাসের তত্ত্ব কার্যকরভাবে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর টলেমিয় সৃষ্টি ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব ছিল না। পরে নিউটনের নিজস্ব ব্যবস্থা না হলেও তাঁর নিজের পদ্ধতি বাদ পড়ে যাবে। ইউরোপিয়রা সত্যি সম্পর্কে এক নতুন ধারণা গড়ে তুলছিল। নতুন নতুন আবিষ্কার সব সময়ই পুরোনো সত্যিকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে বলে সত্য কখনওই পরম হতে পারে না; একে অবশ্যই বাস্তবে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল এবং বাস্তব জীবনে এর কার্যকারিতা দিয়ে পরিমাপ করতে হত। প্রাথমিক কালের বিজ্ঞানের সাফল্য একে এমন কর্তৃত্ব দান করেছিল যা পৌরাণিক সত্যের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছিল, যা এই যোগ্যতার কোনওটাই পূরণ করতে পারেনি।

ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের কাউন্সিলর ফ্রান্সেস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) রচিত *দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অভ লার্নিং*-এ এটা ইতিমধ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বেকন জোরের সাথে বলেছেন সত্যি, এমনকি ধর্মের পবিত্রতম মতবাদকেও অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনামূলক পদ্ধতির অধীনে নিয়ে আসতে হবে। প্রমাণিত তথ্যে ও আমাদের ইন্দ্রিয়জ প্রমাণের বিরোধিতা করলে তাকে অবশ্যই ছুঁড়ে ফেলতে হবে। মানবজাতির জন্যে এক সুমহান ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথে অতীতের কোনও মহান দর্শনকেই বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেওয়া যাবে না। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার মানবজাতির সব রকম ভোগান্তির অবসান ঘটাবে বলে

AMARBOI.COM

বিশ্বাস করতেন বেকন, তিনি মনে করতেন এভাবে এই মাটির পৃথিবীতেই পয়গম্বরদের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই রাজ্যের উদ্বোধন ঘটবে। বেকনের রচনায় আমরা নতুন যুগের উত্তেজনার দেখা পাই। তিনি এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, বিজ্ঞান ও বাইবেলের ভেতর কোনও বিরোধই লক্ষ করেননি। গালিলিও নিন্দিত হওয়ার অনেক বছর আগেই বিজ্ঞানের কর্মীদের পক্ষে সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন তিনি, যাদের কর্মকাণ্ড সাধারণ মনমানসিকতার যাজককুলের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মতো তুচ্ছ ব্যাপার নয়। *দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অভ লার্নিং* মিথ থেকে মুক্তির সন্ধান ও কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদই মানবজাতিকে সত্যের পথে নিয়ে যাবার শক্তির কথা ঘোষণাকারী স্বাধীনতার ঘোষণার মতো ছিল।

এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল এটা, আজকের আধুনিক পশ্চিমে আমরা বিজ্ঞানকে যেভাবে জানি তার সূচনাকে তুলে ধরে। এর আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যাকে সব সময়ই এইসব আবিষ্কারের ব্যাখ্যা তুলে ধরা এক ধরনের সামগ্রিক মিথলজির সীমানায় পরিচালনা করা হত। চলমান মিথ সব সময়ই এইসব আবিষ্কারের নিয়ন্ত্রণ করত, তাদের প্রয়োগের উপর বাধা আরোপ করত, রক্ষণশীল সমাজের সীমাবদ্ধতার দাবি ছিল এমনই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপিয় বিজ্ঞানীরা প্রাচীন বাধা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিতে শুরু করেছিলেন। কৃষিভিত্তিক সমাজকে পেছনে টেনে ধরা বিভিন্ন উপাদান ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হওয়ায় তাদের আর এসবের কোনও প্রয়োজন ছিল না। বেকন জোরের দিয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানই একমাত্র সত্যি। একথা স্বীকার্য, বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ধারণা আমাদের চেয়ে বেশ ভিন্ন ছিল। বেকনের চোখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল প্রধানত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের একটা ব্যাপার, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনুমান ও প্রকল্পের গুরুত্ব হিসাবে মেনেনি তিনি। তবে সত্যি সম্পর্কে বেকনের সংজ্ঞা বিশেষ করে ইংরেজিভাষী দেশগুলোতে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেবল আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে পাওয়া তথ্যের উপরই আমরা নিরাপদভাবে নির্ভর করতে পারি, বাকি সব স্রেফ কল্পনা। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ করা সম্ভব নয় বলে দর্শন, মেটাফিজিক্স, ধর্মতত্ত্ব, শিল্পকলা, কল্পনা, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং মিথলজিকে কুসংস্কার হিসাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল।

জীবনের এই সম্পূর্ণ যৌক্তিক ধারায় বিশ্বাস করেও আবার ধার্মিক হতে চেয়েছে যারা, ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে চিন্তা করার নতুন পথ খুঁজে পেতে হয়েছে তাদের। আমরা ফরাসি বৈজ্ঞানিক রেনে দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) দর্শনে পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গির মৃত্যু প্রত্যক্ষ করি। তিনি কেবল *লোগোই,* যুক্তির ভাষায় কথা বলতে পারতেন। নিঃসঙ্গতার দর্শন ছিল তাঁর। দেকার্তের চোখে মহাবিশ্ব প্রাণহীন

AMARBOI.COM

একটা যন্ত্র, ভৌত জগৎ অনড় ও মৃত। স্বর্গ সম্পর্কে কোনও সংবাদ দেওয়ার ক্ষমতা এর নেই। মহাবিশ্বে একমাত্র মানুষের মনই জীবিত বস্তু, কেবল নিজের উপর নির্ভর করেই তা নিশ্চয়তা খুঁজে পেতে পারে। এমনকি আমাদের নিজস্ব সন্দেহ ও ভাবনার বাইরে আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা সে ব্যাপারেও আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। নিবেদিত প্রাণ ক্যাথলিক ছিলেন দেকার্তে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন তিনি; কিন্তু মিথ ও কাল্টের আদিম কাল্পনিক অতীতে ফিরে যেতে অস্বীকার গেছেন। পয়গম্বর ও পবিত্র টেক্সটের দর্শনের উপরও নির্ভর করতে পারেননি তিনি। নতুন যুগের মানুষ হিসাবে চলমান ধারণা মেনে নিতে পারেননি, বৈজ্ঞানিককে অবশ্যই তাঁর মনকে *তেবুলা রাসা*-য় পরিণত করতে হবে। গণিত বা অনস্বীকার্যভাবে ঠিক 'যা হয়ে গেছে তাকে আর বদলানো যাবে না' ধরনের স্বতঃসিদ্ধ প্রস্তাব থেকে যা পাওয়া যেতে পারে সেটাই একমাত্র সত্যি। যেহেতু পেছনে যাবার পথ রুদ্ধ, দেকার্তে কেবল একটু একটু করে সমনেই যেতে পেরেছেন।

একদিন সন্ধ্যায় কাঠের চুলোর পাশে বসে থাকার সময় *কোগিতো, এরগো সাম* আপ্তবাক্যটি তৈরি করেন দেকার্তে। একে স্বপ্রকাশিত বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। আমরা কেবল আমাদের মনের সন্দেহের অভিজ্ঞতার বিষয়েই নিশ্চিত হতে পারি। কিন্তু এটা মানুষের মনের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে এবং 'সীমাবদ্ধতার' এই চিন্তা কোনও অর্থ প্রকাশ করবে না যদি আমাদের 'সম্পূর্ণতা' সম্পর্কে কোনও পূর্বধারণা না থাকে। অস্তিত্বহীন সম্পূর্ণতা তত্ত্বগতভাবে স্ববিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। *এরগো*—চূড়ান্ত সম্পূর্ণতা—ঈশ্বর—অবশ্যই বাস্তব হতে বাধ্য।[১৭] এই তথাকথিত প্রমাণে কোনও আধুনিক অবিশ্বাসীর সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয়। এখানে এই জাতীয় প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে খাঁটি যুক্তির অক্ষমতাও দেখা যায়। জগতে আমাদের কার্যকর কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে যৌক্তিক চিন্তাভাবনা অপরিহার্য। দেকার্তের মতো কোনও বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যে পরিচালিত হলে বা আমরা জাগতিক বিশ্ব থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে যতদূর সম্ভব বস্তুনিষ্ঠভাবে কোনও কিছু বিবেচনা করতে চাইলে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু আমরা যখন জানতে চাই এই জগৎ *কেন* টিকে আছে (আদৌ থাকলে!) বা জীবনের কোনও অর্থ আছে কিনা, যুক্তি খুব বেশি অগ্রসর হতে পারে না, আর আমাদের চিন্তার বিষয়টিও আমাদের কাছে অদ্ভুত হয়ে উঠতে পারে। শীতল বিশ্বে চুলোর পাশে আপন অনিশ্চয়তায় বন্দি দেকার্তে এমন একটি 'প্রমাণ' উচ্চারণ করেছেন যা কিনা আধুনিক মানুষের আধ্যাত্মিক টানাপোড়েন তুলে ধরা মানসিক ধাঁধার চেয়ে সামান্য বেশি কিছু।

AMARBOI.COM

এভাবে বিজ্ঞান ও বাধাহীন যুক্তিবাদ একসাথে সামনে অগ্রসর হওয়ার এমন একটা সময়ে মানুষের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মিথলজিহীন বাস করতে বাধ্য হওয়া বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের কাছে জীবন হয়ে পড়ছিল অর্থহীন। ব্রিটিশ দার্শনিক টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর একজন ছিলেন, কিন্তু সকল বাস্তবসঙ্গত কারণেই ঈশ্বর নাও থাকতে পারেন। লুথারের মতো হবস ভৌত বিশ্বকে ঈশ্বরহীন মনে করেছেন। হবস বিশ্বাস করতেন, মানব ইতিহাসের ঊষা লগ্নে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, আবার একেবারে অন্তিমেও তাই করবেন। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত আমাদের তাঁকে ছাড়াই এগিয়ে যেতে হবে, যেমন বলা হয়েছে, অপেক্ষা করতে হবে, অন্ধকারে।[১৮] প্রচণ্ডভাবে ধার্মিক মানুষ ফরাসি দার্শনিক ব্লেইজ পাসকাল (১৬২৩-৬২)-এর চোখে আধুনিক বিজ্ঞানের হাতে উন্মুক্ত অসীম বিশ্বজগতের শূন্যতা ও 'চিরন্তন নীরবতা' নিখাঁদ ভীতির জাগরণ ঘটিয়েছে:

> যখন মানুষের অন্ধ ও করুণ অবস্থা দেখি, যখন গোটা মহাবিশ্বকে মৃতের মতো ও মানুষকে আলোহীন দেখি, যেন তাকে মহাবিশ্বের এক কাণে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, যেন কে তাকে ওখানে নিয়ে গেছে তার জানা নেই, তাকে কী করতে হবে, মৃত্যুর পর কী পরিণতি হবে, কোনও কিছুই জানার মতো ক্ষমতা তার নেই, ঘুমের ভেতর কোনও ভয়াল নির্জন দ্বীপে নিয়ে যাওয়া কারও মতো সন্ত্রাসে আলোড়িত হই আমি, পালানোর কোনও উপায় ছাড়াই জেগে উঠে দিশাহারা অবস্থা হয় যার। তখনই এমন করুণ অবস্থাও মানুষকে হতাশায় ঠেলে দেয় না দেখে বিস্মিত হই।[১৯]

এক বিশাল বাস্তব উপায়ে আধুনিক বিশ্বে যুক্তি ও *লোগোস* নারী-পুরুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল, কিন্তু মানবীয় প্রকৃতির কারণেই এপর্যন্ত *মিথোসের*-এখতিয়ারে থাকা উদ্ভূত বিভিন্ন চূড়ান্ত প্রশ্নের মোকাবিলা করার যোগ্যতা মানুষের ছিল না। এর ফলে পাসকাল বর্ণিত হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা আধুনিক অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তবে সবার জন্যে নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক আলোকনের অন্যতম পথিকৃৎ জন লক (১৬৩২-১৭২৪)-এর পাসকালের মতো অস্তিত্বমূলক কোনও উদ্বেগ ছিল না। জীবন ও মানুষের যুক্তির উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রশান্ত ও আস্থাময়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ ছিল না তাঁর মনে, যদিও তিনি বুঝতেন আমাদের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার বাইরে অবস্থানকারী একজন

AMARBOI.COM

উপাস্যের বাস্তবতা প্রমাণ করা বেকনের অভিজ্ঞতাজাত পরীক্ষায় উতরে যায় না। সম্পূর্ণ যুক্তির উপর নির্ভরশীল লকের ধর্ম কোনও কোনও মারানোর উদ্ভাবিত ডেইজম-এর অনুরূপ ছিল। তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন, স্বাভাবিক প্রকৃতি একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ তুলে ধরে এবং যুক্তিকে ঠিক মতো মুক্তভাবে প্রকাশিত হতে দেওয়া হলে সবাই নিজ থেকেই সত্যি আবিষ্কার করতে পারবে। মিথ্যা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভিন্ন ধারণা এই পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করার একমাত্র কারণ পুরোহিতরা তাঁদের অর্থডক্সি মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে ইনকুইজিশনের মতো নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাচারী বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং, সত্যিকারের প্রকৃত ধর্মের খাতিরে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সকল ধরনের বিশ্বাসকে সহ্য করতে হবে এবং স্রেফ বাস্তব প্রশাসন ও সরকার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। চার্চ ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই আলাদা থাকতে হবে। একজনের কাজে আরেকজন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এটা ছিল যুক্তির কাল। মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, বিশ্বাস করেছিলেন লক, নারী-পুরুষ স্বাধীন হয়ে উঠবে এবং সত্য উপলব্ধি করতে পারবে।[২০]

এমনি উদার দৃষ্টিভঙ্গি আলোকনের সুর স্থির করে দিয়েছিল, আধুনিক, সেক্যুলার, সহিষ্ণু রাষ্ট্রের অনুপ্রেরণাদানকারী আদর্শে পরিণত হয়েছিল। ফরাসি ও জার্মান আলোকন দার্শনিকরাও ডেইজমের যৌক্তিক ধর্মে অবদান রেখেছেন, প্রাচীন পৌরাণিক প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগুলোকে সেকেলে বিবেচনা করেছেন তাঁরা। যুক্তিই যেহেতু সত্যির একমাত্র কষ্টিপাথর, 'প্রত্যাদেশে'র কাল্পনিক ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত পুরোনো ধর্মগুলো ঐশ্বর্য প্রাকৃতিক ধর্মের আনাড়ী ভাষ্য বলে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। বিশ্বাসের যৌক্তিক হওয়া উচিত, যুক্তি দেখিয়েছেন ব্রিটিশ ধর্মবেত্তা ম্যাথ্যু টিন্ডাল (১৬৫৫-১৭৩৩) ও রোমান ক্যাথলিক থেকে ডেইস্টে পরিণত আইরিশ জন টোল্যান্ড (১৬৭০-১৭২২)। আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিই পবিত্র সত্যে পৌঁছানোর একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়, ক্রিশ্চান ধর্মকে অবশ্যই রহস্যময়, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রত্যাদেশের কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ যে কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষেই স্বাধীন যুক্তিজ্ঞানের বদৌলতে সত্যে উপনীত হওয়া খুবই সম্ভব।[২১] নিউটন যেমন তুলে ধরেছেন, ভৌত মহাবিশ্বের পরিকল্পনা নিয়ে বাইবেলেই একজন স্রষ্টা ও প্রথম কারণের অস্তিত্বের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ মেলে। মহাদেশে জার্মান ইতিহাসবিদ হারমান স্যামুয়েল রেইমারাস (১৬৯৪-১৭৬৮) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, জেসাস কখনওই নিজেকে ঐশী সত্তা বলে দাবি করেননি। তাঁর লক্ষ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ছিল। একটি 'অসাধারণ, সরল, মহান ও

AMARBOI.COM

বাস্তব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা' জেসাসকে স্রেফ একজন মহান নেতা হিসাবে শ্রদ্ধা করা উচিত।[২২]

মিথোসের প্রাচীন সত্যসমূহকে এখন এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল যেন সেগুলো *লোগোই*, এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন পরিবর্তন, শেষ পর্যন্ত হতাশ করতে বাধ্য।

কারণ ঠিক যে সময়ে এই ধর্মবেত্তা, দার্শনিক ও ইতিহাসবিদগণ যুক্তির প্রাধান্য দাবি করছিলেন, ঠিক তখন জার্মান যুক্তিবাদী ইম্যানুয়েল কান্ট (১৭২৩-১৮০৪) গোটা আলোকনের প্রকল্পকেই খাট করে দেন। কান্ট একদিকে প্রাথমিক আধুনিকতার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মানুষকে অবশ্যই শিক্ষক, চার্চ ও কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীলতা ছুঁড়ে ফেলে নিজে থেকেই সত্যি সন্ধান করতে হবে। 'আলোকন হচ্ছে মানুষের নিজে থেকে সৃষ্টি করা অভিভাবকত্ব থেকে মুক্তি,' লিখেছেন তিনি। 'অভিভাবকত্ব হচ্ছে অন্যের কাছ থেকে নির্দেশনা না পেয়ে নিজের মতো করে নিজের বোধকে কাজে লাগানোর অক্ষমতা।'[২৩] কিন্তু আবার অন্যদিকে *ক্রিটিক অভ পিউর রিজন* (১৭৮১)-এ কান্ট যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আমরা প্রকৃতিতে যে শৃঙ্খলা আবিষ্কার করি বলে ভাবি তার সাথে বাইরের কোনও বাস্তবতার সম্পর্ক থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব। এই 'শৃঙ্খলা' আমাদের নিজস্ব মনের সৃষ্টি মাত্র, এমনকি নিউটনের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুনও সম্ভবত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে বরং মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেই বেশি তথ্য যোগায়। মন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সাহায্যে তার বাইরের কোনও তথ্য সংগ্রহ করার সময় এর ভেতর থেকে একটা অর্থ বের করতে একে তার নিজস্ব অন্তস্থঃ কাঠামো অনুযায়ী শনাক্ত করতে হয়। নিজের জন্যে একটি টেকসই যৌক্তিক দর্শন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মনের ক্ষমতার উপর দারুণ আস্থাশীল ছিলেন কান্ট। কিন্তু বাস্তবে মানুষের পক্ষে তার মনস্তত্ত্ব থেকে পালানো অসম্ভব দেখিয়ে তিনি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পরম সত্য বলে কিছু নেই। আমাদের সব ধারণাই আবিশ্যিকভাবে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যাখ্যামূলক। দেকার্তে যেখানে মানুষের মনকে এক মৃত পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ নাগরিক হিসাবে দেখেছেন, কান্ট জগৎ ও মানুষের ভেতরের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করে দিয়ে তাকে আমাদের নিজেদের মাথার ভেতর বন্দি করেছেন।[২৪] মানুষকে অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি এক বন্দিশালায় আটক করেছেন। প্রায়শঃই আধুনিকতা এভাবে এক হাতে কিছু দিয়ে আরেক হাতে কেড়ে নিয়েছে। যুক্তি আলোক ও মুক্তিদায়ী ছিল, কিন্তু তা নারী-পুরুষকে যে জগৎ তারা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখছিল সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল।

AMARBOI.COM

পরম সত্যি বলে কিছুই যদি না থাকবে তাহলে ঈশ্বরের কী হবে? অন্যান্য ডেইস্টদের বিপরীতে কান্ট বিশ্বাস করতেন যে, উপাস্য ইন্দ্রিয়র নাগালের বাইরে অবস্থান করেন বলে মানুষের মনের অগম্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব।[২৫] পরমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুক্তির আসলে একাকী কিছুই করার থাকে না। একমাত্র যে সান্ত্বনা কান্ট যোগাতে পেরেছিলেন সেটা হলো, একই যুক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করা অসম্ভব। কান্ট স্বয়ং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, নিজের ধারণাসমূহকে ধর্মের প্রতি বৈরী মনে করেননি; তিনি ভেবেছিলেন, এসব ধারণা ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির উপর নেহাত অযথার্থ নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করবে। *ক্রিটিক অভ প্র্যাক্টিকাল রিজন*-এর শেষে তিনি লিখেছেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে নৈতিক বিধান খোদাই করার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন তিনি, স্বর্গের বিশালতার মতো যা তাঁকে বিস্ময় আর ভয়ে পরিপূর্ণ রাখে। কিন্তু ডেইস্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে একমাত্র যে যৌক্তিক ভিত্তি তুলে ধরতে পেরেছিলেন তিনি সেটা খুবই সন্দেহজনক যুক্তি যে, এমন একজন উপাস্য ছাড়া ও পরকালের সম্ভাবনা না থাকলে আমাদের নৈতিক আচরণ করার কোনও কারণ দেখতে পান না তিনি। একেও প্রমাণ হিসাবে অসন্তোষজনকই বলতে হবে।[২৬] কান্টের ঈশ্বর ছিলেন মানবীয় অবস্থায় জুড়ে দেওয়া পশ্চাদভাবনামাত্র। অন্তস্থঃ বিশ্বাস ছাড়া একজন যুক্তিবাদী কেন বিশ্বাস করতে যাবে তার কোনও প্রকৃত কারণ নেই। ডেইস্ট ও যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে অতীত কালের নারী-পুরুষ যুক্তির উপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই কেবল প্রচলিত প্রতীক বা রেওয়াজের মাধ্যমে এক ধরনের পবিত্রের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারত-সেসবে কান্টের কোনও অবকাশ ছিল না। স্বর্গীয় আইনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন কান্ট, তাঁর চোখে এটা ছিল মানুষের স্বায়ত্তশাসনের বর্বোরোচিত অস্বীকৃতি, তিনি অতীন্দ্রিয়বাদ, প্রার্থনা বা আচার অনুষ্ঠানের ভেতর যুক্তি খুঁজে পাননি।[২৭] কান্টের অস্তিত্ব ছাড়া ধর্ম ও স্বর্গের ধারণা ক্ষীণ, শুষ্ক ও সমর্থনের অযোগ্য।

কিন্তু তারপরেও পশ্চিমে, বৈপরীত্যমূলকভাবে সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে যুক্তির আবির্ভাব ধর্মীয় অযৌক্তিকতার বিস্ফোরণের সাথে মিলে গিয়েছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক দেশ ও আমেরিকান কলোনিগুলোতে সংক্ষিপ্ত সময়ে জন্যে আবির্ভূত ব্যাপক উইচ ক্রেজ দেখিয়ে দিয়েছিল যে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের কাল্টও সব সময় অন্ধকার শক্তিকে দূরে ঠেলে রাখতে পারে না। অতীন্দ্রিয়বাদ ও মিথলজি নারী-পুরুষকে অবচেতন বিশ্বের মোকাবিলা করতে শিখিয়েছিল। এটা দুর্ঘটনামূলক নাও হতে পারে যে, এমন একটা সময় ধর্মীয় বিশ্বাস এই ধরনের আধ্যাত্মিকতা বিসর্জন দিতে শুরু করলে অবচেতন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। উইচ ক্রেজকে গোটা ক্রিশ্চান বিশ্বে নারী, পুরুষ ও

AMARBOI.COM

ইনকুইজিটরদের সম্মিলিত ফ্যান্টাসি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। লোকে বিশ্বাস করে বসেছিল যে, দানোর সাথে তাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ও কোনও শয়তানি আচার আর বিকৃত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাতের অন্ধকারে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছিল, ডাইনীরা ধর্মসভার বিকৃতিতে ঈশ্বরের বদলে শয়তানের উপাসনা করছে–প্রচলিত ধর্মের প্রতি ব্যাপকবিস্তারি অবচেতন বিদ্রোহ ফুটিয়ে তোলা পরিবর্তন হতে পারে। ঈশ্বরকে এত দূরবর্তী, অচেনা আর চাহিদা সম্পন্ন মনে হচ্ছিল যে, কারও কারও কাছে দানবীয় হয়ে উঠছিলেন তিনি; অবচেতন ভীতি ও আকাঙ্ক্ষাসমুহ মানুষের দানবীয় রূপে ফুটিয়ে তোলা শয়তানের কাল্পনিক মূর্তিতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।[২৮] খোদ ক্রেজের অবসান হওয়ার আগ পর্যন্ত উইচক্র্যাফটের দায়ে দণ্ডিত হাজার হাজার নারী-পুরুষকে হয় ফাঁসি দেওয়া হয়েছে নয়তো শূলে চড়িয়ে মারা হয়েছে। মনের এইসব গভীর স্তরসমূহকে বিবেচনায় না নেওয়া নতুন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এই বিকারগ্রস্ত বিস্ফোরণকে সামাল দিতে ছিল অক্ষম। এক বিশাল ভীতিকর ও ধ্বংসাত্মক যুক্তিহীনতাও আধুনিক অভিজ্ঞতার অংশ ছিল।

অতলান্তিকের উভয় পাড়ের মানুষের জন্যেই ভীতিকর সময় ছিল এটা। সংস্কার ছিল ইউরোপকে ভয়ঙ্করভাবে বৈরী শিবিরে বিভক্ত করে দেওয়া ভীতিকর বিচ্ছেদ। ইংল্যান্ডে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকরা পরস্পরের উপর নির্যাতন চালিয়েছে: ফ্রান্সে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের ঘটনা (১৫৬২-৬৩) এবং ১৫৭২ সালে দেশব্যাপী প্রটেস্ট্যান্টদের গণহারে হত্যা ঘটেছে। তিরিশ বছর মেয়াদী যুদ্ধ (১৬১৮-৪৮) একের পর এক দেশকে টেনে এনে ইউরাপকে ধ্বংস করে দিয়েছে, শক্তিশালী ধর্মীয় মাত্রায় পরিচালিত ক্ষমতার সংঘাত ইউরোপের ঐকবদ্ধ হওয়ার যে কোনও আশা তিরোহিত করে দিয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতাও ছিল। ১৬৪২ সালে গৃহযুদ্ধে জর্জরিত হয়ে ওঠে ইংল্যান্ড, এরই পরিণতিতে রাজা প্রথম চার্লস নিহত হন (১৬৪৯) এবং পিউরিটান সাংসদ অলিভার ক্রমওয়েলের অধীনে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৬০ সালে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে সংসদ কর্তৃক এর ক্ষমতা খর্ব করা হয়। পশ্চিমে আরও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের রক্তাক্ত ও বেদনাদায়ক আবির্ভাব ঘটছিল। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব আরও অনেক বেশি বিপর্যয়কর ছিল, এর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে নেপোলিয়নের অধীনে শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ত্রাস ও সামরিক স্বৈরাচারের একটা রাজত্ব চলেছে। আধুনিক বিশ্বে ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকার দ্বিমুখী: স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আলোকন আদর্শের বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি আবার সমানভাবে প্রভাবশালী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয়াবহ স্মৃতিও রেখে গেছে। আমেরিকান উপনিবেশগুলোতেও সাত বছর মেয়াদী

AMARBOI.COM

যুদ্ধ (১৭৩৬-৬৩)–যেখানে ফ্রান্স ও ব্রিটেন তাদের সাম্রাজ্যবাদী অধিকার নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল–আমেরিকার পূর্ব উপকূলে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, ভীতিকর ধ্বংসলীলার সৃষ্টি হয়েছে তাতে। এটা সরাসরি স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে নিয়ে গেছে (১৭৭৫-৮৩) যার ফলে আধুনিক বিশ্বে সর্ব প্রথম সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পশ্চিমে আরও ন্যায়বিচারভিত্তিক ও সহিষ্ণু সামাজিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটছিল, কিন্তু সেটা অর্জন সম্ভব হয়েছিল প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী সহিংসতার পর।

এই টালমাতাল সময়ে মানুষ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং কেউ কেউ এমনি নতুন পরিস্থিতিতে বিশ্বাসের প্রাচীন ধরন আর কাজ করছে না বলে আবিষ্কার করেছিল। পরবর্তীকালে ইহুদি ধর্মের শ্যাব্বেতিয় আন্দোলনের মতো নৈতিকতা বিরোধী আন্দোলন অতীতের সাথে বন্ধন ছিন্ন করে সামঞ্জস্যহীনভাবে নতুন কিছু লাভ করার প্রয়াস পেয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীর ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের পর জ্যাকব বথিউমলি ও লরেন্স ক্লার্কসন (১৬৩০) এক ধরনের প্রাথমিক নাস্তিক্যবাদের প্রচার চালান। একজন বিচ্ছিন্ন, দূরবর্তী উপাস্য বহুঈশ্বরবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, *দ্য লাইট অ্যান্ড ডার্ক সাইড অভ গড* (১৬৫০)-এ যুক্তি দেখিয়েছেন ক্লার্কসন; জেসাস ছাড়াও অন্য ব্যক্তির মাঝে মানবরূপ গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বর; সবকিছুতেই, এমনকি পাপেও স্বর্গীয় সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। *দ্য সিঙ্গল আই*-তে ক্লার্কসনের চোখে পাপ মানবীয় কল্পনামাত্র, আর অশুভ ঈশ্বরের একটি প্রকাশ। রেডিক্যাল ব্যাপ্টিস্ট অ্যাবিয়েযার কোপে (১৬১৯-৭২) প্রকাশ্যে যৌনতার টাবু ভঙ্গ করবেন ও জনসমক্ষে খিস্তিখেউর করবেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'মহান সমতাবিধানকারী' ক্রাইস্ট ফিরে এসে বর্তমানের পচা ভণ্ডামীপূর্ণ ব্যবস্থাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন।[২৯] নিউ ইংল্যান্ডের আমেরিকান কলোনিগুলোতেও নৈতিকতা বিরোধী মতবাদ চলছিল। ১৬৩৫ সালে ম্যাসাচুসেটসে পৌঁছানো জনপ্রিয় পিউরিটান যাজক জন কটন (১৫৮৫–১৬২৩) জোর দিয়ে বলেছেন, ভালো কাজের কোনও অর্থ নেই, সৎ জীবন যাপন অর্থহীন; এইসব মানব সৃষ্ট নিয়মনীতি ছাড়াই ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর শিষ্য অ্যানি হাচিনসন (১৫৯০-১৬৪৩) দাবি করেছিলেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন তিনি, তাই বাইবেল পাঠ বা ভালো কাজ করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না।[৩০] এই বিদ্রোহীরা সম্ভবত জীবন মৌলিকভাবে বদলে যেতে থাকা নূতন বিশ্বব্যবস্থায় প্রাচীন বিধিনিষেধ আর কাজ না করার সেই অপরিণত ভাবনাই প্রকাশ করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। অবিরাম উদ্ভাবনের একটা কালে কেউ কেউ ধর্মীয় ও নৈতিক স্বাধীনতার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার উদ্ভাবন থেকেও নিস্তার চাইবে, এটাই স্বাভাবিক।

AMARBOI.COM

অন্যরা নতুন যুগের আদর্শসমূহকে ধর্মীয় ভঙ্গিতে প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছে। সোসায়েটি অভ ফ্রেন্ডস-এর প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ফক্স (১৬২৪-৯১) এমন এক আলোকনের প্রচার করেছেন যা পরবর্তীকালের কান্টের মতবাদ থেকে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না। তাঁর কোয়াকারদের নিজের অন্তস্তলেই আলোর সন্ধান করতে হবে। ফক্স তাদের 'অন্যের কাছে নির্দেশনা নেওয়ার বদলে নিজের মতো করে উপলব্ধি অর্জন করতে'[৩১] শিখিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মকে এই বিজ্ঞানের যুগে অবশ্যই 'পরীক্ষামূলক' হতে হবে; কোনও কর্তৃত্ববাদী প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সত্যায়িত হতে হবে।[৩২] সোসায়েটি অভ ফ্রেন্ডস এক নতুন গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রচারণা চালিয়েছে: সব মানব সন্তানই সমান। কোয়াকারদের আর কারও সামনে মাথার টুপি খোলার প্রয়োজন নেই। অশিক্ষিত নারী-পুরুষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী যাজকদের সমীহ করার প্রয়োজন নেই, বরং তাদের অবশ্যই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে হবে। একইভাবে জন ওয়েসলি (১৭০৩-৯১) আধ্যাত্মিকতায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'মেথডিস্ট' অনুসারীরা প্রার্থনার কঠোর নিয়ম মেনে চলত: বাইবেল পাঠ, উপবাস পালন ও দান। কান্টের মতো ওয়েসলি যুক্তি থেকে ধর্মবিশ্বাসের মুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ধর্ম মস্তিষ্কের কোনও মতবাদ নয়, বরং হৃদয়ের বিশ্বাস। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রিশ্চান ধর্মের যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ 'আবদ্ধ ও বন্দি' হয়ে পড়াটা এমনকি এক ধরনের আশীর্বাদও হতে পারে। এটা নারী-পুরুষকে মুক্ত করবে, তাদের 'নিজেদের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করবে ও হৃদয়ের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলন্ত আলোকে দেখতে বাধ্য করবে।'[৩৩]

ক্রিশ্চানরা বিভক্ত হতে শুরু করেছিল: কেউ কেউ *ফিলোসফসদের* অনুসরণ করে ধর্মবিশ্বাসকে রহস্যমুক্ত ও যৌক্তিক করার প্রয়াস পাচ্ছিল, অন্যরা যুক্তিকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিয়েছিল। এটা ছিল উদ্বেগজনক একটা ব্যাপার, বিশেষ করে আমেরিকান কলোনিগুলোতে বেশি দৃশ্যমান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৌলবাদের বিকাশ এই বিভাজনের অন্যতম প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠবে। প্রথম দিকের বছরগুলোতে পিউরিটান নিউ ইংল্যান্ড ছাড়া অধিকাংশ কলোনি ধর্মের প্রতি নিস্পৃহ ছিল; মনে হয়েছিল যেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ কলোনিগুলো বুঝি সম্পূর্ণ সেকুলারাইজড হয়ে উঠবে।[৩৪] কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবার প্রটেস্ট্যান্টদের আধিপত্য পুনরুজ্জীবিত হয়, পুরোনো পৃথিবীর তুলনায় নুতন বিশ্বে ক্রিশ্চানদের জীবনধারা অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক হয়ে ওঠে। মূলত যাজকীয় কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে যার যার নিজস্ব নেতৃত্ব অনুসরণের উপর

জোরদানকারী কোয়াকার, ব্যাপ্টিস্ট ও প্রেসবিটারিয়ানদের মতো উপদলগুলো ফিলাদেলফিয়া অ্যাসেম্বলি স্থাপন করেছিল। এই অ্যাসেম্বলি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখত, যাজক সম্প্রদায়কে নির্দেশনা দিত ও যেকোনও রকম ধর্মদ্রোহীতাকে দমন করত। এই নির্যাতনমূলক অথচ আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার ফলে তিনটি গোষ্ঠীই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ও এদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বাড়তে থাকে। একই সময়ে মেরিল্যান্ডে চার্চ অভ ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, জাঁকাল দর্শন চার্চ নিউ ইয়র্ক সিটি, বস্টন ও চার্লসটনের দিগন্ত রেখাকে আমূল বদলে দেয়।[৩৫]

কিন্তু একদিকে যখন বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা আরোপের লক্ষ্যে প্রয়াস চলছিল, তখন এই যৌক্তিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়েছিল। রক্ষণশীল ধর্ম সব সময়ই মিথলজি ও যুক্তিকে পরিপূরক হিসাবে দেখেছে, একটি ছাড়া অন্যটি হীন হয়ে পড়বে। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই ছিল, যেখানে যুক্তিকে প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ করে দেওয়া হত। কিন্তু কোনও কোনও নতুন প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলনে (এই পরিবর্তনকে মার্টিন লুথারের সময় পর্যন্ত টেনে নেওয়া যেতে পারে) যুক্তিকে সাইড লাইনে ঠেলে দেওয়ার বা এমনকি পুরোপুরি বাতিল করার প্রবণতা অস্বস্তিকর যুক্তিহীনতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। কোয়াকারদের এ নামে অভিহিত করার কারণ ছিল গোড়ার দিকে প্রায়শঃই তারা তাদের ধর্মীয় পরিবর্তন প্রকাশ করার জন্যে কাঁপত, হুঙ্কার ছাড়ত আর চিৎকার করত–জনৈক পর্যবেক্ষক লক্ষ করেছেন–ফলে কুকুর ডেকে উঠত, গরুছাগল পাগলের মতো ছোটাছুটি করত আর শুয়োরের পাল আতঙ্কে চেঁচামেচি জুড়ে দিত।[৩৬] রেডিক্যাল কালভিনিস্ট পিউরিটানদেরও–চার্চ অভ ইংল্যান্ডের 'সম্পত্তি' বলে তাদের ধরণার সবকিছুর বিরোধিতা করে যাদের শুরু হয়েছিল–একই ধরনের চরম, কোলাহলময় আধ্যাত্মিকতা ছিল। তাদের 'নতুন জন্মে'র খিচুনী প্রায়শঃই আচ্ছন্ন ধরনের ছিল, আনন্দের সাথে ঈশ্বরের বাহুতে ডুব দিয়ে সফল হওয়ার আগে অনেকেই অপরাধবোধ, ভীতি ও অবশ করা সন্দেহের যন্ত্রণা বোধ করেছে। ধর্মান্তরকরণ বিপুল শক্তিতে আদি আধুনিককালে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম করে তুলেছিল তাদের। তারা ভালো পুঁজিবাদী ও প্রায়শঃই ভালো বিজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু অনেক সময় মহত্ত্বের প্রভাব ফুরিয়ে যেত, পিউরিটানরা তখন এক ধরনের পুনঃপতনে আক্রান্ত হত, অবিরাম বিষণ্নতার চক্রে পড়ে যেত তারা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনকি তারা আত্মহত্যাও করেছে।[৩৭]

এইদিক থেকে রক্ষণশীল ধর্ম উন্মাদনাগ্রস্ত ছিল না। মানুষকে আস্থার সাথে সম্পর্কিত করে তোলার জন্যেই এর আচারানুষ্ঠান ও কাল্টের পরিকল্পনা করা হত।

বাকানালিয় কাল্ট ও উন্মত্ত পরমানন্দের ঘটনা নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে বটে, কিন্তু তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে বরং অল্প কিছু লোক প্রভাবিত হয়েছে। অতীন্দ্রিয়বাদ ব্যাপক জনসাধারণের জন্যে ছিল না। সর্বোচ্চ অবস্থায় এটা এক থেকে অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি: এখানে শিক্ষাব্রতীতে সযত্নে তত্ত্বাবধান করা হয় যাতে সে কোনও মানসিক অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় না পড়ে। অবচেতনে অবতরণের ব্যাপারটি এক ধরনের নৈপূণ্য; ব্যাপক দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও শৃঙ্খলা দাবি করে। দক্ষ নির্দেশক পাওয়া না গেলে ফল নিন্দনীয় হয়ে উঠতে পারে। প্রায়শঃই পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক নির্দেশনার অভাবে কারণে ঘটে যাওয়া মধ্যযুগীয় ক্রিশ্চান সাধুদের উন্মত্ত ও পাগলামিসুলভ আচরণ মনের বিকল্প অবস্থার চর্চার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাহীনতার বিপদই তুলে ধরেছে। এই ধরনের অপচয় রোধ করার জন্যেই তেরেসা অভ আভিলা ও জন অভ দ্য ক্রসের সংস্কার পরিকল্পিত ছিল। অতীন্দ্রিয় যাত্রা গণহারে হাতে নেওয়া হলে শাব্বেতিয়দের নিশ্চিহ্নবাদ বা কিছু সংখ্যক পিউরিটানের মানসিক ভারসাম্যহীনতার মতো সমবেত হিস্টিরিয়ায় পর্যবসিত হতে পারে।

আবেগীয় বাড়াবাড়ি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। প্রথম মহাজাগরণে এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্পষ্ট ছিল। ১৭৩৪ সালে কানেক্টিকাটের নর্থদাম্পটনে বিস্ফোরিত হয়েছিল এই আন্দোলন; বিজ্ঞ কালভিনিস্ট যাজক জোনাথান এডওয়ার্ডস (১৭০৩-৫৮) এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মহাজাগরণের আগে, ব্যাখ্যা করেছেন এডওয়ার্ডস, নর্দাম্পটনের লোকেরা তেমন ধার্মিক ছিল না, কিন্তু ১৭৩৪ সালে সহসা দুই তরুণ মারা যায়। এর ধাক্কা, (এডওয়ার্ডসের নিজস্ব আবেগ প্রবণ প্রচারণার সমর্থনে) গোটা শহর উন্মত্ত ধার্মিকতায় পতিত হয়, মহামারীর মতো ম্যাসাচুসেটস ও লঙ আইল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে তা। লোকজন কাজ ফেলে সারাদিন বাইবেল পড়ে সময় কাটাতে শুরু করে। ছয় মাসের মধ্যেই শহরের তিনশো লোক বেদনাদায়ক 'পুনর্জন্মে'র দীক্ষা লাভ করে। পরম আনন্দ ও ভীষণ বিষণ্নতার মাঝে ওঠানামা করছিল তারা; অনেক সময় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ত আর 'তারা ঈশ্বরের ক্ষমা লাভের অযোগ্য ভাবতে তৈরি হয়ে যাওয়ার মতো অপরাধবোধের অনুভূতিতে ডুবে যেত।' অন্যান্য সময়ে তারা 'হাসিতে ফেটে পড়ত, একই সময়ে আবার স্রোতের মতো চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত, মাঝেমাঝে প্রচণ্ড বিলাপে ফেটে পড়ত।'[৩৮] এই পুনর্জাগরণ মিলিয়ে যেতে শুরু করেছিল, এমন সময় এক ইংরেজ মেথডিস্ট যাজক জর্জ হুইটফিল্ড (১৭১৪-৭০) বিভিন্ন উপনিবেশে সফর করে দ্বিতীয় দফা জোয়ার সৃষ্টি করেন। তাঁর সারমনের সময় লোকে অচেতন হয়ে যেত, কাঁদত, চিৎকার ছাড়ত; যারা রক্ষা পেয়েছে মনে করত তাদের চিৎকারে কেঁপে উঠত চার্চের অন্দর মহল আর

নিজেদের নিশ্চিত সাজাপ্রাপ্ত ধরে নেওয়া দুর্ভাগাদের গোঙানি শোনা যেত। কেবল সাধারণ ও অশিক্ষিতরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। হার্ভার্ড ও ইয়েলে আনন্দমুখর সংবর্ধনা লাভ করেন হুইটফিল্ড। ১৭৪০ সালে একটি গণমিছিলের মাধ্যমে তাঁর সফরের সমাপ্তি টানেন তিনি, সেখানে বস্টন কমনের ৩০,০০০ লোকের সামনে সারমন দিয়েছিলেন।

এডওয়ার্ডস তাঁর বিবরণে এই ধরনের আবেগপ্রবণতার বিপদ তুলে ধরেছেন। নর্দাম্পটনে পুনর্জাগরণে ভাটা পড়লে একজন এতটাই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল যে পরমানন্দমূলক আনন্দের হারিয়ে যাওয়ার মানে হতে পারে কেবল তার অবশ্যাম্ভবী নরক বাস, এটা নিশ্চিত হয়ে আত্মহত্যা করে বসে সে। অপরাপর শহরেও 'অসংখ্য মানুষ...জোরালভাবে এটা বুঝিয়েছে বলে মনে হয়েছে, ওদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে, যেন কেউ একজন তাদের উদ্দেশে বলছে, "তোমার গলা কেটে ফেল, এটাই সেরা সুযোগ। এখন!" দুজন লোক 'অদ্ভুত উৎসাহভরা বিভ্রমে'[৩৯] পাগল হয়ে গেছে। এডওয়ার্ডস জোরের সাথে বলেছেন যে অধিকাংশ লোক জাগরণের আগে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও চুপচাপ ছিল, কিন্তু তাঁর অ্যাপোলোজিয়া ধর্মকে কেবল হৃদয়ের একটা ব্যাপার কল্পনা করা কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে সেটাই দেখিয়ে দেয়। ধর্মকে একবার অযৌক্তিক ধরে নিয়ে সেরা রক্ষণশীল আধ্যাত্মিকতার অন্তস্থঃ বাধাসমূহকে বাতিল করে দেওয়া হলে লোকে সব ধরনের বিভ্রমে পতিত হতে পারে। কাল্টের বিভিন্ন আচার আচরণ এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে লোকে কোনও আঘাতের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে স্বাস্থ্যবান হয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে আসতে পারে। লুরিয় কাব্বালাহয় এই বিষয়টি খুবই স্পষ্ট, এখানে অতীন্দ্রিয়বাদীকে বিষাদ ও পরিত্যাগ দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু আনন্দের সাথে অভিযাত্রা শেষ করানো হয়। একইভাবে হুসেইনের সম্মানে আয়োজিত প্রচলিত শিয়া মিছিল মানুষকে তাদের হতাশা ও ক্রোধ প্রকাশ করার একটা পথ তৈরি করে দেয়, তবে একটা আচরিক রূপে: অনুষ্ঠান শেষে তারা উন্মত্তের মতো ছোটাছুটি শুরু করে না, ধনী ও ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয় না। কিন্তু নর্দাম্পটনে লোকজনকে অগ্রসর হওয়ার পথে সাহায্য করতে কোনও পরিকল্পিত কাল্ট ছিল না। সবকিছু ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও বিশৃঙ্খল। লোকজনকে তাদের সম্পূর্ণ আবেগের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে এবং এমনকি তাতে জড়িত হতেও দেওয়া হয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের পক্ষে তা মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছে।

তাসত্ত্বেও এডওয়ার্ডস নিশ্চিত ছিলেন যে, জাগরণ ঈশ্বরেরই কাজ ছিল। আমেরিকায় এক নতুন ভোরের সূচনা দেখিয়েছে তা, বিশ্বের বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়বে এটা। প্রত্যেক পুনর্জাগরণের মাধ্যমে, এডওয়ার্ডস নিশ্চিত ছিলেন, ক্রিশ্চানবা

পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, সমাজে সত্য ও স্বয়ং ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতিফলন ঘটাবে। জাগরণে রাজনৈতিকভাবে রেডিক্যাল কিছু ছিল না। এডওয়ার্ডস ও হুইটফিল্ড শ্রোতাদের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে প্রচারণা বা সম্পদের সুষম বণ্টনের দাবি তোলার তাগিদ দিতে যাননি; তবে এই অভিজ্ঞতা আমেরিকান বিপ্লবের পথ তৈরিতে সাহায্য করেছে।[৪০] পরমানন্দময় অভিজ্ঞতা বিপ্লবী নেতাদের ডেইস্ট আলোকন আদর্শের সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করতে পারবে না এমন বহু আমেরিকানকে এক ধরনের স্বাধীনতার আনন্দময় স্মৃতির অনুভূতি যুগিয়েছে। 'মুক্তি' শব্দটি দীক্ষা ও স্বাভাবিক জীবনের ব্যথা ও বেদনা থেকে মুক্তির আনন্দ বোঝাতে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছে। হুইটফিল্ড ও এডওয়ার্ডস, উভয়ই যাঁর যাঁর সমাবেশকে যারা পুনর্জন্ম লাভ করেনি এবং উন্মত্ততাকে যুক্তিবাদী নিরাসক্ততার সাথে দেখেছে সেই অভিজাত গোষ্ঠীর চেয়ে তাদের পরমানন্দময় বিশ্বাসকে উঁচু মানের ভাবতে উৎসাহিত করেছেন। পুনর্জাগরণের নিন্দাকারী যাজকদের ঔদ্ধত্যের কথা যাদের মনে ছিল তাদের অনেকেই বহু আমেরিকান কালভিনিস্টের ক্রিশ্চান অভিজ্ঞতায় পরিণত হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের প্রতি দারুণ অবিশ্বাস গড়ে তুলেছিল। জাগরণ আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম গণআন্দোলন ছিল। সাধারণ লোকজনকে দুনিয়াবিদারী ঘটনাপ্রবাহে অংশ গ্রহণের হঠকারী অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিয়েছিল যা ইতিহাসের ধারা পাল্টে দেবে বলে বিশ্বাস করেছিল তারা।[৪১]

কিন্তু জাগরণ উপনিবিশের কালভিনিস্ট গোষ্ঠীগুলোকেও সরাসরি দ্বিধা বিভক্ত করে দিয়েছিল। বস্টন যাজক জনাথান মেহিউ (১৭২০-৬০) ও চার্লস চন্সি (১৭০৫-৮৭)-এর মতো ওল্ড লাইটস নামে পরিচিত হয়ে ওঠা ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করতেন ক্রিশ্চান ধর্মকে যৌক্তিক, আলোকিত ধর্মবিশ্বাস হতে হবে, পুনর্জাগরণবাদীদের উন্মত্ততায় ভীত হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিরোধী পক্ষপাতিত্বের প্রতি সন্দিহান ছিলেন।[৪২] 'ওল্ড লাইটস'দের সমাজের অধিকতর সমৃদ্ধ অংশ থেকে আসার প্রবণতা ছিল, অন্যদিকে নিচু শ্রেণীর লোকজন দলত্যাগী নিউ লাইট চার্চের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ১৭৪০-এর দশকে দুই শোরও বেশি সমাবেশ বর্তমান গোষ্ঠী ত্যাগ করে নিজস্ব চার্চ প্রতিষ্ঠা করেছিল।[৪৩] ১৭৪১ সালে প্রেসবিটারিয়ান নিউ লাইট প্রেসবিটারিয়ান সিনদ থেকে বের হয়ে গিয়ে যাজকদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রিন্সটনের নিউ জার্সিতে নাসান হলে নিজস্ব কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরে ভাঙন জোড়া লাগলেও মধ্যবর্তী সময়ে নিউ লাইটস একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় লাভ করে নিয়েছিল যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মৌলবাদী আন্দোলনের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

AMARBOI.COM

মহাজাগরণ সবাইকে টলিয়ে দিয়েছিল। এর পর থেকে এমনকি ওল্ড লাইটসও চলমান ঘটনাপ্রবাহে প্রলয়বাদী তাৎপর্য আরোপ করতে তৈরি ছিল। ১৭৫৫ সালের নভেম্বরে যুগপৎভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটলে জোনাথান মেহিউ বিশ্বাস করেছিলেন যে, 'মহান বিপ্লব আসন্ন,'; 'বিশ্বের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থায় লক্ষযোগ্য পরিবর্তনের'[৪৪] অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই মেহিউ সাত বছর মেয়াদী যুদ্ধের সময় প্রটেস্ট্যান্ট ব্রিটেন ও ক্যাথলিক ফ্রান্সের আমেরিকায় উপনিবেশের অধিকার নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সংঘাতকে পারলৌকিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন, এর ফলে অ্যান্টিক্রাইস্ট শেষ যুগের মহাভণ্ড পোপের ক্ষমতা হ্রাসের ভেতর দিয়ে ক্রাইস্টের দ্বিতীয় আগমন ত্বরান্বিত হবে।[৪৫] সাত বছর মেয়াদী যুদ্ধে নিউ লাইটস অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মহাজাগতিক লড়াইয়ে আমেরিকাকে সামনের কাতারে লড়াই করতে দেখেছে। মোটামুটি এই সময়ে পোপ দিবস (নভেম্বর ৫) ছুটির দিনে পরিণত হয়, তখন উচ্ছৃঙ্খল জনতা পান্টিফের অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল।[৪৬] ভীতিকর ও সহিংস সময় ছিল এটা। আমেরিকানরা তখনও জীবনকে অর্থ যোগাতে ও তাদের উপর নেমে আসা ট্র্যাজিডির ব্যাখ্যা করতে প্রাচীন মিথলজির শরণাপন্ন হচ্ছিল। তবে যেন আসন্ন পরিবর্তনেরও আলামত টের পাচ্ছিল তারা। সেকারণে ফ্রান্স ও রোমান ক্যাথলিক চার্চকে ন্যায়নিষ্ঠ আমেরিকান রীতিনীতির প্রতি শয়তানি ও ভীষণভাবে বৈরী বিবেচনা করে ঘৃণার ধর্ম গড়ে তুলেছিল।[৪৭] এইসব প্রলয়বাদী ফ্যান্টাসির বিকাশ ঘটানোর সময় তারা যেন বুঝতে শুরু করেছিল যে, যতক্ষণ না সম্পত্তির বিনাশ সাধন করা হচ্ছে ততক্ষণ আসলে কোনও নিস্কৃতি, চূড়ান্ত নাজাত বা স্বাধীনতা ও মিলেনিয়াল শান্তি আসছে না। নতুন এই বিশ্বকে অস্তিত্ব দিতে হলে রক্তাক্ত শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন হবে। আমরা দেখব যে, উদীয়মান আধুনিকতার প্রতি সাড়া হিসাবে প্রায়শঃই ক্রোধের ধর্মতত্ত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আমেরিকানরা বুঝতে পেরেছিল, পরিবর্তন অত্যাসন্ন, কিন্তু তখনও প্রাচীন বিশ্বে বাস করছিল তারা। সাত বছর মেয়াদী যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব ব্রিটিশ সরকারকে আমেরিকান উপনিবেশগুলোর উপর নতুন করভার চাপাতে বাধ্য করে। বিপ্লবাত্মক সঙ্কট উস্কে দেয় তা যা ১৭৭৫ সালে আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। প্রলম্বিত এই যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা আধুনিক রীতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় উপাদান অতীতের সাথে চরম বিচ্ছেদের সেই বেদনাদায়ক প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটিয়েছিল, তাদের ঘৃণার ধর্ম এই বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ—যেমন, জর্জ ওয়াশিংটন, জন ও স্যামুয়েল অ্যাডামস, টমাস জেফারসন এবং বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন—বিপ্লবকে সেক্যুলার ঘটনা হিসাবে প্রত্যক্ষ

AMARBOI.COM

করেছেন। তাঁরা ছিলেন যুক্তিবাদী, আলোকনের পুরুষ, জন লক, স্কটিশ কমনসেন্স দর্শন বা রেডিক্যাল উইং আদর্শের মতো আধুনিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। ডেইস্ট হওয়ায় প্রত্যাদেশ ও ক্রাইস্টের ঐশ্বরিকতার ব্যাপারে অধিকতর অর্থডক্স ক্রিশ্চানদের চেয়ে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আলাদা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংযমী, বিচক্ষণ লড়াই পরিচালনা করছিলেন তাঁরা, ধীরে অনীহার সাথে বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নিজেদের অবশ্যই অ্যান্টিক্রাইস্টের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে মহাজাগতিক সংঘাতে লিপ্ত ভাবেননি। ব্রিটেনের সাথে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে উঠলে, তাঁদের লক্ষ্য বাস্তব ভিত্তিক ও আঞ্চলিক উদ্দেশ্যে সীমিত ছিল: 'সম্মিলিত উপনিবেশগুলো অধিকার বলে মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্র হবে।' জন অ্যাডামস ও ফ্রাংকলিনের সাথে জেফারসন কর্তৃক খসড়া করা স্বাধীনতার ঘোষণা ৪ঠা জুলাই ১৭৭৬ তারিখে কলোনিয়াল কংগ্রেসে গৃহীত হয়, এটা ছিল বক প্রচারিত স্ব-প্রকাশিত মানব অধিকারের আদর্শভিত্তিক একটি আলোকন দলিল। এইসব অধিকারকে 'জীবন, মুক্তি ও সুখের সন্ধান' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই ঘোষণা প্রকৃতির ডেইস্ট ঈশ্বরের নামে স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ও সাম্যের আধুনিক আদর্শের প্রতি আবেদন রেখেছে। অবশ্য রাজনৈতিকভাবে রেডিক্যাল ছিল না এই ঘোষণা। এখানে সমাজের সম্পদের পুনর্বণ্টনের বা মিলেনিয়াল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনও ইউটোপিয় কথাবার্তার স্থান ছিল না। এটা ছিল সুদূর প্রসারী স্থিতিশীল কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা বাস্তব, যৌক্তিক *লোগোস*।

কিন্তু আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের ফাউন্ডিং ফাদারগণ ছিলেন অভিজাত গোষ্ঠীর অংশ, তাঁদের ধারণা মামুলি ধরনের ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকানরা কালভিনিস্ট ছিল, তারা এই যৌক্তিক রীতির সাথে তাল মিলিয়ে উঠতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষেই, তাদের অনেকেই ডেইজমকে শয়তানি আদর্শ মনে করেছে।[৪৮] প্রাথমিকভাবে অধিকাংশ উপনিবেশবাসী ঠিক তাদের নেতাদের মতোই ব্রিটেনের সাথে সম্পর্কচ্যুতিতে অনীহ ছিল। সবাই বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দেয়নি। প্রায় ৩০,০০০ এর মতো ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধের পর ৮০,০০০ থেকে ১০০,০০০-এর মতো নতুন রাষ্ট্র ছেড়ে কানাডা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা ব্রিটেনে চলে গেছে।[৪৯] স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যারা, তারা একদিকে যেমন প্রাচীন মিথ ও ক্রিশ্চান ধর্মের মিলেনিয়াল স্বপ্নে প্রণোদিত হয়েছিল তেমনি ফাউন্ডারদের সেক্যুলারিস্ট আদর্শেও অনুপ্রাণিত ছিল। আসলে ধর্মকে রাজনৈতিক ডিসকোর্স থেকে আলাদা করা ছিল কঠিন। সেক্যুলারিস্ট ও ধর্মীয় আদর্শ সৃজনশীলভাবে মিশে গিয়ে আমেরিকার জন্যে নানামুখী আশার ধারক উপনিবেশবাসীদের ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদী মহাশক্তি বিরোধী শক্তিতে যোগ দিতে

AMARBOI.COM

সক্ষম করে তুলেছে। আমরা ইরানের ইসলামি বিপ্লবে (১৯৭৮-৭৯) একই ধরনের ধর্মীয় ও সেক্যুলারিস্ট মৈত্রী গড়ে উঠতে দেখব, এটাও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল।

বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম দশকে সাধারণ লোক অতীতের সাথে রেডিক্যাল বিচ্ছেদ ঘটানো ঘৃণা করছিল। ব্রিটেনের সাথে সম্পর্কচ্যুতি অচিন্তনীয় মনে হয়েছে। অনেকেই আশা করেছিল যে ব্রিটিশ সরকার তাদের নীতির পরিবর্তন ঘটাবে। কেউই উত্তেজনার সাথে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ছিল না বা এক নতুন বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন দেখছিল না। বেশির ভাগ আমেরিকান তখনও সহজাতভাবে প্রাচীন প্রাক আধুনিক কায়দায় সংকটের প্রতি সাড়া দিচ্ছিল: নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে এক আদর্শ অতীতের শরণাপন্ন হচ্ছিল তারা। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ও যাঁরা আরও সেক্যুলার রেডিক্যাল হুইগ আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ১০৬৬ সালে আগ্রাসী নরমানদের বিরুদ্ধে স্যাক্সনদের সংগ্রাম বা ইংরেজদের গৃহযুদ্ধকালীন পিউরিটান পার্লামেন্টারিয়ানদের সাম্প্রতিক সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন। কালভিনিস্টরা নিউ ইংল্যান্ডে পুরোনো ইংল্যান্ডে স্বৈরাচারী অ্যাংলিকান প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পিউরিটান সংগ্রামের কথা স্মরণ করে তাদের সোনালি অতীতের শরণাপন্ন হয়েছে; আমেরিকার বুনো এলাকায় একটি ধর্মনিষ্ঠ সমাজ গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে নতুন বিশ্বে নির্যাতন থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার সন্ধান করেছিল তারা। এই সময়ের (১৭৬৩-৭৩) সারমন ও বিপ্লবী বক্তৃতা-বিবৃতি অতীতের নাজুক সাফল্যকে ধরে রাখার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। রেডিক্যাল পরিবর্তনের চিন্তা অবনতি ও ধ্বংসের ভীতি জাগিয়ে তুলেছে। পুরোনো রক্ষণশীল চেতনা অনুযায়ী উপনিবেশবাসীরা ঐতিহ্য রক্ষা করতে চেয়েছিল। অতীতকে খুবই সহজ সরল হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, ভবিষ্যৎকে উৎসগতভাবে ভীতিকর। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছিলেন যে, ট্র্যাডিশন থেকে প্রবলভাবে বিচ্ছিন্ন হলে অনিবার্যভাবে আবির্ভূত বিপর্যয়কে ঠেকানোর জন্যেই তাঁদের কর্মপরিকল্পনার নকশা করা হয়েছে। বাইবেলের প্রলয়বাদী ভাষা ব্যবহার করে ভীতির সাথে ব্রিটিশ নীতিমালার সম্ভাব্য পরিণতির কথা বলেছেন তাঁরা।[৫০]

তবে এর পরিবর্তন ঘটেছিল। ব্রিটিশরা নাছোড়বান্দার মতো সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালা আঁকড়ে থাকলে উনিবেশবাসীরা তাদের নৌকা পুড়িয়ে দিয়েছিল। বস্টন টি পার্টি (১৭৭৩) ও লুক্সেমবার্গ এবং কনকর্ডের যুদ্ধের (১৭৭১) পর আর পেছনে যাবার উপায় ছিল না। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রাচীন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক চ্যুতি ঘটিয়ে এক নজীরবিহীন ভবিষ্যতের পথে যাত্রা শুরুর সাহসী প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেছে। এই দিক থেকে ঘোষণাটি ছিল আধুনিকায়নের দলিল, রাজনৈতিক

পরিভাষায় ইউরোপে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা ও প্রতিমাবিরোধিতাকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ উপনিবেশবাসী জন লকের চেয়ে বরং ক্রিশ্চান ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন মিথে বেশি অনুপ্রাণিত ছিল। পরিচিত, তাদের গভীরতর বিশ্বাসের সাথে অনুরণিত এবং এই কঠিন যাত্রাকে সফল করে তোলা মনস্তাত্ত্বিক শক্তি খুঁজে পেতে সক্ষম করে তোলা পৌরাণিক মোড়কে আধুনিক রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দিকে চালিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তাদের। আমরা যেমন প্রায়শঃই আবিষ্কার করব, ধর্ম প্রায়শঃই আধুনিকতার বেদনাদায়ক অভিযাত্রায় প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগান দেয়।

এভাবে মুলধারার চার্চের বহু যাজক (এমনকি অ্যাংলিকানরাও) স্যাম অ্যাডামসের মতো জনপ্রিয় নেতাদের বিপ্লবী বাগাড়ম্বরকে ক্রিশ্চান রূপ দিয়েছেন। তাঁরা সরকারে সদগুণ ও দায়িত্বের গুরুত্বের কথা বলার সময় ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অ্যাডামসের জ্বালাময়ী প্রত্যাখ্যান অর্থপূর্ণ হয়ে উঠত।[৫১] মহাজাগরণের আগেই নিউ লাইটস কালভিনিস্টদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সতর্ক এবং পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতায় আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। বিপ্লবী নেতারা 'স্বাধীনতা'র কথা বলার সময় এমন পরিভাষা ব্যবহার করতেন যেটা আগেই ধর্মীয় অর্থে সম্পৃক্ত ছিল: এটা মহত্ত্ব, সম্পলের স্বাধীনতা ও ঈশ্বর পুত্রের সমাবেশ ধারণ করত। এটা ঈশ্বরের রাজ্যের মতো, যেখানে সকল নিপীড়নের অবসান ঘটবে, এবং মনোনীত জাতির শিশু, যারা বিশ্বের পবির্তনের বেলায় ঈশ্বরের অস্ত্রে পরিণত হবে, এমনি সব ধারণার সাথে সম্পর্কিত ছিল।[৫২] ইয়েল ইউনির্ভার্সিটির প্রেসিডেন্ট টিমোথি ডিউইট (১৭৫২-১৮১৭) সোৎসাহে 'ইম্যানুয়েল ল্যান্ডে'র আগমন ঘোষণাকারী বিপ্লব ও আমেরিকার 'সেই নতুন, সেই বিচিত্র রাজ্যের প্রধান ঘাঁটি হওয়ার' কথা বলতেন যা 'পরম ঈশ্বরের সাধুদের প্রদান করা হবে।'[৫৩] ১৭৭৫ সালে কানেক্টিকাটের যাজক ইবেনেযার বল্ডউইন জোর দিয়ে বলেছিলেন, যুদ্ধের বিপর্যয়ই কেবল ঈশ্বরের নতুন বিশ্বের পরিকল্পনাকে তরান্বিত করতে পারে। জেসাস আমেরিকায় মহান রাজ্যের গোড়াপত্তন করবেন: স্বাধীনতা, ধর্ম ও শিক্ষাকে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে সেসব পশ্চিমে যাত্রা করেছে। বর্তমান সঙ্কট বর্তমান দুনীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার শেষ দিনের জন্যে পথ তৈরি করে দিচ্ছে। ফিলাদেলফিয়ার প্রোভোস্ট উইলিয়াম স্মিথের চোখে উপনিবেশবাসীরা ছিল 'মুক্তি, শিল্পকলা ও স্বর্গীয় জ্ঞানের'[৫৪] ঈশ্বর মনোনীত স্থান।

কিন্তু চার্চের লোকেরা রাজনীতিকে সেক্যুলারাইজ করে থাকলেও সেক্যুলার নেতৃবৃন্দ ক্রিশ্চান ইউটোপিয়বাদের ভাষা ব্যবহার করেছেন। জন অ্যাডামস

AMARBOI.COM

আমেরিকার বসতিকে গোটা মানবজাতির আলোকনের জন্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা মনে করেছেন।[৫৫] টমাস পেইন নিশ্চিত ছিলেন যে, 'পৃথিবীর নতুন করে শুরু করার মতো ক্ষমতা আমাদের আছে। সেই নোয়াহর আমল থেকে এই পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি আর সৃষ্টি হয়নি। নতুন বিশ্বের জন্মলগ্ন এলো বলে।'[৫৬] কেবল নেতৃবৃন্দের প্রয়োগবাদ সাধারণ লোকজনকে অজানা ভবিষ্যতের পথে যাত্রা ও মাতৃভূমির সাথে সম্পর্কচ্ছেদে সাহায্য করতে পারেনি। ক্রিশ্চান পরকালতত্ত্বের উৎসাহ, ইমেজারি ও মিথলজি বিপ্লবী সংগ্রামে অর্থ যুগিয়েছে ও সেক্যুলারিস্ট ও কালভিনিস্টদের ট্র্যাডিশনের সাথে চূড়ান্ত স্থানচ্যুতকারী বিচ্ছেদ ঘটাতে সমানভাবে সাহায্য করেছে।

সাত বছর মেয়াদী যুদ্ধের সময় বিস্ফোরিত ঘৃণাও একই কাজ করেছে। মোটামুটি একই ভাষায় ইরানিরা ইসলামি বিপ্লবের সময় আমেরিকাকে যেভাবে 'মহাশয়তান' আখ্যায়িত করেছে বিপ্লবী সংকটকালে ঠিক সেভাবেই ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শয়তানের সাথে হাত মেলানোর অভিযোগ তোলা হয়েছিল। কুখ্যাত স্ট্যাম্প অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানে এর প্রবক্তা লর্ডস বুট, গ্রেনভিল ও নর্থকে আমেরিকানদের শয়তানের চিরন্তন রাজ্যে প্রলুব্ধ করার ষড়যন্ত্রকারী শয়তানের চ্যালা হিসাবে তুলে ধরেছিল। স্ট্যাম্পকে 'পশুর চিহ্ন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বুক অভ রেভেলেশন অনুযায়ী যা শেষ দিবসে সাজাপ্রাপ্তদের উপর খোদাই করা হবে। রাজনৈতিক মিছিলে শয়তানের ছবির পাশে ব্রিটিশ মন্ত্রীদের কুশপুত্তলিকা বহন করা হয় আর গোটা উপনিবেশ জুড়ে 'স্বাধীনতা বৃক্ষে' ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।[৫৭] ১৭৭৪ সালে রাজা তৃতীয় জর্জ সাত বছর মেয়াদী যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের অধিকৃত কানাডিয় এলাকার ফরাসি ক্যাথলিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করলে তাঁকে অ্যান্টিক্রাইস্টের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এবার তাঁর ছবিও পাপাল অ্যান্টিক্রাইস্ট ও শয়তানের সাথে স্বাধীনতা বৃক্ষে শোভা পেতে থাকে।[৫৮] এমনকি অধিকতর শিক্ষিত উপনিবেশবাসীরা এই গোপন মহাজাগতিক ষড়যন্ত্রের ভীতিতে আক্রান্ত হয়েছিল। হার্ভার্ড ও ইয়েলের প্রেসিডেন্টদ্বয় বিশ্বাস করতেন যে, উপনিবেশগুলো শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে; 'স্বেচ্ছাচারী শক্তির পছন্দনীয় ধর্ম' পাপাসির আসন্ন পরাজয়ের অপেক্ষা করেছেন তাঁরা। পাপাল অ্যান্টিক্রাইস্টকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ঈশ্বরের বিধানকৃত পরিকল্পনার অংশে পরিণত হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ, নিশ্চিতভাবেই যা আমেরিকায় ঈশ্বরের মিলেনিয়াল রাজ্যের আবির্ভাব ঘোষণা করবে।[৫৯] ব্যাপক বিস্তৃত এই ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধারণ রাজনৈতিক বিরোধকে শুভ ও অশুভ শক্তির মহাজাগতিক সংঘাত হিসাবে দেখার প্রবণতা দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ নুতন বিশ্বে পা রাখতে গিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার সময় প্রায়শঃই ঘটে। এই শয়তানি মিথলজি উপনিবেশবাসীদের প্রাচীন বিশ্ব

AMARBOI.COM

থেকে নিশ্চিতভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিতে সাহায্য করেছে, যার প্রতি তখনও তাদের একটা জোরাল দুর্বলতার অবশেষ রয়ে গিয়েছিল। ইংল্যান্ডকে দানবায়িতকরণ, একে প্রতিপক্ষমূলক 'অপর', আমেরিকার বিপরীত মেরুতে পরিণত করে উপনিবেশবাসীদের নিজেদের জন্যে একটা স্পষ্ট পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম করে তুলেছে এবং যে নতুন ব্যবস্থাকে বাস্তব রূপ দিতে তারা যুদ্ধ করছিল তাকে ভাষা দিতে সাহায্য করেছে।

এভাবে ধর্ম প্রথম আধুনিক সেক্যুলার প্রজাতন্ত্রের পত্তনে মুল ভূমিকা পালন করেছে। বিপ্লবের পর অবশ্য, সদ্য স্বাধীন রাজ্যসমূহ তাদের সংবিধান প্রণয়ন করার সময় ঈশ্বরের নাম সেখানে নেহাতই দায়সারাভাবে উল্লেখ করা হয়। ১৭৮৬ সালে টমাস জেফারসন ভার্জিনিয়ার অ্যাংলিকান চার্চ ভেঙে দেন; তাঁর বিলে ঘোষণা করা হয় যে, ধর্মের ব্যাপারে নিপীড়ন 'পাপপূর্ণ ও স্বেচ্ছাচারমূলক,' জনগণকে তাদের নিজস্ব মতামত ধারণ করতে দিলে সত্য বিজয়ী হবে এবং ধর্ম ও রাজনীতির ভেতর একটা 'বিচ্ছিন্নতার দেয়াল থাকবে'।[৬০] এই বিলে ভার্জিনিয়ার ব্যাপ্টিস্ট, মেথডিস্ট ও প্রেসবিটারিয়ান চার্চ সমর্থন দেয়, রাষ্ট্রে চার্চ অভ ইংল্যান্ডের সুবিধাজনক অবস্থানে অসন্তুষ্ট ছিল এরা। পরে অন্যান্য রাজ্য ভার্জিনিয়াকে অনুসরণ করে তাদের নিজস্ব চার্চগুলো ভেঙে দেয়, ১৮৩৩ সালে ম্যাসাচুসেটস সবার শেষে এ কাজটি করে। ১৭৮৭ সালে ফিলাদেলফিয়া সম্মেলনে ফেডারেল সংবিধান গৃহীত হলে সেখানে ঈশ্বরের কোনও উল্লেখই ছিল না; সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বিল অভ রাইটস (১৭৮৯) আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে: 'কংগ্রেস ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কোনও আইন প্রণয়ন করবে না বা এর স্বাধীন চর্চায় বাধাও দেবে না।' এর পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মবিশ্বাস একটি ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ে পরিণত হবে। বিপ্লবী পদক্ষেপ ছিল এটা, যুক্তির কালের অন্যতম সাফল্য হিসাবে তা প্রশংসিত হয়েছে। এর পেছনের ভাবনাচিন্তা অবশ্যই আলোকনের সহিষ্ণু দর্শনে অনুপ্রাণিত ছিল, কিন্তু ফাউন্ডিং ফাদারগণ আবার অধিকতর বাস্তব বিবেচনায়ও আলোড়িত হয়েছেন। তাঁরা জানতেন, রাজ্যসমূহের ঐক্য ধরে রাখতে ফেডারেল সংবিধান খুবই জরুরি, তবে তাঁরা এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সরকার কোনও একটি বিশেষ প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলে সংবিধান অনুমোদন পাবে না। উদাহরণ স্বরূপ, কংগ্রেশনাল ম্যাসাচুসেটস কোনওদিনই অ্যাংলিকান চার্চ প্রতিষ্ঠাকারী সংবিধানে সম্মতি দেবে না। এটাও সংবিধানের ধারা-৬; উপধারা-৩-এর মাধ্যমে ফেডারেল সরকারের অফিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরীক্ষা বাতিল করার কারণ। ধর্মকে আসনচ্যুত ও রাজনীতিকে সেকুলার করার ব্যাপারে ফাউন্ডার

ফাদারদের সিদ্ধান্তে আদর্শ *ছিল*, কিন্তু নতুন জাতি কোনও একটি উপদলীয় গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে পরিচয় নির্ধারণ করে বাকি সব প্রজার আনুগত্য ধরে রাখতে পারত না। আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন একে সহিষ্ণু এবং সেই সুবাদে সেক্যুলার হওয়ার দাবি করেছে।[৬১]

অবশ্য বৈপরীত্যমূলকভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নতুন সেক্যুলারিস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবলভাবে ক্রিশ্চান রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৭৮০-র দশক এবং ১৭৯০-র দশকে আরও বেশি করে সমস্ত চার্চ নতুন সমৃদ্ধির[৬২] অভিজ্ঞতা লাভ করে ও ফাউন্ডিং ফাদারদের আলোকন আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে। এবার আমেরিকান স্বাধীনতাকে পবিত্র করণ করে তারা: নতুন প্রজাতন্ত্রকে ঈশ্বরের সাফল্য বলে যুক্তি দেখায় তারা। বিপ্লবী লড়াই স্বর্গের বিরুদ্ধে নরকের আদর্শ ছিল[৬৩] কেবল প্রাচীন ইসরায়েলই ইতিহাসে এমন প্রত্যক্ষ স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। সংবিধানে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ না হয়ে থাকতে পারে, তীর্যক ভাষায় উল্লেখ করেছেন টিমোথি ডিউইট, কিন্তু ছাত্রদের তাগিদ দিয়েছেন, 'তোমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে তাকাও [তাহলেই]...মিশরে ইসরায়েল জাতিকে দেখানো স্বর্গীয় প্রতিরক্ষা ও নিস্তারের তুলনায় কম মহান ও বিস্ময়কর প্রমাণ দেখবে না।'[৬৪] যাজকগোষ্ঠী আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করেছিল, আমেরিকার জনগণ আরও ধার্মিক হয়ে উঠবে; সীমানার বিস্তারকে রাজ্যের আগমনের আভাস হিসাবে দেখেছে তারা।[৬৫] গণতন্ত্র মানুষকে সার্বভৌম করে তুলেছিল, সুতরাং নতুন রাজ্যসমূহকে জনপ্রিয় শাসনের সহজাত বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে তাদের আরও ধার্মিক হয়ে উঠতে হবে। আমেরিকান জনগণকে অবশ্যই রাজনৈতিক নেতাদের অধার্মিক 'ডেইজম' থেকে রক্ষা করতে হবে। চার্চের লোকেরা 'ডেইজম'কে শয়তানি শত্রু হিসাবে দেখেছে, শিশুরাষ্ট্রের সব ধরনের ব্যর্থতার দায় এর উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। ডেইজম, জোরের সাথে বলেছেন তারা, নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের বিকাশ ঘটাবে; জেসাস ক্রাইস্টের বদলে এটা প্রকৃতি ও যুক্তির পুজা করেছে। 'বাভারিয়ান ইল্লিউমিনাতি' নামে এক রহস্যময় গুপ্ত সংগঠন থেকে ষড়যন্ত্রের ভীতির বিভ্রম বিকাশ লাভ করে; এরা নাস্তিক ও ফ্রিম্যাসন ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিশ্চান ধর্মকে বিতাড়িত করার প্রয়াস পাচ্ছিল। ১৮০০ সালে টমাস জেফারসন প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় দ্বিতীয়বারের মতো অ্যান্টিডেইস্ট আন্দোলন হয়, এই আন্দোলন জেফারসন ও ঈশ্বরবিহীন ফরাসী বিপ্লবের নাস্তিক্যবাদী 'জ্যাকোবিনদের' ভেতর একটা সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে।[৬৬]

নতুন রাজ্যসমূহের ঐক্য ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল। আমেরিকানরা–সেক্যুলারিস্ট ও প্রটেস্ট্যান্ট-উভয়ই নতুন জাতির জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আশা লালন করেছিল।

দুটোই সমানভাবে স্থায়ী প্রমাণিত হয়েছিল। আমেরিকানরা তখনও তাদের সংবিধানকে সম্মান ও ফাউন্ডিং ফাদারদের শ্রদ্ধা করছিল, কিন্তু আমেরিকাকে 'ঈশ্বরের নিজ রাষ্ট্র' হিসাবেও দেখেছে তারা; আমরা যেমন দেখব, কোনও কোনও প্রটেস্ট্যান্ট 'সেক্যুলার মানবতাবাদ'কে প্রায় শয়তানি ধরনের অশুভ বিবেচনা করা অব্যাহত রাখবে। বিপ্লবের পর জাতি তিক্তভাবে বিভক্ত ছিল। সংস্কৃতি কী হওয়া উচিত সেই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমেরিকানদের অভ্যন্তরীণ বিবাদে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। কার্যত উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোতে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' সংঘটিত করেছিল তারা। বহু কষ্ট ও সাহসের সাথে আমেরিকানরা অতীতকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে; একটি পরিবর্তনকারী সংবিধান রচনা করেছিল তারা, একটি নতুন জাতির জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু চাপ, টানাপোড়েন ও বৈপরীত্য জড়িত ছিল তাতে। জনগণ তখনও ঠিক করে উঠতে পারছিল না কোনও শর্তে তারা আধুনিক বিশ্বে প্রবেশ করবে, কম সুবিধাপ্রাপ্ত উপনিবেশবাসীদের অনেকেই অভিজাত আলোকন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল। ব্রিটিশদের পরাস্ত করার পর তখনও সাধারণ আমেরিকানদের বিপ্লব কী অর্থ বহন করে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। তাদের কি ফাউন্ডারদের শীতল, মার্জিত যুক্তিবাদ মেনে নিতে হবে নাকি অধিকতর কর্কশ ও বেশি জনপ্রিয় প্রটেস্ট্যান্ট পরিচয় বেছে নেবে?

ফাউন্ডিং ফাদার ও মূলধারার চার্চের যাজকগোষ্ঠী একটি আধুনিক, সেক্যুলার প্রজাতন্ত্র সৃষ্টিতে পরস্পরের সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু উভয়ই তখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে প্রাচীন রক্ষণশীল বিশ্বের মানুষ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, আলোকিত রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে জাতিকে উপর থেকে নেতৃত্ব দান করা তাঁদের দায়িত্ব। নিচ থেকে পরিবর্তন আসার কথা ভাবেননি তাঁরা। তখনও মহান ব্যক্তিদের হাতে ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কথা ভেবেছেন, যাঁরা অতীতের পয়গম্বরদের মতো মানবজাতির পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করেন ও ইতিহাস ঘটতে বাধ্য করেন। তারা তখনও বুঝতে পারেননি যে, একটা সমাজ অনেক সময় নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়ায়ও সামনে অগ্রসর হতে পারে: পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহ সবচেয়ে কার্যকর নেতাদের পরিকল্পনা ও প্রকল্প বিনাশ করে দিতে পারে।[৬৭] ১৭৮০ ও ১৭৯০-র দশকে গণতন্ত্রের প্রকৃতি নিয়ে ঢের আলোচনা হয়েছে। জনগণের কতখানি ক্ষমতা থাকা উচিত? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস উচ্ছৃঙ্খল শাসনের দিকে চালিত করতে পারে ও ধনীদের সম্পদ হ্রাস করতে পারে এমন যেকোনও রাজনীতির ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন।[৬৮] কিন্তু অধিকতর চরমপন্থী

AMARBOI.COM

জেফারসনবাদীরা অভিজাত গোষ্ঠী কীভাবে বহুজনের পক্ষে কথা বলতে পারে সেটা জানতে চেয়েছে। অ্যাডামস সরকারের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে তারা এবং যুক্তি দেখিয়েছে যে, জনগণের কথা অবশ্যই শুনতে হবে। বিপ্লবের সাফল্য বহু আমেরিকানকে এক ধরনের ক্ষমতায়নের বোধ দিয়েছিল; এটা তাদের দেখিয়ে দিয়েছিল যে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ পতনযোগ্য এবং কোনওভাবেই অপরাজেয় নয়। দৈত্যকে আর বোতলে ভরে রাখা সম্ভব ছিল না। জেফারসনপন্থীরা বিশ্বাস করত যে, সাধারণ জনগণেরও *ফিলোসফ*দের প্রচারিত স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করা উচিত। নতুন পত্রপত্রিকায় ডাক্তার, আইনজীবী, যাজককুল ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের পরিহাস করা হত। এইসব তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞ'দের যেন কেউ বিশ্বাস না করে। আইন, ওষুধ বিজ্ঞান ও ধর্মের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের ব্যাপার সকলের নাগালে থাকা হওয়া উচিত।[৬৯]

বিশেষত সীমান্ত এলাকায় এমনি অনুভূতি ছিল জোরাল, যেখানে সাধারণ মানুষ রিপাবলিকান সরকারের হাতে অপদস্থ হয়েছে বলে মনে করেছে। ১৭৯০ দশক নাগাদ মোটামুটি ৪০ শতাংশ আমেরিকান মাত্র তিরিশ বছর আগে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীদের বসতি স্থাপিত হওয়া এলাকায় বাস করত। সীমান্তবাসীরা শাসক অভিজাত গোষ্ঠীর উপর অসন্তুষ্ট বোধ করছিল, ওদের কষ্টের ভাগিদার ছিল না তারা, কিন্তু ব্রিটিশদের মতোই উচ্চহারে ওদের উপর কর আরোপ করেছে এবং পূর্ব উপকূলীয় আয়েস ও পরিমার্জিত সভ্যতা ছেড়ে আসার কোনও ইচ্ছা ছাড়াই সীমান্ত এলাকার জমিজিরাত বিনিয়োগের জন্যে কিনে নিচ্ছিল। তারা এক নতুন ধরনের যাজকের বক্তব্যে কান পাততে ইচ্ছুক হয়ে উঠেছিল যারা দ্বিতীয় মহাজাগরণ নামে পরিচতি পুনর্জাগরণ উস্কে দিতে সাহায্য করেছে। প্রথমটির চেয়ে রাজনৈতিকভাবে ঢের বেশি চরম ধরনের ছিল এটা। এইসব পয়গম্বর কেবল আত্মাকে রক্ষার প্রশ্নে উদ্বিগ্ন ছিলেন না, বরং এমনভাবে সমাজ ও ধর্মকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন যা ফাউন্ডারদের কল্পিত যেকোনও কিছু থেকে ভিন্ন।

নব্য পুনর্জাগরণবাদীরা ইয়েল ও অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করা জনাথান এডওয়ার্ডস ও জর্জ হুইটফিল্ডের মতো পণ্ডিত ছিলেন না। একাডেমিয়াকে ঘৃণা করতেন তাঁরা, জোর দিয়ে বলতেন ধর্মতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের কাছে নতজানু না হয়ে ক্রিশ্চানদের নিজেদের মতো করে বাইবেল ব্যাখ্যা করার অধিকার আছে। এই পয়গম্বরগণ সংস্কৃত মানুষ ছিলেন না; প্রচারণার সময় তাঁরা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতেন, প্রায়শঃই জাগতিক রসিকতা আর খিস্তিখেউরের সাথে অঙ্গভঙ্গি করতেন। তাঁদের বয়ান শোভন ও অলঙ্কারিক নয়, বরং শোরগোলময়, উচ্ছৃঙ্খল ও দারুণভাবে আবেগময় ছিল। তাঁরা এক ধরনের জনপ্রিয়

AMARBOI.COM

কেতায় ক্রিশ্চান ধর্মকে রূপ দিচ্ছিলেন যা কিনা যুক্তির কালের পরিমার্জিত রীতিনীতি থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে। মশাল মিছিল আর জনসভা করেছেন তাঁরা, শহরের বাইরে বিশাল তাঁবু খাঁটিয়েছেন, যাতে পুনর্জাগরণ এক বিশাল ক্যাম্পসাইটের রূপ নিয়েছিল। গস্পেল সঙ্গীতের নতুন ধারা শ্রোতাদের পরমানন্দে পৌঁছে দিত, ফলে তারা কাঁদত, ভীষণভাবে সামনে পেছনে আন্দোলিত হত আর আনন্দে চিৎকার জুড়ে দিত।[৭০] ধর্মকে যৌক্তিক রূপ দেওয়ার বদলে পয়গম্বরগণ স্বপ্ন ও দিব্যদর্শন, নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনার উপর নির্ভর করেছেন—আলোকন যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যেসব বিষয়ের নিন্দা করেছেন। তারপরেও জেফারসনপন্থীদের মতো, রক্ষণশীল কায়দায় অতীতকে প্রজ্ঞার আধার হিসাবে দেখতে অস্বীকার গেছেন তাঁরা। আধুনিক ছিলেন তাঁরা। জনগণের প্রাজ্ঞ ট্র্যাডিশনে আটকে থাকা উচিত হবে না। ঈশ্বরপুত্রের স্বাধীনতা রয়েছে তাদের; কাণ্ডজ্ঞানের ভেতর দিয়ে ঐশীগ্রন্থের সাধারণ অর্থের উপর ভিত্তি করে নিজেরাই সত্য জানতে পারবে।[৭১] অভিজাতগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত যাজকদের বিরুদ্ধে জোট পাকিয়েছেন এই নতুন যাজকগোষ্ঠী। নিউ টেস্টামেন্টের সাম্যবাদী প্রবণতার উপর জোর দিয়েছেন তাঁরা, যেখানে বলা হয়েছে যে ক্রিশ্চান কমনওয়েলথে শেষজন হবে প্রথম ও প্রথমজন শেষ। ঈশ্বর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি পাঠিয়েছেন দরিদ্র ও নিরক্ষরদের কাছে; জেসাস ও তাঁর শিষ্যদের কোনও কলেজের ডিগ্রি ছিল না।

ধর্ম ও রাজনীতি ছিল একই দর্শনের দুটি অংশ। ঝাঁকড়া চুল আর ক্ষ্যাপা চকচকে চোখে লরেনসো দাউকে আধুনিক কালের জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের মতো লাগত। ঝড়কে তিনি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কাজ হিসাবে দেখতেন, অন্তর্দৃষ্টির জন্যে স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের উপর নির্ভর করতেন। আবহাওয়ার কোনও পরিবর্তন আসন্ন প্রলয়ের কোনও রকম 'নিদর্শন' হয়ে থাকতে পারে; ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার ক্ষমতা থাকার দাবি করেছিলেন তিনি। মোট কথা তাঁকে মনে হত আধুনিকতার নতুন বিশ্বের ঠিক বিপরীত। কিন্তু তারপরেও তিনি জেফারসন বা টমাস পেইনের উদ্ধৃতি দিয়েই সারমন শুরু করতেন এবং প্রকৃত আধুনিকতাবাদীর মতো জনগণকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার শেকল ছুঁড়ে ফেলার, পণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব অস্বীকার ও নিজেদের মতো করে ভাবনা চিন্তা করার তাগিদ দিতেন। সংবিধানে যাই বলা হয়ে থাকুক না কেন, নতুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম ও রাজনীতি একই মুদ্রার দুই পিঠ বলে মনে হচ্ছিল, একটার সাথে অন্যটাকে সহজেই মিলিয়ে দেওয়া যেত। এভাবে এলিয়াস স্মিথ প্রথম জেফারসনের প্রেসিডেনশাল প্রচারণার সময় রাজনৈতিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তিনি তখন রেডিক্যাল সাম্যবাদীতে পরিণত হন। কিন্তু এরপরই নতুন ও গণতান্ত্রিক চার্চ প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হন

তিনি। একইভাবে জেমস ও'কেলি বিপ্লবে যুদ্ধ করেছিলেন, ব্রিটিশদের হাতে বন্দিত্ব বরণ করেছেন। আগাগোড়া রাজনৈতিক ছিলেন তিনি, অধিকতর সমান চার্চ চাইতেন ও নিজস্ব 'রিপাবলিকান মেথডিস্ট' চার্চ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মূল ধারা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। বার্টন স্টোন প্রেসবিটারিয়ানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তাঁর বিচ্ছেদকে 'স্বাধীনতার ঘোষণা' আখ্যায়িত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভকারী আলেকজান্দার ক্যাম্পবেল (১৭৮৮-১৮৬৬) আমেরিকায় অভিবাসনের পর তাঁর স্কটিশ প্রেসবিটারিয়ান মতবাদ ত্যাগ করেছিলেন এমন একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যা সাম্যবাদী আদিম চার্চের খুব কাছাকাছি ছিল।[৭২] আরও বেশি রেডিক্যাল ছিলেন জোসেফ স্মিথ (১৮০৫-৪৪)। বাইবেল পাঠ করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তিনি, বরং সম্পূর্ণ নতুন এক ঐশীগ্রন্থ আবিষ্কারের দাবি তুলেছিলেন। *দ্য বুক অভ মরমন* ছিল উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রাঞ্জল সামাজিক প্রতিবাদ; ধনী, শক্তিশালী ও শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রত্যাখ্যান সূচিত করেছিল।[৭৩] স্মিথ ও তাঁর পরিবার প্রায় দুস্থ দশায় বাস করেছিলেন, সাহসী নতুন প্রজাতন্ত্রে তাদের কোনও স্থান নেই বলে ধরে নিয়েছিলেন তাঁরা। প্রথম মরমন দীক্ষিতরাও সমান দরিদ্র, প্রান্তিকায়িত ও বেপরোয়া ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক্সোডাস ও প্রতীকী প্রত্যাখানে প্রস্তুত ছিল তারা। মরমনরা শেষ পর্যন্ত তাদের নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল–প্রথমে ইলিনয়ে এবং শেষে ইউটাহয়।

দাউ, স্টোন ও জোসেফ স্মিথের প্রতি বিতৃষ্ণার সাথে নজর দিয়েছে প্রতিষ্ঠান; তাদের আধুনিক বিশ্বকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই এমন বক্তৃতাজীবী মনে করেছে। যাজকদের বর্গোচিত পশ্চাদপসরণকারী, আদিম হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর রেলিক্স মনে হয়েছে। মূলধারার যাজক ও আমেরিকান অভিজাত গোষ্ঠীর পরবর্তীকালের এই পয়গম্বরদের প্রতি সাড়ার দেওয়ার সাথে আজকের দিনে উদারপন্থী ও সেক্যুলারিস্টরা যেভাবে সাড়া দিয়ে থাকে তার সাথে খুব একটা অমিল নেই। কিন্তু তাঁদের নাকচ করে দিয়ে ভুল করেছিলেন তারা। দাউ, জোসেফ বা স্মিথের মতো ব্যক্তিদের গ্রাম্য-মেধাবী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৭৪] তাঁরা গণতন্ত্র, সাম্য, বাকস্বাধীনতা ও স্বাধীনতার মতো আধুনিক অধর্মসমূহকে এমন এক বাগধারায় সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিলেন যাতে তারা বুঝে সেটাকে আপন করে নিতে পারে। আমেরিকায় জন্ম নিতে চলা নতুন বিশ্বে আবশ্যক হয়ে উঠতে যাওয়া এইসব নতুন আদর্শ এক পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে কম সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল যা সেগুলোকে অর্থ যুগিয়েছে এবং উত্তাল ও বিপ্লবী উত্থানপতনের এই সময়ে প্রয়োজনীয় ধারাবাহিকতা যুগিয়েছে। নতুন পয়গম্বরগণ স্বীকৃতি দাবি করেছেন, তাঁরা প্রতিষ্ঠিত অভিজাত

AMARBOI.COM

গোষ্ঠীর পরিহাসের শিকার হলেও সাধারণ জনগণের কাছে তাঁদের সমাদর দেখিয়েছে যে প্রকৃত প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁরা। প্রথম মহাজাগরণের যাজকদের মতো ব্যক্তিগত ধর্মান্তরে সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁরা, বরং সমাজের পরিবর্তন চেয়েছেন। জনগণকে দেশব্যাপী গণআন্দোলনে সমবেত করার ক্ষমতা রাখতেন তাঁরা, জনপ্রিয় সঙ্গীত ও প্রভাবকে নিপুণ করে তুলতে নতুন যোগাযোগ মাধ্যম কাজে লাগাতেন। ফাউন্ডিং ফাদারদের মতো উপর থেকে আধুনিক রীতিনীতি চাপিয়ে দেওয়ার বদলে তাঁরা জমিন থেকে উপর দিকে গড়ে তুলেছেন ও অনেকটা যুক্তিবাদী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তৃণমূল পর্যায়ে বিদ্রোহ সংগঠিত করেছেন। দারুণভাবে সফল ছিলেন তাঁরা। উদাহরণ স্বরূপ, এলিয়াস স্মিথ, ও'কেলি, ক্যাম্পবেল ও স্টোন প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীগুলো ক্রাইস্টের 'ডিসাইপল'দের সমবেত করতে সম্মিলিত হয়েছিল। ১৮৬০ সাল নাগাদ ডিসাইপলদের মোট সদসসংখ্যা ২০০,০০০-এর দাঁড়ায় এবং তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চম বৃহত্তম প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল।[৭৫] মরমনদের মতো ডিসাইপলরা এমন একটা জনপ্রিয় অসন্তোষকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পেরেছিল প্রতিষ্ঠান যাকে উপেক্ষা করতে পারেনি।

কিন্তু আলোকনের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে রেডিক্যাল ক্রিশ্চান বিদ্রোহের আরও বেশি গভীর প্রভাব ছিল। দ্বিতীয় মহাজাগরণ বহু আমেরিকানকে ফাউন্ডিং ফাদারদের ক্লাসিকাল প্রজাতন্ত্র থেকে আরও বেশি অশ্লীল গণতন্ত্র ও রূঢ় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের দিকে টেনে নিয়ে গেছে যা আজকের আমেরিকান সংস্কৃতিকে বৈশিষ্ট্যায়িত করে। শাসক অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করেছে তারা। আমেরিকান চেতনায় এক ধরনের টানাপোড়েন ছিল যা যুক্তির কালের শীতল রীতিনীতির চেয়ে বরং উনবিংশ শতকের লোকানুবর্তী ও প্রতি-বুদ্ধিজীবীবাদের কাছাকছি। দ্বিতীয় মহাজাগরণের শোরগোলময়, দর্শনীয় পুনর্জাগরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক রাজনৈতিক স্টাইলের উপর স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে, যাদের গণমিছিল, অনিরুদ্ধ অনুভূতি ও লোকদেখানো ক্যারিশমা ইউরোপিয়দের কাছে দারুণ বিস্ময়কর ছিল। আজকের বহু মৌলবাদী আন্দোলনের মতো দ্বিতীয় মহাজাগণের এই পয়গম্বরগণ নতুন রাষ্ট্রে নিজেদের যারা অধিকার বঞ্চিত ও শোষিত মনে করেছে অধিকতর সুবিধাপ্রাপ্ত অভিজাত গোষ্ঠীর কানে তাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছাতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আন্দোলন জনগণকে মার্টিন লুথারের ভাষায় 'কেউ একজন হওয়ার অনুভূতি'[৭৬] দিয়েছিল, অনেকটা আজকের দিনে মৌলবাদী গ্রুপগুলো যেমন করে থাকে। মৌলবাদী আন্দোলনের মতো এই নতুন গোষ্ঠীগুলোর প্রত্যেকে আদিম ব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়েছে, ধর্মবিশ্বাসকে নতুন

করে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল তারা; সবাই ঐশীগ্রন্থের দিকে সম্পূর্ণ নতুন চোখে নির্ভর করেছে, একে তারা আক্ষরিক ও প্রায়শঃই লঘু করে ব্যাখ্যা করেছে। স্বৈরাচারী প্রবণতাও দেখিয়েছে তারা। উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকায় এটা ছিল একটা বৈপরীত্য, উনবিংশ শতকের শেষের দিকে মৌলবাদী আন্দোলনসমূহের মতো স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ও সমতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা বিপুল সংখ্যক লোককে আভাসে ধর্মীয় বক্তৃতাবাজদের মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত এতসব কথাবার্তায় জোসেফ স্মিথ কার্যত এক ধর্মীয় স্বৈরাচার সৃষ্টি করেছিলেন এবং আদি চার্চের সাম্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক আদর্শের প্রতি তারিফ সত্ত্বেও আলেকজান্দার ক্যাম্পবেল পশ্চিম ভার্জিনিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন, দলের লোকদের লৌহমানবের মতো শাসন করেছেন তিনি।

দ্বিতীয় মহাজাগরণ মানুষ তাদের সমাজকে আধুনিকায়নের কষ্টকর উত্থানপতনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় কী ধরনের সমাধান সাধারণ জনগণ আকর্ষণীয় বোধ করে সেটাই তুলে ধরে। আধুনিক মৌলবাদীদের মতো দ্বিতীয় মহাজাগরণের পয়গম্বরগণ শাসক গোষ্ঠীর বিজ্ঞ যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিলেন এবং অধিকতর ধর্মীয় পরিচয়ের উপর জোর দিয়েছেন। একই সময়ে তাঁরা দেকার্তে, নিউটন বা জন লকের রচনা পড়ার সুযোগ পায়নি এমন মানুষের কাছে আধুনিকায়নের রীতিনীতি বোধগম্য করে তুলেছেন। এই আমেরিকান পয়গম্বরদের ভবিষদ্বাণীসুলভ বিদ্রোহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধারে স্থায়ী ও সফল হয়েছিল, এর মানে, বর্তমানে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার অধীন সমাজগুলোয় আধুনিক মৌলবাদী আন্দোলনসমূহ স্বল্পস্থায়ী বা বিদায়ী 'পাগলামি' বলে আশা করা উচিত হবে না আমাদের। নতুন আমেরিকান গোষ্ঠীগুলোকে প্রতিষ্ঠানের চোখে অদ্ভুত ঠেকে থাকতে পারে, কিন্তু এগুলো আবিশ্যিকভাবে আধুনিক ও নতুন বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এটা নিশ্চিতভাবেই নিউ ইয়র্ক কৃষক উইলহেম মিলারের প্রতিষ্ঠিত মিলেনিয়াল আন্দোলানের বেলায় সত্যি; তিনি বাইবেলিয় ভবিষ্যদ্বাণী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঠ করে সতর্ক হিসাবের পর ১৮৩১ সলে প্রকাশিত একটি প্যামফ্লেটে 'প্রমাণ' করেছিলেন যে ক্রাইস্টের দ্বিতীয় আগমন ঘটবে ১৮৪৩ সালে। মিলার বাইবেলকে চিরন্তন বাস্তবতার পৌরাণিক, প্রতীকী বিবরণ হিসাবে না দেখে আবিশ্যিকভাবেই আধুনিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। মিলার ধরে নিয়েছিলেন, বুক অভ রেভেলেশনের এই ধরনের বিবরণ আসন্ন ঘটনাবলীর নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী, যা বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক নির্ভুলতার সাথে হিসাব কষে বের করা সম্ভব। লোকে এখন তথ্যের জন্যে টেক্সট পাঠ করছিল। সত্যকে অবশ্যই যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক প্রকাশের উপযুক্ত হতে হবে। মিলার ঐশীগ্রন্থের *মিথোসকে* এমনভাবে দেখছিলেন যেন তা *লোগোস;* যাকে তিনি

WWW.AMARBOI.COM

ও তাঁর সহকারী জোশুয়া হাইনস মিলারের অনুসন্ধানের পদ্ধতিগত ও বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বলে চাপ দিচ্ছিলেন।[৭৭] আন্দোলন গণতান্ত্রিকও ছিলঃ যেকেউ নিজে বাইবেলের ব্যাখ্যা করতে পারে। মিলার অনুসারীদের তাঁর হিসাব চ্যালেঞ্জ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, নিজস্ব তত্ত্ব খাড়া করতে বলেছেন।[৭৮]

আন্দোলনকে অসম্ভব ও বিচিত্র ঠেকলেও মিলারবাদ আশু আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। প্রায় ৫০,০০০ আমেরিকান নিশ্চিত মিলারবাদীতে পরিণত হয়েছিল, অন্যদিকে আরও হাজার হাজার সেভাবে যোগ না দিলেও সহানুভূতিশীল ছিল।[৭৯] অবশ্য অনিবার্যভাবে বাইবেলের *মিথোস*কে আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করার বিশেষ নজীরে পরিণত হয়েছিল মিলারবাদ। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ১৮৪৩ সালে ক্রাইস্ট ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং মিলারবাদ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তাসত্ত্বেও এই ব্যর্থতার মানে এই ছিল না যে মিলেনিয়ালিজমের অবসান ঘটেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা প্রধান আবেগে পরিণত হয় এবং এখনও অব্যাহত আছে। ১৮৪৩ সালের 'মহা হতাশা' থেকে সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্টের মতো অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো আবির্ভূত হয়। এরা প্রলয়বাদী সময়সূচিকে সমন্বিত করে নিখুঁত পূর্বাভাস এড়িয়ে গিয়ে নতুন আমেরিকার নতুন প্রজন্মগুলোকে ইতিহাসের আসন্ন অবসানের অপেক্ষায় থাকতে সক্ষম করে তুলেছে তারা।

প্রথম প্রথম এই নতুন কর্কশ ও গণতান্ত্রিক ক্রিশ্চানিটি দরিদ্র ও বেশি অশিক্ষিত শ্রেণীর ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ১৮৪০-র দশকে আমেরিকান ধর্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব চার্লস ফিনি (১৭৯২–১৮৭৫) একে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে তুলে আনেন। এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একে গস্পেলের আক্ষরিক পাঠের উপর নির্ভরশীল ও সেক্যুলার ধারণাকে ক্রাইস্টের উপর বর্তানোর ইচ্ছুক এই 'ইভাঞ্জেলিকাল' ক্রিশ্চানিটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ধর্মবিশ্বাসে পরিণত করতে সাহায্য করেন তিনি।[৮০] ফিনি প্রাচীন পয়গম্বরদের অমার্জিত, বর্বর পদ্ধতি কাজে লাগান, কিন্তু আইনবিদ, ডাক্তার, ও বণিকদের প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্ততা ছাড়া ক্রাইস্টকে উপলব্ধি করার তাগিদ দেন, নিজেদের মতো করে ভাবতে ও বিভিন্ন গোত্রের বিজ্ঞ ধর্মবেত্তাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলেন। মধ্যবিত্ত শ্রোতাদের সমাজের সামাজিক সংস্কারে অন্যান্য ইভাঞ্জেলিকালদের সাথেও যোগ দিতে বলেন।[৮১]

বিপ্লবের পর রাষ্ট্র ধর্ম হতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল, একই সময়ে সকল গোষ্ঠীর ক্রিশ্চান রাষ্ট্র থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিতে শুরু করে। মিলেনিয়াম বয়ে আনতে ব্যর্থ বিপ্লব নিয়ে স্বপ্নভঙ্গ ও মোহমুক্তির ব্যাপার ছিল। প্রটেস্ট্যান্টরা ডেইস্ট রিপাবলিকান সরকারের থেকে দূরে থেকে নিজস্ব ধর্মীয় 'স্থান' সংরক্ষণের

AMARBOI.COM

উপর জোর দিতে শুরু করে। ফেডারেল প্রতিষ্ঠানের অংশ নয়, তারা ছিল ঈশ্বরের সম্প্রদায়। প্রটেস্ট্যান্টরা তখনও বিশ্বাস করছিল যে আমেরিকার ধার্মিক জাতি হওয়া উচিত এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে ক্রমবর্ধমানহারে অরাজনৈতিক বিবচনা করা হচ্ছিল;[৮২] সমাজের মুক্তির লক্ষ্যে রাষ্ট্র থেকে স্বাধীনভাবে ১৮২০-র দশকে দ্বিতীয় মহাজারণের পর উত্তরের রাজ্যগুলোয় গড়ে ওঠা বিভিন্ন চার্চ, স্কুল ও সংস্থায় কাজ করাই শ্রেয়তর। ক্রিশ্চানরা একটি ভালো পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে। তারা দাসপ্রথা ও মদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় ও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর উপর নির্যাতন বন্ধের দাবি জানায়। মিলারবাদীদের অনেকেই মিতাচার, দাসপ্রথা উচ্ছেদ ও নারীবাদী সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।[৮৩] এসব কিছুর ভেতর নিশ্চিতভাবেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপাদান ছিল। এছাড়া প্রটেস্ট্যান্টদের মিতব্যায়িতা, সংযম ও পরিষ্কার জীবন যাপনের গুণের উপর গুরুত্ব আরোপের ভেতর অপ্রীতিকরভাবে সংরক্ষণবাদের অনুপ্রেরণাও ছিল। প্রটেস্ট্যান্টরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাথলিকদের বিপুল অভিবাসনে অস্বস্তিতে ভুগছিল। বিপ্লবের সময় আমেরিকা প্রটেস্ট্যান্ট দেশ ছিল। ক্যাথলিকরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশ। কিন্তু ১৮৪০-র দশক নাগাদ আমেরিকায় ক্যাথলিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোমান ক্যাথলিক মতবাদ বৃহত্তম ক্রিশ্চান গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।[৮৪] পোপকে দীর্ঘদিন ধরে অ্যান্টিক্রাইস্ট ভেবে আসা কোনও দেশের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিবর্তন ছিল এটা। ইভাঞ্জেলিকাল প্রয়াসের কিছু কিছু নিশ্চিতভাবেই এই ক্যাথলিক প্রভাবকে ঠেকানোর প্রয়াস ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, মিতাচার নতুন পোলিশ, আইরিশ ও ইতালিয় আমেরিকানদের মদপানের অভ্যাসের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে প্রচারিত হয়েছিল।[৮৫]

তাসত্ত্বেও এইসব ইভাঞ্জেলিকাল সংস্কার আন্দোলনসমূহ ইতিবাচক ও আধুনিকায়নকারীও ছিল। প্রতিটি মানব সন্তানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সক্রিয়ভাবে তারা সাম্যবাদের সমর্থন করে গেছে যাতে, উদাহরণ স্বরূপ, উত্তরের রাজ্যগুলোতে দাসপ্রথা অসহনীয় করে তুলতে সাহায্য করা যায়, কিন্তু দক্ষিণে নয়; দ্বিতীয় মহাজাগরণের বলতে গেলে ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গিয়েছিল তা, গৃহযুদ্ধে অনেক পরেও তা প্রাক আধুনিক আভিজাত্যবাদী সামাজিক কাঠামো ধরে রেখেছিল।[৮৬] সংস্কার আন্দোলনগুলো সাধারণ মানুষকে ক্রিশ্চান প্যাকেজে অন্তত উত্তরে অবিচ্ছেদ্য মানবাধিকারসমূহকে ঠাঁই করে দিতে সাহায্য করেছে। ইভাঞ্জেলিকাল ক্রিশ্চানদের সূচিত নারীবাদ ও শান্তিমূলক এবং শিক্ষার জন্যে আন্দোলনগুলোও প্রগতিশীল ছিল। খোদ সংস্কারবাদী দলগুলোও মানুষকে আধুনিক চেতনা ধারণে সাহায্য করেছে। সদস্যরা কোনও সংগঠনে যোগ দেওয়ার সচেতন,

AMARBOI.COM

স্বেচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং কীভাবে পরিকল্পনা, সংগঠন করতে হয় এবং আধুনিক ও যৌক্তিক উপায়ে একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়িত লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করতে হয় সেটা শিখেছে। শেষ পর্যন্ত ইভাঞ্জেলিকাল ক্রিশ্চানরা হুইগ পার্টির (ব্যাপক দিক থেকে পরবর্তীকালের রিপাবলিকান পার্টি যার উত্তরাধিকারী) মেরুদণ্ড গড়ে তুলবে, অন্যদিকে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী (ওল্ড লাইটস ও ক্যাথলিকরা) ডেমোক্রেটিক পার্টির দিকে ঝুঁকে পড়বে। হুইগ/রিপাবলিকানরা আলোকনের বদলে ধার্মিক গুণাবলীর ভিত্তিতে আমেরিকায় একটি 'ন্যায়নিষ্ঠ সাম্রাজ্য' সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

সুতরাং, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ, ইভাঞ্জেলিকালরা আর প্রান্তিকায়িত ও অধিকারবঞ্চিত ছিল না। সেকুলারিস্ট প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছে তারা। এবার আমেরিকার সমাজের ক্রিশ্চান *রিকনকুইস্তা*'য় নিয়োজিত হয়েছিল তারা, একে কঠোরভাবে প্রটেস্ট্যান্ট রীতিনীতির অধীনে ফিরিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর ছিল। নিজেদের সাফল্যে গর্বিত বোধ করেছে তারা। আমেরিকান সংস্কৃতির উপর অনেপনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্যুলার সংবিধান সত্ত্বেও এখন যা আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে ঢের বেশি ক্রিশ্চান। ১৭৮০ ও ১৮৬০ সালের ভেতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিশ্চান গোষ্ঠীসমূহের লক্ষণীয় বৃদ্ধি ঘটে, জাতীয় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে অনেকাংশে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তা। ১৭৮০ সালে সমাবেশের সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৫০০ টি, ১৮২০ সাল নাগাদ তা ১১,০০০ টিতে দাঁড়ায়; এবং ১৮৬০ সাল নাগাদ উল্লেখযোগ্য ৫২,০০০-এ—প্রায় ২১ গুন বৃদ্ধি পায়। তুলনামূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ১৭৮০ সালের আনুমানিক চার মিলিয়ন থেকে ১৮২০ সালে দশ মিলিয়নে দাঁড়ায় ও ১৮৬০ সালে দাঁড়ায় ৩১ মিলিয়নে—অর্ধেকেরও কম বৃদ্ধি।[৮৭] ইউরোপে ধর্মকে ক্রমবর্ধমানহারে প্রতিষ্ঠানের সাথে এক কাতারে দেখা হচ্ছিল। সাধারণ লোক বিকল্প আদর্শের দিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, কিন্তু আমেরিকায় প্রটেস্ট্যানিজম সাধারণ লোককে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালী করে তুলেছিল; এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে, ফলে এখন আমেরিকায় এমন একটি জনপ্রিয় আন্দোলন খুঁজে বের করা কঠিন যা কোনওভাবে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়। ১৮৫০-র দশক নাগাদ আমেরিকায় ক্রিশ্চান ধর্ম ছিল সজীব, ভবিষ্যতের বিজয়ের জন্যে তৈরি বলে মনে হয়েছে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী ছিল ইউরোপে। সেখানে জনগণকে আধুনিক বিশ্বের দিকে চালিতকারী প্রধান আদর্শগুলো ছিল সেক্যুলারিস্ট, ধর্মীয় নয়। ক্রমবর্ধমানহারে পরকালের চেয়ে ইহকালের দিকে সাধারণ মানুষের মনোযোগ নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। জর্জ উইলিয়াম ফ্রেডেরিখ হেগেলের (১৭৭০—১৮৩১) রচনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট। তিনি

AMARBOI.COM

দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে মাটিতে টেনে নামিয়ে তাঁকে মানুষে পরিণত করেছিলেন। অতিপ্রাকৃতের মাঝে নয়, সম্পূর্ণতার সন্ধান মিলবে এই মাটিতেই; হেগেলের *ফেনোমেনোলজি অভ মাইন্ড*-এ (১৮০৭) বিশ্বজনীন আত্মা কেবল স্থান ও সময়ের সীমিত অবস্থায় নিজেকে স্থাপন করলেই এর পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে; মানব মনেই তা সবেচেয়ে বেশি পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং, মানবজাতিকেও নিজেদের ঐশী বলে উপলব্ধি করার খাতিরে ঈশ্বরের প্রাচীন দুর্জ্ঞেয়র ধারণা বিসর্জন দিতে হবে। এই মিথ, অবতারবাদের নতুন ক্রিশ্চান মতবাদকে বহু আধুনিক মানুষের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে বিচ্ছেদের একটা প্রতিষেধক হিসাবেও দেখা যেতে পারে। এটা ছিল ঐশী সত্তা হতে বঞ্চিত হয়ে পড়া এক বিশ্বকে আবার পবিত্রকরণের প্রয়াস; এবং দেকার্তে ও কান্টের দর্শনে মানুষের মনের যে ক্ষমতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে, তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করাও। কিন্তু সবার উপরে হেগেলের মিথ আধুনিকতার গতিশীল অভিঘাতও প্রকাশ করেছে। সোনালি যুগের কথা ভাববার কোনও ব্যাপার ছিল না এখানে। হেগেলের বিশ্ব অবিরাম নিজেকে পুনঃসৃষ্টি করছিল। প্রাচীন রক্ষণশীল বিশ্বাস অর্থাৎ, আগেই সবকিছু বলা হয়ে যাবার ধারণার বদলে হেগেল এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার কথা কল্পনা করেছেন যেখানে মানুষ অতীতের এককালে পবিত্র ও অপরিবর্তনীয় ধারণা ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সত্তার প্রতিটি অবস্থাই এর বিপরীতটি নিয়ে আসে; বিপরীত এই সত্তাগুলোর সংঘাত বাধে ও আরও উন্নত সংশ্লেষে সেগুলো সমন্বিত হয়। এরপর আবার সেই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলে ফিরে যাবার কোনও উপায় নেই, এটা বরং সম্পূর্ণ নতুন ও নজীরবিহীন সত্যির দিকে অবিরাম বিবর্তন।

হেগেলের দর্শনে রক্ষণশীল চেতনাকে অপরিবর্তনীয়ভাবে পেছনে ফেলে আসা আধুনিককালের চারিত্রিক আশাবাদের প্রকাশ ঘটেছে। তবে অনেকে হেগেল কেন ঈশ্বরের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গেছেন বুঝতে পারেননি। ধর্ম ও মিথলজিকে কোনও কোনও ইউরোপিয়র কাছে কেবল সেকেলেই নয়, বরং ক্ষতিকর মনে হয়েছিল। আমাদের বিচ্ছিন্নতার বোধকে প্রশমিত করার বদলে এগুলোকে তা আরও জটিল করে তোলে বলে মনে করা হয়েছে। ঈশ্বরকে মানবজাতির বিপরীত সত্তা হিসাবে স্থাপন করে হেগেলের শিষ্য লুদভিগ ফয়েরবাখ (১৮০৪–৭২) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, 'ধর্ম মানুষকে তার নিজের থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে...ঈশ্বর সম্পূর্ণ, মানুষ অসম্পূর্ণ, ঈশ্বর চিরন্তন, মানুষ ক্ষণস্থায়ী, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, মানুষ দুর্বল।'[৪৪] কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮–৮৩) চোখে, ধর্ম অসুস্থ সমাজের লক্ষণ, এমন এক মাদক যা রোগাক্রান্ত সামাজিক ব্যবস্থাকে সহনীয় করে তোলে ও এই জগৎ

AMARBOI.COM

থেকে অন্য জগতে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে এর একটি প্রতিষেধক বের করার ইচ্ছা নষ্ট করে ফেলে।[৮৯]

উঁচু নৈতিক ভিত্তি লাভ করছিল নাস্তিকরা। ১৮১৯ সালে চার্লস ডারউইনের লেখা *দ্য অরিজিন অভ স্পিসিজ বাই মিনস অভ নেচারাল সিলেকশন* প্রকাশিত হওয়ার পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায়। গ্রন্থটি আধুনিক বিজ্ঞানের এক নতুন পর্যায় তুলে ধরেছিল। বেকনের পরামর্শ মোতাবেক তথ্য সংগ্রহের বদলে ডারউইন একটি প্রকল্প তুলে ধরেছেন: পশু, গাছপালা ও মানুষ সম্পূর্ণ আকারে সৃষ্টি হয়নি (বাইবেল যেমনটা বুঝিয়েছে), বরং পরিবেশের সাথে অভিযোজনের ভেতর দিয়ে বিবর্তনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় উন্নত হয়ে উঠেছে। *দ্য ডিসেন্ট অভ ম্যান* (১৮৭১)-এ ডারউইন প্রস্তাব রাখেন যে, *হোমো সেপিয়েন্স*রা ওরাংউটান, গরিলা ও শিম্পাঞ্জির আদিপুরুষ একই আদি নরমানব থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মৌলবাদী বলয়ে ডারউইনের নাম নাস্তিক্যবাদের প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে, কিন্তু *অরিজিন*-কে ধর্মের উপর আক্রমণ হিসাবে চিন্তা করা হয়নি, বরং তা ছিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শোভন, সযত্ন ব্যাখ্যা। স্বয়ং ডারউইন অ্যাগনস্টিক ছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সব সময়ই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। তাসত্ত্বেও *অরিজিন* ছিল সন্নিক্ষণ। প্রকাশের দিনই ১৪০০ কপি বিক্রি হয়েছিল। নিশ্চিতভাবে এটা ও ডারউইনের পরবর্তীকালের কাজ মানুষের আত্ম-মর্যাদা বোধের উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। কোপার্নিকাস মানুষকে বিশ্বজগতের কেন্দ্র থেকে উৎখাত করেছিলেন, দেকার্তে ও কান্ট মানুষকে ভৌত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করেন, আর এবার ডারউইন মত প্রকাশ করলেন যে মানুষ স্রেফ আরেকটা পশুমাত্র। ঈশ্বরের হাতে বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়নি তারা, বরং বাকি সমস্ত কিছুর মতো বিবর্তিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যেন ঈশ্বরের কোনও স্থান নেই বলে মনে হয়েছে, 'রক্তাক্ত থাবা ও দাঁতঅলা' পৃথিবীর কোনও ঐশী লক্ষ্য নেই।

কিন্তু তাসত্ত্বেও *অরিজিন* প্রকাশিত হওয়ার পর ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া ছিল চাপা। সাতজন অ্যাংলিকান যাজক সাধারণ পাঠকের জন্যে সর্বশেষ বাইবেলিয় সমালোচনা সহজলভ্য করে তোলা *এসেজ অ্যান্ড রিভিউজ* প্রকাশ করলে পরের বছর বেশি শোরাগোল হয়েছিল।[৯০] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে জার্মান পণ্ডিতগণ বাইবেলের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক বিশ্লেষণ, প্রত্নতত্ত্ব ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নতুন কৌশল প্রয়োগ শুরু করেছিলেন। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতির অধীনে নিয়ে এসেছিলেন একে। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তক, প্রচলিতভাবে যেগুলোর রচয়িতা মোজেস বলে উল্লেখ করা হয়, আসলে অনেক পরে বেশ কয়েক জন ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে রচিত; বুক অভ ইসায়াহর

অন্তত দুটো ভিন্ন ভিন্ন উৎস রয়েছে, রাজা ডেভিড সম্ভবত শ্লোক রচনা করেননি। বাইবেলের বর্ণিত বেশির ভাগ অলৌকিক কাণ্ডই স্রেফ সাহিত্যিক হেঁয়ালি, আক্ষরিকভাবে বোঝার উপায় নেই; বাইবেলিয় বহু ঘটনা প্রায় নিশ্চিতভাবেই ঐতিহাসিক নয়। *এসেজ অ্যান্ড রিভিউজ*-এ ব্রিটিশ যাজকগণ যুক্তি দেখান, বাইবেলের কোনও বিশেষ মর্যাদা পাওয়া উচিত নয়, একে বরং আর পাঁচটা টেক্সটের মতোই সমান সমালোচনার বিষয়ে পরিণত করতে হবে।[৯১] নতুন 'হাইয়ার ক্রিটিসিজম' মিথের বিরুদ্ধে *লোগোসের* যৌক্তিক ডিসকোর্সের বিজয় তুলে ধরেছে। যৌক্তিক বিজ্ঞান বাইবেলের *মিথোই*-কে রেডিক্যাল নিরীক্ষার অধীনে নিয়ে এসে আবিষ্কার করেছে যে, এর কোনও কোনও দাবি 'মিথ্যা'। বাইবেলিয় কাহিনীসমূহ কেবলই 'মিথ', জনপ্রিয় আলোচনায় এখন যার মানে দাঁড়ায়, ওসব সত্যি নয়। হাইয়ার ক্রিটিসিজম ক্রিশ্চান মৌলবাদীদের পক্ষে জুজুতে পরিণত হবে। কারণ একে ধর্মের উপর বড় ধরনের হামলা মনে হয়েছে, তবে এর একমাত্র কারণ পাশ্চাত্যের জনগণ অতীন্দ্রিয়ের মূল বোধ হারিয়ে ফেলেছিল, তারা ধরে নিয়েছিল যে মতবাদ ও ঐশীগ্রন্থের বিবরণসমূহ *লোগোই*, যেসব বিবরণ তথ্যগতভাবে সঠিক হওয়ার কথা ও যেসব ঘটনা বৈজ্ঞানিকভাবে তদন্তযোগ্য। কিন্তু বাইবেল সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে পাঠ করা যে কতখানি কঠিন সেটা প্রকাশ করে হাইয়ার ক্রিটিসিজম আধুনিক ক্রিশ্চানদের ধর্মবিশ্বাসকে 'বৈজ্ঞানিক' করে তোলার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি স্বাস্থ্যকর পাল্টা ভারসাম্যের যোগানও দিতে পারত।

ডারউইনের প্রকল্প ও জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ের বিভিন্ন অমিল তুলে ধরে ডারউইনের আমেরিকান বন্ধু ও সতীর্থ বৈজ্ঞানিক আসা গ্রে (১৮১০–৮৮)-র মতো কিছু ক্রিশ্চান জেনেসিসের আক্ষরিক পাঠের সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন। পরে ক্রিয়েশন সায়েন্স নামে পরিচিত হয়ে ওঠা এই প্রকল্পটি জেনেসিসকে বৈজ্ঞানিকভাবে সম্মানজনক করে তোলার জন্যে আরও অনেক দূর অগ্রসর হবে। কিন্তু এটা ছিল আসল সত্যি বাদ দিয়ে যাওয়া, কারণ মিথ হিসাবে বাইবেলের সৃষ্টিকাহিনী প্রাণের বিকাশের ঐতিহাসিক বিবরণ নয় বরং খোদ জীবনের পরম তাৎপর্যের আধ্যাত্মিক প্রতিফলন ছিল; যার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক *লোগোসের* বলার মতো কিছুই নেই।

ডারউইন না চাইলেও *অরিজিনের* প্রকাশনা সত্যিই ধর্ম ও বিজ্ঞানের ভেতর প্রাথমিক সংঘাতের কারণ হয়েছিল। কিন্তু প্রথম গুলি ছোঁড়া হয়েছিল অধিকতর সেক্যুলারিস্টদের তরফ থেকে। ইংল্যান্ডে টমাস এইচ. হাক্সলি (১৮২৫–৯৫) ও মহাদেশে কার্ল ফোগত (১৮১৭–৯৫), লুদভিগ বাকনার (১৮২৪–৯৯), জ্যাকব মোলেস্ট (১৮২২–৯৩) ও আর্নস্ট হেকেল (১৮৩৪–১৯১৯) বহু সফর করে বিপুল

সংখ্যক দর্শকের সামনে বিজ্ঞান ও ধর্মকে পরস্পর বেমানান প্রমাণ করে ডারউইনের মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন। আসলে তাঁরা ধর্মের বিরুদ্ধে এক ক্রুসেডের প্রচার করছিলেন।[৯২]

হাক্সলি স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, তাঁর সামনে লড়াই অপেক্ষা করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যুক্তিকেই সত্যির একমাত্র মাপকাঠি হতে হবে। মানুষকে মিথলজি ও যৌক্তিক বিজ্ঞানের ভেতর যে কোনও একটাকে বেছে নিতে হবে। এখানে কোনও আপোস হতে পারে না: 'অজ্ঞাত মেয়াদের সংগ্রামের পর একটার অন্যটিকে গ্রাস করে নিতেই হবে।'[৯৩] হাক্সলির কাছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ছিল এক নতুন সেক্যুলার ধর্ম; পরিবর্তন ও সম্পূর্ণ অঙ্গীকার দাবি করেছে তা। 'বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, নিজের যুক্তিকে অনুসরণ করো, তোমাকে তা যতদূরে নিয়ে যাক, আর কোনও বিবেচনাকে মাথায় নিয়ো না,' শ্রোতাদের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। 'আর নেতিবাচকভাবে, বুদ্ধিমত্তার বেলায়, প্রকাশ করা হয়নি বা প্রমাণযোগ্য নয় এমন সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত ধরে নিয়ো না।'[৯৪] লক্ষণীয় সাফল্য লাভ করে নিজেকে আগ্রাসীভাবে সত্যির একক শানাক্তকারী হিসাবে দাবিকারী আধুনিক প্রগতিশীল সংস্কৃতির অভিঘাতের পূর্ণ সমর্থন ছিল হাক্সলির পেছনে। কিন্তু সত্যিকে 'প্রকাশিত ও প্রমাণযোগ্য' সীমিত করে ফেলা হয়েছিল, যা ধর্ম বাদেও শিল্পকলা ও সঙ্গীতের সত্যিকে বিসর্জন দেবে। হাক্সলির চোখে অন্য কোনও সম্ভাব্য পথ থাকতে পারে না। যুক্তিই একমাত্র সত্যি, ধর্মের মিথসমূহ অর্থহীন। এটা ছিল রক্ষণশীল সীমাবদ্ধতা থেকে চূড়ান্ত স্বাধীনতা ঘোষণা। যুক্তিকে আর উচ্চ আদালতে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে না। একে নৈতিকতা দিয়ে সীমাবদ্ধ করে রাখা যাবে না, বরং 'অন্যান্য বিবেচনাকে পরোয়া না করে' শেষ পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। মহাদেশের ক্রুসেডাররা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরও বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। বাকনারের বেস্টসেলার *ফোর্স অ্যান্ড ম্যাটার*—খোদ হাক্সলির অপছন্দ আনাড়ী গ্রন্থ—যুক্তি তুলে ধরে যে, মহাবিশ্বের কোনও উদ্দেশ্য নেই, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই একটি মাত্র কোষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কেবল নির্বোধই ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে পারে। কিন্তু এ বইয়ের বিরাট সংখ্যক পাঠক ও হেকেলের ভাষণ শুনতে সমবেত বিপুল দর্শক দেখিয়েছে যে, ইউরোপে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ বিজ্ঞানের কথা শুনতে চেয়েছে এবং চিরকালের জন্যে ধর্মকে বাতিল করে দিয়েছে।

এর কারণ ধর্মীয় সত্যিকে যৌক্তিক *লোগোই*-এর মতো বিবেচনা করে আধুনিক বিজ্ঞানী, সমালোচক ও দার্শনিকগণ সেগুলোকে অবিশ্বাস্য করে তুলেছিলেন। ১৮৮২ সালে ফ্রেডেরিখ নিৎশে (১৮৪৪—১৯০০) ঈশ্বরের প্রয়াণ ঘটেছে ঘোষণা করবেন। *দ্য গ্রে সায়েন্স*-এ তিনি এক উন্মাদের কাহিনী বলেছেন, একদিন সকালে

AMARBOI.COM

সে বাজার এলাকায় ছুটে এসে চিৎকার করে বলতে থাকে 'আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি!' আমোদিত ও উন্নাসিক পথচারীরা যখন জানতে চাইল, সে কি ভেবেছে ঈশ্বর নির্বাসনে গেছেন বা সটকে পড়েছেন, চোখ পাকিয়ে তাকাল সে। 'ঈশ্বর কোথায় গেছেন?' জানতে চাইল সে। 'আমরা তাঁকে হত্যা করেছি–তোমরা আর আমি! আমরা সবাই তাঁর ঘাতক!'[৯৫] গুরুত্বপূর্ণ এক অর্থে ঠিকই বলেছিলেন নিৎশে। মিথ, কাল্ট, আচার ও প্রার্থনা ছাড়া পবিত্রের অনুভূতি অনিবার্যভাবে মারা যায়। 'ঈশ্বর'কে সম্পূর্ণ মতগত সত্যিতে পরিণত করে কিছু আধুনিক বিশ্বাসীর প্রয়াসের মতো কেবল বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ঐশী সত্তার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আধুনিক নারী-পুরুষ নিজেরাই এঁকে হত্যা করেছে। তাদের ভবিষ্যৎমুখী সংস্কৃতি পবিত্রের প্রতি অগ্রসর হওয়ার প্রচলিত পথকে দার্শনিকভাবে অসম্ভব করে তুলেছে। এর আগে ইহুদি মারানোদের মতো, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে যাদের ধর্মীয় শূন্যতায় ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, অনেক আধুনিক নারী-পুরুষ ধর্মের সত্যিকে ক্ষীণ, খেয়ালি ও দুর্বোধ্য বলে আবিষ্কার করছিল।

নিৎশে'র উন্মাদ বিশ্বাস করত, ঈশ্বরের প্রয়াণ মানবজাতিকে এর শেকড় থেকে উপড়ে দিয়েছে, পৃথিবীকে এর কক্ষপথ থেকে উৎক্ষিপ্ত করে একে মহাশূন্যের পথহীন অঞ্চলে ভাসিয়ে দিয়েছে। যা কিছু মানুষকে একসময় পথের দিশা দিত তার সবই উধাও হয়ে গেছে। 'এখনও কি আকাশ ও জমিন আছে?' জানতে চেয়েছে সে। 'আমরা কি অসীম শূন্যতার ভেতর দিয়ে ভেসে চলার মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়িনি?'[৯৬] এক গভীর ত্রাস, অর্থহীনতার বোধ আধুনিক অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে দাঁড়াবে। নিৎশে এমন এক সময়ে লিখছিলেন যখন আধুনিকতার অতিরিক্ত উল্লাস নামহীন ভীতির সঞ্চার করছিল। এটা কেবল ইউরোপের ক্রিশ্চানদেরই প্রভাবিত করবে না, বরং আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় টেনে আনা ইহুদি ও মুসলিম যারা একে সমানভাবে বিভ্রান্তিকর বলে আবিষ্কার করেছে, তাদেরও প্রভাবিত করবে।

AMARBOI.COM

৪. ইহুদি ও মুসলিম: আধুনিক হলো (১৭০০–১৮৭০)

ইউরোপ ও আমেরিকার ক্রিশ্চানদের পক্ষে আধুনিকায়ন কঠিন হয়ে থাকলে ইহুদি ও মুসলিমদের জন্যে সেটা ছিল আরও সমস্যাসঙ্কুল। মুসলিমরা আধুনিকায়নকে ঔপনিবেশবাদ ও বিদেশী আধিপত্যবাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এক অচেনা আগ্রাসী শক্তি হিসাবে অনুভব করেছে। তাদের এমন এক সভ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছিল যার মূল কথাই হচ্ছে স্বাধীনতা, যেখানে তারা নিজেরা রাজনৈতিক অধীনতা ভোগ করছিল। আধুনিক চেতনা লক্ষণীয়ভাবে ইহুদিবাদের প্রতি বৈরী ছিল। সহিষ্ণুতার অনেক বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও আলোকন চিন্তকরা তখনও ইহুদিদের অসন্তোষের সাথেই দেখছিলেন। ফ্রাঁসোয়া মেরি ভলতেয়ার (১৬৯৪–১৭৭৮) *ডিকশনেয়ারে ফিলোসোফিক*-এ (১৭৫৬) তাদের 'সম্পূর্ণ অজ্ঞ জাতি' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ঘৃণার্হ কার্পণ্য ও তাদের যারা সহ্য করেছে সেইসব জাতির প্রতি তীব্র ঘৃণা তাদের উপাদান। ইউরোপের অন্যতম ঘোষিত নাস্তিক ব্যারন দ'হলবাখ (১৭২৩–৮৯) ইহুদিদের 'মানবজাতির শত্রু'[১] আখ্যায়িত করেন। কান্ট ও হেগেল উভয়ই ইহুদিবাদকে দাসোচিত, ইতর ধর্মবিশ্বাস, সম্পূর্ণ যুক্তির বিরোধী হিসাবে দেখেছেন,[২] অন্যদিকে কার্ল মার্ক্স স্বয়ং ইহুদি বংশোদ্ভুত হলেও ইহুদিরা তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল অশুভের মুল পুঁজিবাদের জন্যে দায়ী বলে যুক্তি দেখিয়েছিলেন।[৩] সুতরাং, ইহুদিদের অবশ্যই ঘৃণার এক আবহে আধুনিকতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল।

আমেরিকায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনসমূহ প্রটেস্ট্যান্টদের দুটো ভিন্ন শিবিরে ভাগ করে দিয়েছিল। একই সময়ে পূর্ব ইউরোপিয় ইহুদি গোষ্ঠীর ভেতরও একই রকম বিরোধ দেখা দিয়েছিল। পোল্যান্ড, গালিশিয়া, বেলোরুসিয়া ও লিথুয়ানিয়ার ইহুদিরা দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত ছিল; দুটোই ইহুদি মৌলবাদের উৎপত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমেরিকান কালভিনিস্টরা যখন প্রথম

AMARBOI.COM

মহাজাগরণের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় আবির্ভূত হাসিদিম নিউ লাইটসের চেয়ে তেমন একটা ব্যতিক্রম ছিল না। ১৭৩৫ সালে ইসরায়েল বেন এলিয়েজার (১৭০০–৬০) নামে এক দরিদ্র সরাইখানা মালিক ঘোষণা করে বসেন, এক প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন তিনি যা তাঁকে 'নামের গুরুতে' *(বা'ল শেম)* পরিণত করেছে, ঈশ্বরের নামে অলৌকিক চিকিৎসা ও ওঝাগিরি করে পোল্যান্ডে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানো ফেইথ হীলারদের একজন। কিন্তু ইসরায়েল অচিরেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে বসেন, কারণ দরিদ্রদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসহ শারীরিক সমস্যার দিকে নজর দিতেন তিনি। ফলে *বা'ল শেমে তোভের* সমার্থক 'বেশট' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি, আক্ষরিকভাবে যার অর্থ 'শুভ নামের গুরু,' ভিন্ন মর্যাদার ওস্তাদ। পোলিশ ইহুদিদের জন্যে এটা ছিল এক কৃষ্ণ কাল। লোকে তখনও শাব্বেতিয় কেলেঙ্কারীর ধাক্কা পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি, ১৬৪৮ সালের হত্যালীলার পর থেকে বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা করে চলা ইহুদি সম্প্রদায়গুলো আধ্যাত্মিক সংকটে ভুগছিল। বেঁচে থাকার সংগ্রামে সম্পদশালী ইহুদিরা ন্যায়সঙ্গতভাবে করের বোঝা বণ্টন করত না, ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সামাজিক বৈষম্য বেড়ে উঠেছিল, অভিজাত দরবারে নিয়মিত যাতায়াতকারী শক্তিমানরা *কেহিলার* নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিচ্ছিল, অন্যদিকে দুর্বলদের পিঠ দেয়ালে ঠেকছিল। আরও খারাপ ব্যাপার হলো, র‍্যাবাইদের অনেকেই এই নিপীড়নে হাত মেলান, তাঁরা দরিদ্রদের দিকে কোনও নজরই দেননি। আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে মামুলি আলাপে বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি নষ্ট করছিলেন। দরিদ্ররা নিজেদের পরিত্যক্ত ভাবতে শুরু করেছিল। দেখা দিয়েছিল আধ্যাত্মিক শূন্যতা, কুসংস্কার সব সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। বেশি দুস্থ ইহুদিদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন জনপ্রিয় যাজকগণ, তাঁদের পক্ষ নিয়ে রাব্বিনিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার দায়ে আক্রমণ শাণিত করেন। প্রায়শঃই এই *হাসিদিমরা* ('ধার্মিক জন') সিনাগগের পরোয়া না করে বিচ্ছিন্ন সেল গঠন করে প্রার্থনা দল তৈরি করত। এই হাসিদিক বলয়েই নিজেকে ১৭৩৫ সালে তুলে ধরেন বেশট, নিজেকে একজন বা'ল শেম ঘোষণা করে তাদের র‍্যাবাইতে পরিণত হন।[৪]

বেশ্‌ট হাসিদিমকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেন। র‍্যাবাইদের কাছে থেকে নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিয়ে সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটানোর প্রয়াস পেয়েছিল তা। ১৭৫০ সাল নাগাদ পোদোলা, ফোলহাইনা, গালিশিয়া ও ইউক্রেনের মতো অধিকাংশ নতুন শহরে হাসিদিমের সেল আবির্ভূত হয়েছিল। সমসাময়িক একটি সূত্র অনুমান করেছে যে, জীবনের শেষ নাগাদ বেশটের মোটামুটি চল্লিশ হাজার অনুসারী ছিল, নিজস্ব ভিন্ন সিনাগগে প্রার্থনা করত এরা।[৫] উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ হাসিদিম

AMARBOI.COM

পোল্যান্ড, ইউক্রেন, ও পূর্ব গালিশিয়ার অধিকাংশ ইহুদি সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। হোয়াইট রাশিয়া, রোমানিয়ার অনেক শহরে এর প্রতিষ্ঠা ঘটে ও লিথুয়ানিয়ায় প্রবেশ শুরু করে।

নিউ লাইট প্রটেস্ট্যানন্ট মতবাদের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল হাসিদিম; নিউ লাইটস যেমন তাদের ভিন্ন চার্চ গঠন করেছিল তেমনি হাসিদিমও নিজস্ব জমায়েত গঠন করে। দুটোই পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের কাছ জনপ্রিয় ছিল। রেডিক্যাল প্রটেস্ট্যান্টরা যেমন অভিজাতদের তাদের শিক্ষা ও ধর্মতাত্ত্বিক দক্ষতার উপর নির্ভর করার জন্যে তীব্র নিন্দাবাদ জানিয়েছিল, ঠিক তেমনি হাসিদিম র‍্যাবাইদের শুষ্ক তোরাহ পণ্ডিতি নিয়ে পরিহাস করেছে। বেশ্‌ট ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রার্থনাকে অবশ্যই তোরাহ পাঠের আগে স্থান দিতে হবে, বিপ্লবী পদক্ষেপ ছিল এটা। শত শত বছর ধরে ইহুদিরা তোরাহ শিক্ষার উপর ভিত্তি করে র‍্যাবাইদের কর্তৃত্ব মেনে এসেছে, কিন্তু র‍্যাবাইরা সম্প্রদায়ের জরুরি সামাজিক সমস্যাদি থেকে চোখ ফিরিয়ে পবিত্র টেক্সটে পিছু হটায় হাসিদিম গতানুগতিকে পরিণত হতে চলা এই পণ্ডিতি প্রত্যাখান করেছে, যদিও নিজেদের মতো করে পবিত্র টেক্সট পাঠ করত তারা।

অবশ্য নিউ লাইটস প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ ছিল আধুনিকায়নের আধ্যাত্মিকতা, অন্যদিকে হাসিদিম প্রকৃতিগতভাবে রক্ষণশীল সংস্কার আন্দোলন ছিল। এর আধ্যাত্মিকতা ছিল পৌরাণিক, আদিম বিপর্যয়ের সময় বস্তু জগতে আটকা পড়ে যাওয়া স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গের লুরিয় প্রতীকের উপর ভিত্তি করে প্রণীত, কিন্তু বেশ্‌ট এই ট্র্যাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপীতার ইতিবাচক উপলব্ধিতে পরিণত করেছেন। সব কিছুতেই স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গের ছিটেফোঁটা পাওয়া যেতে পারে। এমন কোনও জায়গা পাওয়া যাবে না যেখানে ঈশ্বর উপস্থিত নন: সবচেয়ে সফল হাসিদিম মনোসংযোগ ও সর্বক্ষণ ঈশ্বরের সাথে সংশ্লিষ্ট *(দেভেকুত)* থেকে এই গুপ্ত স্বর্গীয় উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। কোনও কাজই, তা সে যত পার্থিব বা ইন্দ্রিয়জ হোক না কেন, কোনওভাবেই অশ্লীল নয়। ঈশ্বর সব সময়ই উপস্থিত, হাসিদিম যখন খাচ্ছে, পান করছে, ভালোবাসছে বা ব্যবসা পরিচালনা করেছ, সব সময়ই তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। হাসদিমকে অবশ্যই তাদের এই ঐশী উপস্থিতির সচেতনতা দেখাতে হবে। একেবারে গোড়া থেকেই হাসিদিক প্রার্থনা শোরগোলময় ও পরমানন্দমূলক ছিল; হাসিদিম সমগ্র সত্তাকে প্রার্থনায় নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রণীত তাদের প্রার্থনাকে অদ্ভুত, সহিংস অঙ্গভঙ্গি দিয়ে গড়ে তুলেছিল। তারা হাততালি দিত, সামনে পেছনে মাথা দোলাত, হাত দিয়ে দেয়ালের আঘাত করত, আর গোটা শরীর এপাশ-ওপাশ দোল খাওয়াত। বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের

চেয়ে গভীর স্তরে হাসিদকে শিখতে হত যে তার সমগ্র সত্তাকে অবশ্যই আশপাশের পরিবেশের স্বর্গীয় শক্তির কাছে সুনম্য হতে হবে, ঠিক যেমন মোমবাতির শিখা বাতাসের প্রতিটি ওঠা-নামার সাথে সাড়া দেয়। কোনও কোনও হাসিদিম এমনকি ঈশ্বরের কাছে সামগ্রিক আত্মসমর্পণের কারণে সম্পূর্ণ অহমের পাল্টে যাওয়া বোঝাতে সিনাগগে ডিগবাজিও খেত।[৬]

অবশ্য হাসিদিমের উদ্ভাবনসমূহ অতীতে প্রোথিত ছিল, এসবকে প্রাচীন সত্যির পুনরুদ্ধার হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। বেশ্‌ট দাবি করেছেন, পয়গম্বর এলিযাহর গুরু আহিজাহ অভ শিলোহই তাঁকে ঐশী রহস্য সম্পর্কে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং এলিযাহর আত্মাকে ধারণ করছেন।[৭] বেশট ও তাঁর অনুসারীরা প্রাচীন পৌরাণিক পদ্ধতিতে ঐশীগ্রন্থ পাঠ করছিলেন। বাইবেলকে সমালোচনার দৃষ্টিতে বা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠ করার বদলে হাসিদিম তোরাহ পাঠকে আধ্যাত্মিক অনুশীলনে পরিণত করেছিল। 'তোমাদের সেরা উপায়ের তোরাহ পাঠ শিক্ষা দেব আমি,' শিষ্যদের বলতেন বেশ্‌ট; 'মোটেই নিজেকে অনুভব [সচেতন হয়ে ওঠা] করার জন্যে নয়, বরং এক মনোযোগী শ্রোতার মতো যার কান উচ্চারিত সব কথাই শুনতে পায়, কিন্তু নিজে কোনও কথা বলে না।'[৮] হাসিদকে টেক্সটের প্রতি হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিতে হত, নিজেকে অহম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিতে হত। সত্তার এই অতিক্রম ছিল এক ধরনের পরমানন্দ যার জন্যে প্রয়োজন ছিল হাসিদের মানসিক শক্তির সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ যা আমেরিকার পুনর্জাগরণবাদীদের আরও উন্মত্ত পরিবর্তনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আক্ষরিক পাঠের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না বেশট, তিনি পৃষ্ঠার শব্দের অতীত স্বর্গের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন, ঠিক যেভাবে তাঁর হাসিদিমদের বাহ্যিক বিশ্বের উপরিতলের উপর দিয়ে তাকিয়ে অভ্যন্তরে বিরাজিত সত্তা সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠার শিক্ষা দিয়েছিলেন। একটা গল্প চালু রয়েছে যে হাসিদিক আন্দোলনের পরে একদিন বেশট-এর উত্তরসুরি হয়ে ওঠা বিজ্ঞ কাব্বালিস্ট দোভ বার (১৭১০–৭২) তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। দেবদূতদের প্রসঙ্গে একটি লুরিয় অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করছিলেন দুই জন, বেশ্‌ট লক্ষ করলেন দোভ বারের আক্ষরিক ব্যাখ্যা সঠিক হলেও তা যথেষ্ট নয়। তিনি তাঁকে দেবতাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে উঠে দাঁড়াতে বললেন। দোভ বার সোজা হয়ে দাঁড়ানোমাত্র 'গোটা বাড়ি আলোয় ভরে উঠল, চারপাশে জ্বলে উঠল আগুন, এবং তাঁরা [দুজনই] উল্লেখ করা দেবদূতদের উপস্থিতি টের পেলেন।' 'তুমি যেভাবে বলেছ সেটাই সহজ পাঠ,' দোভ বারকে বললেন বেশট, 'কিন্তু তোমার পাঠের ধরনে আত্মার ঘাটতি ছিল।'[৯] প্রবণতা ও প্রার্থনার কাল্টিক অঙ্গভঙ্গি ছাড়া সম্পূর্ণ

যৌক্তিক পাঠ কোনও হাসিদকে টেক্সটের নির্দেশিত অদৃশ্য বাস্তবতার দিকে চালিত করবে না।

অনেক দিক থেকেই হাসিদিম বেশটের জীবনের শেষ দিকে পূর্ব ইউরোপে মাত্র আবির্ভূত হতে শুরু করা ইউরোপিয় আলোকনের বিপরীত মেরুর ছিল। *ফিলোসফস* ও বিজ্ঞানীরা যেখানে বিশ্বাস করতেন যে, কেবল যুক্তিই সত্যির দিকে চালিত করতে পারে, বেশট সেখানে অতীন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠানকে যৌক্তিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উন্নত করেছেন। হাসিদিম আধুনিকতার বিচ্ছিন্নতাকে অস্বীকার করেছে–রাজনীতি থেকে ধর্ম, পবিত্র থেকে অপবিত্র–এবং এমন এক হলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যেখানে সর্বত্র পবিত্রতাকে দেখতে পেয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান যেখানে বিশ্বকে নিরানন্দে পরিণত করেছে, বিশ্বজগৎকে ঐশীসত্তা বিহীন আবিষ্কার করেছে, হাসিদিম সেখানে এক পবিত্র সর্বব্যাপীতা অনুভব করেছে। সাধারণ জনগণের আন্দোলন হলেও হাসিদিমে গণতান্ত্রিক কোনও ব্যাপার ছিল না। বেশট বিশ্বাস করতেন, সাধারণ হাসিদ সরাসরি ঈশ্বরের সাক্ষাতে পৌছাতে পারবে না। কেবল একজন যাদ্দিক ('ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ')-এর ভেতরেই সে ঐশী সত্তাকে খুঁজে পেতে পারে, যিনি সাধারণ মানুষের নাগালের অতীত ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় সচেতনতা *দেভেকুতে* দক্ষতা অর্জন করেছেন। সুতরাং, হাসিদ তার যাদ্দিকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল, এটা এমন এক প্রবণতা যাকে কান্ট হয়তো অর্থহীন দাসত্ব বলে নিন্দা জানাতেন। সুতরাং, হাসিদিম গভীরভাবে আলোকন বৈরী ছিল, পূর্ব ইউরোপে এর অনুপ্রবেশ ঘটা শুরু করলে বহু হাসিদিমই প্রত্যাখ্যান করবে।

বেশট বেঁচে থাকতে র‍্যাবিনিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে ততটা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেনি, কিন্তু নতুন নেতা দোভ বার ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন খন্দের। তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। লিথুয়ানিয়ায় পৌছানোর পর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব একাডেমি অভ ভিলনার প্রধান *(গাওন)* এলিয়াহ্ বেন সলোমন যালমানের (১৭২০–৯৭) নজর কাড়ে তা। গাওন এই আন্দোলনে, বিশেষ করে এর তোরাহ পাঠের অবমূল্যায়নে রীতিমতো ভীত বোধ করেন, এটাই ছিল তাঁর মূল আবেগ। অবশ্য তাঁর পাণ্ডিত্য দুর্নীতিবাজ পোলিশ র‍্যাবাইদের দায়সারা পাঠের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন মাত্রার ছিল। গভীর অতীন্দ্রিয় ছাপ ছিল তাতে। তাঁর ছেলেরা আমাদের বলছেন যে, সারা রাত জেগে তোরাহ্ পাঠ করার জন্যে বরফ শীতল পানিতে পা ডুবিয়ে রাখতেন তিনি। গাওনের চোখে তোরাহ পাঠ ছিল হাসিদিমদের চেয়েও অনেক বেশি আগ্রাসী অনুশীলন। তিনি তাঁর ভাষায় পাঠের 'প্রয়াস'-কে উপভোগ করতেন, মনে হত প্রবল মানসিক তৎপরতা তাঁকে সচেতনতার এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। নিজেকে যখন ঘুমানোর সুযোগ দিতেন, তোরাহ তাঁর স্বপ্নে

AMARBOI.COM

হানা দিত, স্বর্গে অতীন্দ্রিয় আরোহণের অভিজ্ঞতা লাভ করতেন তিনি। সুতরাং, তোরাহ পাঠ ছিল ঈশ্বরের সাথে এক ধরনের সাক্ষাৎ। তাঁর অনুসারী র‍্যাবাই হাঈম ফোলঝাইনার (১৭৪৯–১৮২১), পরে যার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে, যেমন ব্যাখ্যা করেছেন: 'তোরাহ্ পাঠকারী ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়, কারণ ঈশ্বর ও তোরাহ এক ও অভিন্ন।'[11] তবে আধুনিক গবেষণার জন্যে সময় বের করে নিয়েছিলেন গাওন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, অ্যানাটমি, গণিত ও বিদেশী ভাষায় নিপুণ ছিলেন তিনি। হাসিদিমকে ধর্মদ্রোহী ও অস্পষ্টতাবাদী হিসাবে আবিষ্কার করেছিলেন। বিরোধ তিক্ত হয়ে উঠেছিল। গাওন সমর্থকরা–হাসিদিমরা যাদের বলত মিসনাগদিম ('বিরোধী')-অনেক সময় তাদের কোনও সদস্য হাসিদিমে পরিণত হলে শোক পালনের অনুষ্ঠান করত, যেন সে মারা গেছে; অন্যদিকে হাসিদিমরা মিসনাগদিমদের প্রকৃত ইহুদি মনে করত না। শেষ পর্যন্ত ১৭৭২ সালে গাওন ভিলনা ও ব্রদির হাসিদিমকে সমাজচ্যুত করেন; বহিষ্কারের এই আঘাত দোভ বারের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল বলে কথিত আছে।

গাওনের জীবনের শেষে দিকে ইউক্রেন ও বেলোরুসিয়ার হাসিদিক নেতা র‍্যাবাই শ্লেয়ুর যালমান (১৭৪৫–১৮১৩) সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু গাওন তাঁর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে যালমানের গ্রন্থ *তানিয়ার* (১৭৯১) প্রকাশনা বহিষ্কারের এক নতুন আইনের সূচনা করেছিল। ব্যাপারটা ছিল করুণ। মিসনাগদিমের আধ্যাত্মিকতার অনেক কাছাকাছি হাবাদ নামে পরিচিত এক নতুন ধরনের হাসিদিমে[12]র প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলেন যালমান, যৌক্তিক ভাবনাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বতালাশের সূচনা বিন্দুতে পরিণত করেছিল তা। যালমান আলোকনের কোনও কোনও ধারণার ব্যাপারে উন্মুক্ত ছিলেন। একটি অতীন্দ্রিয় কাঠামোয় সেগুলোকে স্থান করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল যৌক্তিক শক্তি ঈশ্বরকে পাওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষম; আমরা কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করলে–বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা যেমনটা আমাদের করতে বলেন–জগৎকে আদতেই ঐশী সত্তাশূন্য ঠেকে। কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদী ধারণার ভিন্ন এক রূপে যাওয়ার জন্যে তার ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে, সকল ঘটনায় তা সর্বব্যাপী ঐশী উপস্থিতি প্রকাশ করবে। যালমান যুক্তি বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু কেবল সেই প্রাচীন রক্ষণশীল যুক্তিই তুলে ধরছিলেন যে যৌক্তিক ভাবনাই ধারণার একমাত্র উপায় নয়; যুক্তি ও অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞাকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। ইহুদিরা যৌক্তিক আঁচঅনুমানে ব্যস্ত ও আধুনিক সেক্যুলার বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে যখন, যালমান যুক্তি দেখিয়েছেন, তারা তাদের মনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে, এবং নিগূঢ় প্রার্থনার মাধ্যমে সেগুলোকে অতিক্রম

করে যেতে চাইবে।[১৩] যালমান তাঁর হাবাদ হাসিদিমকে বেশ্‌ট সূচিত সহিংস অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দুর্জ্ঞেয় অনুভূতিতে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছেন। স্বয়ং যালমান ঘোরের অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ঘাসের উপর গড়াগড়ি যেতেন, সাধারণ লোকের মতো নাচতেন।[১৪] কিন্তু এই পরমানন্দ প্রোথিত ছিল পাঠ ও সুশৃঙ্খল মনোনিবেশের মাঝে। হাবাদ হাসিদিমদের মনের আরও গভীর স্তরে অবতরণের মাধমে সকল মহান ঐতিহ্যের অতীন্দ্রিয়বাদীর মতো সত্তার ভূমিতে পবিত্র উপস্থিতির সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত অবচেতন সত্তাকে সামাল দেওয়া শেখানো হত।

হাসিদিম ও মিসনাগদিমের বিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। যালমান আসলে কয়েক বছরের জন্যে সেইন্ট পিটার্সবার্গে কারাবন্দি ছিলেন, মিসনাগদিম তাঁকে ঝামেলাবাজ হিসাবে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোয় বৈরিতা কমে আসতে শুরু করে। উভয় পক্ষই বুঝতে পেরেছিল যে পরস্পরের কাছ থেকে নয়, বরং অন্যদিক থেকে তাদের জন্যে বেশি ভয়ের কারণ রয়েছে। সুতরাং, তাদের উচিত একসাথে মিলে এই নতুন হুমকীর মোকাবিলা করা। সবচেয়ে উদ্বেগজনক ব্যাপার ছিল সবে পূর্ব ইউরোপিয় ইহুদি গোত্রের মাঝে প্রবেশ ঘটতে যাওয়া ইহুদি আলোকন হাসকালাহর আবির্ভাব। হাসদিম ও মিসনাগদিম, দুই পক্ষের কাছেই একে ধর্মদ্রোহী মনে হয়েছে।

হাসকালাহ ছিল জার্মানির দেসাউ-র এক দরিদ্র তোরাহ পণ্ডিতের মেধাবী ছেলে মোজেস মেন্দেলসনের (১৭২৯-৮৬) সৃষ্টি। চৌদ্দ বছর বয়সে প্রিয় শিক্ষককে অনুসরণ করে বার্লিনে চলে এসেছিলেন তিনি। এখানে আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষার প্রেমে পড়েন ও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে জার্মান, ফরাসি, ইংরেজি, লাতিন, গাণিত ও দর্শনে নৈপুণ্য অর্জন করেন। জার্মান আলোকনে অংশ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তিনি, কান্টের ব্যক্তিগত বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। অবসরের গোটা সময়টা পড়াশোনার পেছনে ব্যয় করতেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *ফিদন* (১৭৬৭) যৌক্তিক দিক দিয়ে আত্মার অমরতা প্রমাণের প্রয়াসী ছিল, এর মাঝে ইহুদিসূচক বিশেষ কিছু ছিল না। অবশ্য তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহুদি ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আলোকনের বৈরিতার মুখোমুখী হয়ে ইহুদিবাদের সমর্থনে নিজেকে আবিষ্কার করে বসেন মেন্দেলসন। ১৭৬৯ সালে এক সুইস প্যাস্টর জোহান কাস্পার লাভাতার মেন্দেলসনকে প্রকাশ্যে ইহুদিবাদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি ক্রিশ্চান ধর্মের যৌক্তিক প্রমাণগুলো খণ্ডাতে না পারলে, ঘোষণা করেন লাভাতার, নিজেকে ব্যাপ্টিজমে সমর্পণ করতে হবে। মেন্দেলসন এক প্রুশিয় রাজ কর্মচারী ক্রিশ্চিয়ান উইলহেম ভ্যান দোহমের লেখা প্যামফ্লেট *অন দ্য সিভিক ইম্প্রুভমেন্ট*

AMARBOI.COM

অভ *দ্য কন্ডিশন* অভ জুজ (১৭৮১)-এ অ্যান্টিসেমিটিক লেখার কারণেও বিব্রত ছিলেন। আধুনিক বিশ্বে দক্ষ ও প্রতিযোগিতার সাথে টিকে থাকার জন্যে, যুক্তি দেখিয়েছেন ভ্যান দোহম, যেকোনও জাতিকে যত বেশি সম্ভব তার মেধাবীদের সমবেত করতে হবে, সুতরাং ইহুদিদের মুক্ত করে তাদের সমাজে আরও পূর্ণভাবে সমন্বিত করার ব্যাপারটি অর্থপূর্ণই মনে হয়, যদিও তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া ঠিক হবে না বা সরকারী অফিসে চাকরী দেওয়া চলবে না। অন্তস্থঃ পূর্বানুমান ছিল ইহুদিরা আপত্তিকর ও তাদের ধর্ম বর্বরোচিত।

অনীহার সাথে নিজেকে সাড়া দিতে বাধ্য মনে করেন মেন্দেলসন। ১৭৮৩ সালে *জেরুজালেম, কনসার্নিং রিলিজিয়াস অথরিটি অ্যান্ড জুদাইজম* প্রকাশ করেন তিনি। জার্মান আলোকন ধর্মের প্রতি বেশ ইতিবাচক ছিল। মেন্দেলসন স্বয়ং লকের প্রশান্ত ডেইস্ট বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন বলে মনে হয়; যদিও একে ইহুদিবাদ হিসাবে শনাক্ত করা কঠিন। মেন্দেলসন যেন একজন দয়াময় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে কাণ্ডজ্ঞানের ব্যাপার মনে করেছিলেন, তবে যুক্তিকে বিশ্বাসের আগে স্থান দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। কেবল যৌক্তিকভাবে সত্যিকে প্রমাণ করার পরই আমরা বাইবেলের কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারি। এটা অবশ্যই ট্র্যাডিশনাল রক্ষণশীল ধর্মবিশ্বাসের অগ্রাধিকারকে পাল্টে দিয়েছিল, যেখানে এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, যুক্তি ঐশীগ্রন্থে পাওয়া মিথের সত্যি তুলে ধরতে পারে না। মেন্দেলসন চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ও ধর্মের ব্যক্তিকরণেরও যুক্তি দেখান–ইহুদিদের পক্ষে অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাধান ছিল এটা। ঘেটোর বিধিনিষেধ ঝেড়ে ফেলে মূলধারার ইউরোপিয় সংস্কৃতিতে সংশ্লিষ্ট হতে উদগ্রীব ছিল তারা। ধর্মবিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় বানিয়ে তারা একদিকে যেমন ইহুদি থেকে যেতে পারবে তেমনি হয়ে উঠতে পারবে ভালো ইউরোপিয়। মেন্দলসন জোরের সাথে বলেন যে, ইহুদিবাদ বিশেষভাবে সময়ের ধারার সাথে মানানসই যৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস, এর মতবাদগুলো যুক্তিভিত্তিক। ঈশ্বর সিনাই পর্বতে মোজেসের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার সময় ইহুদি জাতির জন্যে কতগুলো মতবাদের সংকলন নয়, বরং একটা বিধান নিয়ে এসেছেন। সুতরাং, ইহুদিবাদ কেবল নৈতিকতা ও মানবীয় আচরণের সাথেই জড়িত; এটা ইহুদিদের মানসিকতাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখে। মেন্দেলসনের ইহুদিবাদের অতীন্দ্রিয় ও পৌরাণিক উপাদান সম্পর্কে সামান্যই উপলব্ধি ছিল মনে হয়। ইহুদিবাদকে জোর করে এর পক্ষে অচেনা এক যৌক্তিক ছাঁচে ঢেলে আধুনিক বিশ্বের কাছে ইহুদিবাদকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার বেশ কয়েকটি প্রয়াসের ভেতর তাঁরটাই ছিল প্রথম–বেশির ভাগ ধর্মের ক্ষেত্রেই যেমন অচেনা ছিল তা।

AMARBOI.COM

মেন্দেলসনের ধারণাগুলো অবশ্যই পূর্ব ইউরোপের হসিদিম ও মিসনাগদিমের পক্ষে ঘৃণিত ছিল, পশ্চিমা বিশ্বের অধিকতর অর্থডক্স ইহুদিদের বেলায়ও তাই। বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে জেন্টাইলদের সাথে যোগ দেওয়া ধর্মদ্রোহী নব্য স্পিনোযা হিসাবে পরিহাস করা হয়েছে তাঁকে। তারপরেও এটা মেন্দেলসনকে দুঃখ দিতে পারত; তিনি স্পষ্টতই ঐতিহ্যবাহী ইহুদিবাদের অধিকাংশকেই অবিশ্বাস্য ও অচেনা আবিষ্কার করেছিলেন বটে, কিন্তু ইহুদি ঈশ্বরকে বা নিজের ইহুদি পরিচয় ত্যাগ করতে চাননি। অবশ্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী ছিল তাঁর। শ্যাব্বেতাই যেভি ঘটনার পর থেকেই ইহুদিরা দেখিয়ে এসেছে যে, ইহুদিবাদের প্রচলিত সীমিতকারী আবিষ্কার করা কঠোর বিধানের অতীতে যেতে চায় তারা। মেন্দেলসনের নজীর অনুসরণ করতে পেরে খুশি হয়েছিল তারা: জেন্টাইল সমাজে মেলামেশা করা, নতুন বিজ্ঞান পাঠ করা, নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে একান্তে রাখা। মেন্দেলসন ছিলেন ইহুদিদের জাতি ও নিজস্ব সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ত্যাগ করতে বাধ্য না করে ঘেটো থেকে বের হয়ে আধুনিক ইউরোপে মিশে যাওয়ার উপায় উদ্ভাবনকারী প্রথম ব্যক্তিদের একজন।

আলোকনের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ইহুদি *মাসকিলিম*দের ('আলোকিত জন') কেউ কেউ অধিকতর সেক্যুলার দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিল। কেউ কেউ, আমরা যেমন দেখব, ইহুদি ইতিহাসের আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ হাতে নেবে; অন্যরা অর্থডক্স ইহুদিদের প্রার্থনা ও নিবেদনের কাজের জন্যে তুলে রাখা দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিব্রুতে পড়াশোনা ও লেখালেখি শুরু করেছিল। মাসকিলিমরা পবিত্র ভাষাকে সেক্যুলারে রূপান্তরিত করে এবার এক নতুন হিব্রু সাহিত্য গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। ইহুদি হওয়ার একটা আধুনিক কায়দা বের করার, তাদের চোখে অতীতের কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে আলোকিত সমাজের কাছে ইহুদিবাদকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছিল তারা।

কিন্তু তাদের মূলধারার সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণের ক্ষমতাকে বাহ্যিক আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধের ভেতর দিয়ে মারাত্মকভাবে সীমিত করে দেওয়া হয়েছিল: ইহুদিদের রাষ্ট্রীয় কোনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, রাজনৈতিক জীবনে অংশ নিতে পারত না তারা এবং সরকারীভাবে তখনও ভিন্ন জাতি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছিল। কিন্তু মাসকিলিমদের আলোকনের উপর বিরাট আশা ছিল। তারা লক্ষ করেছিল যে, আমেরিকান বিপ্লবের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্যুলার রাজনীতিতে ইহুদিদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল। আলোকনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শাসক নেপোলিয়ন বোনাপার্তে যখন ফ্রান্সে ক্ষমতায় এসে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে শুরু

AMARBOI.COM

করেছিলেন, কিছু সময়ের জন্যে মনে হয়েছিল যে, শত শত বছরের নির্যাতন নিপীড়নের শেষে ইহুদিরা এবার অবশেষে ইউরোপেও সমতা ও সম্মান পেতে যাচ্ছে।

মুক্তি ছিল ফরাসি বিপ্লবের সিংহনাদ, ফ্রান্সের নেপোলিয়ন সরকারের মূলমন্ত্র। ঘেটো থেকে পালাতে উদগ্রীব ইহুদিদের অবিশ্বাস্য আনন্দের ভেতর ফ্রান্সের ইহুদিরা পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন নেপোলিয়ন। ২৯শে জুলাই, ১৮০৬ ইহুদি ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, ও র‍্যাবাইদের প্যারিসের হোটেল দে ভিলে তলব করা হয়। এখানে তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন। কয়েক সপ্তাহ পরে নেপোলিয়ন ইহুদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেন, এর নাম দেন তিনি 'মহান সানহেদ্রিন'—সানহেদ্রিন ছিল ইহুদি শাসক সংস্থা, ৭০ সিই-তে মন্দির ধ্বংসের পর এর আর অধিবেশন বসেনি। এই সংস্থার ম্যান্ডেট ছিল পূর্বের সম্মেলনের ধর্মীয় বিধিবিধানের অনুমোদন দান। ইহুদিরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। র‍্যাবাইগণ ঘোষণা দিয়েছেন যে, ফরাসি বিপ্লব হচ্ছে 'সিনাই পর্বত থেকে আগত দ্বিতীয় আইন,' 'মিশর থেকে আমাদের এক্সোডাস, আমাদের আধুনিক পিস্যাচ'; '*লিবার্তে, ইগালিতে, ফ্রাতার্নিতে* নিয়ে এই নতুন সমাজে আবির্ভূত হয়েছে মেসিয়ানিক যুগ।'[১৫] নেপোলিয়নের বাহিনী গোটা ইউরোপ দখল করে নেওয়ার সময় দখল করা প্রতিটি দেশেই এই সাম্যবাদ বহাল করেছিলেন তিনি: নেদারল্যান্ডস, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল ও প্রুশিয়া। একের পর এক সব প্রিন্সিপালিটি ইহুদিদের মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু এমনকি ১৮০৬-এর প্রথম সম্মেলনের সময়ও ইহুদি জাতির প্রতি নেপোলিয়নের কমিশনার লুইস কাউন্ট মোলের এক আক্রমণে আলোকনের বৈরিতা বের হয়ে আসে। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, আলসেচের ইহুদি মহাজনরা কর ফাঁকি দিয়ে জনগণকে শুষে নিচ্ছে। সুতরাং, সমাবেশের ইহুদি প্রতিনিধিদের তাই দায়িত্ব রয়েছে তাদের জনগণের ভেতর শত শত বছরের 'অমর্যাদাকর অস্তিত্বের' ফলে বিস্মৃত নাগরিক নৈতিকতা বোধ জাগিয়ে তোলা।[১৬] ১৭ই মার্চ, ১৮০৮ ইহুদিদের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নেপোলিয়ন, পরে একে 'কুখ্যাত ডিক্রি' হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। টানা তিন বছর এইসব বিধিনিষেধ জারি থাকায় হাজার হাজার ইহুদি পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। আমেরিকান ইতিহাসবিদ নরম্যান ক্যান্টর যেমন উল্লেখ করেছেন, ইহুদিদের 'ফাউস্টিয়ান বারগেইনে'র প্রস্তাব দিয়েছিলেন নেপোলিয়ন: মুক্তির বিনিময়ে তাদের অনন্য ইহুদি আত্মা বিক্রি করে দিতে হবে।[১৭] *লিবার্তে*র সব রকম অনুপ্রেরণামূলক বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও আধুনিক কেন্দ্রিয় রাষ্ট্র ঘেটোর মতো স্বায়ত্তশাসিত অনিয়ম সহ্য করতে

AMARBOI.COM

পারেনি। আলোকনের রাজনীতিকে আইনি ও সাংস্কৃতিকভাবে সমরূপ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাদের অবশ্যই মিশে যেতে হবে, বুর্জোয়া ফরাসিতে পরিণত হতে হবে, আলাদা জীবনযাত্রা ত্যাগ করতে হবে এবং ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে: ইহুদিদের ইহুদি হিসাবে মিলিয়ে যেতে হবে।

ফরাসি সমাধান ইউরোপের বাকি অংশে ইহুদিদের মুক্তির প্যাটার্নে পরিণত হয়। নতুন সহিষ্ণুতা ছিল পুরোনো বিচ্ছিন্নতার চেয়ে উন্নতি, কিন্তু এটা কেবল আলোকনের অভিনব আদর্শের ছিল না, বরং আধুনিক রাষ্ট্রের চাহিদার ফল। আমরা যেমন দেখেছি, একই ধরনের বাস্তববাদীতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক বহুত্ববাদকে গ্রহণ করার দিকে চালিত করেছিল। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হলে ও একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন করতে হলে সরকারগুলোকে অবশ্যই তাদের সম্পূর্ণ জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। রাষ্ট্রের সরকারী ধর্ম যাই হোক, নতুন অর্থনৈতিক ও শিল্পায়নের কর্মসূচিতে ইহুদি, প্রটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক ও সেক্যুলারিস্টদের প্রত্যেককেই প্রয়োজন হবে। ইহুদিদের কিংবদন্তীসম ব্যবসাবুদ্ধি বিশেষভাবে কাঙ্ক্ষিত ছিল। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এই সম্পদকে আয়ত্তে আনার প্রয়োজন ছিল।[১৮]

তবে পুরোনো কুসংস্কার রয়ে গিয়েছিল। কেবল ফ্রান্স ও হল্যান্ড বাদে ওয়াটারলুতে (১৮২৫) নেপোলিয়নের পরাজয় ও তাঁর সাম্রাজ্যে পতনের পর ইহুদিদের দেওয়া অধিকারগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ইহুদিদের ফের ঘেটোতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, পুরোনো বিধিনিষেধের প্রত্যাবর্তন ঘটে, শুরু হয় নতুন হত্যাকাণ্ড। কিন্তু আধুনিক সমাজের চাহিদা শেষপর্যন্ত একের পর এক সরকারকে ফাউস্টিয়ান বারগেইন গ্রহণে রাজি হওয়া সাপেক্ষে ইহুদিদের পূর্ণ নাগরিকত্ব দিতে বাধ্য করে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও জার্মানির মতো ইহুদিদের সমতা ও নাগরিকত্বদানকারী রাষ্ট্রগুলো সমৃদ্ধি অর্জন করে;[১৯] কিন্তু গণতন্ত্রায়িত না করে আধুনিকতার সুবিধাসমূহকে অভিজাত শ্রেণীর মাঝে সীমিত রাখার চেষ্টা করেছে যারা, তারা পিছিয়ে পড়ে। ১৮৭০ সাল নাগাদ গোটা পশ্চিম ইউরোপে ইহুদিদের মুক্তি অর্জিত হয়; অবশ্য, পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায় যেখানে সরকারগুলো ইহুদি বিচ্ছিন্নতাকে ধ্বংস করতে অধিকতর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, লক্ষ লক্ষ ইহুদি আধুনিক রাষ্ট্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে গোঁয়ারের মতো রাব্বিনিক ও হাসিদিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে।[২০]

কিন্তু নেপোলিয়নের অনুমোদিত মূল অধিকারসমূহ বাতিল করার পরের প্রথম বছরগুলোয় ইহুদিরা বিচ্ছিন্ন ও প্রতারিত বোধ করেছে। তারা ভালো সেক্যুলার শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, আধুনিক সামজে অংশ নিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এখন তাতে

AMARBOI.COM

বাদ সাধা হয়েছে। মেন্দেলসন তাদের ঘেটো থেকে বের হয়ে আসার একটা উপায় বাৎলে দিয়েছিলেন। নেপোলিয়ন মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; এখন আর তারা ট্র্যাডিশনাল জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে পারছিল না। হতাশা থেকে বহু জার্মান ইহুদি মূলধারার সংস্কৃতির সাথে মিশে যেতে ক্রিশ্চান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। অন্যরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, ইহুদিবাদকে বাঁচতে হলে ধর্মান্তরের এই স্রোত রুখতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জার্মানিতে দুটো সম্পর্কিত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, দুটোরই শেকড় প্রোথিত ছিল ইহুদি আলোকনে। মাসকিলিমরা বিশ্বাস করত যে, তারা ঘেটো থেকে আধুনিক বিশ্বে উত্তোরণে সেতুবন্ধের কাজ করতে পারবে। তারা ভালো জার্মান বলতে পারত, জার্মান বন্ধু ছিল, প্রকাশ্যে তাদের সম্পূর্ণ ইউরোপিয় জীবনযাত্রার সাথে মানানসই বলে মনে হত। এবার তাদের কেউ কেউ আধুনিক বিশ্বের সাথে আরও সহজে খাপ খাওয়াতে খোদ ইহুদিবাদকেই সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এই সংস্কৃত ইহুদিবাদ সম্পূর্ণ বাস্তববাদী আন্দোলন হিসাবে সূচিত হয়েছিল; এই কারণে পুরোপুরিভাবে *লোগোসের* নীতিমালায় পরিচালিত হয়েছে। সত্যিই এটা ছিল ইহুদিবাদ থেকে *মিথোসকে* নিশ্চিহ্ন করার পদক্ষেপ। ইসরায়েল জ্যাকবসন (১৭৬৮–১৮২৮) বিশ্বাস করতেন, ইহুদিবাদকে জার্মান জনগণের কাছে কম ভিনদেশী মনে হলে তাতে করে মুক্তির সুযোগ বেড়ে উঠবে। সাধারণ ব্যক্তি ও দানবীর হিসাবে তিনি গাযা পাহাড়ের কাছে সীসেনে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, ছাত্ররা এখানে সেক্যুলার বিষয়ের পাশাপাশি ইহুদি বিষয়ও পড়ত। একটা সিনাগগও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি যেখানে উপাসনাকে ইহুদি ধরনের চেয়ে বরং ঢের বেশি প্রটেস্ট্যান্ট মনে হত। হিব্রুর বদলে মাতৃভাষায় উপাসনা মন্ত্র উচ্চারিত হত; জার্মান কোরাল সঙ্গীত, মিশ্র কয়ার ও জার্মান ভাষায় সারমন আগের তুলনায় সার্ভিসের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথাগত আচারগুলোকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছিল। ১৮১৫ সালে জ্যাকবসন অন্য সাধারণ জনেরা মিলে এই আধুনিকায়িত উপাসনা পদ্ধতিকে বার্লিনে নিয়ে আসেন। এখানে তাঁরা নিয়মিত সিনাগগ থেকে ভিন্ন দেখানোর জন্যে তাঁদের ভাষায় 'ব্যক্তিগত' সিনাগগ খোলেন। ১৮১৭ সালে এডওয়ার্ড ক্লে হামবুর্গে একটি নতুন মন্দির স্থাপন করেন। এখানে সংস্কার ছিল আরও বিপ্লবাত্মক। যায়নে প্রত্যাবর্তন ও মেসায়াহর আগমনের আর্তি জানিয়ে প্রার্থনাকে বাদ দিয়ে সেখানে সকল মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধের জয়গান গেয়ে প্রার্থনা যোগ করা হয়েছিল: ইহুদিরা যেখানে জার্মানির নাগরিক হতে চাইছে সেখানে কেমন করে তারা প্যালেস্তাইনে এক মেসিয়ানিক রাষ্ট্রের জন্যে প্রার্থনা করতে পারে? ১৮২২ সালে প্রটেস্ট্যান্ট কায়দায় মেয়ে ও ছেলেদের জন্যে কনফার্মেশন সার্ভিস

অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে; সার্ভিসে পুরুষ ও নারীদের আলাদা বসার রেওয়াজও পরিত্যাগ করা হয়। হামবুর্গের র‍্যাবাইগণ এই সংস্কার আন্দোলনের নিন্দা জানান এবং এমনকি প্রুশিয় সরকারের কাছে আবেদন জানানোর মাধ্যমে বার্লিন মন্দির বন্ধ করতেও সমর্থ হন।[২১] সুতরাং, পরের বছরগুলোতে এই সংস্কৃত ইহুদি আন্দোলনকে অনুকূল ভাবতে পারত এমন অনেক ইহুদি ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু হামবুর্গ মন্দির খোলাই থাকে ও লিপযিগ, ভিয়েনা ও ডেনমার্কে নতুন নতুন মন্দির খোলা হয়। আমেরিকায় নাট্যকার আইজাক হারবি চার্লসটনে এক সংস্কার মন্দির স্থাপন করেন। আমেরিকার ইহুদিদের কাছে সংস্কার দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৭০ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই শো সিনাগগের উল্লেখযোগ্য অংশ অন্তত কিছু পরিমাণ সংস্কার অনুশীলনী গ্রহণ করেছিল।[২২]

সংস্কার ইহুদিবাদ সম্পূর্ণই আধুনিক বিশ্বের সম্পত্তি ছিল; এটা ছিল যৌক্তিক, বাস্তবধর্মী ও জোরালভাবে ব্যক্তিয়ায়িত ধর্মবিশ্বাসের পক্ষপাতি। সংস্কারকগণ অতীতের সাথে রেডিক্যাল বিচ্ছেদ ঘটাতে ট্র্যাডিশনাল বিভিন্ন মতবাদ ও ভক্তিকে উৎখাত করতে ইচ্ছুক–প্রকৃতপক্ষে অধীর–ছিলেন। নির্বাসনকে অস্তিত্বগত বিপর্যয় হিসাবে দেখার বদলে সংস্কারকগণ ডায়াসপোরায় নিখুঁতভাবেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন। ইহুদিবাদকে আধুনিকতার সকল গুণাবলী ধারণ করা ধর্ম হিসাবে তুলে ধরেছেন সবাই: এটা যৌক্তিক, উদার ও মানবিক, প্রাচীন স্বাতন্ত্র্যবাদ ঝেড়ে ফেলে সর্বজনীন ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হতে প্রস্তুত।[২৩] সংস্কারকদের অযৌক্তিক, অতীন্দ্রিয় বা রহস্যের কোনও অবকাশ ছিল না। প্রাচীন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ইহুদিদের আধুনিক জীবনে উৎপাদনশীল ভূমিকা রাখায় বাধা সৃষ্টি করে থাকলে সেগুলোকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে। গোড়ার দিকে তাদের উদ্বেগ ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিক, কিন্তু ১৮৪০-র দশক নাগাদ সংস্কার পণ্ডিত ও র‍্যাবাইদের আকৃষ্ট করতে শুরু করে, এঁরা ইহুদি ইতিহাসের সমালোচনামূলক গবেষণার কাজ শুরু করেছিলন। লেপল্ড যুনয (১৭৯৪–১৮৮৬), যাকারিয়াহ ফ্রাংকেল (১৮০১–৭৫), নাখমান ক্রোচমাল (১৭৮৫–১৮৪০) এবং আব্রাহাম গেইগার (১৮১০–৭৪) ইহুদিবাদের পবিত্র উৎসসমূহকে অনুসন্ধানের আধুনিক পদ্ধতির অধীনে নিয়ে আসেন। তাঁরা জুৎসইভাবে মানানসই কান্ট ও হেগেলের দর্শনে স্পষ্টই প্রভাবিত 'দ্য সায়েন্স অভ জুদাইজম' নামে একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইহুদিবাদ অতীতে কোনও এক সময় তা প্রত্যাদিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাওয়া কোনও ধর্ম নয়; বরং ধীরে ধীরে তা বিবর্তিত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় ক্রমেই আগের চেয়ে বেশি যৌক্তিক ও আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। এযাবৎ দিব্যদৃষ্টিতে প্রকাশিত

AMARBOI.COM

ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এখন সমালোচনামূলক বুদ্ধি দিয়ে ধারণায়ন ও উপলব্ধি করা যেতে পারে।[২৪] অন্য কথায়, *মিথোসকে* এবার *লোগোসে* পরিণত করা হয়েছিল।

পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ইহুদি অবস্থানের ভেতর একটা ভারসাম্য আনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, ক্রোচমাল ঐতিহ্যবাদীদের সাথে একমত হয়েছিলেন যে, তোরাহ সিনাই পাহাড় চূড়ায় মোজেসের উপর একবারই অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু হালাখাহর–তোরাহর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও প্রসারিত ইহুদি বিধান–ঐশী উৎসকে অস্বীকার করে তিনি তাদের ক্রুদ্ধ করে তোলেন। ফ্রাংকেল যুক্তি দেখান যে, হালাকাহ সম্পূর্ণই মানব রচিত, যুক্তির ফসল, সুতরাং যুগের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে একে পরিবর্তন করা যেতে পারে। ক্রোচমাল যুক্তি দেখান, ইহুদি ইতিহাস দেখিয়েছে যে, ইহুদিবাদ সব সময়ই অন্য সংস্কৃতির কাছ থেকে ধারণা ধার করেছে; এভাবেই টিকে আছে এটা। সুতরাং ইহুদিদের আধুনিক বিশ্বকে নিয়ে পড়াশোনা করে নতুন মূল্যবোধের সাথে খাপ খাইয়ে না নেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষেই আধুনিক সমাজের সুযোগসুবিধা ও চ্যালেঞ্জ ভোগ করার জন্যে ইহুদিদের ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষা লাভ ঠেকানোর এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। গেইগারের বিশ্বাস ছিল, মেন্ডেলসন এক নতুন ইহুদি যুগের সূচনা করেছেন; সংস্কার ইহুদিবাদ ধর্মবিশ্বাসকে আলোকন দর্শনের এক স্বাস্থ্যকর সংযোগ দিয়ে মুক্তি দান করবে।

কিন্তু সায়েন্স অভ জুদাইজম অনেক সময় সংস্কারের সমালোচনামুখর ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, ক্রোচমাল ধার্মিক ইহুদি ছিলেন, সংস্কারকগণ যেসব প্রাচীন আচার আচরণ বাতিল করে দিচ্ছিলেন সেগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন তিনি। ফ্রাংকেল ও যুনয, দুজনই বিশ্বাস করতেন ঐতিহ্যের এমনি পাইকারী বিসর্জন দারুণ বিপজ্জনক। ১৮৪৯ সালে যুনয ইহুদি আচারগুলোকে মৌলিক বিশ্বাসের বাহ্যিক লক্ষণ অভিহিত করে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। খাদ্যসংক্রান্ত বিধি ও ফিল্যাক্ট্রিজ পরা শত শত বছরের পরিক্রমায় ইহুদি অভিজ্ঞতার অত্যাবশ্যক অংশে পরিণত হয়েছে, এইসব আচার বাদে ইহুদিবাদ বিমূর্ত কিছু মতবাদের একটি ব্যবস্থায় পর্যবসিত হবে। যুনয কাল্টের জটিল গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, একমাত্র এটাই ধর্মের মিথ ও বিশ্বাসগুলোক বোধগম্য করে তোলে। ফ্রাংকেলও সঠিক আধ্যাত্মিক প্রবণতা সৃষ্টিতে লোকজনকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে আচারঅর্চণার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর ভয় ছিল, কেবল যুক্তি ঐতিহ্যবাহী ইহুদিবাদ তুঙ্গ অবস্থার মতো করে সবসময়ই আবেগকে সন্তুষ্ট করতে বা আনন্দ ও ফুর্তি বয়ে আনতে পারবে না। ইয়োম কিপ্পুরের প্রাচীন জটিল আচার সম্পূর্ণ বিনাশ করা বা যায়নে মেসিয়ানিক প্রত্যাবর্তনের সকল উল্লেখ মুছে ফেলা ভুল হবে, কারণ এইসব

ইমেজ ইহুদি চেতনাকে গড়ে তুলেছে এবং ইহুদিদের এক ধরনের ভীতির বোধ গড়ে তুলতে ও অসহনীয় পরিস্থিতিতে আশার আলো খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে।[২৫] কিছু পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সংস্কারকারীরা যেন প্রায়শঃই উপাসনায় আবেগের ভূমিকার ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিলেন। যুনয ও ফ্রাংকেল ধর্মের আবিশ্যিকভাবে পৌরাণিক উপকরণ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন, তাঁরা সত্যির প্রবেশদ্বার হিসাবে কেবল যুক্তিকেই দেখার আধুনিক প্রবণতার সাথে পুরোপুরি একমত হননি। গেইগারের দিকে থেকে, তিনি ছিলেন আপাদমস্তক যুক্তিবাদী, পাইকারী সংস্কারের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তারপরেও বছর পরিক্রমায় সংস্কার ইহুদিরা যুনযের প্রজ্ঞা ও ফ্রাংকেলের উদ্বেগকে স্বীকৃতি দিয়ে আবেগীয় অতীন্দ্রিয় উপাদান ছাড়া বিশ্বাস ও উপাসনা তাদের আত্মাকে হারিয়ে ফেলে উপলব্ধি করে কিছু কিছু ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতির পুনর্বাসন করেছিলেন।

সংস্কারক ও সায়েন্স অভ জুদাইজমের পণ্ডিতদের উভয় পক্ষই এমন এক বিশ্বে তাদের ধর্মের টিকে থাকার ব্যাপারে ভাবিত ছিলেন যাকে যতই উদারভাবে মনে হোক না কেন, একে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সতীর্থ ইহুদিদের দীক্ষা গ্রহণের ঝর্নার দিকে হুড়মুড় করে ছুটে যেতে দেখার সময় ইহুদিবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন তাঁরা এবং এর টিকে থাকা নিশ্চিত করার উপায় খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। আমরা দেখব, আধুনিক বিশ্বের বহু ধার্মিক জন এই উদ্বেগের অংশীদার। তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস মারাত্মক বিপদাপন্ন বলে বার বার আশঙ্কার সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। নিশ্চিহ্নতার ভীতি মানুষের অন্যতম মৌলিক আতঙ্ক। আধুনিক বিশ্বে আবির্ভূত বহু ধর্মীয় আন্দোলনই নিশ্চিহ্নতার এই আতঙ্ক থেকে আবির্ভূত হয়েছে। সেক্যুলার চেতনা ধীরে ধীরে শেকড় গেড়ে বসার সাথে সাথে চলমান যুক্তিবাদ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ক্রমশঃ বৈরী হয়ে ওঠায় ধার্মিক লোকজন ক্রমবর্ধমানহারে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে সরে গেছে ও তাদের আধ্যাত্মিকতা আরও বেশি করে যুদ্ধ করার জন্যে তৈরি হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ঐতিহ্যবাহী ইহুদিরা–সংস্কারকরা যাদের *আলতগ্লোবিজেন*, 'প্রাচীন বিশ্বাসী' বলতেন–নিশ্চিতভাবে নিজেদের দলছুট ভাবতে শুরু করেছিল। এমনকি মুক্তির পরেও তারা এমনভাবে বাস করত যেন ঘেটোর দেয়ালগুলো এখনও জায়গামতোই রয়েছে। সম্পূর্ণভাবে তোরাহ ও তালমুদে পাঠে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল তারা আর আধুনিকতাকে বর্জন করার প্রতি জোর দিচ্ছেল। জেন্টাইল পাঠকে তারা ইহুদিবাদের সাথে বেমানান বলে বিশ্বাস করত। তাদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় মুখপাত্র ছিলেন র‍্যাবাই মোজেস সোফার প্রেসবার্গ

(১৭৬৩–১৮৩৯)। আধুনিকতাকে স্থান করে দিতে যেকোনও পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন তিনি–হাজার হোক ঈশ্বর পরিবর্তিত হননি; নিজের সন্তানদের উপর মেন্দেলসনের বইপত্র পড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন তিনি, তাদের সেক্যুলার শিক্ষা দিতে অস্বীকার গেছেন বা কোনওভাবে আধুনিক সমাজে অংশগ্রহণ করতে দেননি।[২৬] সব মিলিয়ে তাঁর সহজাত প্রতিক্রিয়া ছিল পিছু হটা। কিন্তু অন্য ঐতিহ্যবাদীরা সেক্যুলারাইজিং ও যৌক্তিকীকরণের প্রভাবে বিপদের বিরুদ্ধে আরও সৃজনশীল অবস্থান গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

১৮০৩ সালে গাওন অভ ভিলনার একজন শিষ্য র‍্যাবাই হাঈম ফোলোঝিনার এক চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেন যা ঐতিহ্যবাহী ইহুদি আধ্যাত্মিকতাকে বদলে দেবে। লিথুয়ানিয়ার ফেলোঝিনে এতয় হাঈম *ইয়েশিভা* প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। শতাব্দীর পরিক্রমায় পূর্ব ইউরোপের অপরাপর অংশেও অন্যান্য নতুন *ইয়েশিভোত* প্রতিষ্ঠিত হয়: মির, তেলয, স্লোবোদকা, লোমযা ও নোভোগ্রুদোক। অতীতে *ইয়েশিভা* (হিব্রু 'বসা'-র প্রতিশব্দ থেকে গৃহীত একটি শব্দ) ছিল সিনাগগের পেছনের কতগুলো কামরার সারিমাত্র, যেখানে ছাত্ররা বসে তোরাহ ও তালমুদ পাঠ করত। সাধারণত স্থানীয় সম্প্রদায়ই এর দেখাশোনা করত। তবে ফোলোঝিন ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে শত শত মেধাবী ছাত্র বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞদের কাছে পড়ার জন্যে এসে এখানে ভীড় জমাত। পাঠ্যক্রম ছিল কঠিন, ক্লাসগুলো ছিল প্রলম্বিত, *ইয়েশিভায়* ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা মোটেও সহজ ছিল না। র‍্যাবাই হাঈম গাওনের কাছে শেখা পদ্ধতিতে তোরাহ পাঠ শেখাতেন, টেক্সট বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক সামঞ্জস্যতার উপর জোর দিতেন। কিন্তু একভাবে তা ঐশীসত্তার সাথে আধ্যাত্মিক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করত। এটা স্রেফ তালমুদ *সম্পর্কে* জানার কোনও ব্যাপার ছিল না; মুখস্থ বিদ্যার প্রক্রিয়া, প্রস্তুতি ও প্রাণবন্ত আলোচনা ক্লাসে পৌঁছানো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এটা ছিল এক ধরনের প্রার্থনা, এমন এক আচার ছাত্রদের যা পবিত্রতার অনুভূতি যোগাত। এটা ছিল এক প্রবল অস্তিত্ব। তরুণদের আধা মঠজাতীয় গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হত, সম্পূর্ণ *ইয়েশিভায়* তাদের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন আকার পেত। পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হত তাদের, কেবল ইহুদি পণ্ডিতির জগতে মগ্ন থাকত তারা। ছাত্রদের কাউকে কাউকে কিছু সময় আধুনিক দর্শন বা গণিত নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হলেও এধরনের সেক্যুলার বিষয়বস্তু ছিল গৌণ, তোরাহ থেকে সময় চুরি করা হচ্ছে মনে করা হত।[২৭]

ইয়েশিভোতের লক্ষ্য ছিল হাসিদিমের হুমকীর মোকাবিলা করা; *ইয়েশিভোত* স্পষ্টভাবেই মিসনাগদিক প্রয়াস ছিল। তোরাহর প্রবল পাঠ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে

প্রণীত। কিন্তু শতাব্দীর গড়িয়ে যাবার সাথে সাথে ইহুদি আলোকনকে হুমকীর চেয়েও বেশি কিছু বলে ধারণা করা হচ্ছিল; ইহুদি সম্প্রদায়গুলোর চৌহদ্দির ভেতর সেক্যুলার সংস্কৃতির অশুভকে নিয়ে আসা ট্রোজান হর্সের মতো বিবেচনা করা মাসকিলিমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হাসিদিম ও মিসনাগদিম একাট্টা হতে শুরু করেছিল। সুতরাং, আস্তে আস্তে নতুন *ইয়েশিভোত* অর্থডক্সির ঘাঁটিতে পরিণত হয়, যার প্রাথমিক কাজ ছিল এই ভীষণ বিপদকে দূরে ঠেলে দেওয়া। কেবল তোরাহ পাঠই ইহুদিবাদের বিনাশ ঠেকাতে সক্ষম।

ইয়েশিভা বিংশ শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করা আল্ট্রা-অর্থডক্স মৌলবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এই উদীয়মান ও যুদ্ধংদেহী ধরনের ধার্মিকতার প্রথম প্রকাশ ছিল এটা। আমরা এ থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেতে পারি। মৌলবাদ–ইহুদি, ক্রিশ্চান বা মুসলিম, যাই হোক–বিরল ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে আবির্ভূত হয়ে থাকে (ফোলোঝিনের ক্ষেত্রে এই বাহ্যিক শত্রু হতে পারত জেন্টাইল ইউরোপিয় সংস্কৃতি); কিন্তু তার বদলে সাধারণত এর শুরু হয় অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম হিসাবে যেখানে ঐতিহ্যবাদীরা তাদের বিশ্বাস মোতাবেক সেক্যুলার বিশ্বের কাছে অনেক বেশি আপোসকামী বলে বিশ্বাস করা স্বধর্মীদের সাথে যুদ্ধ করে। মৌলবাদীরা প্রায়শঃই সহজাত প্রবৃত্তির বশে *ইয়েশিভার* মতো খাঁটি ধর্মবিশ্বাসের ছিটমহল তৈরি করার মাধ্যমে অগ্রসরমান আধুনিকতার প্রতি সাড়া দেবে। এখানে ঈশ্বর বিহীন বিশ্ব থেকে বাহ্যিক পরিবর্তন অগ্রাহ্য করে অস্তিত্বকে নতুন রূপ দেওয়ার জন্যে আত্ম-সন্তুষ্ট সম্প্রদায়ে প্রত্যাহারের ব্যাপার ঘটে। সেকারণে আবিশ্যিকভাবেই এটি একটি আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ। অবশ্য এই পিছু হটার ভেতরেই আগামীর পাল্টা আক্রমণের শক্তি লুকিয়ে থাকে। এই ধরনের *ইয়েশিভার* ছাত্ররা তাদের সমাজে একই ধরনের প্রশিক্ষণ ও আদর্শবাদী ক্যাডারে পরিণত হতে পারে। এই ধরনের ছিটমহল আধুনিক সমাজের বিকল্প হিসাবে একটি প্রতি-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। *ইয়েশিভার* প্রধান *(রোশ ইয়েশিভা)* ছাত্রদের উপর বিপুল আধিপত্য বিস্তারকারী একজন হাসিদিক যাদ্দিকের মতোই হয়ে পড়েন। তিনি ঐতিহ্যের বিভিন্ন নির্দেশনার প্রতি পরম আনুগত্য দাবি করেন, এটা তাদের মৌলিক চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতার ক্ষমতার উপর সীমা আরোপ করে। এভাবে *ইয়েশিভা* এমন এক ধরনের রীতি তৈরি করে যা প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক চেতনা এবং স্বায়ত্তশাসন ও উদ্ভাবনের উপর এর প্রদত্ত গুরুত্বের পরিপন্থী।

অবশ্য ইউরোপের সেক্যুলার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, বরং প্রাচীন বিশ্বের ঐতিহ্যে তরুণদের সিক্ত করে তাদের আত্মাকে পাহারা দেওয়াই ছিল ফোলোঝিন

AMARBOI.COM

ও এর সহযোগী *ইয়েশিভোতের* মূল নীতি। কিন্তু এখানেই রয়েছে বৈপরীত্যের অস্তিত্ব যা মৌলবাদের ইতিহাসে অবিরাম পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে। রক্ষণশীল চেতনার প্রতি সংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও ফোলোঝিন ও অন্যান্য নতুন *ইয়েশিভোত* আবিশ্যিকভাবে আধুনিক ও আধুনিকায়নের প্রতিষ্ঠান ছিল। তোরাহ ও তালমুদ পাঠকে কেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল তারা। তাদের সৃষ্টি মনোনয়নের সম্ভাবনাও বোঝায়। ঘেটোতে জীবন যাত্রার প্রচলিত ধারা বদলে গিয়েছিল; এর মূল্যবোধ ও রীতিনীতিকে নির্দিষ্ট ও প্রশ্নাতীত হিসাবে অনুভব করা হয়েছে। অন্য কোনও জীবনধারাই ইহুদিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন একজন ইহুদিকে ফেলোঝিনের মতো প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিজেকে ঐতিহ্যের সাথে বেঁধে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল। ধর্মকে ব্যক্তি পর্যায়ের বিষয়ে পর্যবসিতকারী এক বিশ্বে খোদ ফোলোঝিনই ছিল এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।[২৮] এমনকি মৌলবাদীরা যখন আধুনিকতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, একটা পর্যায় পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস আধুনিক ও উদ্ভাবনী হয়ে থাকে।

অন্য ইহুদিরা মধ্যপন্থা বেছে নিতে চেয়েছে। ১৮৫১ সালে বর্তমানে সংস্কারবাদীদের প্রাধান্যবিশিষ্ট ফ্রাংকফুর্ত সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাদী সদস্যরা নিজস্ব ধর্মীয় সমিতি গড়ার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। স্যামুয়েল রাফায়েল হার্শকে (১৮০৮-৮৮) র‍্যাবাই হতে আমন্ত্রণ জানায় তারা। অবিলম্বে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন হার্শ, যেখানে রথসচাইল্ড পরিবারের আর্থিক সহায়তায় ইহুদি ও সেক্যুলার দুরকম বিষয়ই পড়ানো হত। হার্শ যেমন উল্লেখ করেছেন, কেবল ঘেটোতেই ইহুদিরা দর্শন, ওষুধবিজ্ঞান ও গণিত পাঠে অবহেলা করেছিল। অতীতে বিশেষ করে ইসলামি বিশ্বে ইহুদি চিন্তাবিদরা অনেক সময় মূলধারার সংস্কৃতির বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঘেটোতে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় বাধ্য হয়েই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পাঠে অবহেলা করেছিল তারা। হার্শ নিশ্চিত ছিলেন, ইহুদিবাদের অন্যান্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ইহুদিদের যত সম্ভব আধুনিক বিকাশকে আলিঙ্গন করা উচিত, তবে সেটা সংস্কারকদের মতো প্রতিমাবিদ্বেষী না হয়ে।[২৯]

তরুণ বয়সে হার্শ *নাইন্টিন লেটারস অভ বেন উযযেল* প্রকাশ করেছিলেন (১৮৩৬), যেখানে অর্থডক্স পরিপালনের জন্যে মনকে আন্দোলিতকারী আবেদন জানানো হয়, কিন্তু সংস্কার ও ক্রিশ্চান ধর্মে ব্যাপকহারে ধর্মান্তরের জন্যে আধুনিকতাকে বর্জনকারী কট্টর ঐতিহ্যবাদীদের দায়ী করেন তিনি। তিনি তাদের মৌলবাদী আক্ষরবাদও মেনে নেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন ইহুদিদের সযত্ন পাঠ

WWW.AMARBOI.COM

ও গবেষণার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন নির্দেশনার গুপ্ত অন্তস্থঃ অর্থ সন্ধান করা উচিত। কোনও অর্থ প্রকাশ করে না এমন ধরনের আইনগুলো স্মারক হিসাবে কাজ দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, খৎনার বিধি মনকে দেহ পবিত্র রাখার দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়; মাংস ও দুধ না মেশানোর উপর নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টিতে ঐশী শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনকে প্রতীকায়িত করে। সব আইনই পালন করতে হবে, কারণ সেগুলো চরিত্র গঠন করে ও ইহুদিকে পবিত্র করে তুলে মানবতার প্রতি নৈতিক ব্রত পালনে সক্ষম করে তোলে। হার্শের জীবন আবারও আধুনিক বিশ্বে ধর্মীয় অর্থডক্সির স্বেচ্ছাসেবী প্রকৃতি দেখায়। এককালে যেখানে ঐতিহ্যকে নিশ্চিত ধরে নেওয়া হয়েছিল এখন সেখানে ইহুদিদের অর্থডক্স হওয়ার জন্যে লড়াই ও তর্ক করতে হচ্ছিল।

AMARBOI.COM

মিশর ও ইরানে মুসলিমরা আধুনিকায়নকারী পাশ্চাত্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করার সময় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ভেতর সম্পর্কের এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করেছিলেন। স্যুয়েযে একটা ঘাঁটি করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, যেখান থেকে তিনি ভারতমুখী ব্রিটেনের সাগর পথে হয়রানি সৃষ্টি করতে পারবেন ও সম্ভবত সিরিয়া থেকে অটোমান সাম্রাজ্যে হামলা চালাতে পারবেন। অর্থাৎ, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ভেতর বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তারের লড়াইতে মিশর ও প্যালেস্তাইন পরিণত হয়েছিল যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ। ইউরোপিয় ক্ষমতার খেলা ছিল এটা, কিন্তু নিজেকে মিশরিয় জনগণের সামনে প্রগতি ও আলোকনের বাহক হিসাবে তুলে ধরেছিলেন নেপোলিয়ন। ২১শে জুলাই, ১৭৯৮ ব্যাটল অভ পিরামিডে মামলুক অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাস্ত করার পর আরবী ভাষায় এক ঘোষণা প্রকাশ করেছিলেন তিনি যেখানে বিদেশী শাসকদের কবল থেকে মিশরকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শত শত বছর ধরে সারকাসিয়া ও জর্জিয়া থেকে আগত মামলুকরা মিশরের জনগণকে শোষণ করে গেছে, এখন সেই স্বেচ্ছাচারের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। তিনি কলিকালের ক্রুসেডার নন, *উলেমাদের* নিশ্চিত করেছেন, এদের স্থানীয় মিশরিয়দের প্রতিনিধি ভেবেছিলেন তিনি। কেউ যদি ভেবে থাকে তিনি তাদের ধর্মকে ধ্বংস করতে এসেছেন, সে নিশ্চিত থাকতে পারে

> যে আমিআপনাদেরঅধিকার পুনরুদ্ধার করতে এসেছি, ক্ষমতাদখলকারীরা যার উপর আগ্রাসন চালিয়েছিল—আমি মামলুকদের চেয়ে ঈশ্বরকে বেশি মানি, পয়গম্বর মুহাম্মদ ও মহান কোরানকে শ্রদ্ধা করি। ওদের বলে দিন, ঈশ্বরের চোখে সকল মানুষ সমান—বুদ্ধিমত্তা, গুণ ও বিজ্ঞানই তাদের ভেতর একমাত্র তফাৎ।[৩০]

কিন্তু এই মুক্তি ও বিজ্ঞান এসেছিল আধুনিক সেনাবাহিনীর হাত ধরে। মিশরিয়রা কেবল মামলুকদের উপর এই অসাধারণ যুদ্ধ মেশিনকে বিধ্বংসী পরাজয় চাপিয়ে দিতে দেখেছিল; মাত্র দশজন ফরাসি সৈনিক প্রাণ হারিয়েছিল, আহত হয়েছে তিরিশজন, অন্যদিকে মামলুকরা হারিয়েছিল দুই হাজারেরও বেশি মানুষ ও চারশো উট ও পঞ্চাশটি অস্ত্র।[৩১] এই মুক্তির স্পষ্টতই একটা আগ্রাসী দিকও ছিল, যেমন ছিল আধুনিক ইন্সতিতুত দ'ঈজিপ্তের, অঞ্চলের ইতিহাসের যাদের অনুপুঙ্খ গবেষণা নেপোলিয়নকে আরবীতে ঘোষণা দিতে সক্ষম ও ইসলামের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পরিচিত করে তুলেছিল। পণ্ডিতি ও বিজ্ঞান মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপিয় স্বার্থ উদ্ধার ও এখানকার জনগণকে ফ্রান্সের শাসনাধীনে আনার একটা উপায়ে পরিণত হয়েছিল।

*উলেমা*গণ মুগ্ধ হননি। 'এসব প্রতারণা ও চালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই না,' বলেছেন তাঁরা, 'আমাদের প্রলুব্ধ করার জন্যে। বোনাপার্তে একজন ক্রিশ্চানের সন্তান ক্রিশ্চান ছাড়া আর কিছুই নন।'[৩২] বিধর্মী শাসনের সম্ভাবনায় বিব্রত বোধ করেছেন তাঁরা। কোরানের শিক্ষা ছিল যতদিন পর্যন্ত নারী-পুরুষ তাদের সমাজকে আল্লাহ'র ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তুলবে ততদিন পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হবে না। অথচ এখন ইসলামি বাহিনী বিদেশী শক্তির কাছে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়েছে। আযহার *মাদ্রাসার* এক শেখ আল-জাবার্তি এই আগ্রাসনকে

> প্রধান যুদ্ধ; ভীতিকর ঘটনাপ্রবাহ; দুর্যোগময় ব্যাপার; অশুভের বিস্তার... সময়ের বিঘ্ন; প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন; মানব রচিত আইন কানুনের উল্টোযাত্রা[৩৩]

হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তিনি আধুনিকতার আবির্ভাবের সাথে প্রায়শঃই সম্পর্কিত সেই দুনিয়া উল্টে যাবার অনুভূতি বোধ করছিলেন। অতিরঞ্জিত বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও জাবার্তির ভীতি সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না। নেপোলিয়নের আগ্রাসন ছিল মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সূচনা, যেটা আসলেই ছিল পরিস্থিতির সম্পূর্ণ

AMARBOI.COM

পরিবর্তন, লোকজনকে তাদের সবচেয়ে মৌলিক বিশ্বাস ও প্রত্যাশাসমূহকে নতুন করে সাজাতে বাধ্য করেছে।

নেপোলিয়ন *উলেমা*দের আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে ঢের বেশি ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তুর্কি ও মামলুকদের বিরুদ্ধে তাদের মিত্র বানাতে চেয়েছেন তিনি, কিন্তু *উলেমা*গণ তাঁর পছন্দ মতো সাড়া দিতে পারেননি। মিশরিয়রা এত দীর্ঘ সময় তুর্কি ও মামলুকদের অধীনে ছিল যে প্রত্যক্ষ শাসন ছিল সম্পূর্ণ অচেনা একটা ধারণা। কেউ কেউ তাঁর প্রস্তাবিত পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, পরামর্শকের অভ্যস্ত ভূমিকাই বেছে নিয়েছেন। তাঁরা প্রতিরক্ষা বা আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, সবচেয়ে ভালো যা জানতেন তাই আঁকড়ে থাকতে চেয়েছেন: ধর্মীয়, আইনি ও ইসলামি ব্যাপারস্যাপার পরিচালনা। অবশ্য অধিকাংশ *উলেমাই* সহযোগিতা করেছেন; ভিন্ন কোনও উপায় আছে বলে ভাবেননি, শূন্যস্থানে এগিয়ে এসে সরকার ও জনগণের মাঝে মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকা পালন করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছেন–যেমনটা সব সময়ই করে এসেছিলেন।[৩৪] অল্প কয়েকজন ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে ১৭৯৮ সালের অক্টোবরে ও ১৮০০ সালের মার্চে ব্যর্থ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তবে সেগুলোকে দ্রুত দমন করা হয়েছে।

ফরাসিদের নিয়ে হতবিহ্বল ছিলেন তাঁরা। নেপোলিয়নের মুক্তি ও স্বায়ত্তশাসনের আলোকন আদর্শ বুঝে উঠতে পারেননি। মিশরিয় ও ইউরোপিয়দের মাঝে সাগরসম দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। জাবার্তি ইন্সতিতুত দ'ঈজিপ্তে সফর করার সময় ফ্রান্সের পণ্ডিতি ও উদ্দীপনার তারিফ করেছেন, কিন্তু তাদের পরীক্ষানিরীক্ষার কোনও মানে খুঁজে পাননি। বিশেষ করে হটওয়াটার বেলুন দেখে বিস্মিত হয়ে গেছেন। তাঁর মানসিক জগতে এজাতীয় জিনিসের স্থান ছিল না, একে তিনি ইউরোপিয়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারেননি–যাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ বিজ্ঞানের দুই শো বছরের ইতিহাস ছিল। 'অদ্ভুত সব জিনিসপত্র ছিল ওদের কাছে,' পরে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি, 'সেগুলো এমন কাণ্ডকারখানা দেখিয়েছে যা বোঝার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের নেই।'[৩৫]

১৮০১ সালে ব্রিটিশরা মিশর থেকে ফরাসিদের উৎখাত করতে সফল হয়; এই পর্যায়ে ব্রিটিশরা অটোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। সুতরাং, মিশরকে তুর্কিদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল তারা, মিশরে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার কোনও রকম প্রয়াস পায়নি। কিন্তু অধিকারের ব্যাপারটা ছিল শোরগোলময়। মামলুকরা ইস্তাম্বুল থেকে নতুন তুর্কি সরকারকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে মামলুক, জানেসারি ও অটোমানদের প্রেরিত আলবেনিয় গ্যারিসন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জনগণকে

AMARBOI.COM

ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখে। এমনি বিভ্রান্তির সময় মুহাম্মদ আলি (১৭৬৯–১৮৪৯) নামে এক তরুণ আলবেনিয় অফিসার নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেন। বিভ্রান্তিতে ক্লান্ত ও মামলুকদের অযোগ্যতার কারণে *উলেমাগণ* তাঁকে সমর্থন দেন। বিশিষ্ট *আলিম* উমর মাকরামের নেতৃত্বে *উলেমাগণ* তুর্কিদের বিরুদ্ধে এক জনপ্রিয় অভ্যুত্থান পরিচালনা করেন, ইস্তাম্বুলে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে মুহাম্মদ আলিকে মিশরের পাশা বা গভর্নর হিসাবে স্বীকৃতি দানের অনুরোধ জানান। সুলতান সম্মত হন, কায়রোতে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জনৈক ফরাসি পর্যবেক্ষক লিখেছেন যে, জনতার উৎসাহ উদ্দীপনা তাঁকে ফরাসি বিপ্লবের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।[৩৬] এটা ছিল *উলেমাদের* স্বর্ণ সময়। *উলেমাদের* সাথে আলোচনা ছাড়া মিশরের কোনও পরিবর্তন না আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের সমর্থন নিশ্চিত করেন মুহাম্মদ আলি। সবাই ধরে নিয়েছিল যে, স্থিতাবস্থার পুনর্বহাল হয়েছে; বেশ কয়েক বছরের উত্থান-পতনের পর জীবন আবার এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে।

কিন্তু মুহাম্মদ আলির ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিকল্পনা। তিনি মিশরে ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, আধুনিক ইউরোপিয় সেনাবাহিনী দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিলেন; নিজস্ব এমনি একটি আধুনিক দারুণ দক্ষ সেনাবাহিনী পেতে চেয়েছেন তিনি। ইস্তাম্বুল থেকে স্বাধীন একটি আধুনিক মিশর গড়ে তুলতেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি। পশ্চিমে ঘটমান বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের প্রতি মুহাম্মদ আলির কোনও আগ্রহ ছিল না। ছিলেন কৃষক পরিবারের অশিক্ষিত মানুষ, চল্লিশ বছর বয়সে পড়াশোনা করতে শিখেছিলেন। সরকার ও সমর বিজ্ঞান সম্পর্কে জানা যাবে এজাতীয় বইপত্রই ছিল তাঁর আগ্রহের বিষয়। পরবর্তীকালের বহু সংস্কারকের মতো মুহাম্মদ আলি স্রেফ আধুনিকতার প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তির অধিকারী হতে চেয়েছেন। দেশের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপর এইসব পরিবর্তনের প্রভাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ আলি অনন্যসাধারণ মানুষ ছিলেন, তাঁর সাফল্য ছিল উল্লেখ করার মতো। ১৮৪৯ সালে মৃত্যুর সময় বলতে গেলে একা হাতে অটোমান সাম্রাজ্যের এক পশ্চাদপদ, বিচ্ছিন্ন প্রদেশ মিশরকে আধুনিক বিশ্বে টেনে তুলেছিলেন তিনি। তাঁর কর্মজীবন কোনও অ-পশ্চিমা সমাজে পাশ্চাত্য আধুনিকতা চালু করার সমস্যা সম্পর্কে আমাদের আলোকিত করা কিছু অন্তর্দৃষ্টি যোগায়।

প্রথমত, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পশ্চিম ধীরে ধীরে এর নিজস্ব শক্তিতে আধুনিকতায় এসে পৌঁছেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের বিশ্ব আধিপত্য লাভ করার প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জন করতে প্রায় তিন শো বছর সময় লেগেছে। কিন্তু তারপরেও এটা ছিল এক কষ্টসাপেক্ষ, অস্বস্তিকর প্রক্রিয়া যেখানে

বিপুল রক্তক্ষয় ও আধ্যাত্মিক স্থানচ্যুতির ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু স্রেফ চল্লিশ বছর সময়ে ভেতর এই অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়াটিকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন মুহাম্মদ আলি। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তাঁকে এমন কিছু ঘোষণা করতে হয়েছিল যা কিনা মিশরের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল ছিল। এক ভীতিকর অবস্থায় ছিল মিশর। লুটপাট আর ধ্বংস প্রক্রিয়া থাবা বসিয়েছিল। *ফেলাহিন*রা জমি ছেড়ে সিরিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল। করের পরিমাণ ছিল মাত্রাতিরিক্ত ও খামখেয়ালিপূর্ণ। মামলুকরা ফিরে আসার হুমকি সৃষ্টি করেছিল। এমনি করুণ দশার একটি দেশকে কেমন করে আধুনিক প্রশাসন ও আধুনিক সেনাবহিনীর একটি শক্তিশালী, কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল? পাশ্চাত্য অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। কেমন করে মিশর তার নাগাল পাওয়ার আশা করতে পারত, পশ্চিমকে তার নিজের খেলায় পরাস্ত করে ও আরও পাশ্চাত্য আগ্রাসন ও দখল ঠেকাতে পারত?

মামলুক নেতাদের নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছিলেন মুহাম্মদ আলি। ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে তাদের প্রধান কর্মকর্তাদের প্রলুব্ধ করে কায়রো নিয়ে আসেন তিনি ও তিন জন বাদে বাকি সবাইকে অ্যাম্বুশে হত্যা করান। পরের দুই বছরে অবশিষ্ট *বে*-রা তাঁর ছেলে ইব্রাহিমের হাতে প্রাণ হারান; তখন ব্রিটিশদের সামাল দিয়েছেন মুহাম্মদ আলি—তাঁর বিস্ময়কর কার্যকর নেতৃত্ব দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল তারা। সবশেষে অটোমান সুলতানের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে আরবে অটোমান আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ওয়া হাবিদের বিরুদ্ধে একটি অভিযাত্রী দল পাঠান তিনি। ছেলে হাসানের অধীনে থাকার কথা ছিল সেনাবাহিনীর, কায়রোয় এক জাঁকাল অনুষ্ঠানে তিনি গম্ভীর অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। নগরীর বিভিন্ন পথ দিয়ে এঁকেবেঁকে মিছিল এগিয়ে যাওয়ার সময় মুহাম্মদ আলির লোকেরা শেষ মামলুক চিফদের ফাঁদে ফেলে হত্যা করে, তারপর বেপরোয়া হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া হয় তাদের; মামলুকদের বাড়িঘরে লুটপাট চালায় তারা, নারীদের ধর্ষণ করে। সেদিন এক হাজার মামলুক নিহত হয়েছিল, সেটাই ছিল মিশরে মামলুক গোষ্ঠীর অবসান।[৩৭] আবারও, আধুনিকায়ন জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের কাজ হিসাবে শুরু হয়েছিল।

মনে হয় যেন লোকজনকে আধুনিক বিশ্বে নিয়ে আসতে নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই রক্তের নদীতে সাঁতার কাটতে প্রস্তুত থাকতে হয়। স্থিতিশীল, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিতে সহিংসতাই হয়তো শক্তিশালী সরকার অর্জনের একমাত্র পথ। মুহাম্মদ আলি অর্থনীতির বেলায়ও সমান নিষ্ঠুর ছিলেন। এটা বোঝার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল যে, উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই পাশ্চাত্য শক্তির আসল ভিত্তি।

১৮০৫ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে পদ্ধতিগতভাবে নিজেকে দেশের প্রতি একর জমির ব্যক্তিগত মালিকে পরিণত করেছিলেন তিনি। আগেই মামলুকদের এস্টেট হাতিয়ে নিয়েছিলেন; এরপর দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতগ্রস্ত পদ্ধতি চালিয়ে আসা ট্যাক্স কৃষকদের সম্পত্তি অধিকার করে নেন। সবশেষে ব্যক্তিগতভাবে ফাউন্ডেশনের সমস্ত বকেয়া দায় শোধ করে বছরের পরিক্রমায় অবনতির দিকে চলে যাওয়া সকল ধর্মীয়ভাবে দান করা জমি ও সম্পত্তি অধিকার করে নেন। একই রকম স্বেচ্ছাচারী কৌশল প্রয়োগ করে দেশের প্রতিটি ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন তিনি। মাত্র এক দশকের কিছু বেশি সময়ের ভেতরই নিজেকে মিশরের একক ভূস্বামী, বণিক ও শিল্পপতিতে পরিণত করেন। মিশরিয়রা এসব মেনে নিয়েছিল, তার কারণ ছিল বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ। বহু বছরের বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনার পর দেশে আইন শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল; স্বচ্ছতার সাথে বিচারকর্ম সম্পাদিত হচ্ছিল, প্রত্যেকের সরাসরি মুহাম্মদ আলির কাছে অভিযোগ দাখিল করার অধিকার ছিল। স্পষ্টতই আয়ের অর্থে নিজের পকেট ভারি করছিলেন না তিনি, বরং মিশরের উন্নয়ন ঘটাচ্ছিলেন। তাঁর অন্যতম প্রধান সাফল্য ছিল তুলার চাষ, মূল্যবান রপ্তানি পণ্য ও রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছিল তা। মুহাম্মদ আলি ইউরোপ থেকে যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও উপাদিত পণ্য কেনার প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার যোগান পেয়েছেন।[৩৮]

কিন্তু এখানেই পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীলতা ফুটে উঠেছে। ইউরোপের সামগ্রিক আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া স্বায়ত্তশাসন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে–বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক–স্বাধীনতা ঘোষণার প্রয়োজনে শক্তি লাভ করেছিল। কিন্তু মুহাম্মদ আলি একমাত্র যে কায়দায় মিশরের অধিপতি ও ইউরোপ থেকে স্বাধীন করার উপায় ছিল সেটা হচ্ছে পরম স্বৈরাচরী নিয়ন্ত্রণ আরোপ। শক্তিশালী শিল্প ভিত্তি গড়ে তুলতে না পারলে তাঁর পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। যথারীতি তিনি একটি চিনি রিফাইনারি, অস্ত্রভাণ্ডার, তামার খনি, তুলার কারাখানা, লোহার ফাউন্ড্রি, রঙের কারখানা, গ্লাস ফ্যাক্টরি ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু চোখের পলকে শিল্পায়ন সম্ভব হতে পারে না। ইউরোপ অবিষ্কার করেছিল যে তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ পরিচালনার জন্যে সাধারণ মানুষদের ভেতর থেকে অধিক সংখ্যায় আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় নৈপূণ্য অর্জন ও বিশেষায়িত দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হয়েছে। তবে সেজন্যে সময় লেগেছে। মুহাম্মদ আলির কলে-কারাখানায় যেসব *ফেলাহিন* কাজ করত তাদের কোনও রকম কারিগরি দক্ষতা ছিল না, ছিল না কোনও অভিজ্ঞতাও, ক্ষেতের বাইরের জীবনে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে পারেনি তারা। দেশের উৎপাদনশীলতায় অবদান

AMARBOI.COM

রাখতে হলে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাতে এর মানে দাঁড়াত এক বিশাল প্রায় অচিন্তনীয় সামাজিক উত্থান। পরিণতিতে মুহাম্মদ আলি বেশিরভাগ শিল্প উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়েছিল।[৩৯]

এভাবে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষেই বেশ কঠিন ছিল, সমস্যাগুলো অনতিক্রম্য বলা চলে। ইউরোপে চাবিকাঠি ছিল উদ্ভাবন। কিন্তু অধিকাংশ মিশরিয়ই তখনও প্রাক আধুনিক রক্ষণশীল চেতনায় প্রভাবিত ছিল। মুহাম্মদ আলি একমাত্র যে উপায়ে মিশরকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে পারতেন সেটা উদ্ভাবনের সাহায্যে নয় (ইউরোপের মতো), বরং পশ্চিমের অনুকরণের মাধ্যমে। তিনি প্রশাসনিক, কারিগরি ও শিক্ষাগত অনুকরণের (ইসলামি ভাষায় *তাকলিদ*)-এর কর্মসূচির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন, আধুনিক চেতনার উল্টোপিঠ ছিল তা। পশ্চিমের অমূল্য উপাদানে পরিণত হওয়া স্বাধীনতা ও সৃজনীশক্তি ছাড়া মিশরের মতো একটি রাষ্ট্র কীভাবে সত্যিকার অর্থে 'আধুনিক' হয়ে উঠতে পারে?

কিন্তু মুহাম্মদ আলির সামনে কোনও উপায় ছিল না। তিনি প্রধানত ইউরোপিয়, তুর্কি ও লাভান্তিয় অফিসারদের দিয়ে পরিচালিত পাশ্চাত্য কায়দার প্রশাসন চালু করেছিলেন। এরা মিশরের সমাজের এক নতুন শ্রেণী গড়ে তুলেছিল। প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের পড়াশোনার জন্যে ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডে পাঠানো হচ্ছিল। ১২০০ ছাত্রের জন্যে ক্যাসারলিনে একটা সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, পাশার অর্থে তাদের ভরণপোষণ ও পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইউরোপিয় বা বিদেশে পড়াশোনা করা মিশরিয়দের পরিচালনায় তুরা ও গিজায় আরও দুটি আর্টিলারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কলেজে প্রবেশের সাথে সাথে এই ছেলেরা পাশার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হত, তারা ইউরোপিয় ভাষা, গণিত ও পাশ্চাত্য সমর কৌশলের উপর পড়াশোনা করত। এই কলেজগুলো দেশকে সুশিক্ষিত অফিসার শ্রেণীর যোগান দিয়েছিল। কিন্তু *ফেলাহিন*দের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না: ক্ষেতেখামারেই এরা মিশরের পক্ষে বেশি উপকারী ছিল, দেশকে কৃষি ভিত্তি যোগাচ্ছিল।[৪০] এর মারাত্মক পরিণতি দেখা দেবে। মিশরের মতো অ-পশ্চিমা আধুনিকায়নের পথে চলা দেশে ইউরোপিয় দেশসমূহের সাথে সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ ছিল সামরিক বাহিনীর সদস্যদের। জনসংখ্যার বিশাল অংশ প্রক্রিয়া থেকে বাধ্য হয়েই দূরে ছিল, ফলে সেনা অফিসাররা প্রায়শঃই স্বাভাবিকভাবেই নেতা বা শাসকে পরিণত হতেন, তখন আধুনিকতা এক ভিন্ন সামরিক গুরুত্ব লাভ করত—আবারও—পশ্চিম থেকে যা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সেনাবাহিনী ছিল মুহাম্মদ আলির মূল গুরত্বের বিষয়। লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এই বাহিনীর প্রয়োজন ছিল তাঁর। কেননা সারা জীবনের কর্মকাণ্ডে তাঁকে এক হাতে

ব্রিটিশদের ঠেকাতে হয়েছে অন্য হাতে ঠেকাতে হয়েছে অটোমান তুর্কিদের। তুর্কিরা কেবল একটা কারণেই মুহাম্মদ আলির আধা স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন মেনে নিতে পারত, সেটা হলো অটোমান অভিযানে তাঁর উন্নত যোদ্ধা মেশিনকে তলব করে: আরবে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে, বা গ্রিক বিদ্রোহ দমনে (১৮২৫–২৮)। কিন্তু ১৮৩২ সালে তাঁর ছেলে ইব্রাহিম পাশা অটোমান প্রদেশ সিরিয়া ও প্যালেস্তাইনে আক্রমণ চালিয়ে বসে তুর্কি সেনাবাহিনীর উপর শোচনীয় পরাজয় চাপিয়ে দেন, বাবার জন্যে এক দর্শনীয় *ইম্পেরিয়াম ইন ইম্পেরিও* সৃষ্টি করেন। মিশরিয় বাহিনী অবশ্যই ফরাসি কায়দায় গঠন করা হয়েছিল। নেপোলিয়নের সেনাদলে প্রত্যক্ষ করা শৃঙ্খলা ও দক্ষতা অনুকরণের প্রয়াস পেয়েছিলেন মুহাম্মদ আলি, এবং সত্যিই সংখ্যার দিক থেকে বিশাল সেনাবাহিনীর ভেতর দিয়ে অনায়াসে অগ্রসর হওয়ার মতো একটি বাহিনী গড়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সাফল্যে দেশের মানুষের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণও জড়িত ছিল। প্রথমে মুহাম্মদ আলি সুদান থেকে প্রায় ২০,০০০ জনকে জোর করে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেন, আসওয়ানের ব্যারাকে রাখেন তাদের। কিন্তু সুদানিরা স্রেফ মানিয়ে উঠতে পারেনি। তাদের বাঁচাতে সেনাবাহিনীর ডাক্তারদের প্রাণান্ত প্রয়াস সত্ত্বেও (আবু জাবলে মুহাম্মদ আলির মেডিকেল স্কুলে প্রশিক্ষিত) অনেকেই দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মারা গেছে। এভাবে পাশা *ফেলাহিন*দের নিয়োগ করতে বাধ্য হন, তাদের বাড়ি, পরিবার ও ক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে আসেন। পর্যাপ্ত খাপ খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট সহায় তাদের সাধারণত ছিল না, তাদের পরিবার প্রায়ই দুর্গত অবস্থায় পড়ে গেছে, নারীরা পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। জোর করে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক জীবনে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিকাংশ *ফেলাহিন*কে এমন প্রবল ত্রাসে আক্রান্ত করেছিল যে ঘন ঘন আত্ম-বিকৃতির আশ্রয় নিতে শুরু করেছিল তারা: নিজের আঙুল কেটে ফেলত, দাঁত উপড়ে ফেলত ও এমনকি নিজেদের অন্ধও করত।[41] দক্ষ একটি লড়াকু বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল বটে, কিন্তু বিশাল মানবীয় ক্ষতি স্বীকার করে। জোর করে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির ফলে কেবল *ফেলাহিন*রাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, জমিন থেকে পুরুষদের উৎখাত করায় কৃষিখাতও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রত্যেক ইতিবাচক সংস্কারেরই কালো দিক ছিল। মুহাম্মদ আলির অর্থনৈতিক নীতিমালা ইউরোপিয় বাণিজ্যকে মিশরের প্রবেশে উৎসাহিত করেছে, কিন্তু সেটা স্থানীয় শিল্পখাতের ক্ষতি সৃষ্টি করে। মিশরের একমাত্র একচেটিয়া কারবারীতে পরিণত হয়ে পাশা কার্যত দেশীয় বণিকশ্রেণীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।[42] বহুল প্রতীক্ষিত সেঁচ কর্ম ও জলপথের উন্নয়নে বিশাল অংক বিনিয়োগ করেছিলেন তিনি,

AMARBOI.COM

কিন্তু *কোর্ভির* শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ এতটাই খারাপ ছিল যে, ২৩,০০০ প্রাণ হারিয়েছিল বলে কথিত আছে।[৪৩] প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু মিশরের বিশাল জনসংখ্যার প্রাক আধুনিক, রক্ষণশীল জীবনধারা ও বিশ্বাসসমূহ অপরিবর্তনীয় রয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন কেতায় কাজ করে চলা দুটো সমাজ–একটিতে ছিল কেবল আধুনিকায়িত সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মচারী, এবং অন্যটি অনাধুনিক–ধীরে ধীরে আবির্ভূত হচ্ছিল মিশরে।

উলেমাগণ নির্ঘাৎ আধুনিকতার আবির্ভাবকে বিধ্বংসী আবিষ্কার করেছিলেন। মুহাম্মদ আলি গভর্নর হওয়ার সময় তাঁরা ছিলেন বিশাল শক্তি। তিনি তাঁদের তোষামোদ করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং টানা তিনটি বছর পাশা ও যাজকদের ভেতর এক মধুচন্দ্রিমার কাল গেছে। ১৮০৯ সালে অবশ্য *উলেমাগণ* প্রথাগত কর অবকাশের মর্যাদা হারান, উমর মাকরাম মুহাম্মদ আলির বিরোধিতা করার জন্যে আহ্বান জানালেন তাদের যাতে নতুন করারোপ প্রত্যাহারে তাঁকে বাধ্য করা যায়। কিন্তু *উলেমাগণ* খুব কমই ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখাতে পেরেছেন। বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক *উলেমাকে* নিজের শিবিরে টেনে নিতে সক্ষম হন পাশা। মাকরামকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, তাঁর সাথে সাথে মুহাম্মদ আলির বিরোধিতা করার শেষ সুযোগটুকুও *উলেমাদের* হাতছাড়া হয়ে যায়; তাঁর বিদায় শ্রেণী হিসাবে *উলেমাদের* পরাজয়ও ছিল বৈকি। মুসলিম হিসাবে মুহাম্মদ আলি ধর্মীয় পণ্ডিত ও *মাদ্রাসাগুলোর* প্রতি মিষ্টি কথা বলতে ভুল করতেন না, কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছিলেন তাদের, সামান্য ক্ষমতা থেকেও করেছিলেন বঞ্চিত। তাঁকে অমান্যকারী শেখদের বহিষ্কার করেছেন তিনি; ফলে জাবার্তি বলছেন, বেশির ভাগ *উলেমা* নতুন ব্যবস্থায় সায় দিয়েছিলেন। আর্থিকভাবেও তাঁদের অনাহারে রেখেছিলেন তিনি। ধর্মীয়ভাবে দান করা সম্পত্তির *(ওয়াকফ)* আয় বাজেয়াপ্ত করে *উলেমাদের* আয়ের প্রধান উৎসটিকেও কেড়ে নিয়েছিলেন। ১৮১৫ সাল নাগাদ বিশাল সংখ্যক প্রচলিত কোরান শিক্ষার স্কুল ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিল। ষাট বছর পরে ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলো এক মারাত্মক অর্থনৈতিক দুর্দশায় পতিত হয়। শিক্ষকদের জন্যে কোনও রকম বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না, মসজিদগুলো ইমাম, মুয়াজ্জিন, কোরান তেলাওয়াতকারী ও খাদেমদের বেতন দিতে পারছিল না। মহান মামলুক ভবনগুলোর অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল, এমনকি আযহার পর্যন্ত পড়ে গিয়েছিল দুর্দশায়।[৪৪]

এমনি প্রবল আক্রমণের মুখে মিশরের *উলেমাগণ* ভীতু ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েন। সরকারের প্রথাগত পরামর্শকের ভূমিকা নতুন বিদেশী প্রশাসকদের অভিজাত গোষ্ঠী কেড়ে নিয়েছিল, যাদের বেশির ভাগেরই স্থানীয় ঐতিহ্যের প্রতি

AMARBOI.COM

তেমন একটা শ্রদ্ধা ছিল না। প্রগতির যাত্রায় *উলেমাদের* পেছনে ফেলে যাওয়া হয়েছিল, কিতাব ও পাণ্ডুলিপি হাতে তাঁদের একা রেখে দিয়েছিলেন পাশা। বিরোধিতা অসম্ভব হয়ে ওঠায় *উলেমাগণ* পরিবর্তন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, পণ্ডিতি প্রথায় নিমজ্জিত করেন নিজেদের। মিশরের এটাই *উলেমাদের* প্রধান অবস্থানে পরিণত হবে ও অব্যাহত থাকবে। তাঁরা আধুনিকতাকে বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মনে করেননি, তার বদলে তাঁদের ক্ষমতা ও সম্পত্তি চুরি এবং মর্যাদা ও প্রভাব খোয়া যাবার চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে একে কতগুলো ঘৃণ্য ও ধ্বংসাত্মক বিধিনিষেধের ধারা মনে করেছেন।[৪৫] মিশরের মুসলিমরা পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার সংস্পর্শে আসার পর যাজকগোষ্ঠীর কাছ থেকে কোনও রকম পথ নির্দেশনা না পেয়ে সাহায্যের জন্যে অন্য দিকে চোখ ফেরাবে।

শত শত বছর ধরে মিশরের শাসক অভিজাত গোষ্ঠী ও *উলেমাদের* ভেতর একটা অংশীদারী ছিল। মুহাম্মদ আলি এই সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, অকস্মাৎ এক নতুন সেক্যুলারিজমের সূচনা ঘটিয়েছিলেন তিনি। এর কোনও আদর্শিক সমর্থন ছিল না, বরং রাজনৈতিক অনিবার্য পদক্ষেপ হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। পশ্চিমে লোকে আস্তে আস্তে চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এমনকি জাগতিক এক ধরনের আধ্যাত্মিকতাও গড়ে তুলেছিল তারা। অধিকাংশ মিশরিয়র কাছে অবশ্য সেক্যুলারাইজেশন অচেনা, বিদেশী ও বোধের অতীত রয়ে গিয়েছিল।

অটোমান সাম্রাজ্যে একই ধরনের আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া চলছিল, তবে পাশ্চাত্য পরিবর্তনের পেছনের বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে ইস্তাম্বুলে অধিকতর সচেতনতা ছিল। অটোমানরা ইউরোপে কূটনীতিকে পরিণত হয়েছিলেন এবং সুলতানের দরবারে ইউরোপিয় রাষ্ট্রনায়কদের সাথে মিলিত হয়েছেন তারা। ১৮২০ ও ১৮৩০-র দশকে আধুনিক বিশ্বের সাথে পরিচিত একটি প্রজন্ম গড়ে ওঠে, এরা সাম্রাজ্যের সংস্কারের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে গ্র্যান্ড উযির নিয়োগ পাওয়া আহমেদ বেভিক পাশার বাবা প্যারিসে তুর্কি দূতাবাসে কাজ করেছিলেন; স্বয়ং আহমেদ গিবন, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, শেক্সপিয়র ও ডিকেন্স পড়েছেন। মুস্তাফা রাশেদ পাশা প্যারিসেও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন ও সেখানে রাজনীতি ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, আধুনিক সেনাবাহিনী এবং একটি নতুন আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাসহ সকল নাগরিকের সাম্যতাকে স্বীকৃতি দানকারী কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্রে পরিণত হতে না পারলে অটোমান সাম্রাজ্য আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকতে পারবে না; ক্রিশ্চান ও ইহুদিদের অবশ্যই আর *'জিম্মি'* হিসাবে ('সুরক্ষিত সংখ্যালঘু') রাখা যাবে না, বরং তাদের

AMARBOI.COM

মুসলিম নাগরিকদের সমান মর্যাদাই দিতে হবে। এইসব ইউরোপিয় ধারণা চালু থাকায় দ্বিতীয় মুহাম্মদের পক্ষে ১৮২৬ সালে তানযিমাত ('বিধান') চালু করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এইসব বিধান জানেসারিদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়, সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন সূচিত করে ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন শুরু হয়। প্রথমে সুলতান ভেবেছিলেন, সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ঠেকাতে এটাই যথেষ্ট প্রমাণিত হবে, কিন্তু ইউরোপিয় শক্তির অব্যাহত অগ্রগতি ও ইসলামি অঞ্চলে ধীরে ধীরে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, আরও মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে।[৪৬]

১৮৩৯ সালে সুলতান আব্দুলহামিদ রেশিদ পাশার প্ররোচণায় গুলহানে ডিক্রি জারি করেন, ফলে ইসলামি আইন অখণ্ড থাকলেও সুলতানের রাজত্বকে প্রজাদের সাথে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠানসমূহের মৌলিক পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী ছিল তা, যাকে আরও পদ্ধতিগত ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হতে হবে। পরের তিন দশকের পরিক্রমায় কেন্দ্রিয় ও স্থানীয় সরকারের পুনর্গঠন করা হয়, প্রতিষ্ঠা করা হয় ফৌজদারি ও বাণিজ্যিক বিধান ও বিভিন্ন আদালত। ১৮৫৬ সালে হাত্তি হুমায়ূন ডিক্রি ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদান করে। কিন্তু এতে করে অনিবার্যভাবে *উলেমাদের* সাথে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তাঁরা এইসব উদ্ভবনকে শরীয়াহ আইনের অবমূল্যায়ন মনে করেছেন।[৪৭] সংস্কারের প্রতি যারা অঙ্গিকারাবদ্ধ ছিলেন, ক্রমাগত তাদের এই প্রশ্ন নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে: ইসলামি ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি না দিয়ে কেমন করে মুসলিমরা আধুনিক হতে পারে? ঠিক ক্রিশ্চান ধর্ম যেভাবে বদলে গেছে, এবং আধুনিকায়ন আলোকায়নের চিন্তাভাবনার প্রভাবে যেভাবে তা বদলে যাচ্ছে, আগামী দশকগুলোয় ইসলামকেও তেমনি বদলে যেতে হবে।

জরুরি ভিত্তিতে এ প্রশ্নের উত্তর মেলার প্রয়োজন ছিল, কারণ প্রতিটি বছর পেরিয়ে যাবার সাথে সাথে মুসলিম বিশ্ব ও সাথে সাথে পাশ্চাত্য জগতের দুর্বলতাও প্রকট হয়ে উঠছিল। মুহাম্মদ আলি সুলতানকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও, ১৮৪০ সালে ইউরোপের চাপের কাছে বাধ্য হয়ে সিরিয়া, আরব ও গ্রিসে তাঁর নতুন সীমানা গুটিয়ে আনতে হয়েছিল। মারাত্মক তিক্ত আঘাত ছিল এটা, এই ধকল কিছুতেই সামলে উঠতে পারেননি তিনি। ১৮৪০ সালে মিশরের পাশা হিসাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া তাঁর পৌত্র আব্বাস (১৮১৩–৫৪) ইউরোপ এবং পশ্চিমের সমস্ত কিছুই ঘৃণা করতেন। সৈনিক ছিলেন তিনি, অটোমান সাম্রাটদের বিপরীতে তাঁর কোনও উদার নৈতিক শিক্ষা ছিল না। তাঁর চোখে পাশ্চাত্যের মানে ছিল শোষণ ও অপমান: ইউরোপিয় প্রশাসক ও ব্যবসায়ীদের মিশরে লাভ করা বিশেষ

AMARBOI.COM

সুবিধাগুলোকে ঘৃণা করতেন তিনি, ইউরোপিয়রা নিজেদের আর্থিক সুবিধার জন্যে যেভাবে তাঁর পিতামহকে বিভিন্ন অসম্ভব প্রকল্প হাতে নিতে তাগিদ দিয়েছিল, তাও ছিল তাঁর অসন্তোষের বিষয়। তিনি মুহাম্মদ আলি নৌবহর ভেঙে দেন, সেনাবাহিনীকে সীমিত আকার দেন এবং নতুন স্কুলসমূহ বন্ধ করে দেন। আব্বাস অবশ্য মিশরিয়দের মাঝেও অজনপ্রিয় ছিলেন, ১৮৫৪ সালে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান তিনি। মুহাম্মদ আলির চতুর্থ ছেলে মুহাম্মদ সাঈদ পাশা (১৮২২-৬৩) তাঁর উত্তরাধিকারী হন। তিনি ছিলেন আব্বাসের সম্পূর্ণ উল্টো। ফরাসিভাষী সাঈদ পাশ্চাত্য জীবনযাত্রাকে বেছে নিয়েছিলেন, বিদেশীদের সাহচর্য তিনি ভালোবাসতেন, সেনাবাহিনীকে ফের চাঙা করে তোলেন। কিন্তু শাসনামলের শেষের দিকে এমনকি সাঈদও কোনও কোনও ইউরোপিয় কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড ও সন্দেহজনক আচরণের কারণে মোহমুক্ত হয়ে ওঠেন।

এইসব ইউরোপিয় প্রকল্পের ভেতর সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল সুয়েয খাল নির্মাণ। মুহাম্মদ আলি ভূমধ্যসাগরের সাথে লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করার যেকোনও পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন, তাঁর ভয় ছিল যে, এর ফলে মিশর আরও একবার ইউরোপিয় শক্তিগুলোর নজর কাড়বে, তাতে পাশ্চাত্য আগ্রাসন ও আধিপত্য বিস্তারের এক নতুন পর্যায় শুরু হবে। কিন্তু সাঈদ পাশা এই ধারণায় ছিলেন মুগ্ধ, তিনি পুরোনো বন্ধু ফরাসি কনসাল ফার্দিনান্দ দে লেসেপসকে (১৮০৫-৯৪) কনসেশেন মঞ্জুর করতে একপায়ে খাড়া ছিলেন। তিনি তাঁকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে এই খাল মিশরকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম করে তুলবে, ফ্রান্সের টাকায় তৈরি করা হবে বলে শুরুতে মিশরের কোনও খরচই হবে না। সাঈদ ছিলেন অনভিজ্ঞ; ৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৪ তারিখে সম্পাদিত কনসেশন মিশরের পক্ষে বিপর্যয়কর ছিল। সুলতান ও ইংল্যান্ডের লর্ড পামারস্টোন এর বিরোধিতা করেন, কিন্তু দে লেসেপস এগিয়ে যান, নিজের কোম্পানি গড়ে তোলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও অটোমান সাম্রাজ্যের কাছে শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেয়ার গৃহীত না হলে পাশা প্রকল্পে নিজের বিনিয়োগের বাইরে এই অর্থ মঞ্জুর করেন। ১৮৫৯ সালের এপ্রিলে শুরু হয় কাজ।

শেষ পর্যন্ত মিশরকেই দুশোমাইল ভূখণ্ড জমিন বিনা মূল্যে তুলে দেওয়া ছাড়াও প্রায় সমস্ত টাকা, শ্রম আর কাঁচামালও যোগাতে হয়েছে। ১৮৬৩ সালে সাঈদ মারা গেলে ভাস্তে ইসমায়েল (১৮৩০-৯৫) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি খালের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু মিশরের পক্ষে আরও ভালো কিছু পাওয়ার আশায় কনসেশনকে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের শালিসের অধীনে নিয়ে যান। ১৮৬৪ সালে কোম্পানির বিনামূল্যে মিশরিয় শ্রমিক পাওয়ার অধিকার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়,

AMARBOI.COM

কিছু পরিমাণ এলাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মিশরিয় সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৮৪ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক (তিন মিলিয়নেরও বেশি পাউন্ড) ইনডেমনিটি পাওয়ার অধিকারী হয় কোম্পানি। মহা উদ্বোধন ছিল চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠান। মিশরে বিনামূল্যে আগমন ও থাকবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল অতিথিদের; ভার্দি'র *আইদা* অপেরা নতুন কায়রো অপেরা হাউজের জন্যে উদ্বোধন করা হয়। অতিথিদের পিরামিডের কাছে নিতে বিশেষ পথ নির্মাণ করা হয়।[৪৮] এই ব্যয়বহুল প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল মিশরের সমৃদ্ধি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস উৎপাদন করে আরও বিনিয়োগ উৎসাহিত করা। অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে মিশর তখন দেউলিয়া অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়।

খাল নিশ্চিতভাবেই মিশরের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু কেবল এটাই দায়ী ছিল না। আরও একবার ইসমায়েলের কর্মজীবন অ-পশ্চিমা দেশে আধুনিকায়নের বিপুল ব্যয় তুলে ধরে। ইসমায়েল চেয়েছিলেন স্বনির্ভরতা; মিশরকে অটোমান আধিপত্য থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। স্বায়ত্তশাসনের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর, কিন্তু অর্জন করেছিলেন কেবল পঙ্গুত্ব বয়ে আনা নির্ভরতা ও শেষ পর্যন্ত ইউরোপিয় শক্তির দখলদারি। মুহাম্মদ আলি সৈনিক ছিলেন, যুদ্ধ করে মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন। ইসমায়েল মুক্তি কিনে নিতে চেয়েছেন। ৮ই জুন, ১৮৬৭ নিজেকে অন্যান্য অটোমান পাশা থেকে ভিন্ন করে তুলতে সুলতানের কাছ থেকে পার্সি উপাধি *খেদিভ* ('মহান রাজপুত্র') কিনে নেন তিনি। এই সুবিধার জন্যে ইস্তাম্বুলকে মিটিয়েছিলেন বার্ষিক চাঁদা হিসাবে অতিরিক্ত ৩৫০,০০০ পাউন্ড।[৪৯] খাল নির্মাণের ব্যয় নিয়েও যুঝতে হয়েছে তাঁকে, আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময় আকাশছোঁয়া তুলার আকস্মিক মূল্য হ্রাস মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং নিজের উচ্চাভিলাষী আধুনিকায়ন প্রকল্পসমূহের তহবিলের সংস্থান করতে হয়েছে। এ সবের মধ্যে ছিল ৯০০ মাইল রেলপথ নির্মাণ, ৪৩০টি সেতু ও ১১২টি খাল, প্রায় ১,৩৭৩,০০০ একর এযাৎ পতিত জমিতে সেঁচ সুবিধা সৃষ্টি করেছিল।[৫০] খেদিভের অধীনে মিশর আগের শাসকের চেয়ে ঢের দ্রুত অগ্রসর হয়: উভয় লিঙ্গের জন্যে শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ভূতাত্ত্বিক খননের পরিকল্পনা ছিল তাঁর। অনুপ্রেরণাদায়ী নতুন নতুন দালানকোঠা, প্রশস্ত ব্যুলেভার্দ ও প্রমোদ উদ্যান নিয়ে কায়রো পরিণত হয়েছিল আধুনিক নগরে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইসমায়েল এসব কোনও কিছুর জন্যে পয়সা মেটাতে পারেননি। অর্থ যোগাড়ের জন্যে সহজ ঋণের এক ব্যবস্থা চালু করে বিপুল পরিমাণ অর্থ ধার করেন তিনি, এই অর্থের বেশ উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ইউরোপিয় ব্রোকার, ব্যাংকার ও উদ্যোক্তাদের পকেট ভারি করেছে; আরও অর্থ ব্যয় করার জন্যে এরা তাঁকে তোষামোদ করেছে।

AMARBOI.COM

অর্থলগ্নীকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন খেদিভ। ১৮৭৫ সালে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে অটোমান সিকিউরিটিজের দর পতনের সাথে সাথে মিশরিয় সিকিউরিটিজেও ধস নামে; এটাই ছিল শেষ কুটো।

স্যুয়েয খাল মিশরকে সম্পূর্ণ নতুন কৌশলগত গুরুত্ব এনে দিয়েছিল, ইউরোপিয় শক্তিগুলো এর সম্পূর্ণ ধ্বংস চায়নি। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স খেদিভের উপর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, এই নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক হয়ে ওঠার হুমকি সৃষ্টি করেছিল। মুহাম্মদ আলি ঠিকই আশঙ্কা করেছিলেন যে, এই খাল মিশরিয় স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলবে। মিশরিয় সরকারের অর্থিক লেনদেনের তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে ইউরোপিয় মন্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে ইসমায়েল তাদের বরখাস্ত করলে ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলো–ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া–তাঁর বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে খেদিভকে বরখাস্ত করার জন্যে সুলতানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইসমায়েলের স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ছেলে সহৃদয় তরুণ তৌফিক (১৮৫২–৯২), কিন্তু এটা পরিষ্কার যে তিনি ছিলেন ক্ষমতার পুতুল মাত্র। ফলে জনগণ ও সেনাবাহিনী উভয়ের কাছেই অজনপ্রিয় ছিলেন তিনি। মিশরিয় অফিসার আহমেদ বে উরুবি (১৮৪০–১৯১১) সেনাবাহিনী ও সরকারে মিশরিয়দের আরও সিনিয়র পদে নিয়োগের দাবি নিয়ে ১৮৮১ সালে অভ্যুত্থান সংঘটিত করে দেশের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আয়ত্তে নিতে সমর্থ হলে ব্রিটেন হস্তক্ষেপ করে সামরিক দখলাদারিত্বের শুরু করে। মিশরকে ইউরোপের অংশে পরিণত করতে চেয়েছিলেন ইসমাইল, কিন্তু কার্যত একে তিনি ইউরোপিয় কলোনিতে পরিণত করেন।

মুহাম্মদ আলি ছিলেন নিষ্ঠুর ও নিদারুণ হৃদয়হীন; তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন আনাড়ী, লোভী ও ক্ষীণদৃষ্টির। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে বলতে গেলে অপরিমেয় বাধার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। প্রথমত, তাঁরা যে ধরনের সভ্যতাকে অনুকরণ করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন সেটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন কিছু। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, ইউরোপ সম্পর্কে সীমিত অভিজ্ঞতার জোরে এই মানুষগুলো এটা বুঝতে দেরি করে ফেলেছিলেন যে সামান্য সামরিক ও প্রযুক্তিগত সংস্কার তাঁদের একটা 'আধুনিক' জাতিতে পরিণত করার জন্যে যথেষ্ট হবে না। গোটা সমাজকেই নতুন করে সংগঠিত করে তোলা, শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন শিল্পায়িত অর্থনীতি, ও প্রচলিত রক্ষণশীল চেতনাকে নতুন মানসিকতা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার দরকার ছিল। ব্যর্থতা ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়াবে, কারণ ইউরোপ ততদিনে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই শক্তি মিশরকে স্যুয়েয খাল খনন করার জন্যে চাপ দিতে পেরেছে, কিন্তু এর মালিকানার একটা ভাগ পর্যন্ত দিতে অস্বীকার

AMARBOI.COM

করেছে। তথাকথিত সেই 'পূর্বাঞ্চলীয় সংকট' (১৮৭৫-৭৮) ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছিল যে, ইউরোপের অন্যতম পরাশক্তি (রাশিয়া) অটোমান এলাকার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারে, কেবল ইউরোপিয় দেশগুলোর তরফ থেকে হুমকি থেকেই তাদের প্রতিহত করা সম্ভব, খোদ তুর্কিদের মাধ্যমে নয়। এমনকি মুসলিম শক্তির শেষ শক্তঘাঁটি অটোমান সাম্রাজ্যও নিজ প্রদেশগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারছিল না। ১৮৮১ সালে এই ব্যাপারটা বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ফ্রান্স তিউনিস দখল করে নেয় ও ১৮৮২ সালে ব্রিটেন দখল করে বসে মিশর। ইউরোপ ইসলামি বিশ্বে আগ্রাসন চালিয়ে সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলছিল।

এছাড়া, মিশরিয় নেতাদের বিপর্যয়কর সিদ্ধান্ত বাদ দিলেও, এই দুর্বল ইসলামি দেশগুলো ইউরোপিয় বা আমেরিকানদের মতো আধুনিক হয়ে উঠতে পারত না, কারণ এইসব অ-পশ্চিমা দেশের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া মৌলিকভাবে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ১৮৪৩ সালে ফরাসি লেখক জেরার্দ দে নেরবাল কায়রো সফর করেন, তিনি পরিহাসের সাথে উল্লেখ করেন যে, ফরাসি বুর্জোয়া মূল্যবোধ ইসলামি শহরগুলোতে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুহাম্মদ আলি নতুন প্রাসাদগুলো নির্মিত হয়েছিল ব্যারাকের কায়দায়, মেহগনি আর্মচেয়ার ও পাশার ছেলেদের সামরিক পোশাক পরা তেলচিত্র দিয়ে সাজানা হয়েছিল। নেরবালের কল্পনার বিচিত্র, প্রাচ্যীয় কায়রো

> ধুলো আর ছাইয়ের নিচে পড়ে আছে; আধুনিক চেতনা ও এর চাহিদা আজরাইলের মতো একে মাড়িয়ে গেছে। দশ বছরের ভেতর ইউরোপিয় পথঘাট ধূলিমলিন জীর্ণ পুরাতন শহরকে সমকোণে কেটে ফেলবে...চকচকে আর বিস্তৃত হয়েছে কেবল ফ্রাংকদের আবাসস্থল, ইংরেজ, মেল্টিজ আর ফরাসিদের মতোই শহর।[৫১]

মুহাম্মদ আলি ও ইসমাইল কর্তৃক নির্মিত নতুন কায়রোর দালানকোঠা স্থাপত্য আধিপত্য তুলে ধরেছে। ব্রিটিশ দখলদারির সময় এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে, কায়রোর বিভিন্ন অংশে নির্মিত দূতাবাস, ব্যাংক, ভিলা ও সৌধগুলো মধ্যপ্রাচ্যীয় এই দেশটিতে ইউরোপিয় বিনিয়োগের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, কৌশল, কাল ও কর্মকাণ্ডের এক বিচিত্র মিশ্রণ প্রকাশ করেছে সেগুলো, ইউরোপে যাকে সামঞ্জস্যহীন মনে করা হত। কারণ, ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক মাইকেল জাইলসনান উল্লেখ করেছেন, কায়রো 'ইউরোপ পুঁজিবাদে অগ্রসর হওয়ার সময় যে পথ পেরিয়ে এসেছে, উন্নয়নের পর্যায়ক্রমের এক রৈখিক পর্যায়ক্রমিক সেই পথ অতিক্রম করছে *না*।'

AMARBOI.COM

এটা শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে না, নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রথা থেকে আধুনিকতাতেও উত্তরণ ঘটছে না বা নতুন শহুরে সামঞ্জস্যতাও অর্জন করছে না:

> বরং একে নির্ভরশীল স্থানীয় মেট্রোপলিসে পরিণত করা হচ্ছে যার মাধ্যমে একটি সমাজকে শাসন ও তার উপর আধিপত্য বিস্তার করা যেতে পারে। স্থানিক ধরন শক্তি ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে বেড়ে উঠেছে, এইক্ষেত্রে ব্রিটেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৫২]

আধুনিকায়নের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা মধ্যপ্রাচ্যে গুরুত্বপূর্ণভাবে ভিন্ন ছিল: এটা ইউরোপের মতো ক্ষমতায়ন, স্বয়ত্তশাসন ও উদ্ভাবনের ব্যাপার ছিল না, বরং বঞ্চনা, নির্ভরতা ও জোড়াতালি দেওয়া অসম্পূর্ণ অনুকরণ। এই প্রক্রিয়ায় জড়িত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতারও অভিজ্ঞতা ছিল এটা। কায়রোর মতো মুহাম্মদ আলির কোনও 'আধুনিক শহর' মিশরের অন্যান্য স্থানীয় শহরের নির্মাণের পেছনে ক্রিয়াশীল নীতিমালার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গড়ে তোলা হয়েছিল। জাইলসনান যেমন উল্লেখ করেছেন, পর্যটক, উপনিবেশবাসী ও পরিব্রাজকরা প্রায়শঃই প্রাচ্যীয় শহরগুলোকে বিভ্রান্তিকর এমনকি ভীতিকর বলেও আবিষ্কার করে থাকে: মনে হয় নামহীন, নম্বরহীন সব পথঘাট আর আঁকাবাঁকা গলিঘুঁচির যেন কোনও শৃঙ্খলা বা দিশা নেই। পশ্চিমারা এখানে হারিয়ে যায়, নিজেদের চারপাশের পরিবেশের কোনও অর্থ করে উঠতে পারে না। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বেশিরভাগ মানুষের কাছে নতুন পাশ্চাত্যকৃত শহরগুলো সমান মাত্রায় বোধের অতীত ছিল, এর সাথে একটা শহর কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে *তাদের* সহজাত অনুভূতির কোনওই মিল ছিল না। নিজের দেশেই ঘন ঘন দিশা হারিয়ে ফেলত ওরা। এইসব 'সুপারইম্পোজড' পাশ্চাত্যকৃত শহরের অনেকগুলোকেই ঘিরে ছিল 'পুরোনো শহর', তুলনামূলকভাবে যেগুলোকে অন্ধকার, ভীতিকর ও আধুনিক বিশ্বের যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত শহরের বাইরের কিছু মনে হত।[৫৩] মিশরিয়রা এভাবে দ্বৈত বিশ্বে বাস করতে বাধ্য হয়েছিল: একটি আধুনিক ও পশ্চিমা, অপরটি প্রথাগত। এই দ্বৈততা এক বড় ধরনের পরিচয় সঙ্কটের দিকে নিয়ে যাবে তাদের এবং আধুনিকতার অন্যান্য অভিজ্ঞতার মতো কিছু বিস্ময়কর ধর্মীয় সমাধানের পথে চালিত করবে।

ইরান তখনও আধুনিকায়নের পথে পা রাখেনি, যদিও মধ্যপ্রাচ্যে নেপোলিয়নের আবির্ভাব এই দেশেও আধিপত্যবাদের এক যুগের সূচনা ঘটাচ্ছিল। রাশিয়ার সম্রাটের সহায়তায় ব্রিটিশ-ভারতে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন

AMARBOI.COM

নেপোলিয়ন; এতে ইউরোপিয় শক্তিগুলোর কাছে ইরানের অবস্থান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৮০১ সালে ইরানি সমর্থনের বিনিময়ে সামরিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি যোগানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজার শাহ ফাতহ্ আলির (১৭৯৮-১৯৩৪) সাথে চুক্তি সম্পাদন করে ব্রিটেন। ইউরোপের শক্তির খেলায় ইরানও ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছিল, নেপোলিয়নের পতনের অনেক পরেও যা অব্যাহত ছিল। ভারতকে রক্ষা করতে পার্সিয়ান গাল্ফ ও ইরানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে ব্রিটেন, এদিকে উত্তরে ঘাঁটি গড়ার চেষ্টা করছিল রাশিয়া। এদের কেউই ইরানকে উপনিবেশে পরিণত করতে চায়নি, উভয়ই ইরানি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে কাজ করে গেছে, কিন্তু বাস্তবে শাহগণ দুটো শক্তির কোনওটিকেই ঘাঁটানোর সাহস করে উঠতে পারেননি-কোনও একটির সমর্থন ছাড়া। ইউরোপিয়রা নিজেদের ইরানের কাছে প্রগতি ও সভ্যতার পতাকাবাহী হিসাবে তুলে ধরেছে, কিন্তু আসলে ব্রিটেন ও রাশিয়া কেবল সেইসব উন্নয়নকেই সমর্থন দিয়েছে যেগুলো দিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা হয়েছে; উভয়ই ইরানি জনগণের উপকারে আসার মতো উদ্ভাবনে, যেমন, রেলওয়ে, বাধা দিয়েছে, যদি না আবার তাদের নিজেদের কৌশলগত পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।[৫৪]

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আযেরবাইজানের গভর্নর জেনারেল যুবরাজ আব্বাস একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর প্রয়োজন বুঝতে পেরেছিলেন। প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্যে তরুণদের ইউরোপে পাঠান তিনি। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের আগেই ১৮৩৩ সালে তিনি মারা যান। এরপর কাজার শাহরা কেবল আধুনিকায়নের বিক্ষিপ্ত প্রয়াসই পেয়েছেন। শাহরা ছিলেন দুর্বল, ব্রিটেন ও রাশিয়ার কাছে এতটাই কাবু যে নিজস্ব সেনাবাহিনীর কোনও প্রয়োজনই বোধ করেননি: ইউরোপিয়রা জরুরি প্রয়োজনে সব সময়ই তাদের রক্ষা করবে। মুহাম্মদ আলিকে তাড়া করা জরুরি তাগিদের বোধটুকু ছিল না। তবে ন্যায়ের খাতিরে এও বলা দরকার যে, মিশরের চেয়ে ইরানে আধুনিকতা অর্জন ঢের বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া বিশাল দূরত্ব ও ইরানের বন্ধুর প্রান্তর এবং সেই সাথে অঞ্চলের যাযাবর গোত্রগুলোর স্বাধীনচেতা শক্তি কেন্দ্রিয়করণকে যারপরনাই কঠিন করে তুলবে।[৫৫]

বলা চলে ইরান পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জিনিসের মালিক ছিল। হীনকর নির্ভরতা ছিল, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ও উপনিবেশবাদের কোনও সুবিধাই ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে রাশিয়া ও ব্রিটেন ইরানে 'ক্যাপিটুলেশন' প্রতিষ্ঠা করে, এতে অটোমান সুলতানদের সার্বভৌমত্ব খাট হয়েছিল। ক্যাপিটুলেশন ইরানের মাটিতে রাশিয়া ও ইউরোপিয় বণিকদের বিশেষ সুবিধা এনে দিয়েছিল,

WWW.AMARBOI.COM

তাদের দেশের আইন থেকে অব্যহতি দিয়েছে এবং পণ্যের জন্যে ট্যারিফ ছাড় দেওয়া হয়েছে। দারুণ বিরোধিতার মুখে পড়েছিল এটা। এর ফলে ইউরোপিয়দের পক্ষে ইরানি ভূখণ্ডে পা রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে, এদের মামলা পরিচালনাকারী কনসুলার আদালতগুলো প্রায়শঃই মারাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রেও শিথিল মনোভাব দেখাত এবং অপরাধীরা কার্যত বিনা শাস্তিতে পার পেত। ক্যাপিটুলেশন স্থানীয় শিল্পের পক্ষেও ক্ষতিকর ছিল, কারণ পাশ্চাত্য উৎপাদিত কমদামী পণ্য ইরানি কুটিরশিল্পকে প্রতিস্থাপিত করছিল। পাশ্চাত্যের সাথে বাণিজ্যে কোনও কোনও পণ্য অবশ্য লাভবান হয়েছে: তুলা, আফিম ও কার্পেট রপ্তানি করা হয়েছে ইউরোপে। কিন্তু ইউরোপিয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশ থেকে রোগাক্রান্ত রোমশ পোকা আমদানি করার ফলে সিল্ক শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। ইরানের মুদ্রা গঠনকারী রূপার আন্তর্জাতিক মূল্যে নাটকীয় দর পতন ঘটে; বিভিন্ন শক্তি বিশেষ কর্মকাণ্ডের জন্যে ছাড় দাবি করতে শুরু করায় ১৮৫০-র দশকে ইউরোপিয় অর্থনৈতিক প্রভাব ইরানে প্রবল হয়ে ওঠে। ১৮৫০-র দশকের শেষ দিকে ইংল্যান্ড ও ভারতের যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার ইরানে টেলিগ্রাফ লাইনের জন্যে কনসেশন লাভ করে। ১৮৪৭ সালে ব্রিটিশ প্রজা ব্যারন জুলিয়াস দে রয়টার (১৮১৬–৯৯) ইরানে রেলওয়ে ও স্ট্রিটকার নির্মাণ, সব ধরনের খনিজ অনুসন্ধান, সব নতুন সেঁচ কর্ম, একটি জাতীয় ব্যাংক ও বিভিন্ন শিল্পপ্রকল্পের একক অধিকার লাভ করেন। প্রধানমন্ত্রী মির্জা হোসেন খান ছিলেন এই কনসেশনের হোতা, তিনি সংস্কারের পক্ষে থাকলেও সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, শাহগণ এতটাই অযোগ্য যে, ব্রিটিশদের হাতে আধুনিকায়নের দায়িত্ব তুলে দেওয়াই ভালো। হিসাবে ভুল হয়েছিল তাঁর। উদ্বিগ্ন অফিসার ও *উলেমাদের* একটি দল শাহ'র স্ত্রীর নেতৃত্বে রয়টারের কনসেশনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ সূচিত করেন, পদত্যাগে বাধ্য হন মির্জা খান। তাসত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রিটেন ও রাশিয়াই ইরান থেকে ওজনদার অর্থনৈতিক কনসেশন আদায় করে নেয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণেও পরিণত হয়েছিল। এই বিদেশী প্রভাবের ক্রম বৃদ্ধি দেখে ভীত হয়ে ওঠা আধুনিকায়নের সুবিধা লাভকারী বণিকগণ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে পড়ে।[৫৬]

উলেমারা সমর্থন দেন তাদের। মিশরের *উলেমাদের* চেয়ে ঢের শক্ত অবস্থানে ছিলেন তাঁরা। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে উসুলি বিজয় *মুজতাহিদদের* হাতে এক শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিয়েছিল; কারণ নীতিগতভাবে এমনকি শাহও তাঁদের ফতোয়া মানতে বাধ্য ছিলেন। কাজারদের হাতে তাঁরা প্রান্তিকায়িত বা কোণঠাসা হয়ে পড়েননি। তাঁদের সমর্থন প্রয়োজন ছিল কাজারদের। *উলেমাদের* নিশ্চিত

AMARBOI.COM

আর্থিক ভিত্তি ছিল, কাজারদের নাগালের বাইরে অটোমান ইরাকের নাজাফ ও কারবালার পবিত্র শহরে ছিল তাদের মূল কেন্দ্র। ইরানে রাজকীয় রাজধানী তেহরান শিয়া শহর কুমের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এখানে এভাবে ধর্ম ও রাজনীতির এক ধরনের কার্যকর বিচ্ছিন্নতা ছিল। মুহাম্মদ আলির বিপরীতে কাজার শাহগণের কোনও আধুনিক সেনাদল ছিল না, ছিল না শিক্ষা, আইন, ও ধর্মীয়ভাবে দান করা সম্পত্তির *(ওয়াকফ)* প্রশাসনে *উলেমাদের* উপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোনও কেন্দ্রিয় আমলাতন্ত্র। এগুলো ছিল *উলেমাদের* হাতে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোয় অবশ্য, শিয়া ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত যাজকগোষ্ঠী রাজনীতি থেকে দূরে সরে ছিল। শেখ মুর্তাদা আনসারি কার্যত একমাত্র ও প্রধান 'অনুকরণের আদর্শ' *(মার্জা-ই-তাকলিদ)*, গোপন ইমামের সহঅধিনায়ক, হিসাবে প্রথম *মুজতাহিদে* স্বীকৃতি লাভের যোগ্যতা অর্জন করার সময় আরও প্রাজ্ঞ প্রার্থীর চেয়ে তাঁকে বেশি যোগ্য মনে করা হয়েছিল, যিনি স্বয়ং স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, তিনি 'সাধারণ মানুষের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন,' উপাসনালয়ের তীর্থযাত্রী ও বণিকদের ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে আইনি পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করছেন। এর নিগূঢ় অর্থ, বিশ্বাসীদের প্রধান বিচারককে পণ্ডিত হতে হবে, কার্মকাণ্ডে জড়িত কেউ নন।[৫]

কিন্তু ইউরোপিয়রা ইরানে আরও ক্ষমতা আয়ত্ত করার সাথে সাথে বণিক ও কুটিরশিল্পের কারিগররা ক্রমবর্ধমানহারে পরামর্শের জন্যে *উলেমাদের* দ্বারস্থ হতে শুরু করেছিল। যাজকগোষ্ঠী ও বাজারের বণিক ও কারিগরগণ–জনপ্রিয়ভাবে *বাজারি* নামে পরিচিত–ছিল স্বাভাবিক মিত্র; প্রায়ই তাদের একই পরিবারের অর্ন্তভুক্ত, একই ধর্মীয় আদর্শের অনুসারী হতে দেখা গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বিদেশী অনুপ্রবেশের আপত্তিতে *উলেমাগণ* বণিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন যোগান। তাঁরা যুক্তি দেখান, শাহগণ বিধর্মীদের হাতে এভাবে অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া অব্যাহত রাখলে ইরান আর ইসলামি রাষ্ট্র থাকবে না।

শাহগণ গণমানুষের ধর্মের দোহাই পেড়ে, বিশেষ করে হুসেইনের শোকমিছিলে সম্পর্কিত হয়ে এইসব আপত্তির জবাব দেওয়ার প্রয়াস পান। তাঁদের নিজস্ব *রাওদা-খান* ছিল, রোজ কারবালা ট্র্যাজিডির মহাকাব্য থেকে আবৃত্তি করত তারা; হুসেইনের মৃত্যু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বার্ষিক আবেগ নাটক আয়োজনের জন্যে তেহরানে রাজকীয় মঞ্চ তেরি করেছিলেন তাঁরা, রাজ প্রাসাদের রাজকীয় দরবারে পবিত্র মহররম মাসে টানা পাঁচ রাত ধরে চলত এই অনুষ্ঠান। হুসেইন ও ইয়াযিদের যুদ্ধের কাহিনী মঞ্চায়িত হত, ইমাম ও তাঁর ছেলের মৃত্যুকে ফুটিয়ে তোলা হত, এবং কারবালা বিপর্যয়ের বার্ষিকী, আশুরার প্রথম দিন রাতে অনুষ্ঠিত হত এক বিশাল

মিছিল, যেখানে শহীদদের প্রতিমা (প্রমাণ আকৃতির উপাসনাগৃহের প্রতিমা ও সন্তানদের সবাইকে নিয়ে সম্পূর্ণ) রাস্তা ধরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত, সাধারণ মানুষ বুক চাপড়ে অনুসরণ করে যেত। গোটা মহররম মাস জুড়ে সমস্ত মসজিদ কালো পর্দায় ঢেকে রাখা হত, পাবলিক স্কয়ারে *রাওদা খানের* জন্যে খুপরি বানানো হত, যারা জোরে বিলাপের সুরে শোকগীতি গেয়ে চলত। এই সময় পর্যন্ত দেশে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক *রাওদা-খানের* জন্ম হয়েছিল প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে যারা পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামত।

কাজারদের অধীনে এই শোকের আচার এক প্রধান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। রাজতন্ত্রকে হুসেইন ও কারবালার সাথে সম্পর্কিত করা এবং এভাবে কাজার শাসনকে বৈধতার রূপ দেওয়া ছাড়াও সাধারণ মানুষকে তাদের হতাশা ও অসন্তোষ প্রকাশ করার একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়ে এক ধরনের সেফটি ভালভের যোগান দিত। সাধারণ মানুষ নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকত না; আবৃত্তি ও অভিনয়ের পুরো সময় জুড়ে নিজেদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিত। এক ফরাসি পর্যটক যেমন উল্লেখ করেছেন, 'গোটা দর্শকগোষ্ঠী অশ্রু ও গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাড়া দেয়।'[৫৮] যুদ্ধের দৃশ্যগুলোর সময় দর্শকরা কান্নাকাটি করে, বুক চাপড়ায়, গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে তাদের। অভিনেতারা টেক্সটের মাধ্যমে তাদের ভীতি ও বিষাদ ফুটিয়ে তোলার সময় দর্শকদের দায়িত্ব ছিল–এখনও আছে–শোকের প্রকাশ্য ও সহিংস প্রকাশ যুগিয়ে নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমাপ্ত করা। তারা যুগপৎ প্রতীকীভাবে কারবালার প্রান্তরে এবং নিজেদের জগতেও অবস্থান করত, আপন বিষাদ ও যন্ত্রণা নিয়ে কাঁদত। আজও, আমেরিকান পণ্ডিত উইলিয়াম ব্যাখ্যা করেছেন, দর্শকদের তাদের পাপ ও নিজস্ব বিপদের কথা ভেবে কান্নার শিক্ষা দেওয়া হয়, হুসেইনের আরও বড় দুঃখের কথা নিজেদের মনে করিয়ে দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়।[৫৯] এভাবে কারাবালার কাহিনীর সাথে নিজেদের একাত্ম করে তুলতে পারে তারা, এইসব নাটকীয় আচারের ভেতর দিয়ে বর্তমানে পৌঁছে দিয়ে এভাবে ঐতিহাসিক ট্র্যাজিডিকে এক সময়হীন মিথের চরিত্র দান করতে সক্ষম করে তোলে তাদের। অনুতাপকারীরা হুসেইনকে ত্যাগ করে যাওয়া ও সেকারণে প্রায়শ্চিত্ত করা কুফার জনগণকে তুলে ধরেছে এবং তবে সেইসব মুসলিমের পক্ষেও দাঁড়িয়েছে তারা যারা একটি ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ গঠনে ইমামদের সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছে। শিয়ারা হুসেইনের জন্যে কাঁদে এবং তাঁর উদ্দেশে প্রতীকী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করে, কারণ বাস্তব জীবনে তিনি সেই সম্মান পাননি, তাঁর আদর্শ কোনওদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। আজও ইরানিরা বলে যে, মুহররমের সময় তারা বন্ধু ও পরিবারের কষ্টের কথাও মনে করে। কিন্তু এইসব ব্যক্তিগত স্মৃতি

AMARBOI.COM

তাদের অশুভের সমস্যার আবেগময় উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়: *কেন* ভালো মানুষগুলো কষ্ট পায়, আর দুষ্টরা টিকে থাকে? গুঙিয়ে কপাল চাপড়ে প্রবলভাবে কান্নার সময় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মাঝে ন্যায়বিচারের জন্যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে, যা কিনা শিয়া ধার্মিকতার মূল।[১০] শোকগীতি ও আবেগ ওদের পৃথিবীর বুকে অব্যাহত প্রতিটি অশুভের কথা মনে করিয়ে দিতে সাহায্য করে এবং ভালোর চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত করে।

এই জনপ্রিয় বিশ্বাস স্পষ্টতই *মুজতাহিদ*দের আইনি , যৌক্তিক শিয়া মতবাদ থেকে খুবই ভিন্ন ছিল। এর অবশ্যই এক বিপ্লবী সম্ভাবনা ছিল। এটা সমাজে অশুভের উপস্থিতি ও বর্তমান এবং ইয়াযিদের ভেতর একটা মিলের দিকে সহজেই ইঙ্গিত করতে পারত–করবেও। কাজারদের আমলে, সাফাভিয়দের অধীনে থাকার মতো অবশ্য এই বিদ্রোহী মোটিফকে প্রতিহত করা হয় এবং হুসেইনের ভোগান্তির প্রতিই এখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, সাধারণ মানুষের পাপের বিকল্প উৎসর্গ হিসাবে দেখা হত একে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণ মানুষ *তাজিয়াহ*র মাধ্যমে বিদ্রোহ করেনি; বরং অনেকেই দুটি জনপ্রিয় মেসিয়ানিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল।

এগুলোর প্রথমটির নেতৃত্বে ছিলেন এক কাজার যুবরাজ ও ফাতহ আলি শাহর চাচাত ভাই ও পালক পুত্র হাজ্জ মুহাম্মদ করিম খান কিরমানি (১৮১০–৭১); উত্তাল প্রদেশ কিরমানের গভর্নর ছিলেন তাঁর পিতা। এখানে করিম খান কারবালার শায়খ আহমাদ আল-আশাই (১৭৫৩–১৮২৬) প্রতিষ্ঠিত এক রেডিক্যাল অতীন্দ্রিয় আন্দোলন শায়খি গোত্রের সাথে জড়িয়ে পড়েন। মোল্লা সদ্রার অতীন্দ্রিয়বাদ ও ইস্ফাহানের মতবাদে গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন তিনি, উসুলি মোল্লাহরা যাকে দমন করতে চেয়েছিলেন। আশাই ও তাঁর শিষ্য সাঈদ কাযিম রাশতি (১৭৫৯–১৮৪৩) শিক্ষা দিয়েছেন যে, পয়গম্বর ও ইমামগণ নিখুঁতভাবে ঐশী ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে গেছেন; তাঁদের জীবন ও উদাহরণ ক্রমশঃ গোটা মানবজাতিকে এক সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গোপন ইমাম এই জগতে আত্মগোপন করে নেই; তিনি খাঁটি আদর্শ জগতে *(আলম আল-মিথাল)* মিশে গেছেন; সেখান থেকে তিনি অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করার কৌশল জানেন এমন একজন পার্থিব প্রতিনিধির মাধ্যমে মানবজাতিকে পথ নির্দেশ দিয়ে এমন এক জায়গার দিকে পরিচালিত করছেন যেখানে তাদের আর শরীয়ার বিধান প্রয়োজন হবে না; তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আত্মস্থ্ করবে ও সরাসরি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবে; কতগুলো বাহ্যিক আইনের বিন্যাস আর অনুসরণ করতে হবে না। এটা অবশ্যই *মুজতাহিদ*দের পক্ষে ঘৃণিত ব্যাপার ছিল। আশাই শিক্ষা দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে

AMARBOI.COM

একটি 'সম্পূর্ণ শিয়া' মতবাদের অনুসারী দল সব সময়ই ছিলেন, ভ্রান্তিহীন বিরল একটি গোষ্ঠী যারা ধ্যানের স্বজ্ঞামূলক অনুশীলনের মাধ্যমে গোপন ইমামের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা রাখেন। এর নিগূঢ়ার্থ ছিল এই যে, *মুজতাহিদ*দের বিশ্বাস অসম্পূর্ণ, আইনি ও আক্ষরিক ছিল। নিশ্চিতভাবেই আশাই ও তাঁর শিষ্যদের অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টির তুলনায় হীন ছিল এটা।[৬১]

শায়খি মতবাদ, এনামেই ডাকা হত একে, ইরাক ও আযেরবাইযানে খুবই জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক কর্মসূচির বদলে বরং তা দর্শন বা ধারণাই রয়ে যায়। রাশতির পরলোকগমনের পর শায়খি নেতায় পরিণত করিম খানই একে *মুজতাহিদ*দের বিরুদ্ধে বিপ্লবে পরিণত করেন। প্রকাশ্যে তাদের সংকীর্ণ আইনি মতবাদ, কল্পনাশক্তি রহিত অক্ষরবাদ ও নতুন ধারণার প্রতি আগ্রহের ঘাটতি প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। মুসলিমদের অবশ্যই এটা ভাবলে চলবে না যে, *তাকলিদ*ই–জুরিস্টদের অনুকরণ–তাদের একমাত্র দায়িত্ব। যেকেউই ঐশীগ্রন্থ ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখে। *মুজতাহিদ*রা স্রেফ প্রাচীন সত্যি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। কিন্তু দুনিয়ার দরকার সম্পূর্ণ নতুন কিছু। মানবজাতি অব্যাহতভাবে বদলে যাচ্ছে, বিবর্তিত হচ্ছে। তাই প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর পূর্ববর্তীকে অতিক্রম করে গেছেন। প্রত্যেক প্রজন্মে 'সম্পূর্ণ শিয়া মতবাদ' কোরানের আরও বেশি নিগূঢ় তথ্য উন্মোচন করে আসছে, এক চলমান প্রত্যাদেশের মাধ্যমে গোপন গভীরতা তুলে আনছে। বিশ্বাসীকে অবশ্যই ইমাম কর্তৃক নিয়োজিত, যাঁদের কর্তৃত্ব *মুজতাহিদ*রা দখল করে নিয়েছেন, এইসব অতীন্দ্রিয় গুরুর কথা শুনতে হবে।

করিম খান বিশ্বাস করেছিলেন যে, চলমান এই প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণতা লাভ করতে যাচ্ছে। অচিরেই মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণতা অর্জন করবে। তিনি ইউরোপিয়দের ইরানে নিয়ে আসা পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিচ্ছিলেন। করিম খান গণতন্ত্রী ছিলেন না; প্রাক আধুনিক অন্যান্য দার্শনিকের মতোই তিনি ছিলেন অভিজাত গোষ্ঠীর ও চরমবাদী; *মুজতাহিদ*দের সাথে মতানৈক্যের কারণে অধৈর্য হয়ে জনগণের উপর নিজস্ব মতবাদ চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। তাসত্ত্বেও তিনি ছিলেন প্রথম সারির ইরানি যাজক যাঁরা ইউরোপের নতুন ধারণার সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। অর্থডক্স *উলেমা*রা যেখানে কেবল বিট্রিশ ও রাশিয়ার বাণিজ্যিক দখলদারির বিরোধিতা করে গেছেন, করিম খান পাশ্চাত্যের নতুন বিজ্ঞান ও সেক্যুলারিজমের ব্যাপারে আরও বেশি করে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার মতো যথেষ্ট দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। অবসর সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান, অপটিক্স, রসায়ন ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করতেন তিনি, বিজ্ঞান সম্পর্কে নিজের বিদ্যা নিয়ে গর্ব ছিল তাঁর। ১৮৫০ ও ১৮৬০-র দশকে ইরানের খুবই অল্প সংখ্যক লোকের যেখানে ইউরোপ

সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, করিম খান সেখানে আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ইরানি সভ্যতার পক্ষে বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিতে চলেছে। এটা ছিল পরিবর্তনের সময়, তিনি বুঝতে পারছিলেন, এই নজীরবিহীন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্যে নতুন সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে। এই কারণেই নতুন কিছুর সম্ভাবনা সৃষ্টি করা তাঁর বিপ্লবী তত্ত্ব, এবং আসন্ন রেডিক্যাল পরিবর্তনের ব্যাপারে তাঁর স্বজ্ঞামূলক প্রত্যাশা।

তবে জ্ঞান সম্পর্কে অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শায়খি আন্দোলন প্রাচীন বিশ্বে প্রোথিত ছিল। শিল্পোন্নত পশ্চিমের প্রভাব অনুভব করে আত্মরক্ষামূলকও ছিল। করিম খান সংস্কারবাদী মন্ত্রী আমির কবির প্রতিষ্ঠিত তেহরানের প্রথম ফ্রি হাই স্কুল নতুন দার আল-ফানুনু-এর প্রবল বিরোধী ছিলেন। মূলত ইউরোপিয় কর্মকর্তাদের দিয়ে পরিচালিত স্কুলটিতে দোভাষীদের সহায়তায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, বিদেশী ভাষা,ও আধুনিকযুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেওয়া হত। এই স্কুলকে ইউরোপিয় প্রভাব বৃদ্ধি ও ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের অংশ ভেবেছেন করিম খান। অচিরেই *উলেমাদের* স্তব্ধ করে দেওয়া হবে, যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি, মুসলিম সন্তানদের ক্রিশ্চান স্কুলে পড়াশোনা করানো হবে, ফলে ইরানিরা পরিণত হবে মেকি ইউরোপিয়তে। সামনে অপেক্ষমান বিচ্ছিন্নতা ও উন্মূলতার বিপদ টের পেয়েছিলেন তিনি। ক্রমবর্ধমান ইউরোপিয় দখলদারিত্বের মুখে তাঁর অবস্থান ছিল প্রত্যাখ্যানবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী। তাঁর অতীন্দ্রিয় আদর্শকে সম্পূর্ণ নতুন সমাধানের প্রতি ইরানিদের চোখ খুলে দেওয়ার প্রয়াস হিসাবে দেখা যেতে পারে, কিন্তু ভালো বা খারাপ যাই হোক, ইরানে পাশ্চাত্য উপস্থিতি ছিল জীবনেরই অংশ, একে জায়গা করে দিতে ব্যর্থ কোনও সংস্কার আন্দোলনের পক্ষেই সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। গুঞ্জন ছিল যে করিম খান নিজস্ব স্বর্গীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন; তাঁকে দরবারে তলব করা হয় ও আঠার মাস নজরদারীতে রাখা হয়। ১৯৫০ ও ১৮৬০-র দশকে তিনি আস্তে আস্তে প্রকাশ্য জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন, নিজের মতামত একান্তেই রাখতেন, এবং পরাস্ত, তিক্ত মনে নিজের জমিদারিতেই মারা যান।[৬২]

এই সময়ের দ্বিতীয় মেসিয়ানিক আন্দোলনটিও রক্ষণশীল চেতানায় প্রোথিত ছিল, তবে কিছু পাশ্চাত্য মূল্যবোধের বেলায় তা ছিল উন্মুক্ত। এর প্রতিষ্ঠাতা সায়ীদ আলি মুহাম্মদ (১৮১৯–৫০) নাজাফ ও কারাবালায় শায়খি আন্দোলনে জড়িত ছিলেন, কিন্তু ১৮৪৪ সালে নিজেকে গোপন ইমামের অকাল্টেশনে থাকার সময় *উলেমাদের* বন্ধ ঘোষণা করা ঐশী 'দ্বার' *(বাব)* ঘোষণা করে বসেন।[৬৩] ইস্ফাহানের *উলেমা*, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের নিজের আন্দোলনে আকৃষ্ট করেন তিনি। কারবালায় তাঁর মেধাবী নারী শিষ্যা কুররাত আল-আইন (১৮১৪–৫২)

AMARBOI.COM

বিশাল জনতাকে আকৃষ্ট করেছিলেন; তাঁর প্রধান পুরুষ শিষ্য মোল্লা সাদিক (মুকাদ্দাস নামে পরিচিত) ও কুদ্দুস উপাধী প্রাপ্ত মির্যা মুহাম্মদ আলি বারফুরুশি (মৃ. ১৮৪৯) বলা চলে এক নতুন ধর্মের প্রচার করেছিলেন: বাব-এর নাম সব প্রার্থনায় উল্লেখ করা হচ্ছিল, উপাসকদের শিরাযে তাঁর আবাসের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে বছর বাব মক্কায় হাজ্জ পালন করতে গেলে কাবাহর পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে গোপন ইমামের অবতার ঘোষণা করেন তিনি। পনের মাস পরে জোসেফ স্মিথের মতো এক নতুন অনুপ্রাণিত ঐশীগ্রন্থ বায়ান হাজির করেন। প্রাচীন সমস্ত পবিত্র কিতাব রদ হয়ে গেছে। তিনিই যুগের সম্পূর্ণ পুরুষ, অতীতের সমস্ত মহান পয়গম্বরকে নিজের মাঝে ধারণ করছেন। মানবজাতি এখন সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে, প্রাচীন বিশ্বাসসমূহ আর কাজে আসবে না। বুক অভ মরমনের মতো বায়ান এক নতুন ও অধিকতর ন্যায়বিচার ভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থার আহ্বান জানিয়েছে, আধুনিকতার বুর্জোয়া মূল্যবোধের পক্ষে অনুমোদন দান করেছে: উৎপাদনশীল কাজের প্রতি জোরাল মূল্য আরোপ করেছে, মুক্ত বাণিজ্যের আহ্বান জানিয়েছে, কর হার হ্রাসের আহ্বান করেছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিশ্চয়তা চেয়েছে ও নারীর অবস্থার উন্নয়নের কথা বলেছে। সবার উপরে বাব উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বাস—এটিই আমাদের একমাত্র জগৎ—এই ধারণাকে মূর্ত করেছেন। শিয়ারা সাধারণত অতীতের ট্র্যাজিডি ও মেসিয়ানিক ভবিষ্যতের প্রতি জোর দিয়ে থাকে, বাব বর্তমানের উপর জোর দিয়েছেন। শেষবিচার বলে কিছু নেই, পরকাল নেই। এই জগতেই স্বর্গ খুঁজে পাওয়া যাবে। নিষ্ক্রিয়ভাবে নিস্তারের জন্যে অপেক্ষা করার বদলে বাব ইরানের শিয়াদের বলেছেন পৃথিবীর বুকে উন্নত সমাজ সৃষ্টির জন্যে তাদের অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং নিজেদের জীবনকালেই মুক্তি অর্জন করতে হবে।[৬৪]

বাবি আন্দোলনের অনেকগুলো বিষয় আমাদের শাব্বেতেই যেভির কথা মনে করিয়ে দেয়। শাব্বেতাইয়ের মতোই এক ধরনের মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছিলেন বাব। কর্তৃপক্ষ তাঁকে আটক করার পর এক জায়গা থেকে আরেক গন্তব্যে তাঁর বদলি বিজয় মিছিলে পরিণত হয়েছিল, বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর সাথে মিলিত হতে রাস্তায় নেমে আসত। তাঁর কারাগার পরিণত হয়েছিল তীর্থস্থানে। জেলে বসে কাজার 'ক্ষমতা দখলকারী' মুহাম্মদ শাহর কাছে বীরত্বব্যঞ্জক চিঠি লেখার সময় শিষ্যদের বিশাল সমাবেশকে অভ্যর্থনা জানাতে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। এমনকি কর্তৃপক্ষ তাঁকে উরুমিয়ার বাইরে চিহরিগের প্রত্যন্ত দুর্গে স্থানান্তরের পরেও তাঁর সকল অতিথির স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হয়নি। জনতার ভীড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হত। তিনি গণস্নানাগারে গেলে ভক্তরা তাঁর গোসলের পানি নিয়ে আসত।

১৮৪৮ সালের গ্রীষ্মে অবশেষে তাঁকে তাব্রিযে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো হলে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বিপুল সংখ্যক জনতা ভীড় জমিয়েছিল। বিজয়ীর বেশে আদালতে পা রাখেন তিনি। বিচারের সময় আদালতের বাইরে দাঁড়িয়েছিল বিশাল জনতা, তাদের আশা ছিল শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করে বিচার, উৎপাদনশীলতা ও শান্তির নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটাবেন বাব। কিন্তু ঠিক শাব্বেতাইয়ের মতোই আবির্ভূত হয়েছিল এক অ্যান্টিক্লাইমেক্সের। জেরাকারীদের জয় করতে পারেননি বাব। আসলে যেন নাজেহাল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।[৬৫] জেরাকারীরা আরবী, ধর্মতত্ত্ব ও ফালসাফায় তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করে দেন, নতুন বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাই ছিল না। কেমন করে এই লোকটি ইমাম হতে পারেন, স্বর্গীয় জ্ঞানের *(ইলম)* আধার হতে পারেন? আদালত বাবকে ফের কারাগারে পাঠান, শাসকদের প্রতি তাঁর হুমকি ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারেননি তাঁরা। কারণ এই সময়ের ভেতর বাবি আন্দোলন কেবল নৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কারের সামান্য আহ্বানে সীমাবদ্ধ ছিল না; এক নতুন সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার দাবিতে পরিণত হয়েছিল।

ঠিক শাব্বেতাই যেভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর কাছে আবেদন সৃষ্টি করেছিলেন, বাবও নিজের মেসিয়ানিজমের মাধ্যমে দার্শনিক বা মরমীবাদীভাবে তাঁর অতীন্দ্রিয় ধর্মতত্ত্বের প্রতি ঝুঁকে থাকা আম-জনতা ও সামাজিক মতবাদের সাহায্যে অধিকতর সেক্যুলার মানসিকতার অধিকারীদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। পূর্ববর্তী ইহুদি আন্দোলনের মতো এক ধরনের স্বজ্ঞামূলক বোধ কাজ করছিল যে, প্রাচীন বিশ্ব বিদায় নিতে চলেছে, প্রথাগত পবিত্রতা আর প্রয়োগযোগ্য হবে না। ১৮৪৮ সালের জুলাই মাসে বাবি নেতারা খুরাশানের বুদাশতে এক জনসভার আয়োজন করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে কোরান রদ ঘোষিত হয়, বাব বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃত লাভ না করা পর্যন্ত সাময়িকভাবে শরীয়া কার্যকর থাকার ঘোষণা দেওয়া হয়। আপাতত বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই নিজেদের বিবেকের নির্দেশনা মোতাবেক চলতে হবে, নিজেদেরই শুভ ও অশুভের পার্থক্য চিনতে হবে, *উলেমাদের* উপর নির্ভর করা চলবে না। ইচ্ছা করলে তারা শরীয়ার যে কোনও বিধি-বিধান প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। ক্যারিশম্যাটিক নারী যাজক কুররাত আল-আইন নারীদের অধীন করে রাখার অবসান ও প্রাচীন মুসলিম যুগের অবসান ঘটার প্রতীক হিসাবে পর্দা সরিয়ে ফেলেন। এখন থেকে সমস্ত 'অপবিত্র' বস্তুকে 'পবিত্র' জ্ঞান করতে হবে। সত্য কেবল একবারের জন্যে প্রত্যাদিষ্ট কোনও বিষয় নয়, সময়ের কোনও বিশেষ মুহূর্তে ঈশ্বরের বিধানগুলো নির্বাচিত ব্যক্তির মারফত ধীরে ধীরে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়। স্বয়ং শাব্বেতাইয়ের মতো বাবিরা এক নতুন

ধর্মীয় বহুত্ববাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল: নতুন ব্যবস্থায় অতীতে প্রত্যাদিষ্ট সকল ধর্ম একক ধর্মে মিলে যাবে।[৬৬]

বুদাশতে অংশগ্রহণকারী বহু বাবি এমনি রেডিক্যাল ঘোষণায় রীতিমতো ভীত হয়ে উঠেছিল, সন্ত্রাসে তারা পালিয়েছে। অন্য ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা ধর্মদ্রোহীদের উপর আক্রমণ চালায়, তুমুল হট্টগোলের ভেতর শেষ হয়ে যায় সভা। কিন্তু নেতাদের কাজ শুরু হয়েছিল কেবল। তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে মাযানদেরানে ফিরে আসেন, এখানে বাবি নেতা মোল্লাহ হুসেইন বাশরুই (মৃ. ১৮৪৯) দুইশো লোকের সমাবেশ ঘটিয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন: বাবিদের অবশ্যই তাদের পার্থিব সম্পদ বিসর্জন দিয়ে ইমাম হুসেইনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কেবল শাহাদাৎ বরণের ভেতর দিয়েই তারা নতুন দিনের উদ্বোধন ঘটাতে পারবে, তখন বাব হতদরিদ্রদের উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারবেন, গরীবদের ধনীতে পরিণত করবেন। এক বছরের মধ্যেই বিশ্ব জয় করবেন বাব, সকল ধর্মকে ঐকবদ্ধ করবেন। নিজেকে অসাধারণ অধিনায়ক প্রমাণ করেছিলেন বাশরুই। তাঁর ক্ষুদে বাহিনী রাজকীয় সেনাদলের বিরুদ্ধে এমনভাবে যুদ্ধ করেছিল যে, দরবারের বিবরণে যেমনটা পড়ি আমরা, 'নেকড়ের কবল থেকে পালিয়ে যাওয়া ভেড়ার মতো' দৌড়ে বেঁচেছে তারা। বাবিরা আক্রমণ করেছে, লুটতরাজে মেতেছে, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করেছে। ধর্মীয় ঝোঁকবিশিষ্টরা তাদের এই বিপ্লবকে কারবালার চেয়েও ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছে, অন্যদিকে সম্ভবত অপেক্ষাকৃত বেশি জাগতিক কারণে আন্দোলনে যোগাদানকারী দরিদ্ররা ছিল সবার সেরা নিবেদিত গোষ্ঠী। প্রথমবারের মতো তাদের হিসাবে ধরা হয়েছে ভেবেছে তারা, তাদের সাথে এমন আচরণ করা হয়েছে যেন তারা সমান, সহকর্মীর মূল্য দেওয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত সরকার এই বিদ্রোহকে দমন করে, কিন্তু ১৮৫০ সাল ইয়াযদ, নাইরিয, তেহরানে ও যানজানে নতুন উত্থান প্রত্যক্ষ করে। বাবিরা চরম সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীরা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, ছিল স্থানীয় ছাত্ররাও। এমনকি পুরুষের পোশাক পরা মেয়েরা বীরের মতো লড়েছে। শাসকদের প্রতি অসন্তুষ্ট সবাইকে এক করেছিল এই আন্দোলন। *মুজতাহিদদের* কাছে নিপীড়িত বোধকারী মোল্লাহ, বিদেশীদের কাছে ইরানি সম্পদ বিক্রি করার কারণে অসন্তুষ্ট বণিক, *বাজারি*, ভূস্বামী ও দরিদ্র কৃষক–সবাই বাবি ধর্মীয় উৎসাহীদের সাথে যোগ দিয়েছিল। শিয়া ধর্মমত দীর্ঘদিন ধরে ইরানিদের সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যে আকাঙ্ক্ষা লালন করতে শিখিয়েছে, যখনই সঠিক নেতা ও সঠিক দর্শনের আবির্ভাব হয়েছে, সকল ধরনের অসন্তুষ্টরা ধর্মীয় ব্যানারের অধীনে লড়াই করাকেই স্বাভাবিক ধরে নিয়েছে।[৬৭]

AMARBOI.COM

এই যাত্রা সরকার বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম হয়। ৯ই জুলাই, ১৮৫০ তারিখে বাবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, নেতাদেরও হত্যা করা হয়, এবং অন্যান্য সন্দেহভাজনদের আটক করে শেষ করে দেওয়া হয়। কিছু সংখ্যক বাবি অটোমান ইরাকে পালিয়ে যায়। সেখানে ১৮৬৩ সালে আন্দোলনে ভাঙন ধরে। কেউ কেউ বাবের মনোনীত উত্তরাধিকারী মির্যা ইয়াহিয়া নুরি সুবহ-ই-আযালকে (১৮৩০–১৯১২) অনুসরণ করে বিদ্রোহের রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যায়। পরে 'আযালিদের' অনেকেই পুরোনো বাবি অতীন্দ্রিয়বাদ ত্যাগ করে সেক্যুলারিস্ট ও জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হয়। শাব্বেতিয় আন্দোলনের মতো টাবু প্রত্যাখ্যান, প্রাচীন আইন-কানুন বাতিল করা ও বিদ্রোহের স্বাদ তাদের খোদ ধর্ম থেকেই বের হয়ে আসতে সক্ষম করে তুলেছিল। আরও একবার মেসিয়ানিক আন্দোলন সেক্যুলারিস্ট আদর্শের সাথে সেতুবন্ধের ব্যবস্থা করেছে। বেশির ভাগ বেঁচে যাওয়া বাবি অবশ্য সুবহ-ই-আযালের ভাই মির্যা হুসেইন আলি নুরি বাহাউল্লাহকে (১৮১৭–৯২) অনুসরণ করেছে। রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে নতুন বাহাই ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তিনি, যা ধর্ম ও রাজনীতির বিচ্ছিন্নতা, সমঅধিকার, বহুত্ত্ববাদ ও সহিষ্ণুতার আধুনিক আদর্শকে আলিঙ্গন করেছিল।[৬৮]

বাবি বিদ্রোহকে আধুনিকতার অন্যতম মহান বিপ্লব হিসাবে দেখা যেতে পারে। ইরানে তা একটা প্যাটার্ন তৈরি করে দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে আরও উপলক্ষ্যে যাজক ও সাধারণ মানুষ, সেক্যুলারিস্ট ও অতীন্দ্রিয়বাদী, বিশ্বাসী ও নাস্তিক, সকলেই একসাথে নিপীড়ক ইরানি সরকারের বিরোধিতা করবে। শিয়াদের কাছে পবিত্র মূল্যবোধে পরিণত ন্যায়বিচারের জন্যে যুদ্ধ ইরানের পরের প্রজন্মগুলোকে শাহ'র সেনাদলকে মোকাবিলা করে এক নতুন ব্যবস্থার সূচনা ঘটাতে উৎসাহিত করবে। অন্তত দুটি উপলক্ষ্যে, শিয়া আদর্শ ইরানিদের দেশে আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম করে তুলবে। আবারও, বাবি বিপ্লব দেখিয়ে দিয়েছিল যে, ধর্ম মানুষকে আধুনিকতার আদর্শ ও উৎসাহ উদ্দীপনাকে অচেনা সেক্যুলার পরিভাষা থেকে তাদের বোধগম্য ভাষা, মিথলজি ও আধ্যাত্মিকতায় অনুবাদ করে উপলব্ধি করতে ও সেগুলোকে আপন করে নিতে সাহায্য করতে পারে। পশ্চিমের ক্রিশ্চানদের পক্ষে আধুনিকতা কঠিন প্রমাণিত হয়ে থাকলে ইহুদি ও মুসলিমদের জন্যে আরও বেশি সমস্যাসঙ্কুল ছিল। এর জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল সংগ্রামের–ইসলামের পরিভাষায়, *জিহাদ*–অনেক সময় যা পবিত্র যুদ্ধে পরিণত হতে পারে।

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় পর্ব

মৌলবাদ

AMARBOI.COM

৫. যুদ্ধরেখা
(১৯৭০–১৯০০)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পশ্চিমে অবশেষে পূর্ণভাবে বিকশিত নতুন সমাজ আসলে যেমনটা অনেকে কল্পনা করেছিল সেরকম সর্বরোগের মহৌষধ জাতীয় কিছু নয়। হেগেলের দর্শনকে অনুপ্রাণিত করা গতিশীল আশাবাদ বিভ্রান্তিকর সন্দেহ ও অস্থিরতার পথ খুলে দিয়েছিল। একদিকে ক্রমশঃ শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল ইংল্যান্ড; শিল্প বিপ্লব কোনও কোনও জাতি রাষ্ট্রকে তাদের অতীতের যেকোনও সময়ে অর্জিত সম্পদ ও শক্তি থেকে অনেক বেশি কিছু এনে দেওয়ায় এক ধরনের আস্থা ও প্রভুত্বমূলক ভাব এনে দিয়েছিল। কিন্তু চার্লস বদলেয়ারের *লে ফ্লিইয়ার্স দু মাল* (১৮৫৭)-এ অনুসন্ধান করা বিচ্ছিন্নতা, বিষাদ ও নির্লিপ্ততা, আলফ্রেড টেনিসনের *ইন মেমোরিয়াম*-এর (১৮৫০) তুলে ধরা সন্দেহ ও ফ্লবেয়ারের *মাদাম বোভারি* (১৮৫৬) উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্রের বিধ্বংসী নিস্পৃহতা ও অসেন্তাষের মতোই ছিল এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষকে অস্পষ্টভাবে ভীত করে তুলছিল। এখন থেকে একই সময়ে আধুনিক সমাজের সাফল্য উদযাপন করার পাশাপাশি নারী-পুরুষ এক ধরনের শূন্যতা, এক ধরনের অস্তিত্বহীনতার বোধে আক্রান্ত হয়, এর ফলে জীবন হয়ে পড়ে অর্থহীন; আধুনিকতার বিভ্রান্তির ভেতর অনেকেই নিশ্চয়তার জন্যে আকুতি বোধ করেছে; কেউ কেউ কাল্পনিক প্রতিপক্ষ ও সর্বজনীন ষড়যন্ত্রের স্বপ্নের ভেতর দিয়ে তাদের এইসব ভীতিকে প্রকাশ করেছে।

আধুনিক সংস্কৃতির পাশাপাশি গড়ে ওঠা তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের সব কটিতে আমরা মৌলবাদী আন্দোলনে এই সমস্ত উপাদানই আবিষ্কার করব। বিপরীত দিকে হতাশাজনক প্রমাণ লক্ষ করার পরেও মানবজাতি জীবনের একটা পরম মূল্য ও অর্থ আছে, এমন একটা ধারণা ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব বলে আবিষ্কার করে। প্রাচীন বিশ্বে মিথলজি ও আচার জনগণকে ঠিক মহান শিল্পকর্মগুলোর মতোই শূন্যতা থেকে রক্ষাকারী এক ধরনের পবিত্র তাৎপর্যের

AMARBOI.COM

অনুভূতি সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ক্ষমতা ও সাফল্যের উৎস বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ মিথকে বাতিল করে কেবল যুক্তিই সত্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও যুক্তি পরম প্রশ্নগুলোর কোনও উত্তর দিতে পারেনি; কখনওই তা *লোগোসের* এখতিয়ারের ছিল না। ফলে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক পাশ্চাত্য নারী-পুরুষের পক্ষে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস পালন করা আর সম্ভব ছিল না।

অস্ট্রিয় মনস্তাত্ত্বিক সিগমান্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬–১৯৩৯) আবিষ্কার করবেন যে মানব সন্তানরা জোরালভাবে মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি কামনা ও প্রজননের ইচ্ছাতেও তাড়িত হয়। এমবর্ধমান হারে আধুনিক সংস্কৃতিতে নিশ্চিহ্নতার এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা (আর এর ভীতি) জেগে উঠবে। সাধারণ মানুষ নিজেদের তৈরি আধুনিকতা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করার পাশাপাশি একই সময়ে এর সন্দেহাতীত সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চলবে। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণেই পশ্চিমের বেশির ভাগ মানুষ স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছিল, পেয়েছিল দীর্ঘ আয়ু; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছিল জীবন অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। আমেরিকান ও ইউরোপিয়রা তাদের সাফল্য নিয়ে সঠিকভাবেই গর্বিত ছিল। কিন্তু আলোকনের চিন্তকদের টিকিয়ে রাখা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের স্বপ্ন অলীক কল্পনা বলে প্রমাণিত হতে চলেছিল। ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ (১৯৭০–৭১) আধুনিক মারণাস্ত্রের ভয়ঙ্কর প্রভাব তুলে ধরেছিল এবং এক ধরনের উপলব্ধির বিস্তার ঘটছিল যে বিজ্ঞানের হয়তো ক্ষতিকর মাত্রাও থাকতে পারে। এক ধরনের অ্যান্টিক্লাইমেক্সের বোধ জেগে উঠেছিল।[১] উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিপ্লবী বছরগুলোয় এক নতুন ও উন্নত বিশ্ব যেন মানবজাতির হাতে ধরা দিয়েছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এই আশা কোনওদিনই পূরণ হয়নি। তার বদলে শিল্প বিপ্লব নতুন নতুন সব সমস্যা হাজির করেছে, এনেছে নতুন অবিচার ও শোষণ। *হার্ড টাইমস* (১৮৫৪)-এ চার্লস ডিকেন্স শিল্প নগরীকে নরক হিসাবে তুলে ধরে আধুনিক বাস্তববাদী যুক্তিবাদ নৈতিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে বিধ্বংসী প্রমাণিত হতে পারে বলে দেখিয়েছেন। নতুন মেগাসিটিগুলো বিপুল দ্ব্যর্থবোধকতার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। 'অন্ধকার অশুভ কলকারখানাকে'[২] প্রত্যাখ্যানকারী রোমান্টিক কবিরা শহুরে জীবন থেকে পালিয়ে গেছেন, আবার সমানভাবে তাঁরা অক্ষত পল্লী এলাকার জন্যে ইতিবাচক আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ব্রিটিশ সমালোচক জর্জ স্টেইনার ১৮৩০-র দশকে বিকাশ লাভ করা চিত্রকলা এক অদ্ভুত ধরনের কৌশলের উল্লেখ করেছেন, যাকে 'আধুনিকতার প্রতি-স্বপ্ন' হিসবে দেখা যেতে পারে। মহান পাশ্চাত্য সাফল্যকে প্রতীকায়িত করে তোলা আধুনিক শহরগুলোকে-লন্ডন, প্যারিস

ও বার্লিন–অকল্পনীয় কোনও বিপর্যয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[৩] লোকজন সভ্যতার বিনাশ নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু করেছিল; সেই সাথে তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপও নিতে চেয়েছে।

ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পর ইউরোপের জাতিগুলো এক উন্মত্ত অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে, ফলে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে। যুদ্ধকে তারা ডারউনিয় প্রয়োজনীয়তা হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল, যেখানে কেবল যোগ্যতমই টিকে থাকবে। আধুনিক কোনও দেশের অবশ্যই সবচেয়ে বৃহৎ সেনাদল আর বিজ্ঞানের কাছ থেকে পাওয়া সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র থাকতে হবে। ইউরোপিয়রা মর্মবিদীর্ণ করা দেবত্ব আরোপের ভেতর দিয়ে জাতির আত্মাকে শুদ্ধ করে তোলার যুদ্ধের স্বপ্ন দেখেছে। ব্রিটিশ লেখক আই.এফ. ক্লার্ক দেখিয়েছেন, ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে কোনও উপন্যাস বা ছোট গল্পে ইউরোপিয় কোনও কোনও দেশে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয়নি এমন একটিও বছর খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক ছিল।[৪] 'আগামী মহাযুদ্ধ'-কে ভয়ঙ্কর কিন্তু অনিবার্য বিপদ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে: ধ্বংসের ভেতর দিয়ে জাতি আবার এক নতুন ও বর্ধিত জীবনে উন্নীত হবে। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে বিটিশ উপন্যাসিক এইচ.জি. ওয়েলস *দ্য ওয়ার অভ দ্য ওয়ার্ল্ডস* (১৮৯৮) উপন্যাসে এই ইউটোপিয় স্বপ্নকে ফুটো করে দেন, সেটা কোন দিকে যাচ্ছে তাও দেখিয়ে দেন তিনি। বিজাণু অস্ত্রে লন্ডনের জনমানবশূন্য হয়ে যাওয়ার ভীতিকর সব ছবি ফুটে উঠেছিল, ইংল্যান্ডের পথঘাট শরণার্থীতে গিজগিজ করছে। খাঁটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টেনে আনা সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যার বিপদ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। ঠিকই করেছিলেন। এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা সোম-এর দিকে টেনে নিয়ে গেছে। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ শুরু হলে ইউরোপের জনগণ–যারা চল্লিশ বছর ধরে সব যুদ্ধের অবসান ঘটানো যুদ্ধের অপেক্ষা করে আসছিল–সোৎসাহে যোগ দিয়েছিল এই বিরোধে। একে ইউরোপের সমবেত আত্মহত্যা হিসাবে দেখা যেতে পারে। আধুনিকতার সাফল্য সত্ত্বেও সর্বস্ববিধ্বংসী মৃত্যু-ইচ্ছারও অস্তিত্ব ছিল, ইউরোপের জাতিগুলো আত্মধ্বংসের এক বিকৃত ফ্যান্টাসি লালন করছিল।

আমেরিকায় অধিকতর রক্ষণশীল প্রটেস্ট্যান্টরা একই রকম দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার ছিল, তবে তাদের দুঃস্বপ্নের দৃশ্যপট ধর্মীয় চেহারা নিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এক ভয়ঙ্কর বিরোধে আক্রান্ত হয়েছিল, ক্লাইমেক্সসুলভ এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে। উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলোর ভেতরের গৃহযুদ্ধকে (১৮৬১–৬৫) প্রলয়বাদী আলোকে দেখছিল আমেরিকানরা। উত্তরবাসীদের বিশ্বাস ছিল বিরোধের ফলে জাতি শুদ্ধ হয়ে উঠবে; সৈন্যরা 'গ্লোরি অভ দ্য কামিং অভ দ্য

AMARBOI.COM

লর্ড,"[৫] গেয়েছে। যাজকগণ আলো ও অন্ধকারের শক্তির, মুক্তি ও দাসত্বের যুদ্ধের আরমাগেদনের কথা বলেছেন। তাঁরা এই আগুনের মতো বিপদ থেকে অনেকটা ফিনিক্স পাখির মতো নতুন পুরুষ ও নতুন কালপর্বের আবির্ভাবের প্রত্যাশা করেছেন।[৬] কিন্তু আমেরিকাতেও কোনও বেপরোয়া সাহসী জগতের অস্তিত্ব ছিল না। তার বদলে যুদ্ধের শেষ নাগাদ গোটা শহর ধ্বংস হয়ে গেছে, পরিবারগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে, এবং শুরু হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণী পাল্টা হামলা। ইউটোপিয়ার বদলে উত্তরের রাজ্যগুলো কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শিল্পায়িত সমাজে দ্রুত গতির পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। নতুন নতুন শহর গড়ে তোলা হয়েছে, পুরোনো শহরগুলো আকারের দিক থেকে বিস্ফোরিত হয়েছে। দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপ থেকে দলে দলে অভিবাসীরা এসে ভীড় করেছে দেশে। লোহা, তেল ও ইস্পাত শিল্প থেকে পুঁজিবাদীরা দারুণ লাভ হাতিয়ে নিয়েছে, অন্যদিকে শ্রমিকরা ন্যূনতম চাহিদা স্তরের নিচে বাস করেছে। কলেকারখানায় নারী ও শিশুদের শোষণ করা হচ্ছিল: ১৮৯০ সাল নাগাদ প্রতি পাঁচজন শিশুর ভেতর একজন কাজে নিয়োজিত ছিল। কাজের পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ, কর্মঘণ্টা দীর্ঘ, যন্ত্রপাতি নিরাপত্তাহীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল অংশ, বিশেষ করে দক্ষিণ কৃষি নির্ভর রয়ে গিয়েছিল বলে শহর ও পল্লী এলাকার ভেতরও সাগরসম বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল। ইউরোপের সমৃদ্ধির আড়ালে এক শূন্যতার অবস্থান থেকে থাকলে ভেতরের সারবস্তু ছাড়াই একটি দেশে পরিণত হতে চলেছিল আমেরিকা।[৭]

ইউরোপের মানুষকে এমন মুগ্ধ করে রাখা সেক্যুলার 'ভবিষ্যৎ যুদ্ধের' ঘরানা অধিকতর ধার্মিক আমেরিকানদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। তার বদলে কেউ কেউ ঈশ্বর ও শয়তানের মাঝে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের কল্পনা করে এই অশুভ সমাজকে উপযুক্ত পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া পরকালতত্ত্বে আরও গভীরতর আগ্রহ সৃষ্টি করে নিয়েছিল।[৮] উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় শেকড় গেড়ে বসা নতুন প্রলয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির নাম ছিল *প্রি*-মিলেনিয়াম, কারণ এখানে হাজার বছরের শাসনকাল সূচিত হওয়ার *আগেই* ক্রাইস্টের প্রত্যাবর্তন ঘটার কল্পনা করা হয়েছে (তখনও উদার প্রটেস্ট্যান্টদের হাতে চর্চা অব্যাহত থাকা আলোকনের প্রাচীন ও আধিকতর আশাবাদী *পোস্ট*মিলেনিয়ানিজম মানবজাতি আপন প্রয়াসেই ঈশ্বরের রাজ্য উদ্বোধন ঘটানোর কল্পনা করেছিল, কেবল মিলেনিয়াম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার *পরেই* পৃথিবীতে ফিরে আসবেন ক্রাইস্ট)। ইংরেজ জন নেলসন ডারবি (১৮০০–৮২) নতুন প্রি-মিলেনিয়াম প্রচার করেছিলেন; ব্রিটেনে অল্প সংখ্যক অনুসারী পেলেও ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৭ সালের ভেতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় দারুণ প্রশংসিত হন তিনি। তাঁর চোখে আধুনিক বিশ্বে মঙ্গলময় কিছুই ছিল না।

AMARBOI.COM

ধ্বংসের দিকে ছুটে যাচ্ছে এটা। আলোকনের চিন্তকরা যেমন আশা করেছিলেন তেমনি আরও বেশি করে গুণবান হওয়ার বদলে মাবনাজাতি এতটাই নৈতিকভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছে যে ঈশ্বর অচিরেই হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবেন এবং মানবজাতির উপর অবর্ণনীয় দুর্ভোগ চাপিয়ে দিয়ে তাদের সমাজকে ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু এই অগ্নিময় বিপদের ভেতর থেকে বিশ্বাসী ক্রিশ্চানরা বিজয়ীর বেশে বের হয়ে আসবে, ক্রাইস্টের চূড়ান্ত বিজয় ও মহান রাজ্যেকে উপভোগ করবে।[৮]

বাইবেলে অতীন্দ্রিয় অর্থের সন্ধান করেননি ডারবি এঁকে আক্ষরিক অর্থ উল্লেখকারী দলিল হিসাবে বিবেচনা করেছেন। পয়গম্বর ও বুক অভ রেভেলেশনের লেখকগণ প্রতীকী ভাষায় কথা বলছিলেন না, বরং নিখুঁত পূর্বাভাস দিচ্ছিলেন যা ঠিক তাঁদের ভাষ্যমতোই অচিরে ঘটবে। প্রাচীন মিথসমূহকে এখন অনেক আধুনিক পশ্চিমা ব্যক্তির শনাক্তযোগ্য সত্যের একমাত্র রূপ বাস্তব *লোগোসই* মনে করা হচ্ছিল। ডারবি নিস্তারের গোটা ইতিহাসকে ঐশীগ্রন্থের সযত্ন পাঠ থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সাতটি কাল বা 'ডিসপেনশনে' ভাগ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, মানবজাতি যখন এতটাই খারাপ হয়ে ওঠে যে ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিতে গেলে প্রতিটি ডিসপেনশন সমাপ্তির মুখ দেখে। এর আগের ডিসপেনশনগুলো পতন, প্লাবন ও ক্রাইস্টের ক্রুসিফিক্সনের ভেতর দিয়ে শেষ হয়েছে। মানবজাতি এখন ষষ্ঠ বা পেনাল্টিমেট ডিসপেনশনে বাস করছে, অচিরেই এক নজীরবিহীন বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে ঈশ্বর এর অবসান ঘটাবেন। শেষের আগে সেইন্ট পল যে মিথ্যা উদ্ধারকারীর আবির্ভাবের পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন সেই অ্যান্টিক্রাইস্ট' মিথ্যা প্রলোভনে বিশ্বকে প্রতারিত করবে, সবাইকে আয়ত্তে নেবে এবং তারপর মানবজাতির উপর ভোগান্তির একটা কাল অবতীর্ণ করবে। সাত বছর ধরে অ্যান্টিক্রাইস্ট যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, অপরিমেয় মানুষকে হত্যা করবে, সকল বিরোধীকে নির্যাতন করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রাইস্ট পৃথিবীতে নেমে আসবেন, অ্যান্টিক্রাইস্টকে পরাস্ত করবেন, জেরুজালেমের বাইরে আরমাগেদনের প্রান্তরে শয়তানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হবেন তিনি, উদ্বোধন ঘটাবেন সপ্তম ডিসপেনশনের। শেষ বিচারের দিন ইতিহাসের অবসান ঘটানোর আগে হাজার বছর শাসন করবেন তিনি। এটা ছিল ইউরোপের ফিউচার ওয়ার ফ্যান্টাসিরই ধর্মীয় রূপ। সত্যিকারের প্রগতিকে এখানে বিরোধ ও প্রায় সামগ্রিক বিনাশ হিসাবে দেখা হয়েছে। স্বর্গীয় নিস্তারের স্বপ্ন সত্ত্বেও এটা ছিল আধুনিক মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা বিনাশী দৃষ্টিভঙ্গি। ক্রিশ্চানরা আধুনিক সমাজের চূড়ান্ত অবলুপ্তি কল্পনা করেছে বিকৃত বিস্তারে ও অসুস্থভাবে এর আকাঙ্ক্ষা করেছে।

তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। ইউরোপিয়রা যেখানে সবাই আসন্ন সংঘাতের ভোগান্তি ভোগ করার কথা কল্পনা করেছে, ডারবি সেখানে মনোনীতদের

উদ্ধারের পথ দেখিয়েছেন। ক্রাইস্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় জীবিত ক্রিশ্চানদের 'মেঘের উপর তুলে নিয়ে যাওয়া হবে..শূন্যে প্রভুর সাথে সাক্ষাতের জন্যে,'[১০] বিশ্বাসের অধিকারী সেইন্ট পলের চকিত মন্তব্যের ভিত্তিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, ভোগান্তি শুরু হওয়ার ঠিক অব্যবহিত আগে এক 'তুরীয় আনন্দের' ঘটনা ঘটবে, নবজন্মলাভকারী ক্রিশ্চানদের উর্ধ্বে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, যাদের স্বর্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে, এভাবে শেষ বিচারের ভয়ঙ্কর কষ্টের হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে। প্রিমিলেনিয়ানিস্টরা তুরীয় আনন্দকে নিরেট আক্ষরিক বিস্তারে কল্পনা করেছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নবজন্মলাভকারী পাইলট ও ড্রাইভাররা হাওয়ায় উড়ে যাওয়ায় বাহনগুলো নিয়ন্ত্রণ হারানোয় সহসা এয়ার প্লেন, গাড়ি ও ট্রেইন ধ্বংস হয়ে যাবে। স্টক মার্কেট ধসে পড়বে, সরকারের পতন ঘটবে। অবশিষ্টরা বুঝতে পারবে যে তারা অভিশপ্ত, সত্যিকারের বিশ্বাসীরা সব সময়ই ঠিক ছিল। এই অসুখী মানুষগুলো কেবল কষ্টই সহ্য করবে না, তাদের জন্যে চিরন্তন অভিশাপের নিয়তি অপেক্ষা করে থাকার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। প্রিমিলেনিয়ালিজম ছিল প্রতিশোধের ফ্যান্টাসি: মনোনীতরা স্বর্গ থেকে যারা তাদের বিশ্বাসের প্রতি পরিহাস করেছে, উপেক্ষা করেছে, ঠাট্টা করেছে, তাদের ধর্মবিশ্বাসকে প্রান্তিকায়িত করেছে, আর এখন আর ভুল বোঝার আর সময় নেই যাদের, তাদের দিকে তাকানোর কথা কল্পনা করেছে। আজকের দিনে বহু প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীর ঘরে যে জনপ্রিয় ছবিটি চোখে পড়ে সেখানে দেখা যায় বাড়ির সামনে ঘাস কাটার সময় এক লোক দোতলার জানালা দিয়ে তার নবজন্মলাভকারী তুরীয় আনন্দের অধিকারী স্ত্রীর দিকে মহাবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। পৌরাণিক ঘটনার বহু নিরেট বর্ণনার মতো দৃশ্যটিকে খানিকটা অসম্ভব ঠেকে, কিন্তু বর্তমানে এর তুলে ধরা বাস্তবতা নিষ্ঠুর, বিভাজনকারী ও করুণ।

বৈপরীত্যমূলকভাবে সত্যিকারের ধর্মীয় মিথলজির চেয়ে প্রিমিলেনিয়াজিমের বরং এর অপছন্দের সেক্যুলার দর্শনের সাথেই বেশি মিল ছিল। হেগেল, মার্ক্স, ও ডারউইন, এঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতেন যে উন্নতি বিরোধেরই ফল। মার্ক্স আবার ইতিহাসকে এক ইউটোপিয়ায় পর্যবসিত হওয়া ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভাগ করেছিলেন। ভূতাত্ত্বিকগণ পাহাড় ও ক্লিফে ফসিলায়িত গাছপালার বিভিন্ন স্তরে পৃথিবীর বিকাশের উপর্যুপরি কালপর্ব আবিষ্কার করেছেন। কারও কারও ধারণা প্রতিটি কালের অবসান ঘটেছে বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে। প্রিমিলেনিয়াল কর্মসূচি যেমন অদ্ভুতই শোনাক না কেন তা উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ভাবনার একই ধারায় ছিল। অক্ষরবাদীতা ও গণতন্ত্রের দিক থেকেও তা আধুনিক ছিল। কেবল অতীন্দ্রিয় অভিজাত গোষ্ঠীর বোধগম্য কোনও গোপন বা প্রতীকী অর্থের বালাই ছিল না। শিক্ষা যত সামান্যই

AMARBOI.COM

হোক, প্রতিটি ক্রিশ্চান সত্য আবিষ্কার করতে পারে, সকলের দেখার মতো করেই বাইবেলে তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। ঐশীগ্রন্থ যা বলেছে ঠিক তাই বুঝিয়েছে: মিলেনিয়ামের মানে দশ শতাব্দী; ৪৮৫ বছর মানে অতগুলো বছরই; পয়গম্বরগণ 'ইসরায়েল' সম্পর্কে কথা বলে থাকলে তাঁরা চার্চের কথা বোঝাননি, বুঝিয়েছেন ইহুদিদের কথাই; রেভেলেশনের লেখকগণ যখন জেরুজালেমের বাইরে আরমাগেদনের প্রান্তরে জেসাস ও শয়তানের যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ঠিক সেভাবেই ব্যাপারটা ঘটবে।[11] নিমেষে বেস্টসেলারে পরিণত হওয়া বাইবেলের প্রিমিলেনিয়াল পাঠ *দ্য স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল* (১৯০৯) প্রকাশিত হওয়ার পর গড়পড়তা ক্রিশ্চানের পক্ষে অনেক সহজতর হয়ে উঠেছিল। সি. আই. স্কোফিল্ড বাইবেলিয় টেক্সটের সাথে বিস্তারিত টীকাটিপ্পনী দিয়ে নিস্তারের ইতিহাসের এই ডিসপেনশনাল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন, এইসব টীকা বহু মৌলবাদীর কাছে খোদ টেক্সটের মতোই কর্তৃত্বমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইচ্ছা করেই প্রশ্নের দ্বার উন্মুক্ত রেখে পরম সত্যের সম্ভাবনাকে অস্বীকারকারী আধুনিকতার প্রতি এক ধরনের সাড়া প্রিমিলেনিয়ালিজম নিশ্চয়তার জন্যে লালসার প্রকাশ ঘটায়। আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টরা দীর্ঘদিন ধরে আধুনিক সমাজ কীভাবে কাজ করে তা উপলব্ধি করার যোগ্য বলে বিবেচিত অভিজ্ঞদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দৃশ্যতঃ কোনও কিছুই আর যেমন মনে হত তেমন ছিল না। এই সময়ে আমেরিকান অর্থনীতি ভয়ঙ্কর উত্থান-পতনের শিকার হয়েছিল, কৃষি জীবনে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষের চোখে তা ছিল বিস্ময়কর। চাঙা বাজারের পরপরই দেখা দেওয়া মন্দায় রাতারাতি বিপুল অঙ্কের অর্থ লোকসান হত; সমাজ যেন অদৃশ্য রহস্যময় 'বাজার শক্তি'তে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। সমাজবিদরা আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অদক্ষ পর্যবেক্ষকের চোখে ধরা পড়া সম্ভব ছিল না এমন এক এক অর্থনৈতিক গতিশীলতায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল মানুষের জীবন। ডারউইনবাদীরা মানুষকে বুঝিয়েছিল, অস্তিত্ব খালি চোখে অদৃশ্য জীববিজ্ঞানীয় সংগ্রামের অধীন। মনস্তাত্ত্বিকরা গোপন, অবচেতন মনের কথা বলেছেন। হাইয়ার ক্রিটিকরা জোর দিয়েছেন যে, এমনকি খোদ বাইবেল যেমনটা দাবি করা হয়ে এসেছে তেমন কিছু নয়, দৃশ্যতঃ সাধারণ টেক্সট আসলে বিস্ময়কর বিভিন্ন সংখ্যক উৎস থেকে গড়ে তোলা হয়েছে ও কেউ কোনওদিন যাঁদের নাম শোনেনি এমন সব লেখকগণ তা লিখেছেন। যেসব প্রটেস্ট্যান্ট তাদের বিশ্বাস নিরাপত্তা যোগাবে বলে আশা করেছিল, এমনি জটিল এক জগতে মানসিক ঘূর্ণীপাকের শিকারে পরিণত হয় তারা। তারা সবার বোধগম্য সাধারণ ভাষার এক ধর্মবিশ্বাসের আকাঙ্ক্ষা করেছিল।

AMARBOI.COM

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদই সময়ের মূল কথা হওয়ায় গুরুত্বের সাথে নিতে হলে ধর্মেরও যৌক্তিক হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কোনও কোনও প্রটেস্ট্যান্ট তাদের ধর্মবিশ্বাসকে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক করে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। অন্যান্য *লোগোসের* মতোই একে স্পষ্ট, প্রকাশযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। কিন্তু সামগ্রিক নিশ্চয়তার সন্ধানকারীদের অনেকের কাছেই আধুনিক বিজ্ঞান ছিল বড় বেশি পিচ্ছিল। ডারউইন ও ফ্রয়েডের আবিষ্কার এসেছিল অপ্রমাণিত হাইপথেসিস থেকে, এগুলোকে অধিকতর প্রথাগত প্রটেস্ট্যান্টের কাছে 'অবৈজ্ঞানিক' মনে হয়েছে। পরিবর্তে তারা ফ্রান্সিস বেকনের আদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির শরণ নিয়েছে, এমনি আঁচ অনুমানের কোনও ফুরসত যাঁর ছিল না। বেকন বিশ্বাস করতেন, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি, কারণ এগুলোই আমাদের সঠিক তথ্য যোগাতে সক্ষম। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের যৌক্তিক নীতিমালায় বিশ্বকে সংগঠিত করা হয়েছে। কোনও আজগুবী ধারণা তৈরি নয়, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ঘটনাকে শ্রেণীবদ্ধ করা ও সবার কাছে স্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আবিষ্কারকে তত্ত্বে রূপান্তরিত করা। কান্টের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান তত্ত্বের বিরোধী অষ্টম শতাব্দীর স্কটিশ আলোকনের দর্শনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিল প্রটেস্ট্যান্টরা, এবং দাবি করেছে যে সত্য বাস্তব এবং 'সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান'[১২] আছে এমন যেকোনও আন্তরিক মানবসন্তানের কাছে তা পাওয়া যাবে।

নিশ্চয়তার এই কামনা ছিল আধুনিক অভিজ্ঞতার একেবারে মূলে ওৎ পেতে থাকা শূন্যতাকে–সম্পূর্ণ যৌক্তিক মানুষের চেতনায় ঈশ্বর-সম গহ্বর–পূরণ করার প্রয়াস। আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট আর্থার পিয়ারসন বাইবেলকে 'সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ চেতনায়' পরখ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বইয়ের শিরোনামই–*ম্যানি ইনফ্যালিবল প্রুফস* (১৮৯৫)–ধর্ম থেকে তিনি কী ধরনের নিশ্চয়তার সন্ধান করছিলেন তা দেখিয়ে দেয়:

> আমি...কোনও প্রকল্প দিয়ে শুরু হয়ে তারপর তথ্য ও দর্শনকে আমাদের ডগমার সাথে খাপ খাওয়ার জন্যে সাজায় না, বরং প্রথমে ঈশ্বরের বাণীর শিক্ষাকে একত্রিত করে তারপর তথ্যমালাকে সাজানোর মতো কিছু সাধারণ বিধানের সন্ধানকারী বেকনিয় ব্যবস্থার বাইবেলিয় সেইসব ধর্মতত্ত্ব পছন্দ করি।[১৩]

বোধগম্য ইচ্ছা ছিল এটা, কিন্তু বাইবেলের *মিথোই* পিয়ারসনর প্রত্যাশা অনুযায়ী কোনও দিনই তথ্যভিত্তিক হওয়ার ভান করেনি। অতীন্দ্রিয় ভাষাকে কখনওই এর

AMARBOI.COM

রেইজন দ'এতরে–মূল সত্তা–না খুইয়ে যুক্তিভিত্তিক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কবিতার মতো তা এমন সব অর্থ ধারণ করে যাকে অন্য যেকোনওভাবে প্রকাশ করার পক্ষে অধরাই রয়ে যায়। ধর্মতত্ত্ব যখনই বিজ্ঞানে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করে, তখন তা কেবল যৌক্তিক ডিসকোর্সের একটা ক্যারিকেচারের জন্ম দিতে পারে, কারণ এইসব সত্যি বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর পক্ষে মানানসই নয়।[১৪] এই মিথ্যা ধর্মীয় *লোগোস* অনিবার্যভাবে ধর্মকে আরও কুখ্যাতি এনে দেবে।

নিউ জার্সির প্রিন্সটনের নিউ লাইটস প্রেসবিটারিয়ান সেমিনারি এই বৈজ্ঞানিক প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের শক্তঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। 'শক্তঘাঁটি' কথাটা মানানসই, কারণ যৌক্তিক ক্রিশ্চান ধর্মের প্রচারণা অনেক সময় উগ্র ইমেজারি ব্যবহার করেছে, একে বরাবরই আত্মরক্ষামূলক মনে হয়েছে। ১৮৭৩ সালে প্রিন্সটনের ধর্মতত্ত্বের চেয়ারের অধিকারী চার্লস হজ তাঁর দুই খণ্ডের রচনা *সিস্টেমেটিক থিওলজি*'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। আবারও, শিরোনাম এর বৈজ্ঞানিক পক্ষপাত তুলে ধরছে। শব্দের *অতীত* কোনও অর্থের সন্ধান করা ধর্মবেত্তার কাজ নয়, জোরের সাথে বলেছেন হজ, বরং তাঁকে স্রেফ ঐশীগ্রন্থের স্পষ্ট শিক্ষাকে সাধারণ সত্যের একটা ব্যবস্থায় বিন্যস্ত করতে হবে। বাইবেলের প্রতিটি শব্দ ঐশী অনুপ্রাণিত, একে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে নিতে হবে; একে কোনওভাবেই উপমাগত বা প্রতীকী ব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃত করা চলবে না। ১৮৭৮ সালে পিতার আসনের উত্তরাধিকারী হওয়া চার্লসের ছেলে আর্চিবল্ড এ. হজ বাইবেলের আক্ষরিক সত্যের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তরুণ সহকর্মী বেনজামিন ওয়ারফিল্ডের সাথে *দ্য প্রিন্সটন রিভিউ* প্রকাশ করেন। নিবন্ধটি ধ্রুপদী হয়ে ওঠে। বাইবেলের সমস্ত কাহিনী ও বিবৃতি 'চরমভাবে ভ্রান্তিহীন এবং বিশ্বাস ও পরিপালনের জন্যে বাধ্যতামূলক।' বাইবেল কিছু যা বলেছে তার সবই 'তথ্যের পরম সত্যি।' বাইবেল অনুপ্রাণিত হয়ে থাকলে অবশ্যই অনুপ্রাণিত,[১৬] একটি প্যাঁচানো যুক্তি যা আর যাই হোক বৈজ্ঞানিক নয়। এমন দৃষ্টিভঙ্গির কোনও যৌক্তিক বাস্তবতা নেই, যেকোনও বিকল্পের পক্ষে রুদ্ধ ও কেবল নিজের ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেবল যুক্তির উপর প্রিন্সটনের আস্থা একে আধুনিকতার সারিতে দাঁড় করিয়েছে বটে, কিন্তু এর দাবি ছিল তথ্য থেকে দুরন্ত। 'ক্রিশ্চান ধর্ম সঠিক যুক্তির সাহায্যে এর আবেদন সৃষ্টি করেছে,' পরের এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন ওয়ারফিল্ড। 'কেবল যুক্তির উপর ভর করেই প্রাধান্যের পথে এতদূর এগিয়ে এসেছে এবং কেবল যুক্তির মাধ্যমেই তা সব শত্রুকে পদদলিত করবে।'[১৭] ক্রিশ্চান ইতিহাসে চোখ বোলালে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাক আধুনিক সকল ধর্মের মতো যুক্তি কেবল পৌরাণিক প্রেক্ষাপটেই অনুশীলন করা হয়েছে। ক্রিশ্চান ধর্ম 'সঠিক যুক্তি'র–যা কখনওই ক্রিশ্চান ধর্ম বিশ্বাসের 'একক' আবেদন

AMARBOI.COM

ছিল না–চেয়ে বরং অতীন্দ্রিয়বাদ, স্বজ্ঞা ও লিটার্জির উপর নির্ভর করেছে। ওয়ারফিল্ডের উগ্র ইমেজারি, বিশ্বাসের 'প্রতিপক্ষ'কে যা যুক্তি দিয়ে বিভ্রান্ত করার আশা করে, সম্ভবত এক গোপন নিরাপত্তাহীনতা তুলে ধরে। ক্রিশ্চান বিশ্বাস আদতেই এমন স্পষ্ট ও স্ব-প্রকাশিত হয়ে থাকলে এত মানুষ কেন তবে একে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে?

প্রিন্সটন ধর্মতত্ত্বে হতাশার ছাপ রয়েছে। 'ধর্মকে জীবন রক্ষার জন্যে বৈজ্ঞানিক মানুষের এক বিশাল শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে,' ১৮৭৪ সালে ঘোষণা করেছিলেন চার্লস হজ।[১৮] বৈজ্ঞানিক যুক্তির পক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী ক্রিশ্চানদের কাছে নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বাইবেলের আক্ষরিক অর্থের বিরোধী মনে হতে শুরু করায় উদ্বেগজনক বোধ হয়েছিল। বেকনবাদী হজের কাছে ডারউইনবাদ ছিল স্রেফ বাজে বিজ্ঞান। তিনি যত্নের সাথে অরিজিন পাঠ করেছেন, কিন্তু ঈশ্বরের উপর কোনও রকম নির্ভরশীলতা ছাড়াই আকস্মিকভাবে প্রকৃতির জটিল নকশা আবির্ভূত হওয়ার ডারউইনীয় প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে নিতে পারেননি। এভাবে তিনি আসন্ন প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদের রুদ্ধ মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করেছেন: হজ তাঁর বিশ্বাস থেকে ভিন্ন কোনও বিশ্বাসকেই স্রেফ বৈধ মেনে নিতে পারেননি। 'যেকোনও সাধারণভাবে গঠিত মানুষের পক্ষে,' জোরের সাথে বলেছেন তিনি, 'চোখ কোনও পরিকল্পনার অংশ নয়, বিশ্বাস করা কঠিন।'[১৯] মানুষের 'সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে বিরোধপূর্ণ সব ধরনের দর্শনীয় প্রকল্প ও তত্ত্বের বিরোধিতা করার দায়িত্ব রয়েছে–যেমন ডারউনিবাদ।' এটা ছিল 'কাণ্ডজ্ঞানে'র কাছে আবেদন; ঈশ্বর মানুষের মনকে 'এমন প্রবৃত্তি দান করেছেন যা অব্যর্থ,' ডারউইন এর বিরোধিতা করলে, তাঁর প্রকল্প অগ্রহণযোগ্য এবং অবশ্যই তাকে বাতিল করতে হবে।[২০] প্রিন্সটনে আবির্ভূত বৈজ্ঞানিক ক্রিশ্চান ধর্ম দুই নৌকায় পা দিয়ে বসেছিল। হজ প্রাচীন রক্ষণশীল কায়দায় আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য যুক্তির পথে বাধা খাড়া করানোর প্রয়াস পাচ্ছিলেন, একে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে চাননি। কিন্তু সব পৌরাণিক সত্যকে *লোগোইয়ের* পর্যায়ে নামিয়ে এনে প্রাচীন বিশ্বের আধ্যাত্মিকতার উপর আঘাত হেনেছেন তিনি। তাঁর ধর্মতত্ত্ব ছিল বাজে বিজ্ঞান ও অপর্যাপ্ত ধর্ম।

কিন্তু প্রিন্সটন টিপিক্যাল ছিল না। হজ ও ওয়ারফিল্ড যেখানে ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক বিশ্বাস হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করে মতবাদগত সমরূপতার উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করছিলেন, সেখানে পোড়খাওয়া উচ্ছেদবাদী হেনরি ওয়ার্ড বীচার (১৮১৩–৮৭)-এর মতো অন্য প্রটেস্ট্যান্টরা আরও উদার অবস্থান গ্রহণ করছিলেন।[২১] বীচারের চোখে ডগমা ছিল গৌণ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ, ভিন্ন ধর্মতত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করার দায়ে কাউকে শাস্তি দান অক্রিশ্চান সুলভ। উদারবাদীরা

ডারউইনবাদ বা বাইবেলের হাইয়ার ক্রিটিসিজমের মতো আধুনিক জ্ঞানিক উদ্যোগের প্রতি উদার ছিল। বীচারের চোখে ঈশ্বর কোনও দূরবর্তী, বিচ্ছিন্ন বাস্তবতা নন, বরং এই মর্ত্যেরই প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উপস্থিত আছেন, সুতরাং, বিবর্তনকে সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের অবিরাম উদ্বেগ হিসাবে দেখা যেতে পারে। মতবাদগত সমরূপতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ক্রিশ্চান ভালোবাসার চর্চা। উদার প্রটেস্ট্যান্টরা বস্তি ও শহরে সামাজিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বর উপর জোর দিচ্ছিল, তাদের বিশ্বাস ছিল নিবেদিত প্রাণ বদান্যতার ভেতর দিয়ে তারা এই বিশ্বে ঈশ্বরের ন্যায়-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। আশাবাদী ধর্মতত্ত্ব ছিল এটা, আধুনিকতার সুফল ভোগ করতে শুরু করা মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে আবেদন সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮০-র দশক নাগাদ উত্তরের অনেক রাজ্যের প্রধান প্রটেস্ট্যান্ট স্কুলে এই নতুন ধর্মতত্ত্ব পাঠ করানো শুরু হয়েছিল। *ইভোলিউশন অ্যান্ড রিলিজিয়নে* (১৮৯৭) জন বিস্কন ও *থ্রু নেচার টু গড*-এ (১৮৯৯) জন ফিস্ক-এর মতো ধর্মবেত্তাগণ বিশ্বাস করেছিলেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে কোনও বৈরিতা থাকতে পারে না। দুজনই পৃথিবীর বুকে ঈশ্বরের আবির্ভাব আসন্ন বলেছেন; মহাবিশ্বের প্রতিটি হৃদস্পন্দন ঈশ্বরের উপস্থিতি তুলে ধরে। গোটা ইতিহাস জুড়ে মানুষের আধ্যাত্মিক ধারণা বিবর্তিত হয়ে আসছে, এবং এখন মানুষ এক নতুন বিশ্বের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে, যেখানে নারী-পুরুষ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবে যে তথাকথিত 'অতিপ্রাকৃত' ও লৌকিকের ভেতর কোনও পার্থক্য নেই। ঈশ্বরের সাথে গভীর একাত্মতা উপলব্ধি করবে তারা, পরস্পরের সাথে শান্তিতে বসবাস করবে।

সব মিলেনিয়াল দর্শনের মতোই উদার ধর্মতত্ত্ব হতাশ হতে বাধ্য ছিল। বৃহত্তর ছন্দ অর্জন নয়, বরং গভীরভাবে বেকায়দায় পড়ে গেছে বলে আবিষ্কার করেছিল আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টরা। মতপার্থক্য গোটা গোষ্ঠীকেই ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার হুমকি সৃষ্টি করেছিল। বিবর্তন নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিরোধের মুল কারণ ছিল হাইয়ার ক্রিটিসিজম। উদারপন্থীদের বিশ্বাস ছিল, বাইবেল সংক্রান্ত নতুন তত্ত্বগুলো কোনও কোনও প্রাচীন বিশ্বাসকে খাট করে দিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সেগুলো ঐশীগ্রন্থের আরও গভীর উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু ঐতিহ্যবাদীদের কাছে 'হাইয়ার ক্রিটিসিজম' ছিল ভীতিকর পরিভাষা। প্রাচীন নিশ্চয়তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলা আধুনিক শিল্পায়িত সমাজের যা কিছু ভুল তার মূর্ত প্রতীক মনে হয়েছে একে। এই সময় নাগাদ পপুলারাইজাররা নতুন ধারণাকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে এসেছিল। বেশ ভালোরকম বিভ্রান্তির ভেতর ক্রিশ্চানরা আবিষ্কার করেছিল যে, পেন্টাটিউক আসলে মোজেসের রচনা নয়, আবার সালমও ডেভিড লিখেননি; জেসাসের কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মলাভ নেহাতই কথার

AMARBOI.COM

কথা, এবং মিশরের দশটি প্লেগ ছিল সম্ভব পরে অলৌকিক কাণ্ড হিসাবে ব্যাখ্যা করা প্রাকৃতিক বিপর্যয়।[২২] ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক হাম্ফ্রে ওয়ার্ড *রবার্ট এলসমেয়ার* প্রকাশ করেন, যেখানে হাইয়ার ক্রিটিসিজমের কারণে বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ব্রত থেকে ইস্তফা দিয়ে লন্ডনের ইস্ট এন্ডে সমাজ সেবায় নিয়োজিত এক তরুণ যাজকের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উপন্যাসটি বেস্ট সেলারে পরিণত হয়ে, যা অনেককেই নায়কের সন্দেহের সাথে নিজেকে একাত্ম করতে পারার ইঙ্গিত দেয়। রবার্টের স্ত্রী যেমন বলেছে, 'গস্পেল ইতিহাসের মতো সত্যি না হলে তা কীভাবে সত্যি হতে পারে বা তার কোনও মূল্য থাকতে পারে, আমার মাথায় আসে না।'[২৩]

আধুনিক বিশ্বের যৌক্তিক পক্ষপাত এই সময় পাশ্চাত্য ক্রিশ্চানদের অনেকের কাছে মিথের গুরুত্ব উপলব্ধি অসম্ভব করে তুলেছিল। বিশ্বাসকে যৌক্তিক হতে হবে, *মিথোসকে* হতে হবে *লোগোস*। সত্য-কে এখন তথ্যভিত্তিক বা যৌক্তিক ছাড়া অন্য কিছু ভাবা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। এইসব নতুন বাইবেলিয় তত্ত্ব ক্রিশ্চান ধর্মের মৌল কাঠামোকেই ধ্বংস করে দিয়ে কিছুই আর অবশিষ্ট রাখবে না বলে এক ধরনের ভীতি সৃষ্টি হয়েছিল। আবারও এক শূন্যতা এসে হাজির হয়েছিল। 'আমাদের সামনে কোনও অব্যর্থ মানদণ্ড না থাকলে,' যুক্তি দেখিয়েছেন আমেরিকান মেথডিস্ট যাজক আলেক্সান্ডার ম্যাকঅ্যালিস্টার, 'বলতে হবে আমাদের সামনে মানদণ্ড বলতে আসলে কিছুই নেই।'[২৪] একটি অলৌকিক ঘটনাকে বাদ দিন, সামঞ্জস্যতা দাবি করবে আপনাকে সবগুলোকেই বাদ দিতে হবে। জোনাহ আদতেই তিমির পেটে তিন দিন তিন রাত না কাটিয়ে থাকলে তবে কি ক্রাইস্ট আদৌ সমাধি থেকে উত্থিত হয়েছিলেন? প্রশ্ন তুলেছেন লুথারান প্যাস্টর জেমস রেমেস্নাইডার।[২৫] বাইবেলিয় সত্যসমূহকে এভাবে উন্মুক্ত করে তোলা হলে শোভন মূল্যবোধ মিলিয়ে যাবে। মেথডিস্ট যাজক লিয়েন্ডার ডব্লু. মিচেলের চোখে হাইয়ার ক্রিটিসিজমই ব্যাপক বিস্তৃত অন্ধকার, অবিশ্বস্ততা ও সংশয়বাদের জন্যে দায়ী।[২৬] প্রেসবিটারিয়ান এম. বি. ল্যাম্বডিন একে তালাক, দুর্নীতি, চুরি, অপরাধ ও হত্যাকাণ্ডের হার বৃদ্ধির জন্যে দায়ী করেছেন।[২৭]

মৌল ভীতি সৃষ্টি করায় যৌক্তিকভাবে হাইয়ার ক্রিটিসিজমের আর আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। ১৮৯১ সালে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগ এনে হাইয়ার ক্রিটিসিজমের পক্ষে প্রকাশ্যে সমর্থন দানের জন্যে উদারপন্থী প্রেসবিটারিয়ান চার্লস ব্রিগসকে নিউ ইয়র্ক প্রেসবিটারিতে বিচারের সম্মুখীন করা হলে সেই খবর *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর প্রথম পাতায় শিরোনাম আকারে আবির্ভূত হয়েছিল। তিনি খালাস পাওয়ার পর একে হাইয়ার ক্রিটিসিজমের বিজয় হিসাবে প্রশংসা করে *নিউ*

ইয়র্ক টাইমস, কিন্তু গোষ্ঠীর সাধারণ সভা এই রায়কে বাতিল করে গির্জা থেকে ব্রিগসকে সাময়িক বরখাস্ত করে। বিচার ছিল তিক্ত ও উগ্র; এমনি হট্টগোল গোটা গোষ্ঠীকেই সরাসরি দুই ভাগ করে দিয়েছিল। পরে দুইশো প্রেসবিটারির ভেতর ভোটাভুটি হলে নব্বই ভাগই ব্রিগসের মতের বিরোধিতা করে। এটা ছিল এই সময়ের অসংখ্য ধর্মদ্রোহীতার বেশি প্রচারণা লাভকারী একটিমাত্র, তখন একের পর এক উদারপন্থীকে গোষ্ঠী থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

১৯০০ সাল নাগাদ গোলমাল থিতিয়ে এসেছে বলে মনে হয়েছিল। হাইয়ার ক্রিটিসিজমের ধ্যারণা যেন সব জায়গায় প্রাধান্য বিস্তার করছিল, উদারবাদীরা তখনও গোষ্ঠীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেছিলেন, আর রক্ষণশীলরা যেন স্তব্ধ ও নিশ্চুপ হয়েছিল। কিন্তু এই আপাত শক্তি ছিল প্রতারণামূলক। এই সময়ের পর্যবেক্ষকরা সচেতন ছিলেন যে, প্রায় সমস্ত গোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই-প্রেসবিটারিয়ান, মেথডিস্ট, ডিসাইপলস, এপিস্কোলিয়ান, ব্যাপ্টিস্ট-দুটো ভিন্ন 'চার্চ' আবির্ভূত হয়েছিল, 'পুরোনো' ও 'নতুন' দৃষ্টিভঙ্গিতে বাইবেল পর্যবেক্ষণ তুলে ধরছিল এগুলো।[২৮]

কোনও কোনও ক্রিশ্চান আসন্ন সংগ্রামের জন্যে এরই মধ্যে সংগঠিত হতে শুরু করেছিল। ১৮৮৬ সালে হাইয়ার ক্রিটিসিজমের শিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে পুনর্জাগরণবাদী ডিউইট মুডি (১৮৩৭-৯৯) শিকাগোয় মুডি বাইবেল ইন্সটিটিউট স্থাপন করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল 'গ্যাপ-ম্যান'-দের একটা ক্যাডার তৈরি করা যারা যাজক ও সাধারণ মানুষের মাঝখানে অবস্থান নিয়ে তাঁর বিশ্বাস মতে জাতিকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে আসা মিথ্যা ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে। মুডিকে আমেরিকান মৌলবাদের জনক অভিহিত করা হয়েছে। প্রিন্সটনের মতো তাঁর বাইবেল ইন্সটিটিউট রক্ষণশীল ক্রিশ্চান ধর্মের ঘাঁটিতে পরিণত হবে। কিন্তু হজ বা ওয়ারফিল্ডদের চেয়ে ডগমার বিষয়ে কম আগ্রহী ছিলেন মুডি। তাঁর বাণী ছিল সহজ ও প্রাথমিকভাবে আবেগঘন: পাপপূর্ণ জগৎ ক্রাইস্ট কর্তৃক রক্ষা পেতে পারে। মুডির অগ্রাধিকার ছিল আত্মার মুক্তি, তাঁর বিশ্বাস যাই হোক না কেন পাপীদের রক্ষা করার কাজে যেকোনও ক্রিশ্চানের সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। সামাজিক সংস্কারের বেলায় তিনি উদারপন্থীদের সাথে একমত ছিলেন: তাঁর ইন্সটিটিউটের স্নাতকদের দরিদ্রদের পক্ষে মিশনারিতে পরিণত হতে হত। কিন্তু মুডি ছিলেন প্রিমিলেনিয়ালিস্ট, যুগের ঈশ্বরবিহীন ধ্যানধারণা বিশ্বের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করতেন। উদারপন্থীদের বিশ্বাস মতো পরিস্থিতির মোটেই উন্নতি ঘটছে না; বরং প্রতিটি দিনই অবনতি ঘটছে।[২৯] ১৮৮৬ সালে তাঁর বাইবেল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার বছরে, শিকাগোর হেমার্কেট স্কয়ারে গোটা জাতিকে স্তব্ধ করে

দেওয়া এক করুণ ঘটনা ঘটে। ট্রেড ইউনিয়নের র‍্যালি অনুষ্ঠানের সময় মিছিলকারীরা পুলিসের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে বোমা বিস্ফোরণে সাত জন পুলিস প্রাণ হারায়, আহত হয় সত্তর জন। হেমার্কেট দাঙ্গা যেন শিল্পায়িত সমাজের সমস্ত অশুভকে ধারণ করেছিল। মুডি একে কেবল প্রলয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিতেই লক্ষ করতে পেরেছিলেন। 'এইসব মানুষকে ইভাঞ্জেলাইজ করতে হবে,' ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি, 'নইলে কমিউনিজম ও ধর্মহীনতার প্রভাব ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে এই দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি।'[৩০]

বাইবেল ইন্সটিটিউট একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলবাদী সংগঠনে পরিণত হবে। ফোলোঝিন *ইয়েশিভার* মতো এটা এক ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের লক্ষ্যে একটি ক্যাডার গঠন করার নিরাপদ ও পবিত্র অনক্লেভ তুলে ধরেছে। আসন্ন মৌলবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে চলা রক্ষণশীল প্রটেস্ট্যান্টরা মুডিকে অনুসরণ করেছে। ১৯০২ সালে উইলিয়াম বেল রাইলি নর্থওয়েস্টার্ন বাইবেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯০৭ সালে তেল ব্যবসায়ী লিম্যান স্টুয়ার্ট বাইবেল ইন্সটিটিউট অভ লস অ্যাঞ্জেলিস স্থাপন করেন। মূলধারার বিভিন্ন গোষ্ঠীতে উদারবাদীদের কাছে নিজেদের যারা কোণঠাসা মনে করেছে একজোট হতে শুরু করেছিল তারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের বছরে প্রথম প্রফিসি অ্যান্ড বাইবেল কনফারেন্সগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রক্ষণশীল প্রটেস্ট্যান্টরা আক্ষরিক, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বাইবেল পাঠ করার জন্যে একত্রিত হতে পারত, হাইয়ার ক্রিটিসিজম থেকে মনকে পরিষ্কার করে নিত ও নিজেদের প্রিমিলেনিয়াল ধারণা নিয়ে আলোচনা করত। একটি ভিন্ন পরিচয় গড়ে তুলতে চলেছিল তারা এবং ক্রমবর্ধিতহারে জনাকীর্ণ হয়ে ওঠা সম্মেলনগুলো চলার সময় স্বাধীন শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছিল তারা।

বিশেষ অনন্য পরিচয় সৃষ্টি ছিল আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রতি স্বাভাবিক সাড়া। সদ্য শিল্পায়িত উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলো ছিল মেল্টিং পট। ১৮৯০ সাল নাগাদ প্রতি পাঁচজন নিউ ইয়র্কবাসীর ভেতর চারজনই হয় নতুন অভিবাসী বা অভিবাসীর সন্তান ছিল।[৩১] বিপ্লবের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকভাবে প্রটেস্ট্যান্ট জাতি ছিল। এখন ডব্লুএএসপি পরিচয় যেন 'পাপিস্ট' প্লাবনে ধুয়ে মুছে যাবে বলে মনে হচ্ছিল। দূর্ভাগ্যজনকভাবে ভিন্ন পরিচয়ের অনুসন্ধান অনেক সময় মানুষ যার বিপরীতে নিজেকে পরিমাপ করে সেই স্টেরিওটাইপ 'অপর'-এর বিকাশের সাথে হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়। আধুনিকায়নের উত্থান-পতনের প্রতি সাড়াকে ষড়যন্ত্রের এক বিকৃত ভীতি বৈশিষ্ট্যায়িত করে চলবে এবং ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের গড়ে তোলা মৌলবাদী আন্দোলনসূহে তা বিশেষভাবে উপস্থিত থাকবে, যাদের প্রত্যেকে

AMARBOI.COM

তাদের প্রতিপক্ষের বিকৃত এবং প্রায়শঃই ক্ষতিকর ইমেজ গড়ে তুলবে, অনেক সময় যাদের শয়তানসুলভ অশুভ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টরা দীর্ঘদিন ধরে রোমান ক্যাথলিকদের ঘৃণা করে এসেছে, ডেইস্ট, ফ্রিম্যাসন ও মরমনদের ষড়যন্ত্রের ভয়ও করেছে তারা; এদের প্রত্যেকে এক সময় বা এক সময় সমাজের ক্রিশ্চান বুনন নষ্ট করে দিচ্ছে বলে মনে হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এইসব উদ্বেগ ফের চড়া হয়ে ওঠে। ১৮৮৭ সালে প্রটেক্টিভ অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হয়, ২,২৫০,০০০ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া সদস্য সংখ্যা নিয়ে জাতির বৃহত্তম ক্যাথলিক বিরোধী সংস্থায় পরিণত হয় এটি। সংস্থাটি দলের লোকদের উদ্দেশে সব প্রটেস্ট্যান্টকে হত্যা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মবিরোধী সরকার উৎখাতের আহবান জানানো আমেরিকান ক্যাথলিক বিশপদের কথিত 'প্যাস্টরাল চিঠি' জাল করে। ১৮৮৫ সালে জোসিয়া স্ট্রং *আওয়ার কান্ট্রি: ইটস পসিবল ফিউচার অ্যান্ড ইটস প্রেজেন্ট ক্রাইসিস* প্রকাশ করেন। এতে 'ক্যাথলিক হুমকিকে' জাতির মোকবিলা করা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ক্যাথলিকদের ভোট দেওয়ার মানে হবে আমেরিকাকে শয়তানি প্রভাবের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া; ইতিমধ্যে আমেরিকা গথ ও ভ্যান্ডালদের চেয়ে দ্বিগুন সংখ্যক রোমান্টিস্টদের স্রোতের মোকাবিলা করেছে, পঞ্চম শতাব্দীতে এরাই রোমান সাম্রাজ্যের পতন ডেকে এনেছিল। আমেরিকানরা সর্বনাশের এক ফ্যান্টাসিকে লালন করছিল; বিকৃত ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তাদের নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের উপর নামহীন ও আকারহীন ভীতি রোপনে সক্ষম করে তুলে একে এভাবে সামালযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করেছে।[৩২]

AMARBOI.COM

ইউরোপে ভিন্ন পরিচয় গড়ে তোলার সাথে সম্পর্কিত হয়ে ষড়যন্ত্র ভীতি 'বৈজ্ঞানিক' বর্ণবাদের রূপ নিয়েছিল, যা ১৯২০-র দশকের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছবে না। ব্যাপকভাবে ইহুদি জনগণের উপর কেন্দ্রিভূত ছিল তা, এটা ছিল ইউরোপিয়দের নজীরবিহীন দক্ষতার সাথে তাদের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম করে তোলা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির অবদান। চিকিৎসা বিজ্ঞান বা ল্যান্ডস্কেপে উদ্যান চর্চার মতো আধুনিক তৎপরতা মানুষকে ক্ষতিকর, অনভিজাত বা অপ্রয়োজনীয় সব জিনিস মুছে ফেলতে শিখিয়েছিল। জাতীয়তাবাদ ইউরোপিয় রাষ্ট্রসমূহের প্রধান আদর্শে পরিণত

হচ্ছে, এমন একটা সময়ে ইহুদিদের উত্তরাধিকার সূত্রে ও নিরাময়অযোগ্যভাবে কসমোপলিটান মনে হয়েছে। জনতার অত্যাবশ্যকীয় জীববৈজ্ঞানিক ও জেনেরিক বৈশিষ্ট্যাদি সংজ্ঞায়িত করার জন্যে তাদের গড়ে তোলা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইহুদিদের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে নেহাতই সংকীর্ণ ছিল। নতুন জাতিগুলো নিজেদের সংজ্ঞায়িত করার সময় আপন নতুন সত্তাকে নির্ধারণ করার জন্যে 'অপর'-কে প্রয়োজন হয়েছে তাদের; সুবিধাজনকভাবে হাতের কাছেই ছিল 'ইহুদি'রা। মালি যেভাবে বাগান থেকে আগাছা উপড়ে ফেলে বা শল্যচিকিৎসক কেটে ফেলে দেন ক্যান্সার তেমনিভাবে সমাজ থেকে ইহুদিদের উচ্ছেদ করতে চাওয়া আধুনিক এই বর্ণবাদ মানুষকে উন্নত বা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, এমন এক দৃঢ় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত এক ধরনের সামাজিক এঞ্জিনিয়ারিং ছিল। শত শত বছরের ক্রিশ্চান কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এটা এবং একে একটা বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা দিয়েছিল।

অবশ্য, একই সময়ে 'ইহুদি'রা একটা প্রতীকেও পরিণত হয়েছিল যার উপর লোকে আধুনিকায়নের সামাজিক গোলমালের ভীতি ও সংস্কারকে স্থান দিতে পারছিল। ইহুদিরা ঘেটো থেকে বের হয়ে ক্রিশ্চান সমাজে আবির্ভূত হয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন শুরু করায় তারা যেন পুরোনো ব্যবস্থার বিনাশই প্রতীকায়িত করে তুলেছিল। ইউরোপিয়রা আধুনিকতাকে ভীতিকর 'মেল্টিং পট' হিসাবেও অনুভব করেছে। নতুন শিল্পোন্নত বিশ্ব প্রাচীন সব বাধা ভেঙে ফেলছিল, অনেকে এখন একে পরিষ্কার সীমারেখাহীন আকার বিহীন সমাজ হিসাবে ধরে নিয়েছিল, অরাজক ও বিশৃঙ্খলাকারী অবস্থা। মূলধারায় মিশে যাওয়া ইহুদিদেরই বেশি অস্বস্তিকর মনে হয়েছে। তারা কি 'অ-ইহুদি'-তে পরিণত হয়ে এখনও অনতিক্রম্য মনে হওয়া বিভাজন রেখা অতিক্রম করতে পেরেছে?[৩৩] আধুনিক অ্যান্টি-সেমিটিজম আধুনিকায়ন ও সামাজিক বিভ্রান্তির ভীতিকর মাত্রার গোলমালে বিব্রত বোধকারীদের হতাশা ও অসন্তোষ প্রকাশের একটা লক্ষ্য তৈরি করে দিয়েছিল। 'সংজ্ঞায়িত' করার মানে ছিল এইসব ভীতিকর পরিবর্তনের উপর সীমা আরোপ করা; কোনও কোনও প্রটেস্ট্যান্ট যেমন কঠোরতর মতদবাদগত সংজ্ঞার ভেতর নিশ্চয়তার সন্ধান করেছে, অন্যরা নতুন করে পুরোনো সামাজিক সীমারেখা গড়ে তুলে শূন্যতাকে দূরে ঠেলে রাখার চেষ্টা করেছে।

১৮৮০-র দশক নাগাদ আলোকনের সহিষ্ণুতা করুণভাবে অগভীর প্রমাণিত হয়ে পড়ে। আততায়ীর হাতে রাশিয়ায় উদারনৈতিক জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দার নিহত হওয়ার পর বিভিন্ন পেশায় ইহুদিদের নতুন করে অংশ নেওয়ার উপর নতুন করে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ১৮৯১ সালে দশ হাজারেরও বেশি ইহুদিকে

AMARBOI.COM

মস্কো থেকে বহিষ্কার করা হয় ও ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ সাল মেয়াদে এই অঞ্চলে ব্যাপক মাত্রায় বিতাড়নের ঘটনা ঘটে। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মার্জনা পাওয়া বা এমনকি তাদের হাতেই ঘটা হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারও ছিল। এসব ঘটনায় অবশেষে কিশিনেভের (১৯০৫) হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত ইহুদিদের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, এখানে পঞ্চাশ জন ইহুদিকে হত্যা করা হয়, আহত হয় পাঁচ শো।[৩৪] বছরে মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার ইহুদি পশ্চিমে পালিয়ে যেতে শুরু করেছিল, পশ্চিম ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও প্যালেস্তাইনে বসতি গড়তে শুরু করে তারা। কিন্তু বিচিত্র পোশাক-আশাক ও ভিনদেশী রীতিনীতি নিয়ে এই পূর্বাঞ্চলীয় ইহুদিদের পশ্চিম ইউরোপে আগমন পুরোনো সংস্কারকে ফের চাঙা করে তোলে। ১৮৮৬ সালে জার্মানি সরকারীভাবে অ্যান্টি-সেমিটিক প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রথম পার্লামেন্টারি ডেপুটি নির্বাচিত করে; ১৮৯৩ সাল নাগাদ এর সংখ্যা দাঁড়ায় ষোল। অস্ট্রিয়ায় ক্রিশ্চান সমাজতন্ত্রী কার্ল ল্যুগার (১৮৪৪–১৯১০) এক শক্তিশালী অ্যান্টি-সেমিটিক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ১৮৯৫ এর দিকে তিনি ভিয়েনার মেয়র নির্বাচিত হন।[৩৫] নতুন অ্যান্টি-সেমিটিজম এমনকি ফ্রান্সেও আঘাত হানে, ইহুদিদের মুক্তিদানকারী প্রথম ইউরোপিয় জাতি ছিল এরা। ৫ই জানুয়ারি, ১৮৯৫ জেনারেল স্টাফের একমাত্র ইহুদি অফিসার ক্যাপ্টেন আলফ্রেড দ্রেফাস বানোয়াট প্রমাণের ভিত্তিতে জার্মানদের কাছে গোপন তথ্য পাচারের দায়ে দোষী সব্যস্ত করা হয়; এই সময় উত্তেজিত মব চিৎকার করে বলছিল, 'দ্রেফাসের মৃত্যু চাই! ইহুদিদের মৃত্যু চাই!'

কোনও কোনও ইহুদি ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ বা সম্পূর্ণ সেক্যুলার জীবন যাপন করার মাধ্যমে মূলধারায় মিশে যাওয়া অব্যাহত রাখে। কেউ কেউ রাজনীতিতে যোগ দিয়ে রাশিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপিয় দেশে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী নেতায় পরিণত হতে শুরু করে বা ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় সদস্য হয়ে ওঠে। অন্যরা ধরে নেয় যে জেন্টাইল সমাজে ইহুদিদের জায়গা নেই; তাদের অবশ্যই পবিত্র ভূমি যায়নে ফিরে যেতে হবে, সেখানে নতুন ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। অন্যরা সংস্কার, রক্ষণশীল বা নিও-অর্থডক্স ইহুদিবাদের মতো একটি আধুনিকায়নের ধর্মীয় সমাধান পছন্দ করেছে। কেউ কেউ আধুনিক সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রথাগত অর্থডক্সিকে আঁকড়ে থেকেছে। এই হারেদিমরা ('কম্পিত জন') নতুন বিশ্বে ইহুদিবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত ছিল, মরিয়াভাবে প্রাচীন বিশ্বকে আবার গড়ে তোলার চেষ্টা করবে তারা। এমনকি রাশিয়া বা পোল্যান্ডে ওদের পিতৃপুরুষের মতো পশ্চিম ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফারের টুপি, কালো নিকার ও কাফতান পরা অব্যাহত রেখেছিল তারা। এক বৈরী বিশ্বে বেশিরভাগই ইহুদি পরিচয় ধরে

রাখার চেষ্টা করছিল, নিশ্চিহ্নতাকে দূরে ঠেলে রাখতে সংগ্রাম করছিল তারা; এবং কোনও ধরনের পরম নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার সন্ধান করছিল।

এই মনোভাবটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল রাশিয়ার লুবাভিচ ভিত্তিক র‍্যাবাই শ্লেয়ুর যালমানের উত্তরসূরিদের বংশধারার হাতে নিয়ন্ত্রিত হাবাদ হাসিদিজমে। ১৮৯৩ সালে এই উপাধী ধারণকারী পঞ্চম রেব্বে আর. শালোম দোভ (১৮৬০–১৯২০) ইহুদিবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক সফর করেছেন তিনি, লিথুয়ানিয়ার মিসনাগদিমের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন, ধর্মীয় অনুসরণের অধঃগতি দেখতে পাচ্ছিলেন। ১৮৯৭ সালে ফলোঝিন, শ্লোবোদকা ও মিরের মিসনাগদিক *ইয়েশিভোতের* আদলে হাবাদ *ইয়েশিভা* স্থাপন করেন তিনি। তিনিও 'প্রভুর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে' তরুণদের একটা ক্যাডার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। 'এই শত্রুরা' জার ও তাঁর কর্মকর্তারা ছিলেন না; এই ধরনের আন্দোলনের স্বাভাবিক ধারায় স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান হিসাবে সূচিত লুবাভিচ হাসিদিজম মৌলবাদী আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিল। পঞ্চম রেব্বের চোখে অন্য ইহুদিরাই–মাসকিলিম, যায়নিস্ট, সমাজতন্ত্রী ইহুদি ও মিসনাগদিম–ঈশ্বরের শত্রু। তাঁর দৃষ্টিতে এরা ধর্মবিশ্বাসকে মারাত্মকভাবে বিপদাপন্ন করে তুলছিল। তাঁর *ইয়েশিভার* ছাত্রদের বলা হত তামিমিম: 'খাঁটিজন'। 'রেব্বের সেনাদলের সদস্য হওয়ার' কথা ছিল তাদের, ইহুদিবাদের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে যারা 'কোনও রকম আপোস বা ছাড় ছাড়াই' যুদ্ধ করবে। মেসায়াহর আগমনের পথ তৈরি করবে তাদের সংগ্রাম।[৩৬]

প্যালেস্তাইনে একটি ইহুদি স্বদেশ ভূমি সৃষ্টির আন্দোলন যায়নিজম আধুনিকতার প্রতি এইসব ইহুদি সাড়ার ভেতর সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী ও কল্পনা নির্ভর। এটা কোনও একরৈখিক আন্দোলন ছিল না। যায়নিস্ট নেতারা নানা রকম আধুনিক ধ্যান-ধারণা থেকে গ্রহণ করেছেন: জাতীয়তাবাদ, পাশ্চাত্য আধিপত্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইহুদি আলোকনের সেক্যুলারিজম। প্যালেস্তাইনে একটি সমাজতন্ত্রী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে লিপ্ত ডেভিড বেন গুরিওনের (১৮৮৬–১৯৭৩) লেবর যায়নিজম প্রধান যায়নিস্ট আদর্শ হিসাবে আবির্ভূত হলেও যায়নিস্ট উদ্যোগ পুঁজিবাদের উপরও দারুণভাবে নির্ভর করেছে। ১৮৮০ থেকে ১৯১৭ সালের ভেতর ইহুদি ব্যবসায়ীরা প্যালেস্তাইনে অনুপস্থিত আরব ও তুর্কি জমির মালিকদের কাছ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিনোয়োগ করে জমি ক্রয় করেছে। থিওদর হার্যেল (১৮৬০–১৯০৪) ও চেইম ওয়েইম্যান (১৮৭৪–১৯৫৩)-এর মতো অন্যরা পরিণত হয়েছেন রাজনৈতিক লবিস্টে। ভবিষ্যতের ইহুদিরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপিয় কলোনি হিসাবে কল্পনা করেছেন হার্যেল। অনেকে আবার জাতি রাষ্ট্র চায়নি। বরং নতুন স্বদেশভূমিকে ইহুদিদের পক্ষে একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ভেবেছে। অনেকেই

AMARBOI.COM

আসন্ন অ্যান্টি-সেমিটিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেছে; নিশ্চিহ্নতার কবল থেকে ইহুদি জাতিকে রক্ষা করতে তাদের অবশ্যাই একটা নিরাপদ আশ্রয় ও শরণ তৈরি করতে হবে। তাদের নিশ্চিহ্নতার ভীতি কোনও নৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা ছিল না, বরং তা ছিল আধুনিকতার খুনে সম্ভাবনার বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়ন।

যায়নবাদের সবগুলো ধরনেই ভীত বোধ করেছে অর্থডক্সরা। উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মীয় ধরনের যায়নবাদ সৃষ্টির অন্তত দুটি প্রয়াস চলেছিল, কিন্তু কোনওটাই তেমন একটা সমর্থন পায়নি। ১৮৪৫ সালে সারায়েভোর সেফারদিক ইহুদি ইয়েহুদা হাই আলকালাই (১৭৯৮–১৮৭৮) যায়নে প্রত্যাবর্তনের প্রাচীন মেসিয়ানিক মিথকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কর্মসূচিতে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। মেসায়াহ কোনও ব্যক্তি নন, বরং একটা প্রক্রিয়া, 'খোদ ইহুদিদের প্রচেষ্টার ভেতর দিয়েই এর সূচনা ঘটবে, তাদের অবশ্যাই সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, নেতা নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাসনের দেশ ত্যাগ করতে হবে।'[৩৭] বিশ বছর পরে পোলিশ ইহুদি যভি হার্শ কালিশার (১৭৯৫–১৮৭৪) তাঁর *দেভিশাত যায়নে* ('যায়নের আশা', ১৮৬২) ঠিক এই বিষয়টিই তুলে ধরেন। প্রাচীন মিথলজিকে যৌক্তিক করার চেষ্টা করছিলেন আলকালাই ও কালিশার, একে ধরায় নামিয়ে এনে সেকুলারাইজ করছিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ, ধার্মিক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদির কাছে এ জাতীয় যেকোনও ধারণাই মারাত্মক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের বছরগুলোয় যায়নিস্ট আন্দোলন গতি অর্জন ও সুইটযারল্যান্ডের বাসেলে অনুষ্ঠিত বিশাল যায়নিস্ট সম্মেলনে আন্তর্জাতিক পরিচয় পেলে অর্থডক্সরা একে চরম ভাষায় নিন্দা জানিয়েছিল।[৩৮] প্রাক আধুনিক বিশ্বে মিথের সম্পূর্ণতই *লোগোসের* এখতিয়ারে থাকা বাস্তব ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের নীল-নকশা হওয়ার কথা ছিল না। মিথের কাজ ছিল এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে অর্থ ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি দান করা। শাব্বেতাই যেভি ঘটনা মনের অদৃশ্য বলয়ের কাহিনী ও ইমেজকে রাজনীতির বলয়ে প্রয়োগ করায় কী বিপদ হতে পারে সেটা দেখিয়েছিল। সেই প্রয়াসের ব্যর্থতার ধাক্কার পর থেকে *মিথোসকে লোগোস*-এর মতো বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগযোগ্যতা থাকার মতো করে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে পুরোনো সংস্কার ইহুদি কল্পনায় টাবুর শক্তি লাভ করেছিল। নিষ্কৃতি অর্জনের যে কোনও মানবীয় প্রয়াস বা পবিত্রভূমিতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে 'সমাপ্তিকে ত্বরান্বিত' করা ছিল ঘৃণিত। ইহুদিদের এমনকি যায়নে ফিরে যেতে বেশি প্রার্থনা করার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। একমাত্র নিষ্কৃতি দানের অধিকারী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এমন যেকোনও উদ্যোগ গ্রহণ বিদ্রোহের শামিল; যেকেউ

AMARBOI.COM

এমন কিছু করলে সে 'অন্যপক্ষে', দানবীয় বিশ্বে যোগ দেবে। ইহুদিদের অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। এটা নির্বাসনের অস্তিত্বমূলক অবস্থার একটা শর্ত।[৩৯] মোটামুটি শিয়া মুসলিমদের মতোই ইহুদিরা রাজনৈতিক সক্রিয়তা নিষিদ্ধ করেছিল, ইহুদি ইতিহাস থেকে ভালো করেই জানা ছিল তাদের ইতিহাসে মিথকে মূর্ত করে তোলা কতখানি মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আজও যায়নিজম ও এই আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট ইহুদি রাষ্ট্র ইহুদি বিশ্বে খোদ অধুনিকতার চেয়ে ঢের বেশি বিভাজক হয়ে আছে। যায়নিজম ও ইসরায়েল রাষ্ট্রের পক্ষে বা বিপক্ষে সাড়া ইহুদি মৌলবাদের সব ধরনের ক্ষেত্রে মূল প্রেরণাদায়ী শক্তিতে পরিণত হবে।[৪০] যায়নিজমের মাধ্যমেই মূলত সেক্যুলার আধুনিকতা ইহুদি জীবনে প্রবেশ করেছে; চিরকালের মতো একে বদলে দিয়েছে। এর কারণ প্রথমত, যায়নবাদীরা ইহুদিবাদের অন্যতম পবিত্র প্রতীক ইসরায়েল দেশকে যৌক্তিক, জাগতিক ও প্রায়োগিক বাস্তবতায় পরিণত করতে দারুণভাবে সফল হয়েছিল। একে অতীন্দ্রিয় বা হালাখিয়ভাবে ধ্যান করার বদলে যায়নবাদীরা শারীরিকভাবে, কৌশলগতভাবে ও সামরিকভাবে এই দেশে বাস করেছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থডক্সদের কাছে গোড়ার দিকের এই বছরগুলোতে এর মানে ছিল পবিত্র বাস্তবতাকে মাড়িয়ে যাওয়া ধর্মদ্রোহীর মতো। এটা ছিল শত শত বছরের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে যাওয়া অশ্লীলতার পরিকল্পিত কাজ।

কারণ সেকুল্যার যায়নবাদীরা ধর্ম প্রত্যাখ্যান করার বেলায় ছিল সোজাসাপ্টা। তাদের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষেই ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল। এদের অনেকেই ছিল নাস্তিক, সমাজতন্ত্রী, মার্ক্সিস্ট। খুব অল্প জনই তোরাহর বিভিন্ন নির্দেশনা পালন করত। কেউ কেউ ইতিবাচকভাবে ধর্মকে ঘৃণা করেছে, তাদের মতে এই ধর্ম ইহুদি জনসাধারণকে নিষ্ক্রিয় বসে থেকে মেসায়াহর অপেক্ষায় থাকতে উৎসাহিত করে ব্যর্থ করে দিয়েছে। নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করার বদলে ধর্ম ইহুদিদের জগৎ থেকে অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় অনুশীলন বা প্রাচীন টেক্সট পাঠে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রাচীন মন্দিরের শেষ রেলিক্স জেরুজালেমের পশ্চিম প্রাচীর আঁকড়ে ধরে ইহুদিদের কান্নার দৃশ্য বহু যায়নবাদীকে হতাশায় ভরে তুলেছে। অতিপ্রাকৃতের উপর আপাত অসহায় নির্ভরতা তারা যা কিছু অর্জনের প্রয়াস পাচ্ছিল তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল। যায়নবাদীরা ঘেটোর অস্বাস্থ্যকর, সীমিত জীবন থেকে মুক্ত এক নতুন আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে চাইছিল—নতুন ইহুদি। নতুন ইহুদি হবে স্বায়ত্তশাসিত, নিজ দেশে নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা। কিন্তু শেকড় ও আত্মসম্মানের এই সন্ধান ছিল ইহুদি ধর্ম থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার শামিল।

AMARBOI.COM

সবার উপরে যায়নবাদীরা ছিল বাস্তববাদী। এটা আধুনিক কালের মানুষে পরিণত করেছিল তাদের। কিন্তু তারপরেও তারা গভীরভাবে ভূমির প্রতীকের বিস্ফোরণমূলক 'শক্তি' সম্পর্কে সজাগ ছিল। ইহুদিবাদের পৌরাণিক বিশ্বে ভূমি ছিল দুটি পবিত্রতম বাস্তবতা হতে অবিচ্ছেদ্য: ঈশ্বর ও তোরাহ্। কাব্বালাহর অতীন্দ্রিয় যাত্রায় সত্তার অভ্যন্তরে অবতরণের শেষ পর্যায়ের সাথে প্রতীকীভাবে সম্পর্কিত ছিল, এবং কাব্বালিস্টের আপন সত্তার গভীরে আবিষ্কৃত স্বর্গীয় সত্তার মতো একই রূপের। ভূমি ছিল ইহুদি পরিচয়ের ক্ষেত্রে মৌল বিষয়। যায়নবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি যত বাস্তববাদীই হয়ে থাকুক, তারা বুঝতে পেরেছিল, অন্য কোনও দেশই আসলে ইহুদিদের 'রক্ষা' করতে পারবে না; মনস্তাত্ত্বিক উপশম এনে দেবে না। রাব্বিনিক প্রতিষ্ঠানের প্রবল বিরোধী পেরেযত্ স্মোলেনকিন (১৮৪২–৯৫) বিশ্বাস করতেন, একমাত্র প্যালেস্তাইনই ইহুদি রাষ্ট্রের সম্ভাব্য স্থান হতে পারে। লিও পিন্সকার (১৮২১–৯১) অনেক পরে নিজ বিবেচনা বোধের বিরুদ্ধে গিয়ে ধীরে ধীরে এই মতবাদে সমর্থন দিয়েছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন যে প্যালেস্তাইনেই ইহুদি রাষ্ট্র হতে হবে। বাসেলে দ্বিতীয় যায়নিস্ট সম্মেলনে (১৮৯৮) উগান্দায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে থিওদর হার্যেল আরেকটু হলেই নেতৃত্ব খোয়াতে যাচ্ছিলেন। তিনি প্রতিনিধিদের সামনে উঠে হাত তুলে সামিস্টের এই কথাগুলো উচ্চারণ করতে বাধ্য হন: 'জেরুজালেম, তোমাকে ভুলে গেলে আমার ডান হাত যেন খসে পড়ে!' যায়নবাদীরা তাদের সম্পূর্ণ সেক্যুলার এমনকি ঈশ্বরবিহীন অভিযানকে বাস্তব পৃথিবীতে একটি বাস্তবায়নযোগ্য বাস্তবতায় পরিণত করতে *মিথোসের* শক্তি কাজে লাগাতে প্রস্তুত ছিল। সাফল্যই ছিল তাদের বিজয়। কিন্তু পৌরাণিক, পবিত্র ভূগোলকে সমর্থন দান একে কাঠিন বাস্তবে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পাওয়ার সময় বরাবরের মতোই সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠবে। প্রথম দিকের যায়নবাদীদের পূর্ববর্তী দুই হাজার বছরের প্যালেস্তাইনের আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা ছিল না; তাদের শ্লোগান: 'জনহীন এক দেশের জন্যে দেশহীন এক জাতি!' দেশটি যে নিজস্ব দেশের জন্যে নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা লালনকারী প্যালেস্তাইনি আরবদের অধিবাস থাকার সত্যির প্রতি যারপরনাই উপেক্ষাই তুলে ধরেছিল। যায়নবাদ এর সীমিত, বাস্তব ভিত্তিক ও আধুনিক লক্ষ্যে সফল হয়ে থাকলেও তা ইসরায়েলের জনগণকে এমন এক বিরোধে জড়িয়ে দিয়েছিল এই বইটি লেখার মুহূর্তেও যা প্রশমিত হওয়ার তেমন একটা লক্ষণ দেখাচ্ছে না।

AMARBOI.COM

মিশর ও ইরানের মুসলিমরা, আমরা যেমন দেখেছি, প্রথমে আধুনিকতাকে আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক ও শোষণমূলক আবিষ্কার করেছিল। আজকাল পাশ্চাত্যের জনগণ মুসলিম মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে তাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা, তাদের নীতিমালাকে শয়তানসুলভ হিসাবে প্রত্যাখ্যান ও সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো মূল্যবোধের প্রতি কটাক্ষ করার কথা শুনে অভ্যস্ত। এমন একটা ধারণা রয়েছে যে 'ইসলাম' ও পাশ্চাত্য সম্পূর্ণ বেমানান; তাদের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত, পশ্চিম যা কিছুর পক্ষে 'ইসলাম' তারই বিরোধিতা করে থাকে। সুতরাং, এটা উপলব্ধি করা জরুরি যে, আসল ব্যাপার তা নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছি, মুসলিমরা তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক শক্তিতেই অনেক ধারণা ও মূল্যবোধ অর্জন করেছিল। তারা ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করার উপলব্ধির বিকাশ ঘটিয়েছিল ও ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার দর্শন গড়ে তুলেছিল; যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিল। ন্যায়বিচার ও সাম্যের প্রতি কোরানিক জোর আধুনিক পাশ্চাত্য রীতির মতোই পবিত্র। সুতরাং, বহু মুসলিম চিন্তাবিদের পাশ্চাত্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিস্ময়কর নয়। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, ইউরোপিয় ও মুসলিমরা একই মূল্যবোধ ধারণ করে, যদিও ইউরোপের জনগণ নিশ্চিতভাবেই আরও দক্ষ, গতিশীল ও সৃজনশীল সমাজ নির্মাণে অগ্রসর হয়েছে, যাকে তাঁরা নিজেদের দেশে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইরানে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তক, রাজনীতিক ও লেখকদের একটা দল ইউরোপিয় সংস্কৃতির সমীহের ক্ষেত্রে বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন।[৪১] ফতোদি আখুন্দযাদা (১৮১২–৭৮), মালকুম খান (১৮৩৩–১৯০৮), আব্দুল রহিম তারিবজাদা (১৮৩৪–১৯১১) এবং মির্যা আকা খান কিরমানি (১৮৫৩–৯৬) কোনও কোনও ক্ষেত্রে যায়নবাদীদের মতোই বিদ্রোহী ছিলেন। লাগাতার *উলেমাদের* বিরুদ্ধে লেগে থাকতেন তাঁরা, সম্পূর্ণ সেক্যুলার রাজনীতির পত্তন করতে চেয়েছেন, ধর্মকে মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষে ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছেন। যায়নবাদীদের মতোই তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস–তাঁদের বেলায় ইসলাম–মানুষকে পশ্চাদপদ করে রেখেছে, প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, ও মুক্ত আলোচনায় বাদ সেধেছে যা কিনা মহান পাশ্চাত্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিরমানি বিশেষ করে স্পষ্টভাষী

AMARBOI.COM

ছিলেন। ধর্ম বাস্তবভিত্তিক না হলে, তাঁর চোখে, এর কোনও প্রয়োজন নেই। হুসেইনের জন্যে কেঁদে হবে কী, যদি গরীবের জন্যে সত্যিকারের ন্যায়বিচারের অস্তিত্ব না থাকে?

> ইউরোপিয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা যখন গণিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করছে ও মানুষের অধিকারের পক্ষে লড়ছে, সেক্যুলারিজমের এই যুগে দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে সংগ্রাম করছে, সেখানে ইরানি *উলেমা* পবিত্রতার সমস্যা আর পয়গম্বরের স্বর্গে উর্ধ্বারোহণ নিয়ে আলোচনায় মেতে আছেন।[৪২]

কিরমানি জোরের সাথে বলেছেন, সত্যিকারের ধর্ম মানে যৌক্তিক আলোকন ও সমান অধিকার। এর মানে 'উঁচু দালানকোঠা, শিল্প উদ্ভাবন, কলকারাখানা, যোগাযোগের উপায়ের প্রসারণ, জ্ঞানের বিকাশ, সাধারণ মানুষের কল্যাণ, ন্যায়বিচার ভিত্তিক আইনের বাস্তবায়ন।'[৪৩] অবশ্যই কিরমানির ভুল হয়েছিল। ধর্ম এসবের কোনওটাই করেনি; বরং *লোগোস* অর্থাৎ, যৌক্তিক ভাবনা এইসব বাস্তব প্রকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। ধর্মের কাজ ছিল এইসব বাস্তবভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে পরম মূল্য দান করা। একদিক থেকে অবশ্য কিরমানি ঠিক ছিলেন, যখন তিনি শিয়া মতবাদকে প্রগতির পথে বাধা দেওয়ার জন্যে অভিযুক্ত করেছেন। জনমানুষকে সমাজের সহজাত সীমাবদ্ধতাগুলোকে মেনে নিতে সাহায্য করা ছিল রক্ষণশীল প্রাক আধুনিক ধর্মের অন্যতম কাজ; ইরানিরা প্রগতির প্রতি নিবেদিত আধুনিক বিশ্বে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে চাইলে ধর্মকে আর তেমন কিছু করতে দেওয়া যাবে না। ইসলামকে পরিবর্তিত হতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

বহু আধুনিক সেক্যুলারিস্টের মতো কিরমানি এবং তাঁর বন্ধুরা জাতির বিশৃঙ্খলার জন্যে ধর্মকে দুষেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছেন যে, আরবরা ক্ষতি করার জন্যে ইসলামকে ইরানের জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তো প্রাক ইসলামি ইরানের ক্ষীণ জ্ঞানের ভরসায় তাঁরা পার্সিয়ান পরিচয় গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ইউরোপিয় গ্রন্থের অপদ্ধতিগত পাঠের উপর নির্ভরশীল পাশ্চাত্য সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও সমানভাবে অপর্যাপ্ত ও আনাড়ী ছিল।[৪৪] এই সংস্কারকগণ পাশ্চাত্য আধুনিকতার জটিল প্রকৃতি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি, তাঁরা এর প্রতিষ্ঠানসমূহকে (উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতি, বিজ্ঞান ও ক্ষমতার প্রতীক) অনেকটা 'মেশিন' মনে করেছেন যা নির্ভুল ও যান্ত্রিকভাবে গোটা ইউরোপিয় অভিজ্ঞতাকে তৈরি করে দিতে পারবে। ইরানিরা পাশ্চাত্য সেক্যুলার আইনি কাঠামো (শরীয়ার

বদলে) অর্জন বা ইউরোপিয় কায়দার শিক্ষা করতে পারলে তারাও আধুনিক ও প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারবে। শিল্পায়ন ও আধুনিক অর্থনীতির গুরুত্ব বুঝতে পারেননি তাঁরা। ইউরোপিয় শিক্ষা নিশ্চিতভাবেই তরুণ ইরানিদের পক্ষে নতুন দরজা খুলে দিত, কিন্তু তাদের সমাজের অবকাঠামো অপরিবর্তিত রয়ে গেলে শিক্ষা দিয়ে তেমন কিছু করার থাকবে না তাদের। আধুনিকায়ন তখনও এমনকি শিশু অবস্থায়ও পৌঁছেনি; ইরানিদের তাদের কৃষিভিত্তিক সমাজকে শিল্পায়িত ও প্রযুক্তিয়ায়িত সমাজে পরিবর্তনের কষ্টকর ও হতাশব্যঞ্জক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কেবল সেটাই যেখানে সবাই ভাবতে পারবে, লিখতে পারবে, এবং পছন্দমতো ধারণা নিয়ে কাজ করতে পারবে, সংস্কারকদের কাঙ্ক্ষিত সেই উদার সভ্যতা সম্ভবপর করে তুলতে পারত, যেখানে কৃষিভিত্তিক সমাজের পক্ষে এই ধরনের স্বাধীনতাকে ধারণ করা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলো উপকারী হতে পারে, কিন্তু সেগুলো নিজে থেকে তখনও রক্ষণশীল কালে রয়ে যাওয়া দিগন্তধারী কোনও জাতির মানসিকতাকে পরিবর্তন করতে পারত না।

প্রকৃতপক্ষেই খোদ সংস্কারকদেরই এক পা তখনও প্রাচীন বিশ্বে রয়ে গিয়েছিল। আধুনিক সমাজে তাঁদের প্রাথমিক পদচারণাকে বিবেচনায় রাখলে এটা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। ইস্ফাহানের অতীন্দ্রিয় মতবাদ বাবিবাদ, সুফিবাদ ও সেই সাথে পাশ্চাত্যের বইপুস্তক পাঠ করার ভেতর দিয়ে প্রগতিশীল ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন তাঁরা। শিয়া আধ্যাত্মিকতা তাঁদের প্রাচীন বাধা ছুঁড়ে ফেলার মুক্তি ও সাহস যুগিয়েছিল, কিন্তু সেটা একেবারেই রক্ষণশীল উপায়ে। কিরমানি নিজেকে সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী দাবি করতেন: 'যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণই আমার বক্তব্যের উৎস ও আমার কর্মকাণ্ডের ভিত্তি,'[৪৫] জোরের সাথে বলেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদ সম্পূর্ণ পৌরাণিক ও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ ছিল। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কিন্তু তিনি ডারউইনবাদকে মোল্লা সদ্রার সম্পূর্ণতার দিকে সকল সত্তার প্রগতিশীল উন্নয়নের সাথে এক করে দেখেছেন। মালকুম খানও তাই। তাঁরা স্রেফ *ইলম*-এর ('আবশ্যক জ্ঞান') প্রাচীন মুসলিম ধারণাকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে স্থান করে দিতে প্রসারিত করছিলেন। সংস্কারকগণ আধুনিক দার্শনিকদের চেয়ে বরং মধ্যযুগের ফায়লাসুফদের মতো যুক্তি তর্ক দেখাতে চাইতেন। তাঁরা সকলেই শাহদের ক্ষমতাকে সীমিতকারী সাংবিধানিক সরকারের ধারণাকে সমর্থন করেছেন; ইরানে এই বিতর্ক শুরু করার ভেতর দিয়ে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। নিশ্চিতভাবেই তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল কোনও সরকারের কথা কল্পনা করেননি। মালকুম খানের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই দার্শনিক রাজার অজ্ঞ জনসাধারণকে পথ নির্দেশ করার পুরোনো

AMARBOI.COM

ফালসাফাহ্ আদর্শের কাছাকাছি ছিল, আধুনিক রাজনৈতিক বিজ্ঞানীর মতো নয়। তালিবজাদা বহুদলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি; তাঁর দৃষ্টিতে বিরোধী দলের ভূমিকা স্রেফ সরকারী দলের সমালোচনা করা ও কোনও সংকটের সময় ক্ষমতা দখলের জন্যে তৈরি থাকা।[৪৬] গণতান্ত্রিক আদর্শ গড়ে তুলতে পাশ্চাত্য জনগণের কয়েক শো বছরের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল; তো আবারও বলতে হয়, সংস্কারকগণের একে পুরোপুরি বুঝে উঠতে না পারায় বিস্ময়ের কিছু নেই। তাঁরা ছিলেন—এছাড়া আর কিছু হওয়ার উপায়ও ছিল না—ক্রান্তিকালের মানুষ, জাতিকে পরিবর্তনের দিক নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু আধুনিকতাকে সম্পূর্ণভাবে ভাষা দিতে পারেননি।

কিরমানি ও মালকুম খানের মতো বুদ্ধিজীবীগণ ইরানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবেন, নিজেদের প্রায়শঃই উলেমাদের সাথে বিরোধে লিপ্ত অবস্থায় আবিষ্কার করবেন। কিন্তু শতাব্দীর শেষের দিকে মাজকরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সব সময় প্রাচীন বয়ানে ডুবে ছিলেন না তাঁরা, বরং শাহগণ জনগণের জীবনকে বিপদাপন্ন করে বসলে হস্তক্ষেপে প্রস্তুত ছিলেন। ১৮৯১ সালে নাসির আদ-দিন শাহ (১৮২৯–৯৬) একটি ব্রিটিশ কোম্পানিকে ইরানে তামাক উৎপাদন ও বিক্রির একচেটিয়া অধিকার দান করেন। কাজার শাহরা বহু বছর ধরে এই ধরনের কনসেশন দিয়ে আসছিলেন, কিন্তু এপর্যন্ত কেবল সেইসব এলাকায় যেখানে ইরানিরা সংশ্লিষ্ট ছিল না। কিন্তু তামাক ইরানের জনপ্রিয় ফসল ছিল, হাজার হাজার জমি মালিক, দোকানি ও রপ্তানিকারকের আয়ের প্রধান উৎস। দেশময় *বাজারি* ও *উলেমাদের* নেতৃত্বে ব্যাপক প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে নাজাফের নেতৃস্থানীয় *মুজতাহিদ* হাজ মির্যা হাসান শিরাজি এক ফতওয়া জারি করে ইরানে তামাক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত ছিল এটা। সবাই, এমনকি অমুসলিম ইরানি ও শাহর স্ত্রীরা পর্যন্ত ধূমপান বন্ধ করে দেন। সরকার নতি স্বীকার করতে ও কনসেশন প্রত্যাহারে বাধ্য হয়।[৪৭] এটা ছিল পূর্বাভাসমূলক একটা সময়, ইরানি *উলেমাদের* সম্ভাব্য শক্তি দেখিয়ে দিয়েছিল, গোপন ইমামের একক মুখপাত্র হিসাবে তাঁরা এমনকি শাহর আনুগত্যও দাবি করতে পারতেন। ফতওয়াহটি ছিল যৌক্তিক, বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকর, কিন্তু কেবল প্রাচীন পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে ইমামের কর্তৃত্ব থেকে উদ্ভূত হয়েই তা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৮৭০-র দশকে মিশরেও আধুনিক ইউরোপকে উত্তেজনাকর ও অনুপ্রেরণামূলক হিসাবে দেখা হয়েছে, আধুনিকতার সমস্যা ও যন্ত্রণা সত্ত্বেও ইসলামিক চেতনার পক্ষেও একে অনুকূল বিবেচনা করা হয়েছে। এই উৎসাহ স্পষ্টভাবে মিশরিয় লেখক রিফাহ আল-তাহতাওয়ির (১৮০১–৭৩)[৪৮] রচনায়

AMARBOI.COM

প্রতিফলিত হয়েছে। মুহাম্মদ আলির ভক্ত ছিলেন তিনি, আযহারে পড়াশোনা করেছেন, নতুন মিশরিয় সেনাবাহিনীতে ইমামের দায়িত্ব পালন করেছেন, এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে তাহতাওয়ির দারুণ সমীহ ছিল। কিন্তু ১৮২৬ সালে তাহতাওয়ি মুহাম্মদ আলি প্যারিসে পাঠানো প্রথম ছাত্রদের একজন হয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর কাছে এক উন্মোচন। পাঁচ বছর ধরে তিনি ফরাসি, প্রাচীন ইতিহাস, গ্রিক মিথলজি, ভূগোল, গণিত ও যুক্তিবিদ্যার উপর পড়াশোনা করেন। বিশেষভাবে ইউরোপিয় আলোকনের ধারণায় রোমাঞ্চিত ছিলেন তিনি, এর যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাছে অনেকটাই ফালসাফার মতো মনে হয়েছে।[৪৯] দেশে ফেরার আগে তাহতাওয়ি তাঁর ডায়েরি প্রকাশ করেন, যা একজন বহিরাগতের চোখে আধুনিক পশ্চিম সম্পর্কে মূল্যবান প্রাথমিক ধারণা দেয় আমাদের। তাহতাওয়ির নিজস্ব সংস্কার ছিল। ধর্ম সম্পর্কে ইউরোপিয় দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাছে অবমূল্যায়নকর ও ফরাসি চিন্তাবিদদের পয়গম্বরদের অতীন্দ্রিয় অনুপ্রেরণার চেয়ে তাঁদের যৌক্তিক অন্তর্দৃষ্টিকে উন্নত ভাববার ক্ষেত্রে উদ্ধত মনে হয়েছে। তবে তাহতাওয়ির কাছে প্যারিসের সমস্ত কিছু ঠিকভাবে কাজ করা আর আলস্যকে অপছন্দ করা ভালো লেগেছিল। তিনি ফরাসি সংস্কৃতির সূক্ষ্মতা ও নৈপূণ্যকে সমীহ করেছেন; উল্লেখ করেছেন প্যারিসবাসীরা 'ট্র্যাডিশনে বন্দি নয়, তবে সব সময় সবকিছুর আদি জানতে চায় ও তার প্রমাণ চায়।' এমনকি সাধারণ মানুষও পড়ালেখা জানে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি, 'আর প্রত্যেকে যে যার ক্ষমতা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।' আধুনিকতার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান উদ্ভাবনের প্রতি আবেগ দেখেও মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। মানুষকে পরিবর্তনযোগ্য ও ভ্রান্তিময় করে তুলতে পারে তা, কিন্তু তাই বলে রাজনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নয়। 'কোনও একটা কাজে দক্ষ প্রত্যেকে এমন কিছু আবিষ্কার করতে চায় যার কথা আগে কেউ জানত না। কিংবা একটা কিছু শেষ করতে চায় যা এরই মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে।'[৫০]

মিশরে ফিরে নতুন ব্যুরো অভ ট্রান্সলেশনের পরিচালক হওয়ার পর-মিশরিয়দের কাছে ইউরোপিয় বিভিন্ন রচনা সুলভ করে তুলেছিল এই ব্যুরো-তাহতাওয়ি মিশরের লোকজনকে পশ্চিমের কাছে শিক্ষা নেওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। '*ইজতিহাদের* দরজা ('স্বাধীন যুক্তিপ্রয়োগ') অবশ্যই খুলে দিতে হবে, *উলেমাদের* অবশ্যই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, শরীয়াহকে আধুনিক কালের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, ও বিজ্ঞানীদের মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিতদের মতো একই মর্যাদা থাকতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ইসলামের ক্ষতি করতে পারে না; ইউরোপিয়া মূলত স্পেনের কাছ থেকে বিজ্ঞান শিখেছিল, তো পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পড়ার সময়ে আরবরা আসলে তাদের আদি জ্ঞানই ফিরিয়ে

নিচ্ছে। সরকার অবশ্যই প্রগতি ও উদ্ভাবনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না, বরং এগিয়ে চলার পথ দেখাতে হবে, কারণ পরিবর্তনই জীবনের ধারা। শিক্ষাই এর চাবিকাঠি; ফ্রান্সের মতো সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে, মেয়েদেরও ছেলেদের মতো সমান মর্যাদা থাকতে হবে।[৫১] তাহতাওয়ি বিশ্বাস করতেন, মিশর এক মহান ভবিষ্যতের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আধুনিকতার প্রতিশ্রুতিতে আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি; স্টিম এঞ্জিনের গুণ গেয়ে কবিতা লিখেছেন, স্যুয়েয ক্যানেল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রান্সন্যাশনাল রেলওয়েকে দূর দূরান্তের মানুষকে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বন্ধনে কাছাকাছি নিয়ে আসা এঞ্জিনিয়ারিং কৃতিত্ব হিসাবে দেখেছেন। ফরাসি ও ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মিশরের এসে বাস করতে দেওয়া হোক! তাহলেই কেবল প্রগতির ধারা বেগবান হবে।[৫২]

১৮৭০-র দশকে এক দল নতুন লেখক বর্তমানের লেবানন ও সিরিয়া থেকে কায়রোয় এসে বসতি করেন।[৫৩] এদের বেশিরভাগই ছিলেন খ্রিস্টান, ফরাসি ও আমেরিকান মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন তাঁরা, এবং তাঁদের এভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে প্রবেশাধিকার ছিল। এঁরা ছিলেন নতুন সাংবাদিকতার চর্চাকারী, অটোমান অঞ্চল থেকে খেদিভ ইসমাইলের কায়রোতে বেশি স্বাধীনতা আছে বলে আবিষ্কার করেন তাঁরা। নতুন নতুন সাময়িকী প্রকাশ করেন এরা, যেখানে লব্ধজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, শিল্পকারখানা, কৃষিখাত, নৈতিকতা আর সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, সাধারণ আরব পাঠকের কাছে গুরুত্ব পূর্ণ আধুনিক ধ্যান ধারণা পৌঁছে দেয়। এঁদের প্রভাব ছিল বিপুল। বিশেষ করে এই ক্রিশ্চান আরবরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সেক্যুলার হয়ে ওঠার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন; তাই ধর্ম নয় কেবল বিজ্ঞানই সভ্যতার ভিত্তি হতে পারে জোর দিয়েছেন। তাহতাওয়ির মতো পাশ্চাত্যের প্রেমে পড়েছিলেন তাঁরা, মিশরের জনগণের কাছে এই উৎসাহ পৌঁছে দিয়েছিলেন।

পরবর্তী কালে গড়ে ওঠার বৈরিতার আলোকে এই প্রাথমিক সমীহের কথা চিন্তা করা বেশ করুণই বলা চলে। তাহতাওয়ি ও সিরিয় সাংবাদিগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক সংক্ষিপ্ত মধুচন্দ্রমার কাল অতিবাহিত করছিলেন। ইসলামের প্রতি প্রাচীন ক্রুসেডিয় ঘৃণা যেন মুছে গেছে বলে মনে হয়েছিল, তাহতাওয়ি স্পষ্টতই ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে কোনও রকম রাজনৈতিক হুমকি মনে করতে পারেননি। যদিও তাঁর প্যারিস সফরের সাথে ফরাসিদের হাতে আলজেরিয়ার নিষ্ঠুর উপনিবেশিকরণের ঘটনা মিলে গিয়েছিল। তাহতাওয়ির কাছে ব্রিটিশ ও ফ্রান্স ছিল স্রেফ প্রগতির ধারক। কিন্তু ১৮৭১ সালে এক ইরানি আবির্ভূত হন কায়রোয়, তিনি পাশ্চাত্যকে ভয় করতে শিখেছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পশ্চিমা বিশ্ব আধিপত্য অর্জনের

AMARBOI.COM

পথে এগিয়ে চলেছে। ইরানি ও শিয়া হলেও জামাল আল-দিন (১৮৩৯-৯৭) নিজেকে 'আল-আফগানি' (দ্য আফগান) বলে অভিহিত করতেন, সম্ভবত নিজেকে সুন্নি হিসাবে তুলে ধরে ইসলামি বিশ্বে বৃহত্তর শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন।[৫৪] প্রচলিত *মাদ্রাসা* শিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি, এখানে *ফিকহ* (জুরিসপ্রুডেন্স) এবং ফালসাফা ও অতীন্দ্রিয়বাদের *(ইরফান)*-এর নিগূঢ় অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারপরেও বিট্রিশ ভারতে এক সফরের সময় তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞান ও গণিতই ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। অবশ্য, প্যারিসাবসীদের দেখে মুগ্ধ হয়ে তাহতাওয়ির মতো আফগানি পশ্চিমের প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে যাননি। উপমহাদেশে এক দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততা রেখে যাওয়া ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিদ্রোহের (১৮৫৭) সাথে তাঁর সফর কাল মিলে গিয়েছিল। আরব, তুরস্ক, রাশিয়া ও ইউরোপ সফর করেন আফগানি, পাশ্চাত্যের সর্বব্যাপিতা ও মুক্তি দেখে দারুণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। পশ্চিম ইসলামকে মাড়িয়ে যাবে বলে স্থির নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৭১ সালে কায়রোয় পৌঁছানোর মুহূর্তে একটা মিশন ছিল তাঁর হাতে। মুসলিম বিশ্বকে ইসলামের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শানাতে ধর্মকে ব্যবহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি।

আফগানি ছিলেন আবেগপ্রবণ, বাগ্মী, বেপরোয়া ও রগচটা মানুষ। অনেক সময় খারাপ ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছেন তিনি, কিন্তু সন্দেহাতীত ক্যারিশমা ছিল তাঁর। কায়রোয় অল্প দিনেই তিনি এক দল শিষ্য সংগ্রহ করেন ও তাদের তাঁর প্যান-ইসলামিক ধারণা প্রচারে উৎসাহিত করেন। এই সময় আধুনিক মিশরের ভবিষ্যৎ রূপ নিয়ে বেশ আলাপ আলোচনা চলছিল। সিরিয় সাংবাদিকরা সেক্যুলার রাষ্ট্রের ধারণাকে সমর্থন করেছেন, তাহতাওয়ির বিশ্বাস ছিল মিশরিয়দের উচিত হবে পাশ্চাত্য কায়দায় জাতীয়তাবাদের চর্চা করা। আফগানি এসবের কোনওটার পক্ষেই ছিলেন না। তাঁর চোখে, ধর্ম দুর্বল হয়ে গিয়ে থাকলে মুসলিম সমাজ অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেবল ইসলামকে সংস্কার করে ও নিজস্ব অনন্য সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থেকেই মুসলিম দেশগুলো আবার শক্তিশালী হয়ে উঠতে ও জ্ঞানিক আধুনিকতার নিজস্ব ভাষ্য নির্মাণ করতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলিমরা কঠোর পদক্ষেপ না নিলে ইসলামি সম্প্রদায় *(উম্মাহ)* অচিরেই অস্তিত্ব হারাবে। সময় কম। ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতিদিনই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, খুবই অল্প দিনের ভেতর ইসলামি বিশ্ব পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পায়ে দলিত হবে।

সুতরাং, আফগানির ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের প্রত্যক্ষ করা আধুনিকতার সমস্যাগুলোর প্রতি সাধারণ সাড়া নিশ্চিহ্নতার ভীতি থেকে উৎসারিত ছিল। তিনি

বিশ্বাস করেছেন যে, আধুনিক হওয়ার জন্যে ইউরোপিয় জীবনধারা বেছে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। মুসলিমরা নিজেদের মতো করেই সেটা করতে পারবে। স্রেফ ব্রিটিশ ও ফরাসিদের অনুকরণ করলে, নিজেদের ঐতিহ্যের উপর পাশ্চাত্য মূল্যবোধ চাপিয়ে দিলে, নিজেদেরই হারিয়ে ফেলবে তারা। স্রেফ বাজে নকলে পরিণত হবে তারা, না ঘরকা না ঘাটকা; এভাবে নিজেদেরই দুর্বলতাকে আরও প্রকট করে তুলবে।[৫৫] ওদের আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, সেটা ইউরোপের কাছ থেকেই শিখতে হবে; কিন্তু এটাই, যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি, 'আমাদের হীনতার ও পতনের' প্রমাণ। 'ইউরোপিয়দের অনুকরণ করে নিজেদের সভ্য করে তুলছি আমরা।'[৫৬] একটা প্রধান সমস্যা অনুভব করেছিলেন আফগানি। পাশ্চাত্য আধুনিকতা যেখানে বিশালাংশে উদ্ভাবন ও মৌলিকতার চর্চা করে সফল হয়েছিল, মুসলিমরা কেবল অনুকরণের ভেতর দিয়েই তাদের সমাজকে আধুনিক করে তুলতে পারে। আধুনিকায়ন কর্মসূচির একটি সহজাত ও অনিবার্য ঘাটতি রয়েছে।

আবারও, আফগানি একটি বাস্তব সমস্যা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর সামাধান, আকর্ষণীয় শোনালেও, বাস্তবায়নযোগ্য ছিল না, কারণ ধর্মের কাছে এর প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। দুর্বলতা, অস্থিরতা ও উন্মূলতার ফলে সাংস্কৃতিক পরিচয় হারানোর শংকা তাঁর ঠিকই ছিল। এইসব রেডিক্যালভাবে নতুন ধারণার সাথে সৃজনশীলতার সাথে সামাল দিয়ে উঠতে ইসলামকে পরিবর্তিত হবার কথা বলে ঠিক যুক্তিই দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু খোদ ধর্মীয় সংস্কারের পক্ষে কোনও দেশকে আধুনিক করে পাশ্চাত্য হুমকি থেকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। মিশর শিল্পায়িত হতে না পারলে, একটি সজীব আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে না পারলে ও কৃষিভিত্তিক সমাজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যেতে না পারলে, কোনও আদর্শই দেশটিকে ইউরোপের সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে না। পশ্চিমে আমাদের স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার আধুনিক আদর্শগুলো একাধারে অর্থনীতি ও দার্শনিক ও রাজনীতি বিজ্ঞানীদের অবদান। ঘটনাপ্রবাহ অচিরেই প্রমাণ করবে যে, মিশরিয়রা নিজেদের যত মুক্ত ও আধুনিকই *ভাবুক* না কেন, অর্থনৈতিক দুর্বলতা তাদের রাজনৈতিকভাবে ভঙ্গুর ও পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল করে তুলবে, এবং এই অমর্যাদাকর দাসত্ব তাদের পক্ষে সত্যিকারের আধুনিক চেতনার চর্চা আরও কঠিন করে তুলবে।

কিন্তু আধুনিকতার জন্যে এই আকুতি সত্ত্বেও যেসব ইরানি বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে ছিলেন তাঁদের মতোই আফগানি তখনও অনেক দিক থেকেই প্রাচীন বিশ্বের মানুষ ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন তিনি, প্রার্থনা করতেন, ইসলামি আচার পালন করতেন ও ইসলামি বিধিবিধান মেনে জীবন যাপন

AMARBOI.COM

করতেন।[৫৭] মোল্লা সদ্রার অতীন্দ্রিয়াবাদের চর্চা করতেন, তাঁর বিবর্তনমূলক পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি শিষ্যদের ফালসাফাহর নিগূঢ় লোকবিদ্যার শিক্ষা দিতেন ও প্রায়শঃই মধ্যযুগের দার্শনিকের মতো যুক্তিতর্ক করতেন। অন্যান্য ধর্মীয় চিন্তাবিদের মতো নিজের বিশ্বাসকে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে, কোরান মুসলিমদের অন্ধবিশ্বাসে কোনও কিছু মেনে না নেওয়ার শিক্ষা দিয়েছে, প্রমাণ দাবি করার নির্দেশ দিয়েছে; সুতরাং, সমীহজনকভাবে তা আধুনিক বিশ্বের সাথে মানানসই। প্রকৃতপক্ষেই, আফগানি এপর্যন্তও বলেছিলেন যে, ইসলাম আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদেরই অনুরূপ, পয়গম্বর যে আইন গ্রহণ করেছিলেন সেটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতোই ও ইসলামের সব মতবাদকেই যুক্তি ও প্রাকৃতিক প্রদর্শনী দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব।[৫৮] একেবারেই ভুল ছিল এটা। যেকোনও প্রথাগত ধর্মের মতো *লোগোসের* সীমার বাইরে গিয়ে পয়গম্বরিয় ও অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করেছে ইসলাম, এবং প্রকৃতপক্ষে আফগানি স্বয়ং এভাবেই ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ভিন্ন মানসিক অবস্থায় তিনি একেই রকম স্বচ্ছন্দে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরতে পারতেন, যা 'যত সুন্দরই হোক না কেন...মানবজাতিকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারেনি, মানুষ আদর্শের জন্যে পিপাসার্ত থাকে, যা অন্ধকারে ও দূরে অবস্থান করে ও দার্শনিক ও পণ্ডিতগণ একে না ধারণা করতে পারেন না অনুসন্ধান করতে পারেন।'[৫৯] ইরানি বুদ্ধিজীবীদের মতো আফগানির তখনও এক পা ছিল প্রাচীন বিশ্বে, আবার একই সময়ে তিনি নতুন বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা করেছেন। নিজের বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ যৌক্তিক দেখতে চেয়েছেন তিনি, কিন্তু রক্ষণশীল কালের যেকোনও অতীন্দ্রিয়বাদীর মতোই জানতেন, তাঁর ধর্মের *মিথোস* মানবজাতিকে এমন এক অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে বিজ্ঞান যা পারেনি।

এই সামঞ্জস্যহীনতা সম্ভবত অনিবার্য ছিল, কারণ আফগানি ছিলেন ক্রান্তি কালের মানুষ। তবে তাঁর উদ্বেগ থেকেও এর উদ্ভব হয়েছিল। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল, আফগানি নিজের ভাবনার সমস্ত স্ববিরোধিতা মুছে ফেলতে পারছিলেন না। মুসলিমদের অবশ্যই নিজেদের আরও যৌক্তিক করে তুলতে হবে। এটাই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হতে হবে। তারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অবহেলা করে আসার ফলে ইউরোপের পেছনে পড়ে গেছে। তাদের '*ইজতিহাদের* দরজা' বন্ধ করে দিতে বলা হয়েছিল, বলা হয়েছিল অতীতের *উলেমা* ও সাধুদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে। আফগানি জোরের সাথে বলেছেন, এর সাথে প্রকৃত ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা এক ধরনের দাসত্বকে উৎসাহিত করে যা কেবল আধুনিক চেতনা বিরোধীই নয়, বরং মুসলিম বিশ্বাসের 'অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য' 'প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব'-কে

AMARBOI.COM

অগ্রাহ্য করে।[৬০] এখন যেমন দাঁড়িয়েছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 'কর্তৃত্ব' পেয়েছে, মুসলিমরা দুর্বল ও নাজুক হয়ে পড়েছে।[৬১] আফগানি বুঝতে পারছিলেন *ইজতিহাদের* দ্বার রুদ্ধ করার ভেতর দিয়ে প্রতীকায়িত প্রাচীন রক্ষণশীল রীতিনীতি মুসলিমদের পিছু টেনে রেখেছে। কিন্তু ধর্মের *মিথোসকে লোগোসের* মতো উপস্থাপিত করার প্রয়াসী যেকোনও সংস্কারকের মতো তিনি একদিকে যেমন অপর্যাপ্ত ধর্মীয় ডিসকোর্সের সৃষ্টির ঝুঁকি নিয়েছিলেন তেমনি অন্য দিকে ভ্রান্ত বিজ্ঞানের।

তাঁর অ্যাক্টিভিজম সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। আফগানি সঠিকভাবেই তুলে ধরেছিলেন ইসলাম কর্মের মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরা একটি ধর্ম। কোরানের 'আল্লাহ্ অবশ্যই কোনও সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে'[৬২] এই পঙক্তিটি উদ্ধৃত করতে ভালোবাসতেন তিনি। *মাদ্রাসায়* আশ্রয় নেওয়ার বদলে ইসলামকে রক্ষা করতে হলে মুসলিমদের রাজনীতির বিশ্বে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। আধুনিক বিশ্বে সত্যি বাস্তবভিত্তিক; একে অবশ্যই ভৌত ও অভিজ্ঞতার বলয়ে তৎপরতা দেখাতে হবে। আফগানি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, ইসলামের ঐতিহ্য তাঁর কালের বিশ্বে ঠিক পাশ্চাত্য আদর্শের মতোই কার্যকর। ইউরোপ অচিরেই দুনিয়া শাসন করতে যাচ্ছে উপলব্ধি করে তাঁর কালের মুসলিম শাসকদের বিপদ সম্পর্কে সজাগ করে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আফগানির বিপ্লবী প্রকল্পগুলো ছিল প্রায়শঃই স্বয়ং-ধ্বংসী ও নৈতিকভাবে সন্দেহপূর্ণ। কোনওটাই কোনও ফল বয়ে আনেনি। স্রেফ তাঁর তৎপরতার আনুষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ডেকে এনেছে মাত্র। ১৮৭৯ সালে সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডের দায়ে মিশর থেকে ও ১৮৯১ সালে ইরান থেকে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে, এবং পরে ইস্তাম্বুলে বাস করার অনুমতি দেওয়া হলেও অটোমান কর্তৃপক্ষের নিবিড় নজরদারিতে রাখা হয়। ধর্মীয় সত্যকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করার তাঁর প্রয়াস নিশ্চিহ্নতা ও বিপর্যয়ের ঝুঁকিপূর্ণ, আফগানি নিজেকে তাঁর ভ্রান্তিপূর্ণ বিপ্লবী কর্মতৎপরতার লক্ষ্যে ইসলামকে 'ব্যবহার' করার অভিযোগের শিকারে পরিণত করেছিলেন।[৬৩] তিনি স্পষ্টতই ধর্মীয় ঔচিত্যবোধকে তাঁর রাজনীতির সাথে যথেষ্ট গভীরতায় সমন্বিত করতে পারেননি। ১৮৯৬ সালে তাঁর এক শিষ্য তাঁরই তাগিদে নাসির আদ-দিন শাহকে হত্যা করে, সকল ধর্মের অন্যতম মূলনীতি লঙ্ঘন করেছিলেন আফগানি: মানুষের জীবনের পরম মূল্যের প্রতি সম্মান। ইসলামকে তিনি কেবল অদক্ষ ও অদ্ভুতই করে তোলেননি, সেই সাথে অনৈতিকও।

AMARBOI.COM

তাঁর ভাবনার স্পষ্ট ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছিল হতাশা থেকে। আফগানি বিশ্বাস করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্যের কাছে ইসলামি বিশ্ব নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। ১৮৮০-র দশকে প্যারিসে বাস করার সময় তিনি ভাষাবিজ্ঞানী আর্নস্ট রেনানের (১৮২৩–৯২) রচনায় বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদের দেখা পান; তাঁরা আধুনিক বিশ্বে ইসলামের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করেছিলেন। রেনানের বিশ্বাস ছিল সেমেটিক ভাষা হিব্রু ও আরবী দূষিত, এগুলো রুদ্ধ বিকাশের নজীর। এগুলোর 'আর্য' ভাষা ব্যবস্থার মতো সহজাত বিকাশের গ্রহণের ঘাটতি রয়েছে, নিজেদের নতুন করে সৃষ্টি করতে পারেনি। একইভাবে সেমিটিক জাতিগুলো কোনও রকম শিল্পকলা, ব্যবসা বা সভ্যতার জন্ম দিতে পারেনি। বিশেষ করে ইসলাম আধুনিকতার সাথে পাল্লা দিতে অক্ষম, মুসলিম দেশগুলোর স্পষ্ট হীনতা, তাদের সরকারের অযোগ্যতা এবং খোদ মুসলিমদের 'বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্য'তা থেকে যার প্রমাণ মেলে। আফ্রিকার মানুষের মতো ইসলামি বিশ্বের জনগণ মানসিকভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ উপলব্ধি করতে অক্ষম, একটা মৌলিক ধারণাও গঠন করার যোগ্যতা রাখে না। ইউরোপিয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে, আস্থার সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন রেনান, ইসলাম হারিয়ে যাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এর অস্তিত্বই থাকবে না।[৬৪] এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে আফগানি ইসলামের টিকে থাকা নিয়ে ভীত ছিলেন, নইলে ইসলামের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে এমন বাড়তি গুরুত্ব দিতে যেতেন না। সত্যিকারের হুমকীর প্রতি সাড়া হিসাবে মুসলিম চিন্তাভাবনায় এক নতুন আত্মরক্ষামূলক চেতনা অনুপ্রবেশ করেছিল। রেনানের মতো চিন্তকদের রচনায় ইসলামের স্টেরিওটিপিক্যাল ও অযথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামি দেশগুলোয় ঔপনিবেশিক আগ্রাসনকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করবে।

ইউরোপের বৃদ্ধিশীল পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজন থেকেই উপনিবেশবাদের সৃষ্টি। হেগেল যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, একটি শিল্পায়িত সমাজ 'এর বাইরের অন্য জাতির মাঝে...ভোক্তার সন্ধান করতে ও এর মাধ্যমে টিকে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করার' জন্যে প্রসারিত হতে বাধ্য। নতুন বাজারের অনুসন্ধান 'উপনিবেশের জন্যে জমিরও ব্যবস্থা করবে যেখানে সম্পূর্ণ বিকশিত বুর্জোয়াগোষ্ঠীকে ঠেলে দেওয়া হবে।'[৬৫] শতাব্দীর শেষের দিকে মধ্যপ্রাচ্যের উপনিবেশিকরণ বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলছিল। ১৮৩০ সালে ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে নিয়েছিল, নয় বছর পরে আদেন দখল করে ব্রিটেন। ১৮৮১ সালে অধিকৃত হয় তিউনিসিয়া, ১৮৮৯ সালে সুদান এবং লিবিয়া ও মরোক্কো ১৯১২ সালে। ১৯১৫ সালে সাইক্স-পিকো চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের প্রত্যাশায় মুমূর্ষু অটোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ভেতর

বিলি করে দেয়। এই ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ ছিল প্রবল ধাক্কার মতো, কার্যত এর মানে ছিল ওই সব দেশের প্রথাগত জীবনযাত্রার অবসান, অবিলম্বে গৌণ পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল সেগুলো।

উপেনিবেশকৃত দেশ রপ্তানির জন্যে পণ্যের সরবরাহ করেছে, ইউরোপিয় শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার পরে সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। এর বিনিময়ে তা সস্তা পাশ্চাত্য উৎপাদিত পণ্য লাভ করেছে, যার মানে ছিল স্থানীয় বাজারের মার খেয়ে যাওয়া। নতুন উপনিবেশগুলোর আধুনিক প্রযুক্তিকৃত সমাজের সাথে খাপ খাওয়া নিশ্চিত করার জন্যে পুলিস ও সামরিক বাহিনীকে ইউরোপিয় ধারায় নতুন করে সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল; আর্থিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনীতির উৎপাদনশীল দিকেরও অভিযোজনের প্রয়োজন হয়েছে, 'আনাড়ী'দের আধুনিক ধ্যানধারণার সাথে কিছুটা পরিচিত হতে হয়েছে। প্রজা জনসাধারণের কাছে এই আধুনিকতাকে অনুপ্রবেশকারী, নির্যাতনমূলক ও গভীরভাবে অস্থিতিশীল মনে হয়েছে।[৬৬] আফগানি চেয়েছিলেন মুসলিমরা যাতে নিজে থেকেই আধুনিক হয়ে দেশের ইউরোপের এমনি দুর্বল অনুরূপ হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পারে। ঔপনিবেশবাদ একে অসম্ভব করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য আধিপত্যের অধীনে আগত দেশগুলো আর নিজেদের মতো উন্নত হতে পারছিল না। একটি জীবন্ত সভ্যতাকে উপনিবেশবাদীরা নির্ভরশীল ব্লকে রূপান্তরিত করেছিল, স্বায়ত্তশাসনের এই ঘাটতি গভীরভাবে আধুনিক চেতনার বিরোধী দাসত্বের প্রবণতা ও অভ্যাস সৃষ্টি করেছিল। অনিবার্যভাবে তাহতাওয়ি ও অন্যান্য সংস্কারকদের মূর্ত করে তোলা ইউরোপের প্রতি আগের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তিক্ত হয়ে উঠেছিল ও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল।

কায়রোয় আফগানির অবস্থানের সময় মিশর ক্রমে উপনিবেশের জালের দিকে এগিয়ে চলছিল, যদিও এখনওই তা সম্পূর্ণ উপনিবেশে পরিণত হয়নি। খেদিভ ইসমাইলের ব্যয়বহুল সংস্কার ও আধুনিকায়নের প্রকল্পসমূহ দেশকে দেউলিয়া করে দিয়েছিল, ইউরোপিয় ঋণের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল তা। ১৮৭৫ সালে খেদিভ ব্রিটিশের কাছে স্যুয়েয খাল বিক্রি করতে বাধ্য হন, এবং ১৯৭৬ সালে, আমরা যেমন দেখেছি, ইউরোপিয় শেয়ারহোল্ডাররা মিশরের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিয়েছিল। ইসমাইল নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াস পেলে অটোমান সুলতানের সাথে যোগসাজশে ব্রিটিশ তাঁকে উৎখাত করে। খেদিভাত তাঁর ছেলে তেওফিকের হাতে বর্তায়। ১৮৮১ সালে মিশরিয় সামরিক বাহিনীর কিছু অফিসার আহমাদ বে উরুবির নেতৃত্বে এক অভ্যুত্থান সংগঠিত করেন। আফগানির কিছু অনুসারী ও মিশরে আধুনিক সাংবিধানিক শাসনের আকাঙ্ক্ষী কিছু লোক যোগ দেয় তাঁদের সাথে। উরুবি নতুন খেদিভের উপর নিজের সরকারকে কায়েম করতে

AMARBOI.COM

সক্ষম হন, এই বিজয়ের পর এক গণঅভ্যুত্থান ঘটে; বিট্রিশ সরকার শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষায় হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়। ১১ই জুলাই, ১৮৮২, ব্রিটিশ নৌবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ায় আক্রমণ চালায় ও ১৩ই সেপ্টেম্বরে তেল এল-কেবিরে উরুবিকে পরাস্ত করে। এরপর ব্রিটিশ মিশরে তাদের নিজস্ব সামরিক দখল প্রতিষ্ঠিত করে, যদিও খেদিভ তেওফিক সরকারীভাবে পুনর্বহাল হয়েছিলেন। এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মিশরের আসল শাসক হচ্ছেন ব্রিটিশ প্রোকনসাল, ইভেলিন ব্যারিং, লর্ড ক্রোমার।

লর্ড ক্রোমার ছিলেন টিপিক্যাল ঔপনিবেশিক। তাঁর চোখে মিশরিয়রা ছিল সহজাতভাবে পশ্চাদপদ জাতি, তাদের নিজেদের ভালোর জন্যেই উপনিবিশের অধীনে আনতে হয়েছে। রেনানের মতো আপন জাতির সাথে মুসলিমদের তুলনা করতে গিয়ে ধরে নিয়েছিলেন ইউরোপ বরাবরই প্রগতির সম্মুখ কাতারে ছিল। তিনি বুঝতে পারেননি, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো ইউরোপিয় দেশগুলো এককালে মধ্যপ্রাচ্যের মতোই 'পশ্চাদপদ' ছিল, তিনি স্রেফ একটি অসম্পূর্ণভাবে আধুনিকায়িত দেশের দিকে চোখ ফেরাচ্ছেন। খোদ 'অরিয়েন্টাল'দের সহজাতভাবে, উত্তারিকারসূত্রে ভ্রান্তিময় মনে করেছেন। মিশরে ক্রোমারের সাফল্য ছিল উল্লেখ করার মতো। অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করে তুলেছিলেন তিনি, দেশের সেঁচ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছেন ও তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বাধ্যতামূলক শ্রমের প্রাচীন ব্যবস্থা *কোভেই* বাতিল ও একটি উপযুক্ত বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে এই প্রগতির জন্যে মূল্য দিতে হয়েছে। খেদিভ নামমাত্র দেশের দায়িত্বে থাকলেও প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে একজন করে ইংরেজ 'উপদেষ্টা' ছিলেন, সবক্ষেত্রে তাঁর মতই চলত। এর প্রয়োজন রয়েছে মনে করেছেন ক্রোমার। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, ইউরোপিয়রা সব সময়ই যৌক্তিক, দক্ষ ও আধুনিক ছিল, অন্যদিকে অরিয়েন্টালরা প্রকৃতিগতভাবেই যুক্তিহীন, অবিশ্বস্ত ও দুর্নীতিগ্রস্ত।[৬৭] একইভাবে ইসলাম 'সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ,' এবং সংস্কার বা উন্নয়নে অক্ষম। 'সত্যিই মারা যায়নি এমন একটা দেহকে' নতুন করে বাঁচানো আসলেই অসম্ভব, শত শত বছর ধরে এভাবেই চলতে পারে তা, কিন্তু তারপরেও তা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মুমূর্ষু, আধুনিক নিরাময় দিয়ে তা ঠেকানো যাবে না।'[৬৮] তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, এই মারাত্মক রুদ্ধ দেশটির কিছুদিনের জন্যে ব্রিটিশ সমর্থনের প্রয়োজন হবে।

ব্রিটিশ দখলদারি মিশরের সমাজে নতুন বিভাজন সৃষ্টি করেছিল। *উলেমাগণ* শিক্ষক ও জ্ঞানের প্রধান অভিভাবকের আসন হারিয়েছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতরা তাঁদের স্থান দখল করেছিলেন। শরীয়া আদালতগুলো লর্ড ক্রোমার

AMARBOI.COM

প্রতিষ্ঠিত ইউরোপিয় সিভিল কোর্টের কারণে প্রতিস্থাপিত হয়। কারুশিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবাসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পাশ্চাত্যকৃত সিভিল সার্ভেন্ট ও বুদ্ধিজীবীরা এক নতুন অভিজাত গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিল, বিশাল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন তাঁরা। কিন্তু সম্ভবত খোদ মিশরিয়দেরই তাদের সম্পর্কে উপনিবেশবাদীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে আত্মস্থ করে নেওয়া সবচেয়ে ক্ষতিকর ছিল। এভাবে আফগানির এক শিষ্য মুহাম্মদ আব্দুহ (১৮৪৯–১৯০৫) ব্রিটিশ দখলদারিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আধুনিক কালকে তিনি 'বিজ্ঞানের প্রবলধারা' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, ধর্মের প্রথাগত মানুষদের ডুবিয়ে দিচ্ছে:

> এ এমন এক কাল যা আমাদের সাথে সভ্য জাতিসমূহের সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের অসাধারণ অবস্থা সম্পর্কে সজাগ করে তুলছে, সেই সাথে আমাদের মাঝারি দশা: এভাবে ওদের সম্পদ আর আমাদের দারিদ্র্য, ওদের গর্ব আর আমাদের অবনতি, ওদের শক্তি আর আমাদের দুর্বলতা, ওদের বিজয় আর আমাদের পরাজয়।[৬৯]

এমনি ক্ষয়কারী হীনম্মন্যতা উপনিবেশবাসীদের ধর্মীয় জীবনে অনুপ্রবেশ করে আব্দুহর মতো সংস্কারকদের ঔপনিবেশকারীদের অভিযোগের জবাব দিতে ও ইসলাম পাশ্চাত্যের মতোই ন্যায্য ও যৌক্তিক প্রমাণে বাধ্য করেছে।[৭০] প্রথমবারের মতো মুসলিমরা বিজয়ীদের তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এজেন্ডা স্থির করে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

উরুবি বিদ্রোহে জড়িত ছিলেন আব্দুহ, ব্রিটিশ বিজয়ের পর তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। প্যারিসে আফগানির সাথে মিলিত হন তিনি। দুজনের ভেতর অনেক বিষয়েই মিল ছিল। আফগানির অতীন্দ্রিয়াবাদী *(ইরফান)* ধর্মের প্রতি ভালোবাসার কারণে প্রথম দিকে তিনি তাঁর গোষ্ঠীর প্রতি আকৃষ্ট হন যাকে তিনি 'সুখের চাবিকাঠি'[৭১] বলতে পছন্দ করতেন। কিন্তু আফগানি আব্দুহকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাথেও পরিচিত করিয়ে দেন, পরে আব্দুহ গিযো, তলস্তয়, রেনান, স্ট্রাউস এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের পড়েন। ইউরোপে বেশ ভালোই স্বস্তি বোধ করতেন আব্দুহ, ইউরোপিয়দের সঙ্গ তাঁর ভালো লাগত। আফগানির মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন ইসলাম আধুনিকতার সাথে মানানসই, তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে এটা বিশেষভাবে যৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস, এবং *তাকলিদের* অভ্যাস আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত ও ভ্রান্তপূর্ণ। তবে আফগানির মতোই অতীন্দ্রিয় প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক চিন্তাভাবনার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন আব্দুহ। তখনও প্রাচীন বিশ্বের আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি তা।

শেষ পর্যন্ত আব্দুহ রাজনীতি নিয়ে আফগানির সাথে কলহে লিপ্ত হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মিশরের বিপ্লবের চেয়ে বরং সংস্কারই বেশি প্রয়োজন। গুরুর তুলনায় গভীর চিন্তাবিদ ছিলেন তিনি, বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিকায়ন ও স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত কোনও পথ নেই। আফগানির সাথে বিপজ্জনক অর্থহীন প্রকল্পে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে শিক্ষার মাধ্যমে মিশরের কিছু বড় বড় সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। ১৮৮৮ সালে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে দেওয়া হয়। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন তিনি, মিশরিয় ও ব্রিটিশদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকে, লর্ড ক্রোমার ও খেদিভের ব্যক্তিগত বন্ধুতে পরিণত হন।

ইতিমধ্যে দেশে বেশ লক্ষণীয় হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে বহু শিক্ষিত মিশরিয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, ব্রিটিশ দখলদারি অবাঞ্ছিত হলেও লর্ড ক্রোমার দেশকে খেদিভ ইসমাইলের চেয়ে ঢের ভালো চালিয়েছেন। কিন্তু ১৮৯০-র দশক নাগাদ ব্রিটিশের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের প্রায়শঃই আগের চেয়ে কম মেধাবী হতে দেখা গেছে, মিশরিয়দের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার বেলায় তাদের তেমন একটা প্রয়াস ছিল না। গেযিরা অঞ্চলে নিজস্ব অভিজাত মহল্লা গড়ে তুলেছিল তারা। মিশরিয় সরকারী কর্মকর্তারা আবিষ্কার করেন যে, তরুণ বিট্রনদের কারণে তাদের পদোন্নতি আটকা পড়ে যাচ্ছে, ক্যাপিটুলেশন কর্তৃক ব্রিটিশ ও অন্য বিদেশীদের দেওয়া বাড়তি সুবিধার কারণে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, এইসব সুবিধা দেশের আইন-কানুন থেকে রেহাই দিয়েছিল তাদের।[৭২] ক্রমেই বেশি সংখ্যক মানুষ জাতীয়তাবাদী মুস্তাফা কামালের (১৮৭৪–১৯০৮) জ্বালাময়ী ভাষণ শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠছিল। ব্রিটিশদের অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। আব্দুহ কামালকে শূন্যগর্ভ বক্তৃতাবাজ মনে করতেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, একটি স্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনা করার আগে মিশরিয়দের দখলদারির কারণে বহুগুণে বেড়ে ওঠা কিছু মারাত্মক সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

আব্দুহ'র দৃষ্টিতে এক গভীরভাবে ধার্মিক দেশে সেক্যুলারিস্ট ধারণা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনেক দ্রুত সূচিত হচ্ছিল। ইউরোপের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বেশ শ্রদ্ধা করতেন আব্দুহ। তবে সেগুলোকে মিশরে রোপন করা যাবে বলে মনে করেননি। বিপুল জনসংখ্যা নতুন আইনি ব্যবস্থার কিছুই বুঝতে পারেনি; এর চেতনা ও আওতা স্রেফ অজানা ছিল ওদের কাছে। এর ফলে মিশর কার্যত আইন বিহীন দেশে পরিণত হচ্ছিল।[৭৩] তো আধুনিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে ইসলামি আইনের ব্যাপক পর্যালোচনার পরিকল্পনা করেন তিনি। তাঁর পরলোকগমনের পর ১৯২০-র দশকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। আজও তা মিশরে চালু রয়েছে। আব্দুহ বুঝতে পেরেছিলেন, মিশরের সমাজ ভেঙে পড়ছে;

AMARBOI.COM

তাই প্রথাগত ইসলামি রীতিনীতির আধুনিক আইনি ও সাংবিধানিক বিকাশ সংযুক্ত করার প্রয়োজন ছিল; নইলে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার প্রতি যথেষ্ট উন্মুক্ত মিশরের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনও অর্থই করতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ, *শুরাহ্‌র* ('পরামর্শ') নীতিমালাকে গণতন্ত্রের সাথে মানানসই হিসাবে দেখা যেতে পারে; এবং *ইজমাহ* (সম্প্রদায়ের 'ঐকমত্য', ইসলামি আইনের অধীনে কোনও মুসলিম মতবাদ বা রেওয়াজকে যা স্বীকৃতি দেয়) এখন জনগণকে সাংবিধানিক নিয়মকানুন বুঝতে সাহায্য করতে পারে, এভাবে জনমত শাসকের ক্ষমতাকে সীমিত করতে পারবে।[৭৪]

শিক্ষাক্ষেত্রে জরুরি সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে, উল্লেখ করেছেন আব্দুহ, সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে; সমাজে তা অনতিক্রম্য বৈষম্য সৃষ্টি করছিল। এখনও রক্ষণশীল রীতিনীতিতে পরিচালিত ধর্মীয় স্কুল ও *মাদ্রাসায়* তরুণ মুসলিমরা স্বাধীন চিন্তাভাবনা থেকে নিরুৎসাহিত হচ্ছে; ঔপনিবেশিক উদ্যোগের সমর্থক ক্রিশ্চান মিশনারি স্কুলগুলোতে তরুণ মুসলিমরা দেশ ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সরকারী স্কুলগুলোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ: এগুলো ইউরোপিয় স্কুলের অক্ষম অনুকরণ, এখানে কোনও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় না। *উলেমাদের* কাছে শিক্ষাপ্রাপ্তরা সব ধরনের পরিবর্তনের পথে বাদ সাধছিল, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুণরা যেকোনও পরিবর্তনই গ্রহণ করছিল, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে ভাসা ভাসা পরিচিত ছিল তারা, আবার নিজ সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল।[৭৫]

১৮৯৯ সালে মিশরের মুফতি পরিণত হন আব্দুহ, ইসলামি আইনের ক্ষেত্রে দেশের প্রধান পরামর্শক। প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষার সংস্কারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, *মাদ্রাসার* ছাত্রদের আধুনিক সমাজের অংশ হয়ে ওঠার জন্যে বিজ্ঞান পড়তে হবে। এই সময় আব্দুহর দৃষ্টিতে আযহার ছিল ইসলামের যত ভ্রান্তির জ্বলন্ত নজীর: আধুনিক বিশ্বের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষামূলক কালপ্রমাদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু *উলেমারা* আব্দুহ'র সংস্কার প্রয়াসে বাধা দেন। মুহাম্মদ আলির আমল থেকেই আধুনিকতাকে রাজনীতি, আইন-কানুন, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে ঈশ্বরের প্রভাব হ্রাসকারী বিধ্বংসী আক্রমণ হিসাবে দেখে এসেছিলেন তাঁরা। তাঁদের জোর করে আধুনিক বিশ্বে ঠেলে দেওয়ার যেকোনও প্রয়াসই তাঁরা প্রতিহত করবেন। ইরানি *উলেমাদের* বিপরীতে তাঁরা *মাদ্রাসার* বাইরের জীবনে মারাত্মকভাবে অস্বস্তি বোধ করতেন। এদের বেলায় আব্দুহ তেমন একটা সাফল্য লাভ করতে পারেননি। আযহারের প্রশাসনকে আধুনিকায়িত করতে পেরেছিলেন

AMARBOI.COM

তিনি, শিক্ষকদের বেতন ও কাজের পরিবেশও উন্নত করেছিলেন। কিন্তু *উলেমা* ও ছাত্ররা একইভাবে পাঠ্যক্রমে আধুনিক সেক্যুলার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তির যেকোনও প্রয়াসের বিরোধিতা করেছেন।[৭৬] এমনি বিরোধিতার মুখে হতাশ হয়ে পড়েন আব্দুহ। ১৯০৫ সালে মুফতি পদে ইস্তফা দেন এবং এর অল্পদিন পরেই মারা যান।

আফগানি ও আব্দুহর সংগ্রাম দেখায় রক্ষণশীল কালে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা কোনও ধর্মবিশ্বাসকে আধুনিক বিশ্বের ভিন্ন রীতির সাথে খাপ খাওয়ানো কতটা কঠিন ছিল। তাঁরা উভয়েই দ্রুত সেক্যুলারাইজেশনের বিপদ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন–এবং সঠিকভাবেই। স্থানচ্যুতকারী পরিবর্তনের একটা কালে ইসলাম খুবই কাঙ্ক্ষিত ধারাবাহিকতার যোগান দেবে। মিশরিয়রা পরস্পরের কাছে আগন্তুক হয়ে উঠছিল, পাশ্চাত্যকৃতরা প্রায়শঃই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, কোথাওই তারা স্বস্তি পাচ্ছিল না এবং এককালে জীবনকে অর্থদানকারী পৌরাণিক ও প্রার্থনার অনুশীলন বিহীন আধুনিক অভিজ্ঞতার মূলে অবস্থিত এক শূন্যতার দিকে নেমে যাচ্ছিল তারা। প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছিল, কিন্তু নতুনগুলো ছিল অচেনা, ঠিকভাবে তাদের উপলব্ধি করা যাচ্ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আফগানি ও আব্দুহ তখনও প্রাচীন আধ্যাত্মিকতায় পুষ্ট হচ্ছিলেন। ধর্মকে অবশ্যই যৌক্তিক হতে হবে বলে জোর দেওয়ার সময় ধর্মীয়ভাবে অর্জিত সমস্ত সত্যিকে পরিত্যাগকারী ইউরোপিয় যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানীদের চেয়ে বরং মোল্লাহ সদ্রার অনেক কাছাকাছি ছিলেন তাঁরা। যুক্তিই সব সত্যির ফয়সালাকারী ও সকল মতবাদকে যৌক্তিক প্রমাণের অধীন হওয়ার উপযুক্ত হতে হবে বলার সময় অনুশীলনকারী অতীন্দ্রিয়বাদীর মতোই কথা বলেছেন তাঁরা। কিন্তু পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের চেতনায় আরও গভীরভাবে মগ্ন পরের প্রজন্মগুলো আবিষ্কার করবে যে কেবল যুক্তিই এক ধরনের পবিত্রতার বোধ জাগাতে সক্ষম নয়। দুর্জ্ঞেয় অর্থের এই বিনাশকে পাশ্চাত্যের মতো মুক্তি ও স্বাধীনতার সুবিধা দিয়ে ভারসাম্য প্রদান করা হয়নি তার কারণ ক্রমবর্ধমানহারে পাশ্চাত্যই এজেন্ডা স্থির করে দিচ্ছিল–এমনকি ধর্মীয় বিষয়েও।

ব্যাপারটা কতখানি বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে তারই একটা নজীর সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৯৯ সালে কাসিম আমিন (১৮৬৫–১৯০৮) *তাহরির আল-মারা* ('দ্য লিবারেশন অভ উইমেন') প্রকাশ করার পর। এখানে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, নারীদের অধঃপতিত অবস্থা–বিশেষ করে পর্দা প্রথা–মিশরের পশ্চাদপদতার জন্যে দায়ী। পর্দা 'নারী ও তার উন্নতির পথে বিরাট বাধা, এবং পরিণামে জাতি ও এর অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।'[৭৭] বইটির কারণে দারুণ শোরগোল পড়ে যায়, সেটা এখানে নতুন কিছু বলার কারণে নয়, বরং মিশরিয় লেখক একটা উপনিবেশবাদী সংস্কারকে আত্মস্থ ও গ্রহণ করায়। বছরে পর বছর

AMARBOI.COM

মিশরের নারী-পুরুষ নারীদের অবস্থানের মৌলিক পরিবর্তনের জন্যে বিক্ষোভ করে আসছিল। খোদ আব্দুহ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোরান আল্লাহ'র চোখে নারী-পুরুষকে সমান হিসাবে উপস্থাপন করেছে, তালাক বা বহুগামীতা সংক্রান্ত প্রথাগত বিধি ইসলামের ক্ষেত্রে আবশ্যক নয়: এগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব, করতে হবে।[৭৮] নারীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। মুহাম্মদ ইসমাইল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মেয়েদের প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন; ১৮৭৫ সাল নাগাদ প্রায় তিন হাজার মিশরিয় মেয়ে মিশন স্কুলে পড়াশোনা করে ও ১৮৭৩ সালে সরকার মেয়েদের জন্যে প্রথম রাষ্ট্রীয় প্রাথমিক স্কুল ও পরের বছর একটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করে। অতিথিরা মন্তব্য করেছেন, মেয়েদের ঘনঘন প্রকাশ্যে দেখা গেছে; কেউ কেউ পর্দা ফেলে দিচ্ছিল: শতাব্দীর শেষ নাগাদ মহিলারা পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করছিলেন এবং ডাক্তার ও শিক্ষকে পরিণত হচ্ছিলেন। ব্রিটিশদের আবির্ভাবের সময়ই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, যদিও অনেক পথ বাকি ছিল, তবে যাত্রা শুরু হয়েছিল।

পর্দা প্রথা ইসলামে মৌলিক বা মৌল অনুশীলনের কোনওটাই নয়। কোরান সকল নারীকে মাথা আবৃত করার নির্দেশ দেয়নি, পয়গম্বরের পরলোকগমনের অন্তত তিন প্রজন্ম পার হয়ে যাবার আগে ইসলামি বিশ্বে মেয়েদের আবৃত করে হেরেমে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রথাটির আবির্ভাব ঘটেনি; এই সময় মুসলিমরা বাইযান্তিয়ামের ক্রিশ্চান ও পারসিয়ার যরোস্ত্রিয়দের অনুসরণ শুরু করেছিল, যারা নারীদের দীর্ঘদিন ধরে এভাবে রেখে এসেছিল। কিন্তু সব মহিলাই বোরখা পরত না; এটা ছিল মর্যাদার প্রতীক; কৃষক সমাজ নয়, বরং উঁচু সমাজের নারীরা বোরখা পরত। কাসিম আমিনের গ্রন্থ অবশ্য পর্দার প্রান্তিক অনুশীলনকে পুরোপুরি আধুনিকায়ন বিতর্কের প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে আসে। তিনি জোরের সাথে বলেন যে, যতক্ষণ না পর্দাপ্রথার অবলুপ্তি ঘটানো হচ্ছে, মুসলিম বিশ্ব অপমানকর অবস্থায় পড়ে থাকবে। অংশত *তাহরির আল-মারা*'র কারণে সৃষ্ট শোরগোলের ফলেই পর্দা বহু মুসলিমের কাছে ইসলামি শুদ্ধতার প্রতীকে পরিণত হয়, অথচ বহু পশ্চিমার চোখে পর্দাপ্রথা ছিল ইসলামের দুরারোগ্য নারীবিদ্বেষের 'প্রমাণ'।

পর্দাকেই ইসলামের সকল ভ্রান্তির মূল কারণ হিসাবে প্রত্যক্ষকারী আমিনই প্রথম ব্যক্তি নন। ব্রিটিশদের আগমন ঘটলে এই রেওয়াজ দেখে ভীতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিল তারা, যদিও পাশ্চাত্য পুরুষরা তখনও নারীবাদের প্রতি পরিহাসপ্রবণ ছিল, স্ত্রীরা ঘরের ভেতরেই অবস্থান করুক, এমনটাই চাইত তারা, নারী-শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের বিরোধী ছিল। লর্ড ক্রোমার এই দিক থেকে ছিলেন টিপিক্যাল: নারীর ভোটাধিকারের বিরোধিতা করার জন্যে লন্ডনের মেন'স লীগ গঠন করেছিলেন তিনি, অথচ তিনিই আবার মিশরের উপর রচিত তাঁর বিশাল গ্রন্থে মুসলিম নারীদের

AMARBOI.COM

অবস্থার জন্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।[৭৯] তাদের দমিত অবস্থা ক্ষয়রোগের মতো, একেবারে গোড়াতেই বিধ্বংসী কাজ শুরু করে দিয়েছে, শিশু অবস্থায় মায়েদের নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করেছে এবং ইসলামের গোটা ব্যবস্থাকেই কুরে কুরে খেয়েছে। পর্দা প্রথা 'মারাত্মক প্রতিবন্ধক যা মিশরিয়দের 'পাশ্চাত্য সভ্যতার সূচনার সাথে সংশ্লিষ্ট চিন্তা ও চরিত্রের বিকাশকে' আয়ত্ত করার পথ রুদ্ধ করেছে।'[৮০] মিশনারিরাও পর্দা প্রথার বিপর্যয়কর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বিলাপ করেছেন, তাদের ধারণা ছিল এই প্রথা নারীকে জীবন্ত কবর দিয়েছে ও তাকে বন্দি বা দাসীর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। এ থেকেই বোঝা যায় মিশরের জনগণের কত ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।[৮১]

আমিন পর্দা প্রথার এই পশ্চিমা পরিহাসসুলভ মূল্যায়ন নির্বিচারে মেনে নিয়েছিলেন। *তাহির আল-মারা'*য় নারীবাদী কিছু ছিল না। মিশরিয় নারীদের নোংরা ও অজ্ঞ হিসাবে তুলে ধরেছেন আমিন; এমন মায়েদের নিয়ে মিশর পশ্চাদপদ, অলস জাতি ছাড়া আর কীই বা হতে পারে? মিশরিয়রা কি কল্পনা করে দেখেছে যে

> ইউরোপের মানুষ, যারা বাষ্প ও বিদ্যুতের শক্তি আবিষ্কার করার মতো সম্পূর্ণতা ও বুদ্ধিবৃত্তি অর্জন করেছে...যারা প্রতিদিন জ্ঞানের অনুসন্ধানে জীবনের ঝুঁকি নেয় ও জীবনের আনন্দকে সম্মান দেয়...এই বুদ্ধিমত্তা ও প্রাণ, আমরা যাদের এত সম্মান করি...এর ভেতর ভালো কিছু থাকলে এত দিন চর্চা করার পর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিত?[৮২]

এটা বিস্ময়কর নয় যে, এমনি তোষামুদি পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। আরব লেখকগণ তাঁদের সমাজের এমনি মূল্যায়ন মেনে নিতে অস্বীকার করেন, এই উত্তপ্ত বিতর্কের ধারায় পর্দাপ্রথা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীকে পরিণত হয়। এবং সেভাবেই আছে। অনেক মুসলিমই এখন পর্দাকে সকল নারীর জন্যে শোভনতার প্রতীক ও প্রকৃত ইসলামের চিহ্ন মনে করে। নারীবাদী যুক্তি প্রয়োগ করে, যার জন্যে অনেকেরই তেমন একটা বা আদৌ কোনও সহানুভূতি নেই, প্রচারণার অংশ হিসাবে উপনিবেশবাদীরা মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের লক্ষ্যকে রঞ্জিত করেছে ও ধর্মবিশ্বাসকে এর আগে অনুপস্থিত ভারসাম্যহীনতা যোগ করে বিকৃত করেছে।[৮৩]

আধুনিক রীতিনীতি ধর্মকে পাল্টে দিচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের ভেতর এমনও ছিল যারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে তাদের ধর্ম বিনাশের ঝুঁকির ভেতর রয়েছে। ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্যে বেশ কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা। কেউ কেউ আধুনিক সমাজ

AMARBOI.COM

থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে পবিত্র ঘাঁটি ও আশ্রয় হিসাবে নিজস্ব উগ্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে; কেউ পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল, অন্যরা আধুনিকতার সেক্যুলার পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে নিজস্ব চ্যালেঞ্জ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি-সংস্কৃতি ও ডিসকোর্স গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। ধর্মকে বিজ্ঞানের মতোই যৌক্তিক হয়ে ওঠার একটা বিশ্বাস জেগে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোয় এক নতুন ধরনের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা আমরা এখন যাকে মৌলবাদ বলছি সেই যুদ্ধংদেহী ধার্মিকতার স্পষ্ট প্রকাশের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

৬. মৌলবিষয়
(১৯০০–২৫)

ফ্রান্সের ল্যান্ডস্কেপকে দুঃস্বপ্নের মতো নরকে পরিণত করা ১৯১৪ সালে ইউরোপে সূচিত মহাযুদ্ধ আধুনিক চেতনার ভয়ঙ্কর ও আত্মবিনাশী প্রবণতা তুলে ধরে। তরুণদের একটা গোটা প্রজন্ম ধ্বংস করে এই যুদ্ধ ইউরোপকে একেবারে এর মূলে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, যাতে সম্ভবত কোনওদিনই তা সামলে উঠতে না পারে। যুদ্ধের পর সভ্যতার অগ্রগতির ব্যাপারে কোনও চিন্তাশীল মানুষই আর ঠাণ্ডা মাথায় আশাবাদী থাকতে পারেনি। ইউরোপের সবচেয়ে সংস্কৃত অগ্রসর দেশগুলো নতুন সামরিক প্রযুক্তির সাহায্যে নিজেদের পঙ্গু করে দিয়েছিল। যুদ্ধকে যেন এমনি সম্পদ আর শক্তি এনে দেওয়া যান্ত্রিকীকরণের হীন প্যারোডি মনে হয়েছে। সৈন্যসামন্ত নিয়োগ, সেনাবাহিনী পরিবহন ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবার পর নিজস্ব গতিবেগ অর্জন করেছিল যাকে থামানো ছিল কঠিন। ট্রেঞ্চ যুদ্ধের অর্থ ও যুক্তিহীনতা যুগের যুক্তি ও যুক্তিবাদকে অগ্রাহ্য করেছে, এর সাথে মানবীয় চাহিদার কোনওই সম্পর্ক ছিল না। পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা অনেক দশক ধরে কারও কারও প্রত্যক্ষ করে আসা শূন্যতার দিকে সরাসরি চোখ ফিরিয়েছে। পশ্চিমের অর্থনীতিতেও ধস নামতে শুরু করেছিল, ১৯১০ সালে এমনভাবে তার অবনতি ঘটতে থাকে যে তা ১৯৩০-র দশকের মহামন্দায় পর্যবসিত হবে। পৃথিবী যেন অকল্পনীয় কোনও বিপর্যয়ের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল।। আইরিশ কবি ডব্লু, বি. ইয়েটস (১৮৬৫–১৯৩৯) 'দ্বিতীয় আগমন'কে ন্যায়নিষ্ঠতা ও শান্তির বিজয় হিসাবে নয়, বরং বুনো অতলান্ত যুগের জন্ম হিসাবে প্রত্যক্ষ করেছেন:

> সবকিছু ভেঙে পড়ে, মূল আর ধরে রাখতে পারছে না
> দুনিয়ার বুকে নেমে এসেছে তুচ্ছ অরাজকতা,
> রক্ত-রঙা স্রোত ধেয়ে আসছে, সর্বত্র
> নিষ্কলুষতার উৎসব নিমজ্জিত হয়েছে;

AMARBOI.COM

সেরারাও সব বিশ্বাস খুইয়েছে, আর খারাপরা
আবেগময় প্রবল্যে পরিপূর্ণ ।[১]

তবে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নজীরবিহীন সৃজনশীলতা ও বিস্ময়কর সাফল্যের কালও ছিল এটা, আধুনিক চেতনার পূর্ণ বিকাশ তুলে ধরেছে তা। সকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে সৃজনশীল চিন্তাবিদগণ যেন বিশ্বকে একেবারে নতুন করে গড়ে তোলার ইচ্ছায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, অতীতের সকল ধরন ছুঁড়ে ফেলে মুক্ত হতে চেয়েছেন। আধুনিক মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতা গড়ে তুলেছিল, পৃথিবীকে আর আগের মতো করে দেখতে পারছিল না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাস কাজ ও কারণের শৃঙ্খলিত অগ্রগতি তুলে ধরা এক বর্ণনা কৌশল গড়ে তুলেছিল; আধুনিক বর্ণনা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, কী ঘটেছে বা কী ভাবতে হবে সে সম্পর্কে পাঠককে ধন্ধে ফেলে দিয়েছে। পাবলো পিকাসোর (১৮৮১-১৯৭৩) মতো চিত্রশিল্পীরা বিষয়বস্তুকে ভেঙেচুরে ফেলেন বা একই সময়ে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রত্যক্ষ করেন; তাঁরা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে দর্শকের প্রত্যাশাকে তাচ্ছিল্য করছিলেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করছিলেন। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানে প্রাথমিক নীতিমালায়, বিভাজনের অতীত মূলে ফিরে যাওয়ার এবং এই শূন্য ভিত্তিমূল থেকে ফের শুরু করার একটা ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। বিজ্ঞানীরা এখন অণু বা পার্টিকলের সন্ধান করছিলেন, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিকগণ আদিম সমাজ বা আদিম দ্রব্যসামগ্রীতে ফিরে গেছেন। এটা *আদ ফন্তাসে* রক্ষণশীল প্রত্যাবর্তনের মতো ছিল না, কারণ অতীতকে নতুন করে গড়ে তোলার লক্ষ্য ছিল না এখানে, বরং একে চুরমার করে দেওয়ার ইচ্ছাই কাজ করেছে, অ্যাটমকে ভাঙা, সম্পূর্ণ নতুন কিছুকে সামনে নিয়ে আসা।

এইসব প্রয়াসের কোনও কোনওটার লক্ষ্য ছিল ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত বিহীন আধ্যাত্মিকতা তৈরি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের পেইন্টিং, ভাস্কর্য, কবিতা এবং নাটক ছিল এক অবিন্যস্ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের অর্থের অনুসন্ধান; তাঁরা ধারণার উন্নত উপায় ও আধুনিক মিথ সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন। সিগমান্ড ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণমূলক বিজ্ঞান অবচেতনের সবচেয়ে মৌলিক স্তর উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছে যা ছিল নতুন অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক শক্তির উৎসে প্রবেশের প্রয়াস। প্রথাগত ধর্মের প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না ফ্রয়েডের, একে বিজ্ঞানের *লোগোসের* সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু কল্পনা ভাবতেন তিনি।[২] তবে তিনি গ্রিকদের প্রাচীন মিথের একটা আধুনিক অর্থ খাড়া করার চেষ্টা করেছেন, এমনকি নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনীও তৈরি করেছেন। আধুনিক অভিজ্ঞতার ত্রাস ও ভীতির অনেকটাই মানুষকে

হতাশা থেকে বাঁচাতে পারার মতো এক ধরনের অদৃশ্য তাৎপর্যের সন্ধানে তাগিদ দিয়েছে যা যুক্তিপূর্ণ অবিন্যস্ত ভাবনার প্রক্রিয়ায় অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষেই ফ্রয়েড বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রতি তাঁর সমস্ত ভক্তি সত্ত্বেও দেখিয়েছেন যে, যুক্তি কেবল গভীরভাবে আমাদের আচরণকে প্রভাবিতকারী কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত অবচেতন, অযৌক্তিক ও আদিম প্রবণতার এক জ্বলন্ত পাত্রকে ঢেকে রাখা মনের একেবারে বাইরের আবরণকে তুলে ধরে।

ধার্মিক লোকজনও মৌলিক বিষয়ের উপর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছিল। সবচেয়ে দূরদর্শীরা বুঝতে পেরেছিল যে সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষকে আগের মতো ধার্মিক করে তোলা সম্ভব নয়। এই প্রতিমাবিরোধী ভবিষ্যতমুখী পরিবেশে মানুষকে অত্যাবশ্যক সীমাবদ্ধতার সাথে খাপ খাইয়ে চলমান পরিস্থিতিকে মেনে নিতে সাহায্যকারী রক্ষণশীল আধ্যাত্মিকতা সাহায্য করবে না। তাদের ভাবনা ও ধারণার গোটা চেহারাই পাল্টে গিয়েছিল। পশ্চিমে সম্পূর্ণ যৌক্তিক শিক্ষার অধিকারী অনেকেই অতীতের মূল্যের উপর একটা দুর্জ্ঞেয় অনুভূতি সৃষ্টিকারী পৌরাণিক, অতীন্দ্রিয়বাদী ও কাল্টিক আচারের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। পেছনে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। ধার্মিক হতে চাইলে বিভিন্ন আচার, বিশ্বাস ও অনুশীলন সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল যা তাদের যারপরনাই বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে কথা বলবে। ধার্মিক হওয়ার নতুন উপায়ের সন্ধান করছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মানুষ। প্রথম অ্যাক্সিয়াল যুগের (c.৭০০-২০০ বিসিই) মানুষ যেমন আবিষ্কার করেছিল যে প্রাচীন প্যাগান মতবাদ আর তাদের কালের নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাচ্ছে না, ঠিক তেমনি এই দ্বিতীয় অ্যাক্সিয়াল যুগেও একই রকম চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিল। অন্য যেকোনও সৃজনশীল উদ্যোগের মতো আধুনিক (এবং পরে উত্তরাধুনিক) বিশ্বাসের অনুসন্ধান দারুণভাবে কঠিন ছিল। সন্ধান চলছিল, তখনও পর্যন্ত কোনও সুনির্ধারিত বা এমনকি সন্তোষজনক সমাধান বের হয়ে আসেনি। আমরা যাকে 'মৌলবাদ' বলি সেই ধার্মিকতা কেবল তেমনি একটি প্রয়াসের নাম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রটেস্ট্যান্টরা বেশ কিছুকাল থেকেই নতুন কিছুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে মেরুকরণ ঘটেছিল, কিন্তু ধর্মদ্রোহীদের বিচার ও বহিষ্কার প্রত্যক্ষকারী ১৮৯০-র দশকের সংকট যেন উৎরে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। শতাব্দীর গোড়ার দিকে বছরগুলোয় উদারপন্থী ও রক্ষণশীলরা তথাকথিত প্রগতিশীল কালের (১৯০০–২০) কল্যাণমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট ছিল; শিল্পের দ্রুত ও অনিয়ন্ত্রিত উন্নতি ও শহুরে জীবনের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের প্রয়াস পাচ্ছিল তারা। মতবাদগত বিবাদ সত্ত্বেও সকল গোষ্ঠীর প্রটেস্ট্যান্টরা প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি

AMARBOI.COM

নিবেদিত ছিল, বিদেশী মিশন ও নিষিদ্ধকরণ অভিযান বা উন্নত শিক্ষাকার্যক্রমে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করেছে।[৩] প্রবল সমস্যা মোকাবিলা করা সত্ত্বেও অধিকাংশই নিজেদের আত্মবিশ্বাসী মনে করেছে। আমেরিকা ১৯১২ সালে 'খৃস্টায়িত' হয়েছিল, লিখেছেন উদার ধর্মবেত্তা ওয়াল্টার রশেনবুশ; বাকি ছিল কেবল ব্যবসা ও শিল্পের 'ক্রাইস্টের আত্মা ও ভাবনায়' পরিবর্তিত হওয়া।[৪]

প্রটেস্ট্যান্টরা ঈশ্বরহীন শহর ও কলকারখানাকে পবিত্র করে তোলার লক্ষ্যে তাদের ভাষায় 'সোশ্যাল গস্পেল' সৃষ্টি করেছিল। তাঁদের চোখে এটা ছিল হিব্রু পয়গম্বর ও স্বয়ং ক্রাইস্টের মৌলিক শিক্ষায় ফিরে যাওয়ার একটা প্রয়াস, যিনি তাঁর অনুসারীদের বন্দিদের দেখতে, নগ্নকে কাপড় দিতে ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। সোশ্যাল গস্পেলঅলারা তাদের ভাষায় দরিদ্র ও নতুন অভিবাসীদের সেবা ও বিনোদনমূলক সুবিধা দিতে 'প্রাতিষ্ঠানিক চার্চ' প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯১১ সালে নগরীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ও বেশ্যাপাড়া মহল্লায় নিউ ইয়র্ক টেম্পল প্রতিষ্ঠাকারী চার্লস স্টেলযলের মতো উদারপন্থী প্রটেস্ট্যান্টরা সমাজতন্ত্রকেই ব্যাপ্টাইজ করার প্রয়াস পেয়েছেন: ক্রিশ্চানদের বাইবেলের অনুপুঙ্খ ইতিহাস পাঠের বদলে শহুরে ও শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে এবং শিশুশ্রমের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।[৫] শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোয় রক্ষণশীল ক্রিশ্চানরাও একইভাবে উদারপন্থী প্রটেস্ট্যান্টদের মতো সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল, যদিও তাদের আদর্শ ছিল ভিন্ন। তারা হয়তো সামাজিক ক্রুসেডকে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই বা চলমান বস্তুবাদের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখে থাকবে, কিন্তু আবার উদারপন্থী স্টেলযলের মতো নিম্ন-মজুরি, শিশুশ্রম ও অনুন্নত কর্মপরিবেশের ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন ছিল তারা।[৬] রক্ষণশীলরা পরে সোশ্যাল গস্পেলের প্রখর সামালোচনায় মেতে উঠে যুক্তি দেখাবে যে অভিশপ্ত পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা অর্থহীন। তারপরেও শতাব্দীর গোড়ার দিকে বছরগুলোয় এমনকি ১৯০২ সালে নর্থওয়েস্টার্ন বাইবেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম বি. রাইলির মতো জাত রক্ষণশীলগণও মিনেপোলিসকে পরিচ্ছন্ন করার জন্যে সামাজিক সংস্কারকদের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি মন্দিরে ভাষণ দেওয়ার জন্যে লিয়ন ট্রটস্কি ও এমা গোল্ডম্যানকে আমন্ত্রণকারী স্টেলযলের মতো সোশ্যাল গস্পেলঅলারদের কর্মকৌশল মেনে নিতে পারেননি, তবে রক্ষণশীলরা তখনও রাজনীতির বর্ণালীর ডান পাশে সরে যায়নি, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে তারা তাদের কল্যাণমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু ১৯০৯ সালে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এমিরিতাস চার্লস এলিয়ট 'দ্য ফিউচার অভ রিলিজিয়ন' শিরোনামের ভাষণ দেন; অধিকতর রক্ষণশীলদের

AMARBOI.COM

মনে তা আঘাত হানে। এটা ছিল সহজ মূল আদিমূল্যবোধে প্রত্যাবর্তনের আরেকটি প্রয়াস। এলিয়টের বিশ্বাস ছিল নতুন ধর্মের একটাই নির্দেশনা থাকবে: অন্যের প্রতি বাস্তবমুখী সেবায় প্রতিফলিত ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা। চার্চ বা ঐশীগ্রন্থ বলে কিছু থাকবে না; পাপের কোনও ধর্মতত্ত্ব থাকবে না, প্রয়োজন থাকবে না উপাসনার। ঈশ্বরের উপস্থিতি এতটাই নিশ্চিত ও অভিভূতকারী হবে যে, লিটার্জিরও আর দরকার থাকবে না। বিজ্ঞানী, সেক্যুলারিস্ট বা ভিন্ন ধর্মের যারা অনুসারী তাদের ধ্যানধারণাও সমানভাবে বৈধ হয়ে যাওয়ায় সত্যির উপর ক্রিশ্চানদের একচেটিয়া অধিকার থাকবে না। অন্য মানুষের প্রতি দয়ার কারণে ভবিষ্যতের এই নতুন ধর্ম গণতন্ত্র, শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার বা প্রতিশোধকমূলক ওষুধের মতো সেক্যুলার ধারণা থেকে ভিন্ন হবে।[৭] সোশ্যাল গস্পেলের এই চরম ভাষ্য ছিল সাম্প্রতিক দশকগুলোর মতবাদগত বিরোধ থেকে পিছু হটা। কেবল যুক্তি বা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণযোগ্য সত্যিকে মূল্যদানকারী সমাজে ডগমা সমস্যায় পরিণত হয়। ধর্মতত্ত্ব অনায়াসে অনির্বচনীয় ও বর্ণনার অতীত কোনও বাস্তবতার প্রতীক হওয়ার বদলে নিজেই পরম মূল্যে পরিণত হওয়া প্রতিমূর্তি অন্ধসংস্কারে পরিণত হতে পারে। মতবাদকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেলেও এলিয়ট তাঁর চোখে মূলে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন: ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা। সকল বিশ্বধর্মই সামাজিক ন্যায়বিচার ও দুর্বলের প্রতি সদয় আচরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। সকল ট্র্যাডিশনেই, যতক্ষণ ভালোমানুষি দেখানোর অহমের প্রয়াসে পরিণত না হচ্ছে, পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্যে বাস্তবিকভাবে প্রকাশিত সুশৃঙ্খলিত সহানুভূতি লক্ষ করা গেছে। এলিয়ট এভাবে অর্থডক্স বিশ্বাসের চেয়ে বরং অনুশীলনের উপর বেশি নির্ভরশীল একটি বিশ্বাস সৃষ্টি করে আধুনিক বিশ্বে ক্রিশ্চানদের আসল টানাপোড়েনের সমাধানের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

রক্ষণশীলরা অবশ্য ভীত হয়ে উঠেছিল। তাদের চোখে অনির্বচনীয় মতবাদ বিহীন বিশ্বাস ক্রিশ্চান ধর্মই নয়, তারা এই উদার বিপদ প্রতিহত করতে বাধ্য হয়েছে। ঐশীগ্রন্থের ভ্রান্তিহীনতার মতবাদ প্রদানকারী প্রিন্সটনের প্রেসবিটারিয়ানরা ১৯১০ সালে পাঁচটি ডগমার একটি তালিকা প্রকাশ করেন, তাঁদের চোখে এগুলো ছিল আবশ্যক: (১) ঐশীগ্রন্থের নির্ভুলতা, (২) ক্রাইস্টের ভার্জিন বার্থ, (৩) আমাদের পাপের কারণে ক্রসে ক্রাইস্টের প্রায়শ্চিত্ত, (৪) তাঁর দৈহিক পুনরুত্থান ও (৫) তাঁর অলৌকিক কর্মকাণ্ডের বস্তুগত বাস্তবতা। (শেষের এই মতবাদটি পরে প্রিমিলেনিয়ালিজমের শিক্ষা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে)।[৮] এর পর হাইয়ার ক্রিটিসিজমকে প্রতিরোধ করার জন্যে ১৯০৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলিসে বাইবেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অয়েল মিলিয়নিয়ার লাইম্যান ও মিল্টন স্টুয়ার্ট বিশ্বাসীদের

ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ শিক্ষা দিতে একটি প্রকল্পের অর্থ যোগান দেন। ১৯১০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের ভেতর তাঁরা *দ্য ফান্ডামেন্টালস* শিরোনামে বারটি পেপারব্যাক প্যামফ্ল্যাটের একটা সিরিজ প্রকাশ করেন; এসব প্যামফ্ল্যাটে ধর্মবেত্তারা ট্রিনিটির মতো মতবাদের বোধগম্য বিবরণ, হাইয়ার ক্রিটিসিজমের প্রত্যাখ্যান ও গস্পেলের সত্যি প্রকাশের উপর গুরুত্ব দেন। প্রতিটি খণ্ডের আনুমানিক তিন মিলিয়ন করে কপি বিনে পয়সায় প্রত্যেক আমেরিকান প্যাস্টর, প্রফেসর ও ধর্মতত্ত্বের ছাত্রের কাছে পাঠানো হয়। পরে এই প্রকল্প এক বিশাল প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করবে, কেননা মৌলবাদীরা একে তাদের আন্দোলনের প্রাণ বিবেচনা করবে। অবশ্য, এই সময় এই প্যামফ্ল্যাটগুলো তেমন একটা আগ্রহ জাগায়নি। এগুলোর সুর রেডিক্যাল বা বিশেষভাবে উগ্রও ছিল না।[৯]

কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় রক্ষণশীল প্রটেস্ট্যান্টবাদে ত্রাসের একটা উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটে ও তা মৌলবাদী হয়ে ওঠে। আমেরিকানদের সব সময়ই বিরোধকে প্রলয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে আসার প্রবণতা ছিল। মহাযুদ্ধ তাদের অনেকেরই প্রিমিলেনিয়াল বিশ্বাসে স্থির প্রত্যয় জাগিয়েছিল। এমন ভয়াবহ মাত্রায় এমনি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তারা, কেবল প্রলয়েরই লক্ষণ হতে পারে। এটা নিশ্চিতভাবেই বুক অভ রেভেলেশনে বর্ণিত সেই যুদ্ধ। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সালের ভেতর তিনটি বিশাল প্রফেসি কানফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা 'সময়ের আরও আলামতের খোঁজে' *স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল* আঁতিপাতি করে অনুসন্ধান চালায়। সবকিছু ইঙ্গিত করে যে, এই পূর্বাভাসগুলো আসলেই সত্যি হতে যাচ্ছে। হিব্রু পয়গম্বরগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, প্রলয়ের আগে ইহুদিরা স্বদেশে ফিরে যাবে, সুতরাং ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্তাইনে ইহুদি বাসভূমির পক্ষে সমর্থনের অঙ্গীকারের বেলফোর ঘোষণা (১৯১৭) প্রকাশ করলে প্রিমিলেনিয়ালিস্টরা একাধারে ভীতি ও আনন্দে আক্রান্ত হয়েছিল। স্কোফিল্ড বলেছিলেন, রাশিয়াই আরমাগেদনের অব্যবহিত আগে ইসরায়েলকে আক্রমণকারী 'উত্তরের শক্তি',[১০] নাস্তিক্যবাদী কমিউনিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শে রূপান্তরকারী বলশেভিক বিপ্লব (১৯১৭) যেন এই বিষয়টিকেই নিশ্চিত করেছিল। লীগ অভ নেশনস-এর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতভাবেই রেভেলেশন ১৬: ১৪-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবে পরিণত করেছিল: রোমান সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছে তা, অচিরেই অ্যান্টিক্রাইস্ট এর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার সময় প্রিমিলেনিয়াল প্রটেস্ট্যান্টরা রাজনৈতিকভাবে আরও সচেতন হয়ে উঠছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যা গোষ্ঠীতে উদারপন্থীদের সাথে স্রেফ মতবাদগত বিরোধ ছিল সেটাই সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্যে সংগ্রামের রূপ নিচ্ছিল। অচিরেই

AMARBOI.COM

বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে চলা শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের সামনের কাতারে অবস্থান করতে দেখেছিল তারা। যুদ্ধের সময় এবং এর অব্যবহিত পরে জার্মান নিষ্ঠুরতার অবিশ্বাস্য সব গল্পকাহিনী যেন রক্ষণশীলদের হাইয়ার ক্রিটিসিজমের জন্মদাতা জাতিকে প্রত্যাখ্যান করে ঠিক কাজ করার প্রমাণ হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে।[11]

কিন্তু এক গভীর ভীতি থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়েছিল। এটা ছিল জাতিগত ঘৃণার একটা ব্যাপার; ক্যাথলিক, কমিউনিস্ট ও হাইয়ার ক্রিটিকদের মাধ্যমে জাতির অন্তরে বিদেশী প্রভাবের অনুপ্রবেশের ভীতি। মৌলবাদী এই বিশ্বাস আধুনিক বিশ্ব থেকে গভীর পশ্চাদপসরণ তুলে ধরে। রক্ষণশীল প্রটেস্ট্যান্টরা গণতন্ত্র সম্পর্কে পুরোপুরি দোনোমনো হয় উঠেছিল: এর ফলে 'মব শাসন' সৃষ্টি হবে, 'লাল প্রজাতন্ত্রের দিকে' নিয়ে যাবে, 'এমন শয়তানি শাসন দুনিয়া আর দেখেনি।'[12] লীগ অভ নেশনস-এর মতো শান্তিরক্ষী প্রতিষ্ঠানসমূহ এর পর থেকে মৌলবাদীদের চোখে সম্পূর্ণভাবে অশুভে পরিপূর্ণ ঠেকবে। লীগ নিশ্চিতভাবেই অ্যান্টিক্রাইস্টের আস্তানা, সেইন্ট পল বলেছিলেন, বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যাবাদী হবে সে, সবাইকে প্রতারণা করবে। বাইবেল বলেছে, শান্তি নয়, অন্তিমকালে যুদ্ধ বাধবে, তো লীগ বিপজ্জনকভাবে ভুল পথে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অ্যান্টিক্রাইস্টেরই শান্তিরক্ষী হওয়ার কথা।[13] লীগ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে মৌলবাদীদের বিতৃষ্ণা আধুনিকতার কেন্দ্রিয়করণের প্রতি অন্তরের ভীতি ও বিশ্ব সরকারের মতো যেকোনও কিছুর প্রতি ত্রাসের বিষয়টি তুলে ধরে। আধুনিক সমাজের বিশ্বজনীনতার মুখোমুখি হয়ে কিছু কিছু লোক সহজাত প্রবৃত্তির বশে গোত্রীয়বাদে ফিরে গেছে।

মানুষকে প্রাণ বাঁচাতে লড়াই করার বোধ জাগানো এই ধরনের ষড়যন্ত্র ভীতি অনায়াসেই আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে। জেসাস আর ডিউইট মুডির প্রচারিত প্রেমময় উদ্ধারকর্তা ছিলেন না। নেতৃস্থানীয় প্রিমিলেনিয়ালিস্ট আইজ্যাক এম. হালদম্যান যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, বুক অভ রেভেলেশনের ক্রাইস্ট 'এমন একজন হিসাবে এসেছেন যিনি আর বন্ধুত্ব বা ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষী নন... তাঁর পোশাকে রক্তের ধারা, অন্যের রক্ত। নেমে এসেছেন যেন মানুষের রক্ত ঝরাতে পারেন।'[14] যুদ্ধের জন্যে তৈরি ছিল রক্ষণশীলরা, এমনি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আক্রমণে নেমেছিল উদার প্রটেস্ট্যান্টরা।

ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে পৃথিবীর এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে বসা যুদ্ধের বেলায় উদারপন্থীদেরও নিজস্ব সমস্যা ছিল। এই যুদ্ধকে সব যুদ্ধের অবসান ঘটানোর, বিশ্বকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করে তোলা যুদ্ধ হিসাবে দেখেই কেবল

সামাল দেওয়ার উপায় ছিল তাদের। প্রিমিলেনিয়ালিজমের সহিংসতা, গণতন্ত্রের প্রতি এর বিধ্বংসী সমালোচনা ও লীগ অভ নেশনসের কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল তারা। এইসব মতবাদকে কেবল অ-আমেরিকানই নয়, বরং খোদ ক্রিশ্চান ধর্মের অস্বীকৃতি মনে হয়েছে। আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা; এবং ভালোবাসা ও সহানুভূতির গস্পেল সত্ত্বেও তাদের অভিযান ছিল ভয়াবহ ও ভারসাম্যহীন। ১৯১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারনৈতিক ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাসের নেতৃত্বস্থানীয় স্কলাস্টিক প্রতিষ্ঠান ইউনির্ভার্সিটি অভ শিকাগোর ডিভিনিটি স্কুলের ধর্মতাত্ত্বিকগণ শহরের অপর প্রান্তের মুডি বাইবেল কলেজকে আক্রমণ করতে শুরু করেন।[১৫] প্রফেসর শার্লি জ্যাকসন চেজ প্রিমিলেনিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে দেশের সাথে বেঈমানি ও জার্মানদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ তোলেন। আলভা এস. টেইলর বলশেভিকদের সাথে তুলনা করেন তাদের, যারা তাদের মতোই একদিনেই পৃথিবীকে নতুন করে তৈরি করতে চায়। *ক্রিশ্চান রেজিস্টারের* সম্পাদক আলফ্রেড দিফেনবাখ প্রিমিলেনিয়ালিজমকে 'ধর্মীয় চিন্তাভাবনার জগতে সবচেয়ে বিস্ময়কর মানসিক স্খলন'[১৬] আখ্যায়িত করেন।

মুডি বাইবেল ইন্সটিটিউটের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের কেবল তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষই নয় বরং যাদের শয়তানসুলভ মনে করত সেই শত্রুর সাথে তুলনা করে উদারবাদীরা একেবারে আঁতে ঘা দেয়। *মুডি বাইবেল ইন্সটিটিউট মান্থলি*র সম্পাদক জেমস এম. গ্রে পাল্টা জবাবে বলেন, উদারবাদীদের শান্তিবাদই অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আমেরিকাকে জার্মানদের পিছনে ফেলে দিয়েছে, সুতরাং তারা যুদ্ধের প্রয়াসকে বিপর্যস্ত করেছে।[১৭] *দ্য কিংস বিজনেস* নামে একটি প্রিমিলেনিয়াল ম্যাগাজিনে টমাস সি. হর্টন যুক্তি দেখান যে, উদারপন্থীরাই আসলে জার্মানদের সাথে ঘোঁট পাকিয়েছে, কারণ ডিভিনিটি স্কুলে তাদের শিক্ষা দেওয়া হাইয়ার ক্রিটিসিজমই যুদ্ধের জন্যে দায়ী ও জার্মানিতে তা সুকোমল মূল্যবোধের ধস নামিয়েছে।[১৮] অন্যান্য রক্ষণশীল নিবন্ধে কথিত জার্মান নিষ্ঠুরতার জন্যে যুক্তিবাদ ও বিবর্তবাদের তত্ত্বকে দায়ী করা হয়।[১৯] বাইবেল ইন্সটিটিউট অভ লস অ্যাঞ্জেলিসের হাওয়ার্ড ডব্লু. কেলগ জোর দিয়ে বলেন যে, বিবর্তনের দর্শন 'বিশ্ব আধিপত্য বিস্তারের দানবীয় পরিকল্পনা, সভ্যতার বিনাশ ও খোদ ক্রিশ্চান ধর্মের বিলুপ্তির জন্যে দায়ী।'[২০] তিক্ত ও উভয় পক্ষের ক্ষেত্রেই অক্রিশ্চানসুলভ বিরোধ স্পষ্টতই সংবেদনশীল স্নায়ু স্পর্শ করেছিল এবং নিশ্চিহ্নতার এক গভীর ভীতি জাগিয়ে দিয়েছিল। হাইয়ার ক্রিটিসিজমের বেলায় সমন্বয়ের আর কোনও সম্ভাবনা ছিল না, রক্ষণশীলদের চোখে যা পরম অশুভের আভা ধারণ করেছে বলে মনে হচ্ছিল। ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক সত্যি খোদ ক্রিশ্চান ধর্মের পক্ষে জীবন-মরণ প্রশ্নে পরিণত

হয়েছিল। বাইবেলের উপর সমালোচনামূলক আক্রমণ অরাজকতার জন্ম দেবে, গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, 'উইল নিউ ইয়র্ক বি ডেস্ট্রয়েড ইফ ইট ডাজ নট রিপেন্ট?' শিরোনামের এক বিখ্যাত নিবন্ধে ঘোষণা করেন ব্যাপ্টিস্ট যাজক জন স্ট্র্যাটন।[২১] বিরোধ আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। ভাঙন হ্রাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

১৯১৭ সালের আগস্টে উইলিয়াম বেল রাইলি ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক ব্যাখ্যা ও প্রিমিলেনিয়ালিজমের 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদসমূহ প্রচারের লক্ষ্যে একটি সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে *দ্য ফান্ডামেন্টালস*-এর অন্যতম সম্পাদক এ. সি. ডিক্সন (১৮৫৪–১৯২৫) ও পুনর্জাগরণবাদী রিউবেন টরির (১৮৫৬–১৯২৮) সাথে আলোচনায় বসেন। ১৯১৯ সালে রাইলি সকল প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীর ছয় হাজার রক্ষণশীল ক্রিশ্চানের অংশগ্রহণে ফিলাদেলফিয়ায় এক বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করেন ও আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্ল্ডস ক্রিশ্চান ফান্ডামেন্টালস অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লুসিএফএ) প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরপরই রাইলি অসাধারণভাবে সংগঠিত গস্পেল কণ্ঠশিল্পীসহ চৌদ্দজন বক্তার একটি দলকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এক সফরের ব্যবস্থা করেন, এরা আঠারটি শহরে সফর করে। উদারপন্থীরা এমনি আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, মৌলবাদী বক্তাদের প্রতি সাড়া এতটাই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল যে রাইলি ধরে নিয়েছিলেন এক নতুন সংস্কারের সূচনা করেছেন তিনি।[২২] মৌলবাদী প্রচারণাকে যুদ্ধ মনে করা হয়েছিল। নেতৃবৃন্দ অবিরাম সামরিক পরিভাষা ইমেজারি ব্যবহার করছিলেন। 'আমার বিশ্বাস সময় হয়েছে,' *ক্রিশ্চান ওয়ার্কার্স* ম্যাগাজিনে লিখেছেন ই.এ. ওলাম, 'এদেশের ইভাঞ্জেলিস্টিক শক্তির বিশেষ করে বাইবেল ইন্সটিটিউটের কেবল বিশ্বাসের প্রতিরক্ষাকেই শক্তিশালী করা নয় বরং একে ঐক্যবদ্ধ ও আক্রমণাত্মক শক্তিতে পরিণত হতে হবে।' এই সংখ্যায় জেমস এম. গ্রে 'চার্চে প্রতিরক্ষা ও আক্রমণাত্মক জোটের আহ্বান' জানিয়ে একমত প্রকাশ করেন।[২৩] ১৯২০ সালে নর্দার্ন ব্যাপ্টিস্ট কনভেনশনের এক সভায় কার্টিস লি 'মৌলবাদীদের' অ্যান্টিক্রাইস্টের কাছে হারানো অঞ্চল উদ্ধার ও 'বিশ্বাসের মৌলবিষয়গুলোর পক্ষে মহাযুদ্ধে প্রস্তুত' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[২৪] রাইলি আরও এগিয়ে যান। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ নয়, 'এটা এমন এক যুদ্ধ যার থেকে কোনও রেহাই নেই।'[২৫]

মৌলবাদীদের পরের পদক্ষেপ ছিল গোষ্ঠী থেকে উদারবাদীদের বহিষ্কার করা। বেশির ভাগ মৌলবাদীই ব্যাপ্টিস্ট বা প্রেসবিটারিয়ান ছিল, এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রবল লড়াই। সবচেয়ে প্রভাবশালী মৌলবাদী প্রেসবিটারিয়ান ধর্মতাত্ত্বিক জে. গ্রিশাম মাচেন (১৮৮১–১৯৩৭) তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ *ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড*

AMARBOI.COM

লিবারিলিজম (১৯২৩)-এ যুক্তি দেখান যে, উদারপন্থীরা প্যাগান, ভার্জিন বার্থের মতো মৌল বিশ্বাস অগ্রাহ্য করে খোদ ক্রিশ্চান ধর্মকেই অস্বীকার করেছে। মৌলবাদী প্রেসবিটারিয়ানরা চার্চের উপর তাদের পাঁচ দফা ক্রিড চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাধারণ সভায় ভীষণ লড়াই বেধে যায়; এক বিশেষ তিক্ত বিরোধের পর রাইলি ব্যাপ্টিস্ট সভা থেকে বের হয়ে এসে কট্টরপন্থীদের নিয়ে নিজস্ব বাইবেল ব্যাপ্টিস্ট ইউনিয়ন গঠন করেন। কিছু সংখ্যক মৌলবাদী ব্যাপ্টিস্ট মূল সংগঠনে রয়ে যায়, ভেতর থেকে সংস্কারের আশা করেছিল তারা, কিন্তু কেবলই রাইলির তীব্র ঘৃণার পাত্র হয়েছে।[২৬]

অভিযান অব্যাহত থাকে। অনুভূতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, সমন্বয়ের যেকোনও প্রয়াস অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়েছে। শান্তিবাদী মানুষ ও সেই সময়ের আমেরিকার অন্যতম প্রভাবশালী যাজক হ্যারি ইমার্সন ফসডিক (১৮৭৮–১৯৬৯) ১৯২২ সালের ব্যাপ্টিস্ট কনভনশনে প্রদত্ত সারমনে সহিষ্ণুতার আবেদন জানালে (পরে *দ্য ব্যাপ্টিস্ট*-এ 'শ্যাল দ্য ফান্ডামেন্টালিস্টস উইন' শিরোনামে প্রকাশিত) প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা উদারবাদী ধারণার ফলে সৃষ্ট ভীষণ বিতৃষ্ণা তুলে ধরে।[২৭] অন্য গোষ্ঠীতেও তা ছড়িয়ে পড়ে। সারমনের পর মৌলবাদী শিবিরের দিকে যেন ভূমিধস স্রোত নেমেছিল বলে মনে হয়েছে: অধিকতর রক্ষণশীল ডিসাইপলস অভ দ্য ক্রাইস্ট, সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টস, পেন্টাকোস্টালস, মরমন ও স্যালভেশন আর্মি মৌলবাদী আদর্শের পক্ষে এসে দাঁড়ায়। এমনকি বিতর্ক থেকে দূরত্ব বজায় রাখা মেথডিস্ট ও এপিস্কোপালিয়ানরাও স্ব স্ব গোষ্ঠীর মৌলবাদীদের 'ক্রিশ্চান ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ও চিরন্তন সত্যসমূহকে সংজ্ঞায়িত ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা' করার জন্যে[২৮] চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ১৯২৩ সালের দিকে মনে হচ্ছিল যেন মৌলবাদীরাই আসলে জিতবে ও উদারবাদীদের বিপদ থেকে গোষ্ঠীগুলোকে মুক্ত করবে। কিন্তু এরপরই এক নতুন অভিযান জাতির মনোযোগ কেড়ে নেয় ও শেষ পর্যন্ত গোটা মৌলবাদী আন্দোলনকেই দুর্নামের মুখে ফেলে দেয়।

১৯২০ সালে গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ও প্রেসবিটারিয়ান উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান (১৮৬০–১৯২৫) স্কুল ও কলেজে বিবর্তনবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করেন। তাঁর চোখে হাইয়ার ক্রিটিসিজম নয়, বরং ডারউইনবাদই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতার জন্যে দায়ী ছিল।[২৯] ব্রায়ান জার্মান সামরিকবাদ ও বিবর্তনবাদের ভেতর যোগসূত্র স্থাপনের দাবিকারী দুটি গ্রন্থে বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন: বেঞ্জামিন কিড-এর *দ্য সয়েন্স অভ পাওয়ার* (১৯১৮) ও ভার্নন এল. কিলোগে-এর *হেডকোয়ার্টার নাইটস* (১৯১৭)। এ দুটি বইতে জার্মানদের যুদ্ধে ঠেলে দেওয়ার বেলায় বিবর্তনবাদের

প্রভাবের বর্ণনা দেওয়া জার্মান অফিসারদের সাক্ষাৎকার অর্ন্তভুক্ত ছিল। শক্তিমানই টিকে থাকবে, এই ধারণা কেবল 'ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেনি,' বরং, উপসংহার টেনেছেন ব্রায়ান, 'সৈনিকদের শ্বাস রোধ করে হত্যার জন্যে বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কারকারী সেই একই বিজ্ঞান প্রচার করছে যে, মানুষের রয়েছে নিষ্ঠুর পূর্ব ইতিহাস এবং বাইবেল থেকে অলৌকিক ও আধ্যাত্মিকতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে।'[৩০] একই সময়ে, ব্রায়ান মত্তর মনস্তাত্ত্বিক জেমস এইচ. লিউবা তাঁর গ্রন্থ *বিলিফ ইন গড অ্যান্ড ইমমর্টালিটি*-তে পরিসংখ্যান তুলে ধরেন যাতে 'প্রমাণিত' হয়েছে যে কলেজ শিক্ষা ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিপদাপন্ন করে তুলেছে। ডারউইনবাদ তরুণ-তরণীদের ঈশ্বর, বাইবেল ও ক্রিশ্চান ধর্মের অন্যান্য মৌল মতবাদে বিশ্বাস হারানোর কারণ হচ্ছে। টিপিক্যাল মৌলবাদী ছিলেন না ব্রায়ান। তিনি যেমন প্রিমিলেনিয়ালিস্ট ছিলেন না তেমনি ঐশীগ্রন্থকেও নতুন কট্টর অক্ষরবাদ মোতাবেক পাঠ করতেন না। কিন্তু 'গবেষণা' তাঁকে নিশ্চিত করেছিল যে বিবর্তনবাদের তত্ত্ব নৈতিকতা, ভব্যতা ও সভ্যতার টিকে থাকার পক্ষে উপযুক্ত নয়। 'দ্য মিনেস অভ ডারউনিজম' শীর্ষক ভাষণ দেওয়ার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় বিপুল দর্শক ও ব্যাপক প্রচার মাধ্যমের কভারেজ আকৃষ্ট করেছিলেন তিনি।

ব্রায়ানের উপসংহার ছিল উপরিগত, আনাড়ী ও ভ্রান্ত, কিন্তু লোকে তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিজ্ঞানের সাথে মধুচন্দ্রিমার কালের অবসান ঘটিয়েছিল, এর ভীতিকর সম্ভাবনা নিয়ে এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করছিল, কোনও কোনও মহলে একে সীমানার ভেতর আটকে রাখারও চিন্তাভাবনা চলছিল। ডারউইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্ভবত কোনও বিজ্ঞানীর 'কাণ্ডজ্ঞান'কে অগ্রাহ্য করার বিব্রতকর প্রবণতার একটা প্রধান নজীর ছিল। যারা সহজ সাধারণ ধর্মের সন্ধান করত, বিবর্তনবাদ প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তাদের বোধগম্য বিশ্বাসযোগ্য কারণ আবিষ্কারে দারুণ আগ্রহী ছিল তারা। ব্রায়ান তাদের সেটা দিয়েছিলেন এবং একা হাতে বিবর্তনের প্রসঙ্গটিকে মৌলবাদী এজেন্ডার শীর্ষে তুলে দিয়েছেন। ডারউইনবাদ ঐশীগ্রন্থের আক্ষরিক সত্যির বিরোধিতা করে বলে এটা ছিল নতুন মৌলবাদী রীতির প্রতি আবেদন সৃষ্টি করা একটা কারণ। এর প্রভাব সম্পর্কে ব্রায়ানের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রকাশিত নতুন ভীতিকে ধারণ করতে পেরেছিল। পঞ্চাশ বছর পরে চার্লস হজ যেমন যুক্তি দেখিয়েছেন, ডারউইনের প্রকল্প মৌলবাদীদের বেকনিয় মানসিকতার বিরোধী ছিল, তখনও তারা প্রাক আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে ছিল। ইয়েল ও হার্ভার্ড ও অন্যান্য বড় বড় শহরের বুদ্ধিজীবী ও সফিস্টিকেটরা উৎসাহের সাথে এইসব নতুন ধারণা অনুসরণ করে থাকতে পারেন, কিন্তু বহু ছোট শহরের আমেরিকানদের কাছে এসব

AMARBOI.COM

ছিল অজ্ঞাত, তারা ভেবেছিল সেক্যুলারিস্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সংস্কৃতি গ্রাস করে নিচ্ছে। কিন্তু তারপরেও বিবর্তনের বিরুদ্ধে অভিযান হয়তো কোওনদিনই হাইয়ার ক্রিটিজিমকে প্রতিস্থাপিত করতে পারত না যদি না এযাবৎ মৌলবাদীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা দক্ষিণে এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটত।

দক্ষিণবাসীদের পক্ষে মৌলবাদী হয়ে ওঠার কোনও কারণই ছিল না। এই পর্যায়ে দক্ষিণের রাজ্যগুলো উত্তরের তুলনায় বেশ রক্ষণশীল ছিল, মৌলবাদী প্রচারণা শুরু করার পক্ষে দক্ষিণের গোষ্ঠীগুলোতে উদারপন্থীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু পাবলিক স্কুলে বিবর্তবাদের শিক্ষা নিয়ে দক্ষিণবাসীরা উদ্বিগ্ন ছিল। এটা ছিল অজানা আদর্শের কাছে সমাজের 'উপনিবেশীকরণের' নজীর। ফ্লোরিডা, মিসিসিপি, লুইসিয়ানা ও আরকান-স'র রাজ্য সভায় ডারউইনের মতবাদের শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে বিল উত্থাপন করা হয়েছিল। টেনিসির বিবর্তনবাদ বিরোধী আইন ছিল বিশেষভাবে কঠোর। তাদের পরীক্ষা করতে এবং বাক স্বাধীনতা ও প্রথম সংশোধনীর পক্ষে প্রতীকী আঘাত হানতে ছোট শহর ডেটনের এক তরুণ শিক্ষক জন স্কোপস একবার স্কুলের প্রিন্সিপালের বদলে জীববিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাস নিতে গিয়ে আইন ভঙ্গ করার স্বীকারোক্তি দিয়ে বসেন। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, নতুন আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (এসিএলইউ) তাঁর পক্ষে মামলা লড়ার জন্যে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়, এর নেতৃত্বে ছিলেন যুক্তিবাদী আইনবিদ ও প্রচারক ক্লারেন্স ডারো (১৮৫৭–১৯৩৮)। রাইলি ও অন্যান্য মৌলবাদী নেতার অনুরোধে উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান আইনের সমর্থন করতে সম্মত হন। ডারো ও ব্রায়ান জড়িয়ে পড়ার পর মামলাটি স্রেফ নাগরিক স্বাধীনতার ব্যাপার রইল না, তা পরিণত হলো ঈশ্বর ও বিজ্ঞানের এক প্রতিযোগিতায়।

স্কোপস ট্রায়াল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত।[৩১] ডারো ও ব্রায়ান গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান মূল্যবোধের পক্ষে লড়ছিলেন। ডারো বাক স্বাধীনতার পক্ষে, অন্যদিকে ব্রায়ান সাধারণ মানুষের অধিকারের পক্ষে–যারা দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞ দক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের প্রভাবের বেলায় খারাপ চিন্তা লালন করে আসছিল। ব্রায়ানের রাজনৈতিক প্রচারণা সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিল। *ইন হিজ ইমেজ*-এর সমালোচনায় ডারউনের প্রতি ব্রায়ান তাঁর জবাবে দাবি করেছিলেন যে তিনি 'সংখ্যার দিক থেকে বিশেষ করে মূক এক বিশাল জনসংখ্যার মুখপাত্র। আসলে একমাত্র তিনিই তাদের ধ্যানধারণার প্রকাশকারী যাদের শোনার ক্ষমতা রয়েছে। তারা ব্যাপক রাজনীতির অংশ ও কোনওভাবেই উপেক্ষা বা "উন্মাদসম প্রান্তিক" লোকজনের পরিহাসের পাত্র হবার নয়।'[৩২] নিঃসন্দেহে কথাটা সঠিক ছিল, কিন্তু

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এইসব অপরিণত ও অস্পষ্ট উদ্বেগকে ঠিকমতো ভাষা দিতে পারেননি ব্রায়ান। কিন্তু ডাররো বিজ্ঞানের নিজেকে প্রকাশ ও সামনে এগিয়ে যাবার অধিকারের পক্ষে দারুণভাবে যুক্তি তুলে ধরতে পেরেছিলেন। প্রেসবিটারিয়ান ও বেকনিয় ব্রায়ান জোরের সাথে বলেন যে, সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে অনৈতিক প্রভাবের কারণে ডারউইনবাদের মতো 'অসমর্থিত প্রকল্প' প্রত্যাখ্যান করার অধিকার মানুষের রয়েছে। স্বয়ং স্কোপস যেখানে গোটা বিচারটিকেই একটা প্রহসন ধরে নিয়েছিলেন, ডাররো ও ব্রায়ান সেখানে প্রাণপণে তাদের চোখে পবিত্র অলঙ্ঘনীয় মূল্যবোধের পক্ষে লড়ে চলছিলেন।[৩৩] কিন্তু ডাররো ব্রায়ানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পর তাঁর নিষ্ঠুর জেরার মুখে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নির্বোধ ও অতিসরল চেহারা বের হয়ে আসে। কোণঠাসা অবস্থায় ব্রায়ান ডাররোর কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে বাইবেলের আক্ষরিক পাঠে যেমন বোঝায় পৃথিবীর বয়স তার চেয়ে ছয় হাজার বছরের বেশি, জেনেসিসে বর্ণিত সৃষ্টির 'ছয়' দিনের প্রতিটি দিন চব্বিশ ঘণ্টার চেয়ে বেশি এবং তিনি কোনওদিনই বাইবেলের টেক্সটের সৃষ্টির বিবরণ পড়েননি, অন্য কোনও ধর্মে তাঁর আগ্রহ নেই, এবং সবশেষে 'আমি যেসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাই না সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে যাই না' এবং 'মাঝেমাঝে' যেসব নিয়ে ভাবেন কেবল সেগুলো নিয়ে মাথা *ঘামান*।[৩৪] এটা ছিল চরম পরাজয়। স্পষ্ট যৌক্তিক ধ্যানধরণার নায়ক হিসাবে আদালত থেকে বের হয়ে আসেন ডাররো, আর প্রবীন ব্রায়ান বাকোয়াজ, অযোগ্য ও পশ্চাদপন্থী মানুষ হিসাবে অপদস্থ হন; বিচারের অল্প দিন বাদে তাঁর প্রয়াসের পরিণতিতে মারা যান তিনি।

স্কোপস দোষী সব্যস্ত হন, কিন্তু এসিএলইউ তাঁর পক্ষে জরিমানা পরিশোধ করে, ডেটনে ডাররো ও আধুনিক বিজ্ঞান ছিল সন্দোহতীতভাবে বিজয়ী। পত্রপত্রিকাগুলো মানসে ব্রায়ান ও তাঁর সমর্থকদের হতাশাব্যঞ্জক পশ্চাদপন্থী হিসাবে চিত্রিত করে। বিশেষ করে সাংবাদিক এইচ. এল. মেনককেন মৌলবাদীদের জাতির জঞ্জাল হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জোরের সাথে বলেন যে, মুখ ব্যাদান করে থাকা আপল্যান্ড উপত্যকার আদিম মানুষসহ গ্রামের লোকজনকে যেহেতু ভালোবাসতেন, তাই ব্রায়ানের এক 'এক-ঘোড়া টেনিসি গ্রামে' মারা যাওয়াটাই ভালো হয়েছে।' সর্বত্রই আছে মৌলবাদীরা।

> তারা গ্যাস কারখানার নোংরা পথের মতোই পুরু। সব জায়গাতেই আছে তারা মরণশীল মনের পক্ষে ভার বহন করা খুবই কঠিন শিক্ষা, এমনকি ছোট স্কুলহাউসের ছাদের আবছা, করুণ শিক্ষাও।[৩৫]

AMARBOI.COM

মৌলবাদীরা অতীতের অধিবাসী; বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার শত্রু ছিল তারা, আধুনিক বিশ্বে অংশ নেওয়ার অযোগ্য। *দ্য ওয়ার অন মডার্ন সায়েন্স* (১৯২৭)-এ মেয়নার্ড শিপলি যেমন যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মৌলবাদীরা গোষ্ঠীতে ক্ষমতা অধিকার করতে পারলে এবং আইন করে মানুষের উপর তাদের বিধিবিধান চাপিয়ে দিলে আমেরিকানরা তাদের সংস্কৃতির সেরা অংশ খোয়াবে, আবার ফিরে যাবে অন্ধকার যুগে। সংস্কৃতি সব সময়ই প্রতিযোগিতার বিষয়, বিভিন্ন গোষ্ঠী যার যার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি টিকিয়ে রাখার লড়াই করছে। মৌলবাদীদের উপর ভর্ৎসনা চাপিয়ে দিয়ে ডেটনে সেকুলারিস্টরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, প্রমাণ করেছে তাদের গুরুত্বের সাথে নেওয়ার প্রয়োজন নেই বা উচিত হবে না। স্কোপস ট্রায়ালের পর মৌলবাদীরা নীরব ছিল, উদারপন্থীরা গোষ্ঠীতে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছিল, এক ধরনের আঁতাত হয়েছিল বলে মনে হয়। উইলিয়াম বেল রাইলি ও তাঁর অনুসারীরা লড়াই তুলে রেখেছিলেন বলে মনে হচ্ছিল; দশকের শেষ নাগাদ রাইলি উদারপন্থী হ্যারি ফসডিকের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হন।

তবে মৌলবাদীরা আসলে পুরোপুরি বিদায় হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বিচারের পর আরও চরম হয়ে উঠেছিল তারা। নিজেদের তিক্তবিরক্ত মনে করে মূলধারার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ লালন করেছিল। ডেটনে তারা–বিশ্রীভাবে–ধর্ম প্রাচীন প্রাসঙ্গিকতাহীন বিষয় ও কেবল বিজ্ঞানই গুরুত্বপূর্ণ, রেডিক্যাল সেক্যুলারিস্টদের এমনি চরম দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে লড়ার প্রয়াস পেয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেনি তারা, কাজটা করার জন্যে ভুল প্ল্যাটফর্ম বেছে নিয়েছিল। ব্রায়ানের জার্মান-বিরোধী ভীতি ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ, ডারউইনকে দানোরে পরিণত করাও ভুল ছিল। কিন্তু ধর্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঔচিত্যবোধসমূহ মানুষের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে বল্গাহীন যুক্তিবাদের স্বার্থে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে অবিবেচকের মতো ছুঁড়ে ফেলা উচিত হবে না। বিজ্ঞান ও নীতির সম্পর্কের বিষয়টি সব সময়ই জ্বলন্ত উদ্বেগের বিষয় হয়েছিল। কিন্তু মৌলবাদীরা ডেটনে মামলায় হেরে গিয়েছিল, অসন্তোষের সাথে আচরণ করে সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়েছিল তাদের। পঞ্চাশ বছর আগে নিউ লাইটসরা আমেরিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল; স্কোপস ট্রায়ালের পর তারা পরিণত হয় বহিরাগতে। কিন্তু মেনককেনের মতো সেক্যুলার ক্রুসেডারদের পরিহাস ছিল উল্টো ফলদায়ী। মৌলবাদী ধর্মবিশ্বাস গভীর ভীতি ও উদ্বেগে প্রোথিত যা কেবল খাঁটি যৌক্তিক যুক্তি দিয়ে প্রশমিত হওয়ার নয়। ডেটনের পর আরও উগ্র হয়ে ওঠে তারা।[৩৬] বিচারের আগে বিবর্তন তাদের কাছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না, এমনকি চার্লস হজের মতো অক্ষরবাদীরা পর্যন্ত পৃথিবীর বয়স বাইবেলে

AMARBOI.COM

যাই বলা হোক না কেন ছয় হাজার বছরের বেশি, এটা মেনে নিয়েছিলেন। নিউ ফান্ডামেন্টালিস্টরা জেনেসিসকে সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নির্ভুল আখ্যায়িতকারী তথাকথিত 'সৃষ্টিবিজ্ঞান' বিশ্বাস করত। কিন্তু ডেটনের পর মৌলবাদীরা আরও বেশি করে মানসিকভাবে নিজেদের রুদ্ধ করে ফেলে, সৃষ্টিবিজ্ঞানবাদ ও অটল বাইবেলিয় অক্ষরবাদ মৌলবাদী মানসিকতায় মূল বিষয়ে পরিণত হয়। তারা রাজনৈতিক বর্ণালীর আরও ডানে সরে যায়। যুদ্ধের আগে রাইলি ও জন আর. স্ট্র্যাটনের (১৮৭৫–১৯২৯) মতো মৌলবাদীরা সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে বামপন্থীদের সাথে মিলে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। এবার সোশ্যাল গস্পেল গোষ্ঠীতে তাদের পরাস্তকারী উদারবাদীদের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। এটা আমাদের কাহিনীর একটা অব্যাহত থিম হয়ে থাকবে। মৌলবাদ আগ্রাসী উদারবাদ বা সেক্যুলারিজমের সাথে এক প্রতীকী সম্পর্কের ভেতর অবস্থান করে। আক্রান্ত হলে অনিবার্যভাবে আরও চরম, তিক্ত ও আগ্রাসী হয়ে ওঠে।

ডারেরো ও মেন্‌ককেন মৌলবাদীদের সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিকবাসী ভেবে ভুল করেছিলেন। তাদের দিক থেকে মৌলবাদীরা আন্তরিক আধুনিকবাদী। 'মৌলে' ফিরে যাবার প্রয়াসে তারা বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক ধারার সাথেই একাত্ম ছিল।[৩৭] অন্য যেকোনও আধুনিকতাবাদীর মতোই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে আসক্ত ছিল, যদিও কাল্টিয় না হয়ে বরং বেকনিয় ছিল তারা। ১৯২০ সালে এ.সি. ডিক্সন যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি ক্রিশ্চান 'কারণ আমি চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক।' ধর্মবিশ্বাস অন্ধাকারে ঝাঁপ দেওয়া নয়, বরং 'সঠিক পর্যবেক্ষণ ও সঠিক চিন্তার উপর' নির্ভরশীল।[৩৮] মতবাদসমূহ কেবল ধর্মতাত্ত্বিক আঁচঅনুমান নয়, বরং সত্যি। এটা সম্পূর্ণই আধুনিক ধর্মীয় বিকাশ ছিল, রক্ষণশীল কালের প্রাক আধুনিক আধ্যাত্মিকতা থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে। মৌলবাদীরা এমন এক কালে ধার্মিক হওয়ার উপায়ের সন্ধান করছিল যখন বিজ্ঞানের *লোগোস*কে সব কিছুর উপরে মূল্য দেওয়া হচ্ছিল। সময়ই বলে দেবে ধর্মীয়ভাবে এইসব প্রয়াস কতখানি সফল হবে, তবে ডেটন দেখিয়ে দিয়েছিল যে মৌলবাদ অপবিজ্ঞান, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক মাণদণ্ডের সাথে খাপ খাওয়ার উপযুক্ত নয়।

মৌলবাদীরা যখন আধুনিক ধর্ম বিশ্বাস গড়ে তুলছিল, ঠিক সেই সময় পেন্টাকোস্টালিস্টরা আলোকনের যৌক্তিক আধুনিকতাকে তৃণমূল পর্যায়ে প্রত্যাখান তুলে ধরা 'উত্তর আধুনিক' দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলছিল। মৌলবাদীরা যেখানে তাদের দৃষ্টিতে ক্রিশ্চান ধর্মের মতবাদগত ভিত্তিতে ফিরে যাচ্ছিল, পেন্টাকোস্টালিস্টরা সেখানে, যাদের ডগমায় কোনও আগ্রহ ছিল না, আরও বেশি মৌল স্তরে প্রত্যাবর্তন

করিছিলঃ ধর্মবিশ্বাসের ক্রিডাল ফর্মুলেশনের নিচে অবস্থিত খাঁটি ধার্মিকতার কেন্দ্রে ফিরে যাচ্ছিল। মৌলবাদীরা যেখানে ঐশীগ্রন্থের লিখিত বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, পেন্টাকোস্টালিস্টরা ভাষাকে এড়িয়ে গিয়েছে–অতীন্দ্রিয়বাদীরা সব সময়ই যেমন জোর দিয়েছে যে, ভাষা ধারণা ও যুক্তির অতীতে অবস্থানকারী বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে পারে না। তাদের ধর্মীয় ডিসকোর্স মৌলবাদীদের *লোগোস* ছিল না, সেটা ছিল বাণীর অতীত। পেন্টাকোস্টালিস্টরা 'বিভিন্ন ভাষায়' কথা বলত, তাদের বিশ্বাস ছিল পবিত্র আত্মা পেন্টাকোস্টের ইহুদি ভোজ সভায় অ্যাপসলদের উপর যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছেন। যখন ঐশী উপস্থিতি স্বয়ং আগুনের জিহ্বায় নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন আর অ্যাপসলদের অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে সক্ষম করে তুলেছিলেন।[৩৯]

পেন্টাকোস্টালিস্টদের প্রথম দলটি ৯ই এপ্রিল ১৯০৬ তারিখে লস অ্যাঞ্জেলিসের এক ছোট বাড়িতে আত্মার অভিজ্ঞতা লাভ করে। দলের নেতা ছিলেন উইলিয়াম জোসেফ সিমুর (১৮৭০–১৯১৫), দীর্ঘদিন ধরে অধিকতর আনুষ্ঠানিক শ্বেতাঙ্গ প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীতে যতটা সম্ভব তার চেয়ে আন্তরিক ও নির্বোধ ধরনের ধর্মের সন্ধানকারী গৃহযুদ্ধের পর মুক্তিলাভকারী দাসদের সন্তান। ১৯০০ সাল নাগাদ হলিনেস আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি, এর বিশ্বাস ছিল পয়গম্বর জোয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আদিম চার্চের উপভোগ করা নিরাময়, পরমানন্দ, ভাষা আর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা অন্তিম কালের অব্যবহিত আগে ঈশ্বরের জাতির উপর পুনঃস্থাপিত হবে।[৪০] সিমুর ও তাঁর বন্ধুরা আত্মার অভিজ্ঞতা লাভ করলে দাবানলের মতো সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। আফ্রিকান আমেরিকান ও শ্বেতাঙ্গ অবহেলিতরা দলে দলে এত বিপুল সংখ্যায় পরের সভায় এসে হাজির হতে শুরু করেছিল যে আযুসা স্ট্রিটের একটা পুরোনো গুদাম ঘরে সরে যেতে হয়েছিল তাদের। চার বছরের ভেতর সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন শো পেন্টাকোস্টাল গ্রুপ গড়ে ওঠে, পঞ্চাশটি দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই আন্দোলন।[৪১] প্রথম পেন্টাকোস্টাল জোয়ার ছিল আধুনিক কালের বিভিন্ন সময়ে বিস্ফোরিত আরও একটি জনপ্রিয় মহাজাগরণ, যখন লোকে অন্তস্তল থেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে পরিবর্তন একেবারেই হাতের নাগালে। সিমুর ও প্রথম পেন্টাকোস্টালিস্টদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ছিল যে শেষের দিনগুলো শুরু হয়ে গেছে, শিগগিরই আরও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণের জন্যে জেসাস আবির্ভূত হবেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন মনে হলো যতটা দ্রুত মনে হয়েছিল জেসাস তত তাড়াতাড়ি ফিরছেন না, পেন্টাকোস্টালিস্টরা তখন ভিন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। একে এবার ঈশ্বরের সাথে কথা বলার এক নতুন কায়দা মনে

করতে থাকে। সেইন্ট পল ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, ক্রিশ্চানরা যখন প্রার্থনা করা কষ্টকর আবিষ্কার করে, 'তখন স্বয়ং আত্মা আমাদের সাথে সকল উচ্চারণের অতীত গোঙানির ভেতর দিয়ে মধ্যস্ততা করে।'[৪২] ভাষার অতীতে অবস্থানকারী এক ঈশ্বরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল তারা।

এই প্রাথমিক বছরগুলোয় সত্যিই এইসব পেন্টাকোস্টালিস্ট ধর্মসভায় এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ও বর্ধিত বিদেশীদের নিয়ে আতঙ্কের একটা কালে কালো ও শাদারা একসাথে প্রার্থনা করেছে ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে। সিমুর বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, ভিন্ন ভাষায় কথার বলার ক্ষমতার চেয়ে বরং জাতিগত এই সংহতিই শেষ জমানার সূচনার চূড়ান্ত লক্ষণ।[৪৩] প্রশান্ত ব্যাপার ছিল না এটা। এখানে পুনর্জাগরণবাদী ও উপদলের অস্তিত্ব ছিল, কোনও কোনও শাদা পেন্টাকোস্টালিস্ট তাদের নিজস্ব ভিন্ন চার্চ গঠন করেছিল।[৪৪] কিন্তু সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষের ভেতর অসাধারণ দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়া পেন্টাকোস্টালিস্ট আন্দোলন স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহকে প্রতিফলিত করেছে। পেন্টাকোস্টালিস্ট সভায় নারী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত, ঘোরে চলে যেত, পরমানন্দমূলক তুরীয় অবস্থায় যেত, দেখা যেত তারা শূন্যে ভাসছে, এবং তাদের মনে হত অনির্বচনীয় আনন্দে তাদের শরীর হাসছে। বাতাসে উজ্জ্বল আলোকময় চিহ্ন দেখতে পেত লোকে, যেন প্রতাপের চাপে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে বলে মনে হত।[৪৫] এমনি বুনো তুরীয় আনন্দ সহজাতভাবে বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু গোড়ার দিকের এই সময়ে লোকে অন্তত মহাজাগরণের সময়ের মতো হতাশা ও বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়নি। আফ্রিকান-আমেরিকানরা পরমানন্দমূলক আধ্যাত্মিকতায় ঢের বেশি দক্ষ ছিল। যদিও পরে আমরা যেমন দেখব, কিছু শাদা পেন্টাকোস্টালিস্ট মনের অস্বাস্থ্যকর ও বিনাশী অবস্থায় পতিত হবে। শিশু অবস্থায় আন্দোলন ভালোবাসা ও সহানুভূতির মনোভাবের উপর গুরুত্ব দিয়েছে, যা একে নিজস্ব শৃঙ্খলা যুগিয়েছে। সিমুর সাধারণত বলতেন: 'ক্রুদ্ধ হলে বা বাজে কথা বললে বা পরনিন্দা করলে, তুমি কতগুলো ভাষায় কথা বলতে পারছ আমি তার পরোয়া করি না, আসলে পবিত্র আত্মায় দীক্ষিত হওনি তুমি।'[৪৬] 'সকল দরিদ্র ও অস্পৃশ্যকে এক করে আমাদের সবাইকে ভালোবাসতে শেখাতে ঈশ্বর এই বিলম্বিত বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন,' ১৯১০ সালে ব্যাখ্যা করেছেন পেন্টাকোস্টালিজমের গোড়ার দিকের ভাষ্যকার ডি.ডব্লু. মাইল্যান্ড। 'ঈশ্বর ঘৃণিত বস্তু, ইতর বস্তু গ্রহণ করে নিজেকে তাতে মহান করে তুলছেন।'[৪৭] অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহানুভূতিশীল ভালোবাসার উপর গুরুত্ব আরোপ মৌলবাদী ক্রিশ্চান ধর্মের সাথে লক্ষণীয় পার্থক্য তুলে ধরে। যেকোনও ধার্মিকতার

চূড়ান্ত পরীক্ষা যদি বদান্যতাই হয়ে থাকে, এই পর্যায়ে পেন্টাকোস্টালিস্টরা সামনে এগিয়ে ছিল।

পেন্টাকোস্টালিস্টবাদের এক আলোকসঞ্চারী গবেষণায় আমেরিকান পণ্ডিত হার্ভে কক্স যেমন যুক্তি দেখিয়েছেন, এই আন্দোলনটি ছিল আধুনিক পাশ্চাত্যের প্রত্যাখ্যান করা বহু অভিজ্ঞতা পুনরুদ্ধারের একটা প্রয়াস।[৪৮] একে যুক্তির আধুনিক কাল্টের বিরুদ্ধে তৃণমূল পর্যায়ের বিদ্রোহ হিসাবে দেখা যেতে পারে। পেন্টাকোস্টালিজম এমন এক সময়ে শেকড় বিস্তার করেছিল যখন লোকে বিজ্ঞান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠতে শুরু করেছে, যখন ধার্মিক লোকজন কেবল যুক্তির উপর নির্ভরশীলতা ঐতিহ্যগতভাবে অধিকতর স্বজ্ঞামূলক, কল্পনানির্ভর ও নন্দনতাত্ত্বিক মানসিক অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল ধর্মবিশ্বাসের উপর উদ্বেগ সৃষ্টিকারী তাৎপর্য থাকার ব্যাপারে অস্বস্তির সাথে সজাগ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। মৌলবাদীরা যেখানে বাইবেল ভিত্তিক ধর্মকে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছিল, পেন্টাকোস্টালিস্ট সেখানে ধার্মিকতার মূলে ফিরে যাচ্ছিল, কক্স যাকে 'মনের সেই ব্যাপক অপ্রক্রিয়জাতকৃত নিম্নক্রিয়াস' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, 'যেখানে উদ্দেশ্যের বোধ ও তাৎপর্যের জন্যে অন্তহীন সংগ্রাম চলতে থাকে।'[৪৯] মৌলবাদীরা যেখানে যৌক্তিকভাবে প্রমাণিত ডগমার সাথে ধর্মবিশ্বাসকে মিলিয়ে ফেলে ধর্মীয় অনুভূতিকে মনের একেবারে বাইরের বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ে সীমিত করে ফেলছিল, পেন্টাকোস্টালিস্টরা সেখানে পুরাণ ও ধার্মিকতার অবচেতন উৎসে ফিরে যাচ্ছিল। মৌলবাদীরা যেখানে বাণী ও আক্ষরিক অর্থের উপর জোর দিয়েছে সেখানে পেন্টাকোস্টালিস্টরা প্রথাগত ভাষা এড়িয়ে গিয়ে কোনও ঐতিহ্যের ক্রেডাল ভিত্তির অতীতে অবস্থিত আদিম আধ্যাত্মিকতায় প্রবেশের প্রয়াস পেয়েছে। আধুনিক রীতি যেখানে নারী-পুরুষকে বাস্তবভিত্তিকভাবে কেবল এই জগতের প্রতিই জোর দিতে বলে, পেন্টাকোস্টালিস্টরা সেখানে মানুষের তুরীয় আনন্দ ও দুর্জ্ঞেয় অনুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেছে। বিশ্বাসের এমনি ধূমকেতুসুলভ বিস্ফোরণ দেখায় যে, সবাই আধুনিকতার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে মোহিত হয়নি। আধুনিকতার বহু মূল বিষয় থেকে এমনি সহজাত পশ্চাদপসরণ-বহু লোকের পাশ্চাত্যের সাহসী নতুন বিশ্বে একটা কিছু হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতি বোধ করার বিষয়টি তুলে ধরে।

আমাদের এই কাহিনীতে আমরা প্রায়শঃই লক্ষ করব যে, আধুনিকতার প্রধান সুবিধাভোগী নয় এমন মানুষের ধর্মীয় আচরণ অনেক সময়ই সেক্যুলারিস্ট সমাজে বর্জন বা প্রান্তিক অবস্থায় ঠেলে দেওয়া আধ্যাত্মিকতার জোরাল চাহিদা তুলে ধরে। আমেরিকান সমালোচক সুজান সন্টাগ পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতায় যখনই 'চিন্তাভাবনা একটা বিশেষ কষ্টকর জটিলতা ও আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্যের' পর্যায়ে

পৌঁছেছে, তখনই 'ভাষার সাথে স্থায়ী অসন্তোষ সৃষ্টির' কথা উল্লেখ করেছেন।[৫০] এমন অবস্থায় লোকে মানবীয় ভাষার ক্ষমতা নিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদীর অধৈর্যের অংশীদার হয়ে যায়। সকল ধর্মবিশ্বাসের অতীন্দ্রিয়বাদীরা জোরের সাথে বলেছে যে, চূড়ান্ত সত্তা শেষ পর্যন্ত অনির্বচনীয় ও প্রকাশের অতীত। কেউ কেউ মানুষ পবিত্র ও দুর্জ্ঞেয়র উপস্থিতিতে থাকার সময় ভাষা ও তার প্রকাশিত যৌক্তিক ধারণা যখন কোনও কাজে আসে না, তখন শিক্ষাব্রতীকে অনুভূতি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পেন্টাকোস্টলিস্টদের নানা ভাষায় কথা বলার অনুরূপ তুরীয় আনন্দসুলভ উচ্চারণের উপায় গড়ে তুলেছে: উদাহরণ স্বরূপ, তিব্বতের সাধুরা দ্বৈত গম্ভীর আওয়াজ তোলেন, হিন্দু গুরুরা নাকি সুর তোলেন।[৫১] আযুসা স্ট্রিটের পেন্টাকোস্টালিস্টরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন একটা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছিল যার সাহায্যে বিভিন্ন ঐতিহ্য ঐশীসত্তাকে মানবীয় ভাবনা প্রক্রিয়ার অধীন হওয়ার হাত থেকে রক্ষার প্রয়াস পেয়েছে। মৌলবাদীরা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু তারপরেও পেন্টাকোস্টালিস্ট ও মৌলবাদীরা তাদের স্ব স্ব কায়দায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বছরগুলোর বাস্তবতা অনুযায়ী এক নজীর বিহীন জটিলতায় পৌঁছে যাওয়া পাশ্চাত্য ডিসকোর্সের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল। স্কোপস ট্রায়ালে সাধারণ মানুষের 'কাণ্ডজ্ঞানের' পক্ষে লড়াই করেছিলেন ব্রায়ান, চেষ্টা করেছেন বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আঘাত হানার। পেন্টাকোস্টালিস্টরা যুক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিল, কিন্তু মৌলবাদীদের মতোই স্বল্প শিক্ষিত মানুষের কথা বলার ও তাদের বক্তব্য শোনার অধিকারের উপর জোর দিচ্ছিল।

বর্জনবাদী ও নিন্দাবাদী ধার্মিকতার প্রতি বিশ্বস্ত মৌলবাদীরা পেন্টাকোস্টালিস্টদের দারুণ ঘৃণা করেছে। ওয়ারফিল্ড যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অলৌকিক ঘটনার দিন শেষ হয়ে গেছে; ঈশ্বর নিয়মিত ভিত্তিতে প্রকৃতির নিয়ম কানুন পাল্টে দেন এমন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পেন্টাকোস্টালিস্টরা রোমান ক্যাথলিকদের চেয়েও খারাপ। পেন্টাকোস্টালিস্টদের যুক্তিহীনতা মৌলবাদীদের কাছে বৈরী প্রতীয়মান বিশ্বে টিকে থাকা নিশ্চিত করার জন্যে বিশ্বাসের উপর আরোপের করার প্রয়াস চালানো বৈজ্ঞানিক ও মৌখিক নিয়ন্ত্রণের প্রতি আক্রমণ ছিল। অন্য মৌলাবাদীরা পেন্টাকোস্টালিস্টদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার অভিযোগ এনেছে; একজন তো এমনকি আন্দোলনকে 'শয়তানের শেষ বমি' পর্যন্ত বলেছেন।[৫২] কটুকাটব্য ও চূড়ান্ত বিচারের বৈশিষ্ট্য ছিল নতুন প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় গুণ। স্কোপস ট্রায়ালের পর গস্পেলের চেতনা থেকে বহুদূরের নিন্দাবাদের এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু মতানৈক্য

সত্ত্বেও মৌলবাদী ও পেন্টাকোস্টালিস্টরা আধুনিক পাশ্চাত্য বিশ্বে আধুনিকতার বিজয়ের ফলে রয়ে যাওয়া শূন্যতা পূরণের প্রয়াস পাচ্ছিল। ভালোবাসার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও মতবাদের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করে পেন্টাকোস্টালিস্টরা এমনি প্রাথমিক কালে মধ্যবিত্ত উদারপন্থী প্রটেস্ট্যান্টদের অনেক কাছাকাছি ছিল, যদিও শতাব্দীর শেষের দিকে, আমরা যেমন দেখব, কেউ কেউ আরও চরম, কট্টরপন্থী মৌলবাদী শিবিরে সরে গিয়ে দানের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিস্মৃত হবে।

ইহুদি বিশ্বেও উনবিংশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা অতিরিক্ত যৌক্তিক ধরনের ধর্মবিশ্বাস থেকে লোকের পিছিয়ে আসার লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। জার্মানিতে হারমান কোন (১৮৪২–১৯১৮) ও ফ্রানয রোজেনজ্ভিগের (১৮৮৬–১৯২৯) মতো দার্শনিকগণ আলোকনের মূল্যবোধসমূহকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন, যদিও রোজেনভিগ আধুনিক মানুষের উপলব্ধি করার উপযোগি করে প্রাচীন মিথলজি ও আচার আচরণগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সব সময় যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নাও হতে পারে তোরাহর এমন বিভিন্ন নির্দেশনাকে নিজেদের অতীতে ঐশী সত্তার দিকে ইঙ্গিতকারী প্রতীক হিসাবে উল্লেখ করেছেন তিনি। আচার এক অন্তস্থঃ প্রবণতা সৃষ্টি করেছে ইহুদিদের যা পবিত্রতার সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করেছে, তাদের শোনার ও অপেক্ষা করার প্রবণতার চর্চায় সাহায্য করেছে। সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের বাইবেলিয় কাহিনীগুলো বাস্তব নয়, বরং আমাদের অন্তস্থঃ জীবনের আধ্যাত্মিক বাস্তবতার প্রকাশ। মার্টিন বুবের (১৮৭৮–১৯৬৫) ও গারশোম শোলেমের (১৮৯৭–১৯৮২) মতো পণ্ডিতগণ যুক্তিবাদী ইতিহাসবিদগণ যে ধরনের ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দিয়েছিলেন সেগুলোর দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। বুবের হাসিদবাদের সমৃদ্ধি তুলে ধরেছেন আর কাব্বালাহর জগৎ আবিষ্কার করেছেন শোলেম। তবে ভিন্ন জগতের বিষয় প্রাচীন এই আধ্যাত্মিকতাগুলো যৌক্তিক চেতনায় অনুপ্রাণিত ইহুদিদের পক্ষে ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

AMARBOI.COM

যায়নবাদীরা প্রায়শঃ এমনভাবে তাদের স্পর্ধিত সেক্যুলারিস্ট আদর্শকে উপলব্ধি করেছে যাকে এক সময় ধর্মীয় বলে অভিহিত করা হয়েছিল। বিনাশী হতাশাকে এড়াতে মানুষকে কোনওভাবে আধ্যাত্মিক শূন্যতাকে পূরণ করতে

হয়েছে। প্রথাগত ধর্ম কাজ না করলে তারা জীবনকে এক দুর্জ্ঞেয় অর্থে ভরে তুলবে এমন একটা সেক্যুলারিস্ট আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি করবে। অন্যান্য আধুনিক আন্দোলনের মতো যায়নবাদ ইহুদি হওয়ার এক নতুন উপায় তুলে ধরা একক, মৌল মূল্যবোধে প্রত্যাবর্তন ছিল। স্বদেশভূমিতে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে ইহুদিরা নিজেদের কেবল কারও কারও কাছে মনে হওয়া অত্যাসন্ন অ্যান্টি-সেমিটিক বিপর্যয়ের হাত থেকেই রক্ষা করবে না, বরং ঈশ্বর, তোরাহ বা কাব্বালাহ ছাড়াই এক মনস্তাত্ত্বিক নিরাময় আবিষ্কার করবে। যায়নবাদী লেখক আশার গিন্সবার্গ (১৮৫৬–১৯২৭), আহাদ হা-আম ('জনগণের একজন') ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইহুদিদের জগৎ পর্যবেক্ষণ করার আরও যৌক্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু একজন প্রকৃত আধুনিকের মতো তিনি ইহুদিবাদের ন্যূনতম *সত্তায়* ফিরে যেতে চেয়েছেন, যা ইহুদিরা কেবল তাদের শেকড়ে ফিরে গিয়ে প্যালেস্তাইনে আবাস শুরু করলেই পাওয়া যাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম ইহুদিবাদের বাহ্যিক আবরণ মাত্র। পবিত্র ভূমিতে ইহুদিদের গড়ে তোলা নতুন চেতনাই এককালে ঈশ্বর ওদের জন্যে যা করেছিলেন সেটা করবে। এটা পরিণত হবে 'জীবনের সকল পর্যায়ের এক দিক দর্শন,' 'হৃদয়ের অন্তস্থলে,' পৌঁছে যাবে ও 'অনুভূতির সাথে যোগসূত্র স্থাপন' করবে।[৫৩] এভাবে যায়নে প্রত্যাবর্তন এককালের কাব্বালিস্টের সেই অন্তস্থঃ যাত্রার মতো হয়ে দাঁড়াবেঃ একাত্মতা অর্জনের লক্ষ্যে মনের গভীরে অবতরণ।

ধর্মকে প্রায়শঃই ঘৃণাকারী যায়নবাদীরা তাদের আন্দোলন সম্পর্কে সহজাত প্রবৃত্তির বশেই অর্থডক্স ধর্মভাষায় কথা বলত। 'অভিবাসন' বোঝাতে তাদের ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ *আলিয়াহ* আদিতে সত্তার উচ্চতর পর্যায়ে আরোহণকে বোঝাতে ব্যবহার করা হত। অভিবাসীদের তারা বলত *ওলিম* ('যারা উর্ধ্বারোহণ করেছে,' বা 'তীর্থযাত্রী')। নতুন কৃষি বসতিতে যোগদানকারী কাউকে বলা হত *চালুয*– নিস্কৃতি, মুক্তি ও উদ্ধার লাভ বোঝানো জোরাল ধর্মীয় দ্যেতনা বিশিষ্ট শব্দ।[৫৪] জাফা বন্দরে পৌঁছানোর পর যায়নবাদীরা প্রায়শঃই জমিনে চুমু খেত; অভিবাসনকে তারা নবজন্ম বিবেচনা করত, অনেক সময় বাইবেলিয় গোত্রপিতাদের মতো ক্ষমতায়নের বোধ প্রকাশ করতে নামও পাল্টে ফেলত।

লেবর যায়নিজমের আধ্যাত্মিকতা আহারন ডেভিড গর্ডনের (১৮৫৬–১৯২২) হাতে সবচেয়ে বাঙ্ময় ও জোরালভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৪ সালে তিনি প্যালেস্তাইনে পৌঁছানোর পর গালিলির দেগানিয়ার এক নতুন সমবায় বসতিতে কাজ করেন। এখানে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ধার্মিক ইহুদিরা যাকে বলবে শেখিনাহর অভিজ্ঞতা। অর্থডক্স ইহুদি ও কাব্বালিস্ট হলেও কান্ট, শোপেনহাওয়ার,

AMARBOI.COM

নিৎশে, মার্ক্স ও তলস্তয়ের ছাত্র ছিলেন গর্ডন। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন, আধুনিক শিল্পায়িত সমাজ নারী-পুরুষকে তাদের নিজেদের কাছ থেকেই নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছে। জীবন সম্পর্কে একপেশে ও অতিযৌক্তিক উপলব্ধি গড়ে তুলেছে তারা। একে ভারসাম্য দিতে তাদের অবশ্যই নিজেদের যতখানি সম্ভব প্রকৃতিক ল্যান্ডস্কেপের জীবনে সংশ্লিষ্ট করার মাধ্যমে *চাভায়াহ্*র–পবিত্রের খুব কাছের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা–চর্চা করতে হবে, কারণ এখানেই নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেন অন্তহীন। ইহুদিদের ক্ষেত্রে এই ল্যান্ডস্কেপকে অবশ্যই প্যালেস্তাইন হতে হবে। 'ইহুদির আত্মা,' জোর দিয়ে বলেছেন গর্ডন, 'ইসরায়েল দেশের স্বাভাবিক পরিবেশের সন্তান।' কেবল সেখানেই একজন ইহুদি, কাব্বালিস্টরা যাকে 'স্পষ্টতা, অন্তহীনভাবে পরিষ্কার আকাশ, স্পষ্ট দৃষ্টিকোণ, বিশুদ্ধতার কুয়াশা'[৫৫] বলেছে, তার সন্ধান পেতে পারে। শ্রমের (*আভোদাহ্*) মাধ্যমে একজন অগ্রগামী 'অজ্ঞাত ঐশীসত্তাকে' চিনতে পারবে ও অতীন্দ্রিয়বাদীরা যেভাবে আধ্যাত্মিক অনুশীলনে নিজেদের নতুন করে নির্মাণ করেছিলেন সেভাবে গড়ে তুলতে পারবে। জমিনে কাজ করে, 'অপ্রাকৃতিক, ত্রুটিপূর্ণ, বিচ্ছিন্ন মানুষ' ডায়াসপোরাতে তার যা পরিণতি হয়েছে, তা থেকে পরিবর্তিত হয়ে 'প্রাকৃতিক, সম্পূর্ণ মানব সত্তায় পরিণত হবে, যে নিজের কাছে অনুগত।'[৫৬] গর্ডনের কাছে মন্দিরের লিটার্জিতে 'শ্রম' বা 'সেবার' জন্যে *আভোদাহ* শব্দ ব্যবহৃত হওয়াটা বিস্ময়ের ছিল না। যায়নাবাদীদের পক্ষে পবিত্রতা ও সামগ্রিকতা আর প্রথাগত ধর্মীয় আচারে পাওয়ার বিষয় ছিল না, বরং গালিলিতে পাহাড় ও খামারে কঠোর পরিশ্রমেই মিলছিল।

সেক্যুলারকে আধ্যাত্মিকতায় পরিবর্তনের অন্যতম বেপরোয়া ইহুদি প্রয়াস রূপ লাভ করেছিল র‍্যাবাই আব্রাহাম ইতযহাক কুকের হাতে (১৮৬৫–১৯৩৫)। তিনিও ১৯০৪ সালে নতুন বসতির সম্প্রদায়ের র‍্যাবাই হওয়ার উদ্দেশ্যে প্যালেস্তাইনে অভিবাসন করেছিলেন। এক অদ্ভুত নিয়োগ ছিল এটা। বেশির ভাগ অর্থডক্সের বিপরীতে যায়নবাদী আন্দোলনে গভীরভাবে আন্দোলিত ছিলেন কুক। কিন্তু ১৮৯৮ সালে বাসেলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় যায়নবাদী কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের 'যায়নবাদের সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক' না থাকার ঘোষণায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।[৫৭] তীব্র ভাষায় এর নিন্দা জানান তিনি। 'অসাধারণ নতুন আন্দোলনটিকে এর খোদ জীবন ও সৌন্দর্যের আলোর উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপর-নিচে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর কালো ছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে।' এটা 'এক ধরনের অমর্যাদা ও বিকৃতি,' যায়নবাদকে বিনষ্টকারী 'বিষ', এর 'পচন ও কীটপতঙ্গের নিচে চাপা পড়ে যাবার' কারণ হচ্ছে। এর ফলে যায়নবাদ কেবল 'শূন্য গর্ভ পাত্রে পরিণত

AMARBOI.COM

হতে পারে...ধ্বংসশীলতা ও সংঘাতের চেতনায় পরিপূর্ণ।'[৫৮] প্রায়শঃই প্রাচীনকালের পয়গম্বরদের ভাষায় কথা বলতেন কুক, কিন্তু তাঁর চিন্তার বহু উপাদান ছিল আধুনিক। তিনি ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বহু আগেই জাতীয়তাবাদ মারাত্মক হয়ে ওঠার ও পবিত্রতার বোধ ছাড়া রাজনীতির দানবীয় চেহারা নিতে পারার সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সক্ষম অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি, এই ধরনের আদর্শ নিয়েই সূচনা ঘটেছিল তার, কিন্তু রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতার বুনো উৎসবে পরিণত হয়েছে শেষে। নিখাঁদ সেক্যুলারিস্ট আদর্শ নারী ও পুরুষের ভেতরের স্বর্গীয় ইমেজকে মাড়িয়ে যেতে পারে; একেই রাষ্ট্র পরম মূল্য দিলে তখন একজন শাসককে তাঁর দৃষ্টিতে জাতির উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী বলে মনে হওয়া সেইসব প্রজাদের বিনাশ করা থেকে বিরত রাখা যায় না। 'যখন কেবল জাতীয়তাবাদই জনগণের মাঝে শেকড় গেড়ে বসে,' সতর্ক করে বলেছেন তিনি, 'তখন তা চেতনাকে উন্নত করার মতো তাদের চেতনাকে অবনমিত ও অমানবীয়করণও করতে পারে।'[৫৯]

অবশ্যই অতিপ্রাকৃত কিছুর শরণাপন্ন না হয়েও প্রতিটি মানুষের মাঝে পবিত্র অলঙ্ঘনীয়তার বোধ জাগাতে মানুষকে সাহায্য করার জন্যে সেক্যুলারিস্ট ধারণাও ছিল। ধর্মও যেকোনও সেক্যুলার আদর্শের মতোই ভয়ানক খুনে হতে পারে। কিন্তু সময়োপযোগী সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন কুক, কেননা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দী একের পর এক গণহত্যার কর্মকাণ্ডে বৈশিষ্ট্যায়িত হয়েছে, জাতীয়তাবাদী, সেক্যুলার শাসকগণই করেছেন একাজ। কুক যায়নবাদেরও সমান নিপীড়নকারী পরিণত হওয়ার ও ইহুদিদের অবস্থা বিপজ্জনক রকম বহুঈশ্বরবাদী হয়ে ওঠার ভয় করেছেন। ইহুদিরা জানুক বা না জানুক, তারা অস্তিত্বগতভাবে ঐশীসত্তার সাথে সম্পর্কিত ছিল বলে ঈশ্বর অভিশপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্যালেস্তাইনে পৌঁছুনোর পর কুকের অন্যতম প্রথম দায়িত্ব ছিল করুণভাবে অল্প বয়সে পরলোকগত থিওদর হার্যেলের সম্মানে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করা। প্যালেস্তাইনের অর্থডক্স সম্প্রদায়ের হিংস্রতার মুখে যায়নবাদকে সহজাতভাবে অশুভ মনে করেছেন তিনি, হার্যেলকে জনপ্রিয় ইহুদি পরলোকতত্ত্বে ইহুদিদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মেসিয়ানিক যুগের শুরুর দিকে আবির্ভূত হবেন বলে প্রত্যাশিত একজন অভিশপ্ত ত্রাণকর্তা জোসেফের বংশের মেসায়াহ হিসাবে তুলে ধরেন কুক, যিনি জেরুজালেমের তোরণে মারা যাবেন। তবে তাঁর প্রচারণা ডেভিডের বংশের প্রকৃত ত্রাণকর্তার আগমনের পথ পরিষ্কার করবে, যিনি নিস্তার নিয়ে আসবেন। হার্যেলকে এভাবেই দেখেছেন কুক। তাঁর বহু সাফল্য ছিল গঠনমূলক, কিন্তু নিজের আদর্শ থেকে ধর্মকে মুছে ফেলার চেষ্টার কারণে তাঁর কাজ এপর্যন্ত ক্ষতিকর ছিল।

AMARBOI.COM

জোসেফীয় মেসায়াহর প্রয়াসের মতো নিশ্চিত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার মতো ছিল এটা। কুক এও যুক্তি দেখিয়েছেন যে যায়নবাদের বিরোধী অর্থডক্সরা সমানভাবে ধ্বংসাত্মক; নিজেদের 'বস্তুগত পরিবর্তনের শত্রু'-তে পরিণত করে ইহুদি জাতিকে দুর্বল করে দিয়েছে তারা।[৬০] ধার্মিক ও সেক্যুলারিস্ট ইহুদিদের পরস্পরের প্রয়োজন ছিল; একটি বাদে অন্যটি টিকতে পারত না।

এটা প্রাচীন রক্ষণশীল দর্শনকে নতুন করে তুলে ধরেছে। প্রাক আধুনিক বিশ্বে ধর্ম ও যুক্তি ভিন্ন কিন্তু সম্পূরক বলয় অধিকার করেছিল। দুটোই প্রয়োজনীয় ছিল এবং একটিকে ছাড়া অন্যটি হীন হয়ে পড়ত। কুক কাব্বালিস্ট ছিলেন, এক রক্ষণশীল কালের পুরাণ ও অতীন্দ্রিয়াবাদে অনুপ্রাণিত ছিলেন তিনি। কিন্তু আমাদের আলোচিত অন্য কয়েকজন সংস্কারকের মতো তিনি এই বিশ্বাসে আধুনিক ছিলেন যে পরিবর্তনই এখন জীবনের বিধি, যত বেদনাদায়কই হোক না কেন কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতাসমূহকে এখন ছুঁড়ে ফেলতেই হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, তরুণ যায়নবাদী বসতি স্থাপনকারীরা ইহুদিদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে–শেষ পর্যন্ত–নিষ্কৃতি নিয়ে আসবে। তাদের নিষ্ঠুর রকম বাস্তবভিত্তিক আদর্শ ছিল *লোগাস;* এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ও কার্যকরভাবে কাজ করার জন্যে মানুষের যা প্রয়োজন। কিন্তু একে সৃজনশীলভাবে ইহুদিধর্মের *মিথোসের* সাথে সম্পর্কিত করা না গেলে তা অর্থ খোয়াবে, জীবনের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হবে ও ক্রমে হারিয়ে যাবে।

প্যালেস্তাইনে পৌঁছানোর পর প্রথমবারের মতো এইসব সেক্যুলারিস্টের সাথে কুকের পরিচয় হয়। কয়েক বছর আগে তাদের ধর্ম প্রত্যাখ্যান তাঁকে ভীত করেছিল, কিন্তু পবিত্র ভূমিতে কাজ করতে যেতে দেখার পর তাঁর ধারণা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন তিনি। তিনি আবিষ্কার করেন তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিকতা রয়েছে। হ্যাঁ, ওরা বেপরোয়া ও উদ্ধত বটে, কিন্তু ওদের 'দয়া, সততা, স্বচ্ছতা ও করুণা...এবং [ওদের মাঝে] জ্ঞানের চেতনা ও উর্ধ্বারোহণের মহান গুণাবলী ও আদর্শও রয়েছে।' সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, 'বিশ্বব্যবস্থায় বাসকারী ও মধ্যপন্থী ও ভদ্রলোকদের ব্যথিতকারী ওদের বিদ্রোহী ভাব' ইহুদি জনগণকে সামনে ঠেলে দেবে; ইহুদিরা প্রগতি অর্জন করতে চাইলে এবং তাদের নিয়তিকে পূরণ করতে চাইলে ওদের গতিশীলতা জরুরি।[৬১] যায়নবাদী অগ্রপথিকদের তারিফ করার সময় তিনি এমন সব গুণ বেছে নিয়েছিলেন যেগুলো প্রাক আধুনিক কালে দারুণভাবে ঘৃণিত বিবেচিত হত, যখন লোকে চলমান ব্যবস্থার ছন্দ ও সীমা মেনে নিতে বাধ্য ছিল, যেখানে সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তিবিশেষ সমাজকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারত।[৬২]

AMARBOI.COM

> এই প্রবল প্রাণগুলো কোনও রকম সীমায় নিজেদের বন্দি হতে দিতে অস্বীকার করে নিজেদের সংহত করেছে,...শক্তিশালী জানে যে শক্তির এই প্রকাশ আসে বিশ্বকে পরিশুদ্ধ করতে, জাতি, মানবতা ও বিশ্বকে উজ্জীবিত করতে। কেবল সূচনার লগ্নেই এটা বিশৃঙ্খলার ও রূপে আবির্ভূত হয়েছিল।[৬৩]

তালমুদিয় কালে র‍্যাবাইরা কী ভবিষ্যৎবাণী করেননি যে 'ঔদ্ধত্য ও স্পর্ধার একটা কাল'[৬৪] আসবে যখন তরুণরা প্রবীনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে? এই বেদনাদায়ক বিদ্রোহ স্রেফ 'মেসায়াহর পদক্ষেপ...গম্ভীর পদক্ষেপ, বিশুদ্ধ আনন্দময় অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।'[৬৫]

কুক ছিলেন নতুন সেক্যুলারিজমকে আলিঙ্গন করতে পারা প্রথম গভীরভাবে ধর্মীয় চিন্তকদের অন্যতম; যদিও যায়নবাদী উদ্যোগ প্যালেস্টাইনে এক ধর্মীয় নবায়নের দিকে চালিত করবে বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। ধার্মিক সেক্যুলারিস্টদের– *মিথোস* ও *লোগোসের* প্রতিভূ–শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে না ভেবে নিষ্কৃতির সিন্থেসিসের দিকে চালিতকারী দুটি বিপরীতমুখী দর্শনের দ্বান্দ্বিক সংঘাতের হেগেলিয় দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। সেক্যুলারিস্টরা ধার্মিকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত কিন্তু এই বিদ্রোহে যায়নবাদীরা ইতিহাসকে এক নতুন পরিপূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গোটা সৃষ্টি, প্রায়শঃ বেদনাদায়কভাবে, ঈশ্বরের সাথে চূড়ান্ত মিলনের লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। যে কেউ প্রথাগত ধারণাকে ধ্বংস করেছে বলে মনে হলেও এক নতুন উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া আধুনিক বিজ্ঞানের বর্ণিত বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বা কোপার্নিকাস, ডারউইন বা আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য করতে পারে বলে বিশ্বাস করতেন কুক। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেদনাকেও লুরিয় পরিভাষায় শেষ পর্যন্ত আমাদের জগতে পবিত্রকে পুনঃস্থাপিতকারী 'ব্রেকিং অভ দ্য ভেসেলস', সৃজনশীল প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে।[৬৬] ধার্মিক ইহুদিদের এভাবেই যায়নবাদী বিদ্রোহকে বিবেচনা করা উচিত। 'এমন কিছু সময় আসে যখন তোরাহর বিধিবিধানকে অবশ্যই লঙ্ঘন করতে যেতে হয়,' ঔদ্ধত্যের সাথে যুক্তি দিয়েছেন কুক। মানুষ যখন ভিন্ন পথের সন্ধান করছে, যখন সমস্ত কিছুই নতুন ও নজীরবিহীন, তখন 'বৈধ পথ দেখিয়ে দেওয়ার নেই কেউ, তখন লক্ষ্য অর্জিত হয় সব সীমা ছিন্ন করার ভেতর দিয়ে।' এটা 'বাহ্যিকভাবে শোকাবহ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আনন্দের একটা উৎস!'[৬৭]

কুক সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যাননি। ধার্মিক ও সেক্যুলার ইহুদিদের ভেতর 'একটা বিরাট যুদ্ধ চলছে।' দুটো শিবিরই তাদের দিক থেকে সত্যি: যায়নবাদীরা

AMARBOI.COM

অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গতভাবেই লড়াই করছে, আবার অর্থডক্সরা বোধগম্যভাবেই ঐতিহ্যের অসময়োচিত বিসর্জনের ফলে দেখা দেওয়া বিশৃঙ্খলা এড়াতে উদগ্রীব। কিন্তু দুই পক্ষই আংশিক সত্য ধারণ করেছে।[৬৮] এদের মধ্যকার বিরোধ এক অসাধারণ সংশ্লেষের দিকে চালিত করবে যাতে কেবল ইহুদিরাই নয়, বরং সারা বিশ্বের সকল মানুষ উপকৃত হবে। 'বিশ্বের সকল সভ্যতা আমাদের আত্মার পুনর্জাগরণের ভেতর দিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে,' ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি; 'সকল ধর্মই নতুন ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করবে, নোংরা, ঘৃণ্য ও অপরিচ্ছন্ন সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'[৬৯] মেসিয়ানিক স্বপ্ন ছিল এটা। কুক সত্যিই বিশ্বাস করতেন, তিনি শেষ যুগে বাস করছেন, অচিরেই মানব ইতিহাসের চূড়ান্ত সম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করবেন।

কাব্বালাহর সময়হীন প্রতীকের সাথে তাঁর যুগের অসাধারণ বিকাশকে সমন্বিত করার মাধ্যমে এক নতুন মিথ গড়ে তুলছিলেন কুক। কিন্তু আধুনিক কালের মানুষ হিসাবে এই মিথকে ভবিষ্যতের দিকে চালিত করেছেন: এখানে ইতিহাসকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলা বেদনাদায়ক ও উত্তাল গতিময়তা দেখানো হয়েছে। ইহুদি পাঠকদের পরিস্থিতির স্থিতাবস্থা ও যেমন হওয়ার কথা তাকেই মিনে নিতে সম্মত করার বদলে কুক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অতীতের সমস্ত পবিত্র আইন উপেক্ষা করে নতুন করে শুরু করা প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক চাপ সত্ত্বেও কুকের মিথ তারপরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে প্রাক আধুনিক বিশ্বের অংশ। তাঁর দুটি শিবিরের দৃষ্টিভঙ্গি, ধার্মিক ও সেক্যুলার যায়নবাদী, *মিথোস* ও *লোগোসের* প্রাচীন ধারণার খুবই কাছাকাছি, শ্রমের সমান বিভাজন তুলে ধরে। যুক্তিবাদী বাস্তববাদীরাই ইতিহাসকে সামনের দিকে ঠেনে নিয়ে যাচ্ছে, *লোগোস* সব সময়ই যেমন করে থাকে, অন্যদিকে ধার্মিক *মিথোস* ও কাল্টের প্রাচীন বিশ্বে প্রতিনিধিত্বকারীরা এই কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দেয়। 'আমরা *তেফেলিন* [ফিল্যাক্ট্রিজ] সাজাই,' অর্থডক্স বুলি উচ্চারণ করতে পছন্দ করতেন কুক। 'আর অগ্রগামীরা ইঁট সাজায়।'[৭০] মিথ ছাড়া যায়নবাদীদের কর্মকাণ্ড কেবল অর্থহীনই নয়, বরং দারুণভাবে দানবীয় প্রকৃতির। যায়নবাদীরা সেটা না বুঝতে পারে, বিশ্বাস করতেন কুক, 'কিন্তু তারা ঈশ্বরেরই হাতের পুতুল, স্বর্গীয় নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্য করছে। কেবল এভাবেই তাদের ধর্মীয় বিদ্রোহকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যেতে পারে; অচিরেই–তাঁর জীবদ্দশাতেই এমনটা ঘটার ইঙ্গিতও দিয়েছেন কুক–পবিত্র ভূমিতে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটবে, ইতিহাসের নিষ্কৃতি ঘটবে।

রক্ষণশীল যুগের শৃঙ্খলার প্রতি নিবেদিত কুক চাননি তাঁর মিথ কোনও আদর্শ বা কর্মকাণ্ডের নীলনকশায় রূপান্তরিত হোক। সে যাই হোক, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা

ছিল খুবই কম, জীবদ্দশায় তাঁকে অনেকটা উন্মাদ ঠাওড়ানো হয়েছিল। কুক প্যালেস্তাইনে যায়নবাদীদের কর্মকাণ্ডের চলমান সমস্যাগুলোর কোনও রাজনৈতিক সমাধান দেননি। ঈশ্বরের কাছে সবকিছু তৈরি রয়েছে। ভবিষ্যতের ইহুদি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ধরন সম্পর্কে কুক যেন নিদারুণভাবে নিস্পৃহ ছিলেন। 'আমার দিক থেকে বলতে পারি, আমি পবিত্রতায় প্রোথিত আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু নিয়েই বেশি ভাবিত,' ছেলে য্ভি ইয়েহুদাকে (১৮৯১-১৯৮১) লিখেছিলেন তিনি। 'আমার কাছে এটুকু পরিষ্কার, সরকারী পর্যায়ের পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আত্মা শক্তিশালী হলে তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে, কারণ মুক্ত, উজ্জ্বল পবিত্রতার মহান প্রকাশের ভেতর দিয়ে আমরা সরকারের চলার পথকে আলোকিত করে তুলতে পারব।'[৭১] বর্তমান নিষ্কৃতিহীন যুগে রাজনীতি দুর্নীতিগ্রস্ত, নিষ্ঠুর। 'অশুভ কালের শাসনের ভয়ঙ্কর বৈষম্য' দেখে বিতৃষ্ণ ছিলেন কুক। সৌভাগ্যক্রমে ৭০ সিইতে পবিত্র ভূমি হারিয়ে নির্বাসনে যাবার পর ইহুদিরা আর রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি; পৃথিবী নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত ইহুদিদের উচিত রাজনীতির বাইরে থাকা। 'যতক্ষণ রক্তপাতের ঘটনা ঘটছে, যতক্ষণ এখানে দুষ্টবুদ্ধির প্রয়োজন থাকছে, জ্যাকোবের সরকারে সংশ্লিষ্ট হওয়া চলবে না।' তবে অচিরেই 'বিশ্ব পরিশুদ্ধ হবে,'[৭২] এবং সেটা যখন ঘটবে, ইহুদিরা তাদের ইচ্ছামতো রাজনীতি ও বাস্তবসম্মত নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে পারবে। 'ঈশ্বরের সকল জাতি যখন কোনও নিশ্চিত উপায়ে তাদের দেশে থিতু হবে, তখন একে খাঁদ মুক্ত করতে, এর মুখ থেকে রক্ত মুছে ফেলতে জন্যে ও দাঁতের ফাঁক থেকে সকল আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্যে [ভূ]রাজনৈতিক বলয়ে নজর দিতে পারবে তারা।'[৭৩] প্রাক আধুনিক বিশ্বে মিথের বাস্তবক্ষেত্রে অনূদিত হওয়ার কথা ছিল না, সেটা ছিল *লোগোসের* কাজ-কুকের প্রকল্পে-অগ্রগামীদের।

কুকের এখনও ধারণা বর্তমান কালে রাজনীতি ও ধর্ম পরস্পর মানানসই নয়, অর্থডক্স বিশ্বে এই বিশ্বাস টাবুর শক্তি ধারণ করেছিল। ধর্মকে পরিত্যাগকারী যায়নবাদীরা সমস্ত বাস্তব কাজ করছিল।

ইসরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার তের বছর আগে, ১৯৩৫ সালে মারা যান কুক। আরব প্যালেস্তাইনে নিজেদের একটা রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্যে ইহুদিরা কী ভয়ঙ্কর কলাকৌশলের ভেতর দিয়ে যাবার অনুভূতি বোধ করেছে সেটা দেখার জন্যে বেঁচে ছিলেন না। তিনি কোনওদিনই ১৯৪৮ সালে স্বদেশভূমি থেকে ৭৫০,০০০ প্যালেস্তাইনের উৎখাত প্রত্যক্ষ করেননি, আরব ইসরায়েল যুদ্ধে আরব ও ইহুদিদের রক্ত ঝরতেও দেখেননি। তাঁকে ইসরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টির পঞ্চাশ বছর পরে পবিত্র ভূমির অধিকাংশ ইহুদি এখনও সেক্যুলারিস্ট রয়ে যাওয়ার বাস্তবতাও প্রত্যক্ষ করতে

AMARBOI.COM

হয়নি। তাঁর ছেলে যৃভি ইয়েহুদা এইসব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবেন, এবং বুড়ো বয়সে বাবার *মিথোস*কে বাস্তব, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত করে মৌলবাদী আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

কিন্তু এই ভীষণ সময়ে ইহুদিদের পক্ষে রাজনৈতিক জীবন বজায় রাখা কি সম্ভব ছিল? আধুনিক সমাজ কেবল ক্রমবর্ধমান হারে অ্যান্টি-সেমিটিক হয়ে উঠছিল না, বরং সেক্যুলারিজম ইহুদি সমাজের অভ্যন্তরে ভীষণভাবে ঢুকে পড়ছিল, প্রচলিত জীবনধারাকে করে তুলছিল অচল। পূর্ব ইউরোপে আধুনিকায়ন সূচিত হচ্ছিল মাত্র। রাশিয়া ও পোল্যান্ডের কিছু সংখ্যক র‍্যাবাই নতুন বিশ্বের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে নিজেদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। কেমন করে ইহুদি পদবাচ্য কেউ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের অবিশ্যিক অংশ দরকষাকষি ও আপোসে অংশ নিতে পারে? জেন্টাইলদের সাথে চুক্তি করে ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দিয়ে ইহুদিরা সম্প্রদায়ে অপবিত্র বিশ্বকে ডেকে আনবে; অনিবার্যভাবে একে তা দূষিত করবে। কিন্তু মহান মিসনাগদিক *ইয়েশিভোত* ও পোলিশ শহর গারের হাসিদিম দ্বিমত পোষণ করে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে বিভিন্ন যায়নাবদী দল ও ইহুদি সমাজতান্ত্রিক দল ইহুদিদের এক ঈশ্বরবিহীন জীবনে প্রলুব্ধ করে চলেছে। সেক্যুলারিজমের দিকে এই স্রোত ও মিশেল রুদ্ধ করতে চেয়েছিল তারা। তারা বিশ্বাস করত এইসব আবিশ্যিকভাবে বিপজ্জনক আধুনিক বিপদগুলোকে তাদের কায়দাতেই আধুনিক উপায়ে মোকাবিলা করতে হবে। ধার্মিক ইহুদিদের অবশ্যই সেক্যুলারিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র দিয়েই লড়তে হবে। এর মানে ছিল অর্থডক্স স্বার্থ রক্ষার জন্যে একটা আধুনিক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা। তারা যুক্তি দেখাল, এটা মোটেই আনকোরা কোনও ধারণা নয়। কিছু সময়ের জন্যে রাশিয়া ও পোল্যান্ডের ইহুদিরা ইহুদি সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণের জন্যে সরকারের সাথে *শ্তাদলানাত* (রাজনৈতি সংলাপ বা আলোচনা)-এ যোগ দিয়েছিল। নতুন অর্থডক্সি পার্টি এই কাজটিই অব্যাহত রাখবে, তবে আরও দক্ষ ও সংগঠিতভাবে।

১৯১২ সালে মিসনাগদিক *রোশি ইয়েশিভোত* ও গার হাসিদিম একটা নতুন দল আগুদাত ইসরায়েল ('দ্য ইউনিয়ন অভ ইসরায়েল') প্রতিষ্ঠা করে। ১৯০১ সালে র‍্যাবাই ইসাক জ্যাকব রেইনস (১৮৩৯–১৯১৫) প্রতিষ্ঠিত 'ধার্মিক যায়নবাদীদের' সংগঠন মিযরাচির সদস্যরা এতে যোগ দেয়। মিযরাচি প্যালেস্তাইনে সেক্যুলার যায়নাবাদী উদ্যোগকে গভীরভাবে ধর্মীয় বিকাশ বিবেচনাকারী র‍্যাবাই কুকের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও কম রেডিক্যাল ছিল। আরও

কঠোর অর্থডক্স রেইনস একমত পোষণ করেননি: যায়নবাদীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ধর্মীয় কোনও তাৎপর্য জড়িত নেই, তবে ইহুদি স্বদেশ ভূমির সৃষ্টি নির্যাতিত মানুষের পক্ষে বাস্তব সম্মত সমাধান, সেকারণে অর্থডক্সদের সমর্থনের দাবিদার। প্যালেস্তাইনে এক সময় একটা দেশ প্রতিষ্ঠিত হলে, মিরযাচির দৃষ্টিতে তা হয়তো আধ্যাত্মিক নবায়নের দিকে চালিত করবে ও সেখানে তোরাহর আন্তরিক অনুসরণ ঘটাবে। ১৯১১ সালে অবশ্য প্যালেস্তাইনে ধর্মীয় স্কুল পরিচালনার জন্যে কংগ্রেস সমপরিমাণ তহবিল বরাদ্দ দিতে ব্যর্থ হলে মিযরাচির প্রতিনিধিরা বাসেলে অনুষ্ঠিত দশম যায়নিস্ট কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসেন। রেডিক্যাল সেক্যুলারিজমের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ মনে হওয়া মূলধারার যায়নবাদের সাথে সহযোগিতা করতে না পারায় অচিরেই পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে শাখা বিস্তারকারী আগুদাত ইসরায়েলের সাথে গাটছড়া বাঁধতে তৈরি ছিল তারা।

কিন্তু পশ্চিমের আগুদাতের সদস্যরা আন্দোলনকে রাশিয়ান ও পোলিশ ইহুদিদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখেছিল, প্রত্যক্ষ কর্মতৎপরতার ব্যাপারে তখনও খুবই সতর্ক বোধ লালন করছিল তারা।[৭৪] রাশিয়া ও পোল্যান্ডের ইহুদিরা আগুদাতকে স্রেফ একটা আত্মরক্ষামূলক সংগঠন হিসাবে দেখেছে; এর কাজ স্রেফ পূর্ব ইউরোপের সরকারের আধুনিকায়নের প্রয়াস পাওয়ার এমনি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষা করা। কর্মকাণ্ডকে একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখে তারা, আধুনিক রাজনৈতিক কাঠামোয় ইহুদিদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে, যায়নাবাদকে পরিহার করে ও পোলিশ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রচার করে। কিন্তু পশ্চিমে, আধুনিকায়ন যেখানে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল, ভিন্ন কিছুর জন্যে তৈরি ছিল ইহুদিরা। পশ্চিমের বেশির ভাগ আগুদাত সদস্য ছিল নিও-অর্থডক্স, এটা নিজেই ছিল ইহুদিবাদের আধুনিকায়িত ধরন। আধুনিক বিশ্বের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তারা, তারা কেবল এই নতুনের ধাক্কা সামাল দিতে চাওয়ার বদলে বরং একে বদলে দিতে চেয়েছে। দলকে একটি আত্মরক্ষামূলক সংগঠন হিসাবে না দেখে কেউ কেউ চেয়েছে আগুদাত আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করুক, এক প্রাথমিক মৌলবাদের বিকাশ ঘটাচ্ছিল তারা।

জ্যাকব রোসেনহেইমের (১৮৭০–১৯৬৫) চোখে আগুদাতের প্রতিষ্ঠা পুবের ইহুদিদের মতো কেবল কিছুটা অনুশোচনাযোগ্য প্রয়োজনীয়তা ছিল না, বরং এক মহাজাগতিক ঘটনা। ৭০ সিই-র পর এই প্রথমবারের মতো ইহুদিরা 'একটা ঐক্যবদ্ধ ও ইচ্ছা-নির্ধারক কেন্দ্র'[৭৫] লাভ করেছে। আগুদাত ইসরায়েলের উপর ঈশ্বরের শাসনকে প্রতীকায়িত করে, এর ইহুদি বিশ্বের কেন্দ্রে পরিণত হওয়া

AMARBOI.COM

উচিত। তা সত্ত্বেও রাজনীতির ব্যাপারে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন রোসেনহেইম, তিনি চেয়েছিলেন আগুদাত ইহুদিদের স্কুল রক্ষণাবেক্ষণ ও ইহুদিদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার কাজে নিজেকে সীমিত রাখুক। তরুণ সদস্যরা ছিল আরও রেডিক্যাল, প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীদের অনেক কাছাকাছি ছিল তাদের চেতনা। ইসাক ব্রুয়ার (১৮৮৩–১৯৪৬) চেয়েছিলেন ইহুদি সমাজের সংস্কার ও সেক্যুলারাইজেশনের লক্ষ্যে আগুদাত উদ্যোগ নিয়ে প্রচারণায় নামুক। প্রিমিলেনিয়লিস্টদের মতো বিশ্বে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের 'নিদর্শন' দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। মহাযুদ্ধ ও বেলফোর ঘোষণা 'মেসায়াহর পদক্ষেপ' ছিল। ইহুদিদের অবশ্যই বুর্জোয়া সমাজের দূষিত মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, ইউরোপের সরকারগুলোর সাথে আর সহযোগিতা করা যাবে না, পবিত্র ভূমিতে তাদের নিজস্ব পবিত্র ছিটমহল গড়ে তুলতে হবে, যেখানে তারা তোরাহ ভিত্তিক ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারবে। ইহুদি ইতিহাস ওলটপালট হয়ে গেছে। পবিত্র ঐতিহ্য থেকে ইহুদিরা বিচ্যুত হয়েছে। এখন সময় এসেছে ইতিহাসকে ফের আগের পথে ফিরিয়ে নেওয়ার; ইহুদিরা প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে দুর্নীতিগ্রস্ত ডায়াসপোরা থেকে নির্বাসনে গেলে ও নিজস্ব ভূমিতে তোরাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করে আদি মূল্যবোধে ফিরে গেলে ঈশ্বর মেসায়াহকে প্রেরণ করবেন।[৭৬]

ইহুদি পণ্ডিত অ্যালান এল. মিটেলম্যান উল্লেখ করেছেন যে, আগুদাতের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা মৌলবাদের কাঠামোর ধারা তুলে ধরে। এটা আধুনিক সেক্যুলার সমাজের প্রতি কোনও অবিলম্ব প্রবল ধরনের প্রতিক্রিয়া নয়, বরং আধুনিকায়ন বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরেই এর বিকাশ ঘটে। প্রথম প্রথম ঐতিহ্যবাদীরা–আগুদাতের পূর্ব ইউরোপিয় সদস্যদের মতো–স্রেফ নতুন চ্যালেঞ্জের সাথে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। তারা কিছু কিছু আধুনিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করে, প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে এসব ট্র্যাডিশনের পক্ষে নতুন নয়, ধর্মবিশ্বাস এইসব পরিবর্তন আত্মস্থ করে নেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি রাখে। কিন্তু সমাজ যখন আরও অধিকতরভাবে সেক্যুলার ও যৌক্তিক হয়ে ওঠে, কেউ কেউ তখন এর উদ্ভাবনসমূহকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে। তারা বুঝতে শুরু করে সেক্যুলার আধুনিকতার সম্পূর্ণ ধাক্কা রক্ষণশীল প্রাক আধুনিক ধর্মের ছন্দের সম্পূর্ণ বিপরীত, এটা অত্যাবশ্যক মূল্যবোধকে হুমকি দিচ্ছে। তখন তারা 'মৌলবাদী' সমাধান খুঁজে বের করে যা প্রথম নীতিমালায় ফিরে যায় এবং পাল্টা হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৭৭]

আমাদের বিবেচনাধীন মুসলিমরা তখনও এই পর্যায়ে পৌছেনি। মিশরে আধুনিকায়ন শেষ হতে তখনও ঢের বাকি ছিল, আর ইরানে সেভাবে শুরুই হয়নি। মুসলিমরা তখনও হয় ইসলামি পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ধ্যানধারণাকে আত্মস্থ করার প্রয়াস পাচ্ছিল বা সেক্যুলারিস্ট আদর্শ গ্রহণ করছিল। এইসব প্রাথমিক কলাকৌশল কোনও কোনও মুসলিমের চোখে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বে মৌলবাদের আবির্ভাব ঘটবে না। তারা সেক্যুলারিজমকে ইসলাম ধ্বংসের একটি প্রয়াস মনে করবে এবং প্রকৃতপক্ষে বিদেশী প্রেক্ষাপটেই মধ্যপ্রাচ্যে বাস্তবায়িত হতে চলা পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে প্রায়শঃই সত্যিকার অর্থেই আক্রমণাত্মক মনে হয়েছে।

নব্য সেক্যুলার রাষ্ট্র তুরস্কে এটা একেবারেই স্পষ্ট ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির পক্ষে যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপিয় মিত্রপক্ষের কাছে পরাস্ত হয়, সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করে প্রাচীন অটোমান প্রদেশগুলোয় ম্যান্ডেট ও প্রটেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করে তারা। আনাতোলিয়া ও প্রাচীন অটোমান প্রাণকেন্দ্রে আগ্রাসন চালায় গ্রিকরা। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১–১৯৩৮) স্বাধীনতার লড়াইতে তুর্কি জাতীয়তাবাদী শক্তির নেতৃত্ব দেন। তিনি ইউরোপিয়দের তুরস্ক থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হন এবং আধুনিক ইউরোপিয় কায়দায় পরিচালিত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামি বিশ্বে নজীর বিহীন পদক্ষেপ ছিল এটা। ১৯৪৭ সাল নাগাদ তুরস্ক একটি দক্ষ আমলাতন্ত্র ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির অধিকার লাভ করে, পরিণত হয় মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। কিন্তু এই সাফল্য শুরুই হয়েছিল এক জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের সাথে। ১৮৯৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯২৭ সালের ভেতর অটোমান ও তুর্কি সরকারের ধারাগুলো পদ্ধতিগতভাবে বিদেশী উপাদানের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে আনাতোলিয়ার গ্রিক ও আর্মেনিয়দের বহিষ্কার, দেশান্তর বা হত্যা করে, এরা ছিল বুর্জোয়া সমাজের শতকরা ৯০ ভাগ। এই শুদ্ধিকরণ নতুন রাষ্ট্রকে কেবল স্পষ্ট তুর্কি জাতীয় পরিচয়ই দেয়নি, বরং আতাতুর্ককে সম্পূর্ণ তুর্কি বাণিজ্যিক শ্রেণী নির্মাণের সুযোগ করে দিয়েছে যা তাঁকে আধুনিক শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।[৭৮] অন্ততপক্ষে এক মিলিয়ন আর্মেনিয়র হত্যাকাণ্ড ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম গণহত্যা, এবং র্যাবাই কুকের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ ক্রুসেড ও

AMARBOI.COM

ধর্মের নামে পরিচালিত শুদ্ধি অভিযানের মতোই সমান ভয়ঙ্কর ও নিশ্চিতভাবেই বিপজ্জনক হতে পারে।

আতাতুর্কের তুরস্কের সেক্যুলারাইজেশন আগ্রাসীও ছিল। ইসলামকে 'পাশ্চাত্যকৃত' করে একে আইনি, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাবহীন ব্যক্তিগত বিশ্বাসে পরিণত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি। ধর্মকে অবশ্যই রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে হবে। বিভিন্ন সুফি ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়; সকল *মাদ্রাসা* ও কোরান স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়; আইন করে পাশ্চাত্য পোশাক চালু করা হয়; নারীদের বোরখা পরা ও পুরুষদের ফেয মাথায় দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। নকশবন্দি সুফি ব্যবস্থার নেতা শায়খ সাইদ সুরসি বিদ্রোহের নিতৃত্ব দিলে ইসলাম আত্মরক্ষার শেষ প্রয়াস পেয়েছিল, কিন্তু দ্রুত ও দক্ষতার সাথে আতাতুর্ক মাত্র দুই মাসে তা দমন করেন। পশ্চিমে সেক্যুলারাইজেশন মুক্তিদায়ী হিসাবে অনুভূত হয়েছিল; প্রাথমিক পর্যায়ে একে এমনকি ধার্মিক হওয়ার নতুন ও ভালো উপায় মনে করা হয়েছে। সেক্যুলারিজম ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃহত্তর সহিষ্ণুতার দিকে নিয়ে যাওয়া ইতিবাচক পরিবর্তন। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে সেক্যুলারাইজেশন ছিল সহিংস ও নিপীড়নমূলক আক্রমণ। পরবর্তীকালের মুসলিম মৌলবাদীরা সেক্যুলারিজম ইসলামের বিনাশ ছিল দাবি করতে গিয়ে প্রায়শঃই আতাতুর্কের নজীর তুলে ধরবে।

মিশর তুরস্কের মতো দ্রুত স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের কোনওটাই পায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিশরিয় জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল; ইংরেজদের উপর আক্রমণ চালানো হয়, রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়, টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলা হয়। ১৯২২ সালে ব্রিটেন মিশরকে কিছুমাত্রায় স্বাধীনতা দেয়। খেদিভ ফুয়াদ পরিণত হন নতুন রাজায়; মিশরকে একটি আদর্শ সংবিধান ও একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংসদীয় সংগঠন দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যিকারের গণতন্ত্র ছিল না এটা। ব্রিটেন প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিয়েছিল, ফলে সত্যিকারের স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে জনপ্রিয় ওয়াফদ পার্টি উদার সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনটি বড় আকারের বিজয় লাভ করে, কিন্তু ব্রিটিশ বা রাজার তরফ থেকে চাপের কারণে প্রতিবারই পদত্যাগে বাধ্য হয়।[৭৯] নতুন গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলো ছিল স্রেফ প্রসাধন, এই স্বাধীনতা আধুনিক চেতনার পক্ষে আবশ্যক স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার বেলায় মিশরিয়দের কোনও কাজে আসত না। তাছাড়া, ব্রিটিশরা যতই নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে ছলচাতুরি খেলছিল ততই গণতান্ত্রিক আদর্শ দূষিত মনে হতে শুরু করেছিল।

তাসত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে নেতৃস্থানীয় মিশরিয় চিন্তাবিদগণ যেন সেক্যুলার আদর্শের দিকেই ঝুঁকে ছিলেন বলে মনে হয়েছে। আব্দুহ'র অন্যতম শিষ্য লুফতি আল-সায়ীদের (১৮৭২–১৯৬৩) রচনাবলীতে ইসলাম খুবই সামান্য ভূমিকা রেখেছে। জাতীয়তাবাদের আদর্শই পাশ্চাত্যের সাফল্যের গোপন সূত্র থাকার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, ইসলামি ভিত্তিতে আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রোপন করা জরুরি মনে করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে লুফতির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ প্রায়োগিক। ধর্ম অবশ্যই আধুনিক জাতীয় ঐকমত্য গড়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, কিন্তু এটা অন্যান্য উপাদানের একটি মাত্র। ইসলামের বিশেষ বা ভিন্ন কিছু দেওয়ার নেই। অধিকাংশ মিশরিয় মুসলিম বলেই এটা মিশরের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হয়েছে; এটা তাদের নাগরিক গুণাবলী চর্চায় সাহায্য করবে, কিন্তু ভিন্ন সমাজে অন্য কোনও ধর্মবিশ্বাস ঠিক একাজই করবে।[৮০] আলি আব্দ আল-রাযিকের (১৮৮৮–১৯৬৬) *আল-ইসলাম ওয়া উসুল আল-হুকুম* ('ইসলাম অ্যান্ড দ্য বেসেস অভ পাওয়ার', ১৯২৫) বইটি ছিল আরও রেডিক্যাল, এখানে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, ইসলামের সাথে মিশরের সম্পর্ক চ্যুতি ঘটানো উচিত। তিনি যুক্তি তুলে ধরেন যে, খেলাফতের প্রতিষ্ঠানসমূহ কোরানে উল্লেখিত হয়নি আর পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্রপ্রধান বা সারকার প্রধান ছিলেন না, সুতরাং সম্পূর্ণ সেক্যুলারিস্ট মিশরিয় ধরনের রাজনীতি প্রতিষ্ঠার বেলায় মিশরিয়দের ঠেকানোর মতো কোনও কারণ নেই।[৮১]

আল-রাযিকের বইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বিশেষ করে সাংবাদিক রশিদ রিদাহ (১৮৬৫–১৯৩৫) ঘোষণা করেছিলেন যে, এই ধরনের চিন্তাভাবনা কেবল মুসলিম জাতির ঐক্যই দুর্বল করবে না বরং তাদের আরও সহজে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত করবে। সেক্যুলার পথ বেছে নেওয়ার বদলে রিদাহই প্রথম শরীয়াহ্ ভিত্তিক সম্পূর্ণ আধুনিকায়িত ইসলামি রাষ্ট্রের কথা উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা *আল-খালিফা* (১৯২২–২৩)-য় খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন তিনি। রিদাহ ছিলেন আব্দুহর জীবনীকার ও বিশাল ভক্ত, কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবনা সম্পর্কে ব্যাপক ওয়াকিবহাল হলেও তিনি কখনওই আব্দুহর মতো ইউরোপিয়দের সাথে স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি। খেলাফত প্রয়োজন, কারণ তা মুসলিমদের কার্যকরভাবে পশ্চিমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করবে, কিন্তু এটা দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়। একটা সত্যিকারের আধুনিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার আগে প্রস্তুতির দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হবে। রিদাহ ভবিষ্যৎ খলিফাকে একজন মহান *মুজতাহিদ* হিসাবে কল্পনা করেছেন, যিনি ইসলামি আইনে এতটাই বিশেষজ্ঞ হবেন যে, শরীয়াহকে শিথিল না করেই একে

AMARBOI.COM

আধুনিক করতে সক্ষম হবেন। এভাবে তিনি মুসলিমদের সত্যিকার অর্থে পালন করার মতো আইন-কানুন সৃষ্টি করতে পারবেন, কারণ সেগুলো সত্যিকার অর্থেই বিদেশ থেকে আমদানি করার বদলে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ভিত্তিক হবে।[৮২]

রিদাহ ছিলেন ইবন তাঈমিয়াহ ও আব্দ আল-ওয়াহাবের ধারার টিপিক্যাল মুসলিম সংস্কারক। *আদ ফন্তেসে* প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে বিদেশী হুমকির মোকাবিলা করতে চেয়েছেন তিনি।[৮৩] কেবল *সালাফের*-প্রথম প্রজন্মের মুসলিম-আদর্শে প্রত্যাবর্তনের ভেতর দিয়েই আধুনিক মুসলিমরা নতুন ও সজীব ইসলাম তৈরি করতে পারবে। কিন্তু রিদাহর *সালাফিয়াহ* আন্দোলন অতীতে দাসত্বমূলক প্রত্যাবর্তন ছিল না। আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের অন্যান্য সংস্কারকের মতো ইসলামি প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার মাধ্যমে আধুনিক পশ্চিমের শিক্ষা ও মূল্যবোধসমূহকে আত্মস্থ করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন তিনি। তিনি একটি সেমিনারি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে ছাত্ররা আন্তর্জাতিক আইন, সমাজবিজ্ঞান, বিশ্ব-ইতিহাস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে পারবে; আবার একই সময়ে ইসলামি জুরিসপ্রুডেন্স নিয়েও গবেষণা করতে পারবে। এভাবে এক নতুন শ্রেণীর *উলেমার* বিকাশ ঘটবে, যারা হবে আযহারের পণ্ডিতদের বিপরীতে (রিদাহ তাদের হতাশাব্যঞ্জকভাবে পশ্চাদবর্তী মনে করতেন) সত্যিকারের সময়ের মানুষ, ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত উদ্ভাবনী *ইজতিহাদের* চর্চা করতে পারবে। একদিন এই নতুন *উলেমার* একজন হয়তো খলিফায় পরিণত হবেন।[৮৪] রিদাহ মোটেই মৌলবাদী ছিলেন না; পাল্টা ডিসকোর্স সৃষ্টির বদলে ইসলাম ও আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতির বন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর রচনা ভবিষ্যতের মৌলবাদীদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। জীবনের শেষ দিকে রিদাহ ক্রমবর্ধমানহারে মিশরিয় জাতীয়তাবাদীদের কাছ থেকে সরে যান। সেক্যুলারিজমকে সমাধান মনে করেননি তিনি। আতাতুর্কের নিষ্ঠুরতায় ভীত বোধ করেছেন। রাষ্ট্র চরম মূল্যে পরিণত হলে এবং একজন শাসককে জাতীর স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক অথচ নিষ্ঠুর নীতি গ্রহণে বাধা দেওয়ার মতো কিছু না থাকলে এমনটাই কি ঘটে? রিদাহ বিশ্বাস করতেন, মধ্যপ্রাচ্যে-ক্রিশ্চান পাশ্চাত্যে যদি নাও হয়-ধর্মের অবনতির কারণেই নির্যাতন ও অসহিষ্ণুতার ঘটনা ঘটছে।[৮৫] অনেক নেতৃস্থানীয় মিশরিয় চিন্তাবিদ যখন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন সেই সময়ে রিদাহ বিশ্বাস করেছিলেন যে, আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আগের চেয়ে বেশি না হলেও সমান পরিমাণ ধর্মীয় বাধা থাকা প্রয়োজন।

মিশরের জনগণ যদি জাতীয়তাবাদই ইউরোপের সাফল্যের গোপন সূত্র বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে থাকে, ইরানিরা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোয়

AMARBOI.COM

বিশ্বাস করেছে যে, 'সাংবিধানিক' সরকারই ছিল এই গোপন সূত্র। এই পর্যায়ে বহু মিশরিয়র মতো ইরানিরা পশ্চিমের মতো হতে চেয়েছে। ১৯০৪ সালে সম্প্রতি সাংবিধানিক সরকার বেছে নেওয়া জাপান রাশিয়ার উপর শোচনীয় পরাজয় চাপিয়ে দিয়েছিল। বহুদিন ধরেই জাপান ছিল ইরানের মতোই অজ্ঞ ও পশ্চাদপদ, সংস্কারকগণ যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু এখন সংবিধানের কল্যাণে তারা ইউরোপিয়দের মতো একই স্তরে উঠে এসেছে, এবং তাদের নিজস্ব খেলায় হারাতে পারছে। এমনকি কোনও কোনও *উলেমা* শাহদের স্বেচ্ছাচারী শাসন রুদ্ধ করার জন্যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। উদার *মুজতাহিদ* সায়ীদ মুহাম্মদ তাবাতাবাদি যেমন ব্যাখ্যা করেছেন:

> আমরা নিজেদের সাংবিধানিক শাসন দেখিনি। কিন্তু আমরা এর কথা শুনেছি, সাংবিধানিক সরকার প্রত্যক্ষকারীরা আমাদের বলেছেন যে, সাংবিধানিক শাসন দেশে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। এটা আমাদের মাঝে এক ধরনের তাগিদ ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।[৮৬]

আত্মরক্ষামুলকভাবে *মাদ্রাসার* জগতে পিছু হটা মিশরিয় *উলেমাদের* বিপরীতে ইরানি *উলেমাগণ* প্রায়শঃই পরিবর্তনের পুরোধা ছিলেন, আসন্ন ঘটনাপ্রবাহে চূড়ান্ত ভুমিকা পালন করবেন তাঁরা।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তেহরানের গভর্নর সরকারী নির্দেশ মোতাবেক মূল্য হ্রাস না করায় কয়েকজন চিনি ব্যবসায়ীর পায়ে আঘাত হানার নির্দেশ দেন। উচ্চ আমদানি শুল্কই উচ্চ মূল্য রাখা প্রয়োজনীয় করে তোলার যুক্তি দেখিয়েছিল তারা। প্রধানমন্ত্রী আইন আল-দৌলাহ কর্তৃক উৎখাত হওয়ার আগ পর্যন্ত *উলেমা* ও *বাজারিদের* এক বিশাল দল তেহরানের রাজকীয় মসজিদে আশ্রয় নেন। সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মোল্লাহ তাবাতাবাদিকে অনুসরণ করে একটা প্রধান উপাসনালয়ে উপস্থিত হয়ে দাবি করেন যে, শাহকে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক 'হাউস অভ জাস্টিস' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শাহ সম্মত হন, *উলেমাগণ* আবার তেহরানে ফিরে যান, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি পূরণের কোনও রকম আভাস না দেওয়ায় দাঙ্গা বেধে যায়, সেখানে ও বিভিন্ন প্রদেশে দাঙ্গা বেধে যায় এবং জনপ্রিয় যাজকগণ মিম্বর থেকে সরকারের প্রচণ্ড নিন্দাবাদ উচ্চারণ করতে থাকেন, সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে তোলেন তাঁরা। অবশেষে ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে তেহরানের মোল্লাহরা কুমের উদ্দেশে গণঅভিযাত্রার আয়োজন করেন, অন্যদিকে প্রায় ১৪,০০০ বণিক ব্রিটিশ লিগেশনে আশ্রয় নেয়। বিক্ষোভকারীরা আইন আল-দৌলাহর বরখাস্ত

AMARBOI.COM

করণ ও একটি *মজলিসের* ('প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ') প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে থাকে, আরও বিজ্ঞ সংস্কারকগণ *মাশরুতেহ* ('সংবিধান') নিয়ে আলোচনা শুরু করেন।[৮৭]

সাংবিধানিক বিপ্লব প্রাথমিকভাবে সফল ছিল। প্রধানমন্ত্রীকে জুলাইয়ের শেষের দিকে বরখাস্ত করা হয়, এবং অক্টোবরে তেহরানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক *উলেমা* অন্তর্ভুক্তকারী প্রথম মজলিস উদ্বোধন করা হয়। এক বছর পরে নয়া শাহ মোহাম্মদ আলি বেলজিয়ান সংবিধানের আদলে প্রস্তুত ফান্ডামেন্টাল ল' স্বাক্ষর করেন। এর ফলে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজার মজলিসের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল: সকল নাগরিক (ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস লালনকারীসহ) আইনের চোখে সমান অধিকার ভোগ করেছে এবং সংবিধান ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করেছে। গোটা ইরান জুড়ে উদার কর্মকাণ্ডের একটা জোয়ার শুরু হয়েছিল। প্রথম মজলিস সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিয়েছিল, এবং অবিলম্বে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। নতুন বিভিন্ন সমাজ গড়ে ওঠে, একটি জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, একটা নতুন মিউনিপ্যাল কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। তাব্রিয়ের মেধাবী তরুণ ডেপুটি সায়ীদ হাসান তাকিযাদেহ মজলিসে বামপন্থী গণতান্ত্রিক দলের নেতৃত্ব দেন, অন্যদিকে *মুজতাহিদ* আয়াতোল্লাহ তাবাতাবাদি ও সায়ীদ আব্দুল্লাহ বেহবেহানি শরীয়াহর মর্যাদা রক্ষা করতে কিছু ধারা সংযোজনে সক্ষম হওয়া রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বে ছিলেন।

কিন্তু উদারপন্থী যাজকগোষ্ঠী ও সংস্কারকদের ভেতর এই সহযোগিতার প্রদর্শনী সত্ত্বেও প্রথম মজলিস এক গভীর বিভাজন তুলে ধরেছিল। সাধারণ ডেপুটিদের অনেকেই ছিলেন মালকুম খান বা কিরমানির সাথে সংশ্লিষ্ট ভিন্নমতাবলম্বী, এরা *উলেমাদের* প্রতি কেবল অসন্তোষই বোধ করতেন। তাঁদের প্রায়শঃই বিপ্লবী ধ্যানধারনার প্রচার চালাতে গঠিত *আনজুমান*-('গোপন গোষ্ঠী')-এর সদস্য হতে দেখা যেত, এমনকি অধিকতর রেডিক্যাল যাজকের সাথে এইসব দলের সম্পর্ক ছিল, সংস্কারকগণ সাধারণত *উলেমাদের* প্রগতির পথে বাধা হিসাবে বিবেচেনা করতেন। সংস্কারকদের সাথে যোগ দেওয়া *উলেমাগণ* শরীয়াহকে সংবিধানে রাষ্ট্রীয় বিধানে পরিণত করার প্রত্যাশা করে থাকলে হতাশ হয়েছিলেন তাঁরা। প্রথম মজলিস অবিলম্বে শিক্ষার মতো বিষয়ে যাজকগোষ্ঠীর ক্ষমতা হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে; পরিহাসের ব্যাপার, অসংখ্য মোল্লাহর সমর্থন লাভকারী সাংবিধানিক বিপ্লব দেশে তাঁদের ব্যাপক ক্ষমতার অবসানের সূচনা প্রত্যক্ষ করেছিল।[৮৮]

AMARBOI.COM

শিয়া *উলেমা* কখনওই এর আগে রাজনীতিতে এমন সক্রিয় ভূমিকা রাখেননি। কোনও কোনও পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, তারা প্রধানত নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা ও বিধর্মী পশ্চিমকে ঠেকানোর আশা নিয়েই বেশি অনুপ্রাণিত ছিলেন।[৮৯] অন্যরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, শাহগণের স্বৈরাচারী ক্ষমতা খর্ব করবে এমন একটি সংবিধানের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে অধিকতর উদার *উলেমা*গণ স্বৈরাচারের বিরোধিতা করার প্রাচীন শিয়া দায়িত্বই পালন করছিলেন।[৯০] সাধারণ সংস্কারকগণ *উলেমা*দের বিশাল ক্ষমতার কথা মনে রেখে বিপ্লবের সময় মুসলিম অনুভূতিতে আঘাত না দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, তবে যাজকদের প্রতি বহু আগে থেকেই বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন তাঁরা, তাই ক্ষমতা লাভ করামাত্র আইন ব্যবস্থা ও শিক্ষাকে সেক্যুলারাইজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই সেক্যুলারাইজেশনের বিপদ শনাক্তকারীদের অন্যতম প্রথম ছিলেন তেহরানের প্রধান তিন যাজকের একজন শায়খ ফদলুল্লাহ নুরি (১৮৪৩–১৯০৯)। ১৯০৭ সালে তিনি সংবিধানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করেন। তিনি যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে, গোপন ইমামের অনুপস্থিতিতে সরকারের বৈধতা না থাকায় নতুন সংসদ অনৈসলামিক। মজলিস নয়, *মুজতাহিদ*গণই ইমামের ডেপুটি, তাঁদেরই আইন প্রণয়ন ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা উচিত। এই নতুন ব্যবস্থার অধীনে অবশ্য যাজকরা স্রেফ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো হয়ে দাঁড়াবেন, তাঁরা আর জনগণের প্রধান আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক থাকবেন না, ধর্ম বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। নুরি দাবি জানালেন, মজলিস অন্ততপক্ষে শরীয়াহর উপর ভিত্তি করে আইন-কানুন প্রণয়ন করুক। তাঁর আপত্তির মুখে সংবিধানে সংশোধন আনা হয়: মজলিস কর্তৃক ইসলামি আইনের সাথে বিরোধিতাকারী আইনে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাসহ নির্বাচিত পাঁচজন *উলেমা*র একটি প্যানেল গঠন করা হয়।[৯১]

তাসত্ত্বেও নুরি সংখ্যালঘুর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। নাজাফের বেশিরভাগ *মুজতাহিদ* সংবিধান সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা সেটা অব্যাহত রাখবেন। তাঁরা গোপন ইমামের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ছাড়া আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ সম্ভব নয় দাবি করে শরীয়াহকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করার নুরির দাবির বিরোধিতা করেন। আরও একবার শিয়াহ অন্তর্দৃষ্টি রাষ্ট্রব্যবস্থার সেক্যুলারাইজেশনকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং এখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ধর্মের সাথে বেমানান বিবেচনা করেছে। বহু যাজক কাজারদের বিদেশীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য অর্থিক কনসেশন দিতে ও ব্যয়বহুল ঋণ গ্রহণে বাধ্য করা দরবারের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও সরকারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় বিতৃষ্ণ ছিলেন। তাঁরা লক্ষ করেছিলেন, এমনি অদূরদর্শী আচরণ মিশরকে সামরিক দখলদারির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

AMARBOI.COM

কাজারদের নির্যাতনমূলক নীতিমালাকে সংবিধানের মাধ্যমে সীমিত করা সম্ভব বলে মনে হয়েছিল।[৯২] শায়খ মুহাম্মদ হুসেইন নাইনি (১৮৫০–১৯৩৬)-এর *অ্যাডমোনিশন টু দ্য নেশন অ্যান্ড এক্সপোজিশন টু দ্য পিপল*-এ এই দৃষ্টিভঙ্গি জোরের সাথে প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালে নাজাফে এটি প্রকাশিত হয়। নাইনি যুক্তি দেখান যে, গোপন ইমামের পর প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারই সেরা উপায়; স্বৈরাচারী শাসককে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম সংসদ প্রতিষ্ঠা স্পষ্টতই শিয়াহদের উপযুক্ত কাজ। স্বৈরাচারী শাসক ইসলামের চরম পাপ বহুঈশ্বরবাদীতার *(শিরক)* অপরাধে অপরাধী, কারণ তিনি ঐশী ক্ষমতার প্রতি উদ্ধত আচরণ করেছেন এবং খোদ ঈশ্বরের মতো আচরণ করেছেন, যেন প্রজাকূলের অধিপতি। ফারাওর শক্তিকে ধ্বংস করার জন্যে পয়গম্বর মোজেসকে পাঠানো হয়েছিল। ফারাও জনগণের উপর নির্যাতন চালিয়েছেন, তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি করেছিলেন। মোজেস তাঁকে আল্লাহর আইন মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। একই ভাবে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের প্যানেলের সাহায্যে নতুন মজলিসকে শাহদের ঈশ্বরের আইন মানা নিশ্চিত করতে হবে।[৯৩]

তবে *উলেমাদের* তরফ থেকে নয় বরং নতুন সংবিধানের সবচেয়ে মারাত্মক বিরোধিতা এসেছিল নতুন শাহর কাছ থেকে, রাশিয়ান কস্যাক ব্রিগেডের সহায়তায় ১৯০৮ সালের জুনে একটি সফল অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন তিনি এবং মজলিস বন্ধ করে দেন; সবচেয়ে রেডিক্যাল ইরানি সংস্কারক ও *উলেমাদের* মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তাব্রিযের পপুলার গার্ড শাহর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং বখতিয়ারি গোত্রের সহায়তায় পরের মাসে পাল্টা অভ্যুত্থান পরিচালনা করে শাহকে গদিচ্যুত করে তাঁর নাবালক পুত্র আহমাদকে একজন উদার রিজেন্টের সাথে সিংহাসনে বসায়। দ্বিতীয় মজলিস নির্বাচিত হয়, কিন্তু মিশরের মতো এই দুর্বল সংসদীয় ব্যবস্থাটি ইউরোপিয় শক্তিগুলোর হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মজলিস একজন আমেরিকান ফিনান্সিয়ার মরগান শুস্টারকে নিয়োগ দিয়ে ব্রিটেন ও রাশিয়ার দীর্ঘদিন ধরে ইরানের উপর যে শৃঙ্খল চাপিয়ে রেখেছিল সেটা থেকে বের হয়ে আসার প্রয়াস পেলে রাশিয়ান বাহিনী তেহরানে হাজির হয় ও ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে মজলিস রুদ্ধ করে দেয়। আরও তিন বছর পর মজলিসকে আবার অধিবেশন ডাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ের ভেতর অনেকেই তিক্ত ও মোহমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সংবিধান তাদের প্রত্যাশা মোতাবেক কোনও মহৌষধ ছিল না, বরং স্রেফ ইরানের মৌলিক অক্ষমতাকে নিষ্ঠুর ও স্পষ্ট রূপ দান করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইরানের পক্ষে দারুণ বিঘ্নকারী ছিল, ফলে বহু ইরানি শক্তিশালী সরকারের আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করেছিল। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ ও রাশিয়ান বাহিনী

দেশটি দখল করে নেয়। বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়ানরা প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চলে তাদের ছেড়ে দেওয়া এলাকায় ব্রিটিশরা এগিয়ে যায়, আবার দক্ষিণে নিজেদের ঘাঁটিগুলোয়ও দখল অব্যাহত রাখে। ইরানকে একটি প্রটেক্টরটে পরিণত করতে উদগ্রীব ছিল ব্রিটিশ। ১৯০৮ সালে এদেশে তেল আবিস্কৃত হয়েছিল, একজন ব্রিটিশ নাগরিক উইলিয়াম কক্স ডি'আরসিকে কনশেসন দেওয়া হয়েছিল; ১৯০৯ সালে অ্যাংলো-পারসিয়ান অয়েল কোম্পানি গঠন করা হয়, ইরানি তেল ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জ্বালানির সরবরাহ করতে শুরু করে। ইরান পরিণত হয়েছিল এক বিরাট লোভনীয় বস্তুতে। কিন্তু মজলিস ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিহত করতে শুরু করে। ১৯২০ সালে সারা দেশে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়, মজলিস সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়। ব্রিটেন পরিকল্পনা বাদ দিতে বাধ্য হয়। তবে ইরানিরা করুণভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল যে কেবল অন্য শক্তির শরণাপন্ন হয়েই স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারছে তারা, যাদের আবার ইরানের তেল নিয়ে নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে। ইরানের একটি সংবিধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ছিল বটে, কিন্তু মজলিসের প্রকৃত কোনও ক্ষমতা না থাকায় তা ছিল অর্থহীন। এমনকি আমেরিকানরাও লক্ষ করেছিল যে, ব্রিটিশরা অব্যাহতভাবে নির্বাচনে কারচুপি করে চলেছে ও ইরানিদের 'বর্তমান সামরিক আইন ও নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্রের মাধ্যমে মতামত বা কোনওভাবে অনুভূতি প্রকাশে বাধা দেওয়া হচ্ছে।'[১৯৪]

অসন্তোষের চলমান মনোভাব জনৈক বেসামরিক ব্যক্তিত্ব সায়ীদ জিয়া আদ-দিন তাবতাবাতি ও শাহর কস্যাক ব্রিগেডের কমান্ডার রেযা খানের (১৮৭৭–১৯৪৪) নেতৃত্বে ক্ষুদ্র একটি দলের পক্ষে সরকারকে উৎখাত করা সহজ করে দিয়েছিল। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জিয়া আদ-দিন প্রধানমন্ত্রী হন, রেযা খান পান আইন মন্ত্রীর দায়িত্ব। জিয়া আদ-দিন বিটিশপন্থী হিসাবে পরিচিত থাকায় ব্রিটিশরা এটা মেনে নিয়েছিল, তারা আশা করেছিল তাঁর নির্বাচনের ফলে প্রটেক্টরেট বানানোর পরিকল্পনা অগ্রসর হবে। পুরোপুরি পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেনি তারা। কিন্তু দুই নেতার ভেতর রেযা খান ছিলেন অধিকতর শক্তিশালী, অচিরেই জিয়াকে নির্বাসনে পাঠাতে সক্ষম হন তিনি, একটি নতুন কেবিনেট গঠন করেন এবং পরিণত হন একক শাসকে। সাথে সাথে দেশের আধুনিকায়নের কাজে হাত দেন রেযা। জনগণ নিদারুণভাবে হতাশ ও পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত থাকায় তাঁর পূর্বসুরিরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি সেখানে সফল হন। সামাজিক সংস্কার বা দরিদ্রদের নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্রেফ দেশকে কেন্দ্রিভূতকরণ, সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং ইরানকে আরও

AMARBOI.COM

দক্ষতার সাথে কার্যকর করে তোলা। যেকোনও ধরনের বিরোধিতাকে কঠোর হাতে দমন করা হয়েছে। একেবারে গোড়া থেকেই রেযা ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্যে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তোয়াজ করে চলছিলেন। আমেরিকান কারিগরি পরামর্শ ও বিনিয়োগের বিনিময়ে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি অভ নিউ জার্সিকে তেলের কনসেশন দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৫ সালে রেযা শেষ কাজার শাহকে ক্ষমতা ত্যাগে সম্মত করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তবে মূল লক্ষ্য ছিল একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু *উলেমারা* আপত্তি তোলেন। মজলিসে আয়াতোল্লাহ মুদ্দারিস ঘোষণা করেন, প্রজাতন্ত্র অনৈসলামিক। আতাতুর্কের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে দূষিত। যাজকগোষ্ঠীর কোনও ইচ্ছাই ছিল না ইরানও তুরস্কের মতো একই পথের পথিক হোক। রেযার শাহ হওয়ার বেলায় কোনও আপত্তি ছিল না। তখনও যাজকদের দরবারকে তোয়াজ করে চলতে উদগ্রীব ছিলেন তিনি। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সরকার ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করবে, এর বিধিবিধানসমূহ শরীয়াহর সাথে বিরোধে যাবে না। এরপর জনাকীর্ণ মজলিস পাহলভী বংশের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু শাহ রেযা পাহলভীর *উলেমাদের* কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙতে দেরি হবে না, তিনি কেবল আতাতুর্কের নিষ্ঠুর সেক্যুলারাইজেশনের সমানই হয়ে উঠবেন না বরং তাঁকে অতিক্রম করে যাবেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ নাগাদ মনে হয়েছিল সেক্যুলারিজমের বিজয় ঘটতে যাচ্ছে। ব্যাপক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের উপস্থিতি ছিল বটে, যদিও অধিকতর রেডিক্যাল আন্দোলনসমূহকে দমন করায় সেগুলো সেক্যুলার নেতৃত্বের জন্যে কোনও রকম হুমকি ছিল না। কিন্তু এই বছরগুলোতে রোপিত বীজ আধুনিক সেক্যুলারিস্ট পরীক্ষানিরীক্ষার কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর শেকড় ছড়াতে শুরু করবে।

AMARBOI.COM

৭. প্রতি-সংস্কৃতি
(১৯২৫–৬০)

নিৎশে ঈশ্বরের প্রয়াণের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই আধুনিক মানুষ নানাভাবে তাদের সংস্কৃতির মূলে একটি শূন্যতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। ফরাসি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫–৮০) একে বলেছেন মানুষের চেতনায় ঈশ্বর আকৃতির গহবর, যেখানে স্বর্গীয় সত্তা সব সময় ছিলেন কিন্তু এখন এক শূন্যতা পেছনে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের বিস্ময়কর সাফল্য প্রাচীন পৌরাণিক সচেতনতাকে দমন করার সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়ায় খোদ ঈশ্বরের ধারণাকেই বহু পাশ্চাত্যকৃত মানুষের পক্ষে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব করে তুলেছিল। পবিত্রতার অনুভূতি জাগানোর মতো কাল্ট ছাড়া ঈশ্বরের প্রতীক ক্ষীয়মান ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক মানুষ কোনওরকম অনুতাপ করেনি। অনেক দিক থেকেই পৃথিবী আগের চেয়ে ঢের ভালো জায়গায় পরিণত হয়েছিল। তাদের জীবনকে একটা মূল্য দেবে ও তাদের এতদিন পর্যন্ত কনফেশনাল ধর্মগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত সত্তার গভীর প্রবাহের কাছে পৌঁছে দিতে সাহিত্য, শিল্পকলা, যৌনতা, মনোবিশ্লেষণ, মাদক এমনকি ক্রীড়ায় দুর্জ্ঞেয়র অনুভূতির সন্ধান করে সেক্যুলারিস্ট আধ্যাত্মিকতা গড়ে তুলছিল তারা। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাশ্চাত্য জনগণ ধরে নিয়েছিল যে, ধর্ম আর কখনওই বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারবে না। একে দৃঢ়তার সাথে ব্যক্তিগত বলয়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে; আবারও ক্ষমতার বিভিন্ন অবস্থান দখল করে রাখা বা প্রচারমাধ্যম ও সরকারী ডিসকোর্সের নিয়ন্ত্রণকারী বহু সেক্যুলারিস্টের চোখে একথা সত্যি মনে হয়েছিল। পাশ্চাত্য খৃস্টজগতে ধর্ম প্রায়শঃই নিষ্ঠুর ও নিপীড়নমূলক ছিল। আধুনিক রাষ্ট্রের চাহিদা ছিল সমাজকে সহিষ্ণু হতে হবে। ক্রুসেড বা ইনকুইজিশনের যুগে ফিরে যাবার কোনও উপায় ছিল না। সেক্যুলারিজম এসেছে

AMARBOI.COM

থাকবার জন্যে। কিন্তু একই সময়ে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ পৃথিবীকে এও স্বীকার করে নিতে হয়েছিল যে, 'শূন্যতা' যে এখন আর মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা নেই, বরং একে স্পষ্ট ও ভীতিকর রূপ দেওয়া হয়েছে।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের ভেতর ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সত্তর মিলিয়ন মানুষ সহিংস মৃত্যু বরণ করেছিল।[1] ভয়াবহ কিছু নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হয়েছিল ইউরোপের অন্যতম সংস্কৃত সমাজের বাসিন্দা জার্মানদের হাতে। যৌক্তিক শিক্ষা বর্বরতা নিশ্চিহ্ন করতে পারবে, এমনটি আর মনে করা যাচ্ছিল না; কেননা এক মহান বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে কাছেই নাৎসি হলোকাস্ট নির্যাতন শিবিরের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছিল। নাৎসি হলোকাস্ট বা সোভিয়েত গুলাগের ভয়ঙ্কর মাত্রা সেগুলোর আধুনিক উৎস তুলে ধরে। এর আগের কোনও সমাজই নিশ্চিহ্নতার এমনি ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা ভাবেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) ভয়াবহতা শেষ হয়েছিল কেবল জাপানি শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর প্রথম অ্যাটম বোমা বর্ষণের ভেতর দিয়ে। এটাও আবার আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষমতার ভীতিকর রূপ ও আধুনিক সংস্কৃতির নিশ্চিহ্নতার বীজাণু। দশকের পর দশক নারী-পুরুষ ঈশ্বর নির্ধারিত চূড়ান্ত প্রলয়ের অপেক্ষা করে এসেছিল; কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল যেন এই বিশ্ব ধ্বংস করার জন্যে মানবজাতির কোনও অতিপ্রাকৃত উপাস্যের প্রয়োজন পড়বে না। নিজেরাই অসাধারণ দক্ষতার সাথে একাজটি করতে খেয়াল, দক্ষতা ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে তারা। জীবনের এইসব নতুন সত্য বিবেচনা করার সময় জনগণ আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে যৌক্তিক রীতিনীতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। এমনি ভয়াবহ মাত্রার বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে যুক্তি নীরব হয়ে গিয়েছিল; আক্ষরিক অর্থেই এর বলার মতো কিছু ছিল না।

হলোকাস্ট আধুনিক কালের অশুভের প্রতিমূর্তিতে পরিণত হবে। এটা ছিল একেবারে গোড়া থেকেই যা জাতিগত শুদ্ধিকরণের কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট আধুনিকতার উপজাত। নাৎসিরা শিল্পযুগের বহু সরঞ্জাম ও সাফল্যকে মারাত্মক কার্যকারিতার সাথে প্রয়োগ করেছে। মৃত্যুশিবিরগুলো ছিল একেবারে খোদ শিল্পকারখানার চিমনি পর্যন্ত ফ্যাক্টরির প্যারোডি। তারা রেলপথ, অগ্রসর রাসায়নিক শিল্প ও দক্ষ আমলাতন্ত্র এবং ব্যবস্থাপনার পূর্ণ ব্যবহার করেছে। হলোকাস্ট ছিল বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক পরিকল্পনার নজীর, যেখানে সমস্ত কিছু ছিল একক, সীমিত ও স্পষ্ট সংজ্ঞায়িত লক্ষ্যের অধীন।[2] আধুনিক বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ থেকে উদ্ভূত হলোকাস্ট ছিল বিংশ শতাব্দীর 'উদ্যান' সংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত সামাজিক প্রকৌশলের চরম রূপ। খোদ বিজ্ঞানই মৃত্যু-শিবিরে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, সেখানে সুপ্রজনন

বিদ্যার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। আর কিছু না হোক হলোকাস্ট দেখিয়েছে যে, সেক্যুলারিস্ট মতাদর্শ যেকোনও ধর্মীয় ক্রুসেডের মতোই মারাত্মক হতে পারে।

মানব চেতনায় ঈশ্বরের পরলোকগমনের ফলে আবির্ভূত বিপদেরও স্মারক ছিল হলোকাস্ট। খৃস্টতত্ত্বে নরককে ঈশ্বরের অনুপস্থিতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শিবিরগুলোকে যেন অপার্থিবভাবে শত শত বছর ধরে ইউরোপিয়দের তাড়া করে ফেরা নরককুণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্নির্মাণ বলে মনে হয়েছিল। প্রহার, শূলে চরানো, চাবুকপেটা করা এবং পরিহাস, বিকৃত, বিনষ্টদেহ, অগ্নিশিখা ও গন্ধময় হাওয়া এসব কিছুই ক্রিশ্চানদের ইউরোপের কবি, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও নাট্যকারদের বর্ণিত নরকের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।[৩] অশৎউইচ ছিল এক কৃষ্ণ এপিফ্যানি, পবিত্রতার অনুভূতি হারিয়ে গেলে জীবনের চেহারা কেমন হতে পারে মানুষকে তার একটা আভাস দিয়ে গিয়েছিল। সর্বত্তোম অবস্থায় (কেবল সর্বোত্তম অবস্থাতেই) ধর্ম মানুষকে এর মিথ, আচার ও কাল্টিক ও নৈতিক অনুশীলনের ভেতর মানবজাতির পবিত্রতার উপলব্ধি চর্চা করতে সাহায্য করেছিল। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ মনে হয়েছে, বল্গাহীন যুক্তিবাদ পৃথিবীর বুকেই নরক নামিয়ে আনতে নিজেকে বাধ্য মনে করতে পারে, ঈশ্বরের অনুপস্থিতির সহস্রাব্দিক উদ্দেশ্য। আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি সৃজনশীলতার সাথে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানোর ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষকে আকর্ষণ করার মতো এক ধরনের বিনাশী প্রবণতা ছিল। ঈশ্বরের প্রতীক মানবীয় সম্ভাবনার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করেছিল; এবং রক্ষণশীল যুগে নারী-পুরুষের কর্মতৎপরতার উপর সীমা আরোপ করেছিল। আইনের নির্দেশনা তাদের মনে করিয়ে দিয়েছে এই পৃথিবী তাদের খেয়ালখুশি মতো কিছু করার জায়গা নয়। আধুনিক মানব সত্তা এখন এমন ব্যাপক মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন ও মুক্তিকে মূল্য দিচ্ছিল যে সর্বশক্তিমান স্বর্গীয় আইনপ্রণেতার ধারণাই তাদের কাছে ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল। এই পরিবর্তন মানুষের মর্যাদার এক বিরাট অগ্রগতি চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু হলোকাস্ট ও গুলাগ দেখিয়েছে, মানুষ এধরনের সকল বাধা ছুঁড়ে ফেললে কিংবা জাতি বা রাজনীতিকে পরম মূল্যে পরিণত করলে কী ঘটতে পারে। জীবনের পবিত্রতা এবং পৃথিবীকে সম্মান দেখাতে মানুষকে 'অতিপ্রাকৃতের' অপুর্ণাঙ্গ প্রতীক নিয়ে আধুনিক শুদ্ধতার সাথে আপোস করবে না এমন শিক্ষা দেওয়ার নতুন উপায় বের করতে হবে।

মৃত্যু-শিবির ও মাশরুম মেঘ হচ্ছে এমন প্রতিমা যা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে ও মনে রাখতে হবে যাতে আমরা যেন উন্নত বিশ্বে আমাদের অনেকেরই উপভোগ করা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির ব্যাপারে বড় বেশি শভেনিস্টিক না হয়ে উঠি। কিন্তু এইসব প্রতিমা আবার কিছু কিছু ধার্মিক মানুষ আমাদের আধুনিক

সেক্যুলার সামাজকে কীভাবে দেখে সে সম্পর্কে একটা ধারণাও দেয়, যেখানে তারাও ঈশ্বরের অনুপস্থিতি বোধ করে। কোনও কোনও মৌলবাদী আধুনিকতাকে সমানভাবে অহংময়, অশুভ ও দানবীয় মনে করে; আধুনিক শহর বা সেক্যুলার মতাদর্শ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা অশৎউচের অন্ধকারে তাকিয়ে থাকা উদারপন্থী সেক্যুলারিস্টদের মতো একই ধরনের ভীতি ও অসহায় ক্রোধে তাদের ভরিয়ে তুলেছিল। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের সবকটার মৌলবাদীরাই মূলধারার সমাজ থেকে সরে গিয়ে তাদের ধারণায় পরিস্থিতি কেমন হওয়ার কথা ছিল সেটাকেই তুলে ধরে প্রতি-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। তারা কেবল অহঙ্কার বশতঃ নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছিল না, বরং প্রায়শঃই ত্রাস ও ভীতির কারণে এমনটি করতে বাধ্য হয়েছিল। মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাণকেন্দ্রে যে ভীতি ও উদ্বেগের বাস সেটা উপলব্ধি করা আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কেবল তাহলেই আমরা এর প্রবল ক্রোধ, নিশ্চয়তা দিয়ে শূন্যতাকে পূর্ণ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং এর ক্রমাগত এগিয়ে আসা অশুভ সংক্রান্ত বিশ্বাস উপলব্ধি করতে পারব।

কোনও কোনও ইহুদি আধুনিক বিশ্বকে হলোকাস্টের আগে থেকেই দানবীয় মনে করে আসছিল। প্রকৃতপক্ষেই নাৎসি নিষ্ঠুরতা কেবল তাদের এই বিশ্বাসকেই নিশ্চিত করেছিল যে, জেন্টাইল বিশ্ব নিছক অতীত অশুভই নয়, বরং অধিকাংশ আধুনিক ইহুদি ভয়ঙ্করভাবে সাজা পাওয়ার যোগ্য। ১৯৩০-র দশক পর্যন্ত আধুনিক সংস্কৃতির সাথে কোনও সম্পর্ক রাখতে অনিচ্ছুক বেশিরভাগ অর্থডক্স ইহুদি *ইয়েশিভা* বা হাসিদিক সভায় নিজেদের মগ্ন রাখতে পারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা প্যালেস্তাইনে অভিবাসন করার ইচ্ছা বা প্রয়োজন কোনওটাই ছিল না তাদের। কিন্তু ১৯৩০ ও ১৯৪০-র দশকের আলোড়ন বুঝিয়েছিল যে, জীবিতদের ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পালানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। হেরেদিমদের অনেকে প্যালেস্তাইনে গিয়ে যায়নবাদীদের মুখোমুখি পড়ে যায়, এরা তখন ইহুদিদের আসন্ন বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর লক্ষ্য একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্যে সংগ্রাম করছিল।

জেরুজালেমের আল্ট্রা অর্থডক্স ইহুদি সম্প্রদায় এদাহ হেরেদিস বেলফোর ঘোষণার বহু আগে থেকেই যায়নবাদের প্রবল বিরোধী ছিল। ছোট দল ছিল এটি, ১৯২০-র দশকে প্যালেস্তাইনে বসবাসরত ১৭৫,০০০ জন ইহুদির মধ্যে মাত্র ৯,০০০ জনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল তারা।[৪] পবিত্র টেক্সটে নিমগ্ন এই সম্প্রদায়টির নিজেদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার উপায় সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না, কিন্তু অচিরেই যারা আধুনিক রাজনীতির খেলার কায়দা রপ্ত করা

AMARBOI.COM

আগুদাত ইসরায়েলের সদস্যরা তাদের সাথে যোগ দেবে। আগুদাত তখনও যায়নবাদের বিরোধী আদর্শগত মতবাদ লালন করলেও সদস্যরা পবিত্র ভূমিতে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বসতি স্থাপন করার মাধ্যমে সেক্যুলারিস্টদের প্রভাব হ্রাস করার প্রয়াস পেয়েছিল, তরুণ সম্প্রদায় যেখানে তোরাহ ও তালমুদের পাশাপাশি আধুনিক বিষয়াদি পাঠ করেছে। এমনি আপোস আগুদাত 'সীমানা অতিক্রম' করে গেছে, এই বিশ্বাস লালনকারী অধিকতর আল্ট্রা অর্থডক্স ইহুদিদের ভীত করে তুলেছিল। এই আল্ট্রা অর্থডক্স বিরোধ থেকেই প্রথম নজীরে প্রায়শঃই যেমন ঘটে থাকে সহধর্মাবলম্বীদের ভেতর বিবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি মৌলবাদী আন্দোলনের জন্ম ঘটেছিল।

এই প্রত্যাখ্যানবাদী অর্থডক্সির প্রধান মুখপাত্র ছিলেন হাঙেরিয় ইহুদি সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান হাসিদিক নেতা র‍্যাবাই হাইম এলিয়েযার শাপিরা অভ মুনকাকস (১৮৭২–১৯৩৭)। ১৯২২ সালে আগুদাতের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রচারণা শুরু করেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে আগুদাত সদস্যরা যায়নবাদীদের সাথে যোগসাজশে *গোয়িশি* আলোকনের এইসব 'বিষাক্ত আগাছা ও সোমরস' দিয়ে নিষ্পাপ স্কুলছাত্রদের আক্রান্ত করছে, 'তেমনি সেইসব গান দিয়ে যেগুলো এরেতয ইসরায়েলের ভূমিতে ক্ষেতখামারে ও আঙুর বাগিচায় ভূমিতে বসতি গড়ার কথা বলে–ঠিক যায়নিবাদী কবিদের মতো।' তারা পবিত্র জমিনকে চাষ করার মাধ্যমে কেবল প্রার্থনা ও পবিত্র পাঠের জন্যই নির্ধারিত পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করছে। স্লোভাকিয়ায় এক সভায় হেরেদিমের সবচেয়ে রেডিক্যাল মুনকাকযার রেব্বের সাথে একমত হয়ে আগুদাতের সাথে সংশ্লিষ্টতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নির্দেশে স্বাক্ষর করেন। সুস্পষ্টভাবে যায়নবাদের বিরোধিতা করে অস্তিত্ব লাভ করা আগুদাত সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ছিল না; এই দলটি যারা যায়নবাদকে সমর্থন করে না আবার আগুদাতের উপর শাপিরার নিষেধাজ্ঞাকেও সমান বাড়াবাড়ি মনে করে এমন পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থডক্সের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সজাগ ছিল। তা সত্ত্বেও যায়নবাদের সহজাত ত্রাসের কারণে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতিকে তারা যুক্তিসঙ্গত মনে করেছে। নিষেধাজ্ঞায় স্বাক্ষরকারী অন্যতম প্রথম হেরেদিম ছিলেন তরুণ র‍্যাবাই মোশে তেইতেলবাম (১৮৮৮–১৯৭৯), পরে হাঙেরির সাতমারের হাসিদিম নেতা এবং যায়নবাদ ও ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রবলতম হেরেদি বিরোধীতে পরিণত হবেন তিনি।

শাপিরা ও তেইতেলবাম প্যালেস্তাইনে যায়নবাদী *কিব্বুতযিম* নিয়ে ভাববার সময় লোকে পরবর্তী কালে নাৎসি মৃত্যু-শিবিরের কথা শুনলে যেমন ভীতি ও ক্রোধের অনুভূতিতে তাড়িত হত তেমনি বোধ করেছেন। এটা মোটেই বাড়াবাড়ি

AMARBOI.COM

ছিল না। স্বজাতির সাথে আমেরিকায় অভিবাসন করে অল্পের জন্যে রেহাই পেয়েছিলেন তেইতেলবাম, হলোকাস্টের সম্পূর্ণ দায়ভার 'সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদি জনগণকে ভয়ানক ধর্মদ্রোহিতার পথে প্রলুব্ধকারী' যায়নবাদীদের মহাপাপের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, 'এমন কিছু পৃথিবীর সৃষ্টির পর আর দেখা যায়নি...তো এটা বিস্ময়ের কিছু নয় যে, প্রভু ক্রোধে আঘাত হেনেছেন।'[৬] এই প্রত্যাখ্যানবাদীরা মরুভূমিতে যার ফসল ফলানো যায়নবাদীদের কৃষিখাতে সাফল্যের ভেতর বা ইহুদিদের প্রাণ বাঁচাতে লড়াই চালিয়ে যাওয়া তাদের নেতাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ইতিবাচক কিছুই প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। এটা ছিল এক ধরনের 'উন্মত্ততা', 'এক ধরনের 'অপবিত্রকরণ', এবং অশুভ শক্তির চূড়ান্ত বিস্ফোরণ।[৭] যায়নবাদীরা ছিল নাস্তিক, অবিশ্বাসী, তাদের উদ্যোগ তারপরেও অশুভ কারণ এটা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে ইহুদিদের অবশ্যই নির্বাসনের কষ্ট ভোগ করতে হবে, তারা অবশ্যই নিজেদের উদ্ধার করার কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না।

শাপিরার চোখে ভূমি সাধারণ ইহুদিদের বসতি স্থাপনের পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র, আত্মস্বীকৃত যায়নবাদী বিদ্রোহীদের কথা তো বাদই। কেবল সারা জীবন পাঠ ও প্রার্থনায় কাটিয়ে দেওয়া ধর্মীয় অত্যুৎসাহীই সেখানে নিরাপদে বাস করতে পারে। যেখানে এরেতয ইসরায়েলের (ইসরায়েল দেশ) মতো কোনও পবিত্র বস্তু থাকে, অশুভ শক্তি সেখানেই আক্রমণ চালাতে সমবেত হয়। যায়নবাদীরা, ব্যাখ্যা করেছেন শাপিরা, স্রেফ দানবীয় প্রভাবের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। সুতরাং, খোদ পবিত্র ভূমি দুষ্ট শক্তিতে ভরে উঠেছে, যা ঈশ্বরের ক্রোধ ও ক্ষোভ জাগিয়ে তুলবে।' ঈশ্বরের বদলে এখন খোদ শয়তান জেরুজালেমে বাস করছে। ভূমিতে 'আরোহণে'র ভানকারী যায়নবাদীরা আসলে নরকের গভীরে নেমে যাচ্ছে'[৮] পবিত্র ভূমি এখন ঈশ্বর শূন্য, অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। যায়নবাদীদের বক্তব্য মোতাবেক এরেতয ইসরায়েল মোটেই স্বদেশভূমি নয়, বরং রণক্ষেত্র। এমনি ভয়ঙ্কর সময়ে সেখানে কেবল যারা বাস করতে পারে তারা গৃহস্থ বা কৃষক নয়, বরং 'জেরুজালেমের পবিত্র পাহাড়ে ঈশ্বরের অবশিষ্ট ঐতিহ্যের পক্ষে ন্যায়যুদ্ধ করতে' অগ্রসর হওয়া যোদ্ধা, 'অন্ধ ঈশ্বরভীরুর দল,' 'যুদ্ধের বীর পুরুষ'। গোটা যায়নবাদী উদ্যোগ শাপিরাকে অস্তিত্বগত ভীতিতে ভরিয়ে তুলেছিল। তেইতেলবাম যায়নবাদীদের ইহুদি জনগণের উপর লাগাতার বিপর্যয় নিয়ে আসা অশুভ অহঙ্কারের সর্বশেষ প্রকাশ হিসাবে দেখেছেন: টাওয়ার অভ বাবেল, সোনালি বাছুরের বহুঈশ্বরবাদীতা, সিই দ্বিতীয় শতাব্দীতে বার কোচবা বিদ্রোহ ও শাব্বেতেই যেভি কেলেঙ্কারী। কিন্তু যায়নাবাদই সব সেরা ধর্মদ্রোহীতা। এটা ছিল বিশ্বের খোদ

ভিত্তিমুলের নাড়া দেওয়া ভীষণ ঔদ্ধত্য। ঈশ্বরের হলোকাস্ট প্রেরণের ভেতর বিস্ময়ের কিছুই নেই![৯]

সুতরাং, বিশ্বাসীকে অবশ্যই নিজেদের অশুভ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে। ১৯২০ ও ১৯৩০-র দশকে লেখালেখি করেছেন জেরুজালেমের অন্যতম অত্যুৎসাহী হাসিদিম র‍্যাবাই ইয়েশায়াহু মারগোলিস, শাপিরা ও তেইতেল বামের বিরাট ভক্ত ছিলেন তিনি, তেইতেলবামকে এদাহ হেরেদিসের নেতা হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। মারগোলিস ইসরায়েলের প্রতি-ইতিহাস নির্মাণ করেছিলেন যেখানে অবিরাম শত শত বছর ধরে ঈশ্বরের নামে রুখে দাঁড়িয়ে অন্য ইহুদিদের বিরুদ্ধে নিজেদের লড়াই করতে বাধ্য মনে করা যুদ্ধংদেহী একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। লেভাইরা মোজেস সিনাই পাহাড়ের চূড়ায় তোরাহ গ্রহণ করার সময় সোনালি বাছুরের উপাসনাকারী তিন হাজার ইসরায়েলিকে হত্যা করেছিল; একারণেই, মন্দিরে তাদের সেবার জন্যে নয়, ঈশ্বর অন্য গোত্রগুলোর উপরে তাদের মর্যাদা দিয়েছিলেন। মোজেস ছিলেন সারা জীবন অন্য ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়া একজন মহান ধর্মোৎসাহী। আরনের পৌত্র ফিনেহাস ইসরায়েলের রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও যিমরির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ তিনি ব্যাভিচার করেছিলেন। এলিযাহ আহাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাআলের ৪৫০জন পয়গম্বরকে হত্যা করেছেন। এই অত্যুৎসাহী ধার্মিকরা, ঈশ্বরের প্রতি যাদের আবেগ প্রায়শঃই নিয়ন্ত্রণহীন ক্রোধের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সত্যিকারের ইহুদি, অবশিষ্ট বিশ্বাসী।[১০] অনেক সময় জেন্টাইলদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে তাঁদের, অনেক সময় সতীর্থ ইহুদিদের বিরুদ্ধে, কিন্তু যুদ্ধ বরাবর একই। বিশ্বাসী ইহুদিদের অবশ্যই ঈশ্বরকে ত্যাগ করে অশুভের দলে নাম লেখানো আগুদাতের সদস্যের মতো ইহুদিদের সাথে নিজেদের শেকড়বাকর শুদ্ধ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। যায়নবাদের সাথে সহযোগিতা করে আগুদাত ইহুদিদের 'পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপের চেয়েও বেশি ক্ষতি করেছে।' ওদের সাথে মেশা পাপ এবং শয়তানের সাথে চুক্তি করার মতোই।[১১]

একারণেই বিচ্ছিন্নতার দায়িত্ব। তোরাহ যেমন পবিত্রকে অপবিত্র থেকে, আলোকে অন্ধকার থেকে, দুধকে মাংস থেকে এবং সাব্বাথকে বাকি সপ্তাহ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে তেমনি ন্যায়নিষ্ঠকে নিজেকে বিচিছন্ন রাখতে হবে। কখনও দলে ফিরে আসবে না এমন বিদ্রোহী, এইসব দুষ্ট ইহুদিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে প্রকৃত হেরেদিম তাদের সাথে অধিবিদ্যিক স্তরে বিরাজিত অস্তিত্বের মহাগহ্বরেরই ভৌত প্রকাশ ঘটাচ্ছে। কিন্তু ভীতিকর এই দর্শন বোঝায় যে, শয়তানি অশুভের ভেতর বাস করে বিশ্বাসীদের জীবনের প্রতিটি বিষয় মহাজাগতিক গুরুত্ব বহন

AMARBOI.COM

করে। পোশাক, পড়াশোনার কৌশল, এমনকি রুটির টুকরোকে অবশ্যই সঠিক হতে হবে। ইহুদি জীবন মারাত্মকভাবে বিপদাপন্ন, যেকোনও রকম উদ্ভাবনই দারুণভাবে নিষিদ্ধ: খেয়াল রাখতে হবে যেন ডান দিকের ল্যাপেল বাম দিকের ল্যাপেলের উপরে থাকে, যাতে পরমেশ্বরের ডান হাত, 'পরমপ্রভুর ডান হাত উপরে থাকে' এর মহান ভালোবাসায় *(হেসেদ)*, অশুভ প্রবণতার ক্ষমতা *(দিন)* প্রকাশকারী বামদিকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।'[১২] প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদ যেখানে কঠোর মতবাদগত সমরূপতায় পরম নিশ্চয়তার সন্ধান করে শূন্যতাকে পুরণ করার প্রয়াস পেয়েছে, এইসব যায়নবাদ বিরোধী আল্ট্রা অর্থডক্সরা ঐশী বিধান ও রেওয়াজের অনুপুঙ্ক্ষ পরিপালনের ভেতর নিশ্চয়তার খোঁজ করেছে। এটা যেগুলো কেবল প্রাচীন সীমারেখার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংরক্ষণ, নতুন সীমানার সৃষ্টি, কঠোর বিচ্ছিন্নতা ও ঐতিহ্যের মূল্যবোধের আবেগময় পরিপালনের মাধ্যমেই প্রশমিত হতে পারে এমন প্রায় নিয়ন্ত্রণের অতীত ভীতি তুলে ধরা এক ধরনের আধ্যাত্মিকতা।

যেসব ইহুদি যায়নবাদী সাফল্যকে বিস্ময়কর ও উপশমকারী মনে করেছিল তাদের কাছে এই প্রত্যাখ্যানবাদী দর্শন বোধগম্য ঠেকেনি। এটাই গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়ে ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের সকলের মোকাবিলা করা সেই টানাপোড়েন: মৌলবাদী ও আধুনিক সেক্যুলার বিশ্বের প্রতি অধিকতর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালনকারীদের ভেতরকার অনতিক্রম্য এক দূরত্ব রয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী স্রেফ অবস্থাকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে না। যৌক্তিক তর্ক কোনও কাজে আসে না, কারণ বিরোধের সৃষ্টি হয় মনের গভীরতর ও অধিকতর স্বজ্ঞামূলক স্তরে। শাপিরা, তেইতেলবাম এবং মারগোলিস সেক্যুলার যায়নবাদীদের উদ্দেশ্যমূলক, বাস্তববাদী ও যৌক্তিকভাবে অনুপ্রাণিত কর্মকাণ্ড নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার সময় তাঁরা কেবল তাদের ঈশ্বরহীন এবং একারণে দানবীয় রূপেই দেখতে পেয়েছেন। পরে তাঁরা এবং তাঁদের অনুসারীরা মৃত্যু-শিবিরে নাৎসিদের যৌক্তিক, বাস্তবভিত্তিক ও নিষ্ঠুরভাবে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের কথা শুনে তাদের যায়নবাদী উদ্যোগের মতো একই প্রকৃতির মনে করেছেন। দুটোই ঈশ্বরের অনুপস্থিতি তুলে ধরেছে, সুতরাং এগুলো ধ্বংসাত্মকভাবে হেরেদিমদের কাছে মূল্যবান পবিত্র সকল মূল্যবোধ মাড়িয়ে যাওয়া শয়তানসুলভ ও বিনাশী। এখন পর্যন্ত জেরুজালেমের যায়নবাদ বিরোধী এলাকার প্ল্যাকার্ড ও গ্রাফিতিগুলো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতাদের হিটলারের সাথে তুলনা করে। বহিরাগত কারও চোখে এমনি তুলনা হতবুদ্ধিকর, মিথ্যা ও বিকৃত, তবে মৌলবাদীদের হৃদয়ে সেক্যুলারিজম কেমন গভীর ভীতি জাগিয়ে তুলতে পারে আমাদের সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়।

AMARBOI.COM

এরেতয ইসরায়েলে ইহুদি ধর্মদ্রোহীদের একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাটিই একটা টাবুকে লঙ্ঘন করেছিল। শত শত বছর ধরে হারানো ভূমি একে ঈশ্বর ও তোরাহর সাথে এক ধরনের পবিত্র ট্রিনিটিতে সম্পর্কিত করে এক প্রতীকী ও অতীন্দ্রিয়বাদী মূল্য লাভ করেছিল। ধর্মকে ছুঁড়ে ফেলার ব্যাপারটি গোপন করেনি এমন একদল লোকের হাতে এর অপবিত্রকরণ প্রত্যক্ষ করা পবিত্র উপাসনালয়ের অমর্যাদার মতোই মিশ্র ক্রোধ ও ভীতির উদ্রেক ঘটিয়েছে, বিশেষ করে ইহুদি বিশ্বে একে প্রায়শঃই ধর্ষণ হিসাবে অনুভব করা হয়ে থাকে।[১৩] যায়নবাদীরা যতই তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, রেডিক্যাল হেরেদিমদের কেউ কেউ ততই বেপরোয়া হয়ে উঠছিল; অবশেষে ১৯৩৮ সালে যায়নবাদীদের সাথে 'সহযোগিতা'র কারণে আগুদাত থেকে বের হয়ে আসা আমরাম ব্লঅ ও আহারন কাতযেনেলেনবোগেন এদাহ হেরেদিস ছেড়ে বের হয়ে আসেন। ইহুদি সম্প্রদায় সম্প্রতি আরব আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরক্ষার খরচ মেটানোর লক্ষ্যে বিশেষ কর আরোপ করেছিল, এই প্রত্যাখানবাদীরা তা আদায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যাখ্যানকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে ব্লঅ ও কাতযেনেলেনবোগেন একটি তালমুদিয় কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান প্যালেস্তাইনের একটি শহরে সশস্ত্র প্রহরীরা একটি ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার সময় দুজন ইহুদি সাধু তাদের বলেছিলেন: 'তোমরা শহরের অভিভাবক নও, বরং ধ্বংসকারী।'[১৪] ব্লঅ ও কাতযেনেলেনবোগেনের হাতে গড়ে ওঠা নতুন দলটিকে একটি আরামাইক নাম দিয়েছিলেন, নেচারেই কারতা ('দ্য গার্ডিয়ান অভ দ্য সিটি'): ইহুদিরা যায়নবাদীদের জঙ্গী তৎপরতার মাধ্যমে নয় বরং অর্থডক্সদের নিবেদিতপ্রাণ ও নিষ্ঠ ধর্মীয় পরিপালনের ভেতর দিয়েই রক্ষা পাবে। তাঁরা যায়নবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করেন। তাঁদের চোখে ইহুদিদের যখন তোরাহ দেওয়া হয়েছিল, তারা বিভিন্ন জাতি থেকে এক ভিন্ন বলয়ে প্রবেশ করেছিল। রাজনীতি বা সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেওয়ার কথা নয় তাদের, বরং উচিত আত্মার কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিবেদন করা। ইহুদিদের ইতিহাসের জগতে ডাক দিয়ে যায়নবাদীরা আসলে ঈশ্বরের রাজ্যকে পরিত্যাগ করেছে ও এমন এক রাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে যেটা ইহুদিদের পক্ষে কোনও অস্তিত্বমূলক অর্থ রাখে না। তারা নিজেদের প্রকৃতিকেই অস্বীকার করেছে এবং ইহুদিদের ধ্বংসের পথে স্থাপন করেছে।[১৫]

যায়নবাদ যত সফল হয়ে উঠল নেচারেই কারতা ততই হতবাক হয়ে চলল। কী কারণে দুষ্টরা সমৃদ্ধি লাভ করছে? ১৯৪৮ সালে হলোকাস্টের খুব অল্প পরেই ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তেইতেলবাম ও ব্লঅ কেবল এই উপসংহারেই পৌঁছতে পেরেছিলেন যে, ইহুদিদের অর্থহীন অশুভ ও অপবিত্রতার দিকে চালিত

করতে খোদ শয়তান ইতিহাসে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করেছে।[১৬] অধিকাংশ অর্থডক্স ও আল্ট্রা-অর্থডক্সরা নতুন রাষ্ট্রকে মেনে নিতে পেরেছিল। তারা ঘোষণা করেছিল যে, এর কোনও ধর্মীয় মূল্য নেই, ইসরায়েলে বাসরত ইহুদিরা এখনও ঠিক ডায়াসপোরার মতোই নির্বাসনে আছে; কোনও কিছুই বদলায়নি। আগুদাত ইসরায়েল ইহুদদের ধর্মীয় স্বার্থ নিশ্চিত করতে ঠিক ইউরোপের জেন্টাইল সরকারগুলোর সাথে আলোচনা করার মতোই ইসরায়েলি সরকারের সাথে *শতাদলানাতে*-সংলাপ ও আলোচনা-প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নেচারেই কারতা এসবের কোনও কিছুই মেনে নিতে পারেনি। ১৪ই মে, ১৯৪৮ তারিখে রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়ার পরপরই নির্বাচনে যেকোনও ধরনের অংশ গ্রহণের উপর দলটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, *ইয়েশিভোতের* জন্যে সরকারী অর্থসংস্থান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কখনওই পা না রাখার শপথ নেয়। আগুদাতের উপর আক্রমণও দ্বিগুন করে দেয়, তাদের বাস্তবভিত্তিক রাষ্ট্র মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে তারা কীলকের ডগা বিবেচনা করেছে। 'ঈশ্বর না করুন, অশুচি, বলাৎকারকারী ও দূষিতকারীদের প্রতি আমাদের ঘৃণা থেকে আমরা এতটুকু সরে এলেও,' জোরের সাথে বলেছেন ব্লম, '[আমরা যদি] পবিত্র তোরাহর আমাদের উপর অরোপিত বিচ্ছিন্নতাকে ভঙ্গ করি...তাহলে প্রতিটি নিষিদ্ধ জিনিসের জন্যে রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যাবে, কারণ বাঁকা পথের জন্যে সরল ও সংকীর্ণ পথ ছেড়ে দেব।'[১৭] বলতে গেলে গোটা ইহুদি জাতিকে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রলুব্ধ করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়নবাদী উদ্যোগ সকল শোভন ও পবিত্র মূল্যবোধের বিনাশী প্রত্যাখ্যানে পতিত হচ্ছে।

ইহুদি বিশ্বে যায়নবাদ শেকড় গেড়ে বসার সাথে সাথে ইহুদি রাষ্ট্রটি সফল হয়ে ওঠার ফলে উভয়ের প্রতিই নেচারেই কারতার ঘৃণা প্রবল হয়ে উঠল। সমন্বয়ের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কারণ ইসরায়েল রাষ্ট্রটি ছিল শয়তানের সৃষ্টি। তেইতেলবাম যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, কোনও ইহুদির পক্ষে 'রাষ্ট্রের প্রতি ও তোরাহর প্রতি একসাথে বিশ্বাস রাখা সম্ভব নয়, কারণ তারা সম্পূর্ণ বিপরীত।' এমনকি রাজনীতিবিদরা তালমুদিয় সাধু ও নির্দেশনার নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী হলেও রাষ্ট্র তারপরেও দানবীয় অশ্লীলতাই রয়ে যাবে কেননা এটা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ও নিস্কৃতি ও অন্তিমকালকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াস পেয়েছে।[১৮] ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে ধর্মীয় আইন পাসের নেচারেই কারতার প্রয়াস নিয়ে আগুদাত ইসরায়েলের মাথা ঘামানোর কোনও ফুরসত ছিল না। আইন করে সাব্বাথে সরকারী পরিবহন সীমিত করা বা *ইয়েশিভার* ছাত্রদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই দেওয়া ধর্মীয় কাজ নয়। এটা স্রেফ স্বর্গীয় আইনকে

মানবীয় আইনে পরিণত করা; এটা তোরাহকে বাতিল করারই শামিল, হালাখাহর অপবিত্রকরণ। নিউ ইয়র্কের সাতমার হাসিদিম সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত র‍্যাবাই শিমন ইসরায়েল পোসেন নেসেটের আগুদাত সদস্যদের সম্পর্কে যেমন বলেছেন:

> যারা প্রতিদিন 'নেসেট' নামে পরিচিত দুষ্টদের সমাবেশে ফিল্যাক্ট্রিজ পরে আর মিথ্যার উদ্দেশে গান গায়, ঈশ্বর না করুন, আশীর্বাদপ্রাপ্ত পবিত্র জনের স্বাক্ষর জাল করে, তাদের উপর লানত বর্ষিত হোক। কারণ তারা মনে করে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট দিয়ে তোরাহর সত্যিকে আরও দলিত করা যাবে কিনা বা ঈশ্বরের তোরাহকে কর্তৃত্ব প্রদান করা যাবে কিনা সেটা স্থির করতে পারবে।[১৯]

কিন্তু তারপরেও নেচারেই কারতা যায়নবাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। যায়নবাদীদের 'বলাৎকারকারী' হিসাবে ব্লঅর বর্ণনা তাৎপর্যপূর্ণ। ইহুদি ভূমিতে একটি ইহুদি রাষ্ট্র ইহুদির আত্মায় প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এটাই মৌলবাদী টানপোড়েনের অংশ। প্রায়শঃই তারা আধুনিকতার যেসব সাফল্য থেকে আতঙ্কে পশ্চাদপরণ করে থাকে সেগুলোর প্রতিই তীব্রভাবে আকর্ষণ বোধ করে।[২০] মোহনীয় বিশ্বাসযোগ্য প্রতারক অ্যান্টিক্রাইস্টের প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদী চিত্রণ একই বিরোধের একটা কিছু তুলে ধরে। আধুনিকতার মৌলবাদী দর্শনে বিস্ফোরক হয়ে ওঠার মতো এক ধরনের টেনশন রয়েছে যা, ব্লঅ যেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন, যায়নবাদ বিরোধীদের ধার্মিকতা এক ধরনের নীতিগত 'ঘৃণা' এবং ঘৃণা প্রায়শঃই অজ্ঞাত ভালোবাসার সাথে হাত ধরাধরি করে চলে। ইসরায়েল রাষ্ট্রের কথা ভাবতে গেলে হেরেদিম ক্রোধ অনুভব করে। তারা হত্যা করে না বটে, কিন্তু আজও সাব্বাথের দিন আইন ভেঙে যেসব ড্রাইভার গাড়ি চালায় তাদের লক্ষ্য করে ইঁটপাটকেল ছোঁড়ে। অনেক সময়, অর্থাৎ ধরা যাক টেলিভিশন রেখে বা স্ত্রীকে অশোভান পোশাক পরার অনুমতি দিয়ে প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী বাস করতে ব্যর্থ সতীর্থ হেরেদির বাড়িতে আক্রমণ চালায়। সহিংসতার এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে *কিদ্দুশ হাশেম*, 'ঈশ্বরের নামের পবিত্রকরণ' হিসাবে দেখা হয় এবং চারদিক থেকে হেরেদিমকে ঘিরে রেখে তাদের গ্রাস করার হুমকি দিয়ে চলা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত মনে করা হয়।[২১] তবে এমনটা হওয়া অসম্ভব নয় যে, এইসব সহিংসতা আসলে তাদের নিজেদের মনেরই চাপা আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ দমানোরই প্রয়াস।

যায়নবাদ বিরোধী এই হেরেদিমরা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর অংশ। ইসরায়েলের এদের সংখ্যা মাত্র দশ হাজার, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও হাজার দশেক; তবে

AMARBOI.COM

উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে তাদের।[২২] বেশিরভাগ আল্ট্রা-অর্থডক্সরা যায়নবাদ বিরোধী হওয়ার চেয়ে বরং যায়নবাদ নিরপেক্ষ হলেও নেচারেই কারতা ও সাতমার হেরেদিমের মতো অন্য রেডিক্যালরা রাষ্ট্রের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করার বিপদে থেকে তাদের মোকাবিলা করে। ইসরায়েল রাষ্ট্র থেকে তাদের সুদৃঢ় প্রত্যাহার প্রায়শঃই ইহুদি রাষ্ট্রে অখণ্ডতা ও নিখাঁদতার অভাব বোধকারী অধিকতর কম উৎসাহী হেরেদিমদের মনে করিয়ে দেয় যে, পার্থিব অর্থে ইসরায়েল যত শক্তিশালী ও সফল হয়ে উঠুক না কেন ইহুদিরা এখনও অস্তিত্বগত নির্বাসনে রয়ে গেছে, আধুনিক বিশ্বে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ নিতে পারবে না তারা।

ইসরায়েলকে শয়তানি সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু মানতে হেরেদিদের এই অস্বীকৃতি তাদের অনেকেরই বাসস্থান এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অব্যাহত বিদ্রোহেরই শামিল ছিল। তারা সাব্বাথে গাড়ি লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়া বা সাঁতারের পোশাকের বিজ্ঞাপনে স্বল্পবসনা নারীর ছবি ছেঁড়ার সময় তারা ইহুদি রাষ্ট্রের সেক্যুলার রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যেখানে কর্মতৎপরতাই একমাত্র মাপকাঠি এর যৌক্তিক, বাস্তব উপযোগিতা। তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বসের সব কটিতেই মৌলবাদীরা আধ্যাত্মিকতাকে বর্জন করে আধুনিক সমাজে প্রাধ্যান্য বিস্তারকারী পবিত্রের আরোপিত সীমা অগ্রাহ্যকারী বাস্তবভিত্তিক *লোগোসের* বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে। কিন্তু সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত শক্তিশালী বলে অধিকাংশকেই তাদের বিদ্রোহকে ছোট প্রতীকী কর্মকাণ্ডে সীমিত রাখতে হয়। তাদের দুর্বলতার বোধ ও উদাহরণ স্বরূপ, যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের উপর নির্ভরতার নীরব স্বীকৃতি কেবল মৌলবাদীদের ক্রোধই বাড়িয়ে তুলতে পারে। হেরেদিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল অংশ প্রতি পদক্ষেপেই তাদের মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে চলা সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে দৃঢ় পশ্চাদপসরণ ও প্রতি-সংস্কৃতি গড়ে তোলার ভেতর তাদের প্রতিবাদ সীমিত রেখেছে।

হেরেদিমদের বিকল্প সমাজ আধুনিক রীতিনীতির কারণে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত ছিল। হলোকাস্টের পর ইহুদিদের পক্ষে এই শূন্যতা ভীষণভাবে স্পষ্ট ছিল। প্রাণে বেঁচে যাওয়ারা ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাসিদিক সভা ও মিসনাগদিক *ইয়েশিভোত* পুনর্নির্মাণের দায় বোধ করেছে। হিটলারের মৃত্যু-শিবিরে প্রাণ হারানো লক্ষ লক্ষ হেরেদিমের প্রতি এটা ছিল ধার্মিকতার একটি আচরণ ও অশুভের শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাদের বিশ্বাস ছিল হেরাদি প্রতিষ্ঠানসমূহকে নতুন জীবন দান করে ও সেই মৃত জগৎকে আবার জীবিত করে কেবল বেঁচে থাকতেই দিয়ে নয় বরং আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি

AMARBOI.COM

শক্তিশালী করে পবিত্রের পক্ষে আঘাত হানছে তারা।[২৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন *ইয়েশিভোত* প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৩ সালে র‍্যাবাই আরন কোতলার (১৮৯১–১৯৬২) ফোলোঝিন, মির ও স্লোবোদকার *ইয়েশিভোতের* অনুসরণে নিউ জার্সির গেদোলাহয় বায়াস মিদ্রাশ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আমেরিকায় প্রথম লিথুয়ানিয় *ইয়েশিভা* স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালের পর তেল আভিভের কাছে বৃনেই ব্রাক 'তোরাহ নগরীতে' পরিণত হয়। এর নব প্রতিষ্ঠিত *ইয়েশিভা* ইসরায়েল ও ডায়াসপোরার সব জায়গা থেকে ছাত্রদের আকর্ষণ করতে থাকে। এখানে পরিচালনাকারী চেতনা ছিলেন র‍্যাবাই আব্রাহাম ইয়েশাইয়াহু কারলিতয (১৮৭৮–১৯৪৩), হাযন ইশ (তাঁর একটি গ্রন্থের নাম) নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি। এইসব নতুন প্রতিষ্ঠান *ইয়েশিভাকে* আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে হেরেদি জীবনের মূলে পরিণত করেছিল। তোরাহ পাঠ পরিণত হয়েছিল আজীবন পূর্ণকালীন প্রয়াসে। বিয়ের পরেও পুরুষরা পড়াশোনা চালিয়ে যেত, স্ত্রীরা তাদের আর্থিক সহযোগিতা দিত। বলতে গেলে গোটা ইউরোপিয় ইহুদি সম্প্রদায়কেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া আধুনিকতার নতুন বিপজ্জনক জগতে *ইয়েশিভায়* বাসকারী পণ্ডিতদের একটা ক্যাডারের বাইরের জগতের সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক ছিল, নিজেদের পবিত্র টেক্সটে পরিপূর্ণভাবে মগ্ন করে রেখেছিলেন তাঁরা, ইহুদিবাদের নতুন অভিভাবকে পরিণত হবেন তাঁরা।[২৪]

কোতলারের বিশ্বাস ছিল তাঁর অধ্যয়নই গোটা বিশ্বের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে। স্রেফ মানুষকে তোরাহ পাঠে সক্ষম করে তোলার জন্যেই ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র ইহুদি জাতি দিনরাত তোরাহ পাঠ করলেই তার দায়িত্ব পালন হবে। তারা সেটা বন্ধ করে দিলে, 'সমগ্র বিশ্বজগৎ সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে।'[২৫] এটা পূর্ণ নিশ্চিহ্নতার সাথে সংঘর্ষের ফলে আবির্ভূত এক ধার্মিকতা। যেকোনও সেক্যুলার পাঠ কেবল সময়েরই অপচয় নয়, বরং তা খুনে জেন্টাইল সংস্কৃতির সাথে মিশে যাওয়ার শামিল। আধুনিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করার প্রয়াসী ইহুদিবাদের যেকোনও ধরন–ধর্মীয়, যায়নবাদী, সংস্কার, রক্ষণশীল বা নিও-অর্থডক্স–অবৈধ।[২৬] সম্প্রতি ইহুদিবাদকে ধ্বংস করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা এক বিশ্বে এমন কোনও আপোসের অবকাশ থাকতে পারে না। প্রকৃত ইহুদিকে অবশ্যই এই জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণভাবে টেক্সটে নিমগ্ন করতে হবে। যুদ্ধোত্তর নতুন *ইয়েশিভোত* মৌলবাদী আধ্যাত্মিকতার মরিয়া ভাবের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে আধুনিকতার সাথে বিধ্বংসী মোকাবিলার পর কেবল পবিত্র টেক্সটই অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ছয় মিলিয়ন ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছে। অগুনতি ধ্রুপদী ইহুদি শিক্ষার সাথে *ইয়েশিভোত* ও হাসিদিক সভাগুলো

AMARBOI.COM

ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে; ঘেটোর জীবনধারা এবং এর সাথে সাথে প্রথাগত অনুসরণের শত বছরের আন্তরিক বিদ্যাও চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে; পবিত্র ভূমি যায়নবাদীদের হাতে দূষিত হয়েছে। ধর্মপ্রাণ ইহুদিরা এখন কেবল ঈশ্বরের সাথে শেষ সম্পর্কটুকু ধরে রাখা টেক্সট আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে।

হলোকাস্টের ধ্বংস তোরাহ পাঠের ধরনকেই পাল্টে দিয়েছিল। ঘেটো বিশ্বে প্রচলিত বহু আচার ও রেওয়াজ 'নির্দিষ্ট' বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল; জীবন যাপনের বা তোরাহ পালনের অন্য কোনও বিকল্প পথ ছিল না। প্রথম প্রজন্মের শরণার্থীদের তখনও এইসব আচার পালন করার জ্ঞান ছিল, কিন্তু নিহত পূর্বপুরুষের হারানো বিশ্বকে নতুন করে গড়ে তুলতে উদগ্রীব তাদের সন্তানসন্ততি ও প্রপৌত্ররা আর সহজাতভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে কখনওই লিখিত রূপে রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি এমন সাম্প্রদায়িক পরিপালন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। অপসৃয়মান তোরাহ উদ্ধার করার একমাত্র উপায় ছিল বিচ্ছিন্ন তথ্যের জন্যে টেক্সটে অনুসন্ধান চালানো। ১৯৫০-র দশক থেকে *ইয়েশিভা*গুলো হলোকাস্ট পূর্ববর্তী ইউরোপে স্বাভাবিক ও প্রচলিত ধারা হিসাবে প্রতীয়মান বিভিন্ন অনুপুঙ্খ ও জটিল বিস্তারিত প্রক্রিয়ার বিজ্ঞ পাণ্ডুলিপিতে ভরে গিয়েছিল। প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পূর্বসুরিদের চেয়ে আরও বেশি হারে এইসব পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করবে।[২৭] বিনাশের ফলে ইহুদি জীবন আরও টেক্সটমুখী ও আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি করে লিখিত শব্দের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল।

মৌলবাদী ইহুদিবাদে এক নতুন কঠোরতা দেখা দিয়েছিল। ১৯৬০-র দশক নাগাদ সেই সময়ের অতিথি বনেই ব্রাক র‍্যাবাই সিমলা এলবার্গ উল্লেখ করেছেন যে, 'গোটা ধর্মীয় জীবনের সম্পূর্ণ সীমানা জুড়ে নিবিড় বিপ্লব' ঘটছে। 'তোরাহ নগরীর' ইহুদিরা আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে অনেক নিষ্ঠার সাথে নির্দেশনা মেনে চলছে।[২৮] পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে আরও পূর্ণাঙ্গভাবে আইন পালনের এই প্রয়াস বীরত্বসূচক: এটা নিষ্ঠুরভাবে ঈশ্বর শূন্য করে তোলা এক বিশ্বে ঈশ্বরকে মূর্ত করে তোলার এক ধরনের উপায়। বনেই ব্রাকের হেরেদিমরা খাদ্য ও পবিত্রতার বিষয়গুলোর মতো বিষয়ে আরও নিষ্ঠ ও সঠিক হওয়ার উপায় বের করার প্রয়াস পাচ্ছিল, যদিও তা তাদের জীবনকে আরও জটিল করে তুলেছিল।

১৯৩০-র দশকে হাযন ইশ এই সুর স্থির করে দিয়েছিলেন, তখন প্রথম বারের মতো প্যালেস্তাইনে পৌঁছেছিলেন তিনি। ধার্মিক যায়নবাদীদের একটা দল জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। বসতিতে ইহুদি কৃষি বিধান মেনে চলতে ইচ্ছুক ছিল তারা, তোরাহ মোতাবেক পবিত্র ভূমিতে খামার স্থাপন করতে চেয়েছে। তার মানে কি আইনে যেমন বিধান দেওয়া হয়েছে, প্রতি সাত বছরে একবার জমিন পতিত

AMARBOI.COM

রাখতে হবে তাদের?[২৯] এই 'সাব্বাতিয় বছর' পালন নিশ্চিতভাবেই দারুণ দুর্ভোগের জন্ম দেবে, এবং তা দক্ষতা সর্বোচ্চ করাই যার লক্ষ্য সেই আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান বিরোধী। বসতিস্থাপনকারীদের জন্যে একটা ফাঁক খুঁজে বের করেছিলেন র‍্যাবাই কুক, কিন্তু হাযন ইশ কঠোরভাবে এই ধরনের শৈথিল্যের *(কুলা)* বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, কষ্টের ভেতরই রয়েছে চ্যালেঞ্জ। আইনের দাবি, কৃষকরা আরও ভালো কিছুর জন্যে তাদের সমৃদ্ধিকে বিসর্জন দেবে। সাব্বাতিয় বছর নির্ধারণ করা হয়েছে ভূমির পবিত্রতা উদযাপন, ইহুদিদের এর অলঙ্ঘনীয়তা সম্পর্কে সজাগ করে তোলার জন্যে এবং সকল পবিত্র বস্তুর মতো এটাও আবিশ্যিকভাবে ব্যক্তির প্রয়োজন ও ইচ্ছা থেকে বিচ্ছিন্ন। ইহুদিদের নিজস্ব লাভের জন্যে ভূমিকে ব্যবহার করা যাবে না, বর্ধিত উৎপাদনশীলতার জন্যে দোহন করা যাবে না বা ব্যয়সংকুলান মূলক ব্যবস্থার অধীন করা যাবে না। সত্যিকারের ধার্মিক কৃষকদের উচিত হবে সেক্যুলার অগ্রগামীদের যৌক্তিক মূলধারাকে চ্যালেঞ্জ করা, এরা 'যায়নবাদী' হতে পারে, কিন্তু তা মোটেই 'ইহুদিসুলভ' নয়।[৩০]

বৃনেই ব্রাকে হাযন ইশ–র‍্যাবাই এলবার্গ যাকে 'হুমরোতের বিশ্ব ('কট্টরপন্থী')' বলে আখ্যায়িত করেছেন–এর নেতৃত্ব দান করছিলেন। শিষ্যদের নির্দেশনা পালনের জন্যে 'সবচেয়ে সীমিতকারী, কঠোর ও যথার্থ' উপায় বের করার শিক্ষা দিয়েছেন তিনি।[৩১] এই অনুশীলন তাদের আধুনিকতার বাস্তববাদী রীতিনীতি থেকে সর্বাত্মকভাবে বিচ্ছিন্ন করবে। এই ধরনের কঠোরতা ইউরোপের প্রথাগত ইহুদি সম্প্রদায়ের রাব্বিনিক প্রতিষ্ঠানের ভ্রুকুটির শিকার হয়েছে। র‍্যাবাইগণ আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে ভাবিত বিবেকবান লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্ত সামগ্রিকভাবে গোটা সম্প্রদায়ের উপর এই কঠোরতা *(হুমরা)* চাপিয়ে দিতে সম্মত ছিলেন না, কারণ তাতে বিভাজন সৃষ্টি হতে পারত। পশু জবাই করার কঠোর মান অনুসরণকারী সম্প্রদায় থেকে আগত ইহুদিরা আরও শিথিলভাবে আইনের ব্যাখ্যাকারী ইহুদিদের সাথে একসাথে মাংস খেতে পারবে না। বাড়াবাড়ি ধরনের কঠোরতা এইসব বিষয়ে ততখানি কঠোর ছিলেন না অতীতের এমন সাধুদেরও বিরাট অসম্মান হবে। র‍্যাবাইগণ তোরাহর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রবণ ছিলেন: আধ্যাত্মিক অভিজাত একটি গোষ্ঠীকে সাধারণ ইহুদিদের পক্ষে অনুসরণ অসম্ভব করে তুলতে দেওয়া যাবে না।[৩২]

বৃনেই ব্রাকের বিপ্লবী কঠোরতা ছিল হেরেদিমের নতুন প্রতি-সংস্কৃতির সৃষ্টির প্রয়াসের অংশ। এটা দক্ষতা ও বাস্তবাদীতাকে মূল মানদণ্ডে পরিণতকারী আধুনিকতার যৌক্তিক চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত এক ধর্মীয় মানদণ্ড স্থাপন করেছিল। সংস্কার, রক্ষণশীল ও নিও-অর্থডক্স ইহুদিরা আইনের কোনও একটা অংশ বিসর্জন

দিচ্ছে বা আরও শিথিল ও যৌক্তিক জীবনের সন্ধান করছে, এমন একটা সময়ে হেরেদিমদের অধিকতর কঠোর পরিপালন মূলধারার সমাজের রেওয়াজের সাথে আপোসে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ব্নেই ব্রাক সফরের সময় র‍্যাবাই এলবার্গ লক্ষ করেছিলেন যে, এটা 'নিজেই এক বিশ্বে' পরিণত হয়েছে;[৩৩] হেরিদি ইহুদিরা আধুনিক সমাজ থেকে কেবল প্রত্যাহৃতই হচ্ছে না, বরং অন্য কম নিয়মনিষ্ঠ ইহুদিদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ওদের ভিন্ন কসাইয়ের প্রয়োজন হচ্ছিল, কোশার খাবার সম্পর্কে গোঁড়া দোকান ও নিজস্ব আচরিক স্নানের প্রয়োজন হচ্ছিল। সময়ের মেজাজের বিপরীতে ভিন্ন পরিচয় গড়ে তুলছিল তারা।

একইভাবে *ইয়েশিভোতে* ইহুদিরা সেক্যুলার কলেজের ছাত্রদের মতো পরে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মতো তথ্যের জন্যে তোরাহ পাঠ করছিল না। তোরাহর বহু আইন, যেমন মন্দিরের আচার বা পশুবলী সম্পর্কিত বিধিবিধানসমূহ বাস্তবায়নযোগ্য ছিল না; টর্টস ও ক্ষয়ক্ষতির বিধান মেসায়াহ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর হয়তো পুনর্বহাল করা যাবে। তারপরেও ছাত্ররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনকি বছর পর্যন্ত তাদের শিক্ষকদের সাথে আপাত অচল হয়ে যাওয়া বিধিবিধান পাঠে কাটিয়ে দিয়েছে, কারণ এগুলো ঈশ্বরের আইন। ঈশ্বর–কোনওভাবে–সিনাই পাহাড়ের চূড়ায় মোজেসকে আইন প্রদানের সময়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেই হিব্রু শব্দের পুনরাবৃত্তি ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের একটা উপায়। আইনের প্রতিটি বিষয় অনুসন্ধান ছাত্রকে প্রতীকীভাবে ঈশ্বরের মনে প্রবেশে সক্ষম করে তোলে। ভীতিকরভাবে স্বর্গীয় আইন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া একটা সময়ে ইহুদিরা আগের চেয়ে বেশি করে যথার্থভাবে এর পরিপালন করবে। নিজেকে অতীতের মহান র‍্যাবাইদের আইনি মতামতের সাথে পরিচিত করে তোলা ছাত্রের পক্ষে ঐতিহ্যকে মনে-প্রাণে আপন করে নেওয়ার ও সাধুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একটা উপায়। *ইয়েশিভোতে* পাঠ পদ্ধতি উপকরণের মতোই জটিল ছিল। *ইয়েশিভা* শিক্ষার উদ্দেশ্য এই বিশ্বের বিরাট কোনও সুবিধা লাভ নয়, বরং ঈশ্বরকে ত্যাগের প্রয়াসী এক বিশ্বে স্বর্গীয় সত্তার অনুসন্ধান। *ইয়েশিভা* জগতের সব কিছুই বস্তুজগতের থেকে আলাদা। মূলধারার সমাজে পুরুষ (১৯৫০-র দশকে তখনও প্রধান লিঙ্গ বিবেচিত) ব্যবসার কাজে ঘরের বাইরে যায়, আর নারী ঘরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। হেরেদিমদের মধ্যে নিম্নতর লিঙ্গই *গোয়িম*রা যাকে 'প্রকৃত' জাগতিক বিষয় বলে থাকে সেখানে অংশ নেয় (আভাসে এর গৌণ মর্যাদা ঘোষণা করে), অন্যদিকে পুরুষরা *ইয়েশিভায়* প্রকৃত বাস্তবতার সাথে সীমাবদ্ধ সুরক্ষিত জীবন যাপন করে। সেক্যুলার ইসরায়েলে সেনাবাহিনী প্রায় পবিত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছিল, উভয় লিঙ্গের পক্ষেই জাতীয় সেবা বাধ্যতামূলক ছিল, একজন পুরুষ কর্মময় জীবনের

গোটা সময় তার সেনা ইউনিটের অধীনে থাকবে। অবশ্য একজন *ইয়েশিভা* ছাত্র সামরিক চাকরি থেকে অব্যহতি লাভ করে, ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)-এর প্রতি পিঠ ফিরিয়ে নিজেকে ইসরায়েলি জাতির প্রকৃত 'অভিভাবক' ঘোষণা করে এবং চারপাশ থেকে *ইয়েশিভার* উপর আগ্রাসীভাবে এগিয়ে আসা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথম কাতারে অবস্থান করার কথা ঘোষণা করে।[৩৪]

হেরেদিমের কাছে আধুনিকতা–এমনকি ইসরায়েলে রাষ্ট্রেও–স্রেফ নির্বাসন, বিচ্ছিন্নতা ও ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরত্ব গালুতের সর্বশেষ অবস্থা। হলোকাস্ট এর আবিশ্যিক বৈরিতা তুলে ধরেছিল। এমন এক জগতে একজন ইহুদির স্বস্তি বোধ করার কথা নয়, যদিও বিপরীত দিক থেকে ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুজায়গাতেই তোরাহ শিক্ষা উদারভাবে অর্থসংস্থান এবং আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি বিকাশ লাভ করছিল। ছাত্রদের অবশ্য সেক্যুলার বিশ্ব থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। একজন হেরেদি শিক্ষক যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, *ইয়েশিভা* কেবল তরুণদের 'তোরাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যেরই শিক্ষা' দেয়নি, বরং 'এই বিশ্ব থেকে দূরত্ব বজায় রাখার পদ্ধতির শিক্ষা দিয়েছে।'[৩৫] *ইয়েশিভার* প্রাচীরগুলো তোরাহ যে কোনওদিনই গালুতে স্বস্তি বোধ করতে পারে না তারই স্মারক। ছাত্রদের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্নতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই প্রতি-সংস্কৃতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। *এডুকেশন ইন দ্য ফেস অভ দ্য জেনারেশন*-এ (১৯৫৪) আব্রাহাম উল্ফ যেমন উল্লেখ করেছেন, সেক্যুলারিস্টদের নিস্পৃহতা সত্ত্বেও *ইয়েশিভা* ইহুদি বাপ-দাদার জগৎকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্বে নিবেদিত। 'একাজে আমরা একা। আমরা আমাদের চারপাশের সবার চেয়ে ভিন্ন। সংস্কার ইতিহাসবিদগণ, কবি [অন্যরা তাদের মহান ব্যক্তি মনে করে]।' এমনকি ইহুদি রাষ্ট্রেও হেরেদিম বিচ্ছিন্ন। 'পথঘাটের নাম রাখা হয়েছে ঐতিহসিক চরিত্রের নামে, আমরা যাদের একেবারেই নেতিবাচক আলোয় দেখি। আমরা একা।'[৩৬]

যৌক্তিক আধুনিকতার বিরুদ্ধে হেরেদি বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে পিছু হটায় সৃষ্ট। কিন্তু এই সময়ে রাশিয়ায় হাবাদ *ইয়েশিভায়* দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গী মানসিকতাকে লালনকারী লুবাভিচ হাসিদিম আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। বলশেভিকরা কার্যত রাশিয়ায় হাবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। ইহুদি স্কুল ও *ইয়েশিভাগুলো* বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তোরাহ পাঠকে প্রতিবিপ্লবী হিসাবে নিন্দা জানানো হয়েছে, উপেক্ষা করার মানে ছিল উপবাস, কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ড। ষষ্ঠ রেব্বে (জোসেফ ইসাক শ্নিয়ারসন, ১৮৮০–১৯৫০) এইসব ব্যবস্থাকে কেবল 'মেসায়াহর জন্ম বেদনা' হিসাবেই দেখেছিলেন। ধার্মিকের এই জগৎ থেকে প্রত্যাহারই যথেষ্ট নয়;

হাসিদিমকে অবশ্যই ঈশ্বরের জন্যে এই আধুনিক বিশ্বকে অধিকার করে নিতে হবে। রাশিয়ায় রেব্বে একটি ইহুদি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন, এখানে হাবাদ *ইয়েশিভার* স্নাতকদের তোরাহ ও তালমুদের ক্লাস করানো হত। তরুণ ইহুদিদের সারা বিশ্বের লুবাভিচদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে নতুন যোগাযোগ কৌশল শিক্ষা দেওয়া হত। হিটলারের কাছ থেকে পালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসতে বাধ্য হওয়ার পর রেব্বে মিশন অব্যাহত রাখেন ও নতুন বিশ্বে মিশে যাওয়া বা নিজেদের উন্মূল মনে করা ইহুদিদের ফিরিয়ে আনার অভিযানে নামেন। প্রত্যাহারের বদলে এটা ছিল হাত বাড়ানো। ১৯৪৯ সালে রেব্বে কফার ইসরায়েলে প্রথম হাসিদিক বসতি হাবাদ প্রতিষ্ঠার এক দর্শনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যায়নবাদের প্রতি বৈরিতা একবিন্দুও কমাননি তিনি, বরং বিশ্বাস করেছিলেন যে শেষের এই কালে তাঁর কর্মকাণ্ডকে অবশ্যই ইসরায়েলের অপবিত্র ভূমির ইহুদিদের কাছে পৌঁছাতে হবে।[৩৭]

১৯৫০ সালে রেব্বে পরলোক গমন করলে তাঁর মেয়েজামাই র‍্যাবাই মেনাচেম মেন্দেল শ্নিয়ারসন (১৯০৪–৯৪) উত্তরাধিকারী হন। এটা ছিল এক বিস্ময়কর পরিবর্তন, সেক্যুলার বিশ্বকে পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাঁকে আলিঙ্গন করার হাবাদের ইচ্ছাকেই তুলে ধরতে হবে যাকে। সপ্তম রেব্বে *ইয়েশিভায়* শিক্ষিত ছিলেন না, আধুনিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি। বার্লিনে ইহুদি দর্শনে ও সর্বোর্নে মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেছেন। ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর নৌবাহিনীর পক্ষে কাজ করেছেন, কিন্তু শ্বশুরের কাজেও সাহায্য করেছিলেন। এই রেব্বে আধুনিক বিশ্বের সৃষ্টি ছিলেন, সারা বিশ্বের সকল ইহুদিকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে দক্ষ প্রচারমাধ্যমের প্রচারণা চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। এখন কেবল *ইয়েশিভা* ছাত্ররাই রেব্বের সেনাদলের সৈনিক হবে না, বরং প্রতিটি হাবাদ ইহুদি এই দায়িত্ব পাবে।[৩৮] সর্বত্রে তাঁর অভিজান পরিকল্পনা করেছিলেন রেব্বে। ১৯৭০-র দশকে সেক্যুলারাইজেশন ও মিশ্রণের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক পাল্টা আক্রমণের সূচনা করেছিলেন তিনি। দূরবর্তী শহরে বসতি স্থাপন করার জন্যে হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে লুবাভিচে পাঠানো হবে যেখানে ইহুদিরা হয় সম্পূর্ণ সেক্যুলারাইজড হয়ে গেছে বা সংখ্যালঘু হিসাবে বাস করছে। এই বাড়িটি হবে ইহুদিবাদের বিভিন্ন তথ্যের যোগান দেওয়া একটি 'ড্রপ-ইন' সেন্টার যা সাব্বাথের আয়োজন করবে ও উৎসবের অনুষ্ঠান করবে, লেকচার ও ক্লাস নেবে। অন্য তরুণ হাসিদিমদের পাঠানো হবে আমেরিকার ক্যাম্পাস ও রাস্তায়, যেখানে তারা পথে দেখা পাওয়া ইহুদিদের সাথে পরিচিত হয়ে *তেফেলিন* পরা বা প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করার মতো যেকোনও একটি নির্দেশনা প্রকাশ্যে পালনে সম্মত করাবে। এই আচার প্রত্যেক

AMARBOI.COM

ইহুদির হৃদয়ে প্রোথিত স্বর্গীয় 'স্ফুলিঙ্গ' স্পর্শ করে তার আবিশ্যিক পবিত্রতাকে জাগিয়ে তুলবে বলে ধারণা করা হয়েছিল।[৩৮]

রেব্বে এই জগতেই স্বস্তি বোধ করেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হাবাদ হাসিদিমের প্রাচীন জ্ঞানের সাথে সহাবস্থান করে। মেরিন বায়োলজিতে তাঁর শিক্ষা স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গের দর্শন থেকে তাঁকে বিচ্যুত করেনি; তিনি এক শক্তিশালী মেসিয়ানিজম গড়ে তুলবেন এবং ষষ্ঠ রেব্বের সাথে ঐশ্বরিক সম্পর্ক থাকার দাবি করে হাবাদের নেতৃত্বে নির্বাচিত হবেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতায় *লোগোস* ও *মিথোস* অন্তর্দৃষ্টির সম্পূরক উৎস। তিনি বাইবেলকে যেকোনও প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীর মতোই আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন, বিশ্বাস করতেন ঠিক ছয় হাজার বছর আগে ঈশ্বর মাত্র ছয় দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আবার এও বিশ্বাস করতেন যে, দেহ ও মনের সম্পর্ক বা বস্তু ও শক্তির ভেতরকার সম্পর্ক নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ মানবজাতিকে বাস্তবতার মৌলিক ঐক্যের এক নতুন উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যা শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদের প্রতি উন্মুখ করে তুলবে।[৩৯] তাঁর ব্যাপক প্রচারণা আধুনিক ভাবধারায় পরিকল্পিত ছিল। কীভাবে নিজের সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে এবং সেক্যুলারাইজড নারী-পুরুষের সাথে কথা বলতে হবে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। তবে মনে হয় হাবাদের পুরাণ ও অতীন্দ্রিয়বাদ লুবাভিচকে আত্মরক্ষামূলকভাবে পিছু না হটে, জগতের দিকে অগ্রসর হওয়ার আত্মবিশ্বাসের যোগান দিয়েছিল। সাম্প্রতিক রেব্বেরা আলোকনের চেতনা থেকে পিছু হটে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম রেব্বে ও হাবাদের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর হাসিদিমকে তাঁদের কালের পৃথিবী সম্পর্কে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চায় সাহায্য করেছেন। অতীন্দ্রিয়বাদী প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক ক্ষমতা ব্যবহার করে ঠিক খোদ যালমানের মতোই সপ্তম রেব্বে যেন এই আদি চেতনায় ফিরে গিয়েছিলেন। হাবাদ পবিত্র ও অপবিত্রের আধুনিক বিচ্ছিন্নতা গ্রহণে অস্বীকার গেছে। যত জাগতিক ও তুচ্ছই হোক না কেন, সব কিছুই স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ ধারণ করে। 'সেক্যুলার ইহুদি' বলে কেউ নেই, এমনকি *গোয়িমের*ও সম্ভাব্য পবিত্রতা রয়েছে। জীবনের শেষ দিকে অন্তিম কাল আসন্ন বিশ্বাস করে রেব্বে আমেরিকার জেন্টাইলদের উদ্দেশে প্রচারাভিযানে নেমেছিলেন, তিনি স্বীকার করেছিলেন ইহুদিদের প্রতি ভালো ছিল তারা। লুবাভিচ আধুনিক কালে দারুণ ভুগেছে, কিন্তু রেব্বে তাদের গালুতকে সম্পূর্ণ দানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, প্রতিশোধ ঘৃণার ফ্যান্টাসি লালন না করে বিশ্বকে এমন একটি স্থান হিসাবে কল্পনা করতে বলেছেন যেখানে ঐশী সত্তাকে নতুন করে সূচিত করতে পারবে তারা।[৪০]

AMARBOI.COM

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা শেষ পর্যন্ত তাদের পরাস্তকারী আধুনিকতার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের সূচনা করবে, কিন্তু বর্তমান আলোচিত কালে তারা হেরেদি ইহুদিদের মতো নিজস্ব আত্মরক্ষামূলক প্রতি-সংস্কৃতি গড়ে তুলছিল। স্কোপস ট্রায়ালের পর প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা সাধারণ বলয় থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে নিজস্ব গির্জা ও কলেজে আশ্রয় নিয়েছিল। উদার ক্রিশ্চানরা ধরেই নিয়েছিল যে, মৌলবাদী সংকটের অবসান ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ নাগাদ মৌলবাদী দলগুলোকে যেন তাৎপর্যহীন প্রান্তিক গোষ্ঠী মনে হচ্ছিল। মূলধারার গোষ্ঠীগুলোই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্বাসীদের আকর্ষণ করছিল। কিন্তু অদৃশ্য হওয়ার বদলে মৌলবাদীরা স্থানীয় পর্যায়ে শেকড় বিস্তার করছিল। মূল-ধারার গোষ্ঠীতে তখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৌলবাদী রয়ে গিয়েছিল; উদারপন্থীদের বহিষ্কারের সকল আশা হারিয়ে বসলেও 'মৌলবিষয়ে' বিশ্বাসকে বিসর্জন দেয়নি তারা, সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। অতি-রেডিক্যাল, বিশেষ করে তুরীয় আনন্দের জন্যে অপেক্ষা করার সময়টুকুতে নিজেদের ঈশ্বরবিহীন উদারপন্থীদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা পবিত্র দায়িত্ব বলে বিশ্বাসকারী প্রিমিলেনিয়ানরা নিজস্ব চার্চ গঠন করে। এক নতুন প্রজন্মের ইভাঞ্জেলিস্টদের পরিকল্পনায় নতুন সংস্থা ও নেটওয়ার্ক গঠন করতে শুরু করেছিল তারা। ১৯৩০ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশটি মৌলবাদী বাইবেল কলেজ ছিল। মন্দার বছরগুলোতে আরও ছত্রিশটি কলেজ স্থাপন করা হয়। ইলিনয়ের মৌলবাদী হুইটন কলেজ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত বিকাশ লাভকারী উদারপন্থী আর্ট কলেজ। মৌলবাদীরাও তাদের নিজস্ব প্রকাশনা ও প্রচারণা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ১৯৫০-র দশকে টেলিভিশনের আগমন ঘটলে তরুণ গ্রাহাম, রেক্স হামবার্দ ও ওরাল রোবার্টস পুরোনো ভবঘুরে যাজকদের স্থান দখল করে 'টেলিভেঞ্জালিস্ট' হিসাবে মিনিস্ট্রি চালু করেন।[৪১] এক বিশাল আপাত অদৃশ্য প্রচারণা নেটওয়ার্ক সারা দেশের মৌলবাদীদের সংযুক্ত করেছিল। নিজেদের তারা বহিরাগত ভেবেছে, কিন্তু তাদের নতুন কলেজ ও টেলিভিশন কেন্দ্রগুলো বৈরী বিশ্বে তাদের আবাসের ব্যবস্থা করেছিল।

প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীদের নির্মিত এই প্রতি-সংস্কৃতিতে তাদের কলেজগুলো ছিল চারপাশের অপবিত্রের মাঝে নিরাপদ পবিত্র ছিটমহল। বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে

AMARBOI.COM

পবিত্রতা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছিল তারা। ফ্লোরিডায় ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার গ্রিনভিলে চূড়ান্ত আবাস পাওয়ার আগে টেনেসিতে স্থানান্তরিত বব জোনস ইউনিভার্সিটি নতুন মৌলবাদী প্রতিষ্ঠানের রীতিকে মূর্ত করে তুলেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের তরুণ ইভাঞ্জেলিস্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, কিন্তু একটি নিরাপদ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি যা তরুণদের নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তাদের বিশ্বাস রক্ষায় সাহায্য করবে; তিনি বিশ্বাস করতেন নাস্তিক্যবাদ সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আবৃত্ত করে রেখেছে।[৪২] উদার শিল্পকলার পাশাপাশি ছাত্রদের 'সাধারণ জ্ঞানের' ক্রিশ্চান ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হত। প্রত্যেক সেমিস্টারে প্রত্যেককে অন্তপক্ষে একটি বাইবেল কোর্স নিতে হত, চ্যাপেলে যোগ দিতে হত এবং পোশাক, সামাজিক মেলামেশা ও সাক্ষাতের কঠিন নিয়মসহ 'ক্রিশ্চান' জীবনধারা মোতাবেক চলতে হত। অমান্যকরণ ও অনুগত্যহীনতা, বব জোন্স জোরের সাথে বলেছেন, 'ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ' এবং তা সহ্য করা হত না।[৪৩] কর্মচারী ও ছাত্রদের সমানভাবে নিয়ম মেনে চলতে হত। বব জোনস ইউনিভার্সিটি নিজেই ছিল একটা ভিন্ন জগৎ: সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানের সাথে আপোস পাপ বিশ্বাস করে একাডেমিক এক্রিডিশন না নেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল একে।[৪৪] এই বিসর্জন বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ভর্তি, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও লাইব্রেরির সম্পদ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম করে তুলেছিল।

এই শৃঙ্খলাটুকু জরুরি ছিল, কারণ বিজেইউ-ছাত্রদের জানা ছিল যে তারা যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। একটি সাম্প্রতিক আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্যাটালগ যেমন ব্যাখ্যা করেছে, এই স্কুল 'ঐশীগ্রন্থের উপর সকল নাস্তিক্যবাদী, সংশয়বাদী ও মানবতাবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে'; সকল 'তথাকথিত আধুনিকতাবাদী,' 'উদার,' ও 'নিও অর্থডক্স' অবস্থান ও 'নব্য ইভাঞ্জেলিস্টদের অ-ঐশীগ্রন্থীয় আপোস ও 'ক্যারিশম্যাটিকদের অ-ঐশীগ্রন্থীয় অনুশীলনের বিরুদ্ধে।'[৪৫] ছাত্র ও কর্মচারীরা ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা ও প্রতিপক্ষের উপর হামলা শানাতে জগৎ হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই 'বিচ্ছিন্নতা', বব জোন্সের ছেলের (দ্বিতীয় বব জোন্স) মতে 'মৌলিক সাক্ষী ও সাবুদের একান্ত ভিত্তি।'[৪৬] বিশ্বাসের এই ঘাঁটি থেকে ছাত্ররা 'ধর্মের শত্রুদের আক্রমণ করার মাধ্যমে'[৪৭] 'বাইবেলিয় কর্তৃত্ব ও ভ্রান্তিহীনতার' পক্ষে উগ্রভাবে লড়াই করবে। আমেরিকার একাডেমিয়ার উপর বিজেইউ-র সামান্যই প্রভাব ছিল, তবে ক্রিশ্চান জাতির উপর এর প্রভাব ব্যাপক। বব জোন্স ইউনিভার্সিটি দেশের মৌলবাদী শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় যোগানদাতায় পরিণত হয়েছে; গ্র্যাজুয়েটেরা উদার শিক্ষার জন্যে না হলেও তাদের আত্মসংযমের জন্যে পরিচিত।

AMARBOI.COM

এই বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত বাইবেল কলেজ ও মৌলবাদী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হেরেদি *ইয়েশিভার* মতো বিচ্ছিন্ন দুর্গ ছিল। মৌলবাদীরা মনে করেছে তাদের ধর্ম বিশ্বাস বিপদাপন্ন; আমেরিকান জীবনধারার কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাদের, নিজেদের 'দরজার ওপাশের' লোক হিসাবে দেখার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৪৮] উগ্রতা গভীরতর ক্রোধ প্রকাশ করে। এই বছরগুলোয় জনসংখ্যার সবচেয়ে প্রান্তিকায়িত অংশের ভীতি, ঘৃণা ও কুসংস্কারের অনেকটাই ভাষা দেওয়া অধিকতর চরমপন্থী ক্রিশ্চানদের উচ্চারণে তা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯২০-র দশকে বিবর্তনের শিক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে ডিফেন্ডার্স অভ ক্রিশ্চান ফেইথের সংগঠক ব্যাপ্টিস্ট জেরাল্ড উইনরড ১৯৩০-র দশকে নাৎসি জার্মানি সফর করে আমেরিকান জনগণের কাছে 'ইহুদি ভীতি' প্রমাণ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফিরে আসেন। একই সময়ে তিনি রুজভেল্টের 'জুইশ নিউ ডিল'কে শয়তানীসুলভ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। কার্ল ম্যাকইন্টায়ার ও বিলি জেমস হারগিসের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব রকম 'উদারনৈতিক' প্রবণতার বিরোধিতা করেন উইনরড। মৌলাবাদীরা সেক্যুলারিস্ট বা ক্রিশ্চান যে ধরনেরই হোক না কেন 'প্রকৃত' ক্রিশ্চানদের প্রান্তিক মর্যাদার কারণে উদারপন্থীদের নিন্দা করেছে। রাজনৈতিক ডানপন্থার দিকে সরে যেতে শুরু করেছিল তারা। উনবিংশ শতাব্দীতে ইভাঞ্জেলিকালরা দেশপ্রেমকে বহুঈশ্বরবাদীতা মনে করেছে। এখন আমেরিকান জীবনধারার পক্ষে দাঁড়ানো পবিত্র দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। কমিউনিস্ট বিরোধী মিনিস্ট্রি ক্রিশ্চান ক্রুসেডের প্রতিষ্ঠাতা হারগিস সোভিয়েত ইউনিয়নকে দানবীয় মনে করেছেন, তিনি তাঁর চোখে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন লড়াই করে গেছেন: উদার সংবাদপত্র, বামপন্থী শিক্ষক এবং সুপ্রিম কোর্টসহ সকলে তাঁর চোখে আমেরিকাকে 'লাল'-এ পরিণত করার ষড়যন্ত্রেরই অংশ ছিল। বাইবেল প্রেসবিটারিয়ান চার্চ অ্যান্ড দ্য ফেইথ থিওলজিক্যাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রেসবিটারিয়ান চার্চ থেকে বের হয়ে আসা কার্ল ম্যাকইন্টায়ার সর্বত্র গোপন শত্রুর দেখা পেয়েছেন। খোদ মূলধারার গোষ্ঠীগুলোই আমেরিকায় ক্রিশ্চান ধর্মকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ। ১৯৫০-র দশকে জোসেফ ম্যাককার্থির সাথে কমিউনিস্ট বিরোদী ক্রুসেডে যোগ দেন ম্যাকইন্টায়ার। টিপিক্যাল ছিলেন না এই চরমপন্থীরা, বরং প্রভাবশালী ছিলেন। ১৯৩৪ সাল নাগাদ প্রায় ৬,০০,০০০ লোক উইনরডের *ডিফেন্ডার ম্যাগাজিনের* গ্রাহক হয়েছিল; ১২০,০০০ জন ম্যাকইন্টায়ারের *ক্রিশ্চান বীকন* গ্রহণ করেছিল। রেডিও অনুষ্ঠান *টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ক্রিশ্চান আওয়ারের* মাধ্যমে ম্যাকইন্টায়ার আরও হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘৃণার ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস করে না এমন সকল ক্রিশ্চান এবং

AMARBOI.COM

অজ্ঞদের কাছে দয়াময় ও ক্রিশ্চান মনে হতে পারে কিন্তু আসলে যারা 'নাস্তিক্যবাদী, কমিউনিস্ট ভাবধারার, বাইবেলকে পরিহাসকারী, রক্ত-ঘৃণাকারী, মুখখিস্তিকারী, যৌন শৃঙ্খলিত সবুজ চোখ দানবের সন্তান'[৪৯] সকল উদার যাজকের নিন্দা করা হয়েছে।

মৌলবাদ ক্রোধের ধর্মে পরিণত হচ্ছিল, কিন্তু হেরেদি ইহুদিবাদের মতো এই ক্রোধ ছিল গভীর ভীতিতে প্রোথিত। এই সময়ের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়া প্রিমিলেনিয়ালিজমে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাগাদ কেবল প্রিমিলেনিয়ালিস্টরাই নিজেদের 'মৌলবাদী' আখ্যায়িত করেছিল; বিলি গ্রাহামের মতো অন্য রক্ষণশীল ক্রিশ্চানরা নিজেদের 'ইভাঞ্জেলিস্ট' বলতেই পছন্দ করতেন: এই পচা সভ্যতার আত্মাকে রক্ষা করার দায়িত্ব ধর্মীয় বিশ্বাস যাই হোক না কেন অন্য ক্রিশ্চানদের সাথে কিছু মাত্রার সহযোগিতা দাবি করে। অবশ্য মৌলবাদীদের মূলধারা বিচ্ছিন্নতা ও ভিন্নতার উপরই জোর দিয়ে গেছে।[৫০] যুদ্ধের বছরগুলো যেন উদারপন্থীদের পোস্টমিলেনিয়াল আশাবাদ তিরোহিত হয়েছে বলে মনে হয়েছে; মৌলবাদীরা নতুন জাতিসংঘ-কে পুরোনো লীগ অভ নেশনস-এর মতোই নেতিবাচক আলোকে দেখেছে। এটা পৃথিবীকে অ্যান্টিক্রাইস্টের স্বৈরাচার ও আসন্ন দুর্ভোগের জন্যে প্রস্তুত করবে। বিশ্বশান্তি বলে কিছু থাকবে না। 'বাইবেল এই ধরনের ইউটোপিয় স্বপ্নের বিরোধিতা করে,' ১৯৪২ সালে লিখেছেন হারবার্ট লকিয়ার। 'এটাই শেষ যুদ্ধ নয়। বর্তমান ভয়াবহতা আসলে আরও ভয়ঙ্কর কষ্টের জন্ম দেওয়া বীজমাত্র।'[৫১] উদারপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির একেবারেই বিপরীত ছিল এটা। আমেরিকায় আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে অপারগ 'দুই জাতি' ছিল। প্রিমিলেনিয়াল দর্শন মৌলবাদীদের যারপরনাই অসহায়ত্বের বোধের সাক্ষ্য দেয়। তাদের বিশ্বাস ছিল পারমাণবিক বোমা ছিল সেইন্ট পিটারের ভবিষ্যদ্বাণী, যিনি আভাস দিয়েছিলেন যে, অন্তিমকালে 'সগর্জনে আকাশ অদৃশ্য হয়ে যাবে, নানা উপাদান আগুন ধরে ছিনভিন্ন হবে, পৃথিবী ও এর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত কিছু জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে।'[৫২] চূড়ান্ত হলোকাস্ট এড়ানোর কোনওই আশা নেই, ১৯৪৫ সালে *ইটারনিটি ম্যাগাজিনে* ভাবনা প্রকাশ করেছেন ডেভিড গ্রে বার্নহাউস: 'ঐশী পরিকল্পনা অনিবার্য বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।' বেস্টসেলার *দ্য অ্যাটোমিক এজ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড* অভ গড-এ (১৯৪৮) মৌলবাদী লেখক উইলবার স্মিথ যুক্তি দেখিয়েছেন, বোমা প্রমাণ করেছে যে, অক্ষরবাদীরা আগাগোড়াই সঠিক ছিল।[৫৩] ঐশীগ্রন্থে পারমাণবিক বোমার সঠিক পূর্বাভাস দেখিয়েছে যে বাইবেল আসলেই নির্ভুল এবং একে এর সহজ অর্থেই পাঠ করতে হবে।

AMARBOI.COM

তারপরেও এই অদৃষ্টবাদী দৃশ্যপট আবার মূলধারার সংস্কৃতির কারণে নিজেদের ঘৃণিত ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন বোধকারী মৌলবাদীদের এক ধরনের আত্মবিশ্বাস ও প্রাধান্যের বোধ যুগিয়েছে। তাদের কাছে ছিল সেক্যুলারিস্ট বা উদারপন্থী ক্রিশ্চানদের বঞ্চিত করা বাড়তি সুবিধাজনক তথ্য, তারা জানে আসলে কী ঘটছে। বিংশ শতাব্দীর বিপর্যয়কর ঘটনাপ্রবাহ আসলে ক্রাইস্টের চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে পরিচালিত করছে। তাছাড়া, পারমাণবিক হলোকাস্ট সত্যিকারের বিশ্বাসীদের ক্ষতি করবে না, কারণ আমরা যেমন দেখেছি, তারা নিশ্চিত ছিল, সমাপ্তির আগে তাদের তুরীয় আনন্দের মাধ্যমে স্বর্গে তুলে নেওয়া হবে। কেবল ধর্মদ্রোহী ও অবিশ্বাসীরাই এইসব চূড়ান্ত শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং গস্পেলের মৌল চেতনার সাথে খাপ খায় না এমন প্রতিশোধের ফ্যান্টাসি লালন করার সুযোগ করে দিয়ে মৌলবাদীদের অনুভূত অসন্তোষকে ইন্ধন যোগানোই ছিল প্রিমিলেনিয়ালিজম। নতুন ইসরায়েল রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের আপাত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেও স্ববিরোধিতা ছিল।

প্রিমিলেনিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠাতা জন ডারবির দর্শনে ইহুদি জাতিই ছিল মূল বিষয়। মৌলবাদীরা ১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণায় শিহরিত হয়েছিল ও ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রকৃত সৃষ্টিকে মৌলবাদী যাজক জেরি ফলওয়েল কর্তৃক 'জেসাস ক্রাইস্টের পুনরাগমনের একক মহান লক্ষণ' হিসাবে দেখা হয়েছিল; বেন গুরিয়নের ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়ার তারিখ ১৪ই মে, ১৯৪৮-কে জেসাসের স্বর্গারোহণের পর ইসরায়েলের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে দেখেছেন তিনি।[৫৪] ইসরায়েলের পক্ষে সমর্থন দান বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে; ইসরায়েলের ইতিহাস মানুষের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে, চিরকাল ঈশ্বর স্বয়ং তা নির্ধারণ করে আসছেন। ইহুদিরা পবিত্রভূমিতে বাস না করলে ক্রাইস্ট ফিরে আসতে পারবেন না, সূচনা হতে পারবে না অন্তিমকালের।[৫৫]

প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা উৎসাহী যায়নবাদী হলেও তাদের দর্শনের একটা অন্ধকার দিক ছিল। জন ডারবি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, অন্তিম কালে অ্যান্টিক্রাইস্ট প্যালেস্তাইনে বসবাসকারী দুই তৃতীয়াংশ ইহুদিকে হত্যা করবে: যাকারিয়াহ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; এবং এমনি অন্যসব ভবিষ্যদ্বাণীর মতো তাঁর বক্তব্যকেও আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।[৫৬] মৌলবাদীদের কেউ কেউ হলোকাস্টকে ইহুদিদের পরিবর্তন করার ঈশ্বরের শেষ প্রয়াস হিসাবে দেখেছে এবং দুঃসময়ের পূর্ব নজীর মনে করেছে। *ইসরায়েল অ্যান্ড প্রফিসি*-তে দ্রুতপ্রজ মৌলবাদী লেখক জন ভালভুর্দ ভবিষ্যদ্বাণীর সমাবেশের উপর ভিত্তি করে ইহুদিদের এই চূড়ান্ত নির্যাতনের বিস্তারিত সময়সূচি তুলে ধরেছেন। অ্যান্টিক্রাইস্ট ইহুদিদের মন্দির

AMARBOI.COM

নির্মাণে সাহায্য করবে, অনেককেই নিজেকে মেসায়াহ বিশ্বাস করাতে সক্ষম হবে; কিন্তু তারপর নতুন মন্দিরে উপাসনার বস্তু হিসাবে নিজের প্রতিমা স্থাপন করবে। এই ধর্মদ্রোহের পর ১৪৪,০০০ ইহুদি অ্যান্টিক্রাইস্টকে প্রত্যাখ্যান করবে, আবার ফিরে আসবে ক্রিশ্চান ধর্মে, শহীদ হিসাবে প্রাণ হারাবে। অ্যান্টিক্রাইস্ট এরপর জঘন্য নিপীড়ন শুরু করবে, বিপুল সংখ্যায় মারা যাবে ইহুদিরা। জেসাসকে তাঁর দ্বিতীয় আগমনে স্বাগত জানানোর জন্যে মাত্র অল্প কয়েকজন রেহাই পাবে।[২৭] একইসময়ে প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা নতুন ইসরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টি উদযাপন করার পাশপাশি অন্তিমকালে চূড়ান্ত গণহত্যার ফ্যান্টাসিও লালন করছিল। ইহুদি রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করেছে কেবল ক্রিশ্চানদের আরও পূর্ণতা দান করার জন্যে। শেষ কালে ইহুদিদের নিয়তি অনন্যভাবে বিষণ্ন, কারণ ক্রাইস্টকে গ্রহণ করুক বা না করুক তারা অভিশপ্ত। আমেরিকান প্রোটেস্ট্যান্টরা ইহুদিদের মতো নির্যাতিত না হলেও তাদের আধুনিকতার দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল অন্ধকার ও অভিশপ্ত। আধুনিক বিশ্বের যৌক্তিক চেতনার প্রতি সাড়া হিসাবে ঐশীগ্রন্থ পাঠের নিজস্ব আক্ষরিক ও 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল তারা। তারপরও বিশ্বাসীদের সহানুভূতির মৌল শিক্ষা চর্চায় সাহায্য করাই প্রকৃত ধর্মীয় দর্শনের পরীক্ষা হলে (বুক অভ রেভেলেশনে না হলেও গস্পেল ও সেইন্ট পলের চিঠিপত্রে এই শিক্ষা নিহিত) প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদ যেন ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে ঠিক স্কোপস ট্রায়ালে এর বিজ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ প্রমাণিত হওয়ার মতোই ব্যর্থ হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষেই, বাইবেলের দারুণভাবে নির্বাচিত অনুচ্ছেদের আক্ষরিক পাঠ তাদের আধুনিকতার ঈশ্বরহীন গণহত্যামূলক প্রবণতাকে আত্মস্থ করতে উৎসাহিত করেছিল।

AMARBOI.COM

মুসলিমরা তখন পর্যন্ত কোনও মৌলবাদী আন্দোলনের জন্ম দেয়নি, কারণ তাদের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া তখনও পর্যাপ্তভাবে অগ্রসর হয়নি। তখনও আধুনিকতার নতুন চ্যালেঞ্জ মেটাতে তারা তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য পুনর্গঠনে ব্যস্ত ছিল এবং নতুন চেতনা উপলব্ধি করতে জনগণকে সাহায্য করার কাজে লাগাচ্ছিল ইসলামকে। মিশরে এক তরুণ শিক্ষক সব সময়ই বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুদ্র বলয়ে সীমাবদ্ধ আফগানি, আব্দুহ ও রিদাহর সংস্কার ধারণা অধিকতর সাধারণ মানুষের মাঝে নিয়ে এসেছিলেন। খোদ এটাই ছিল আধুনিকায়নের একটি প্রক্রিয়া। প্রাচীন সংস্কারকগণ তখনও রক্ষণশীল

রীতিনীতিতে আকার লাভ করছিলেন, অধিকাংশ প্রাক আধুনিক দার্শনিকদের মতো অভিজাতপন্থী ছিলেন তাঁরা, সাধারণ মানুষকে তাঁদের বিমূর্ত ধারণা বোঝার উপযুক্ত মনে করেননি। হাসান আল-বান্না (১৯০৬-৪৯) তাঁদের সংস্কার ধারণাকে গণআন্দোলনে পরিণত করার একটা উপায় বের করেছিলেন। একাধারে আধুনিক ও প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষা ছিল তাঁর। তিনি কায়রোর বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের প্রথম টিচার্স ট্রেনিং কলেজ দার আল-উলুমে পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু সুফিও ছিলেন বান্না, গোটা জীবন জুড়ে সুফিবাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও আচার তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল।[৫৮] বান্নার কাছে বিশ্বাস কোনও ক্রিডের প্রতি মতামতগত সম্মতি ছিল না; এটা এমন কিছু যাকে কেবল যাপন এবং এর আচারগুলোকে যত্নের সাথে পালন করা হলেই উপলব্ধি করা যেতে পারে। তিনি জানতেন, মিশরিয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োজন ছিল; তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের সমাজকে অবশ্যই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে আধুনিক করে তুলতে হবে। কিন্তু এগুলো ছিল বাস্তব ও যৌক্তিক বিষয় যেগুলোকে অবশ্যই আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংস্কারের সাথে হাতে হাত রেখে চলতে হবে।[৫৯]

কায়রোর ছাত্র হিসাবে বান্না ও তাঁর বন্ধুরা শহরের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভ্রান্তি দেখে আবেগে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন।[৬০] রাজনৈতিক অচলাবস্থা বিরাজ করছিল সেখানে: অর্থহীন ও প্রবল বিতর্কে মেতে ছিল বিভিন্ন পক্ষ, মিশরিয় 'স্বাধীনতা' সত্ত্বেও তখনও দেশের নিয়ন্ত্রণে রয়ে যাওয়া ব্রিটিশের হাতে পরিচালিত হচ্ছিল। ব্রিটিশদের নিরাপদ আরামদায়কভাবে আবাস স্যুয়েয খাল এলাকায় ইসমাইলিয়াহয় প্রথম শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আপন জাতির মানুষগুলোর দুর্দশা একেবারে অন্তরে আঘাত করেছিল তাঁর। ব্রিটিশ ও অন্য প্রবাসীদের স্থানীয় জনগণের প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না, বরং অর্থনীতি ও সরকারী উপযোগের উপর কঠিন নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল তারা। ব্রিটিশদের বিলাসী বাড়িঘর ও মিশরিয় শ্রমিকদের কাহিল দর্শন কুঁড়ের বৈপরীত্যে গ্লানি বোধ করেছেন তিনি।[৬১] নিবেদিত প্রাণ মুসলিম বান্নার চোখে এটা স্রেফ রাজনীতির কোনও ব্যাপার ছিল না। মুসলিম সম্প্রদায়, উম্মাহর অবস্থা ইসলামে ক্রিশ্চান ধর্মের কোনও মতবাদগত নীতিমালার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মূল্য রাখে। বান্না আধ্যাত্মিকভাবে তাঁর জনগণের দুঃখকষ্টে বিচলিত বোধ করেছেন ঠিক একজন প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদী বাইবেলের ভ্রান্তি হীনতার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে মনে করলে বা নেচারেই কারতার কোনও সদস্য তার চোখে যায়নবাদীদের হাতে পবিত্র ভূমির অপবিত্রকরণ মনে করা কিছু দেখলে যেমন বোধ করবে। বান্না বিশেষ করে লোকজনকে মসজিদ ছেড়ে

AMARBOI.COM

চলে যেতে দেখে উদ্বিগ্ন ছিলেন। মিশরিয়দের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এই প্রক্রিয়ায় কায়রোয় প্রকাশিত অসংখ্য পত্রিকায়, সাময়িকী ও ম্যাগাজিনে পাশ্চাত্য ধারণার মুখোমুখি হয়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল তারা–যেগুলোকে ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন বা এর প্রতি ইতিবাচকভাবে বৈরী ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। *উলেমাবা* আধুনিক দৃশপট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষকে সঠিক কোনও নির্দেশনা দিতে পারছিলেন না তাঁরা। আর রাজনীতিবিদগণ গণমানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষা সমস্যা নিয়ে কোনওরকম স্থিতিশীল প্রয়াস পাচ্ছিলেন না।[৬২] বান্না স্থির করেন, একটা কিছু করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেখানে নিজেদের বিভ্রান্ত ও মনোবলরহিত মনে করছে সেখানে জাতীয়তাবাদ ও ইউরোপের সাথে মিশরের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে উচ্চমার্গের আলোচনায় কোনও ফায়দা হবার নয়। তাঁর মনে হয়েছিল, লোকে কেবল কোরান ও সুন্নাহর প্রথম নীতিমালায় ফিরে গিয়েই আধ্যাত্মিক উপশম লাভ করতে পারে।

বান্না মসজিদ ও কফিহাউসে উপস্থিত 'সারমন' দেওয়ার জন্যে কিছু বন্ধুবান্ধবকে সমবেত করেন।[৬৩] শ্রোতাদের তিনি বললেন, পাশ্চাত্যের প্রভাব ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহ তাদের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে, এখন আর নিজেদের ধর্মকে তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। ইসলাম পাশ্চাত্য কেতার ধর্মতত্ত্ব বা ক্রিডের কোনও সেট নয়। এটা সর্বাঙ্গীন জীবন ব্যবস্থা, আন্তরিকভাবে এই ধর্ম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারলে তা আবার বহুদিন আগে বিদেশীদের হাতে উপনিবেশে পরিণত হওয়ার আগে মুসলিম *উম্মাহর* অধিকারে থাকা সেই গতিময়তা ও শক্তি ফিরিয়ে আনবে। *উম্মাহকে* ফের শক্তিশালী করে তুলতে তাদের অবশ্যই মুসলিম আত্মাকে আবিষ্কার করতে হবে।[৬৪] তখনও বিশের কোঠার শুরুর দিকে বয়স হলেও বেশ প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বান্না। ১৯২৮ সালের মার্চের এক সন্ধ্যায় ইসমাইলিয়াহর ছয়জন স্থানীয় কর্মী তাঁর কাছে এসে তৎপরতা শুরু করার অনুরোধ জানালেন:

> আমরা ইসলামের মাহাত্ম্যে পৌঁছানোর বাস্তব পথ জানি না, মুসলিমদের কল্যাণের লক্ষ্যে সেবা করতেও না। আমরা এই অপমান আর বিধিনিষেধে ভরা জীবনে ক্লান্ত। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আরব ও মুসলিমদের কোনও মর্যাদা বা সম্মান নেই। আমাদের রক্ত ছাড়া আর কিছুই নেই...আর আছে প্রাণ...আর সামান্য কটি পয়সা। আমরা আপনার মতো করে কর্মের পথ বা

AMARBOI.COM

পিতৃভূমি চিনতে পারিনি, ধর্ম ও *উম্মাহ*কে আপনার মতো সেবার পথও চিনতে অক্ষম।[৬৫]

এই আবেদনে আলোড়িত হয়েছিলেন বান্না। একসাথে তিনি ও তাঁর অতিথিরা 'ইসলামের বাণীর স্বার্থে সেনাদল [জুন্দ]' হওয়ার শপথ গ্রহণ করলেন। সেরাতে সোসায়েটি অভ মুসলিম ব্রাদার্সের জন্ম হলো। নগণ্য এই সূচনা থেকে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৪৯ সালে বান্নার পরলোকগমনের সময় সারা মিশরে সোসায়েটির ২,০০০ শাখা ও ৬০০,০০০ ব্রাদার ও সিস্টার ছিল। এটাই মিশরের সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করা একমাত্র সংগঠন: সিভিল সার্ভেন্ট, ছাত্র ও সম্ভাব্য শক্তিধর শহুরে শ্রমিক গোষ্ঠী ও কৃষক সমাজ।[৬৬] দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ নাগাদ মিশরিয় রাজনীতির দৃশ্যপটে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছিল সোসায়েটি।

অস্তিত্বের প্রথম রাত থেকেই উগ্র ইমেজারি সোসায়েটির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হলেও বান্না সব সময়ই জোরের সাথে বলেছেন যে, অভ্যুত্থান সংগঠন বা ক্ষমতা দখলের কোনও অভিলাষ তাঁর নেই। সোসায়েটির প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষা। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাধারণ মানুষ ইসলামের বাণী আত্মস্থ করতে পারলে সহিংস ক্ষমতা দখল ছাড়াই জাতি মুসলিম হয়ে উঠবে। একেবারে গোড়ার দিকে আফগানি, আব্দুহ ও রিদাহর *সালাফিয়াহ* সংস্কার আন্দোলনের প্রতি ঋণ প্রকাশ করে ছয়দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন বান্না: (১) যুগের চেতনায় কোরানের ব্যাখ্যা, (২) ইসলামি জাতিগুলোর ঐক্য, (৩) জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলা অর্জন, (৪) নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, (৫) বিদেশী আধিপত্য থেকে মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলসমূহ উদ্ধার ও (৬) বিশ্বজুড়ে ইসলামি শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার।[৬৭] বান্না চাননি, সোসায়েটি সহিংস বা রেডিক্যাল হোক, কিন্তু নীতিগতভাবে তিনি উপনিবেশিক অভিজ্ঞতার কারণে নমিত ও শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মুসলিম সমাজের মৌলিক সংস্কারের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন।[৬৮] মিশরিয়রা নিজেদের ইউরোপিয়দের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু এর কোনও প্রয়োজনই ছিল না। তাদেরও অসাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, যা আমদানি করা আদর্শ থেকে ঢের বেশি সাহায্য করবে তাদের।[৬৯] ফরাসি বা রাশিয়ান বিপ্লব অনুকরণ করা উচিত হবে না, কারণ পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) ১৩০০ বছর আগেই স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আহ্বান জানিয়ে গেছেন।[৬৯] শরীয়াহ্ এমনভাবে মধ্যপ্রাচ্যীয় দেশগুলোর সাথে খাপ খেয়ে যায় যেভাবে কোনও বিদেশি আইনের পক্ষে সম্ভব হবে

AMARBOI.COM

না। মুসলিমরা যতদিন অন্য জাতিকে অনুকরণ করবে তত দিন তারা 'সাংস্কৃতিক সঙ্কর'ই রয়ে যাবে।[৭০]

কিন্তু সবার আগে ব্রাদার ও সিস্টারদের নিজেদের ইসলামের সাথে নতুন করে পরিচিত হতে হবে। মুক্তি ও মর্যাদা লাভের কোনও সংক্ষিপ্ত পথ নেই। মুসলিমদের নিজেদের ও সমাজকে একেবারে শূন্য থেকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে বছরের পর বছর অবিরাম পর্যালোচনা ও আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে বান্না একটি দক্ষ ও আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৩৮ সালে সদস্যদের বিভিন্ন 'ব্যাটালিয়নে' বিভক্ত করা হয়, প্রতিটিতে তিনটি করে গ্রুপ ছিল—একটি শ্রমিকদের জন্যে, একটি ছাত্রদের ও অন্যটি ব্যবসায়ী ও সিভিল সার্ভেন্টদের। গ্রুপগুলো সপ্তাহে একদিন প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার জন্যে মিলিত হত। যে আশা নিয়ে নবীনদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল সেটা পূরণ না হওয়ায় ১৯৪৩ সাল নাগাদ 'ব্যাটালিয়নগুলোকে' 'পরিবার' দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এর প্রতিটির দশ জন করে সদস্য ছিল, ইউনিট হিসাবে তৎপরতার জন্যে দায়ী ছিল তারা। পরিবারের সদস্যরা সপ্তাহে একবার মিলিত হত, একে অন্যের উপর নজর রাখত যাতে প্রত্যেকে 'স্তম্ভ'গুলো অনুসরণ করে; জুয়া, মদ, সুদ ও ব্যাভিচার থেকে দূরে থাকে। মিশরের সমাজ আধুনিকায়নের চাপে ভেঙে পড়ার একটা সময়ে পরিবার ব্যবস্থা মুসলিমদের বাঁধনের উপর জোর দিয়েছিল। প্রতিটি পরিবার ছিল প্রধান কার্যালয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা একটি বৃহত্তর 'ব্যাটালিয়নের' অংশ।[৭১]

এই সময়ের কোনও ক্রিশ্চান সংস্কার আন্দোলনের মতবাদ নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হত; অংশত এর কারণ ছিল ধর্মকে কতগুলো বিশ্বাসের বিন্যাস পরিপালন হিসাবে মেনে নেওয়া বিবেচনাকারী আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। অবশ্য মুসলিমদের নির্দিষ্ট উপায়ে নিজেদের মাঝে এক মুহাম্মদীয় আদর্শরূপ গড়ে তুলতে সাহায্যকারী শরীয়াহর রক্ষণশীল ধার্মিকতায় সোসায়েটি পরিচালিত হত। তবে এই প্রাচীন কেতার ধার্মিকতা এক আধুনিক বেশে প্রসারিত হয়েছিল। পয়গম্বরের মতো ঈশ্বরমুখীনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আচার, প্রার্থনা ও নৈতিক অনুশীলনের নকশা করা হয়েছিল। কেবল এই আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটেই আধুনিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কার মুসলিম জাতির কাছে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে বলে বিশ্বাস করতেন বান্না। ১৯৪৫ সালে এক জনাকীর্ণ সভায় বান্না সিদ্ধান্ত নেন যে, দারুণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলেও কোনও সরকারই যার জন্যে যথার্থ পদক্ষেপ নেয়নি এমন একটি সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণের সময় হয়েছে। ব্রাদাররা সব সময় কোথাও কোনও শাখা খোলার সাথে সাথে মসজিদের পাশে ছেলে ও মেয়েদের জন্যে স্কুল নির্মাণ করেছে।[৭২] আধুনিক স্কাউট আন্দোলন রোভার্সও প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা, যেখানে তরুণ

ব্রাদারদের শারীরিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাগাদ দেশের বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী যুব সংগঠনে পরিণত হয়েছিল রোভাররা।[৭৩] এবার এইসব সেবা আরও সুশৃঙ্খল ও দক্ষ হয়ে উঠল। ব্রাদাররা শ্রমিকদের জন্যে নাইট স্কুল ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে টিউটোরিয়াল কলেজ পরিচালনা করত;[৭৪] তারা গ্রামাঞ্চলে ক্লিনিক ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে; আর দরিদ্রতর পল্লী এলাকার পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য শিক্ষার কাজেও নিয়োজিত ছিল রোভাররা। সোসায়েটি আধুনিক ট্রেড ইউনিয়নও প্রতিষ্ঠা করে, শ্রমিকদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। কিছু ভয়াবহ শ্রমিক শোষণের ঘটনা প্রকাশ করে দেয়; নিজস্ব কারাখানা স্থাপন ও মুদ্রণ, তাঁত, নির্মাণ ও প্রকৌশলের হালকা কারাখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তৎপর ছিল তারা।[৭৫]

সোসায়েটির শত্রুরা সব সময়ই বান্নার বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র' সৃষ্টির অভিযোগ তুলে আসছিল। তিনি প্রকৃতই স্পষ্ট হুমকিস্বরূপ সরকারের ঘাটতিগুলোকে উজ্জ্বল করে তোলা এক ব্যাপক সফল প্রতি-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন।[৭৬] শিক্ষা ও শ্রমিকদের অবস্থার প্রতি সরকারের অবহেলার দিকে তা দৃষ্টি আর্কষণ করেছে; সোসায়েটি একাই *ফেলাহিনদের* কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়ার ব্যাপারটি সত্যিই বিব্রতকর ছিল। কিন্তু তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সোসায়েটির সকল প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট মুসলিম পরিচয় ছিল। এর সমস্ত কারখানায় মসজিদ ছিল, আবশ্যক প্রার্থনার জন্যে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া হত; কোরানের সামাজিক বাণী মোতাবেক কর্ম পরিবেশ ও মজুরি ছিল ভালো। শ্রমিকরা স্বাস্থ্য বীমা ও শোভন অবকাশ পেত; যে কোনও বিরোধের সমাধান করা হত ন্যায়সঙ্গতভাবে। বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতরা যাই বলে থাকুন না কেন, মিশরের বেশির ভাগ মানুষই ধার্মিক হতে চায় এই বাস্তবতার নাটকীয় প্রকাশই ছিল সোসায়েটির অসাধারণ সাফল্য। এটা দেখিয়েছে যে ইসলাম প্রগতিশীল হতে পারে। সপ্তম শতাব্দীর রেওয়াজে কোনও দাসত্বমূলক প্রত্যাবর্তন ছিল না। ব্রাদাররা সৌদি আরবের নতুন ওয়াহাবি রাজ্যের ব্যাপারে দারুণভাবে সমালোচনামুখর ছিল, ইসলামি আইনের আক্ষরিক ব্যাখ্যার–যেমন চোরের হাত কাটা বা ব্যাভিচারীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা–নিন্দা করেছে।[৭৭] ভবিষ্যৎ ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনীতির রূপ সম্পর্কে ব্রাদারদের কোনও ধারণা ছিল না। তবে তারা জোরের সাথে বলেছে কোরান ও সুন্নাহর চেতনার প্রতি বিশ্বস্ত হতে হলে সৌদি আরবের চেয়েও সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন থাকতে হবে। ওদের সাধারণ ধারণা নিশ্চিতভাবে সময়ের সাথে তাল মেলানো ছিল: শাসকদের নির্বাচিত হতে হবে (আদি মুসলিমকালের মতো), এবং *রাশিদুন* ('ন্যায়নিষ্ঠ') খলিফাগণ যেমন তাগিদ দিয়েছেন, একজন শাসককে

AMARBOI.COM

অবশ্যই তাঁর জাতির কাছে জবাবদিহি করতে হবে; তিনি স্বৈরাচারীমূলক শাসন চালাতে পারবেন না। কিন্তু সম্ভাব্য ইসলামি রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনাকে বান্না সব সময়ই অপরিপক্ক মনে করেছেন, কারণ এখনও প্রাথমিক অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে।[৭৮] বান্না স্রেফ মিশরকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন; সোভিয়েতেরা কমিউনিজম বেছে নিয়েছে, পাশ্চাত্য বেছেছে গণতন্ত্র; যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ইসলামি ভিত্তিতে তাদের রাজনীতি নির্মাণ করার অধিকার থাকা উচিত, যদি তারা কখনও ইচ্ছা করে।[৭৯]

সোসায়েটি নিখুঁত ছিল না। সাধারণ মানুষের কাছে এর আবেদনের কারণে প্রতিবুদ্ধিজীবী প্রবণ হয়ে উঠেছিল। এর বিভিন্ন ঘোষণা অনেক সময়ই আত্মরক্ষামূলক ও স্বয়ং-ন্যায়নিষ্ঠ হতে দেখা গেছে। পাশ্চাত্য সম্পর্কে এর লোভ, স্বৈরাচার ও আধ্যাত্মিক দেউলিয়াত্বের উপর জোর দেওয়া ব্রাদারহুড-এর ইমেজ উপনিবেশিক অভিজ্ঞতার কারণে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য কেবল, সোসায়েটির এক মুখপাত্র যেমন বলেছিলেন, 'আমাদের অমর্যাদা করা, আমাদের দেশ দখল করা ও ইসলামের ধ্বংস শুরু করা'[৮০] ছিল না। সোসায়েটির নেতৃবৃন্দ সাধারণ কাতারে মতদ্বৈতের ব্যাপারে অসহিষ্ণু ছিলেন। চরম আনুগত্যের উপর জোর দিয়েছেন বান্না, তিনি পর্যাপ্তভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর কেউই তাঁর স্থান নিতে পারেননি। সোসায়েটি কার্যত অর্থহীন অন্তর্কলহের কারণে শেষ হয়ে গেছে। তবে এর সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর ব্যর্থতা ছিল ১৯৪৩ সালে 'দ্য সিক্রেট অ্যাপারেটাস' (*আল-জিহাজ আল-সিররি*) নামে সন্ত্রাসী গ্রুপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা।[৮১] সামগ্রিকভাবে সোসায়েটিতে তা প্রান্তিক হয়ে গিয়েছিল। গোপন সংগঠন হওয়ায় আমরা এর সম্পর্কে খুব কমই তথ্য জানি, তবে সোসায়েটির নিশ্চিত গবেষণায় রিচার্ড পি. মিচেল তাঁর বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে, ১৯৪৮ সাল নাগাদ ইউনিটের মাত্র হাজার খানেক সদস্য ছিল, বেশির ভাগ ব্রাদারই তখন পর্যন্ত এর অস্তিত্বের কথা জানত না।[৮২] বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের কাছে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কার ছিল সোসায়েটির *রেইজন দে'এতরে*, অ্যাপারেটাসের সন্ত্রাসের নিন্দা করেছে তারা। তাসত্ত্বেও ঈশ্বরের নামে মানুষ হত্যা শুরু করলে কোনও সংগঠন সবচেয়ে মৌলিক ধর্মীয় মূল্যবোধকে অস্বীকারকারী এক বিনাশী পথে পা বাড়ায়।

১৯৪০-র দশক মিশরের পক্ষে খুবই উত্তাল সময় ছিল। উদার গণতন্ত্রের ব্যর্থতা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, এবং অধিকাংশ মিশরিয় সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ বা মিশরিয় জাতীয়তাবাদীদের কেউই বুঝতে পারেনি যে উপরিতলের ও অতি দ্রুত আধুনিকায়নের ফলে মূলত তখনও সামন্ত

বাদী ও কৃষিভিত্তিক রয়ে যাওয়া একটি দেশে সরকারের আধুনিক পদ্ধতি কায়েম সম্ভব নয়। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে সতেরটি সাধারণ নির্বাচনের প্রত্যেকটিতে জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ পার্টি জয়লাভ করলেও মাত্র পাঁচবার তাদের শাসন করার সুযোগ দেওয়া হয়। ওয়াফদপন্থীদের সাধারণত ব্রিটিশ বা রাজপ্রাসাদের তরফ থেকে পদত্যাগে করতে বাধ্য করা হত।[৮৩] ১৯৪২ সালে এমনকি ব্রিটিশরা জার্মানপন্থী প্রধানমন্ত্রীকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ হিসাবে ওয়াফদ পার্টিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলে এর উপরও শ্রদ্ধা হারিয়ে বসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কায়রোয় এক সন্ত্রাসের আবহ বিরাজ করছিল, সেই সাথে হতাশা; ১৯৪৮ স্যালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর প্যালেস্তাইনে আগ্রাসন চালানোর পর মিশরসহ পাঁচটি আরব বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে তা আরও গভীর হয়ে ওঠে। প্যালেস্তাইন হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ও ১৯৪৮ সালে গৃহত্যাগে বাধ্য হওয়া ৭৫০,০০০ প্যালেস্তাইনি শরণার্থীর দুঃখদুর্দশার প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের উদাসীনতা আধুনিক বিশ্বে আরবদের অক্ষমতাই তুলে ধরেছে। আরব আজও ১৯৪৮ সালের ঘটনাকে *আল-নাখবাহ*: মহাজাগতিক পর্যায়ের বিপর্যয় হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকে। এমনি ভীষণ আবহে অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে সন্ত্রাসই 'একমাত্র উপায়'[৮৪]। নিশ্চিতভাবেই এটা পরে মিশরের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন আনোয়ার আল-সাদাতের মত ছিল; ক্যানাল যোনে ব্রিটিশদের হামলা ও ব্রিটিশদের 'দালালী' করা মিশরিয় রাজনীতিবিদদের হত্যা করার লক্ষ্যে ১৯৪০-র দশকে 'মার্ডার সোসায়েটি' গঠন করেছিলেন তিনি। সহিংসতাকেই একমাত্র উপায় মনে করা অন্য প্যারামিলিটারি গ্রুপও ছিল: রাজপ্রাসাদের সাথে সংশ্লিষ্ট দ্য গ্রিন শার্টস এবং ওয়াফদ-এর সাথে সম্পর্কিত ব্লুশার্টস।[৮৫]

সম্ভবত মিশরের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রধান কুশীলব সোসায়েটি অভ মুসলিম ব্রাদার্সেরও নিজস্ব সন্ত্রাসী সংগঠন থাকার ব্যাপারটা অনিবার্য ছিল, কিন্তু এটা ছিল একটা করুণ পরিবর্তন। বান্না স্বয়ং গোপন অ্যাপারেটাসের কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন কিনা সেটা পরিষ্কার নয়। তিনি সবসময়ই তাদের নিন্দা করেছেন, কিন্তু এই বছরগুলোয় সরকারের নিন্দাবাদেও উচ্চকণ্ঠ ছিলেন তিনি।[৮৬] নিজের সন্ত্রাসী ইউনিটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি বান্না, এই সংগঠনের কর্মকাণ্ড এমন কিছু ঘটনাপ্রবাহের সৃষ্টি করেছিল যা তাঁর মৃত্যু ডেকে এনেছে, সোসায়েটির নৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা মসীলিপ্ত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এর ধ্বংস ডেকে এনেছে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সিক্রেট অ্যাপারেটাসের সদস্যরা সম্মানিত বিচারক আহমাদ আল-খাযিন্দারের হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে সূচিত সন্ত্রাসের কর্মসূচি হাতে নেয়, গোটা গ্রীষ্মকাল জুড়ে তা অব্যাহত থাকে; কায়রোর ইহুদি অধ্যুষিত এলাকায়

সহিংস আক্রমণ হয়, বোমা বর্ষণ করা হয়, ফলে অনেক সম্পদ বিনষ্ট হয়, অসংখ্য মানুষ আহত হয় বা প্রাণ হারায়; ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আল-নাকরাশির হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে এটা পরিণতি লাভ করে।

সোসায়েটি এইসব হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছে, নাকরাশি হত্যাকাণ্ডে ত্রাসের ভবিষ্যদ্বাণী করেন বান্না।[৮৭] তাসত্ত্বেও সমাজের সকল স্পষ্ট সেক্টরের নিন্দার পাত্র নতুন প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহিম আল-হাদি বড্ড বেশি ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা ব্রাদারহুডকে ধ্বংস করার এই সুযোগ লুফে নেন। সোসায়েটিকে দমন করা হয়, সদস্যদের ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করা হয়, নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয় তারা, এবং ১৯৪৯ সালের জুলাই নাগাদ আব্দ আল-হাদি অবশেষে পদত্যাগ করার সময় পাঁচ হাজারেরও বেশি ব্রাদার কারাগারে অবস্থান করছিল।[৮৮] কিন্তু ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ বান্নাকে ইয়াং মেন'স মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয়ের ঠিক বাইরে প্রায় নিশ্চিতভাবেই প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিতে রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হয়।

১৯৫০ সালে গোপনে সোসায়েটি আবার সংগঠিত হতে শুরু করে, একজন নতুন নেতা নির্বাচন করে তারা: মধ্যপন্থী ও সহিংসতা এড়িয়ে চলার কারণে সুপরিচিত বিচারপতি হাসান ইসমাইল আল-হুদাইবি। আশা করা হয়েছিল যে, সোসায়েটিকে অতি প্রয়োজনীয় সম্মান এনে দেবেন তিনি। কিন্তু হুদাইবি তাঁর দায়িত্বের উপযুক্ত ছিলেন না। বান্নার শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাবে নেতাদের ভেতর উপদলীয় কোন্দল ছড়িয়ে পড়ে, সিক্রেট অ্যাপারেটাসকে নিয়ন্ত্রণে অক্ষম প্রমাণিত হন হুদাইবি, ১৯৫৪ সালে ফের সোসায়েটির পতন ঘটায় তারা।

এই সময় নাগাদ মিশর ভয়ঙ্কর তরুণ আর্মি অফিসার জামাল আব্দ–আল নাসেরের (১৯১৮–৭০) হাতে শাসিত হচ্ছিল। ২২শে জুলাই ১৯৫২ তারিখে ফ্রি অফিসারদের অ্যাসোসিয়েশনকে সাথে নিয়ে পুরোনো মর্যাদাহীন শাসকগোষ্ঠীকে এক সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাত করেছিলেন তিনি। মিশরে এক বিপ্লবী প্রজাতন্ত্র কায়েমের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পুরোনো উদার আদর্শ থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন ধরনের উগ্র জাতীয়বাদের প্রবক্তা ছিলেন নাসের। ১৯২০ ও ১৯৩০-র দশকের মিশরিয় বুদ্ধিজীবীদের বিপরীতে নতুন আরব জাতীয়বাদীরা পাশ্চাত্যের প্রতি মুগ্ধ ছিল না। আর মধ্যপ্রাচ্যে এমন পরিষ্কারভাবে ব্যর্থ সংসদীয় গণতন্ত্রেরও ফুরসত ছিল না তাদের। নাসেরের সরকার উগ্রভাবে সমাজতন্ত্রী ছিল, তিনি সোভিয়েতদের তোয়াজ করে চলতেন। ব্রিটিশদের চিরকালের জন্যে মিশর থেকে তাড়াতে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; পাশ্চাত্য ও ইসরায়েলের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর জনগণের জন্যে মোহমুক্তভাবে উপেক্ষার। তাঁর বিদেশ নীতি ছিল প্যান-আরব এবং ইউরোপিয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসে রত অন্য এশিয় ও আফ্রিকান দেশগুলোর সাথে

AMARBOI.COM

মিশরের সংহতির উপর জোর দিয়েছে। নাসের পোড়খাওয়া সেক্যুলারিস্টও ছিলেন। ধর্মসহ কোনও কিছুকেই জাতীয় স্বার্থের প্রতি বাধা হতে দেওয়া যাবে না; ধর্মসহ সমস্ত কিছু রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত নাসের মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় মানবে পরিণত হবেন এবং 'নাসেরবাদ' হবে প্রধান মতাদর্শ। কিন্তু গোড়ার দিকের বছরগুলোয় নাসেরকে সংগ্রাম করতে হচ্ছিল: তিনি তেমন একটা জনপ্রিয় ছিলেন না, কোনও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেঁচে থাকতে দিতে পারেননি।

অবশ্য প্রথমে ব্রাদারকে তোয়াজ করেছেন নাসের। ওদের তাঁর প্রয়োজন ছিল, ইসলামি বাগাড়ম্বর ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন বলে সোসায়েটি তাঁকে সমর্থন দিয়েছে, এর রোভাররা জুলাই বিপ্লবের পর আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বিশেষ করে জনমুখী মুসলিম বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও নাসেরের ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও ছিল না এটা পরিষ্কার হয়ে যাবার পর এক ধরনের প্রাথমিক টানাপোড়েন চলছিল। হুদাইবির ইসলামি নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি অসময়োচিত পরিণত হলে নাসেরের কেবিনেট ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৫৪ পাল্টা বিপ্লব সংগঠন করার অভিযোগ তুলে আরও একবার সোসায়েটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৮৯] ব্রাদারহুডের একটা নিউক্লিয়াস আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়, অপপ্রচারের অভিযান শুরু করে সরকারি, ব্রাদারদের বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র রাখা ও ব্রিটিশদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হয়। শাসককুল নিজেদের ইসলামি পরিচয় স্পষ্ট করে তোলার প্রয়াস পায় এবং নতুন ইসলামি কংগ্রেসের সেক্রেটারি জেনারেল আনোয়ার সাদাত আধাসরকারী পত্রিকা *আল-জামহারিয়াহ*-য় 'প্রকৃত' ও 'উদার' ইসলামের উপর বেশ কয়েকটি নিবন্ধ লিখেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ২৬শে অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে খোদ ব্রাদারহুড নাসেরের হাতের খেলার পুতুলে পরিণত হয়, সোসায়েটির সদস্য আব্দ আল-লতিফ এক র‍্যালিতে নাসেরকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে।

আক্রমণ থেকে প্রাণে বেঁচে যান নাসের। হামলার মুখে তাঁর অসম সাহস ও নিরাসক্তি জনপ্রিয়তার পক্ষে বিস্ময়কর ভূমিকা রাখে। এবার সোসায়েটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পক্ষে মুক্ত ছিলেন তিনি। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে এক হাজারেরও বেশি ব্রাদার সদস্যকে গ্রেপ্তার করে বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছিল। তবে আরও অসংখ্য সদস্য যারা লিফেলট বিলির চেয়ে মারাত্মক কোনও কাজ করেনি, তাদের কোনওদিনই আদালতে হাজির করা হয়নি, পরের পনেরটি বছর নাসেরের কারাগার ও নির্যাতন শিবিরে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে তারা।[৯০] নাসের যেন ব্রাদারহুডকে শেষ করে দিয়েছেন বলে মনে হয়েছিল, তাঁর চলার পথেই

মিশরের একমাত্র প্রগতিশীল ইসলামি আন্দোলনকে থমকে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে নাসের দুই বছর পরে স্যুয়েয সঙ্কটের পরবর্তী সময়ে আরব বিশ্বের নায়কে পরিণত হলে সেক্যুলারিজমকেই যেন বিজয়ী মনে হচ্ছিল, এই সময় তিনি কেবল পাশ্চাত্যকে সাফল্যের সাথে উপেক্ষাই করেননি, বরং ব্রিটিশের উপর শোচনীয় অপমান চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাদারদের বিরুদ্ধে এই বিজয় শেষ পর্যন্ত শ্মশানের বিজয়ে পরিণত হয়। নাসেরের জীবদ্দশায় যেসব ব্রাদার কারাগারে ছিল সেক্যুলারিজমের সবচেয়ে আগ্রাসী চেহারা দেখতে পেয়েছে তারা। আমরা দেখব যে, শিবিরে বান্নার কিছু সংখ্যক অনুসারী ব্রাদার বান্নার সংস্কারবাদী দর্শন ত্যাগ করে একটি নতুন সহজাতভাবে সহিংস সুন্নি মৌলাবাদ গড়ে তুলেছিল।

ইরানিরাও ভয়ঙ্কর সেক্যুলারিস্ট আক্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করছিল। রেযা শাহর আধুনিকায়ন কর্মসূচি মিশর বা তুরস্কের আধুনিকায়নের কর্মসূচির চেয়ে ঢের বেশি দ্রুত গতির ছিল, কারণ তিনি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সময় ইরানে তখনও বলতে গেলে আধুনিকায়ন শুরুই হয়নি।[৯১] রেযা ছিলেন নিষ্ঠুর। বিরোধীদের স্রেফ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে; প্রথম যাদের বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁদের অন্যতম ছিলেন মজলিসে শাহর বিরোধিতাকারী আয়াতোল্লাহ মুদাররিস। ১৯২৭ সালে তাঁকে কারাবন্দি করা হয়েছিল এবং ১৯৩৭ সালে হত্যা করা হয়।[৯২] রেযা প্রথমবারের মতো দেশটিকে কেন্দ্রিভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহ দমন ও এযাবৎ কার্যত স্বায়ত্তশাসন ভোগকারী যাযাবর গোত্রগুলোকে দরিদ্রতর করে তোলার মাধ্যমে সবচেয়ে নিষ্ঠুর উপায়ে।[৯৩] রেযা বিচার ব্যবস্থাকে সংস্কার করেন, তিনটি নতুন সেক্যুলার আইনি বিধি–সিভিল, কমার্শিয়াল ও ক্রিমিনাল-শরীয়াহকে প্রতিস্থাপন করে।[৯৪] দেশকে শিল্পায়িত করে আধুনিক সুযোগসুবিধার আমদানি করতে চেয়েছিলেন তিনি। ১৯৩০-র দশকের শেষদিকে বেশিরভাগ শহরেই বিদ্যুৎ ও পাওয়ার প্লান্ট ছিল। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ একটি সত্যিকারের প্রগতিশীল পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল; মজুরি ছিল কম, শোষণ ছিল মারাত্মক। এই অতিশয় নির্মম পদ্ধতি নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে; ইরান অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি, ব্রিটেন তখনও প্রতিশ্রুতিশীল তেল শিল্পের মালিকানা বজায় রেখেছিল, অর্থনীতিতে বলতে গেলে যার কোনও অবদানই ছিল না, বিদেশী ঋণ ও বিনিয়োগ গ্রহণে ইরানকে বাধ্য করা হচ্ছিল।

রেযার কর্মসূচি অনিবার্যভাবে উপরিতলের ছিল। পুরোনো কৃষিভিত্তিক অবকাঠামোর উপরই আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে চাপিয়ে দিয়েছিল, মিশরে এই পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছিল, এখানেও একই ভাগ্য বরণ করবে। কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত জনসংখ্যার নব্বই ভাগকে উপেক্ষা করা হয়েছিল; প্রথাগত কৃষি পদ্ধতি ছিল

AMARBOI.COM

অব্যাহত এবং অনুৎপাদশীল রয়ে গেছে। সমাজের মৌলিক কোনও সংস্কার সাধিত হয়নি। দরিদ্রদের দুঃখদুর্দশায় সামান্যতমও আগ্রহী ছিলেন না রেযা, সেনাবাহিনী মোট বাজেটের পঞ্চাশ ভাগ পেলেও মাত্র চার ভাগ ব্যয় করা হত শিক্ষাখাতে, তাও ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণীর অধিকারে।[৯৫] মিশরের মতোই ইরানে দুটি জাতি গড়ে উঠছিল, যারা ক্রমবর্ধমানহারে পরস্পরকে বুঝে উঠতে পারছিল না। ক্ষুদ্র পাশ্চাত্যকৃত সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়কে নিয়ে ছিল একটি 'জাতি', রেযার আধুনিকায়ন কর্মসূচির ফায়দা লুটছিল তারা; অন্য 'জাতি'টি ছিল শাসকগোষ্ঠীর নতুন সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ করে হতচকিত বিশাল দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে, আগের চেয়ে আরও বেশি করে *উলেমাদের* পরামর্শের উপর নির্ভর করেছে তারা।

কিন্তু খোদ *উলেমারাই* রেযার সেক্যুলারাইজেশন নীতির প্রভাবে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন। যাজকদের ঘৃণা করতেন তিনি, ইরানে তাঁদের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা হ্রাস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর প্রাচীন পারসিয় সংস্কৃতি ভিত্তিক ইরানি জাতীয়তাবাদ ইসলামকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। রেযা ইমাম হুসেইনের সম্মানে আয়োজিত আশুরা উদযাপন (তাদের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দান করা) দমনের প্রয়াস পেয়েছিলেন, মক্কায় *হাজ্জ* করতে যাওয়ার ব্যাপারে ইরানিদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। ১৯৩১ সালে শরীয়াহ আদালতের আওতা মারাত্মকভাবে খর্ব করা হয়। যাজকদের কেবল ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল; অন্য সমস্ত মামলা নতুন সিভিল আদালতে পাঠানো হচ্ছিল। এক শত বছরেরও বেশি সময় ধরে *উলেমারা* ইরানে প্রায় বল্গাহীন ক্ষমতা ভোগ করে এসেছেন; কিন্তু এবার পদ্ধতিগতভাবে তাদের ক্ষমতা খর্ব করার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করলেন তাঁরা, কিন্তু মুদাররিসের হত্যাকাণ্ডের পর বেশির ভাগ যাজকই প্রতিবাদ করার সাহস করে উঠতে পারেননি।[৯৬]

রেযার পোশাকের সমরূপতার আইন (১৯২৮) তাঁর আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার উপরিতলগত চেহারা ও সহিংস রূপ দুটোই দেখায়। সকল পুরুষের পক্ষে পশ্চিমা পোশাক বাধ্যতামূলক করা হয় (কেবল *উলেমাদের* ছাড়া; যাজকীয় পদে যোগদানের জন্যে রাষ্ট্রীয় পরীক্ষায় পাস করার শর্তে জোব্বা ও পাগড়ী পরার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের।), পরে মেয়েদের বোরখা পরার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তাঁর সৈনিকরা সাধারণত বেয়োনেট দিয়ে মহিলাদের বোরখা ছিঁড়ে দিত, কুটিকুটি করে রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলত।[৯৭] অন্তস্থঃ রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও ইরানকে আধুনিক দেখাতে চেয়েছিলেন রেযা, এই লক্ষ্য অর্জনে

AMARBOI.COM

যেকোনও কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। ১৯২৯ সালের আশুরার সময় পুলিস কুমের ফায়যিয়াহ মাদ্রাসা ঘেরাও করে, ছাত্ররা রাস্তায় নেমে এলে তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছিঁড়ে পশ্চিমা পোশাক পরতে বাধ্য করে। পুরুষরা সাধারণত চওড়া কিনারাঅলা পশ্চিমা টুপি অপছন্দ করত, কারণ তাতে আচরিক প্রার্থনার সময় সেগুলো বাধা হয়ে দাঁড়াত। ১৯৩৫ সালে মাশাদে অষ্টম ইমামের মসজিদে একটি বিশ্রী ঘটনা ঘটে, পোশাক আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পুলিস জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। শত শত নিরস্ত্র বিক্ষোভকারী হয় প্রাণ হারায় কিংবা পবিত্র স্থানে আহত হয়। এটা বিস্ময়কর নয় যে, বহু ইরানি সেক্যুলারাইজেশনকে নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের কবল থেকে ধর্মকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নয় (পাশ্চাত্যের মতো), আসলে ইসলামকেই ধ্বংস করাই লক্ষ্যই পরিকল্পিত ভয়ঙ্কর নীতি হিসাবে ভয় করতে শিখেছিল।[৯৮]

ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতেই মৌলবাদী আন্দোলন ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে পারে। এই সময়কালেই ব্যাপারটা ঘটেনি, তবে চারটি ঘটনা ঘটেছিল যা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রথমটি ছিল এক প্রতি-সংস্কৃতির সৃষ্টি। ১৯২০ সালে বিশিষ্ট *মুজতাহিদ* শায়খ আব্দ আল-করিম হায়রি ইয়াযদিকে (১৮৬০–১৯৩৬) কুমের মোল্লাহরা সেখানে এসে থাকবার আমন্ত্রণ জানান। কারণ অষ্টম শতাব্দীতে ইরানি শিয়াবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়া কারাবালা ও নাজাফের উপাসনালয়গুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীত থাকায় কুমকে ফের শিয়া মানচিত্রে পুনঃস্থাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি। শায়খ হায়রির কুমে পৌঁছানোর অল্প পরেই ব্রিটিশরা সত্যিই কয়েক জন নেতৃস্থানীয় *উলেমাকে* ইরাক থেকে বহিষ্কার করে। সবচেয়ে বিজ্ঞ দুজনের একজন 'সংবিধানবাদী' *মুজতাহিদ* নাইনি কুমে বাস করতে আসেন। শহর আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে শুরু করে। *মাদ্রাসাগুলো* নতুন করে সাজানো হয়, বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ সেখানে শিক্ষা দান শুরু করেন, ভালো ভালো ছাত্রদের আকর্ষণে সক্ষম করে তোলে তাঁদের। নবাগতদের ভেতর একজন ছিলেন জ্ঞানী ও জগৎবিমুখ আয়াতোল্লাহ সায়ীদ আকা হুসেইন বোরুজারদি (১৮৭৫–১৯৬১); তিনি শিয়াহদের মারজে-ই তাকলিদ–সর্বোচ্চ আদর্শ–পরিণত হয়েছিলেন, কুমের আরও পণ্ডিতদের আকর্ষণ করেন তিনি।[৯৯] ক্রমে কুম নাজাফকে প্রতিস্থাপিত করতে শুরু করে, ১৯৬০ ও ১৯৭০-র দশকে ইরানের ধর্মীয় রাজধানী ও তেহরানের রাজকীয় রাজধানী বিরোধীদের কেন্দ্রে পরিণত হবে তা। কিন্তু প্রাথমিক এই বছরগুলোতে কুমের মোল্লাহরা শিয়া ঐতিহ্য অনুসরণ করে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন; যেকোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শাহর রোষ ডেকে আনত, কুমের পুনরুজ্জীবন শিশুকালেই দমন হয়ে যেত।

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় মারাত্মক ঘটনাটা ছিল ১৯২০ সালে কুমে এমন একজন মানুষের আগমন যিনি ইরানের সবচেয়ে বিখ্যাত মোল্লাহয় পরিণত হবেন। শায়খ হায়রি ইয়াযদি পশ্চিম ইরান থেকে কুমে আসার সময় কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে এসেছিলেন, তরুণ রুহুল্লাহ মুসাভি খোমেনি (১৯০২–৮৯) ছিলেন তাঁদের একজন। প্রথমে অবশ্য খোমেনিকে বরং প্রান্তিক চরিত্র মনে হয়েছে। ফায়যিয়াহ মাদ্রাসায় *ফিকহ* পড়াতেন তিনি, তবে পরে নৈতিকতা ও অতীন্দ্রিয়বাদে (*ইরফান*) বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন; *ফিকহের* তুলনায় এগুলোকে বরং 'প্রান্তিক' বিষয়ই বলা যেতে পারে। তাছাড়া, মোল্লাহ সদ্রার অতীন্দ্রিয়বাদের চর্চা করতেন খোমেনি, দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসন যাকে তীর্যক চোখে দেখে এসেছে। রাজনৈতিক প্রশ্নে তাঁর আগ্রহ আছে বলে মনে হলেও সেটা তাঁর যাজকীয় পেশার উন্নতির লক্ষ্যে চিন্তা করা হয়নি; বিশেষ করে প্রাচীন শিয়া নীরবতাবাদ অনুসরণকারী ও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে *উলেমাদের* উপর নিষেধাজ্ঞা জারিকারী আয়াতোল্লাহ বোরুজারদি মারজা পরিণত হওয়ার পর। ইরানে উত্তাল সময় ছিল এটা, কিন্তু স্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্বেগ সত্ত্বেও খোমেনি সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হননি। তারপরেও ১৯৪৪ সালে *কাশফ আল-আসরার* ('দ্য ডিসকভারি অভ সিক্রেটস') প্রকাশ করেছিলেন তিনি, সেই সময়ে তেমন একটা মনোযোগ টানতে না পারলেও এটাই শিয়া দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমবারের মতো পাহলভী নীতির প্রতি চ্যালেঞ্জের প্রয়াস ছিল। এই পর্যায়ে খোমেনি তখনও সংস্কারক, কোনও অর্থেই মৌলবাদী নন। তাঁর অবস্থান অনেকটা শরীয়াহ সাথে বিরোধপূর্ণ সংসদীয় আইন বাতিলের ক্ষমতাসহ *মুজতাহিদদের* প্যানেলের ধারণা মেনে নেওয়া ১৯০৬ সালের প্রথম মজলিসের অনুরূপ ছিল। তখনও পুরোনো সংবিধানের সমর্থক ছিলেন খোমেনি, এই আধুনিক প্রতিষ্ঠানকে ইসলামি প্রেক্ষিতে স্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছিলেন। কেবল ঈশ্বরেরই আইন জারি করার ক্ষমতা রয়েছে, যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি, শিয়াদের পক্ষে আতাতুর্ক বা রেযা শাহ'র মতো কোনও শাসককে মানা যুক্তিসঙ্গত নয়, যাঁরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে সাধ্যমতো সবই করেছেন। কিন্তু এমনি প্রাথমিক সময়ে তখনও একজন যাজকই সরাসরি দেশ শাসন করবেন, এমন পরামর্শ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রথাগত ছিলেন খোমেনি: শত শত বছরের শিয়া রেওয়াজ বিরোধী হত সেটা। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী ঈশ্বরের বিধিবিধানের উপর জ্ঞানধারী *মুজতাহিদগণ* একজন সাধারণ সুলতান নির্বাচনের অনুমতি রাখেন, যিনি তাদের জানা মতে স্বর্গীয় বিধান অমান্য করবেন না বা জনগণের উপর নির্যাতন করবেন না।[১০০]

খোমেনির বই প্রকাশিত হতে হতে ব্রিটিশরা জার্মানপন্থী সহানুভূতির কারণে শাহকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করেছে, বইটি দেখিয়ে দিয়েছিল যে স্বাধীনতা নিয়ে

AMARBOI.COM

শোরগোলময় নিশ্চয়তা সত্ত্বেও কাজারদের মতোই ইউরোপিয় শক্তির নিগড়ে বন্দি ছিলেন তিনি। ১৯৪৪ সালে রেযার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মুহাম্মদ রেযা (১৯১৯-৮০) উত্তরাধিকারী হন; তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত শান্ত এবং এই পর্যায়ে দুর্বল চরিত্র। এক কঠিন সময়ে সিংহাসনে অরোহণ করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইরানে দারুণরকম বিঘ্নকারী ছিল; শিল্পকারখানাগুলো অচল হয়ে গিয়েছিল, যন্ত্রপাতি ক্ষয়ে গেছে, ব্যাপকবিস্তারি দুর্ভিক্ষ চলছিল। সুযোগের অভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী; এমনি কঠিন একটা সময়ে ইরানি তেলের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ বিরাজ করছিল। *উলেমা*গণ অবশ্য খুশি ছিলেন। নতুন শাহ্ তখনও তাঁদের দাবির বিরোধিতা করার মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠেননি: আশুরার আবেগি নাটক ও আবৃত্তি আবার চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, ইরানিরা ফের হজ্জে যাবার অনুমতি লাভ করে; মহিলাদেরও বোরখা পরার অনুমতি দেওয়া হয়। বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে এই সময়: সোভিয়েতপন্থী মুহাম্মদ মুসাদ্দিকের (১৮৮১-১৯৬৭) নেতৃত্বে তুদেহ্ বা দ্য ন্যাশনাল ফ্রন্ট ইরানি তেলের জাতীয়করণের দাবি তোলে, এবং একটি নতুন প্যারামিলিটারি গ্রুপ ফেদায়িন-ই ইসলাম ('ফাইটার্স অভ ইসলাম')-সেক্যুলারিস্ট এজেন্ডার পক্ষাবলম্বনকারীদের সন্ত্রস্ত করে তুলছিল এরা।

১৯৪৫ সালে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের কারাবন্দি করে রাখা আয়াতোল্লাহ সায়ীদ মুস্তাফা কাশানি (c. ১৮৮২-১৯৬২)[১০১] ইরানে ফিরে আসার অনুমতি লাভ করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বিশাল জনসমাবেশ ঘটে, তাঁর গাড়ির নিচে গালিচা পেতে দেওয়া হয়। বাস ভর্তি করে বিপুল সংখ্যক মেধাবী *উলেমা* কাশানির দেশ প্রত্যাবর্তনে স্বাগত জানাতে অনেক দূর পথ পাড়ি দিয়ে হাজির হয়েছিলেন, দলে দলে নেমে এসেছিল *মাদ্রাসার* মহাআনন্দিত ছাত্ররা।[১০২] কাশানি ছিলেন এই সময়ে ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের তৃতীয় আলামত। তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা হয়তো অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষককে আভাস দিয়ে থাকবে যে, ইরানিরা সম্ভবত কোনও সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহের সাথে রাজনৈতিক বিষয়ে যাজকদের অনুসরণ করবে। কাশিয়ানি ও খোমেনি পরস্পরকে ভালো করেই চিনতেন, কিন্তু আসলে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। খোমেনি যেখানে ছিলেন দারুণ শৃঙ্খলা পরায়ণ, কোনও উদ্দেশ্য অর্জনের একরোখা, কাশানি সেখানে অনেক বেশি খেয়ালি, হুজুগে মেতে উঠতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁর কিছু পরিকল্পনা নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য ছিল না। জার্মানপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্যে ব্রিটিশরা ১৯৪৩ সালে তাঁকে কারাবন্দি করেছিল: কাশানির চোখে নাৎসিদের দুরাচার তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, বরং ব্রিটিশদের কবল থেকে ইরানিদের রক্ষা পেতে সাহায্য করতে পারার ব্যাপারটাই

আসল।[১০৩] ফেদায়িন-ই ইসলামের সাথেও যোগাযোগ ছিল কাশানির। ১৯৪৯ সালে তাদের একজন শাহকে হত্যার চেষ্টা করলে কাশানিকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। বেইরুত থেকে ন্যাশনাল ফ্রন্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে তেলের জাতীয়করণের পক্ষে একটি ফতওয়া জারি করেন তিনি। ১৯৫০ সালে ইরানে ফিরে আসার অনুমতি পান কাশানি, নায়কোচিত অভ্যর্থনা লাভ করেন। তাঁর আগমনের আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই জনতা মেহরাবাদ এয়াপোর্টে ভীড় জমাতে শুরু করে। তেল ইস্যুর কল্যাণে মুসাদ্দিকের নাশনাল ফ্রন্ট সবে নির্বাচনে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিল, প্রবীন *উলেমাদের* অভ্যর্থনা কমিটিতে যোগ দেন তিনি; কাশানি বিমান থেকে নেমে এলে শোরগোল এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, তাঁর সম্মানে নির্ধারিত ভাষণ বাদ দিতে হয়েছিল। তিনি তেহরানের নিজ বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলে জনতা আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, অনেক সময় তার গাড়িটিকে রাস্তা থেকে শূন্যে তুলে ফেলছিল তারা।[১০৪]

এই বছরগুলোর চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল তেল সংকট,[১০৫] ১৯৫৩ সালে অ্যাংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানির সমর্থক প্রধানমন্ত্রী আলি রাযমারা ফেদায়িনদের হাতে নিহত হলে এই সংকট প্রবল হয়ে ওঠে। দুই দিন পরে মজলিস সরকারকে তেল সম্পদ জাতীয়করণের পরামর্শ দেয়। শাহর প্রার্থীকে প্রতিস্থাপিত করে মুসাদ্দিক পরিণত হন প্রধানমন্ত্রীতে। ইরানি তেল জাতীয়করণ করা হয়, কিন্তু দ্য হেগের আন্তর্জাতিক আদালত নিজস্ব তেল সম্পদ জাতীয়করণে ইরানের অধিকারের পক্ষে রায় দিলেও ব্রিটিশ ও আমেরিকান তেল কোম্পানিগুলো একজোট হয়ে ইরানি তেলের বিরুদ্ধে অঘোষিত অবরোধে যোগ দেয়। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া মুসাদ্দিককে ইরানকে ইউএসএসআর-এর হাতে তুলে দেওয়া (যদিও মুসাদ্দিক ইরানকে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখতে ইচ্ছুক জাতীয়তাবাদী ছিলেন) বিপজ্জনক ফ্যানাটিক, তস্কর (যদিও তিনি সব সময়ই ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন) ও কমিউনিস্ট হিসাবে চিত্রিত করে। অবশ্য ইরানে মুসাদ্দিক ছিলেন বীর, অনেকটা স্যুয়েয খাল জাতীয়করণের পর নাসের যেমনটা পরিণত হবেন। শাহকে বঞ্চিত করে নিজ হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে শুরু করেন তিনি। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে তিনি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ দাবি করামাত্র শাহ তাঁকে বরখাস্ত করেন, কিন্তু মুসাদ্দিকের পক্ষে এক গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়, ফলে রয়ালিস্টরা সতর্ক হয়ে ওঠে, কারণ এতে বোঝা যাচ্ছিল ইরানিরা প্রজাতান্ত্রিক শাসন দাবি করার উপান্তে পৌঁছে গেছে। দাঙ্গা মুসাদ্দিকের অপসারণ আকাঙ্ক্ষী লন্ডন ও ওয়াশিংটনকেও অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। এইসব বিক্ষোভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন আয়াতোল্লাহ কাশানি, কাফনের কাপড় পরে রাস্তায় নেমে স্বৈরাচারের

বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেন। মাত্র দুই দিন পরে মুসাদ্দিককে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হন শাহ।

এমনি মুহূর্তে এযাবত উদারশক্তি হিসাবে বিবেচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানে রাজনৈতিক সরলতা হারায়। ১৯৫৩ সাল নাগাদ মুসাদ্দিকের পক্ষে সমর্থন হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। কখনও সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ আনুগত্য লাভ করতে পারেননি তিনি। কিন্তু তেল অবরোধ এবার দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, *বাজারিরা* তাঁকে ত্যাগ করেছিল। কাশানিসহ। *উলেমারা*ও: মুসাদ্দিক ধর্মকে ব্যক্তিপর্যায়ে অবনমিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অন্তপ্রাণ সেক্যুলারিস্ট ছিলেন। মজলিস বাতিল করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ভেবেছিলেন নিজেকে। এতে শিয়া যাজকগোষ্ঠী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ভীত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইসব পুরোনো মিত্ররা মুসাদ্দিককে পরিত্যাগ করলেও সেক্যুলারিস্ট তুদেহ পার্টি তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসে। ফলে প্রেসিডেন্ট ডিউইট আইজেনহাওয়ারের নেতৃত্বাধীন মার্কিন সরকার কমিউনিস্টপন্থী অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে ওঠে। এই কারণে মুসাদ্দিককে অপসারণ করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ও সিআইএ-র পরিকল্পিত অভ্যুত্থান প্রয়াস অপারেশন অ্যাক্সিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের অনুমোদন দেন তিনি। অবশ্য ১৯৫৩ সালের আগস্টে মুসাদ্দিক এই ষড়যন্ত্রের আভাস পান, জানাজানি হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তানুযায়ী দেশ থেকে চলে যান শাহ ও রানি, কিন্তু তিন দিন পরে সিআইএ এজেন্টদের আশ্রয়ে আবার ফিরে আসেন। তারা অসন্তুষ্ট ইরানি ও সামরিক বাহিনীর প্রধান ব্যক্তিদের মাধ্যমে অভ্যুত্থানের আয়োজন করে যাতে মুসাদ্দিক গদিচ্যুত হন। পরে এক সামরিক আদালতে তাঁর বিচার করা হয়, নিজের পক্ষে অত্যন্ত চমৎকারভাবে যুক্তি তুলে ধরেন তিনি, মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে গেলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নজরবন্দি হয়ে কাটাতে হয়েছিল তাঁকে।

দেশে উল্লেখযোগ্য অসন্তোষ বিরাজ না করলে ১৯৫৩ সালের অভ্যুত্থান সফল হতে পারত না, তবে এটাও ঠিক যে বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া এমন ঘটনা ঘটত না। ইরানিরা এত দিন পর্যন্ত বন্ধু জেনে আসা দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেঈমানি ও অপমানের শিকার হয়েছে বলে মনে করেছে। আমেরিকা এখন রাশিয়া ও ব্রিটিশদের পদচিহ্ন অনুসরণ করছে, নিজেদের ফায়দা অর্জনের জন্যে ইরানের ঘটনাপ্রবাহের বিশ্রিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। ১৯৫৪ সালে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। এক নতুন তেল চুক্তি তেল উৎপাদন, এর বিপনন, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মুনাফা ওয়ার্ল্ড কার্টেল কোম্পানিগুলোর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল।[১০৬] ব্যাপারটা চিন্তাশীল ইরানিদের অসুস্থ করে তোলে। আন্তর্জাতিক আদালতের সমর্থন নিয়ে

নিজেদের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ পেতে চেষ্টা করেছিল তারা, কিন্তু তার মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ভীত হয়ে উঠেছিলেন আয়াতোল্লাহ কাশানি। আমেরিকার সাহায্য ইরানে মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু লোকের উপকারে এসেছে, প্রতিবাদ করেন তিনি, পেট্রডলারের হিসাবে ইরান থেকে যে পরিমাণ সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে গেছে তার শতভাগের এক ভাগেরও সমান নয় তা। 'আমেরিকান উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা তেলের যে শত শত মিলিয়ন ডলার লাভ করবে,' ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তিনি, 'তার বিনিময়ে নিপীড়িত জাতি মুক্তির সমস্ত আশা খোয়াবে, পাশ্চাত্য বিশ্ব সম্পর্কে নেতিবাচক মত সৃষ্টি হবে।'[১০৭]

অন্তত এই দিক থেকে ঠিক কথাই বলেছিলেন কাশানি। ইরানিরা অপারেশন অ্যাজাক্সের কথা ভাববার সময় মুসাদ্দিকের পক্ষ থেকে তাদের নিজেদের লোকদের সরে যাওয়ার কথা ভুলে যায়, মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থে একা হাতে তাদের উপর শাহর স্বৈরাচার চাপিয়ে দিয়েছে। ১৯৬০-র দশকের গোড়ার দিকে তিক্ততা প্রবল হয়ে ওঠে, শাহর শাসন এই সময় আরও স্বৈরচারী ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। দ্বৈতনীতি চলছিল যেন। আমেরিকা গর্বের সাথে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করলেও নিজ শাসনের কোনও রকম বিরোধিতার অনুমতি দিতে অস্বীকারকারী, ইরানিদের মানবাধিকার অস্বীকার যাওয়া শাহকে আন্তরিকভাবে সমর্থন যোগাচ্ছিল। ১৯৫৩ সালের পর ইরান আমেরিকার সুবিধাপ্রাপ্ত মিত্রে পরিণত হয়। প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে ইরান ছিল আমেরিকান সেবা ও প্রযুক্তির প্রধান বাজার। আমেরিকা ইরানকে অর্থনৈতিক সোনার খনি মনে করত। বছর পরিক্রমায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশদের প্রয়োগ করা রাজনৈতিক প্যাটার্নই কাজে লাগিয়েছে: তেল বাজারে শক্ত হাতের কৌশল, রাজণ্যের উপর অন্যায় প্রভাব, কূটনৈতিক দায়মুক্তির দাবি, ব্যবসা ও বাণিজ্য ছাড় এবং খোদ ইরানিদের প্রতি একই ধরনের পরিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি। আমেরিকান ব্যবসায়ী ও উপদেষ্টাতে দেশ ভরে গিয়েছিল, অনেক টাকা পয়সার মালিক বনে গিয়েছিল তারা। তাদের জীবন ধারার সাথে অধিকাংশ ইরানির জীবনধারার বিশাল পার্থক্য ছিল; সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করত তারা, বেশির ভাগই সিংহাসনের সাথে সম্পর্কিত চুক্তির অধীনে কাজ করত বলে শাসকগোষ্ঠীর সাথে মারাত্মকভাবে সম্পর্কিত হয়ে উঠেছিল। এটা ছিল অদূরদর্শী, স্বার্থপর নীতি শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটা দানবীয় চেহারা দেবে।

মেরুকৃত দেশে পরিণত হচ্ছিল ইরান: আমেরিকান বুম থেকে অল্প কিছু মানুষ ফায়দা পাচ্ছিল, কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পড়ে ছিল পেছনে। ইরান একা ছিল

AMARBOI.COM

না। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ মনে করা হচ্ছিল যেন আমাদের বিবেচিত সমস্ত দেশের সমাজগুলো দুটি ভিন্ন শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ আধুনিক কালকে মুক্তিদায়ী ও ক্ষমতায়নের উপায় হিসাবে দেখছিল, বাকিরা একে অশুভ আক্রমণ বিবেচনা করেছে। ভীতি, ঘৃণা ও কোনওমতে চাপা পড়া ক্রোধ বিরাজ করছিল। অচিরেই তীব্রভাবে ক্রোধবোধকারী এই মৌলবাদীরা স্থির করবে যে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে প্রতি-সংস্কৃতি গড়ে তোলা আর যথেষ্ট নয়। অবশ্যই সংগঠিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে তাদের।

AMARBOI.COM

৮. সংগঠন
(১৯৬০–৭৪)

১৯৬০-র দশক নাগাদ গোটা পশ্চিম ও মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লবের হাওয়া ভেসে বেড়াচ্ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় তরুণরা রাস্তায় নেমে বাবা-মার আধুনিক রেওয়াজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অধিকতর ন্যায় ভিত্তিক ও সাম্যবাদী ব্যবস্থার দাবি করে তারা, তাদের সরকারের বস্তুবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও শোভেনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, জাতীয় যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকার করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে অস্বীকৃতি জানায়। অনেক দশক ধরে মৌলবাদীরা যা করে আসছিল ঠিক সেটাই করতে শুরু করেছিল ষাটের তরুণ সমাজ: মূলধারার মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবে একটা 'প্রতি-সংস্কৃতি,' 'বিকল্প সমাজ' গড়ে তুলতে শুরু করেছিল তারা। নানাভাবেই আরও বেশি করে ধর্মীয় জীবনধারার দাবি করছিল। বেশিরভাগেরই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস রাখার বা একেশ্বরবাদের কর্তৃত্বপরায়ণ কাঠামোয় বিশ্বাস করার ফুরসত ছিল না। তার বদলে কাঠমান্ডু গেছে তারা বা প্রাচ্যের ধ্যানমূলক বা অতীন্দ্রিয়বাদী কৌশলের কাছে সান্ত্বনা খোঁজার প্রয়াস পেয়েছে। অন্যরা মাদক প্রভাবিত অভিযাত্রা, দুর্জ্ঞেয়মূলক ধ্যান বা এরহার্ড সেমিনারস ট্রেনিং (ইএসটি)-র মতো ব্যক্তিগত পরিবর্তনের কৌশলের ভেতর দুর্জ্ঞেয়র সন্ধান পেয়েছে। *মিথোসের* পক্ষে এক ধরনের ক্ষুধা বিরাজ করছিল, এবং সেটা ছিল নতুন পাশ্চাত্যের অর্থডক্সিতে পরিণত হওয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রত্যাখ্যান। তবে এটা আসলে সত্যিকারের যুক্তিবাদের নয়, বরং এর চরম ধরনের প্রত্যাখ্যান ছিল। বিংশ শতাব্দীর খোদ বিজ্ঞানই নিজের সীমাবদ্ধতা ও যোগ্যতার আওতা সম্পর্কে দারুণভাবে শৃঙ্খলিত ও নীতিগতভাবে সতর্ক, সুবোধ ছিল। কিন্তু আধুনিকতার চলমান মেজাজ বিজ্ঞানকে আদর্শিক করে তুলেছিল, সত্যে পৌছানোর অন্য যেকোনও উপায়কে স্থান দিতে অস্বীকার গেছে। ষাটের দশকে তারুণ্যের

AMARBOI.COM

বিপ্লব ছিল অংশত যৌক্তিক ভাষার অবৈধ আধিপত্য ও *মিথোস* ও *লোগোসের* অবদমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

কিন্তু অধিকতর স্বজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞান অর্জনের এমনি শৃঙ্খলিত উপায় সম্পর্কে উপলব্ধি যেহেতু সেই আধুনিকতার আবির্ভাবের পর থেকেই পাশ্চাত্যে অবহেলিত হয়ে এসেছে, ফলে আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্যে ষাটের এই সন্ধান প্রায়শঃই আত্ম-প্রমোদপূর্ণ ও বেসামাল ছিল। ধর্মীয় রেডিক্যালদের দর্শন ও নীতিমালায়ও ভ্রান্তি ছিল; আধুনিক সমাজের সেক্যুলারাইজেশন ও যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে নিজস্ব আক্রমণ সংগঠিত করে তুলতে যাচ্ছিল তারা। মৌলবাদীরা সংগঠিত হতে শুরু করেছিল। আধুনিকতাকে প্রায়শঃই আগ্রাসী হামলা মনে করে এসেছে তারা। আধুনিক চেতনা অতীতের সেকেলে চিন্তাধারা হতে মুক্তি দাবি করেছে; প্রগতির আধুনিক আদর্শ অযৌক্তিক এবং সে কারণে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মনে হওয়া সকল বিশ্বাস, আচরণ ও প্রতিষ্ঠানের অবসান দাবি করেছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মতবাদ প্রায়শঃই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। অনেক সময়, স্কোপস ট্রায়ালের সময় উদারপন্থীদের কেসের মতো অস্ত্রকে পরিহাস করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে, আধুনিকতা যেখানে অনেক বেশি সমস্যাপূর্ণ ছিল, পদ্ধতি ছিল আরও বেশি নিষ্ঠুর, হত্যালীলা, দেশান্তরীকরণ ও নির্যাতন শিবির জড়িত ছিল এর সাথে। ১৯৬০ ও ১৯৭০-র দশকে নাগাদ অনেক ধার্মিক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, উদারপন্থী ও সেক্যুলারিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল তারা। তাদের বিশ্বাস মোতাবেক এই দলটি তাদের নির্যাতন করেছে ও প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু এই ধার্মিক রেডিক্যালরা ছিল তাদের সময়েরই মানুষ। আধুনিক অস্ত্র হাতেই লড়াই করেছে, আধুনিক আদর্শ গড়ে তুলেছে।

আমেরিকান ও ফ্রেঞ্চ বিপ্লবের পর থেকে পাশ্চাত্য রাজনীতি আদর্শিক হয়ে উঠেছিল। লোকে যুক্তির কালের আলোকন আদর্শের পক্ষে বিরাট সব যুদ্ধে অংশ নিয়েছে: মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবীয় সুখ ও সামাজিক ন্যায়বিচার। পাশ্চাত্য উদারনৈতিক ঐকমত্যের বিশ্বাস ছিল, শিক্ষার ভেতর দিয়ে সমাজ ও রাজনীতি আরও বেশি যৌক্তিক ও ঐক্যবদ্ধ হবে। মানুষকে যুদ্ধের জন্যে ঐক্যবদ্ধ করার একটি উপায় সেক্যুলার আদর্শ ছিল একটি আধুনিক বিশ্বাস পদ্ধতি যা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করে একে একটা যুক্তি প্রদান করে।[১] যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে আবেদন সৃষ্টির করার লক্ষ্যে আদর্শকে সহজ ইমেজে প্রকাশ করা হয়, যাকে প্রায়শঃই 'জনগণই ক্ষমতার উৎস!' বা 'ঘরের শত্রু বিভীষণ!' জাতীয় শ্লোগানে সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব। এমনি অতি সরল সত্যি সবকিছু ব্যাখ্যা করে বলে বিশ্বাস করা হয়। আদর্শবাদীরা বিশ্বাস করে, বিশ্ব সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে, তারা সাম্প্রতিক সমস্যার কারণ খুঁজে বের করে এবং এর থেকে

AMARBOI.COM

উদ্ধার পাওয়ার একটা উপায় বের করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা বিশ্বের ধ্বংসের জন্যে দায়ী করা যেতে পারে এমন কোনও বিশেষ দলের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; অন্য একটি দল সব ঠিক করে দেবে। আধুনিক বিশ্বে রাজনীতির আর অভিজাত গোষ্ঠীর পেশা থাকা সম্ভব না হওয়ায় সমগ্র জনগণের সমর্থন লাভের জন্যে আদর্শকে অবশ্যই যথেষ্ট সরল হওয়ার প্রয়োজন ছিল যাতে সামান্য মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিও তার মানে আত্মস্থ করতে পারে।

কোনও কোনও দল 'মিথ্যাবিশ্বাসে' আক্রান্ত থাকায় কোনওদিনই আদর্শ উপলব্ধি করতে পারবে না, এমনি বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ প্রায়শঃই রুদ্ধ ব্যবস্থা হয়ে থাকে, বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্বের সাথে নিতে পারে না। পুঁজিবাদীদের গোটা বিশ্বের সমস্ত দুরবস্থার জন্যে দায়ী বিবেচনাকারী মার্ক্সবাদীরা পুঁজিবাদের মূল্যবোধ বুঝতে পারে না। এবং বিপরীতক্রমে। উপনিবেশবাদীরা উদীয়মান জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিল। যায়নবাদী ও আরবরা একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারে না। সকল আদর্শ একটি অবাস্তব, অনেকে বলবেন, অবাস্তবায়নযোগ্য ইউটোপিয়ার কল্পনা করে। স্বভাবগতভাবেই তারা দারুণভাবে নৈর্বাচনিক হয়, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন বা সাম্যের মতো পরিবেশে বিরাজ করা ধারণা, আবেগ ও উৎসাহ একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শ কর্তৃক নির্বাচিত হতে পারে, তো তাতে ইতিহাসের একই মৌল চেতনা থেকে উদ্ভূত একই ধরনের আদর্শের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে।

ইতিহাসবিদ এডমান্ড বার্ক (১৭২৯–৯৭) ছিলেন অন্যতম যারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোনও একদল মানুষ প্রতিষ্ঠানের মতাদর্শকে (তা নিজেই এক সময় বিপ্লবী থেকে থাকতে পারে) চ্যালেঞ্জ করতে চাইলে তাদের নিজস্ব প্রতিবিপ্লবী আদর্শ গড়ে তুলতে হবে। এটাই ছিল ১৯৬০ ১৯৭০-র দশকের বেশির ভাগ অসন্তুষ্ট ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমের অবস্থান। তাদের চোখে আধুনিক প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিক ফ্যান্টাসির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এক সময়ের বিপ্লবী ও রেডিক্যাল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, যা এখন এতটাই কর্তৃত্বপরায়ণ ও আধিপত্যবাদী হয়ে উঠেছিল যে সেগুলোকে মনে হচ্ছিল স্বতঃসিদ্ধ। সকলেই দুর্বল অবস্থায় ছিল তারা, সকলেই অনেক সময় যৌক্তিকভাবেই বিশ্বাস করেছে, সেক্যুলারিস্ট ও উদারপন্থীরা তাদের নিশ্চিহ্ন করতে চায়। একটি ধর্মীয় আদর্শ গড়ে তুলতে এমনভাবে তাদের ঐতিহ্যের *মিথোস* ও প্রতীকসমূহকে নতুন রূপ দিতে হবে যাতে সেগুলো কর্মতৎপরতার জোরাল নীলনকশায় পরিণত হয়ে মানুষকে রুখে দাঁড়িয়ে ধর্মকে নিশ্চিহ্নতার হাত থেকে বাঁচাতে বাধ্য করবে। এইসব ধর্মীয় আদর্শকের কেউ কেউ রক্ষণশীল কালের আধ্যাত্মিকায় গভীরভাবে আপ্লুত ছিল। তারা অতীন্দ্রিয়বাদী ছিল

AMARBOI.COM

এবং তাদের অদৃশ্যের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা মিথ ও আচারের উপলব্ধি গড়ে তুলেছিল। তবে একটা সমস্যা ছিল। প্রাক আধুনিক যুগে *মিথোসকে* কখনওই বাস্তব প্রয়োগের জন্যে ভাবা হয়নি। নিরেট কর্মপরিকল্পনার যোগানদার কল্পনা করা হয়নি একে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে স্প্রিংবোর্ডে *মিথোস* ব্যবহার করার ফল ছিল বিপর্যয়কর। এখন সেক্যুলার বিশ্বের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলার পরিকল্পনার সময় এইসব ধর্মীয় রেডিক্যালদের মিথসমূহকে মতাদর্শে পরিণত করতে হবে।

মিশরে ১৯৬০-র দশকে ইসলাম অব্যাহত আদর্শিক আক্রমণের শিকার হয়েছিল। জনপ্রিয়তার শিখরে অবস্থান করছিলেন নাসের, 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' ডাক দিয়েছিলেন তিনি; এর বাস্তবায়নের নাম দিয়েছিলেন 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'। মে, ১৯৬২ সালে ঘোষিত ন্যাশনাল চার্টারে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেন তিনি। এটা ছিল এমন এক আদর্শ যা পুঁজিবাদ ও রাজতন্ত্রের ব্যর্থতা 'প্রমাণ' করেছে, কেবল সমাজতন্ত্রই নিজস্ব সরকার, উৎপাদনশীলতা ও শিল্পায়ন হিসাবে সংজ্ঞায়িত 'প্রগতি'র দিকে নিয়ে যেতে পারে। শাসক গোষ্ঠী ধর্মকে অপরিবর্তনীয়ভাবে অতীতের বিষয় বলে ধরে নিয়েছিল। মুসলিম ব্রাদারহুডের ধ্বংসের পর নাসের আর ইসলামি বুলি ব্যবহারের দিকে যাননি। ১৯৬১ সালে সরকার প্রাচীন মধ্যযুগীয় শিক্ষা আঁকড়ে থাকার জন্যে *উলেমাদের* ও 'নিজেকে বর্তমান সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পারা' 'আত্মরক্ষামূলক, রক্ষণশীল ও আড়ষ্ট' দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে আযহারের তীব্র নিন্দা করে। নাসেরের কথায় যুক্তি ছিল। মিশরিয় *উলেমাগণ* প্রকৃতপক্ষেই আধুনিক বিশ্বের বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, সংস্কার প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন তাঁরা।[২] নিজেদের পশ্চাদপদ করে তুলে মিশরিয় সমাজের আধুনিকায়িত ক্ষেত্রগুলোর উপর সমস্ত প্রভাব খোয়াচ্ছিলেন। একইভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রান্তিক গ্রুপগুলোর নৈতিক, অন্যায় সন্ত্রাসবাদ সমাজের ধ্বংসের জন্যে ব্যাপকভাবে দায়ী ছিল। মুসলিম প্রতিষ্ঠান যেন নিজেকে কর্মহীন ও আধুনিক বিশ্বের কাছে নিজের অযোগ্যতাই স্বপষ্ট করে তুলছিল।

মিশর ও সিরিয়ায় ১৯৬০-র দশকে 'নাসেরবাদী' ইতিহাসবিদগণ নতুন সেক্যুলারিস্ট আদর্শকে শক্তিশালী করে তোলেন। ইসলাম পরিণত হয়েছিল জাতির সকল দুর্বলতার কারণ; একে পরিণত করা হয়েছিল 'আউট গ্রুপের' ভূমিকাবরণকারীতে, আরব দেশগুলো প্রগতি অর্জন করতে চাইলে যাকে অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করতে হবে। সিরিয় পণ্ডিত যাকি আল-আরযুসি বিশ্বাস করতেন, আরবরা বিশ্বকে ইসলাম উপহার দিয়েছিল, এই কথা ভেবে সময় নষ্ট করার বদলে

AMARBOI.COM

ইতিহাসবিদদের উচিত বস্তুবাদী সংস্কৃতিতে তাদের অবদানের (উদাহরণ স্বরূপ, হিয়েরোগ্লাফিক থেকে বর্ণমালায় পরিবর্তন) উপর জোর দেওয়া। ধর্মের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলেই আরবরা ইউরোপের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে, আধ্যাত্মিক বিশ্বের বদলে ভৌত জগতের প্রতি মনোযোগ দিয়েছে তারা, আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। শিবলি আল-আয়াসমি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মুসলিম ইতিহাসবিদদের প্রাক-মুসলিম আরবীয় সভ্যতাকে *জাহিলিয়াহ* ('অজ্ঞতার কাল') হিসাবে নাকচ করে দেওয়াটা নিন্দনীয়, কারণ প্রাচীন ইয়েমেনে এর সাংস্কৃতিক সাফল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। ইয়াসিন আল-হাফিজ কেবল শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো ইসলামি ঐতিহাসিক সূত্রের উপর বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। মৃত সুদূর অতীতের অসঠিক স্মৃতির উপর ভিত্তি করে আধুনিক আদর্শ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ইতিহাসবিদদের অবশ্যই আরও বিজ্ঞানভিত্তিক ও দ্বান্দ্বিক ইতিহাসবিজ্ঞান নির্মাণ করতে হবে, 'প্রাচীন সমাজের সকল কুসংস্কার ধ্বংস করার জন্যে যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোগ দিতে হবে।'[৩] ধর্মই আরবদের টেনে ধরে রাখা 'মিথ্যা সচেতনতা'। সুতরাং, যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির পথে আর সব বাধার মতো একে অবশ্যই অপসারণ করতে হবে। যেকোনও আদর্শের মতোই এইসব যুক্তি ছিল নির্বাচনিক। ধর্মের বর্ণনা ছিল সরল ও ভ্রান্ত। এটা অবাস্তবও ছিল। আধুনিক বিশ্বে ধর্মের স্থান যাই হোক না কেন (এখনও তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাকি রয়েছে), এমনকি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ও সেগুলোর কর্মীদের সরিয়ে ফেলা হলেও মানুষের মনে টিকে থাকা জাতিকে গড়ে তোলা অতীত মুছে ফেলা সব সময়ই অসম্ভব।

এরই সাড়া হিসাবে ধর্মীয় আদর্শবাদীরাও একই রকম সরলবাদী ও আগ্রাসী ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, জীবনের তাগিদে তারা লড়াই করছে। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানি সাংবাদিক ও রাজনীতিক আবুল আলা মাওদুদি (১৯০৩–৭৯) মিশরে তাঁর রচনা প্রকাশ শুরু করেন।[৪] মাওদুদির ভয় ছিল যে ইসলাম ধ্বংস হওয়ার পথে। ইসলামকে শেষ করে মুছে ফেলার জন্যে পশ্চিমের বিপুল শক্তিকে একত্রিত হতে দেখেছেন তিনি। মহাসংকটের এক মুহূর্ত ছিল সেটা। মাওদুদি বিশ্বাস করতেন, ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা জগৎ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে অন্যদের হাতে রাজনীতি তুলে দিতে পারে না। তাদের অবশ্যই একসাথে মিলে অগ্রসরমান ও *লা-দিনি* ('ধর্মহীন') সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে শক্তভাবে দলবদ্ধ হতে হবে। জনগণকে সংগঠিত করতে মাওদুদি ইসলামকে যাতে সময়ের অন্য অগ্রসর আদর্শের মতো গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয় সেজন্যে একে একটি যুক্তিপূর্ণ, পদ্ধতিগত উপায়ে উপস্থানের প্রয়াস পান।[৫] সুতরাং, ইসলামের গোটা জটিল

মিথোস ও আধ্যাত্মিকতাকে বাস্তবভিত্তিক কর্মকাণ্ডের দিকে চালিত করার লক্ষ্যে প্রণীত একটি যৌক্তিক ডিসকোর্স *লোগোসে* পরিণত করার প্রয়াস পাচিছলেন তিনি। রক্ষণশীল বিশ্বে এধরনের যেকোনও প্রয়াসকে মারাত্মকভাবে ভ্রান্তিপূর্ণ হিসাবে নিন্দা জানানো হত, কিন্তু মুসলিমরা আর তখন প্রাক আধুনিক কালে বাস করছিল না। ভয়ানক, সহিংস বিংশ শতাব্দীতে টিকে থাকতে হলে তাদের পুরোনো ধ্যানধারণাকে পর্যালোচনা করে ধর্মকে আধুনিক করার প্রয়োজন ছিল হয়তো?

আমরা আরও যেসব আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদের কাজ আলোচনা করব তাদের মতোই মাওদুদির আদর্শের ভিত্তি ছিল আল্লাহ'র সার্বভৌমত্বের মতবাদ। এই ব্যাপারটা সাথে সাথে আধুনিক বিশ্বের প্রতি অস্ত্র তাক করে, কারণ তা আধুনিকতার প্রতিটি পবিত্র সত্যির বিরোধিতা করে। যেহেতু কেবল আল্লাহই মানবীয় বিষয়াদির শাসন করেন, তিনিই যেহেতু সর্বোচ্চ আইনদাতা, সুতরাং মানুষের নিজের আইন তৈরি করার বা নিয়তিকে নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কোনও অধিকার নেই। মানবজাতির স্বাধীনতা ও মানুষের সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ ধারণাটিকে আক্রমণ করার মাধ্যমে মাওদুদি গোটা সেক্যুলারিস্ট রীতিকেই অগ্রাহ্য করেছেন।

> আমাদের অস্তিত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা বা আমাদের জাগতিক কর্তৃত্বের সীমানা নির্ধারিত করে দেওয়ার দায়িত্বটি আমাদের নয়, এইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আর কারও নেই...কোনও কিছুরই সার্বভৌমত্ব দাবি করার অধিকার নেই, তা সে মানুষ, পরিবার, শ্রেণী, বা একদল মানুষ বা এমনকি সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতি হোক। কেবল আল্লাহই সার্বভৌম, এবং তাঁর নির্দেশ ইসলামের বিধিবিধান।[৬]

লক, কান্ট এবং আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদারগণের তাঁদের কবরে নড়েচড়ে ওঠার কথা। কিন্তু আসলে যেকোনও আধুনিক মানুষের মতো স্বাধীনতার অনুরক্ত ছিলেন মাওদুদি, একটি ইসলামি মুক্তির তত্ত্ব তুলে ধরছিলেন তিনি। যেহেতু আল্লাহই সার্বভৌম, কোনও মানুষের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে কেউই বাধ্য নয়। আল্লাহ'র বিধান (কোরান ও সুন্নাহর মাধ্যমে প্রত্যাদিষ্ট) অনুযায়ী শাসন করতে অস্বীকারকারী কোনও শাসকই তাঁর প্রজাদের আনুগত্য দাবি করতে পারেন না। এমন অবস্থায় বিপ্লব কেবল অধিকার নয়, বরং দায়িত্ব।

সুতরাং ইসলামি ব্যবস্থা এটা নিশ্চিত করেছে যে রাষ্ট্র কোনও শাসকের খামখেয়ালির ও উচ্চাভিলাষের বস্তু নয়। মুসলিমদের তা খেয়ালখুশি আর মানবীয়

AMARBOI.COM

নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য অশুভ থেকে রক্ষা করেছে। ইসলামি আইনে শুরাহ্‌র ('পরামর্শ') নীতি অনুযায়ী খলিফা প্রজাদের সাথে আলোচনা করতে বাধ্য, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শের মতো জনগণের কাছ থেকে বৈধতা লাভ করে থাকে। খলিফা বা জনগণের কেউই নিজেদের মতো করে আইন প্রণয়ন করতে পারেন না। তারা কেবল শরীয়াহ প্রয়োগ করতে পারেন। সুতরাং, মুসলিমদের অবশ্যই উপনিবেশিক শক্তির আরোপিত পাশ্চাত্যকৃত সরকারের ধরনকে প্রতিহত করতে হবে, যেহেতু এই ধরনের সরকারগুলো আল্লাহ'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বোঝায় ও তাঁর কর্তৃত্বকে ছিনতাই করে।[৭] মানুষ একবার অহমিকাভরে নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিলে অশুভ, নির্যাতন, শোষণ ও স্বৈরাচারের বিপদ সৃষ্টি হয়। গোঁড়া সেক্যুলারিস্টের কাছে অদ্ভুত ঠেকা এক মুক্তির ধর্মতত্ত্ব, কিন্তু যেকোনও আদর্শের প্রকৃতিই এমন যে এর অন্তর্দৃষ্টি বিরোধীদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মাওদুদি চলমান যুগচেতনার মূল্যবোধসমূহের ধারক ও ভাগিদার ছিলেন; তিনি মুক্তি ও আইনের শাসনে বিশ্বাস করতেন, এসবকে স্বৈরাচার ও দুর্নীতি ঠেকানোর একটা উপায় হিসাবেও দেখেছেন। কেবল এইসব আদর্শকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে ইসলামি চেহারা দিয়েছেন তিনি, কিন্তু সেক্যুলারিজমের 'মেকি মানসিকতা' নিয়ে কারও পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব হবে না।

একটি আদর্শের মূল্যবোধেও বিশ্বাস করতেন মাওদুদি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ইসলাম ফ্যাসিবাদ বা মার্ক্সবাদেরই অনুরূপ একটি বিপ্লবী আদর্শ, কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।[৮] নাৎসি ও মার্ক্সিস্টরা অন্য মানুষকে দাসত্বে শৃঙ্খলিত করেছে, অথচ ইসলাম তাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য যেকোনও কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছে। প্রকৃত আদর্শবাদী মাওদুদি অন্য সকল ব্যবস্থাকে নিরাময়ের অতীত ভ্রান্তিপূর্ণ মনে করেছেন।[৯] গণতন্ত্র বিশৃঙ্খলা, লোভ ও মব শাসনের দিকে চালিত করে; পুঁজিবাদ শ্রেণীর সুবিধাকে লালন করে ও গোটা বিশ্বকে ব্যাংকারদের একটা গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেয়; কমিউনিজম মানবীয় উদ্যোগের গলা টিপে মারে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিনাশ ঘটায়। এগুলো সাধারণ আদর্শগত অতিসরলীকরণ। মাওদুদি বিস্তারিত বিষয় ও সমস্যা পাশ কাটিয়ে গেছেন। ইসলামি শুরা কেমন করে প্রায়োগিক অর্থে পাশ্চাত্য দলনমূলক গণতন্ত্র থেকে ভিন্ন? কৃষি ভিত্তিক আইনি বিধান শরীয়াহ কীভাবে আধুনিক শিল্পায়িত বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে খাপ খাইয়ে নেবে? মাওদুদি যুক্তি দেখিয়েছেন, একটি ইসলামি রাষ্ট্র সমগ্রতাবাদী হবে, কারণ তা সমস্ত কিছুকে আল্লাহ'র অধীনে নিয়ে আসবে; কিন্তু সেটা বাস্তবক্ষেত্রে কেমন করে স্বৈরাচার থেকে

AMARBOI.COM

ভিন্ন হবে–মাওদুদি সঠিকভাবেই কোরানে যার নিন্দা করা হয়েছে বলে জোর দিয়েছেন?

যেকোনও আদর্শবাদীর মতো কোনও বিমূর্ত পণ্ডিতি তত্ত্ব গড়ে তুলছিলেন না মাওদুদি, বরং যুদ্ধের আহবান জানাচ্ছিলেন। তিনি সর্বজনীন *জিহাদের* দাবি করেছেন, একেই ইসলামের মূল ভিত্তি ঘোষণা করেছিলেন। এর আগে অন্য কোনও মহান মুসলিম চিন্তাবিদ এধরনের দাবি করেননি। মাওদুদির চোখে বর্তমান জরুরি পরিস্থিতিতে এটা ছিল প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন। পশ্চিমারা যেমন বিশ্বাস করে, *জিহাদ* ('সংগ্রাম') বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করার যুদ্ধ নয়, আবার আব্দুহ যেমন যুক্তি দেখিয়েছেন, কেবল আত্মরক্ষার উপায়ও নয়। মাওদুদি *জিহাদকে* গোটা মানবজাতির কল্যাণে ক্ষমতা দখলের বিপ্লবী সংগ্রাম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এখানেও আবার ১৯৩৯ সালে এই ধারণা গড়ে তোলা মাওদুদি মার্ক্সবাদের মতো উগ্র মতাদর্শের মতো একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেছেন। পয়গম্বর যেভাবে প্রাক ইসলামি যুগের অজ্ঞতা ও বর্বরতা *জাহিলিয়াহর* বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, ঠিক সেভাবে সকল মুসলিমকে অবশ্যই সকল উপায়ে পশ্চিমের আধুনিক *জাহিলিয়াহকে* ঠেকাতে হবে। *জিহাদ* নানা রূপ নিতে পারে। কেউ কেউ নিবন্ধ লিখবে, অন্যরা বক্তৃতা দেবে, কিন্তু শেষ উপায় হিসাবে তাদের অবশ্যই সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।[১০]

এর আগে কখনও ইসলামি আনুষ্ঠানিক ডিসকোর্সে *জিহাদ* এমন কেন্দ্রিয় ভূমিকায় আসেনি। মাওদুদির দর্শনের উগ্রতা প্রায় নজীরবিহীন, কিন্তু আব্দুহ ও বান্না ইসলামকে সংস্কারের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আধুনিক পাশ্চাত্য রীতিনীতিকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করায় এর পরিস্থিতি অনেক কঠিন হয়ে উঠেছিল। মুসলিমদের কেউ কেউ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল। মাওদুদির রচনায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিতদের একজন হলেন সায়ীদ কুতব (১৯০৬–৬৬), তিনি ১৯৫৩ সালে মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগ দিয়েছিলেন, ১৯৫৪ সালে নাসেরের হাতে কারাভোগ করেছেন এবং পনের বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি ভোগ করেছেন, ইসলামপন্থীদের প্রতি শাসকদের নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেছেন।[১১] নাসেরের নির্যাতন শিবিরের অভিজ্ঞতা তাঁকে বিক্ষত করেছে, ফলে মাওদুদির চেয়ে আরও বেশি রেডিক্যাল হয়ে উঠেছিল তাঁর ধারণা। কুতবকে সুন্নি মৌলবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। কারাগারে তাঁর প্রণীত আদর্শের উপরই প্রায় সকল রেডিক্যাল ইসলামপন্থী নির্ভর করেছে,[১২] কিন্তু সব সময় পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি বৈরী বা চরমপন্থী ছিলেন না তিনি। কায়রোর দার আল-উলুম কলেজে পড়াশোনা করেছেন কুতব, এখানে ইংরেজি সাহিত্যের প্রেমে পড়েন তিনি, পরিণত হন বইপ্রেমীতে। জাতীয়তাবাদীও ছিলেন তিনি, এবং

AMARBOI.COM

ওয়াফদ পার্টির সদস্য। দেখে মোটেই উগ্র মনে হত না, ছোটখাট, মৃদুভাষী; শারীরিকভাবেও শক্তিশালী ছিলেন না। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন কুতব। দশ বছর বয়সে গোটা কোরান মুখস্থ করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা, কিন্তু তরুণ বয়সে তাঁর বিশ্বাস অনায়াসে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সেক্যুলার নীতিমালার সাথে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। ১৯৪০-র দশক নাগাদ অবশ্য পশ্চিমের প্রতি তাঁর সমীহ ক্ষয়ে আসতে শুরু করেছিল। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কর্মকাণ্ড যায়নবাদের প্রতি পশ্চিমা সমর্থনের মতোই তাঁকে অসুস্থ করে তোলে।[১৩] বছর খানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়শোনা করার পর্বটিও ছিল মোহমুক্তিকর।[১৪] আমেরিকান সংস্কৃতির যৌক্তিক বাস্তববাদীতা তাঁর অস্বস্তিকর *ঠেকেছে*: 'কাজের উপযোগী উদ্দেশ্য ছাড়া আর সব ধারণাকেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়, অহম ছাড়া আর কোনও মানবীয় আবেগকে স্বীকার করা হয় না,' এক চিঠিতে লিখছেন তিনি। 'গোটা জীবন যেখানে এমনি বস্তুবাদে নিয়ন্ত্রিত, সেখানে শ্রম ও উৎপাদনের আইন ছাড়া আর কোনও আইনের কোনও সুযোগ নেই।'[১৫] কিন্তু তাসত্ত্বেও মধ্যপন্থী ও সংস্কারক হিসাবে গণতন্ত্র ও সংসদীয় পদ্ধতির মতো পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পূর্ণ সেক্যুলারিস্ট আদর্শের বাড়াবাড়ি এড়ানোর আশায় একটা ইসলামি মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

কিন্তু কারাগারে কুতবের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে বিশ্বাস যোগায় যে ধার্মিক ও সেক্যুলারিস্টরা একই সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারবে না। কারাগারের চারপাশে নজর বোলানোর সময় ব্রাদারদের উপর নির্যাতন ও তাদের হত্যার কথা ভেবেছেন তিনি, ধর্মকে একপাশে ঠেলে দেওয়ার নাসেরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেছে, মাওদুদির মতো ধর্মবিশ্বাসের চিরকালের, সব সময়ের শত্রু অজ্ঞ বর্বরতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত *জাহিলিয়াহ্*র সব রকম লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। মক্কার *জাহিলি* (অজ্ঞ) সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন পয়গম্বর মুহাম্মদ (স), তাঁর নজীর অনুসরণ করে মুসলিমরা আমরণ লড়াই করতে বাধ্য। তবু কেবল অমুসলিম বিশ্বকেই *জাহিলি* বিবেচনাকারী মাওদুদির তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন কুতব। ১৯৬০-র দশক নাগাদ কুতব নিশ্চিত হয়ে যান যে, তথাকথিত মুসলিম বিশ্বও *জাহিলিয়াহ্*র অশুভ মূল্যবোধ ও নিষ্ঠুরতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। নাসেরের মতো একজন শাসক বাইরে বাইরে ইসলামের কথা বললেও তাঁর কথা ও কাজ প্রমাণ করেছে যে আসলে তিনি ধর্ম ত্যাগ করেছেন। এমন সরকারকে উৎখাত করা মুসলিমদের দায়িত্ব। এবার সেক্যুলারিজমের স্রোতকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে *জিহাদে* নিবেদিতপ্রাণ ভ্যানগার্ড সংগঠন এবং সমাজকে আবার ইসলামি মূল্যবোধে

AMARBOI.COM

ফিরিয়ে নিয়ে আসতে একটি আদর্শ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পয়গম্বরের জীবন ও ব্রতের শরণাপন্ন হলেন তিনি।

আধুনিক বিশ্বের মানুষ ছিলেন কুতব এবং একটি আকর্ষণীয় *লোগোস* সৃষ্টি করবেন, কিন্তু মিথের জগৎ সম্পর্কেও গভীরভাবে সজাগ ছিলেন তিনি। যুক্তি ও বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু একে সত্যের পথে একমাত্র পথপ্রদর্শক মনে করেননি। কারাগারে কাটানো দীর্ঘ সময়ে নতুন মৌলবাদী তত্ত্বের বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি কোরানের উপর একটি বিশাল ধারাভাষ্য রচনা করেন তিনি, তাতে অদৃশ্য ও দুর্জ্ঞেয়র প্রতি তাঁর আধ্যাত্মিক সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যত যৌক্তিকই হয়ে উঠুক না কেন, লিখেছেন তিনি, 'অজানার সাগরে' অবিরাম ভেসে চলেছে তা। সকল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিকাশ নিঃসন্দেহে এক ধরনের প্রগতির কথা বোঝায়, কিন্তু সেগুলো স্রেফ চিরস্থায়ী মহাজাগতিক বিধানের ঝলকমাত্র, 'কোনও মহাসাগরের' তরঙ্গের মতো উপরিতলের ঢেউকে তা বদলে দেয় না, ধ্রুব প্রাকৃতিক উপাদানে তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।[১৬] আধুনিক যুক্তিবাদ যেখানে জাগতের প্রতি মনোযোগ দিয়েছে, কুতব সেখানে সময় ও পরিবর্তনের অতীত বাস্তবতার দিকে চোখ ফেরাতে জাগতিক বাস্তবতার ভেতর দিয়ে দেখার প্রচলিত অনুশীলনের চর্চা করছিলেন। জাগতিক ঘটনাপ্রবাহকে মোটামুটি চিরন্তন আদি আদর্শ বাস্তবতার প্রতিফলন হিসাবে দেখা এই অত্যাবশ্যকমূলক অতীন্দ্রিয় মানসিকতা তাঁর ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর আপাত অনুপস্থিতি তাতে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। যখনই আধুনিক সেক্যুলার সংস্কৃতির কথা ভেবেছেন, অন্য মৌলবাদীদের মতো কুতবও তাঁকে আতঙ্কে ভরে তোলা পবিত্রতা ও নৈতিক তাৎপর্যরহিত স্থান নরকের দেখা পেয়েছেন।

> মানুষ আজকের দিনে এক বিশাল পতিতালয়ে বাস করছে! একবার কেবল পত্রিকা, চলচ্চিত্র, ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, বল রুম, মদের বার ও সম্প্রচারকেন্দ্রগুলোর দিকে তাকানোই যথেষ্ট! কিংবা নগ্নদেহ, উস্কানিমূলক অঙ্গভঙ্গি ও সাহিত্যে অসুস্থ ও ইঙ্গিতময় বর্ণনা, শিল্পকর্ম ও গণমাধ্যমে লালসা! আর এর সাথে যোগ করুন মানুষের টাকার জন্যে প্রলোভনকে ইন্ধন যোগানো ও এর সংগ্রহ ও বিনিয়োগের লক্ষ্যে আইনের পোশাকে প্রতারণা, কূটকৌশল ও ব্ল্যাকমেইলের পাশাপাশি দুষ্ট কৌশল বের করতে প্ররোচিতকারী সুদের পদ্ধতি।[১৭]

এই সেক্যুলার শহরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং আধুনিক সমাজের উপর আধ্যাত্মিকতার একটা বোধ পুনঃস্থাপন করতে চেয়েছিলেন কুতব।

ইতিহাসকে অতীন্দ্রিয়ভাবে দেখেছেন কুতব। তিনি এইসব ঘটনাকে অনন্য এবং সুদূর অতীতের মনে করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিদের মতো পয়গম্বরের জীবনের শরণাপন্ন হননি। ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য সমালোচক হওয়ায় তিনি জানতেন যা ঘটে গেছে তার পেছনের সত্যিতে উপনীত হওয়ার অন্য উপায় আছে। কুতবের চোখে মুহাম্মদের ব্রত তখনও আদি আদর্শ ছিল, এমন এক মুহূর্ত যখন পবিত্র ও মানুষ এক হয়ে ঐকতানে কাজ করেছে। গভীরতর অর্থে এটা ছিল জাগতিক কর্মকাণ্ডকে ঐশী জগতের সাথে সম্পর্কিত করা একটা 'প্রতীক'। এভাবে মুহাম্মদের জীবন ইতিহাস, সময় ও স্থানের অতীত এক আদর্শ তুলে ধরেছে; এবং ক্রিশ্চান অন্সুদীক্ষার মতো পরম বাস্তবতার সাথে মানবজাতির এক 'অবিরাম সাক্ষাতের' ব্যবস্থা করেছে।[18] সুতরাং এটা একটা এপিফ্যানি ছিল; আর পয়গম্বরের ব্রতের বিভিন্ন পর্যায় নারী-পুরুষকে তাদের ঈশ্বরের দিকে চালিতকারী 'মাইলফলক' বোঝায়। একইভাবে *জাহিলিয়াহ* কথাটি প্রচলিত মুসলিম ইতিহাসবিজ্ঞানের মতো কেবল আরবের প্রাক ইসলামি কালকে বোঝাতে পারে না। '*জাহিলিয়াহ* সময়ের কোনও পর্ব নয়,' তাঁর সবচেয়ে বিতর্কিত গ্রন্থ *মাইলস্টোনস*-এ লিখেছেন কুতব। 'এটা সমাজ যখনই ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়, তখনই দেখা দেওয়া এক অবস্থা, সেটা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে হতে পারে।'[19] আল্লাহ'র বাস্তবতা ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকারের যেকোনও রকম প্রয়াসই *জাহিলি*। জাতীয়তাবাদ (রাষ্ট্রকে পরম মূল্য দেয়), কমিউনিজম (নাস্তিক্যবাদী), ও গণতন্ত্র (যেখানে জনগণ আল্লাহ'র ক্ষমতা কেড়ে নেয়) সবই আল্লাহ'র পরিবর্তে মানুষের উপাসনাকারী *জাহিলিয়াহ*র প্রকাশ। এটা খোদাহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতার একটা অবস্থা। কুতবের চোখে মিশর ও পাশ্চাত্যের আধুনিক *জাহিলিয়াহ* পয়গম্বরের আমলের *জাহিলিয়াহ*র চেয়ে ঢের খারাপ ছিল, কারণ এটা 'অজ্ঞতা' ভিত্তিক ছিল না, বরং আল্লাহ'র বিরুদ্ধে নীতিগত বিদ্রোহ ছিল।

কিন্তু প্রাক আধুনিক আধ্যাত্মিকতায় ইসলামের আচার ও নীতিগত আনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম সত্তার অন্তস্তলে মুহাম্মদীয় আদিআদর্শ রূপ গড়ে তোলা হয়েছিল। এভাবে নিশ্চিতভাবে তা কুতবের পক্ষে একটা *মিথোস* ছিল, কিন্তু তিনি এবার একে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করেছেন যাতে মিথ কর্মকাণ্ডের নীলনকশা আদর্শে পরিণত হয়। মদীনায় পয়গম্বর প্রতিষ্ঠিত প্রথম *উম্মাহ* ছিল আল্লাহ পরিকল্পিত এক 'উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা', 'যাতে এই অনন্য ইমেজ বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাস্তবায়িত করা যায় এবং মানবীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার ভেতর

একে পুনাবৃত্তি করার জন্যে এর কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়।'[২০] সত্যিই 'এক ব্যতিক্রমী প্রজন্মের মানুষদের হাতে' মদীনার আদি আদর্শমূলক সমাজ অর্জিত হয়েছিল, তবে সেটা 'অননুকরণীয় অলৌকিক' ঘটনা ছিল না; এটা ছিল 'মানবীয় প্রয়াসের ফল,' এবং যথার্থ প্রয়াস নিলেই অর্জন করা সম্ভব।[২১] মুহাম্মদের জীবনে, যুক্তি দেখিয়েছেন কুতব, স্বর্গীয় পরিকল্পনা *(মানহাজ)* তুলে ধরেছেন আল্লাহ, সুতরাং এটা মানব রচিত সকল আদর্শের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। পয়গম্বরের জীবনের 'মাইলফলক' পর্যবেক্ষণ করে আল্লাহ মানব সন্তানকে সঠিকভাবে নির্দেশিত সমাজ গঠনের একমাত্র উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন।[২২]

ক্রিশ্চানদের বিপরীতে মুসলিমরা সবসময় স্বর্গীয় সত্তাকে মতবাদের চেয়ে বরং এক ধরনের ঔচিত্যবোধ হিসাবেই অনুভব করেছে; মুসলিম মৌলবাদ সব সময়ই সক্রিয় থাকবে ও *উম্মাহ* কেন্দ্রিক হবে। কিন্তু কুতব পয়গম্বরের জীবনের *মিথোস*কে একটি আদর্শে রূপান্তরিত করার পর অনিবার্যভাবে সরলীকরণ করে এর আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেন, এবং একে খাট করেন। তিনি আধুনিক আদর্শের জন্যে প্রয়োজনীয় এক শৃঙ্খলিত কর্মসূচি প্রণয়নের জন্যে পয়গম্বরের ব্যক্তিগত বহুমুখী সংগ্রামের জটিলতা, দ্ব্যর্থবোধকতা ও বৈশরীত্যকে সরিয়ে দেন; কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় এর সাথে অন্তর্ভুক্ত নিষ্ঠুর নির্বাচন ইসলামি দর্শনকে বিকৃত করেছে।

পয়গম্বরের জীবনকে চারটি পর্যায়ে অগ্রসর হতে দেখেছেন কুতব; বিংশ শতাব্দীতে সঠিকপথে পরিচালিত একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্যে মুসলিমদের অবশ্যই এই চারধারা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে।[২৩] প্রথমে আল্লাহ একজন ব্যক্তি মুহাম্মদের কাছে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন, এরপর তিনি আল্লাহ'র ইচ্ছা বাস্তবায়ন ও মক্কার *জাহিলিয়াহ* অপসারণ করে একটি ন্যায়বিচারভিত্তিক, সাম্যবাদী সমাজ গঠনের শপথ গ্রহণকারী অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিদের দল, যা কেবল আল্লাহ'র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, *উম্মাহ* গঠনের পথে অগ্রসর হয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে মুহাম্মদ এই ভ্যানগার্ডদের সম্পূর্ণ ভিন্ন মূল্যবোধে পরিচালিত পৌত্তলিক *জাহিলি* প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। অন্য মৌলবাদীদের মতো কুতব বিচ্ছিন্নতার নীতিকে *(মাফাসালাহ)* গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। পয়গম্বরের কর্মসূচি দেখিয়েছে যে সমাজ দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত শিবিরে বিভক্ত। আজকের মুসলিমদেরও, যুক্তি দেখিয়েছেন কুতব, অবশ্যই তাদের নিজস্ব কালের *জাহিলিয়াহ*কে প্রত্যাখ্যান করে এর থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে একটি খাঁটি মুসলিম ছিটমহল নির্মাণ করতে হবে। তারা তাদের সমাজের অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহীদের প্রতি সৌজন্য দেখাতে পারে, দেখানো উচিতও, কিন্তু সেই সম্পর্ক

একেবারে নিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে এবং সাধারণভাবে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অসহযোগিতার নীতি অনুসরণ করতে হবে।[২৪]

জাহিলি মূলধারা থেকে এই বিচ্ছিন্নতা মক্কার পৌত্তলিক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন শুরু এবং শেষ পর্যন্ত ৬২২ সালে তাদের মক্কা থেকে আনুমানিক ২৫০ মাইল উত্তরের মদীনার বসতিতে অভিবাসনে *(হিজরাহ)* বাধ্য করলে প্রকট হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী ও তাদের খোদাহীন সমাজের ভেতর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ছিল অনিবার্য। কর্মসূচির তৃতীয় পর্যায়ে পয়গম্বর মদীনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটা ছিল সংহতি, ভ্রাতৃত্বমূলক নিশ্চয়তা ও সমন্বিতকরণের একটা পর্যায়; এই সময় আসন্ন সংগ্রামের লক্ষ্যে *জামাহ* নিজেকে প্রস্তুত করেছে। কর্মসূচির চতুর্থ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে মুহাম্মদ (স) মক্কার বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র সংগ্রামের কাল সূচনা করেন, প্রথমে মক্কার বাণিজ্য ক্যারাভানের উপর ছোট মাত্রার আক্রমণ, এবং পরে মক্কান সেনাবাহিনীর উপরে অব্যাহত হামলা। সমাজের মেরুকরণ বিবেচনায় রেখে ঠিক আজকের মুসলিমদের মতোই সহিংসতা ছিল অনিবার্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৬৩০ সালে মক্কা স্বেচ্ছায় মুহাম্মদকে (স) তার দুয়ার খুলে দেয়, স্বীকার করে নেয় ইসলামের শাসন ও আল্লাহ'র সার্বভৌমত্ব।

কুতব সব সময় জোর দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ'র পক্ষে সশস্ত্র সংগ্রাম শক্তি দিয়ে ইসলাম কায়েমের লক্ষ্যে নির্যাতনমূলক, নিপীড়ক অভিযান হবে না। মাওদুদির মতো তিনি তাঁর আল্লাহ'র সার্বভৌমত্বের ঘোষণাকে স্বাধীনতার ঘোষণা মনে করেছেন। এটা ছিল

> অন্য মানুষ বা মানবীয় ইচ্ছার বন্ধন থেকে সর্বজনীন মানবীয় মুক্তির ঘোষণা... আল্লাহ'র সার্বভৌমত্ব ঘোষণার অর্থ: সকল ধারণা, ধরন, পদ্ধতি ও শর্তের দিক থেকে মানবীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সামগ্রিক বিপ্লব, এবং মানব জাতি যেসব ক্ষেত্রে সর্বভৌম তার প্রতিটি শর্তের প্রতি উপেক্ষা।[২৫]

কুতবের আদর্শ আবিশ্যিকভাবে আধুনিক ছিল; তাঁর ভাবনায় আল্লাহ'র কেন্দ্রিকতা ছাড়া অনেক দিক থেকেই তিনি আধুনিক পদ্ধতির প্রত্যাখানে ষাটের দশকের মানুষ ছিলেন। পয়গম্বরের কর্মসূচির বর্ণনায় কোনও আদর্শের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই রয়েছে। এটা ছিল সহজ; শত্রুকে শনাক্ত করেছে, সমাজকে পুনর্গঠনকারী *জামাহকে* চিহ্নিত করেছে। কুতবের আদর্শ সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও নতুন করে দিক নির্ধারণে অস্বস্তিতে ভোগা অনেক মুসলিমের কাছে ইসলামি পরিভাষায় আধুনিক রীতিনীতির জটিল বৈশিষ্ট্যসমূহকে অনুবাদ করেছে যাতে তারা নিজেদের সম্পর্কিত করতে

AMARBOI.COM

পারে। নিশ্চিতভাবেই ব্রিটিশদের দান 'স্বাধীনতাকে' মুক্তিদায়ী বা ক্ষমতায়নকারী হিসাবে অনুভব করেনি তারা। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ছয় দিনের যুদ্ধে নাসেরের শোচনীয় পরাজয় অনেক মানুষের কাছে নাসেরবাদের সেক্যুলার, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল। গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এক ধরনের ধর্মীয় পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছিল, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম কুতবের আদর্শে অনুপ্রেরণার সন্ধান লাভ করবে।

মুসলিম দর্শনে *জিহাদকে* কেন্দ্রিয় অবস্থানে এনে কুতব আসলে পয়গম্বরের জীবনকে বিকৃত করেছেন। প্রচলিত জীবনীকারগণ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রথম *উম্মাহকে* টিকে থাকার জন্যেই লড়াই করতে হয়েছিল, মুহাম্মদ (স) তলোয়ারের সাহায্যে বিজয় লাভ করেননি, বরং অহিংসার সৃজনশীল ও মেধাবী কৌশলে সেটা অর্জিত হয়েছে। কোরান সকল সহিংসতাকে ঘৃণিত হিসাবে প্রবলভাবে নিন্দা করে। কেবল আত্মরক্ষায় যুদ্ধের অনুমোদন দিয়েছে। কোরান ধর্মীয় বিষয়ে শক্তিপ্রয়োগের ঘোর বিরোধী। এর দর্শন অন্তর্ভুক্তিমূলক, অতীতের সকল মহান পয়গম্বরের প্রশংসা করেছে।[২৬] পরলোকগমনের আগে তাঁর সম্প্রদায়ের উদ্দেশে মুহাম্মদ (স) শেষ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি সকল মানুষ যেহেতু ভাই, তাই ধর্মকে ব্যবহার করে তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্যে মুসলিমদের তাগিদ দিয়েছেন: 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।'[২৭] বর্জন ও বিচ্ছিন্নতার কুতবের এই দর্শন এই গ্রহণের সহিষ্ণুতা বিরোধী। কোরান স্পষ্টভাবে এবং গুরুত্বের সাথে জোর দিয়ে বলেছে 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।'[২৮] কুতব একে সীমিত করেছেন, ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় প্রকৃত মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই কেবল সহিষ্ণুতা থাকতে পারে।[২৯]

নতুন আপসহীনতা মৌলবাদী ধর্মের মূল ভিত্তি গভীর ভীতি থেকে উৎসারিত। কুতব ব্যক্তিগতভাবে আধুনিক *জাহিলিয়াহ্র* খুনে ও বিধ্বংসী ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নাসের যেন ইসলামকে মুছে ফেলতে বদ্ধ পরিকর বলে মনে হয়েছে। তিনি একা ছিলেন না। ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানোর সময় কুতবের মনে হয়েছে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে একের পর *জাহিলি* লেগে ছিল: পৌত্তলিক, ইহুদি, ক্রিশ্চান, ক্রুসেডার, মঙ্গোল, কমিউনিস্ট, পুঁজিবাদী, উপনিবেশবাদী এবং যায়নবাদী।[৩০] আজ এরাই আবার এক বিশাল ষড়যন্ত্রে একজোট হয়েছে। অনেক দূর ঠেলে দেওয়া প্রকৃত মৌলবাদীর ভ্রান্তি নিয়ে কুতব সর্বত্র সম্পর্ক লক্ষ করেছেন। আরবদের প্যালেস্তাইন থেকে বিতাড়িত করতে ইহুদি

AMARBOI.COM

ও ক্রিশ্চান সাম্রাজ্যবাদীরা একসাথে ষড়যন্ত্রে মেতেছে; পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম, দুটোরই জন্ম দিয়েছে ইহুদিরা; ইসলামকে বিতাড়িত করতেই ইহুদি ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা আতাতুর্ককে ক্ষমতায় বসিয়েছে; মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তুরস্কের নজীর অনুসরণ না করায় নাসেরকে সমর্থন দিয়েছে তারা।[৩১] অধিকাংশ বৈকল্যবাদীর মতো এই ষড়যন্ত্র ভীতি বাস্তবতার কাছে উড়ে যায়, কিন্তু যখন মানুষের মনে এই অনুভূতি জাগে যে স্রেফ বেঁচে থাকার জন্যেই তারা বিরাট বিপদের মোকাবিলা করছে, তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর যুক্তিসঙ্গত থাকতে পারে না।

কুতব বাঁচতে পারেননি। ১৯৬৪ সালে সম্ভবত ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কারাবাসের সময় বোন তাঁর লেখা চালান করে গোপনে বিলি করেছিলেন, কিন্তু মুক্তির পর কুতব *মাইলস্টোনস* প্রকাশ করেন। পরের বছর সরকার নাসেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র লিপ্ত বলে অভিযুক্ত সন্ত্রাসী দলের এক নেটওয়ার্কের অস্তিত্ব উন্মোচন করে। কুতবসহ শত শত ব্রাদারকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৬৬ সালে নাসেরের জবরদস্তির ফলে কুতবকে ফাঁসি দেওয়া হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভকারীর বদলে কুতব বরং একজন আদর্শবাদীই হয়ে ছিলেন। তিনি সব সময় যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ১৯৫৪ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর জন্যেই ব্রাদারদের অস্ত্র সংগ্রহ কেবল আত্মরক্ষামূলক কাজ। তিনি সম্ভবত ভেবেছিলেন, *জিহাদ* শুরুর সময় হয়নি। *জাহিলিয়াহ্*র উপর আক্রমণ শানানোর আগে আধ্যাত্মিক ও কৌশলগতভাবে তৈরি হওয়ার জন্যে ভ্যানগার্ডকে মুহাম্মদীয় কর্মসূচির প্রথম তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। সব ব্রাদারই তাঁকে অনুসরণ করবে না। অধিকাংশই অধিকতর মধ্যপন্থী সংস্কারপন্থী হুদাইবির দর্শনের প্রতি অনুগত ছিল, কিন্তু কারাগার ও নির্যাতন শিবিরে মুসলিমদের একটা বিরাট সংখ্যা কুতবের রচনা পাঠ করেছে, সেসব নিয়ে আলোচনা করেছে, এবং ছয় দিনের যুদ্ধের পর অধিকতর ধর্মীয় পরিবেশে ক্যাডার তৈরি শুরু করেছে।

ইরানের শিয়া মুসলিমরাও ১৯৬২ সালে শাহ মুহাম্মদ রেযা পাহলবী শ্বেত বিপ্লবের ঘোষণা দেওয়ার পর সেক্যুলারিস্ট আগ্রাসনের নতুন ঢেউয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকদের জন্যে বর্ধিত মুনাফা ভাগাভাগির প্রতিষ্ঠান ও জমির মালিকানার আধা সামন্তবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো ও স্বাক্ষরতা বাহিনী সৃষ্টি।[৩২] শাহর কিছু প্রকল্প সফল হয়েছিল। শিল্প, কৃষি ও সামাজিক প্রকল্পগুলোকে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। ১৯৬০-র দশকে মোট জাতীয় উৎপাদনে ব্যাপক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করা গেছে। শাহ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের নিম্নপর্যায়ের মনে করলেও তাদের মর্যাদা ও শিক্ষার মান উন্নত করা সংস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন; যদিও তাতে কেবল সমাজের উঁচু পর্যায়ের মহিলারাই

AMARBOI.COM

উপকৃত হয়েছিল। পশ্চিমে উৎসাহের সাথে শাহর সাফল্যের তারিফ করা হয়েছে: ইরানকে যেন মধ্যপ্রাচ্যে প্রগতি ও সুস্থতার আলোকবর্তিকা মনে হয়েছে। মুসাদ্দিক সংকটের পর আমেরিকাকে তোয়াজ করে চলছিলেন শাহ, ইসরায়েল রাষ্ট্রকে সমর্থন দিয়েছেন ও অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখা বিদেশী বিনিয়োগে পুরস্কৃত হয়েছেন। কিন্তু এমনি একটা সময়েও দক্ষ পর্যবেক্ষক লক্ষ করেছিলেন যে, এইসব সংস্কার যথেষ্ট প্রসারিত হয়নি। ধনীদের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছে সেগুলো, শহুরে নাগরিকদের প্রতি কেন্দ্রিভূত ছিল এবং সাধারণ মানুষকে অবহেলা করেছে। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে অর্জিত মুনাফা দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয়নি, বরং লোকদেখানো ও সামরিক প্রযুক্তির সর্বশেষ সরঞ্জামের পেছনে ব্যয় করা হয়েছে।[৩৩] এর ফলে সমাজের মূল কাঠামো স্পর্শের বাইরে রয়ে গেছে ও পাশ্চাত্যকৃত ধনীক গোষ্ঠী ও প্রাচীন কৃষিভিত্তিক রীতিনীতির অধীনে ফেলে আসা সাধারণ দরিদ্রদের ভেতরকার ফারাক আরও প্রসারিত হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে অবনতির কারণে গ্রাম এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের শহরে অভিযাত্রা ঘটেছে: ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৮ সালের ভেতর শহরের জনসংখ্যা শতকরা ৩৮ ভাগ থেকে ৪৭ ভাগে বৃদ্ধি পায়। এই বছরগুলোতে তেহরানের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুন হয়ে ওঠে, ২.৭১৯ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ৪.৪৯৬ মিলিয়নে দাঁড়ায়।[৩৪] গ্রামের অভিবাসীরা ঠিকভাবে মিশে যেতে পারেনি, শহরের উপকণ্ঠে বস্তি এলাকায় বাস করত তারা; কুলি, ট্যাক্সি ড্রাইভার ও রাস্তার হকার হিসাবে কোনওমতে জীবন যাপন করত। অধুনিক ও প্রচলিত ধারায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল তেহরান: পুরোনো শহর থেকে পাশ্চাত্যকৃত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নতুন আবাসিক এলাকা এবং শহরের উত্তরের বার আর ক্যাসিনোর অবস্থান রয়েছে, মহিলারা যেখানে পশ্চিমা কায়দায় পোশাক পরে, এবং প্রকাশ্যে পুরুষের সাথে খোলামেলাভাবে মেশে সেই বাণিজ্যিক এলাকায় চলে আসে। পুরোনো শহর ও সংলগ্ন দক্ষিণাঞ্চলে রয়ে যাওয়া *বাজারি* ও হতদরিদ্রদের কাছে একে বিদেশী কোনও শহর মনে হয়েছে।

ইরানের বিপুল সংখ্যাগিরিষ্ঠ জনগণ এভাবে যারপরনাই মানসিক আবেগে অস্বস্তিকর অবস্থার মোকাবিলা করছিল। পরিচিত বিশ্ব অচেনা হয়ে উঠেছে; শহর থেকেও যেন নেই; অসুস্থতার কারণে চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়া কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। ১৯৬০-র দশকে ইরান যেভাবে দ্রুত বদলে গেছে বিশ্ব যখন সেভাবে বদলে যায়, নারী-পুরুষ নিজেদের আগন্তুক ভাবতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমানহারে উদ্বেগজনক সংখ্যক ইরানি কোথাওই স্বস্তি বোধ করছে না বলে আবিষ্কার করেছিল। ১৯৫৩ সালের বিপর্যয় অনেককেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হাতে পরাজয় ও অপমানের ক্ষয়িষ্ণু বোধে তাড়িত করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাধারী অল্প কজন যারা

বাবা-মা ও পরিবারের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করেছে, দুটো জগতের মাঝখানে পড়ে কোনওটাতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। জীবন অর্থহীন মনে হয়েছে। ১৯৬০-র দশকের দ্রুতপ্রজ সাহিত্যে সবচেয়ে পুনরাবৃত্ত প্রতীক বেড়ে ওঠা বিচ্ছিন্নতা তুলে ধরেছে: দেয়াল, একাকীত্ব, অর্থহীনতা, নৈঃসঙ্গ ও কপটতা। সমসাময়িক ইরানি সমালোচক ফাযানেহ মিলানি ১৯৬০ ও ১৯৭০-র দশকে 'সংরক্ষণ ও গোপনীয়তার মেধাবী' নাছোড় ইমেজারির কথা উল্লেখ করেছেন।

> দেয়াল ঘিরে রাখে বাড়িকে। বোরখা মেয়েদের। ধর্মীয় *তাকিয়াহ* বিশ্বাসকে রক্ষা করে। *তারোফ* [ডিসকোর্সের আচরিক ধরণ] প্রকৃত ভাবনা ও আবেগকে আড়াল করে। বাড়িঘর *দারনি* [অন্দরমহল], *বিরুনি* [বহির্মহল] আর *বাতিনি* [গোপন] বলয়ে বিভক্ত হয়ে গেছে।[৩৫]

ইরানিরা নিজেদের কাছ থেকে এবং অন্যদের কাছ থেকে নিজেদের আড়াল করছিল। দারুণ ভীতিকর জায়গায় পরিণত হয়ে ওঠা পাহলভী রাষ্ট্রে তারা আর নিরাপদ বোধ করছিল না।

কেবল স্বৈরাচারী শাসন ও সকল বিরোধিতাকে স্তব্ধ করে সংস্কারকে এগিয়ে নিতে পারবেন ভেবে মজলিসকে নিষিদ্ধ করে শ্বেত বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন শাহ। ১৯৫৭ সালে আমেরিকার সিআইএ ও ইসরায়েলি মোসাদের সহযোগিতায় তৈরি গোপন পুলিস সাভাক সহায়তা দেয় তাঁকে। সাভাকের নিষ্ঠুর কায়দা, অত্যাচার ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের রাজত্ব জনগণের মনে ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগসাজশে নিজ দেশে কারাবন্দি থাকার ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।[৩৬] ১৯৬০ ও ১৯৭০-র দশকে এই সময়ে উন্নয়নশীল দেশে আবির্ভূত হতে চলা গেরিলা গ্রুপের আদলে দুটি প্যারামিলিটারি দল গঠন করা হয়েছিল: বর্তমানে নিষিদ্ধ তুদেহ ও ন্যাশনাল ফ্রন্ট পার্টির সদস্যদের নিয়ে গঠিত মার্ক্সবাদী গ্রুপ ফেদাইন-ই খালক ও ইসলামি বাহিনী মুজাহিদিন-ই খালক। শক্তিকেই সকল স্বাভাবিক বিরোধিতার পথ রুদ্ধকারী সম্মতি নয় বরং নির্যাতনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একমাত্র উপায় মনে করা হয়েছে।

বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন ধারণার মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়াস পেয়েছেন। দেশের অস্থিরতার কারণে অস্বস্তিতে ছিলেন তাঁরা, বুঝতে পারছিলেন যে আধুনিকায়ন মাত্রাতিরিক্ত দ্রুত গতিতে চলায় ব্যাপকবিস্তৃত বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছে। ১৯৬০-র দশকের শেষের দিকে ইউনিভার্সিটি অভ তেহরানের প্রফেসর পদে উন্নীত অসাধারণ মেধাবী দার্শনিক আহমাদ ফরিদ (১৯১২–৯৪) ইরানি

AMARBOI.COM

টানপোড়েনকে বোঝাতে *গার্বজাদেগি* ('পাশ্চাত্য আসক্তি') শব্দটি তৈরি করেন: মানুষ পশ্চিমের কারণে বিষে আক্রান্ত ও দূষিত হয়েছে; তাদের অবশ্যই একটা ভিন্ন পরিচয় গড়ে তুলতে হবে।[৩৭] সেক্যুলারিস্ট ও এককালের সমাতন্ত্রী জালাল আল-ই আহমাদ (১৯২৩–৬৯) এই ধারণাটি আরও বিস্তৃত করেন, তাঁর *গার্বজাদেগি* (১৯৬২) ১৯৬০-র দশকে ইরানিদের কাছে একটি কাল্ট গ্রন্থে পরিণত হয়েছিল। এই 'শেকড়হীনতা' ও 'অক্সিডেন্টোসিস' এক রকম 'উপযুক্ত পরিবেশে বিস্তার ঘটা বাইরের রোগ।' 'কোনও রকম সমর্থক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক পটভূমিহীন, পরিবর্তনের কোনও রকম উপাদান বিহীন' এক জাতির দুঃখ।[৩৮] এই মহামারী ইরানের অখণ্ডতাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে, এর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের বিনাশ ঘটাতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে অর্থনীতিকে। কিন্তু আল-ই আহমাদ নিজেই টানাপোড়েনে ভুগছিলেন: সার্ত্রে এবং হেইদেগারের মতো পাশ্চাত্য লেখকদের রচনায় আকৃষ্ট ছিলেন তিনি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মতো পাশ্চাত্য আদর্শের আকর্ষণ বোধ করেছেন; কিন্তু ইরানের অচেনা ভূমিতে কেমন করে তাকে রোপন করা যাবে সেটা বুঝতে পারেননি। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দুই দিকে আকর্ষণবোধকারী ইরানিদের যাকে বলে 'অ্যাগোনাইজড সিযোফ্রেনিয়া' তুলে ধরেছেন[৩৯] এবং সমস্যাটাকে স্মরণীয়ভাবে প্রকাশ করতে পারলেও কোনও সমাধান প্রস্তাব করতে পারেননি–যদিও মনে হয় যে, জীবনের শেষদিকে তিনি শিয়াবাদকে প্রকৃত জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি ও পাশ্চাত্যকরণের রোগের উপশমসুলভ বিকল্পে পরিণত হতে পারার মতো প্রকৃত ইরানি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখতে শুরু করেছিলেন।[৪০]

ইরানি *উলেমাগণ* মিশরীয় যাজকদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সাধারণ জনগণকে সমর্থন দিতে হলে নিজেদের ও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহকেও আধুনিকায়তি করতে হবে। মৌলিক শিয়া নীতিমালাকে আহত করে চলা শাহর স্বেরাচরী শাসন এবং ধর্মের প্রতি স্পষ্ট নিরাসক্ততায় ক্রমেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলেন তাঁরা। ১৯৬০ সালে যাজকদের যেকোনও রকম রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণাকারী প্রধান মারজা আয়াতোল্লাহ বোরুজারদি শাহর ভূমি সংস্কার আইনের নিন্দা জানাতে এগিয়ে আসেন। তাঁর এই ইস্যু হাতে তুলে নেওয়ার ব্যাপারটা ছিল দুঃখজনক, কারণ *উলেমাদের* তা স্বার্থপর ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে তুলে ধরেছিল, যাদের অনেকেই ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। আসলে বোরুজারদির হস্তক্ষেপ সম্ভবত এটাই কীলকের সংকীর্ণ ডগা হয়ে থাকার এই সহজাত ভাবনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল।[৪১] ভূমি সংস্কার মালিকানার শরীয়াহ বিধানের পরিপন্থী ছিল, বোরুজারদি হয়তো কোনও একটি ক্ষেত্রে জনগণকে ইসলামি

আইনে প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারটি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হতে পারে এবং তা আরও খারাপ হয়ে উঠতে পারে ভেবে ভয় পেয়েছিলেন। পরের বছর মার্চে বোরুজারদি মারা যাবার পর মারজা'র পদ আর পূরণ করা হয়নি। *উলেমাদের* একটি গ্রুপ যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে, শিয়া মতবাদকে আরও গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে হবে, জটিল নতুন বিশ্বে একজন মাত্র ব্যক্তির পরম নির্দেশকে পরিণত হওয়ার প্রত্যাশা বাস্তব সম্মত নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষত্ব সম্পন্ন কয়েকজন *মারাজিকে* নিয়ে নতুন নেতৃত্ব হতে পারে। স্পষ্টই আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া ছিল এটা, ইসলামি বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা বেশ কয়েক জন যাজক সংস্কারবাদী *উলেমাদের* এই দলে ছিলেন: আয়াতোল্লাহ সায়ীদ মুহাম্মদ বিহিশতি; বিজ্ঞ ধর্মবেত্তা মোর্তযা মোতাহারি; আল্লামাহ মুহাম্মদ-হুসেইন তাবাতাবাতি; এবং সবচেয়ে রেডিক্যাল ইরানি যাজক আয়াতোল্লাহ মাহমুদ তালেকানি। ১৯৬০ সালে বসন্তে বেশ কিছু বক্তৃতা অনুষ্ঠান করেন তাঁরা, এবং পরের বছর শিয়া মতবাদকে হালনাগাদ করার বিষয়ে বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করা একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন।

একটা বিষয়ে সংস্কারকগণ নিশ্চিত ছিলেন যে, ইসলামে যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তাই *উলেমাদের* রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার বেলায় এতটা সতর্ক থাকা উচিত নয়। যাজকীয় শাসন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেননি তাঁরা, তবে রাষ্ট্র স্বৈরাচরী বা জনগণের চাহিদার প্রতি নির্বিকার হয়ে উঠেছে অনুভব করার পর বিশ্বাস করেছেন যে, ঠিক তামাক সংকট ও সাংবিধানিক বিপ্লবের সময় যেমন করেছিলেন, শাহদের বিরুদ্ধে ঠিক সেভাবে *উলেমাদের* রুখে দাঁড়ানো উচিত। *ফিকহ*'র উপর অতিরিক্ত মনোযোগ হ্রাস করার জন্যে *মাদ্রাসার* পাঠ্যক্রমকে পর্যালোচনা করে নতুন করে সাজানোর যুক্তি দেখিয়েছেন তাঁরা। যাজকদের তাদের আর্থিক ব্যবস্থাকেও যৌক্তিক করতে হবে: বর্তমানে স্বেচ্ছা দানের উপর বেশি নির্ভরশীল তাঁরা, লোকজন যেহেতু রক্ষণশীল মানসিকতার, তাই এটা তাদের মৌলিক পরিবর্তন থেকে দূরে রেখেছে। *ইজতিহাদের* গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সত্যিই জনগণের সেবা করতে চাইলে শিয়াদের অবশ্যই ব্যবসা, কূটনীতি ও যুদ্ধের মতো আধুনিক বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে। সবার উপরে ছাত্রদের কথা শুনতে হবে। ১৯৬০-র দশকের তরুণ সমাজ আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত, এরা পুরোনো প্রপাগান্ডা হজম করবে না। ধর্ম থেকে এদের দূরে সরে যাওয়ার কারণ তাদের সামনে তুলে ধরা শিয়াবাদের রূপ প্রাণহীন, প্রাচীন ধরনের। পশ্চিমে তরুণ সংস্কৃতি পুরোপুরিভাবে বিকশিত হওয়ার আগেই ইরানি যাজক সমাজ তরুণদের সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সংস্কার

AMARBOI.COM

আন্দোলনে মুষ্টিমেয় কয়েকজন *উলেমা* অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; সাধারণ জনগণের কাছে তা পৌঁছেনি, শাসকেদের সমালোচনা করার কোনও প্রয়াস পাননি তাঁরা। কেবলই শিয়াদের অভ্যন্তরীণ বিষয়-আশয়ে সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় বলয়ে প্রচুর আলোচনার জন্ম দিয়েছে ও যাজকগোষ্ঠীর সিংহভাগকে পরিবর্তনের পথে নিয়ে গেছে।[৪২] কিন্তু সহসা এপর্যন্ত অলক্ষ্যে থাকা একজন যাজক পত্রিকার শিরোনাম কেড়ে নিলে *উলেমা*গণ বিস্মিত হয়ে পড়েন, আরও রেডিক্যাল অবস্থানে চলে যান তাঁরা।

১৯৬০-র দশক নাগাদ ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ছাত্ররা কুমের ফায়যিয়াহ মাদ্রাসায় আয়াতোল্লাহ খোমিনির ইসলামি নৈতিকতার উপর শিক্ষাক্রমের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। কথিত আছে, ক্লাস চলার সময় তিনি পুলপিট ছেড়ে নেমে এসে, 'অফ দ্য রেকর্ড' ছাত্রদের সাথে মেঝেয় বসে প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করতেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে অকস্মাৎ এই আড়াল ছেড়ে বের হয়ে পুলপিট থেকেই স্বীয় ক্ষমতাবলে শাহর বিরুদ্ধে অবিরাম প্রত্যক্ষ আক্রমণ শুরু করেন, তাঁকে ইসলামের শত্রু হিসাবে চিত্রায়িত করেন। যখন শাসকের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার মতো সাহস ছিল না কারও, শাহর শাসনের নিষ্ঠুরতা ও অবিচার, তাঁর অসাংবিধানিকভাবে মজলিস ভেঙে দেওয়া, নির্যাতন, সকল বিরোধী দলের অপ নিষিদ্ধকরণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শাহর ভীরু আত্মসমর্পণ এবং প্যালেস্তাইনিদের আবাস থেকে বঞ্চিতকারী ইসরায়েলের প্রতি তাঁর সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন খোমেনি। বিশেষ করে গরীবের অসহায় অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি: শাহর উচিত তাঁর চোখ ধাঁধানো প্রাসাদ থেকে বের হয়ে দক্ষিণ তেহরানের বস্তি এলাকায় একবার ঘুরে আসা। একবার নাকি এক হাতে কোরানের একটি কপি ও অন্য হাতে ১৯০৬ সালের সংবিধানের কপি নিয়ে এগুলো রক্ষার জন্যে নেওয়া তাঁর নেওয়া শপথ ভঙ্গ করার অভিযোগ তোলেন তিনি। ২২শে মার্চ, ১৯৬৩ ষষ্ঠ ইমামের (যাঁকে ৭৬৫ সালে খলিফা আল-মনসুর বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিলেন) শাহাদৎ বার্ষিকীতে সাভাক বাহিনী *মাদ্রাসা* ঘেরাও করে হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন ছাত্রকে হত্যা করে। খোমেনিকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়।[৪৩] পদক্ষেপ নেওয়ার বেলায় শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে আনাড়ী ও আত্মধ্বংসী দিন ছিল এটা। খোমেনির সাথে দীর্ঘ সংগ্রামে অবিরাম শাহ যেন স্বাভাবের বাইরে গিয়ে নিজেকে স্বৈরচারী শাসক ও ইমামদের শত্রু হিসাবে তুলে ধরেছেন।

কেন মুখ খোলার জন্যে এই মুহূর্তটিকে বেছে নিয়েছিলেন খোমেনি? সারা জীবন মোল্লা সদ্রার তালিম দেওয়া *ইরফানে*র অতীন্দ্রিয়বাদী অনুশীলন চর্চা করেছেন তিনি। সদ্রার মতো খোমেনির কাছেও অতীন্দ্রিয়বাদ ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য ছিল।

আধ্যাত্মিক সংস্কারের সাথে পরিচালিত না হলে সমাজের কোনও রকম সামাজিক সংস্কার হতে পারে না। পরলোকগমনের আগে ইরানের জনগণের উদ্দেশে দেওয়া তাঁর শেষ ভাষণে খোমেনি *ইরফানের* পাঠ ও তার চর্চা চালিয়ে যাবার আবেদন রেখেছেন, *উলেমাগণ* এই অনুশীলনটিকে অবহেলা করে এসেছেন। খোমেনির চোখ *মিথোসের* সাথে সম্পর্কিত অতীন্দ্রিয়বাদী অনুসন্ধানকে অবশ্যই *লোগোসের* বাস্তব কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। খোমেনির সাথে যারা সাক্ষাৎ করেছেন তারা সব সময়ই আধ্যাত্মিকতায় তাঁর স্পষ্ট মগ্নতায় বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর উদাস মনোভাব, অন্তর্মুখী দৃষ্টি ও ভাষণের ইচ্ছাকৃত একঘেয়েমি (পশ্চিমারা যাকে বিতৃষ্ণ মনে করেছে) শিয়াদের কাছে অনায়াসে 'সোবার' অতীন্দ্রিয়বাদীর লক্ষণ মনে হয়েছে। অন্তস্থঃ যাত্রা কালে প্রায়শঃই উন্মুক্ত হওয়া আবেগীয় চরম অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করে 'মাতাল' সুফি ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিপরীতে 'সোবার' অতীন্দ্রিয়বাদীগণ বাড়াবাড়িকে দূরে ঠেলে রাখার জন্যে ইস্পাত কঠিন আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চা করেন। মোল্লা সদ্রা উস্মাহর নেতার *(ইমাম)* আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন। রাজনৈতিক মিশন শুরুর আগে তাকে অবশ্যই মানুষ থেকে আল্লাহর উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে, নিজেকে আল্লাহর পরিবর্তনকারী দর্শনের কাছে উন্মুক্ত করতে হবে, এবং নিজেকে আত্মউপলব্ধির পথে বাধা অহমকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। কেবল এই দীর্ঘ ও শৃঙ্খলিত যাত্রার শেষেই তিনি, যেমন বলা হয়েছে, জাগতিক কর্মকাণ্ডে ফিরে এসে আল্লাহ'র বাণী প্রচার করতে এবং সমাজে স্বর্গীয় বাণীর বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবেন। আমেরিকান পণ্ডিত হামিদ আলগার বলছেন, ১৯৬৩ সালে শাহর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করার সময় প্রাথমিক ও আবশ্যক 'আল্লাহর অভিমুখে যাত্রা' শেষ করেছিলেন খোমেনি।[৪৪]

কয়েকদিন কারাগারে আটক রাখার পর খোমেনিকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু সাথে সাথে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন তিনি। ফায়যিয়াহ মাদ্রাসায় সাভাকের আক্রমণের চল্লিশ দিন পরে ছাত্ররা নিহতদের স্মরণে ঐতিহ্যবাহী শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এখানে দেওয়া ভাষণে খোমেনি এই আক্রমণকে ১৯৩৫ সালে মাশাদের উপাসনালয়ে রেযা শাহর পরিচালিত আক্রমণের সাথে তুলনা করেন, তখন শত শত বিক্ষোভকারী প্রাণ হারিয়েছিল। গোটা গ্রীষ্মকাল জুড়ে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে থাকেন তিনি। শেষে কারবালায় ইমাম হুসেইনের শাহাদৎ বার্ষিকী আশুরার উৎসবে (৩রা জুন, ১৯৬৩) একটি শোকগাথা পাঠ করেন খোমেনি, *রওদাহয়* এই সময় প্রথা অনুযায়ী জনগণ কান্নাকাটি করছিল। খোমেনি দাবি করেন, শাহ হচ্ছেন কারবালার খলনায়ক ইয়াযিদের মতো। গত মার্চে ফায়যিয়াহ মাদ্রাসায় আক্রমণ চালানোর সময় পুলিস কেন কোরান ছিঁড়ে ফেলল?

তারা কেবল *উলেমাকে* গ্রেপ্তার করতে চেয়ে থাকলে কেন তবে মাত্র আঠার বছরের এক ছাত্রকে হত্যা করতে গেল, যে কিনা কোনওদিন শাসকদের বিরুদ্ধে কিছু করেনি? উত্তর হচ্ছে শাহ খোদ ধর্মকেই ধ্বংস করতে চান। তাঁর প্রতি সংস্কারের আবেদন জানান তিনি:

> আমাদের দেশ, আমাদের ইসলাম বিপদাপন্ন। যেসব ঘটনা ঘটছে, ঘটতে যাচ্ছে, আমাদের তা উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ন করে তুলছে। আমরা আমাদের এই বিধ্বস্ত দেশের অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যাতে একে সংস্কার করা যায়।[৪৫]

পরদিন সকালে আবার গ্রেপ্তার হন খোমেনি। এবার ঘটে বিস্ফোরণ। খবর শোনামাত্র হাজার হাজার ইরানি তেহরান, মাশাদ, শিরাজ, কাশান ও ভারামিনে প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমে আসে। দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয় সাভাক বাহিনীকে; তেহরানের জনগণকে শুক্রবারের জুম্মার নামাজ পড়া থেকে বিরত রাখতে ট্যাংক দিয়ে মসজিদ ঘেরাও করে ফেলা হয়। তেহরান, কুম আর শিরাজে নেতৃস্থানীয় *উলেমাগণ* মিছিলে নেতৃত্ব দেন। অন্যরা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে *জিহাদের* আহবান জানান। কেউ কেউ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জীবন দিতে প্রস্তুত থাকার প্রমাণ দিতে কাফনের সাদা কাপড় পরেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও *মাদ্রাসার* ছাত্র, আর মোল্লাহ ও সাধারণ জনগণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে। তলে তলে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা বিশাল টানাপোড়েন ও অসন্তোষ তুলে ধরা এই বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে সাভাকের। ১১ই জুন অবশেষে যখন শৃঙ্খলা ফিরে আসে, শত শত ইরানি প্রাণ হারিয়েছিল।[৪৬]

স্বয়ং খোমেনি অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলেন। অন্যতম প্রবীন *মুজতাহিদ* আয়াতোল্লাহ মুহাম্মদ কাযিম শরিয়তমাদারি (১৯০৪–৮৫) গ্র্যান্ড আয়াতোল্লাহ পদে উন্নীত করে খোমেনিকে রক্ষা করেছিলেন, ফলে তাঁকে হত্যা করা শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।[৪৭] মুক্তির পর খোমেনি জনগণের কাছে নায়কে পরিণত হন। বিরোধিতার প্রতীক হিসাবে সর্বত্র তাঁর ছবি আবির্ভূত হয়। নিজেকে সঠিক স্থানে স্থাপন করে শাহর প্রতি আরও বহু ইরানির মনের অপ্রকাশিত বিতৃষ্ণাকে ভাষা দিয়েছিলেন তিনি। খোমেনির দর্শন সাধারণ মৌলবাদী বিকৃতিতে ভ্রান্তিময়। তিনি তাঁর ভাষণে অবিরাম ইহুদি, ক্রিশ্চান ও সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে গেছেন, সাভাকের সাথে সিআইএ ও মোসাদের সংশ্লিষ্টতার কারণে বহু ইরানি একে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছে। এটা ছিল ক্ষোভের ধর্মতত্ত্ব।[৪৮]

তবে খোমেনি ইরানিদের বোধগম্য ভাষায় বৈধ অসন্তোষ প্রকাশে সক্ষম করে তুলেছিলেন। মার্ক্সবাদী বা উদারনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত সমালোচকরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনাধুনিকায়িত ইরানিদের বাদ দিতেন, সেখানে প্রত্যেকে কারাবালার প্রতীকীবাদ বুঝতে পেরেছিল। অন্য আয়াতোল্লাহদের বিপরীতে খোমেনি দূরবর্তী, কেতাবি ঢঙে কথা বলেননি; তাঁর ভাষণ ছিল প্রত্যক্ষ, মাটি ঘেঁষা, সাধারণ মানুষের উদ্দেশে দেওয়া। পশ্চিমা জনগণ খোমেনিকে মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করে, কিন্তু আসলে তাঁর অধিকাংশ বার্তা ও বিকাশমান ধর্মতত্ত্বই ছিল আধুনিক। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও প্যালেস্তাইনিদের প্রতি সমর্থন এই সময় অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের আন্দোলনের অনুরূপ; জনগণের কাছে তাঁর সরাসরি আবেদনও তাই।

শেষ পর্যন্ত অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন খোমেনি। ২৭শে অক্টোবর, ১৯৬৪ আমেরিকান সামরিক সদস্য ও অন্যান্য উপদেষ্টাকে দেওয়া সাম্প্রতিক কূটনৈতিক ইম্যুনিটি ও অস্ত্র ক্রয়ের জন্যে শাহর ২০০ মিলিয়ন ডলার গ্রহণের বিরুদ্ধে কঠোর আক্রমণ সূচিত করেন। তিনি দাবি করেন, ইরান কার্যত আমেরিকার উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। অন্য কোনও দেশ কি এমনি অসম্মান মেনে নিত? ইরানে সংঘটিত মারাত্মক অপরাধের জন্যে একজন আমেরিকান পরিচারিকা বিনা শাস্তিতে পার পেয়ে যাবে, অথচ একজন আমেরিকানের কুকুরকে মাড়িয়ে যাওয়ার দোষে ইরানিকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তিনি উপসংহার টানেন:

> ইরানি জনগণের পক্ষে আর কোনও নিরাময় নেই। আগামী শীতে দরিদ্র জনসাধারণের কী হবে ভেবে আমি উদ্বিগ্ন, আমার ধারণা, আল্লাহ না করুন, অনেকেই শীত ও অনাহারে প্রাণ হারাবে। মানুষের উচিত গরীবের কথা ভাবা, গত শীতের নিষ্ঠুরতা ঠেকানোর পদক্ষেপ নেওয়া। *উলেমাদের* এই লক্ষ্যে চাঁদা চাইতে হবে।[৪৯]

এই ভাষণের পর খোমেনিকে দেশান্তরী করা হয়, শেষ পর্যন্ত পবিত্র শিয়া নগরী নাজাফে অবস্থান নেন তিনি।

কাসকগোষ্ঠী এবার যাজকদের বাকরুদ্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। খোমেনির বিদায়ের পর সরকার ধর্মীয়ভাবে দান করা সম্পত্তি *(ওয়াকফ)* বাজেয়াপ্ত করা শুরু করে ও *মাদ্রাসা*সমূহকে কঠোর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এর ফলে ১৯৬০-র দশকের শেষের দিকে ধর্মতাত্ত্বিক ছাত্রের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল।[৫০] ১৯৭০ সালে আয়াতোল্লাহ রিযা সায়দিকে ইরানে আমেরিকান বিনিয়োগ বৃদ্ধির পক্ষে আয়োজিত এক সম্মেলনের বিরোধিতা ও শাসকগোষ্ঠীকে

AMARBOI.COM

'সাম্রাজ্যবাদের স্বৈরাচারী চর' হিসাবে নিন্দা করার দায়ে নিপীড়ন করে হত্যা করা হয়। ক্রমে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমে আসে, এদিকে তেহরানে আয়াতোল্লাহ সায়িদির মসজিদের সামনে আয়াতোল্লাহ তালেকানির ভাষণ শোনার জন্যে এক বিরাট জনতা সমবেত হয়।[৫১] একই সময়ে সরকার রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত এক ধরনের 'সরকারী ইসলাম' প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়: গ্রামাঞ্চলে ডিপার্টমেন্ট অভ রিলিজিয়াস প্রপাগান্ডা ডিপার্টমেন্টের সাথে নিবিড় সহযোগিতায় কাজ করার জন্যে সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতাত্ত্বিক অনুষদ থেকে পাস করা সাধারণ স্নাতকদের নিয়ে একটি ধর্মীয় বাহিনী গঠন করা হয়। 'আধুনিকায়নের এই মোল্লাহদের সাধারণ কৃষকদের কাছে শ্বেত বিপ্লবের ব্যাখ্যা করতে হত, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, সেতু ও জলাধার নির্মাণ, গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধক টিকা দানের কাজ করতে হত। ঐতিহ্যবাহী *উলেমাদের* খাট করার পরিষ্কার প্রয়াস ছিল এটা।'[৫২] কিন্তু ইরান ও শিয়াহ মতবাদের সম্পর্কচ্ছেদের জন্যে শাহ যাপরনাই উদগ্রীব ছিলেন। ১৯৭০ সালে ইসলামি ক্যালেন্ডার বাতিল করে দেন তিনি, পরের বছর প্রাচীন ইরানি রাজতন্ত্রের ২৫০০ তম বার্ষিকী স্মরণে পারসেপোলিসে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এটা কেবল ইরানে ধনী ও দরিদ্রদের ভেতর বিশাল ফারাকের অশ্লীল প্রদর্শনীই ছিল না, বরং ইসলামের প্রাক ইসলামি ঐতিহ্যের মাঝে শাসকগোষ্ঠীর ইরানের আত্মপরিচয় খোঁজার ইচ্ছা সম্পর্কে জনগণের মনে প্রবল ধারণা জেগেছিল।

ইরানিরা ইসলামকে হারিয়ে ফেললে, নিজেদেরই হারাবে তারা। এটাই ছিল ক্যারিশম্যাটিক তরুণ দার্শনিক ডক্টর আলি শরিয়তির (১৯৩৩-৭৭) বার্তা, ১৯৬০-র দশকের শেষের দিকে যাঁর লেকচার হলে পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুণরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ভীড় জমাতো।[৫৩] শরিয়তির প্রচলিত *মাদ্রাসার* শিক্ষা ছিল না, বরং ইউনিভার্সিটি অভ মাশাদ ও সরবোর্নে পড়াশোনা করেছেন তিনি, সেখানে পারসিয় দর্শনের উপর অভিসন্দর্ভ লিখেছেন ও ফরাসি অরিয়েন্টালিস্ট লুই মাসিগঁ, অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্রে ও তৃতীয় বিশ্ব আদর্শবাদী ফ্রানয ফানোর রচনা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, আধুনিক ইরানিদের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন না করেই তাদের আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটানোর মতো একটি ভিন্ন শিয়া আদর্শ গড়ে তোলা সম্ভব। ইরানে ফিরে শেষ পর্যন্ত উত্তর তেহরানের ১৯৬৫ সালে দানবীর মুহাম্মদ হুমায়ুন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয় হুসাইনিয়াহতে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নেন শরিয়তি। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে সংস্কারবাদী *উলেমাদের* ভাষণে আলোড়িত হয়ে ইরানি তরুণ সমাজের কাছাকাছি পৌঁছতে *হুসাইনিয়াহ* প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হুমায়ুন। ইরানে *হুসাইনিয়াহ* ছিল ইমাম হুসেইনের প্রতি

AMARBOI.COM

নিবেদনের একটি কেন্দ্র; সাধারণত মসজিদের পাশে নির্মাণ করা হত এগুলো। কারবালার কাহিনী *হুসাইনিয়াহতে* পড়তে আসা ছাত্রদের উন্নত সমাজের জন্যে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে, এমন আশা করা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মধ্যপ্রাচ্যে আবির্ভূত ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল ইরান। ১৯৬৮ সাল নাগাদ এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সহায়তাকারী অন্যতম সংস্কারক আয়াতোল্লাহ মোতাহারি লিখতে পেরেছিলেন যে, *হুসাইনিয়াহকে* ধন্যবাদ, 'আমাদের শিক্ষিত তরুণ সমাজ বিস্ময়ের একটি পর্ব অতিক্রম করার পর, এমনকি [ধর্মের] দ্বারা বিতৃষ্ণ হয়েও এখন মনোযোগ দিচ্ছে এবং একে অগ্রাহ্যকারীর বেলায় উদ্বেগ দেখাচ্ছে।'[৫৪] আর কোনও বাগ্মী শরিয়তির মতো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেননি। ছাত্ররা দুপুরের খাবার সময় বা কাজের পর তাঁর ভাষণ শোনার জন্যে ছুটে যেত, তাঁর বাগ্মীতার আবেগ ও প্রাবল্যে অনুপ্রাণিত ছিল তারা। তাঁর সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করতে পারত তারা, অনেকে তাঁকে বড় ভাইয়ের মতো মনে করেছে।[৫৫]

শরিয়তি ছিলেন সৃজনশীল বুদ্ধিজীবী, আবার আধ্যাত্মিক মানুষও। তাঁর জীবনে পয়গম্বর ও ইমামগণ ছিলেন বাস্তব সত্তা। তাঁদের প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল পরিষ্কার। শিয়া ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ স্রেফ সপ্তম শতাব্দীর ঐতিহাসিক কিছু ঘটনা ছিল না, বরং এক সময়হীন বাস্তবতা যা বর্তমানের মানুষকে অনুপ্রাণিত ও পথ দেখাতে পারে। গোপন ইমাম, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, জেসাসের মতো উধাও হয়ে যাননি। এখনও এই জগতেই আছেন তিনি, কিন্তু অদৃশ্যে; শিয়ারা কোনও বণিক বা ভিখিরির মাঝে তাঁর দেখা পেয়ে যেতে পারে। আত্মপ্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন তিনি, শিয়াদের অবশ্যই তাঁর কাড়ানাকাড়ার আওয়াজ শুনতে সব সময় প্রস্তুত অবস্থায় জীবন যাপন করতে হবে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে *জিহাদের* আহ্বান শোনার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। গোপন সত্তা *(যাত)*-এর আভাস পাওয়ার জন্যে শিয়াদের অবশ্যই প্রাত্যহিক জীবনে তাদের ঘিরে রাখা বাস্তবতার নিরেট হতবুদ্ধিকর বাস্তবতা ভেদ করে দেখতে হবে।[৫৬] আধ্যাত্মিকতা যেহেতু ভিন্ন কোনও বলয় নয়, সুতরাং শাসকগোষ্ঠী যেভাবে প্রয়াস পাচ্ছে সেভাবে ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। মানুষ দুই মাত্রার প্রাণী; তাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক অস্তিত্ব উভয়ই রয়েছে। তাদের *লেগোসের* মতোই *মিথোসের* প্রয়োজন, এবং সব রাজনীতিরই একটি দুর্জ্ঞেয় মাত্রা থাকা উচিত। এটাই ইমামতের মতবাদের আসল অর্থ: জনগণকে একাধারে তাদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা যোগাতে সমাজ একজন ইমাম, স্বর্গীয় নির্দেশক ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, এটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে একটা প্রতীকী স্মারক ছিল। ধর্ম

ও রাজনীতিকে আলাদা করার মানে মুসলিমকে স্বর্গীয় একত্বে প্রতিপলিত অখণ্ডতা অর্জনে সাহায্যকারী ইসলামের মৌল বিশ্বাস *তাওহিদের* ('ঐকবদ্ধকরণ') নীতির সাথে বেঈমানি।[৫৭]

তাওহিদ পাশ্চাত্য-আসক্ত ইরানিদের বিচ্ছিন্নতারও উপশম ঘটাবে। শরিয়তি *বাজগাশত বেহ খিশতান*–'নিজের কাছে প্রত্যাবর্তন'–এর উপর জোর দিয়েছেন। গ্রিক চেতনা যেখানে দর্শন দিয়ে বৈশিষ্ট্যায়িত হয়েছে, রোমানি চেতনা শিল্প ও সামরবিদ্যায়, ইরানের আদিআদর্শ সত্তা ধর্মীয় ও ইসলামি। পশ্চিমের যৌক্তিক প্রায়োগিক বিজ্ঞান যেখানে *অস্তিত্ববানের* উপর দৃষ্টি দেয়, অরিয়েন্ট সেখানে আসন্ন সত্যিও সন্ধান করে। ইরানিরা বেশি নিবিড়ভাবে পশ্চিমা আদর্শ অনুসরণ করলে পরিচয় হারিয়ে ফেলবে এবং নিজেদের জাতিগত নিশ্চিহ্নতাতেই সহযোগিতা করবে।[৫৮] শাহর মতো প্রাচীন পারসিয় সংস্কৃতিতে মাহাত্ম্য খোঁজার বদলে তাদের শিয়া ঐতিহ্যকে উদযাপন করা উচিত। কিন্তু এটা লোক দেখানো বা একেবারেই ধারণাগত প্রক্রিয়া হতে পারবে না। অসাধারণ সুন্দর মনোগ্রাফ *হাজ্জ*-এ শরিয়তি নিখুঁতভাবে রক্ষণশীল চেতনা মূর্ত করে তোলা কাবাহ্‌ ও মক্কায় তীর্থযাত্রার সাথে প্রাচীন কাল্টের পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে সেগুলো আধুনিকতার দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে মুসলিমদের কাছে পৌঁছতে পারে। শরিয়তির গ্রন্থে তীর্থযাত্রা আল্লাহ'র পথে অভিযাত্রায় পরিণত হয়েছে, মোল্লা সদ্রায় বর্ণিত চার ধাপের অন্তস্থঃ যাত্রার সাথে এর খুব পার্থক্য নেই। সবার অতীন্দ্রিয়বাদী ক্ষমতা নেই, এর জন্যে বিশেষ মেধা ও মেজাজ প্রয়োজন, কিন্তু *হজ্জের* আচারগুলো সকল মুসলিম নারী-পুরুষের বোধগম্য। তীর্থযাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ–অধিকাংশ মুসলিমের পক্ষে জীবনের একমাত্র অভিজ্ঞতা–এক নতুন পরিচয় তুলে ধরে। তীর্থযাত্রীকে অবশ্যই বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন সত্তাকে পেছনে ফেলে যেতে হবে। কাবাহকে ঘিরে সাতবার প্রদক্ষিণ করার সময় বিশাল ভীড়ের প্রচণ্ড চাপ, ব্যাখ্যা করেছেন শরিয়তি, তীর্থযাত্রীর মনে 'ছোট জলধারার বিরাট কোনও নদীর সাথে মিলিত হওয়ার' কথা মনে করিয়ে দেয়:

> মানুষের ভিড় আপনার উপর এমন চাপ সৃষ্টি করে যে আপনি নতুন জীবন লাভ করেন। এখন আপনি জনতার একটা অংশ; একজন মানুষ, জীবিত ও চিরন্তন...আল্লাহকে ঘিরে প্রদক্ষিণের সময় আপনি অচিরেই নিজেকে ভুলে যাবেন।[৫৯]

উম্মাহর সাথে এই ঐক্যে অহমবাদ অতিক্রম করা হয়েছে এবং এক নতুন 'কেন্দ্র' অর্জিত হয়েছে। আরাফাতের ময়দানে রাত্রি জাগরণের সময় তীর্থযাত্রীরা স্বর্গীয়

জ্ঞানের আলোর কাছে নিজেদের উন্মুক্ত করেছে এবং এবার তাদের অবশ্যই আল্লাহর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে জগতে প্রবেশ করতে হবে (মিনার তিনটি স্তম্ভ লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার আচারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা এক *জিহাদ*)। এরপর *হাজ্জি* প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে পবিত্র দায়িত্ব ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্যে সংগ্রামের সাথে অবিচ্ছেদ্য এই আধ্যাত্মিক সচেতনতা নিয়ে জাগতে ফিরে আসতে প্রস্তুত হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত যৌক্তিক প্রয়াস কাল্ট ও মিথে অনুপ্রাণিত আধ্যাত্মিকতার প্রদত্ত অর্থের উপর নির্ভর করে।

শরিয়তির চোখে ইসলামকে অবশ্যই কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। সত্তার মূলে শিয়ারা যে সময়হীন বাস্তবতা দেখতে শিখেছে সেটাকে বর্তমানে সক্রিয় করে তুলতে হবে। কারবালায় ইমাম হুসেইনের উদাহরণ, শরিয়তি বিশ্বাস করতেন, সারা বিশ্বের সকল নির্যাতিত ও বিচ্ছিন্ন মানুষের পক্ষে অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত। শরিয়তি নিজেদের *মাদ্রসায়* বন্দি করে রাখা ও তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামকে স্রেফ ব্যক্তিগত ক্রিডে পরিণত করে বিকৃতকারী শান্তিবাদী *উলেমাদের* প্রতি বিরক্ত ছিলেন। অকাল্টেশনের কাল নিষ্ক্রিয়তার কাল হতে পারে না। শিয়ারা হুসেইনের নজীর অনুসরণ করে তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারলে গোপন ইমামকে আত্মপ্রকাশে বাধ্য করতে পারত।[৬০] কিন্তু *উলেমাগণ* তরুণ ইরানিদের জন্যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, তাদের বিচ্যুতিতে একঘেয়েমিতে ফেলেছেন আর পশ্চিমের হাতে তুলে দিয়েছেন তাদের। ইসলামকে তারা একেবারেই আক্ষরিক অর্থে দেখে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করার মতো কিছু স্পষ্ট নির্দেশের বিন্যাস। অথচ আসলে প্রতীকীবাদই শিয়ামতবাদের বিশেষত্ব। মুসলিমদের তা পার্থিব বাস্তবতায় অদৃশ্যের 'নিদর্শন' দেখতে শিখিয়েছে।[৬১] শিয়াদের প্রয়োজন সংস্কার। আলি ও হুসেইনের মূল শিয়াবাদ ইরানে শরিয়তির ভাষায় 'সাফাভিয় শিয়াবাদের' কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একটি সক্রিয় গতিশীল ধর্মকে ব্যক্তিগত, নিষ্ক্রিয় বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। অথচ গোপন ইমামের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পয়গম্বর ও ইমামদের ব্রত আসলে সাধারণ মানুষদের কাঁধে বর্তানোর কথা বুঝিয়েছিল। সুতরাং, অকাল্টেশনের কাল আসলে গণতন্ত্রের যুগ। সাধারণ মানুষকে আর *মুজতাহিদদের* কাছে বন্দি করে রাখা যাবে না, তাদের সাভাভীয় শিয়াবাদে আবশ্যক ধর্মীয় আচরণের অনুকরণে *(তাকলিদ)* বাধ্য করা যাবে না। প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্যই একাকী আল্লাহ'র কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং তার নিজস্ব জীবনের দায়িত্ব নিতে হবে। বাকি সবকিছু বহুঈশ্বরবাদীতা এবং ইসলামের বিকৃতি, একে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের প্রাণহীন অনুসরণে পরিণত করা। জনগণকেই তাদের নেতা নির্বাচিত করতে হবে; শুরার নীতিমালার দাবি অনুযায়ী

AMARBOI.COM

অবশ্যই তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। ঐকমত্যের *(ইজমাহ)* ভেতর দিয়ে নেতাদের সিদ্ধান্তের বৈধতা দেবে তারা। যাজকীয় নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটাতে হবে। *উলেমা*দের বদলে 'আলোকিত বুদ্ধিজীবীগণ' *(রওশানফেকরুন)* দের হতে হবে *উম্মাহ*র নতুন নেতা।[৬২]

শরিয়তি সম্পূর্ণভাবে সাফাভিয় শিয়াবাদের উসুলি মতবাদের প্রতি পুরোপুরি ন্যায় আচরণ করেননি। বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি সাড়া হিসাবে এগুলোর আবির্ভাব ঘটেছিল, সব সময়ই বিতর্কিত থাকলেও প্রাক আধুনিক যুগের আধ্যাত্মিকতা তুলে ধরেছে সেগুলো, ব্যক্তিকে যেখানে বেশি স্বাধীনতা দান সম্ভব ছিল না।[৬৩] কিন্তু জগৎ বদলে গেছে। স্বায়ত্তশাসন ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার মতো পাশ্চাত্য আদর্শে প্রভাবিত ইরানিরা আর পূর্বপুরুষদের মতো *মুজতাহিদ*দের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছিল না। সাধারণ মানুষকে তাদের সমাজের সীমাবদ্ধতা মেনে নিতে ও স্থিতাবস্থার কাছে আত্মসমর্পণে সাহায্য করতে রক্ষণশীল আধ্যাত্মিকতা প্রণয়ন করা হয়েছিল। হুসেইনের মিথ শিয়াদের মাঝে সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে আবেগকে জীবন্ত রেখেছে, কিন্তু তাঁর কাহিনী ও ইমামদের কাহিনী এও দেখায় যে রেডিক্যাল পরিবর্তনকে স্থান দিতে অক্ষম এক বিশ্বে স্বর্গীয় আইন বাস্তবায়ন কত কঠিন।[৬৪] কিন্তু আধুনিক বিশ্বে এটা আর প্রয়োগযোগ্য ছিল না। ইরানিরা ভয়াবহ গতির পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করছিল; এই ভাবে প্রাচীন আচার ও প্রতীকের প্রতি সাড়া দিতে পারছিল না তারা। শরিয়তি শিয়াবাদকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন যাতে তা গভীরভাবে পরিবর্তিত বিশ্বে শিয়াদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

শরিয়তি জোরের সাথে বলেছেন, অন্য ধর্মবিশ্বাস থেকে ইসলাম ঢের বেশি গতিশীল। খোদ এর পরিভাষাই প্রগতিশীল ধাক্কা তুলে ধরে। পশ্চিমে 'রাজনীতি' শব্দটি নেওয়া হয়েছে স্থির প্রশাসনিক একক গ্রিক *পোলিস* ('নগর') থেকে, কিন্তু ইসলামি সমার্থক শব্দ *সিয়াসাত*, আক্ষরিকভাবে যার অর্থ 'বুনো ঘোড়াকে বশ মানানো,' অন্তস্থঃ সহজাত সম্পূর্ণতাকে বের করে আনার জোরাল সংগ্রামের কথা বোঝানো প্রক্রিয়া।[৬৫] আরবী শব্দ *উম্মাহ* ও *ইমাম*, দুটিই এসেছে মূল শব্দ *আমম* ('যাওয়ার সিদ্ধান্ত') থেকে: সুতরাং ইমাম হচ্ছেন একজন আদর্শ যিনি মানুষকে নতুন দিকে নিয়ে যাবেন। সম্প্রদায় *(উম্মাহ)* কেবল কয়জন ব্যক্তির সমাবেশ নয়, বরং লক্ষ্যমুখী, চিরন্তন বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত।[৬৬] *ইজতিহাদে*র ধারণা ('স্বাধীন বিবেচনা') নবায়ন ও পুনর্নির্মাণের এক অবিরাম বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস বোঝায়; এটা, জোরের সাথে বলেছেন শরিয়তি, মুষ্টিমেয় *উলেমা*র অধিকার নয়, বরং সকল মুসলিমের দায়িত্ব।[৬৭] মুসলিম অভিজ্ঞতায় *হিজরা*র ('অভিবাসন') কেন্দ্রিকতা

পরিবর্তনের পক্ষে প্রস্তুতির কথা এবং মুসলিমকে অস্তিত্বের নতুনত্বের সাথে সম্পর্কিত রাখা উন্মুলতার কথা বোঝায়।[৬৮] এমনকি *ইন্তিযার* ('গোপন ইমামের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা') পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রতি চিরন্তন সচেতনতা ও স্থিতাবস্থার প্রত্যাখ্যান বোঝায়: 'এটা মানুষের দায়িত্বকে তার নিজস্ব করে তোলে, সত্যির ধারা, মানুষের ধারা, ভারি, অবিলম্ব, যৌক্তিক এবং গুরুত্বপূর্ণ।' আলির শিয়াবাদ ছিল এমন এক বিশ্বাস যা মুসলিমদের রুখে দাঁড়িয়ে 'না' বলতে বাধ্য করেছিল।[৬৯]

শাসকগোষ্ঠী এই ধরনের কথাবার্তা চলতে দিতে পারেনি। ১৯৭৩ সালে *হুসাইনিয়াহ* বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরিয়তিকে গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও কারাবন্দি করা হয়। এরপর ইরানে অভ্যন্তরীণ নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে শেষে দেশ ত্যাগের অনুমতি পান। তাঁর বাবা স্মৃতিচারণ করেছেন, মারা যাবার আগে এক রাতে কেঁদে কেঁদে পয়গম্বর ও ইমাম আলিকে বিদায় জানাতে শুনেছেন তিনি।[৭০] ১৯৭৭ সালে লন্ডনে প্রায় নিশ্চিতভাবেই সাভাকের এজেন্টদের হাতে মারা যান শরিয়তি। শিক্ষিত পাশ্চাত্যকৃত ইরানিদের একটি ইসলামি বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন শরিয়তি। ষাটের দশকের আল-ই আহমাদের মতো ১৯৭০-র দশকের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। ১৯৭৮ সালের বিপ্লবের দিকে অগ্রসরমান দিনগুলোতে খোমেনির পাশাপাশি তাঁর ছবিও মিছিলে বহন করা হত।

অবশ্য ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পথ নির্দেশের জন্যে খোমেনির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বিপরীত দিক থেকে কুমের চেয়ে ইরাকে নির্বাসনে থাকার সময়ই তিনি বিরোধিতাকে ভাষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঢের বেশি স্বাধীন ছিলেন। তাঁর বই ও টেপ চোরাপথে পাচার হয়ে দেশে আসত; এবং তাঁর ফতওয়া, যেমন ক্যালেন্ডার বাতিল করার পর শাহর শাসনকে ইসলামের সাথে বেমানান ঘোষণা করে দেওয়া সিদ্ধান্তটি, বেশ গুরুত্বের সাথে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে তিনি তাঁর ল্যান্ডমার্ক গ্রন্থ *হুকুমাত-ই ইসলামি* ('ইসলামি সরকার') প্রকাশ করেন, এখানে যাজকীয় শাসনের শিয়া আদর্শ রূপায়িত হয়েছিল। তাঁর থিসিস ছিল হতবুদ্ধিকর ও বিপ্লবী। শত শত বছর ধরে শিয়ারা গোপন ইমামের অনুপস্থিতিতে সকল সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করে এসেছে, *উলেমাদের* পক্ষে রাষ্ট্র শাসন করা সঠিক বলে কখনওই ভাবেনি। কিন্তু *ইসলামিক গভর্নমেন্ট*-এ খোমেনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ'র সার্বভৌমত্ব নিরাপদ করার স্বার্থে *উলেমাদের* অবশ্যই ক্ষমতা দখল করতে হবে। একজন *ফাকিহ্*—ইসলামি জুরিসপ্রুডেন্সে বিশেষজ্ঞ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সমূহের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিলে, শরীয়াহর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারবেন তিনি। *ফাকিহ্* পয়গম্বর ও ইমামদের মতো সমপর্যায়ের না হলেও

স্বর্গীয় বিধি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বোঝায় যে তিনি তাঁদের মতোই সমান কর্তৃত্ব ধারণ করতে পারেন। কেবল আল্লাহই প্রকৃত বিধান প্রদানকারী, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে শরীয়া আইন প্রয়োগ করার জন্যে নিজস্ব মানব রচিত আইন সৃষ্টিকারী পার্লামেন্টের পরিবর্তে একটা সংসদ থাকা প্রয়োজন।

খোমেনি জানতেন তাঁর যুক্তিগুলো দারুণভাবে বিতর্কিত ও মৌল শিয়া বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু কুতবের মতোই এই উদ্ভাবন বর্তমান জরুরি অবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। শরিয়তির মতো ধর্মকে আর ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিত রাখা যাবে বলে বিশ্বাস করতেন না। পয়গম্বর, ইমাম আলি এবং ইমাম হুসেইন–এঁরা সবাই একাধারে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন, সক্রিয়ভাবে তাঁদের সময়ের নির্যাতন ও বহুঈশ্বরবাদীতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কোনও ব্যাপার ছিল না বরং 'মানুষকে কর্মে চালিতকারী' এক প্রবণতা ছিল:

> ইসলাম হচ্ছে বিশ্বাস ও ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ জঙ্গী ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম। এটা তাদের ধর্ম যারা মুক্তি ও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে। এটা তাদের স্কুল যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।[৭১]

খুবই আধুনিক বার্তা ছিল এটা। শরিয়তির মতো খোমেনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে ইসলাম মধ্যযুগিয় কোনও ধর্ম নয়, বরং সব সময় পশ্চিম যেসব মূল্যবোধ আবিষ্কার করেছে বলে মনে করে সেগুলোকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। কিন্তু ইসলাম সাম্রাজ্যবাদীদের কারণে আক্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। জনগণ পশ্চিমা আদর্শের ভিত্তিতে ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে, এবং এটা বিশ্বাসকে বিকৃত করেছে: 'ইসলাম এমনভাবে মানুষের মাঝে বাস করে যেন অচেনা কেউ,' বিলাপ করেছেন খোমেনি। 'কেউ ইসলামকে তার প্রকৃত রূপে উপস্থাপন করতে চাইলে জনগণকে তা বিশ্বাস করাতে কষ্ট হবে।'[৭২] ইরানিরা আধ্যাত্মিক অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়েছে। 'আমরা নিজেদের পরিচয় সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। একে পশ্চিমা পরিচয় দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছি,' বলতেন খোমেনি। ইরানিরা 'নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে, নিজেদের তারা চেনে না, বিদেশী আদর্শের দাসত্বে বন্দি হয়ে যাচ্ছে।'[৭৩] তিনি বিশ্বাস করতেন, সম্পূর্ণ ইসলামের আইন ভিত্তিক একটি সমাজ নির্মাণ করাই এই বিচ্ছিন্নতার নিরাময়ের উপায়; এসব আইন ইরানিদের কাছে আমদানি করা পশ্চিমের আইনি বিধানের চেয়ে অনেক কাছেরই নয়, বরং সেগুলোর স্বর্গীয় উৎস রয়েছে। তারা স্বর্গীয়ভাবে নির্ধারিত পরিবেশে বাস করে, দেশের আইন অনুযায়ী

AMARBOI.COM

ঠিক যেভাবে আল্লাহ চেয়েছেন সেভাবে বাস করতে বাধ্য হলে তারা নিজেরা এবং তাদের জীবনের অর্থ বদলে যাবে। ইসলামের শৃঙ্খলা, অনুশীলন ও আচার তাদের মাঝে মানবজাতির পক্ষে আদর্শ মুহাম্মদীয় চেতনা সৃষ্টি করবে। খোমেনির চোখে ধর্মবিশ্বাস স্রেফ ক্রিডের ধারণাগত স্বীকারোক্তিমাত্র ছিল না, বরং আল্লাহ মানবজাতির পক্ষে যে সুখ ও অখণ্ডতা চেয়েছেন তার জন্যে বিপ্লবী সংগ্রামকে ধারণ করা এক প্রবণতা ও জীবনযাত্রার ধরণ। 'একবার বিশ্বাস সৃষ্টি হলে, বাকি সব কিছু এমনি এসে যাবে।'[৭৪]

পাশ্চাত্য চেতনার আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধারণ করে বলে এই ধরনের বিশ্বাস বিপ্লবী ছিল। পশ্চিমা কারও চোখে খোমেনির তত্ত্ব *বেলায়েত-ই ফাকিহ* ('দ্য গভর্নমেন্ট অভ জুরিস্ট') ভয়ানক, নিপীড়নমূলক মনে হবে, কিন্তু ইরানিদের 'আধুনিক' সরকারের অভিজ্ঞতা তাদের জন্যে ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণের নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া মুক্তি এনে দেয়নি। খোমেনি পাহলভী শাসকের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজস্ব একটি বিকল্প শিয়া আদর্শ ধারণ করতে চাচ্ছিলেন। অতীন্দ্রিয়বাদী হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি এবং হুবহু ইমামদের মতো না হলেও কাছকাছি স্বর্গীয় জ্ঞানের ধারক ছিলেন বলে মনে করা হত তাঁকে। হুসেইনের মতো তিনি স্বৈরাচারের দুর্নীতিপরায়ণ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন; ইমামদের মতো তাঁকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, তাঁকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন নাজাফে ইমাম আলির সমাধির পাশে বসবাসরত খোমেনিকে অনেকটা বরং গোপন ইমাম বলেই মনে হচ্ছিল: জাতির পক্ষে দেহিকভাবে এখনও প্রবেশাধিকার রুদ্ধ, দূর থেকে তিনি তাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন, একদিন ফিরে আসবেন। গুজব ছিল যে বর্তমান নির্বাসন সত্ত্বেও কুমে ইন্তেকাল করার স্বপ্ন দেখেছেন খোমেনি। পশ্চিমের লোকেরা একজন রাজনৈতিক নেতার মাঝে যেমন আকর্ষণ বা ক্যারিশমা আশা করে তার কোনওটাই না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে খোমেনি ইরানি জনগণের এমন ভক্তি লাভ করতে পেরেছেন সেটা কিছুতেই বুঝতে পারে না। শিয়াবাদ সম্পর্কে ধারণা থাকলে হয়তো একে তেমন রহস্যজনক ভাবত না।

ইসলামিক গভর্নমেন্ট রচনা করার সময় সম্ভবত খোমেনির ধারণাই ছিল না যে বিপ্লব অত্যাসন্ন। তিনি বিশ্বাস করতেন, *বেলায়েত-ই ফাকিহ*'র জন্যে প্রস্তুত হতে ইরানের আরও দুইশো বছর লাগবে।[৭৫] এই সময় পর্যন্ত তাঁর তত্ত্বে রাজনৈতিক দিকের চেয়ে ধর্মীয় আদর্শ নিয়েই বেশি ভাবিত ছিলেন খোমেনি। ১৯৭২ সালে, *ইসলামিক গভর্নমেন্ট* প্রকাশিত হওয়ার এক বছর পর বিতর্কিত *বেলায়ত-ই ফাকিহ*র পক্ষে অতীন্দ্রিয়বাদী যৌক্তিকতার সন্ধান লাভকারী একটি প্রবন্ধ লিখেন খোমেনি, যার নাম দিয়েছিলেন 'দ্য গ্রেটার জিহাদ'। শিরোনাম তাঁর একটি প্রিয়

AMARBOI.COM

হাদিসের উল্লেখ করে, এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে পয়গম্বর বলেছিলন: 'আমরা ছোট *জিহাদ* থেকে বড় *জিহাদের* দিকে ফিরে যাচ্ছি।' এটা নিখুঁতভাবে খোমেনির বিশ্বাস তুলে ধরে যে রাজনীতির যুদ্ধ ও প্রচারণা 'নিম্নপর্যায়ের' সংগ্রাম, সমাজের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনা ও কারও হৃদয় আর মনকে সংহত করার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বহীন। শরিয়তির মতো তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইরানের গভীরতর ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ছাড়া রাজনৈতিক সমাধান সফল হতে পারে না।

১৯৭২ সালের নিবন্ধে খোমেনি প্রস্তাব করেন যে, মোল্লা সদ্রার বর্ণিত অধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে নিয়োজিত একজন *ফাকিহ* ইমামদের মতো একই 'ভ্রান্তি হীনতা' *(ইসমাহ)* অর্জন করতে পারেন। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে জুরিস্ট ইমামদের সমপর্যায়ের হয়ে গেছেন, বরং অতীন্দ্রিয়বাদী আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তাঁকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা অহমবাদ থেকে মুক্ত করেছেন। তাকে 'অন্ধকারের পর্দা', 'জাগতিকতার সাথে সংশ্লিষ্টতা' ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে মুক্ত করতে হয়েছে। আল্লাহ'র অভিমুখে যাত্রার চূড়ান্ত পর্যায়ে এভাবে তিনি পাপ প্রবণতা থেকে পরিশুদ্ধ হয়েছেন: 'কেউ সর্বশক্তিমান আল্লাহয় বিশ্বাস করলে হৃদয়ের চোখ দিয়ে যেভাবে সে সূর্যকে দেখতে পায় সেভাবে তাঁকে দেখলে তার পক্ষে পাপ করা অসম্ভব।' ইমামদের অনন্য উপহার, বিশেষ স্বর্গীয় জ্ঞান ছিল, তবে খোমেনি বিশ্বাস করতেন আধ্যাত্মিকতার সাধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই নিম্নতর ভ্রান্তিহীনতা অর্জন করেছেন তাঁরা। এভাবে ইসলামি আইনের বিশেষজ্ঞ ও অতীন্দ্রিয়বাদীভাবে নব জন্মলাভকারী একজন *ফাকিহ্‌র* পক্ষে জনগণকে আল্লাহ'র পথে পরিচালিত করা অসম্ভব হবে না।[৭৬] এখানে সম্ভাব্য বহুঈশ্বরবাদীতার ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু আবারও জোরের সাথে বলা প্রয়োজন যে ১৯৭২ সালে কেউই, এমনকি খোমেনিও না, ইসলামি প্রবণতাসম্পন্ন বিপ্লবের মাধ্যমে শাহকে উৎখাত করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন না। খোমেনি সত্তর বছর বয়সী ছিলেন তখন। নিশ্চয়ই তিনিই যে শাসক *ফাকিহ্‌তে* পরিণত হবেন এমনটা ভাবতে যাননি। *ইসলামিক গভর্নমেন্ট* ও 'দ্য গ্রেটার জিহাদে' খোমেনি শিয়াহ পুরাণ ও অতীন্দ্রিয়বাদ কীভাবে অভিযোজিত করে শত শত বছরের পবিত্র ঐতিহ্যকে ভেঙে ইরানে যাজকীয় শাসনের অনুমতি দেওয়া যায় সেটাই দেখার চেষ্টা করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এই *মিথোস* কীভাবে কাজ করে সেটা দেখা তখনও বাকি ছিল তাঁর।

AMARBOI.COM

ইসরায়েলে এক নতুন ধরনের ইহুদি মৌলবাদ ইতিমধ্যে মিথকে রাজনৈতিক বাস্তবতায় অনুবাদ করার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। ধর্মীয় যায়নবাদে ছিল এর শেকড়, প্যালেস্তাইনে রাষ্ট্র-পূর্ববর্তী সময়ে সেক্যুলার যায়নবাদের ছায়ায় পরিপুষ্ট হয়েছে। এইসব ধর্মীয় যায়নবাদীরা ছিল আধুনিক অর্থডক্স, বেশ আগে থেকেই তারা সমাজতান্ত্রিক কিব্বুতযিমের পাশাপাশি নিজস্ব নিবেদিত বসতি স্থাপন করে আসছিল। হেরাদিমের বিপরীতে ধার্মিক ইহুদিদের এই ক্ষুদ্র দলটি যায়নবাদকে অর্থডক্সির সাথে বেমানান মনে করেনি। বাইবেলকে আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে তারা: তোরাহয় ঈশ্বর আব্রাহামের বংশধরদের ভুমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং এভাবে ইহুদিদের প্যালেস্তাইনের উপর বৈধ অধিকার দান করেছেন। তাছাড়া, এরেতয ইসরায়েলে ইহুদিরা ডায়াসপোরার চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনভাবে আইন অনুসরণ করতে পারবে। ঘেটোতে কৃষি ও ভূমিতে বসতি স্থাপনের অনেক বিধান কিংবা রাজনীতি ও সরকারের আইন বাস্তব কারণেই পালন করা সম্ভব ছিল না। ফলে প্রয়োজনের তাগিদেই ডায়াসপোরার ইহুদিবাদ বিভাজিত ও গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এখন নিজেদের দেশে আসার পর অবশেষে ইহুদিরা ফের সম্পূর্ণ তোরাহ আবার পালন করতে পারবে। যায়নবাদী অর্থডক্সির অন্যতম অগ্রদূত পিনচাস রোজেনব্লাথ ব্যাখ্যা করেছেন:

> আমরা নিজেদের উপর সম্পূর্ণ তোরাহ গ্রহণ করেছি, এর নির্দেশনা ও ধারণাসমূহ। [প্রাচীন] অর্থডক্সি আসলে তোরাহর ছোট একটা অংশ তুলে ধরেছে...সিনাগগ বা পরিবারে পালন করা হয়...কিংবা জীবনের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে। আমরা সব সময় সব জায়গায় তোরাহ অনুসরণ করতে চাই, [তোরাহ] ও এর বিধিবিধানকে ব্যক্তি ও সর্বসাধারণের জীবনে সার্বভৌমত্ব দিতে চাই।[৭৭]

আধুনিকতার সাথে বেমানান হওয়া দূরের কথা, আইন একে সম্পূর্ণতা দান করবে। জগৎ দেখবে যে, ইহুদিরা ঈশ্বর পরিকল্পিত বলে সম্পূর্ণ প্রগতিশীল একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন ঘটাতে পারে।[৭৮]

AMARBOI.COM

সামগ্রিকতার প্রতি সবসময়ই এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ধর্মীয় যায়নবাদকে সব সময়ই যা বৈশিষ্ট্যায়িত করবে। নির্বাসনের আঘাত ও বিধিনিষেধের পর এটা ছিল উপশম ও অধিকতর হলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি খোঁজার উপায়। তবে এটা সেক্যুলার যায়নবাদীদের যৌক্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ছিল, যারা ধার্মিক বসতিস্থাপনকারীদের গুরুত্বের সাথে নেয়নি এবং এরেতয ইসরায়েলে তাদের তোরাহ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে কেবল পশ্চাদপদই নয় বরং বিতৃষ্ণা জাগানো মনে করেছে। ধার্মিক যায়নবাদীরা বিদ্রোহী হওয়ার বেলায় দারুণ সজাগ ছিল। ১৯২৯ সালে তারা নিজস্ব তরুণ আন্দোলন ব্নেই আকিভা ('সান্স অভ আকিভা') সূচিত করার সময় এই তরুণ দল রোমে ইহুদি আন্দোলনের সমর্থনকারী দ্বিতীয় সিই শতাব্দীর মহান অতীন্দ্রিয়বাদী ও পণ্ডিত র‍্যাবাই আকিভাকে আদর্শ হিসাবে নিয়েছিল। সেক্যুলার যায়নবাদীরাও বিদ্রোহী ছিল, কিন্তু সেটা ধার্মিক ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে। এবার ব্নেই আকিভার ধারণা জেগেছিল যে তাদের অবশ্যই 'বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানাতে হবে, ইহুদিবাদ ও ইহুদি ঐতিহ্যের বিরোধিতাকারী [সেক্যুলার] তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে।'[৭৯] ঈশ্বরের নামে যুদ্ধ করছিল তারা। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন থেকে ধর্মকে বাদ বা প্রান্তিকায়িত করার বদলে তারা চাইছিল 'সর্বক্ষণ ও সকল ক্ষেত্রে' তাদের অস্তিত্বকে ধর্ম দিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলতে। সেক্যুলারিস্টদের সম্পূর্ণভাবে যায়নবাদ 'দখল' করে নিতে দিতে চায়নি তারা। সংখ্যালঘু হলেও সেক্যুলারিস্টদের সম্পূর্ণ যৌক্তিক আদর্শের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদে অভ্যুত্থান ঘটাচ্ছিল তারা।

নিজস্ব স্কুল ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল তাদের। ১৯৪০-র দশকে রাভ মোশে য্ভি নেরিয়া ধার্মিক যায়নবাদী ছেলেমেয়েদের জন্যে বেশ কয়েকটি অভিজাত বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই *ইয়েশিভা* হাই স্কুলগুলোতে পাঠ্যক্রম ছিল খুবই উচ্চমানের; ছাত্ররা তোরাহর পাশাপাশি সেক্যুলার বিষয় পড়াশোনা করত। হেরেদিমদের বিপরীতে এই নিও-অর্থডক্স ধার্মিক যায়নবাদীরা তাদের আধুনিক জীবনের প্রধান ধারা থেকে দূরে সারিয়ে রাখতে হবে বলে মনে করেনি। এটা তাদের হলিস্টিক দর্শনের বিরোধিতা করবে; তাদের বিশ্বাস ছিল যে ইহুদিবাদ এইসব জেন্টাইল বিজ্ঞানকে স্থান করে দেওয়ার মতো যথেষ্ট বিশাল, কিন্তু তোরাহ পাঠকেও খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল তারা, তোরাহ ও তালমুদ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে হেরেদি *ইয়েশিভোতের* স্নাতকদের নিয়োগ দিয়েছিল। *ইয়েশিভা* হাইস্কুলে *মিথোস* ও *লোগোসকে* তখনও সম্পূরক মনে করা হত। তোরাহ ঈশ্বরের সাথে এক অতীন্দ্রিয়বাদী সাক্ষাতের ব্যবস্থা যোগাত ও সামগ্রের অর্থ প্রদান করত, যদিও এর কোনও বাস্তব উপযোগিতা ছিল না। মিদ্রশিয়াত নোয়ামের প্রিন্সিপাল র‍্যাবাই

ইয়েহোশুয়া যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, ছাত্ররা জীবীকা নির্বাহের জন্যে বা 'অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের উপায় হিসাবে' তোরা পাঠ করত না। বরং তোরাহকে অবশ্যই 'এর খাতিরেই পাঠ করতে হবে'; সেক্যুলার বিষয়ের *লোগোসের* বিপরীতে এর বাস্তব কোনও ব্যবহার ছিল না, বরং তা ছিল স্রেফ 'মানুষের সমগ্র লক্ষ্য'।[৮০] অবশ্য ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পড়াশোনাই ধার্মিক তরুণ যায়নিস্টদের জন্যে যথেষ্ট ছিল না। ১৯৫০-র দশকে বয়স্ক ছাত্রদের জন্যে *ইয়েশিভোত* প্রতিষ্ঠা করা হয় যেগুলোর ধার্মিক তরুণদের তোরাহ্ পাঠের সাথে আইডিএফ-এ জাতীয় চাকরিকে সমন্বিত করার উপায় দিয়ে নতুন ইসরায়েলি সরকারের সাথে বিশেষ 'ব্যবস্থা' *(হেসদার)* ছিল।

ধার্মিক যায়নবাদীরা এভাবে নিজেদের জন্যে ভিন্ন জীবনধারা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু রাষ্ট্রের গোড়ার দিকের বছরগুলোয় কেউ কেউ পরিচয় সংকটে ভুগছে। তারা যেন দুই জগতের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিল: সেক্যুলারিস্টদের চোখে তারা যথেষ্ট যায়নবাদী ছিল না, এবং তাদের সাফল্যসমূহ রাষ্ট্রকে অস্তিত্ব দানকারী সেক্যুলার অগ্রদূতদের সাফল্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারছিল না। একই ভাবে হেরেদিমের পক্ষে যথেষ্ট অর্থডক্স ছিল না তারা, জানত তোরাহয় তাদের দক্ষতার সাথে পাল্লা দিতে পারবে না। এই সংকট ১৯৫০-র দশকের গোড়ার দিকে আরও একটি তরুণ অভ্যুত্থানের দিকে চালিত করেছিল। এক *ইয়েশিভা* হাই স্কুল কফার হারো'এহ-র চৌদ্দ বছরের দশবারজন ছেলের একটা ক্ষুদে দল হেরেদিমদের মতোই আরও কঠোর ধর্মীয় জীবন যাপন করতে শুরু করে। তারা শোভন পোশাক ও লিঙ্গের বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দেয়, চটুল কথাবার্তা ও তুচ্ছ বিনোদনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি ও দুষ্কৃতকারীদের বিচারের মাধ্যমে একে অন্যের জীবনের উপর নজরদারী করতে থাকে। তীব্র জাতীয়তাবাদের সাথে হেরেদি উৎসাহকে সম্পৃক্ত করে এরা নিজেদের নাম দিয়েছিল গাহেলেত ('জ্বলন্ত অঙ্গার')। কেন্দ্রে একটি *ইয়েশিভাসহ* কিব্বুতয প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখত ওরা, যেখানে পুরুষরা হেরেদিমের মতো দিন রাত সারাক্ষণ তালমুদ পাঠ করবে ও আল্ট্রা অর্থডক্স কায়দায় নিম্নতর তবে *লোগোসের* সম্পূরক বলয়ে অবনমিত নারীরা তাদের ভরণপোষণ করবে, জমিতে চাষ করবে। ধার্মিক যায়নবাদী বলয়ে অভিজাত গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল গাহেলেতরা, কিন্তু তাদের মনে হয়েছিল যে হাসিদিম ও মিসনাগদিমের মতো নির্দেশনা দানের জন্যে একজন র‍্যাবাই না মেলা পর্যন্ত তাদের অর্থডক্সি পূর্ণতা পাবে না। ১৯৫০-র দশকের শেষের দিকে র‍্যাবাই আব্রাহাম ইতযহাত কুকের ছেলে প্রবীন র‍্যাবাই য্ভি ইয়েহুদা কুকের আকর্ষণে বন্দি হয়ে পড়ে এরা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁর রচনাবলী আলোচিত হয়েছে।[৮১]

গাহেলেত র‍্যাবাই যৃভি ইয়েহুদার দর্শন যখন পায় ততদিনে তিনি সত্তর বছর বয়স্ক হয়ে গেছেন, বাবার তুলনায় অর্ধেকও নন বলে সাধারণভাবে মনে করা হত তাঁকে। উত্তর জেরুজালেমেরে মারকায *ইয়েশিভার* প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি। বাবা প্রতিষ্ঠা করলেও মাত্র বিশ জন ছাত্র নিয়ে ধুঁকেধুঁকে মরছিল সেটা। কিন্তু ছেলে কুকের ধারণাগুলো নিমেষে গাহেলেতের কাছে আবেদন সৃষ্টি করল, কারণ তিনি বাবা আব্রাহাম ইতযহাকের চেয়ে ঢের অগ্রসর ছিলেন এবং বাবা কুকের জটিল দ্বান্দ্বিক দর্শনকে এতটাই সরলীকরণ করেছিলেন যে তা আধুনিক আদর্শের সংহত রূপ নিয়েছিল। প্রবীন কুক সেক্যুলার যায়নবাদে স্বর্গীয় উদ্দেশ্য দেখেছিলেন, কিন্তু র‍্যাবাই যৃভি ইয়েহুদা বিশ্বাস করতেন যে, সেক্যুলার ইসরায়েল রাষ্ট্রই ঈশ্বরের রাজ্য *তাউত কোর্ত*; এর জমিনের প্রতিটি কণা পবিত্র:

> এরেতয ইসরায়েলে আগত প্রতিটি ইহুদি, ইসরায়েলের জমিনে রোপন করা প্রতিটি গাছ, ইসরায়েলের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া প্রতিটি সৈনিক অক্ষরিকভাবে আরেকটি আধ্যাত্মিক পর্যায় গঠন করে; নিষ্কৃতির প্রক্রিয়ায় আরেকটি স্তর।[৮২]

হেরেদিম যেখানে স্বাধীনতা দিবসে ছাত্রদের আর্মি প্যারেড দেখার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, সেখানে ছেলে কুক জোরের সাথে বলেছেন, সেনাবাহিনী যেহেতু পবিত্র তাই সেটা দেখা ধর্মীয় দায়িত্ব। সৈনিকরা তোরাহ পণ্ডিতদের মতোই ন্যায়নিষ্ঠ, তাদের অস্ত্র প্রার্থনার চাদর বা ফিলাক্ট্রিজের মতোই পবিত্র। 'যায়নবাদ স্বর্গীয় বিষয়,' জোরের সাথে বলেছেন র‍্যাবাই যৃভি ইয়েহুদা। 'ইসরায়েল রাষ্ট্র স্বর্গীয় সত্তা, আমাদের পবিত্র ও মহান রাজ্য।'[৮৩]

নিষ্কৃতিহীন বিশ্বে সকল রাজনীতিই দূষিত হওয়ায় পিতা কুক যেখানে ইহুদিদের রাজনীতিতে অংশ নেওয়া ঠিক হবে না বলে বিশ্বাস করতেন সেখানে ছেলে কুকের বিশ্বাস ছিল যে মেসিয়ানিক যুগের সূচনা হয়েছে এবং রাজনৈতিক সংশ্রব কাব্বালিস্টের অতীন্দ্রিয় যাত্রার মতো পবিত্রতার চরম শিখরে আরোহণ।[৮৪] তাঁর দর্শন আক্ষরিক মতবাদগতভাবে দিক থেকে হলিস্টিক ছিল। ভূমি, জনগণ, ও তোরাহ এক অদৃশ্য ত্রয়ী সৃষ্টি করেছে। কোনও একটিকে ত্যাগ করা মানে সবকটিকেই ত্যাগ করা। ইহুদিরা বাইবেলে নির্ধারিত সীমানা মোতাবেক ইসরায়েলের সমগ্র ভূমিতে বাস না করা পর্যন্ত নিষ্কৃতি আসতে পারে না: এই সময় আরবদের অধিকারে থাকা এলাকাসহ সম্পূর্ণ দেশের অধিকার এক মহান ধর্মীয় দায়িত্বে পরিণত হয়েছিল।[৮৫] কিন্তু ১৯৫০-র দশকের শেষ দিকে গাহেলেত কুকের

AMARBOI.COM

দেখা পাওয়ার মুহূর্তে এমন কিছু অর্জনের সামান্যই সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্রের সীমানায় গালিলি, নেজেভ ও উপকূলীয় সমতল অন্তর্ভুক্ত ছিল। জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের বাইবেলিয় ভূমি জর্দানের হাশেমিয় রাজ্যের অধিকারে ছিল। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী ছিলেন কুক। সব কিছুই পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছে। এমনকি ইহুদিদের ডায়াসপোরা ছেড়ে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য করায় হলোকাস্ট নিষ্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। ইহুদিরা 'বিদেশী ভূমির অপবিত্রতাকে এমন শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল যে শেষ সময় উপস্থিত হওয়ায় বিপুল রক্তপাতের ভেতর দিয়ে সেখান থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছে,' ১৯৭৩ সালে এক হলোকাস্ট ডে সারমনে ব্যাখ্যা করেছেন কুক। ঐতিহাসিক এইসব ঘটনা ঈশ্বরের স্বর্গীয় হাতের প্রকাশ ঘটিয়েছে, এবং 'তোরাহ এবং যা কিছু পবিত্র তার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছে।' এভাবে ইতিহাস 'বিশ্ব জগতের প্রভুর সাথে' এক মিলনের ব্যবস্থা করেছে।[৮৬]

মিথকে বাস্তবে পরিণত করার ব্যাপারটি অবশেষে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রাক আধুনিক বিশ্বে পুরাণ ও রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। রাষ্ট্র নির্মাণ, সামরিক অভিযান, কৃষি ও অর্থনীতি এসবই ছিল *লোগোসের* যৌক্তিক অনুশীলনের এখতিয়ার। মিথ এইসব বাস্তব কর্মকাণ্ডকে ধারণ করে অর্থ যোগাত। মিথ আবার শুদ্ধিকরণের উপায় হিসাবেও কাজ করতে পারত এবং নারী পুরুষকে যুক্তির বাস্তব বিবেচনাকে অতিক্রম করে যাওয়া সহানুভূতির মতো মূল্যবোধ মনে করিয়ে দিত। পার্থিব কোনও বাস্তবতা ঐশী প্রতীকে পরিণত হতে পারে, কিন্তু সেটা নিজে কখনও পবিত্র হতে পারে না, যুক্তির অগম্য নিজের অতীত সেই দিকে ইঙ্গিত করে। কিন্তু এইসব পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করে কুক এমন কিছু নির্মাণ করেছেন কেউ যাকে বহু ঈশ্বরবাদীতা বলতে পারে। সেনাবাহিনী কি 'পবিত্র' হতে পারে যেখানে দোষী ব্যক্তিদের সাথে নিরীহ লোকজনকে হত্যা করার মতো ভয়ঙ্কর কাজ করতে বাধ্য হয় তারা? ঐতিহ্যগতভাবে মেসিয়ানিজম মানুষকে স্থিতাবস্থার সমালোচনায় আনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু কুক একে ইসরায়েলের নীতির প্রতি চরম অনুমোদন দিতে ব্যবহার করবেন। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধকে অস্বীকারকারী বিনাশী মতবাদের জন্ম দিতে পারে। ইসরায়েল রাষ্ট্রকে পবিত্র পরিণত করে এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে পরম মূল্য দিয়ে কুক বিংশ শতাব্দীর কিছু ভয়ঙ্করতম জাতীয় নিষ্ঠুরতার জন্যে দায়ী প্রলোভনের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। প্রবীন র‍্যাবাই কুকের অন্য ধর্মবিশ্বাস ও সেক্যুলার বিশ্বের দিকে হাত বাড়ানো অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শন হারিয়ে গিয়েছিল। ছেলে কুক ইসরায়েলের আশার পথে বাধা দানকারী *গোয়িম* ক্রিশ্চান ও

আরবদের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ ছিলেন।[৮৭] অতীতের দর্শনে যুক্তি ও মিথকে ভিন্ন হলেও সম্পূরক হিসাবে বিবেচনাকারী প্রজ্ঞা ছিল। ছেলে কুকের দুটোকে একসাথে জোয়ালবদ্ধ করায় বিপদের ঝুঁকি ছিল।

গাহেলেত অবশ্যাই এই দর্শন গ্রহণ করেনি। র‍্যাবাই কুকের হলিস্টিক আদর্শ যায়নবাদকে ধর্মে পরিণত করেছিল। ঠিক এরই খোঁজ করছিল তারা। মারকায হারাভের পূর্ণসময়ের ছাত্রে পরিণত হয়ে এই আবছা *ইয়েশিভাকে* ইসরায়েলের মানচিত্রে স্থাপন করে। কুককেও তারা অনেকটা ইহুদি পোপে পরিণত করে, যাঁর সিদ্ধান্তসমূহ অবশ্য পালনীয় ও ভ্রান্তিহীন ছিল। এই তরুণরা কুকের ক্যাডারে পরিণত হয়; অচিরেই নতুন মৌলবাদী যায়নবাদের নেতায় পরিণত হবে তারা: মোশে লেভিংগার, ইয়াকভ আরিয়েল, শ্লোমো আভিনার, হাইম দ্রুকমান, দোভ লিয়র, যালমান মেলামেদ, আব্রাহাম শাপিরা ও এলিয়েযার ওয়ালডমান। জাতিকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ১৯৬০-র দশকে মারকায হারাভে একটি আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তারা। সেক্যুলার রাষ্ট্র ইসরায়েলের ধর্মীয় সম্ভাবনা অর্জনের জন্যে প্রবীন কুকের পরিকল্পিত সেক্যুলার ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বান্দিক সংশ্লেষের বদলে র‍্যাবাই য্ভি ইয়েহুদা ঈশ্বর কর্তৃক সেক্যুলারের অত্যাসন্ন অধিকারের স্বপ্ন দেখেছেন।

অবশ্য শত উৎসাহ সত্ত্বেও গাহেলেত পরিকল্পনার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারেনি। সমগ্র দেশে বসতি স্থাপন বা জাতির মন বদলানোর মতো কার্যকর কিছু করার ছিল না তাদের, কিন্তু ১৯৬৭ সালে ইতিহাস হাত মিলিয়েছিল।

১৯৬৭ সালের স্বাধীনতা দিবসে, ছয় দিনের যুদ্ধের শুরু হওয়ার মোটামুটি তিন সপ্তাহ আগে, র‍্যাবাই কুক যথারীতি মারকায হারাভ *ইয়েশিভায়* ভাষণ দিচ্ছিলেন। সহসা ফুঁপিয়ে ওঠার মতো আওয়াজ করে উঠলেন তিনি, এমন কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেন যা বক্তৃতার ধারাকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিল: 'কোথায় ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র থেকে ছিঁড়ে নেওয়া আমাদের হেব্রন, শেচেম, জেরিকো এবং আনাতোহ; কর্তিত অবস্থায় আমাদের রক্তক্ষরণ হচ্ছে?'[৮৮] তিন সপ্তাহ পরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এর আগে আরবদের হাতে থাকা এইসব বাইবেলিয় স্থান দখল করে নেয়। র‍্যাবাই কুকের শিষ্যরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েই সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি। স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের শেষে ইসরায়েল মিশর থেকে গাযা মালভূমি, জর্দানের কাছ থেকে পশ্চিম তীর ও সিরিয়া থেকে গোলান মালভূমি দখল করে নেয়। ১৯৪৮ সাল থেকে ইসরায়েল ও জর্দানের ভেতর বিভক্ত পবিত্র জেরুজালেম নগরী এবার ইসরায়েল কর্তৃক অধিকৃত হয় ও ইহুদি রাষ্ট্রের চিরন্তন রাজধানী বলে

ঘোষিত হয়। আরও একবার ইহুদিরা পশ্চিম দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করার সুযোগ লাভ করে। উল্লাসের মেজাজ ও প্রায় অতীন্দ্রিয়বাদী উল্লাস গোটা দেশকে অধিকার করে নিয়েছিল। যুদ্ধের আগে ইসরায়েলিরা রেডিও-তে ওদের সবাইকে সাগরে নিক্ষেপ করার নাসেরের শপথের কথা শুনত; এখন অপ্রত্যাশিতভাবে ইহুদি স্মৃতিতে পবিত্র সব স্থানের অধিকার লাভ করেছে তারা। চরম সেক্যুলারিস্টদের অনেকেই যুদ্ধকে লোহিত সাগর অতিক্রম করার স্মৃতিবাহী একটি ধর্মীয় ঘটনা হিসাবে প্রত্যক্ষ করেছিল।[৮৯]

কিন্তু কুকবাদীদের জন্যে যুদ্ধ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একে নিস্কৃতি একেবারে হাতের নাগালে এবং ঈশ্বর ইতিহাসকে চূড়ান্ত পূর্ণতার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তারই পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ মনে হয়েছে। প্রকৃত কোনও মেসায়াহর আগমন না ঘটার ব্যাপারটি গাহেলেতকে উদ্বিগ্ন করেনি; আধুনিক ছিল ওরা, বিমূর্তভাবে ব্যক্তি নয় বরং প্রক্রিয়াকেই 'মেসায়াহ' হিসাবে দেখতে প্রস্তুত ছিল।[৯০] যুদ্ধের 'অলৌকিক' ঘটনার একটি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা থাকায়ও তারা অস্বস্তি বোধ করেনি: ইসরায়েলি বিজয় ছিল সম্পূর্ণ আইডিএফ-এর দক্ষতা ও আরব বাহিনীর অযোগ্যতার ফল। দ্বাদশ শতাব্দীর দার্শনিক মায়মোনাইদস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, নিস্কৃতিতে অতিপ্রাকৃত কিছু থাকবে না: মহাজাগতিক বিস্ময় ও সর্বজনীন শান্তির কথা বলা ভবিষ্যদ্বাণীসুলভ অনুচ্ছেদগুলো মেসিয়ানিক রাজ্যের নয় বরং আসন্ন পৃথিবীর কথা বুঝিয়েছে।[৯১] বিজয় কুকবাদীদের বিশ্বাস করিয়েছিল যে আন্তরিকতার সাথে সংগঠিত হওয়ার সময় হয়েছে।

বিজয়ের কয়েক মাস পরে র‍্যাবাই ও ছাত্ররা আরব প্রতিবেশীদের সাথে শান্তি স্থাপনের জন্যে শ্রমিক দলীয় সরকারের সদ্য অধিকৃত কিছু এলাকা ফিরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নাকচ করার উপায়ের খোঁজে মারকায হারাভে এক অনির্ধারিত সভার আয়োজন করেন। কুকবাদীদের চোখে এমনকি এক ইঞ্চি পবিত্র ভূমি ফিরিয়ে দেওয়ার মানে হবে অশুভ শক্তির বিজয়। বিস্ময়ের সাথে সেক্যুলারদের মিত্র হিসাবে পেয়ে যায় তারা। যুদ্ধের অব্যবহিত পর ইসরায়েলি কবি, প্রফেসর, অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিক ও সেনা কর্মকর্তাদের বিশিষ্ট একটি দল সরকারকে অঞ্চলগত ছাড় থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ল্যান্ড অভ ইসরায়েল আন্দোলন গঠন করেন। বছর পরিক্রমায় এই আন্দোলন কুকবাদীদের এমনভাবে তাদের আদর্শ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে যা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন সৃষ্টি করবে এবং তাদের আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন যোগাবে। আস্তে আস্তে কুকবাদীরা মূল ধারায় যোগ দিচ্ছিল।

১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে মোশে লেভিংগার হেব্রনে পাসওভারের অনুষ্ঠানে কুকবাদীদের একটি ছোট দল ও সেগুলোর পরিবারের নেতৃত্ব দেন, যেখানে আব্রাহাম, ইসাক ও জ্যাকবের সমাধি আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। মুসলিমরা যেহেতু ইহুদি গোত্রপিতাদের মহান পয়গম্বর হিসাবে শ্রদ্ধা করে, হেব্রন তাদের চোখেও পবিত্র নগরী। শত শত বছর ধরে প্যালেস্তাইনিরা হেব্রনকে ঈশ্বরের 'বন্ধু' আব্রাহামের সাথে সম্পর্কের কারণে আল-খালিল ডেকে এসেছে। কিন্তু হেব্রন অন্ধ স্মৃতিও জাগিয়ে তোলে। ২৪শে আগস্ট, ১৯২৯ প্যালেস্তাইনে আরব ও যায়নবাদীদের এক মহা টানাপোড়েনের সময় উনপঞ্চাশজন ইহুদি নারী-পুরুষ ও শিশু হেব্রনে গণহত্যার শিকার হয়। লেভিংগার ও তার দল সুইস পর্যটকের পরিচয়ে পার্ক হোটেলে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু পাসওভার শেষ হয়ে গেলেও বিদায় নিতে অস্বীকার করে স্কোয়ার্টার হিসাবে থেকে যান। ইসরায়েলি সরকারের পক্ষে বিব্রতকর ব্যাপার ছিল এটা, কেননা জেনিভা কনভেনশন বৈরিতার সময় অধিকৃত যেকোনও এলাকায় বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ করেছে, এবং জাতি সংঘ অধিকৃত এলাকা থেকে ইসরায়েলকে প্রত্যাহারের চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু কুকবাদীদের *চুতযপা* স্বর্ণযুগে তাদের শ্রমিক দলীয়দের তাদের অগ্রদূতদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, সুতরাং সরকার তাদেরকে উৎখাত করতে অনীহ ছিল।[৮২]

লেভিংগারের দলটি কেভ অভ দ্য প্যাট্রিয়ার্কে সাথে সাথে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ছয় দিনের যুদ্ধের পর ইসরায়েলি সামরিক সরকার বৈরিতার সময় বন্ধ থাকা উপসনালয়টি আবার উপাসনার জন্যে খুলে দিয়েছিল, আরবদের বিরক্ত না করে প্রার্থনার জন্যে ইহুদিদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল। ইহুদি বসতিস্থাপনকারীদের পক্ষে এটা যথেষ্ট ছিল না, গুহায় আরও সময় ও স্থান বাড়ানোর জন্যে চাপ দিচ্ছিল তারা। শুক্রবার মুসলিমদের সমবেত প্রার্থনার সময় তারা উপসনালয় ছেড়ে যেতে অস্বীকার করছিল, অনেক সময় দরবার ঘর ছেড়ে গেলেও মুল প্রবেশপথ অবরোধ করে রাখত, যাতে মুসলিম উপাসকরা ভেতরে ঢুকতে না পারে। গুহায় *কিদ্দুশ* ধরে মদ পান করত, জানত মুসলিমরা একে আক্রমণাত্মক মনে করবে। ১৯৬৮ সালের স্বাধীনতা দিবসে, সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে উপসনালয়ে ইসরায়েলি পতাকা ওঠায় তারা। উত্তেজনা বেড়ে ওঠে এবং–সম্ভবত অনিবার্যভাবে–মসজিদের বাইরের কোনও প্যালেস্তাইনি তরুণ ইসরায়েলি পর্যটকদের প্রতি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে।[৮৩] ইসরায়েলি সরকার অনীহার সাথে হেব্রনের বাইরে বসতি স্থাপনকারীদের জন্যে একটি ছিটমহল প্রতিষ্ঠা করে; নতুন বসতি আইডিএফ-এর হেফাযতে ছিল। লেভিংগার এর নাম দিয়েছিলেন কিরিয়াত আরবা (হেব্রনের বাইবেলিয় নাম), এবং তা সবচেয়ে চরম, সহিংস ও উস্কানিদাতা যায়নবাদী মৌলবাদীদের ঘাঁটি হয়েছিল।

AMARBOI.COM

১৯৭২ সাল নাগাদ কিরিয়াত আরবা আনুমানিক পাঁচ হাজার অধিবাসীর একটা ছোট শহরে পরিণত হয়। কুকবাদীদের কাছে পবিত্র যুদ্ধে 'অন্যপক্ষে'র সীমানা ঠেলে ঈশ্বরের জন্যে পবিত্র ভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুক্ত করা বিজয়ের প্রতীক ছিল এটা।

অবশ্য আর কোনও ক্ষেত্রে কুকবাদীরা তেমন এটা সাফল্য পায়নি। মহা হতাশার সাথে তারা লক্ষ করেছে যে নিস্কৃতি থমকে গেছে। শ্রমিক দলীয় সরকার দখলিকৃত ভুমি অধিগ্রহণ করেনি, সামরিক বসতি স্থাপন করলেও শান্তির বিনিময়ে ভূমি ছেড়ে দেওয়ার আলোচনা অব্যাহত ছিল। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ ইসরায়েলি আত্মতুষ্টিবোধের দিকে পরিচালিত করেছিল, কিন্তু ১৯৭৩ সালে অক্টোবর মাসে ইহুদি ক্যালেন্ডারে সবচেয়ে গম্ভীর দিন ইয়োম কিপ্পুর দিবসে (প্রায়শ্চিত্ত দিবস) তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, মিশর ও সিরিয়া ইসরায়েলিদের সম্পূর্ণ স্তম্ভিত করে সিনাই ও গোলান উপত্যকায় হামলা করে বসে। এবার অবশ্য আরবরা আগের চেয়ে ভালো ফল দেখায়। কেবল কষ্টেসৃষ্টেই আইডিএফ তাদের ফিরিয়ে দিতে পেরেছিল। হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল ইসরায়েলিরা। গোটা দেশ জুড়ে হতাশা ও সন্দেহের একটা বোধ চেপে বসেছিল। অসতর্ক অবস্থায় আক্রান্ত হয়েছে ইসরায়েল। প্রায় পরাস্ত অবস্থাকে আদর্শগত অবক্ষয়েরই পরিণতি মনে হয়েছে। কুকবাদীরা এতে একমত হয়। ১৯৬৭ সালে ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই বিজয়কে পুঁজি না করে এবং দখলিকৃত এলাকা অধিগ্রহণ না করে ইসরায়েলি সরকার গড়িমসি করেছে ও *গোয়িম*, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষুব্ধ করে তোলার ভয় করেছে। ইয়োম কিপ্পুরের যুদ্ধ ঈশ্বরের শাস্তি ও স্মারক। এবার ধার্মিক ইহুদিদের অবশ্যই জাতিকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসতে হবে। এক কুকবাদী র‍্যাবাই সেক্যুলার ইসরায়েলকে বীরের মতো যুদ্ধ করে রণক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়া সৈনিকের সাথে তুলনা করেছিলেন। বিশ্বাসী ইহুদিরা, যারা কোনওদিনই ধর্মকে ত্যাগ করেনি, দায়িত্ব গ্রহণ করবে ও তাঁর সেই ব্রতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।[৯৪]

ছয়দিনের যুদ্ধ কুকবাদীদের তাদের দর্শনের ব্যাপারে নিশ্চিত করে তাদের বেশ কয়েকটি বসতি স্থাপনের পথে পরিচালিত করেছিল, কিন্তু ইয়োম কিপ্পুরের যুদ্ধের আগে তাদের আন্দোলন আসলে তেমন গতি পায়নি। কুকবাদী র‍্যাবাই ইয়েহুদা আমিতাল রচিত একটি নিবন্ধ এই নতুন জঙ্গী মনোভাব তুলে ধরেছে। 'দ্য মিনিং অভ দ্য ইয়োম কিপ্পুর ওয়ার'-এ আমিতাল বহু মৌলবাদী আন্দোলনের অন্তরে বিরাজ করা নিশ্চিহ্নতার ভীতি তুলে ধরেছে। অক্টোবরের হামলা সকল ইসরায়েলিকে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের বিচ্ছিন্নতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে এবং দেখিয়ে

দিয়েছে যে তারা তাদের রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্যে বদ্ধ পরিকর মনে হওয়া শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে হলোকাস্টের অপচ্ছায়া জেগে উঠেছিল। এবার আমিতাল ঘোষণা করলেন, পুরোনো যায়নবাদ ব্যর্থ। সেক্যুলার রাষ্ট্র ইহুদি সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। অ্যান্টি-সেমিটিজম এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রকট। 'ইসরায়েল রাষ্ট্র পৃথিবীতে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়ানো একমাত্র দেশ,' যুক্তি দেখান তিনি। ইহুদিদের 'স্বাভাবিকীকরণের' কোনও উপায় নেই, সেক্যুলার যায়নবাদীদের প্রত্যাশা মোতাবেক অন্যান্য জাতির মতো হতে পারবে না তারা। কিন্তু র‍্যাবাই য্ভি কুক প্রবর্তিত আরেক ধরনের যায়নবাদ ছিল, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নিষ্কৃতির প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যুদ্ধকে আরও একটি ইহুদি বিপর্যয় হিসাবে দেখার বদলে একে বরং পরিশুদ্ধিকরণের একটা প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা উচিত। যাদের যায়নবাদ শোচনীয়ভাবে অপর্যাপ্ত থাকায় জাতিকে প্রায় বিপর্যয়ের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়েছিল, সেই সেক্যুলার ইহুদিরা ইহুদিবাদকে আধুনিক পশ্চিমের অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তিবাদ ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করার প্রয়াস পেয়েছিল। এই বিদেশী প্রভাবকে অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করতে হবে।[৯৫]

সেই সময়ের মিশর ও ইরানে বিকাশমান মৌলবাদের সাথে অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ এক তত্ত্বের কথা বলছিলেন আমিতাল। ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধকে ঈশ্বর ইহুদিদের ফের নিজেদের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্যে সূতিক করে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। 'পাশ্চাত্য-আসক্ত' ইসরায়েলের প্রতি প্রকৃত মূল্যবোধে ফিরে আসার স্মারক ছিল এটা। সুতরাং, তা মেসিয়ানিক প্রক্রিয়ার একটা অংশ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ। কিন্তু স্রোত ফিরে গেছে। যুদ্ধ এটাও দেখিয়েছে যে, কেবল ইহুদিরাই বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করছে না। এই বাঁচা-মরার লড়াইয়ে, আমিতালের বিশ্বাস ছিল, জেন্টাইলরাও চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। ইহুদি রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ তাদের দেখিয়ে দিয়েছিল যে, ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন, স্যাটানের কোনও অবকাশ নেই, এবং ইসরায়েল অসাম্যের শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ইসরায়েল ভূমি জয় করেছে; এখন নিষ্কৃতির আগে কেবল ইহুদিদের আত্মা থেকে পশ্চিমা সেক্যুলার চেতনায় অবশেষটুকুও নিশ্চিহ্ন করা বাকি। তাদের অবশ্যই আবার ধর্মে ফিরে আসতে হবে। যুদ্ধ সেক্যুলারিজমের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। কুকবাদীরা এখন সংগঠিত হয়ে সংগ্রামে আরও বেশি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হতে প্রস্তুত—এই সংগ্রাম ইসরায়েলি সম্প্রসারণবাদে বাধা দিতে ইচ্ছুক পশ্চিমের বিরুদ্ধে, আরবদের বিরুদ্ধে এবং ইসরায়েলের উপর পশ্চিমের আরোপ করা সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে।

AMARBOI.COM

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীদের মাঝেও একই রকম প্রস্তুতি ছিল। ১৯৬০-র দশকের খোলামেলা তরুণ সংস্কৃতি, যৌন বিপ্লব এবং সমকামী, কৃষ্ণাঙ্গ ও নারীদের সমান অধিকারের প্রচারণা নিয়ে শোরগোল যেন সমাজের ভিত্তি ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল বলে মনে হয়েছে। অনেকেই বিশ্বাস করেছিল যে, এই ব্যাপক পরিবর্তন আর তার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের উন্মাতাল পরিবেশের কেবল একটা মানেই হতে পারে, পরমান্দ অত্যাসন্ন। বিপ্লবের পর থেকেই আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টবাদ দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, এবং প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মৌলবাদীরা সেক্যুলারিস্ট ও উদারপন্থী ক্রিশ্চানদের রীতিনীতি সমানভাবে প্রত্যাখ্যানকারী নিজস্ব পৃথক জগৎ তৈরি করছিল। নিজেদের বহিরাগত হিসাবে দেখলেও আসলে পুবের সাংস্কৃতিক সেক্যুলারিস্ট প্রতিষ্ঠানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশকারী এবং মৌলবাদীদের রক্ষণশীল ধর্মে স্বস্তি বোধকারী আমেরিকান জনগণের এক বিরাট অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছে তারা। আমেরিকার সমাজকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে তখনও তারা রাজনৈতিক দল গঠনের জন্যে সংগঠিত হয়নি, কিন্তু ১৯৭০-র দশকের শেষ নাগাদ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, এবং মৌলবাদীরা তাদের শক্তি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠছিল। ১৯৭৯ সালে, মৌলবাদীরা যে বছর তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছিল, জর্জ গালাপ-এর জাতীয় নির্বাচন দেখায় যে প্রতি তিনজন প্রাপ্ত বয়স্ক আমেরিকানের মধ্যে একজন ধর্মীয় ('নবজন্ম') অভিজ্ঞতা লাভ করেছে; প্রায় ৫০ শতাংশ বিশ্বাস করে যে, বাইবেল নির্ভুল, এবং ৮০ ভাগেরও বেশির বিশ্বাস জেসাস স্বর্গীয় ছিলেন। জরিপ এও প্রকাশ করে যে, মোট ১৩০০ ইভাঞ্জেলিকাল রেডিও টেলিভিশন স্টেশন রয়েছে যেগুলোর দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা প্রায় ১৩০ মিলিয়ন, এবং এদের আনুমানিক মুনাফার পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন ডলার থেকে কয়েক 'বিলিয়ন' ডলার পর্যন্ত। একজন নেতৃস্থানীয় মৌলবাদী প্যাট রবার্টসন ১৯৮০-র নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছিলেন: 'এই দেশ চালানোর মতো যথেষ্ট ভোট আছে আমাদের হাতে!'[৯৬]

১৯৬০ ও ১৯৭০-র দশকে এই নতুন বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের পেছনে তিনটি উপাদান কাজ করেছে। প্রথমত দক্ষিণের ঘটনাপ্রবাহ। এযাবত মৌলবাদ ছিল বড় বড় উত্তরাঞ্চলীয় শহরের অবদান। দক্ষিণ তখনও প্রধানত কৃষিভিত্তিক ছিল।

AMARBOI.COM

উদারপন্থী ক্রিশ্চানিটি চার্চে তেমন একটা সুবিধা করতে পারেনি, সুতরাং সেখানে 'মৌলবাদীদের' সোশ্যাল গস্পেলের ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু ১৯৬০-র দশকে আধুনিকায়িত হয়ে উঠতে শুরু করে দক্ষিণ। উত্তর থেকে বর্ধিত হারে লোকজন আসতে শুরু করেছিল। এই এলাকায় স্থাপিত তেল শিল্প ও প্রযুক্তি এবং মহাশূন্য প্রকল্পে কাজের সন্ধান করছিল তারা। দক্ষিণ এক ধরনের দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়নের অভিজ্ঞতা লাভ করতে শুরু করেছিল একশো বছর আগেই উত্তর যার অভিজ্ঞতা লাভ করে। ১৯৩০-র দশকে দুই তৃতীয়াংশ দক্ষিণী সেখানে বাস করত, ১৯৬০ সাল নাগাদ অর্ধেকের চেয়েও কম বাস করছিল। দক্ষিণ উচ্চতর জাতীয় গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করেছিল। ১৯৭৬ সালে জিমি কার্টার গৃহযুদ্ধের পর প্রথম দক্ষিণী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন; ১৯৮০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর রোনাল্ড রেগান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু দক্ষিণীরা তাদের নতুন প্রাধান্যকে স্বাগত জানালেও নিজেদের বিশ্বকে তারা সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে দেখে। উত্তরের অভিবাসীরা সাথে করে আধুনিক ও উদার ধারণা নিয়ে এসেছিল। আবার সবাই প্রটেস্ট্যান্ট বা ক্রিশ্চান ছিল না। এতদিন পর্যন্ত নিশ্চিত মানা মূল্যবোধ ও বিশ্বাস নিয়ে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। বিশেষ করে ব্যাপ্টিস্ট ও প্রেসবিটারিয়ান গোষ্ঠীতে রক্ষণশীল প্রটেস্ট্যান্টরা শতাব্দীর শুরুতে তাদের সধর্মীদের মতো সেই একই কারণে মৌলবাদী আন্দোলনের পক্ষে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল।[৯৭]

নিজেদের বসবাসের সমাজ থেকে উন্মুল ও বিচ্ছিন্ন মনে করা নতুন দক্ষিণের মানুষ এখন প্রায়শঃই দ্রুত বর্ধিষ্ণু শহরে গ্রামাঞ্চল থেকে আগত আগন্তুকে পরিণত হয়েছিল। গ্রামের বহু মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের কলেজে পাঠাচ্ছিল, ক্যাম্পাসে তারা তখন নব্য ধাঁচের উদারবাদের সাথে পরিচিত হচ্ছিল। সতীর্থ বহু ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস হারানো প্রত্যক্ষ করেছে তারা।[৯৮] ছেলেমেয়েদের আপাত ঈশ্বরহীন ধারণা গ্রহণ করতে দেখে বাবা-মারা ভীত হয়ে উঠছিলেন। চার্চে নবাগতদের উত্তর থেকে নিয়ে আসা আরও হতবুদ্ধিকর ধারণার দেখা পাচ্ছিলেন তারা। লোকে ক্রমবর্ধমান হারে মৌলবাদী চার্চের, বিশেষ করে বায়ুতরঙ্গের 'ইলেক্ট্রিক' চার্চের শরণাপন্ন হচ্ছিল। শক্তিশালী নতুন টেলিভেঞ্জালিস্টগণ এই সময়ে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। মৌলবাদে সম্ভাব্য দীক্ষালাভকারীরা ভার্জিনিয়া সৈকতে শুরু করে দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর বাস করত, প্যাট রাবার্টসন এখানে তাঁর ক্রিশ্চান ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক ও দারুণ জনপ্রিয় '৭০০ ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর এসেছে লিঞ্চবার্গ, ভার্জিনিয়া, এখানে ১৯৫৬ সালে জেরি ফলওয়েল তাঁর টেলিভিশন মিনিস্ট্রি শুরু করেছিলেন; উত্তর ক্যারোলিনার শার্লটে ছিল বর্ধিষ্ণু জিম ও ট্যামি ফেই বাক্কার এবং

'বাইবেল বেল্ট' শেষ হয়েছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রক্ষনশীলতার দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী এলাকা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়।[৯৯]

দ্বিতীয় যে উপাদানটি বহু ঐতিহ্যবাদীকে মৌলবাদীতে পরিণত করার পথে চালিত করেছিল সেটি হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্রুত প্রসার। বিপ্লবের পর থেকেই আমেরিকানরা কেন্দ্রিভূত সরকারের বেলায় অবিশ্বাসী ছিল, প্রায়শঃই সেক্যুলারিস্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা বোঝাতে ধর্মকে ব্যবহার করেছে তারা। মৌলবাদীরা জেফারসনের জারি করা রাজনীতি ও ধর্মকে বিচ্ছিন্ন রাখার 'বিচ্ছিন্নতার দেয়াল' বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার যুক্তিতে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সরকারী স্কুলে বাধ্যতামূলক প্রার্থনা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত ছিল। সেক্যুলারিস্ট বিচারপতিগণ উপসংহারে পৌছেছিলেন যে, কর থেকে আহরিত অর্থ সংশ্লিষ্ট না থাকলেও, এবং এমনকি প্রার্থনা স্বেচ্ছামূলক ও গোষ্ঠীবাদের উর্দ্ধে হলেও স্কুলে প্রার্থনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সরকারের পক্ষে অসাংবিধানিক। ১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৬২ সালে এই ধরনের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট সরকারী স্কুলে প্রথম সংশোধনীর ধর্মীয় ধারা উদ্ধৃত করে বাইবেল পাঠও নিষিদ্ধ করেন। ১৯৭০-র দশকে আদালত যেকোনও আইন (১) ধর্মকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে, (২) এর পরিণতিতে ইচ্ছা যাই হোক না কেন, ধর্মের প্রসার ঘটাতে চায় এবং সবশেষে (৩) সরকারকে তা ধর্মীয় বিষয়ে জড়াতে চাইলে তা বাতিল হয়ে যাবে ঘোষণা দিয়ে বেশ কয়েকটি রায় প্রদান করেন।[১০০] আদালত আমেরিকান সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান ঐহিকত্ববাদের প্রতি সাড়া দিচ্ছিলেন; ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ধর্মের বিরুদ্ধে এর কোনও বিরাগ নেই, কিন্তু জোরের সাথে একে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলেছেন।

এইসব সিদ্ধান্তে সেক্যুলারকরণ ছিল, কিন্তু এদের ধর্মকে প্রান্তিকায়িত করার নাসের বা শাহর প্রয়াসের সাথে তুলনা করা যাবে না। তাসত্ত্বেও মৌলবাদী ও ইভাঞ্জেলিকাল ক্রিশ্চানরা সমানভাবে তাদের চোখে ঈশ্বরহীন ক্রুসেডে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এভাবে ধর্মকে আইন সঙ্গতভাবে সীমানা দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যাবে বলে বিশ্বাস করেনি তারা, কারণ ক্রিশ্চানিটির দাবি ছিল সামগ্রিক ও সার্বভৌম হতে হবে। আদালত (প্রথম সংশোধনীতে দাবিকৃত) ধর্মবিশ্বাসের 'স্বাধীন প্রকাশের' নীতি এমনকি ক্রিশ্চান নয় এমন ধর্মের উপরও বিস্তৃত করতে চাইছেন দেখে আক্রান্ত বোধ করেছে, সকল ধর্মকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসার বিচারপতিদের নীতিগত প্রয়াসে ক্ষুব্ধ হয়েছে। এ যেন ধর্মকে মিথ্যা বলারই শামিল মনে হয়েছে। ব্যক্তি জীবনে আদালতের মাত্রাতিরিক্ত ও নজীরবিহীন হস্তক্ষেপ মনে হওয়া ঘটনার সাথে মেলানো হলে ধর্মকে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্তকে মৌলবাদীদের

কাছে আরও বেশি ভয়ানক ঠেকেছে। ইন্টারনাল রেভেনিউ সার্ভিস বিশেষ কতগুলো মৌলবাদী কলেজের নিয়মকানুন সরকারী নীতির বিরোধী যুক্তি দেখিয়ে দাতব্য কর অবকাশ সুবিধা প্রত্যাহারের হুমকি দিলে তাকে উদার নৈতিক সমাজের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার মতো মনে হয়েছে। কেবল মৌলবাদীদেরই বিশ্বাসের নীতিমালার 'স্বাধীন চর্চা'য় বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয়েছে। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে সুপ্রিম কোর্ট আফ্রো-আমেরিকানদের ভর্তি না করায় উত্তর ক্যারোলিনার গোল্ডবরো ক্রিশ্চান স্কুল এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী না হলেও বাইবেলে নিষিদ্ধ দাবি করে ক্যাম্পাসে আন্তবর্ণ ডেটিং বাতিল করার কারণে বব জোন্স ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে দেওয়া আইআরএস রুলিংয়ের প্রত্যয়ন করে।

এটা ছিল ১৯২৫ সালের স্কোপস ট্রায়ালের অনুরূপ দুটি ভিন্ন মূল্যবোধ ব্যবস্থার সংঘাত। দুই পক্ষই বিশ্বাস করছিল, তারাই চূড়ান্তভাবে সঠিক। গোটা জাতি সম্পূর্ণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ক্রমবর্ধমানহারে ১৯৬০ ও দশকের শেষে ও ১৯৭০-র দশকে রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার সংক্রান্ত ধারণা প্রসারিত করার সাথে সাথে আধুনিক সমাজের একেবারে প্রান্তে অবস্থানরত রক্ষণশীল ক্রিশ্চানরা এইসব হস্তক্ষেপকে সেক্যুলার আক্রমণ হিসাবে অনুভব করেছে। নিজেদের ম্যানহাটান, ওয়াশিংটন ও হার্ভার্ডের 'উপনিবেশ' ভাবতে শুরু করেছিল তারা। তাদের এই অভিজ্ঞতা বিদেশী শক্তির অধিকারে যাওয়ার ব্যাপারে তিক্তভাবে অসন্তোষ প্রকাশকারী মধ্যপ্রাচ্যীয় দেশগুলোর চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না। মনে হচ্ছিল সরকার যেন পরিবারের অন্দর মহলে হানা দিয়েছে: নারীদের সমান চাকরির অধিকার দিয়ে আনা সাংবিধানিক সংশোধনীকে 'নারীদের অবস্থান বাড়িতে' বাইবেলের এই আদেশের মুখে চপেটাঘাত বলে মনে হয়েছে। আইন করে শিশুদের উপর শারীরিক আঘাত সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যদিও বাইবেলে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, এভাবে সন্তানদের শৃঙ্খলা শেখানো বাবার দায়িত্বের ভেতর পড়ে। সমকামীদের সিভিল রাইটস ও বাক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল এবং অ্যাবর্শন বৈধ করা হয়েছিল। সান ফ্রান্সিস্কো, বস্টন, বা ইয়েলে উদারপন্থীদের চোখে যেসব সংস্কার ন্যায়সঙ্গত ও নৈতিক মনে হয়েছে সেগুলোই আরকান-স ও আলাবামার রক্ষণশীলদের কাছে পাপাচারপূর্ণ ঠেকেছে, যারা বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বর অনুপ্রাণিত বাণীকে অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে ব্যাখ্যা ও অনুসরণ করতে হবে। উদার সমাজে নিজেদের মুক্ত ভাবতে পারেনি তারা। তারা যখনই ভাবতে গেছে যে ১৯২০-র দশকে এই রাজ্যগুলোর দুই তৃতীয়াংশই মদপানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল কিন্তু এখন গোটা উত্তর আমেরিকা জুড়ে মানুষ মারিয়াহুনাকে বৈধতা দিতে

AMARBOI.COM

প্রচারণা চালাচ্ছে, তখন কেবল এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পেরেছে যে স্যাটানের প্রভাবে আক্রান্ত হচ্ছে আমেরিকা।[১০১]

এক নতুন ধরনের তাগিদ দেখা দিয়েছিল। লোকজন মনে করেছে যে সত্যিকারের ধর্ম ধ্বংসের পথে। ক্রিশ্চানরা পাল্টা যুদ্ধ না করলে হয়তো বিশ্বাসীদের আরেকটি প্রজন্ম নাও থাকতে পারে। ১৯৭০-র দশকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক বাবা-মা পাবলিক স্কুল থেকে তাদের ছেলেমেয়েদের ক্রিশ্চান প্রতিষ্ঠানে সরিয়ে নিয়েছেন, যেখানে তাদের ক্রিশ্চান মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া যাবে, তাদের সামনে ক্রিশ্চান রোল মডেল খাড়া করা যাবে ও যেখানে সকল শিক্ষাই বাইবেলিয় প্রেক্ষিতেই সম্পন্ন হয়। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৩ সালের ভেতর এইসব ইভাঞ্জেলিকাল স্কুলে ভর্তির সংখ্যা ছয়গুণ বেড়ে উঠেছিল আর প্রায় ১০০,০০০ মৌলবাদী শিশুকে বাড়িতেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[১০২] স্বাধীন ক্রিশ্চান স্কুল আন্দোলন সংগঠিত হতে শুরু করেছিল। এর আগে পর্যন্ত মৌলবাদী স্কুলগুলো বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন থাকলেও ১৯৭০-র দশকে এরা শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিবিধান পর্যালোচনা, ইনস্যুরেন্স প্যাকেজ সৃষ্টি, শিক্ষকদের নিয়োগ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ও ফেডারেল পর্যায়ে লবিং গ্রুপ হিসাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা গঠন শুরু করে। এগুলোর বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ১৯৯০-র দশক নাগাদ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অভ ক্রিশ্চান স্কুলস-এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩৬০, অন্যদিকে অ্যাসোসিয়েশন অভ ক্রিশ্চান স্কুল ইন্টারন্যাশনালের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯৩৯।[১০৩] আমাদের বিবেচিত আরও অন্যান্য স্কুল, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো 'হলিস্টিক' শিক্ষার জন্যে একটা আকাঙক্ষা কাজ করছিল যেখানে সমস্ত কিছু-দেশপ্রেম, ইতিহাস, নৈতিকতা, রাজনীতি ও অর্থনীতি—ক্রিশ্চান প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা যাবে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সাফল্য মনে করা হয়েছে (যদিও সাধারণভাবে এটা সরকারী পর্যায়ে শিক্ষার তুলনায় ভালোই ছিল)। এটা ছিল অঙ্গীকারাবদ্ধ ও প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্যুলারাইজেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত উগ্র ক্রিশ্চানদের তৈরি করার 'হটহাউস' পরিবেশ। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকার ক্রিশ্চান ইতিহাস পাঠ করেছে তারা, আব্রাহাম লিংকন ও জর্জ ওয়াশিংটনের মতো ব্যক্তিত্বদের ধর্মীয় পরিচয় পরখ করেছে, এবং কেবল সেইসব সাহিত্য ও দর্শনই পাঠ করেছে যেগুলো বাইবেলের সাথে 'যথেষ্ট' খাপ খায় ও বাইবেলিয় পারিবারিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়।[১০৪]

আমরা যেমন দেখেছি, কার্যকরভাবে সংগঠিত হওয়ার লক্ষ্যে কোনও একটি গ্রুপের স্পষ্টভাবে শত্রুকে সংজ্ঞায়িত করে এমন একটি আদর্শের প্রয়োজন। ১৯৬০ ও ১৯৭০-র দশকে প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদী আদর্শবাদীরা শত্রুকে 'সেক্যুলার

AMARBOI.COM

মানবতাবাদ' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। 'পাশ্চাত্যের' সেক্যুলার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ইসলামপন্থী ও কুকবাদীদের বিপরীতে আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টরা ভয়ঙ্কর রকম দেশপ্রেমিক ছিল, তাদের সামনে এমন সহজ কোনও লক্ষ্যবস্তু ছিল না। 'ঘরের শত্রুর' বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে। বছর পরিক্রমায় 'সেক্যুলার মানবতাবাদ' এক পিণ্ডারি শব্দে পরিণত হয়েছিল, মৌলবাদীরা তাদের অপছন্দের যেকোনও মূল্যবোধ বা বিশ্বাসকে এই তকমা এঁটে দিতে পারত। যেমন এখানে উদাহরণ হিসাবে 'প্রো-ফ্যামিলি ফোরামের' (এন.ডি.) দেওয়া মানবতাবাদের সংজ্ঞা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটা:

ঈশ্বরের প্রভুত্ব, বাইবেলের অনুপ্রেরণা ও জেসাস ক্রাইস্টের ঐশ্বরিকতা অস্বীকার করে।

আত্মার অস্তিত্ব, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, নিস্কৃতি এবং স্বর্গ ও নরকের শাস্তি অস্বীকার করে।

সৃষ্টির বাইবেলিয় বিবরণ অস্বীকার করে।

বিশ্বাস করে যে পরম, সঠিক, ভ্রান্তি বলে কিছু নেই নৈতিক মূল্যবোধ স্বনির্ধারিত এবং পরিস্থিতি নির্ভর। নিজের কাজ নিজে করো, 'যতক্ষণ না অন্যের ক্ষতি করছে।'

নারী-পুরুষের পৃথক ভূমিকার অপসারণে বিশ্বাস করে।

বয়স নির্বিশেষে সম্মত ব্যক্তিদের ভেতর প্রাক-বিবাহ যৌনতাসহ যৌন স্বাধীনতা, সমকামীতা, লেসবিয়ানিয়াজম ও অবৈধ সম্পর্কে বিশ্বাস করে।

গর্ভপাত, ইউথানাশিয়া ও আত্মহত্যায় বিশ্বাস করে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করতে আমেরিকার সম্পদের সম বণ্টনে বিশ্বাস করে।

পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ, শক্তি নিয়ন্ত্রণ ও এর সীমাবদ্ধতায় বিশ্বাস করে।

আমেরিকান দেশপ্রেম বিনাশ, স্বাধীন উদ্যোগ ব্যবস্থা, নিরস্ত্রীকরণ ও একক বিশ্ব ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক সরকার সৃষ্টিতে বিশ্বাস করে।[১০৫]

সম্ভবত সামান্য প্রভাব বিশিষ্ট সংগঠন আমেরিকান হিউম্যানিস্ট সোসায়েটি নামে এক সংগঠনের প্রথম ও দ্বিতীয় ইশতেহার থেকে নেওয়া হলেও এই তালিকাকে ষাটের দশকে বিকাশ ঘটা উদারবাদী মানসিকতার মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা হিসাবে ধরা যেতে পারে।

তবে অধিকাংশ মতাদর্শের ধারা অনুযায়ী অবশ্যই এটা ক্যারিকেচার ও উদারবাদের অতিরঞ্জিত সরলীকরণও ছিল। যৌন সাম্য বা সম্পদের সুষম বণ্টন-

AMARBOI.COM

আকাঙ্ক্ষী সকল উদারপন্থীই নাস্তিক ছিল না। সমকামীদের অধিকারে বিশ্বাসী উদারপন্থীরা কোনওদিনই অবৈধ সম্পর্কের অনুমোদন দেয়নি। কোনও উদারপন্থী 'সঠিক বা ভ্রান্তি বলে কিছু নেই' এমন কথা মানবে না; বরং অতীতের নৈতিক মানদণ্ডের কিছু পরিমার্জনার প্রয়োজন রয়েছে বলে বিশ্বাস করত তারা। অতীতের বৈরী জাতিগুলোর ইউরোপিয় ইউনিয়ন বা জাতি সংঘের মতো সংস্থার মাধ্যমে কাছাকাছি আসার আকাঙ্ক্ষা কোনওভাবেই 'একক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের' আকাঙ্ক্ষার কথা বোঝায়নি। তবে এই তালিকাটি অনেক উদার ক্রিশ্চান ও সেক্যুলারিস্ট সমানভাবে যেসব মূল্যবোধকে স্বপ্রকাশিতভাবে ভালো মনে করবে (যেমন দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি বা পরিবেশের জন্যে উদ্বেগ) সেগুলোকে মৌলবাদীদের চোখে দারুণভাবে অশুভ মনে হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরার ক্ষেত্রে উপকারী। এমন মনে হতে পারে যে এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেকটা ইরান ও ইসরায়েলের মতোই 'দুই জাতি' ছিল। আধুনিক সমাজ এমনভাবে মেরুকৃত হয়ে গিয়েছিল যে বিভিন্ন শিবিরে অবস্থানরত মানুষের পক্ষে পরস্পরকে বোঝাই কষ্টকর হয়ে পড়ছিল। উপসংস্কৃতি বড্ড বেশি বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হওয়ায় অনেকেই এমনকি সমস্যাটা *কোথায়* সেটাই হয়তো বুঝতে পারেনি।

কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা সেক্যুলার মানবতাবাদীদের এই সংজ্ঞাকে মোটেই ক্যারিকেচার ভাবেনি। সেক্যুলার মানবতাবাদকে নিজস্ব ক্রিড, নিজস্ব লক্ষ্য ও একটি সুনির্দিষ্ট সংগঠন বিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম মনে করেছে তারা। এই বিশ্বাসের পক্ষে সমর্থন হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের *তোরকাসো বনাম ওয়াটকিন্স* মামলার রায়ের পাদটীকার শরণ নিয়েছে তারা, যেখানে স্পষ্টভাবে 'সাধারণভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস বিবেচিত বিষয়ের শিক্ষা দেয় না' যেমন বুদ্ধধর্মমত, তাওবাদ, ও নৈতিক সংস্কৃতির মতো সেইসব বিশ্ব ধর্মের ভেতর 'সেক্যুলার মানবতাবাদকে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১০৬] মৌলবাদীরা পরে রক্ষণশীল প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের মতো সরকার ও আইন প্রণেতাদের অনুসৃত 'সেক্যুলার মানবতাবাদ'-এর মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে কঠোরভাবে জনগণের জীবন থেকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলার সময় একে কাজে লাগাবে।

অবশ্য সেক্যুলার মানবতাবাদ সম্পর্কে মৌলবাদী এই পূর্বধারণাকে ষড়যন্ত্র বা উদারনৈতিক প্রবণতাকে খাট করার লক্ষ্যে গৃহীত মেধাবী বিকৃতি মনে করা ভুল হবে। 'সেক্যুলার উদারবাদ' পরিভাষাটি এবং এর পক্ষের সমস্ত কিছুই মৌলবাদীদের ভয়াবহ ভীতিতে পূর্ণ করে তোলে। একে অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্র হিসাবে দেখে তারা, অন্যতম দ্রুতপ্রজ মৌলবাদী আদর্শবাদী টিম লাহাইয়ের ভাষায় যা 'ঈশ্বর বিরোধী, নৈতিকতা বিরোধী, আত্মসংযম বিরোধী ও আমেরিকা বিরোধী।'

সেক্যুলার মানবতাবাদ একটি ক্ষুদে ক্যাডারে পরিচালিত হয়, 'ক্রিশ্চানিটি ও আমেরিকান পরিবারকে ধ্বংস করার জন্যে'[১০৭] এরা সরকার, সরকারী স্কুল ও টেলিভিশন নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে। ৬০০ মানবতাবাদী সিনেটর, কংগ্রেসম্যান এবং কেবিনেট মন্ত্রী রয়েছেন, আছে প্রায় ২৭৫,০০০ আমেরিকান সিভিল রাইটস ইউনিয়ন। ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর উওম্যান, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, দ্য কার্নেগি, ফোর্ড এবং রকেফেলার ফাউন্ডেশনসমূহ ও সকল ইউনিভার্সিটি ও কলেজও 'মানবতাবাদী'। আইন প্রণেতাদের পঞ্চাশ ভাগ সেক্যুলার মানবতাবাদের ধর্মের প্রতি অঙ্গিকারাবদ্ধ।[১০৮] বাইবেল ভিত্তিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকা এখন সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, এই বিপর্যয়ের জন্যে জন হোয়াইটহেড (রক্ষণশীল রাদারফোর্ড ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্ট) প্রথম সংশোধনীর ব্যাপক ভ্রান্ত পাঠকে দায়ী করেছেন। হোয়াইটহেড বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে জেফারসনের 'বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর' প্রণীত হয়েছিল, উল্টোটি নয়।[১০৯] কিন্তু এখন মানবতাবাদী বিচারকগণ রাষ্ট্রকেই উপাসনার বস্তুতে পরিণত করেছেন। 'রাষ্ট্রকে সেক্যুলার হিসাবে দেখা হচ্ছে,' যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি, কিন্তু 'রাষ্ট্র ধার্মিক, কারণ এর "পরম লক্ষ্য" খোদ রাষ্ট্রের স্থায়ীকরণ।' সুতরাং সেক্যুলার মানবতাবাদ ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল, এবং এর রাষ্ট্রের উপাসনা বহুঈশ্বরবাদীতা।[১১০]

ষড়যন্ত্র কেবল আমেরিকার সমাজে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবেশ করেনি, বরং বিশ্বকেই দখল করে নিয়েছে। মৌলবাদী লেখক প্যাট রুকসের চোখে সেক্যুলার মানবতাবাদীরা '"এক নতুন বিশ্বব্যবস্থায়" এক বিশাল বিশ্ব সরকার গঠনের নিজ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলা "বিশাল ষড়যন্ত্রমূলক নেটওয়ার্ক" গড়ে তুলেছে, যা বিশ্বকে দাসত্বে পর্যবসিত করবে'[১১১] অন্য মৌলবাদীদের মতো সর্বত্রই দীর্ঘ সময় ধরে উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া শত্রুকে দেখতে পেয়েছেন রুকস্ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ওয়াল স্ট্রিট, যায়নবাদ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কর্মকাণ্ডে তিনি এর কাজ দেখেছেন। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এই চক্রে রথশচাইল্ডস, রকেফেলার, কিসিঙ্গার, ব্রেযনিস্কি, শাহ এবং সাবেক পানামিয় স্বৈরাচার ওমর তোরিজো অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।[১১২] সেক্যুলার মানবতাবাদের ত্রাস ছিল আমাদের আলোচিত অন্য বিকৃত ফ্যান্টাসির মতোই অযৌক্তিক ও সামাল দেওয়ার অতীত, এবং বিনাশের ভীতি থেকে এর উদ্ভব। আধুনিক সমাজ সম্পর্কে প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণভাবে ও বিশেষ করে আমেরিকায় ইসলামিস্টদের মতোই দানবীয়। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রাঙ্কি শেফারের চোখে পাশ্চাত্য পা বাড়াতে প্রস্তুত হয়েছে

> এক ইলেক্ট্রনিক অন্ধকার যুগে, যেখানে নতুন পৌত্তলিক বাহিনী তাদের হাতের সমস্ত প্রযুক্তিগত শক্তি নিয়ে সভ্য মানবতার শেষ শক্ত ঘাঁটিটি ধ্বংস করার দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়েছে। আমাদের সামনে পড়ে আছে অন্ধকারের এক দৃশ্যপট। আমরা ক্রিশ্চান পাশ্চাত্য লোকদের পেছনে ফেলে যাবার সময় সামনে কেবল এক অন্ধকার উত্তাল হতাশার সাগরই বিছিয়ে আছে...যদি আমরা যুদ্ধ না করি।[১১৩]

ইহুদি ও মুসলিম মৌলবাদীদের মতো আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টরাও তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে বলে ভেবেছে, বাঁচতে হলে যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই।

উদারপন্থী মুসলিমদের পক্ষে যেমন সায়ীদ কুতবের আধুনিক *জাহিলি* নগরী শনাক্ত করা কঠিন ছিল ঠিক তেমনি আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীদের ফুটিয়ে তোলা আমেরিকার ছবি মূলধারার উদারপন্থীদের চেয়ে ব্যাপকভাবে ভিন্ন ছিল। মৌলবাদীরা নিশ্চিত ছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঈশ্বরের আপন রাষ্ট্র, কিন্তু তারা অন্য আমেরিকানদের অত্যন্ত প্রিয় ও প্রশংসিত মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে বলে মনে হয়নি। আমেরিকান ইতিহাস সম্পর্কে লেখার সময় তারা প্রায় সকলেই নস্টালজিকভাবে পিউরিটান প্রিলগ্রিম ফাদারদের শরণাপন্ন হয়েছে, কিন্তু কেবল সেইসব গুণেরই তারিফ করেছে যেগুলো উদারপন্থীদের কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়। পিউরিটানরা নিউ ইংল্যান্ডে কী ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছিল? প্রশ্ন তুলেছেন প্লাইমাউথ রক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা রাস ওয়াল্টন। *'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র? জীবন গেলেও না!* আদি আমেরিকানরা নতুন বিশ্বে এমন কোনও ধারণাই সাথে করে আনেনি,' অনুমোদনের ভঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন তিনি।[১১৪] মুক্তির কথা ভাববার সময়ও ছিল না পিউরিটানদের, 'গির্জা ও রাষ্ট্রে' 'অন্যদের সঠিক পথে কাজ করতে বাধ্যকারী'[১১৫] 'সঠিক সরকার প্রতিষ্ঠা'র ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিল তারা। একইভাবে বিপ্লবকে 'গণতান্ত্রিক' মনে করা হয়নি। আমেরিকান ইহুদি ও মুসলিম প্রতিপক্ষের মতো একই কারণে প্রটেস্টট্যান্ট মৌলবাদীরা গণতন্ত্রকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। প্যাট রবার্টসনের মতে, আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের ফাউন্ডিং ফাদারগণ ছিলেন কালভিনিস্ট, বাইবেলিয় আদর্শে অনুপ্রাণিত। তার ফলেই আমেরিকান বিপ্লব ফরাসী বা রাশিয়ান বিপ্লবের পথ ধরা থেকে রক্ষা পেয়েছে। আমেরিকান বিপ্লবীরা গণমানুষের শাসনের কথা ভাবতেই যাননি, তাঁরা এমন এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন করবে ও সাম্যের প্রবণতা বাইবেলিয় আইনে নিয়ন্ত্রিত হবে।[১১৬] ফাউন্ডিং ফাদারগণ নিশ্চিতভাবেই

AMARBOI.COM

একটি 'সংখ্যাগরিষ্ঠ যা ইচ্ছে করতে পারবে, এমন খাঁটি, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাননি।'[১১৭] সরকার তার নিজস্ব আইন বাস্তবায়ন করছে, এমন ধারণায় মুসলিম মৌলবাদীদের মতোই সমান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তারা: সংবিধান '[ঈশ্বরের] আইনের চেয়ে উন্নতর আইন প্রণয়ন করার অধিকার রাখে না, কেবল মানুষের উপলব্ধি ও অনুসরণের যোগ্য মৌল বিধিবিধানই পরিচালনা করতে পারে।'[১১৮]

আমেরিকার অতীতের এই ভাবমূর্তি উদার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মৌলবাদী ইতিহাস ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতি-সংস্কৃতির ফল। সকলেই পতন ও আমেরিকান ধার্মিক সূচনা থেকে অবনতি প্রত্যক্ষ করেছিল: সুপ্রিম কোর্টের রুলিংস, সামাজিক উদ্ভাবন ও অ্যাবরশনের আইন 'মুক্তির' নামে সেক্যুলারাইজেশনকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু ১৯৭০-র দশকের শেষ নাগাদ মৌলবাদীরা বুঝতে শুরু করেছিল যে তাদেরও একই দোষ স্বীকার করে নিতে হবে।[১১৯] স্কোপস ট্রয়ালের পর পিছু হটে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে সেক্যুলার মানবতাবাদীদের ফাঁকা মাঠে দাবড়ে বেড়াতে দিয়েছে তারা। এখন নৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অঙ্গীকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তারা। ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে টিম ল্যাহাই কখনওই মৌলবাদীদের রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কথা বলেননি, কিন্তু দশকের শেষ নাগাদ তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, মানবতাবাদীরা কয়েক বছরের মধ্যেই 'আমেরিকাকে ধ্বংস' করে দেবে 'যদি না ক্রিশ্চানরা গত তিনটি দশকে যেমন ছিল তারা তারচেয়ে নৈতিকতা ও শোভনতার পক্ষে লড়াই করার জন্যে আরও নিশ্চিত হয়ে ওঠার ইচ্ছা করে।'[১২০]

মৌলবাদীদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা অন্যতম উপাদান ছিল তাদের প্রিমিলেনিয়লিজম: পৃথিবী যেহেতু অভিশপ্ত, একে সংস্কার করার কোনও অর্থ নেই। কিন্তু এখানেও একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। ১৯৭০ সালে হাল লিন্ডসে দারুণ সফল একটি বই বের করেন, যার নাম ছিল *দ্য লেট গ্রেট প্ল্যানেট আর্থ*, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এটি ২৮ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে। গতিশীল হাল নাগাদ ভাষায় পুরোনো প্রিমিলেনিয়াল ধারণাকে নতুন করে তুলে ধরেছে বইটি। অন্তিমকালে আমেরিকার কোনও বিশেষ ভূমিকা দেখতে পাননি লিন্ডসে, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, চলমান ঘটনাপ্রবাহে আসন্ন সমাপ্তির 'লক্ষণ' শনাক্ত করেই ক্রিশ্চানদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু ১৯৭০-র দশকের শেষের দিকে তিনি টিম লাহাইয়ের মতো মত পাল্টে ফেলেন। *দ্য নাইন্টিন এইটিজ, কাউন্টডাউন টু আর্মাগেদন*-এ তিনি যুক্তি দেখান, আমেরিকার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এলে গোটা সহস্রাব্দ জুড়েই সে বিশ্বশক্তি হিসাবে টিকে থাকতে পারবে। কিন্তু

AMARBOI.COM

> তার মানে আমাদের অবশ্যই সক্রিয়ভাবে নাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমাদের সক্রিয় হতে হবে, এমন সব কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করতে হবে যারা কেবল বাইবেলের নৈতিকতারই প্রতিফলন ঘটাবেন না, বরং আমাদের দেশ ও আমাদের জীবনধারাকে রক্ষা করার জন্যে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ নীতি নির্ধারণ করবেন।[121]

মৌলবাদীরা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ করার মতো প্রতিপক্ষ ছিল তাদের। আমেরিকার কেমন হওয়া উচিত তার উদারপন্থী ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ছবি এবং শত ভয় সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, ক্রুসেডে সফল হওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি তারা রাখে।

১৯৭০-র দশকের শেষের দিকে আমেরিকার প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা অনেক উঁচু প্রোফাইল ও বৃহত্তর আত্মবিশ্বাসের অধিকার লাভ করে। এটা ছিল ১৯৮০-র দশকে তাদের সংগঠিত হওয়ার তৃতীয় কারণ। তারা আর স্কোপস ট্রায়াল থেকে পালিয়ে বনে আশ্রয় নেওয়া দুর্বল বনবাসী ছিল না। সমাজকে সম্ভাব্য খোলামেলা করে তোলা প্রাচুর্য তাদেরও প্রভাবিত করেছিল। দক্ষিণের নব জাগরণ ও সেখানে মৌলবাদের উত্থান অনেকের মনেই এই ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে এখন তাদের পক্ষে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব। ১৯৬০-র দশকের দিক থেকেই উদারপন্থী মূলধারার গোষ্ঠীগুলোর সদস্য সংখ্যা কমে আসার কথা জানা ছিল তাদের, যেখানে ইভাঞ্জেলিকাল চার্চের সংখ্যা পাঁচ বছরে ৮ শতাংশ হারে বেড়েছে।[122] ক্রিশ্চান ধর্মকে মোড়কবদ্ধ করে বিপণনের বেলায় টেলিভেঞ্জালিজমও অনেক দক্ষ হয়ে উঠেছিল। জনগণের জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন ঈশ্বরকে যেন আবার নাটকীয় ও স্পষ্ট উপস্থিতি দিয়েছে বলে মনে হয়েছে। পর্দায় পেন্টাকোস্টালিস্ট যাজক ওরাল রবার্টসকে আপাতদৃষ্টিতে অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের সারিয়ে তুলতে দেখে ঐশী শক্তিকে সক্রিয় হতে দেখেছে তারা। সপ্তাহে ১০০,০০০ আত্মাকে রক্ষা করার দাবিকারী দারুণ শক্তিমান টেলিভেঞ্জালিস্ট জিমি সোয়াগার্টকে রোমান ক্যাথলিক, সমকামী ও সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ভাষায় মুখখিস্তি করতে দেখে কেউ একজন তাদের ভাবনাকেই প্রকাশ্যে ভাষা দিচ্ছে বলে মনে হয়েছে। প্যাট রবার্টসন বা বাক্কাররা প্রতি সপ্তাহের অনুষ্ঠানে চাঁদা হিসাবে অনেক টাকা সংগ্রহ করতে পারছেন জানতে পেরে মৌলবাদীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, ঈশ্বরই অর্থনীতির সমস্যার সমাধান। তারা জোরের সাথে বলেছেন যে, পেতে হলে ক্রিশ্চানদের অবশ্যই দান করতে হবে। ঈশ্বরের রাজ্যে, রবার্টসনের মতে, 'কোনও অর্থনৈতিক মন্দা নেই, নেই কোনও ঘাটতি।'[123] এটা এমন এক সত্যি দশটি ক্রিশ্চান টেলিভিশন

AMARBOI.COM

সাম্রাজ্যের সাফল্য যার সাক্ষ্য দিয়েছে বলে মনে হয়েছে, প্রতি বছর বিলিয়ন ডলার আয় করত এগুলো, হাজারের বেশি লোককে চাকরি দিয়েছে ও দারুণ পেশাদারি পণ্য হাজির করেছে।[১২৪]

তবে সময়ের মানুষটি ছিলেন জেরি ফলওয়েল। ধারণা করা হয়, ১৯৬০ ও ১৯৭০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি দশটি বাড়ির চারটিতেই তাঁর ভার্জিনিয়ার লিঞ্চবার্গের স্টেশনের অনুষ্ঠান শোনা হত। ১৯৫৬ সালে এক অব্যবহৃত সোডা কারখানায় অল্প কয়েকজন লোক নিয়ে নিজস্ব মিনিস্ট্রি শুরু করেন তিনি। তিন বছর পরে সমাবেশটি আদি আকারের তিনগুণ হয়ে ওঠে, এবং ১৯৮৮ সাল নাগাদ টমাস রোড ব্যাপ্টিস্ট চার্চের সদস্য ও অ্যাসোসিয়েট প্যাস্টরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৮,০০০ ও ষাটে। চার্চের বার্ষিক মোট আয় ষাট মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে, ৩৯২টি টেলিভিশন ও ৬০০টি রেডিও স্টেশনে সার্ভিস প্রচারিত হত।[১২৫] টিপিক্যাল মৌলবাদী জেরি ফলওয়েল একটি বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। লিঞ্চবার্গে বাইবেলিয় ধারায় পরিচালিত একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি; ১৯৭৬ সাল নাগাদ লিবার্টি ব্যাপ্টিস্ট কলেজের ছাত্র ছিল ১৫০০। দাতব্য প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছিলেন ফলওয়েল: মদ্যপদের জন্যে নিবাস, নার্সিং হোম ও গর্ভপাতের বিকল্প ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে দত্তক প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ সাল নাগাদ স্বয়ং ফলওয়েল নিজেকে নেতৃস্থানীয় নবজন্মপ্রাপ্ত ব্রডকাস্টার ভাবতে শুরু করেছিলেন।

সেক্যুলার মানবতাবাদকে পরাস্ত করার জন্যে বিকল্প সমাজ গড়ে তুলছিলেন ফলওয়েল। শুরু থেকেই লিবার্টি কলেজকে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে চেয়েছিলেন; এটা রোমান ক্যাথলিকদের নতর দাম বা মরমনদের ব্রিগহাম ইয়াং নয়। ১৯২০ সালে বব জোন্স নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই মৌলবাদ বদলে গিয়েছিল। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা যথেষ্ট ছিল না। অন্য মৌলবাদী শিক্ষকের মতো ফলওয়েল ভবিষ্যতের জন্যে একটি ক্যাডার সৃষ্টি করছিলেন, 'জীবনমুখী, নীতিবান ও আমেরিকরাপন্থী তরুণদের এক আধ্যাত্মিক সেনাদল।'[১২৬] বব জোন্স যেখানে ক্রিশ্চান স্কুলের জন্যে শিক্ষক সৃষ্টি করতে সেক্যুলার বিশ্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, ফলওয়েল সেক্যুলারিস্ট প্রতিষ্ঠান হাত করতে চেয়েছেন। লিবার্টি ছাত্রদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও পেশার জন্যে প্রশিক্ষিত করবে। তারা সমাজকে 'রক্ষা' করবে। কিন্তু তার মানে ছিল তাদের অবশ্যই মৌলবাদী রীতির কাছে সমর্পণ করতে হবে: ফ্যাকাল্টিকে অবশ্যই বিশ্বাসের বিধান মেনে নিতে হবে; সকল ছাত্রকে প্রতি সেমিস্টারে প্যারিশে 'ক্রিশ্চান সার্ভিস অ্যাসাইনমেন্টে' সম্পন্ন করতে হত; মদ বা ধূমপান করা যেত না; ছাত্রদের

AMARBOI.COM

বাধ্যতামূলকভাবে রোববারে সারাক্ষণ সেরা পোশাক পরে থাকতে হত আর সপ্তাহে তিনদিন টমাস রোডে সার্ভিসে যোগ দিতে হত। বব জোন্সের বিপরীতে ফলওয়েল একাডেমিক স্বীকৃতি চেয়েছিলেন এবং এভাবে ক্যাম্পাসের শালীনতা ও চমৎকার শিক্ষার পরিবেশের অনুমোদনদাতা অভিভাবকদের অমৌলবাদী ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছিলেন ফলওয়েল। লিবার্টি একদিকে ষাট ও সত্তর দশকের উদারপন্থী আর্ট কলেজের খোলামেলা পরিবেশের একটি বিকল্প যুগিয়েছে, অন্যদিকে অন্যান্য কিছু প্রাচীন মাঝারি মানের বাইবেলিয় কলেজের বিকল্প সৃষ্টি করেছে। মতবাদগত জোর সত্ত্বেও ক্যাম্পাস বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে গুরুতর বিষয়ে বিতর্কের জন্যে উন্মুক্ত ছিল। এটা ছাত্রদের সেক্যুলার জগতের সাথে এর শর্তেই মিলিত হতে সক্ষম করে তুলবে, এবং এর *রিকনকুয়েস্তা* সূচিত করবে।[১২৭]

আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করছিলেন ফলওয়ল। এবং আধুনিক কায়দায়। কলেজ, চার্চ ও রেডিও স্টেশনে তাঁর পরিশ্রমী দলটির দিশাহারা ও মৃতপ্রায় বিশ্বের কাছে পৌঁছানোর প্রয়াস ছিল। তাঁর স্টেশনে কোনও চমক বা বুনো অ্যান্টিক ছিল না; *ওল্ড টাইম গস্পেল আওয়ার* রবার্টস, সোয়াগার্ট ও বাক্কারদের বাড়াবাড়ি এড়িয়ে যেত। ধর্মতত্ত্বের মতো প্রচারণায়ও অক্ষরবাদী ফলওয়েল তাঁর সার্ভিসগুলোকে পরখ করতেন ও ঠিক যেভাবে প্রচারিত হচ্ছে সেভাবেই রেকর্ড করতেন, ক্যামেরা ও তাঁর জারিজুরির প্রতি দৃকপাত করতেন না। লিঙ্কবার্গ ছিল সংযম, পুঁজিবাদ ও কালভিনিয় নীতিকর্মের পক্ষে। গোটা সাম্রাজ্যকে নতুন শপিং মলের আদলে গড়ে তুলেছিলেন ফলওয়েল, যেখানে সমন্বিত সেবা পাওয়া যেত। তাঁর প্রধান ধর্মতাত্ত্বিক পরামর্শদাতা এলমার টাউন্স যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, ফলওয়েল বিশ্বাস করতেন, একই রকম উদ্যোক্তাসুলভ দক্ষতা দিয়ে আত্মার অধিকার লাভ করতে পারবেন তিনি। ব্যবসা, ফলওয়েল মনে করেছেন, উদ্ভাবনের আসল দিক এবং 'টমাস রোড ব্যাপ্টিস্ট চার্চ বিশ্বাস করত যে একটি চার্চে বিভিন্ন এজেন্সির সমন্বিত মিনিস্ট্রি কেবল বিপুল জনগণকে গস্পেলের দিকে আকৃষ্ট করবে না, বরং আগত প্রতিটি ব্যক্তিকে আরও ভালোভাবে সেবা দিতে পারবে।'[১২৮] ১৯৬০ ও১৯৭০-র দশকে টমাস রোড যেন পুঁজিবাদের ধার্মিক সম্ভাবনা প্রমাণ করেছে বলে মনে হয়েছে, একটি মিনিস্ট্রির সাথে আরেকটিকে সম্পর্কিত করেছে ও সম্প্রসারিত হয়েছে। সেক্যুলার ক্ষমতার কারবারীরা যখন ১৯৮০-র দশকের ডানপন্থী নবজাগরণে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত একজন ব্যক্তির খোঁজ করছিল, ফলওয়েলই যোগ্যতম লোক ছিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের গতিময়তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং এর সাথে সমান তালে পাল্লা দেওয়ার উপযুক্ত ছিলেন।

AMARBOI.COM

কিন্তু তারপরেও ফলওয়েলের আপাত কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে প্রতি সাড়া দানকারী মৌলাবাদীদের আশঙ্কায় ভরিয়ে তুলেছিল। সেক্যুলার মানবতাবাদী ষড়যন্ত্র বলে কিছুর অস্তিত্ব বোঝানোর আশায় ফলওয়েল, জাহাই বা রবার্টসনের সাথে তর্কে যাওয়া বৃথা। মুসলিম ও ইহুদি মৌলাবাদীদের মতো বিনাশ ও ধ্বংসের এই বৈকল্যময় ভীতি তাদের প্রচারণায় তাগিদ ও দৃঢ় বিশ্বাস যোগ করবে। আধুনিক সমাজ বস্তুগত ও নৈতিক দিক থেকে বিরাট অর্জনের অধিকারী হয়েছে। নিজের ন্যায়নিষ্ঠতায় বিশ্বাস রাখার কারণ ছিল এর। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততপক্ষে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা মুক্তিদায়ী ছিল। কিন্তু মৌলবাদীরা এটা বুঝতে পারেনি, সেটা তারা বিকৃত বলে নয়, বরং তার কারণ তারা আধুনিকতাকে তাদের পবিত্রতম মূল্যবোধকে হুমকীদানকারী ও তাদের খোদ অস্তিত্বকেই বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে মনে হওয়া আক্রমণ হিসাবে দেখেছে। ১৯৭০ দশক নাগাদ ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিম ঐতিহ্যবাদীরা পাল্টা লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হবে।

AMARBOI.COM

৯. আক্রমণ
(১৯৭৪—৭৯)

মৌলবাদী আক্রমণ বহু সেক্যুলারিস্টকে হতচকিত করে দিয়েছিল। তারা ধরে নিয়েছিল ধর্ম আর কোনও দিনই রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারবে না, কিন্তু ১৯৭০-র দশকের শেষের দিকে ধর্মবিশ্বাসের এক উগ্র বিস্ফোরণ ঘটে। ১৯৭৮-৭৯ সালে সারা বিশ্ব মহাবিস্ময়ের সাথে লক্ষ করে, এক অজ্ঞাত ইরানি আয়াতোল্লাহ মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে প্রগতিশীল ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত শাহ মুহাম্মদ রেযা পাহলভীর রাজত্বের পতন ঘটিয়েছেন। একই সময়ে বিভিন্ন সরকার যখন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের শান্তি প্রয়াস, ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন ও পাশ্চাত্যের প্রতি শান্তি প্রস্তাবের তারিফ করছিল, তখন পর্যবেক্ষকরা তরুণ মিশরিয়দের ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়া লক্ষ করেছিলেন। আধুনিকতার স্বাধীনতাকে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে ইসলামি পোশাক পরছিল তারা, অনেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস আগ্রাসীভাবে অধিকার করে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেরি ফলওয়েল ১৯৭৯ সালে প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীদের রাজনীতিতে অংশ নিয়ে 'সেক্যুলার মানবতাবাদী' এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে আসা রাষ্ট্র ও ফেডারেল আইনের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মরাল মেজরিটি প্রতিষ্ঠা করেন।[৮]

ধর্মের এই আকস্মিক বিস্ফোরণ সেক্যুলারিস্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে হতবুদ্ধিকর ও বিকৃত মনে হয়েছে। দারুণ কার্যকর প্রমাণিত আধুনিকতার অন্যতম আদর্শকে আলিঙ্গন করার বদলে এই রেডিক্যাল ঐতিহ্যবাদীরা বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ডিসকোর্সে অচেনা ঐশীগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে ও প্রাচীন বিধান ও নীতির উল্লেখ করেছে। ওদের প্রাথমিক সাফল্য ব্যাখ্যার অতীত মনে হয়েছে; আধুনিক রাষ্ট্রকে এই নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করা (নিশ্চিতভাবেই?) অসম্ভব ছিল? মৌলবাদীদের অতীতে অ্যাটাভিস্টিক প্রত্যাবর্তনকারী মনে হয়েছে। তাছাড়া, এইসব নীতিমালার অনুপ্রাণিত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সমর্থন ছিল রীতিমতো

AMARBOI.COM

আক্রমণের শামিল। যেসব আমেরিকান ও ইউরোপিয় ধর্মের দিন ফুরিয়ে গেছে ভেবেছিল, এবার তারা কেবল এটাই লক্ষ করতে বাধ্য হলো না যে প্রাচীন ধর্ম এখনও আবেগঘন আনুগত্যই অনুপ্রাণিত করছে না, বরং লক্ষ লক্ষ নিবেদিত ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিম তাদের এত গর্বের ধন সেক্যুলার, উদার সংস্কৃতিকে ঘৃণা করছে।

আসলে, আমরা যেমন দেখেছি, মৌলবাদী পুনর্জাগরণ আকস্মিক বা বিস্ময়কর কোনওটাই ছিল না। দশকের পর দশক বিভিন্ন কারণে অবহেলিত, নিপীড়িত এবং এমনকি সেক্যুলার সরকারের হাতে অত্যাচরিত অধিকতর রক্ষণশীল ধার্মিক লোকজন অসন্তোষে জ্বলছিল। অনেকেই নিজস্ব খাঁটি ধর্মের একটা পবিত্র সংরক্ষিত অঞ্চল নির্মাণের জন্যে আধুনিক সমাজ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। ওদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ সরকারের হাতে নিশ্চিহ্ন হওয়ার নিশ্চয়তা থেকে নিজেদের তারা যুদ্ধে লিপ্ত ও আত্মরক্ষায় নিয়োজিত হয়েছে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে বিশ্বাসীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ গড়ে তুলেছে। ধর্মের প্রতি নিস্পৃহ বা বৈরী বিভিন্ন সামাজিক শক্তিতে ঘেরাও হয়ে এক ধরনের অবরোধের মানসিকতা গড়ে তুলেছিল তারা যা অনায়াসেই আগ্রাসনের দিকে বাঁক নিতে পারে। ১৯৭০-র দশকের মাঝামাঝি সময় উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। ওদের শক্তি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছিল সবাই, বিশ্বাস করেছিল যে সংকট অত্যাসন্ন, ইতিহাসের এক অনন্য মুহূর্তের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তারা। পৃথিবী তাদের বদলে দেওয়ার আগেই উল্টে পৃথিবীটাকেই পাল্টে দিতে প্রস্তুত ছিল সবাই। তাদের চোখে ইতিহাস এক মারাত্মক বাঁক নিয়েছিল; সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। এখন এমন সমাজে বাস করছে তারা যেখানে ঈশ্বরকে হয় প্রান্তিকায়িত বা সম্পূর্ণ নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীকে ফের পবিত্র করে তুলতে তৈরি ছিল তারা। সেক্যুলারিস্টদের অবশ্যই মানুষকে সবকিছুর পরিমাপকে পরিণত করা গর্বিত স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিসর্জন দিতে হবে, এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেক্যুলারিস্ট পর্যবেক্ষকগণ এই ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না। বিভিন্ন সমাজ এতখানি মেরুকৃত হয়ে পড়েছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারপন্থীরা বা ইরানের মতো দেশগুলোর পাশ্চাত্যকৃত সেক্যুলারিস্টরা বছরের পর বছর বিকাশ লাভ করে চলা ধর্মীয় প্রতি-সংস্কৃতিকে খাট করে দেখতে প্ররোচিত হয়েছে। এই আগ্রসী ধার্মিকতাকে প্রাচীন বিশ্বের বিষয় ভেবে ভুল করেছে তারা; এগুলো ছিল ধর্মের আধুনিক ধরন, যেগুলো প্রায়শঃই শত শত বছরের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত দারুণভাবে উদ্ভাবনী ধরনের ছিল। তিনটি ধর্মের

AMARBOI.COM

সকল মৌলবাদী আধুনিকতা প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি একই সময়ে আধুনিক ধারণা ও উদ্দীপনায়ও প্রভাবিত হয়েছে। তবে অনেক কিছু শেখার ছিল তাদের। প্রথম দিকের আক্রমণগুলো মৌলবাদী কালের স্বর্ণ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু, পরের অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখব, আধুনিক রাজনীতির বহুত্ববাদী, যৌক্তিক ও বাস্তববাদী বিশ্বে যোগদানের পর ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত আন্দোলনের পক্ষে এর অখণ্ডতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবই আরেক স্বৈরাচারে পরিণত হতে পারে; একটি সমন্বিত, হলিস্টিক রাষ্ট্র অর্জন করার লক্ষ্যে আধুনিকতার বিচ্ছিন্নতাকে বাতিল করার জন্যে পরিচালিত লড়াই সামগ্রিকতাবাদী হয়ে দাঁড়াতে পারে; মৌলবাদীদের অতীন্দ্রিয়বাদী, মেসিয়ানিক বা পৌরাণিক দর্শনকে রাজনৈতিক *লোগোইতে* পরিণত করা বিপজ্জনক। কিন্তু প্রথমে মৌলবাদীরা মনে করে, তাদের সহ্য করে আসা বহু দশকের অপমান ও নিপীড়নের পর তারা সত্যিই আবার ঈশ্বরের পক্ষে পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছে।

ইরানি বিপ্লব ছিল মৌলবাদীদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রথম ঘটনা, তবে এটাই বিশ্ব রাজনীতিতে সফল উদ্যোগ পরিচালনাকারী প্রথম আন্দোলন ছিল না। আমরা দেখেছি, ১৯৭৩ সালের ইয়োম কিপ্পুরের যুদ্ধের পর কুকবাদীরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, ইহুদি জাতি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। যুদ্ধ ছিল একটা সতর্কবাণী; নিষ্কৃতি অত্যাসন্ন, কিন্তু সরকার মেসিয়ানিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার মতো কোনও নীতি অনুসরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকলে তাদেরই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কিছুটা বিস্ময়ের সাথেই সেক্যুলারিস্ট মিত্র পেয়ে যায় তারা, কুকের আদর্শে বিশ্বাস না করলেও যারা অধিকৃত এলাকা দখলে রাখার ব্যাপারে সমানভাবে নাছোড় ছিল। কুকবাদী বা ধার্মিক ইহুদি নয় এমন সব লোকজনও, যেমন সেনাবাহিনী প্রধান রাফায়েল এইতান বা পারমাণবিক বিজ্ঞানী ও উগ্রজাতীয়তাবাদী য়ুভাল নে'ইমান ইসরায়েলের পক্ষে অধিকৃত অঞ্চলসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধার্মিক যায়নিস্টদের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইডিএফ-এ কাজ করা ও ইসরায়েলের পক্ষে যুদ্ধ অংশ নেওয়া র‍্যাবাই, যুদ্ধবাদী তরুণ সেক্যুলারিস্ট, কুকবাদী ও অন্যান্য ধার্মিক যায়নবাদী গোষ্ঠী একটা গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে, যার নাম তারা রেখেছিল গাশ এমুনিম, 'বিশ্বাসীদের দল'।

এর অল্প পরেই নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি পজিশন পেপার উপস্থাপিত করে তারা। গাশ রাজনৈতিক দল হবে না, নেসেটে আসন লাভের জন্যে প্রতিযোগিতা করবে না তারা, বরং এটা হবে একটা প্রেশার গ্রুপ, 'যায়নবাদী লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইহুদি জাতির মাঝে মহাজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাবে, তাদের

উপলব্ধি ছিল এই দর্শনের উৎস ইসায়েলের ইহুদি ঐতিহ্যে, এবং ইসরায়েল ও গোটা বিশ্বের নিস্কৃতিই এর উদ্দেশ্য।[১] প্রথমদিকের যায়নবাদীরা যেখানে ধর্মকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, গাশ সেখানে তাদের আন্দোলনকে ইহুদিবাদে প্রোথিত করছিল। গাশের সেক্যুলার সদস্যরা যেখানে 'নিস্কৃতি' শব্দটিকে অধিকতর শিথিল, অনেক বেশি রাজনৈতিক অর্থে ব্যাখ্যা করতে পারত, র‍্যাবাই কুকের হলিস্টিক দর্শন মেনে নেওয়া ধার্মিক অ্যাক্টিভিস্টদের বিশ্বাস ছিল যে মেসিয়ানিক নিস্কৃতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, ইহুদি জাতি গোটা এরেতয ইসরায়েলে বসবাস না করা পর্যন্ত বাকি বিশ্বে শান্তির কোনও অবকাশ নেই।

শুরু থেকেই গাশ এমুনিম সেক্যুলার ইসরায়েলের প্রতি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছিল। পজিশন পেপারে প্রাচীন যায়নবাদের ব্যর্থতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ইহুদিরা তাদের ভূমি রক্ষার লক্ষ্যে এক ভয়ঙ্কর সংঘাতে জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও,

> আমরা পতন ও যায়নবাদী আদর্শ বাস্তবায়নের পথ থেকে কাজে ও কর্মে পশ্চাদপসরণের একটি প্রক্রিয়া লক্ষ করছি। এই সংকটের জন্যে চারটি সম্পর্কিত উপাদান দায়ী: প্রলম্বিত সংঘাতের ফলে সৃষ্ট মানসিক ক্লান্তি ও হতাশা; চ্যালেঞ্জের অভাব; স্বার্থপর উদ্দেশ্যের প্রতি অগ্রাধিকার ও ইহুদি বিশ্বাসের ক্ষয়।[২]

শেষের কারণটিই-ধর্মের দুর্বলতা-গাশের ধার্মিক সদস্যদের চোখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইহুদিবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন যায়নবাদের কোনও অর্থ থাকতে পারে না বলে বিশ্বাস ছিল তাদের। একই সময়ে কুকবাদীরা আরবদের কাছ থেকে দখলিকৃত এলাকা জয় করে নিতে চেয়েছিল, সেক্যুলার ইসরায়েলের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তারা। বাইবেলেরই ভাষায় তারা প্রাচীন সমাজতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স প্রতিস্থাপনও করতে চেয়েছিল। শ্রমিক যায়নবাদীরা যেখানে ইহুদি জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিক ও ইহুদিদের 'অন্যসব জাতির মতো' করতে চেয়েছে, গাশ এমুনিম ইসরায়েল জাতির 'অনন্যতার' উপর জোর দিয়েছে;[৩] ইহুদিদের যেহেতু ঈশ্বর মনোনীত করেছেন, সুতরাং তারা অন্য জাতি থেকে আবিশ্যিকভাবেই ভিন্ন, একই নিয়মের অধীন নয়। বাইবেল এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে 'পবিত্র' জাতি হিসাবে ইসরায়েলকে এর নিজস্ব ধরনে আলাদা করা হয়েছে।[৪] শ্রমিক যায়নবাদ যেখানে আধুনিক পশ্চিমের উদার মানবতাবাদকে আত্মস্থ করতে চেয়েছে, গাশ এমুনিম সেখানে বিশ্বাস করেছে ইহুদিবাদ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পরস্পর বিরোধী। সুতরাং, কুকবাদীদের ক্ষেত্রে সেক্যুলার যায়নবাদের সফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল

AMARBOI.COM

না।[৫] তাদের কাজ ছিল ধর্মের পক্ষে যায়নবাদকে অধিকার করে নেওয়া, অতীতের ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে সংশোধন করা ও ইতিহাসকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা।

ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধের প্রায় বিপর্যয় দেখিয়ে দিয়েছে যে সেক্যুলার যায়নবাদের 'মিথ্যা' নীতিমালায় রুদ্ধ হয়ে যাওয়া নিস্তার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্যে অবিলম্বে কাজ শুরু করা জরুরি। সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত হতে গাশ এমুনিমের এক বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সদস্যদের তা এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার যোগান দিতে সক্ষম হয়। গাশ কায়দার পোশাক, সঙ্গীত, সজ্জা, গ্রন্থ ও বাচ্চাদের নামের পছন্দ, এমনকি কথা বলার বিশেষ ধরনের কায়দা থাকবে।[৬] বছর পরিক্রমায় গাশ সদস্যদের সময় পরীক্ষিত মৌলবাদী কৌশলে সেক্যুলার ইসরায়েল থেকে প্রত্যাহৃত হতে সক্ষম করে তোলা একটি প্রতি-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। অবশ্য গাশের ধার্মিক সদস্যদের ধার্মিকতা ও তোরাহ পালন জাহির করার কায়দায় কিছুটা আগ্রাসন ছিল। রাষ্ট্রের প্রথম দিকের বছরগুলোয় সেক্যুলার ইসরায়েলিরা প্রথাগত কিপ্তি টুপি মাথায় দেওয়া ইহুদিদের নিয়ে পরিহাস করত; এখন এইসব ধার্মিক অ্যাক্টিভিস্টরা রেডিক্যাল ধর্মীয় শৈলীতে পরিণত হওয়া হাতে বোনা *কিপা* পরতে শুরু করেছিল।[৭] গাশের ক্যাডাররা নিজেদের শ্রমিকবাদীদের তুলনায় ঢের বেশি ইহুদি ও যায়নবাদী মনে করেছে, নিজেদের তারা প্রাচীন কালের পবিত্র যোদ্ধা জোশুয়া, ডেভিড ও ম্যাকাবিদের সাথেই নয় বরং একই ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনের অন্তর্ভুক্ত এবং নিজেদের কাছে উন্মাদ বিবেচিত থিওদর হার্যেল, বেন গুরিয়নের মতো যায়নবাদী নায়ক ও গোড়ার দিকের অগ্রগামীদের সাথেও সম্পর্কিত করেছে।

গাশের সেক্যুলার ও ধার্মিক সদস্যরা তাদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ই কুকবাদীদের একটা দল প্রবীন বসতি স্থাপনকারী মোশে লেভিংগারের সহায়তায় পশ্চিম তীরের আরব শহর নাবলুসের এক রেলওয়ে ডিপোয় একটি *গারিন* (ক্ষুদ্র বসতির জন্যে একটি 'বীজ' বা নিউক্লিয়াস) স্থাপনের প্রয়াস পায়। ইহুদিদের জন্যে পবিত্র এলাকা ছিল এটা: নাবলুস জ্যাকব ও জোশুয়ার সাথে সম্পর্কিত বাইবেলিয় শহর শেচেমের স্থান দখল করে আছে। বসতি স্থাপনকারীরা তাদের দৃষ্টিতে প্যালেস্তাইনিদের হাতে অপবিত্র ভূমিকে আবার পবিত্র করার প্রয়াস পাচ্ছিল। এই বসতির নাম দিয়েছিল তারা এলোন মোরেহ, শহরের অন্যান্য বাইবেলিয় নামের একটা, এবং রেলওয়ে ডিপোটিকে পবিত্র টেক্সট পাঠের লক্ষ্যে *ইয়েশিভা* হিসাবে চালানোর চেষ্টা করেছে। গাশ এমুনিমে যোগ দিতেও রাজি হয় তারা। *গারিন* অবৈধ বলে সরকার বসতি উচ্ছেদের চেষ্টা করে, কিন্তু ইহুদিরা অন্য লোকদের আইন পালন করতে বাধ্য নয় বলে অধিকৃত এলাকা থেকে

AMARBOI.COM

ইসরায়েলের প্রত্যাহারের দাবি করে দেওয়া জাতি সংঘের ঘোষণা মেনে নেওয়ার কোনও প্রয়োজনই বোধ করেনি গাশ। ইসরায়েলে উল্লেখযোগ্য সমর্থন লাভ করে বসতি স্থাপনকারীরা, অন্যদিকে সরকারকে অক্ষম ও দ্বিধান্বিত দেখায়। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে মোশে লেভিংগার পশ্চিম তীরে বিশ হাজার ইহুদির মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এলোন মোরেহর নিজের তাঁবু থেকে, নিজের 'ওয়ার সিচুয়েশন রুম' বলতেন তিনি ওটাকে, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শিমন পেরেসের সাথে দরকষাকষি করেন। আইডিএফ সৈনিকদের সাথে একটা সংঘর্ষ ঘটে: কোনওরকম গুলি বর্ষিত হয়নি, তবে পাথর ছোঁড়া হয়েছে, বন্দুকের বাট ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হেলিকপ্টারে চেপে হাজির হন পেরেস, তাঁবুতে লেভিংগারের সাথে আলাপ করেন, এই সভার পর ঝড়ের বেগে বের হয়ে আসেন র‍্যাবাই, শোকের প্রথাগত ভঙ্গিতে পরনের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেন। নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় ধর্মীয় ভোট খোয়ানোর ভয় থেকে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নেন পেরেস। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কাছের এক সেনা শিবিরে এলোন মোরেহ বসতি স্থাপনকারীদের তিরিশ জনকে স্থান দিতে সম্মত হন তিনি। লেভিংগারকে কাঁধে নিয়ে উল্লাসমুখর তরুণরা মিছিল করে।[৮] কৃশ, টোকো, ঝুলন্ত দাড়ি, পুরু চশমা ও স্থায়ীভাবে কাঁধে বন্দুক ঝোলানো ভদ্রলোক লেভিংগার এক নতুন ধরনের ইহুদি বীরে পরিণত হন। অনেকের চোখেই বসতি স্থাপনকারী তোরাহ বিশেষজ্ঞ যাদ্দিক ও হাসিদের পাশে স্থান করে নিজেই যাচ্ছিলেন তিনি। সেক্যুলারিস্টদেরও সমর্থন লাভ করেন তিনি। 'লেভিংগার যায়নবাদের প্রত্যাবর্তনকে প্রতীকায়িত করেছেন,' বলেছে প্রবীন ও আত্মস্বীকৃত সন্ত্রাসী গেউলা কোহেন। 'জুদাহ আর সামারায় [পশ্চিম তীরের বাইবেলীয় নাম] মোমের শিখার মতো দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তিনিই যায়নবাদী বিপ্লবের নেতা।'[৯]

শেষ পর্যন্ত ১৬৪ বিসিইতে সেলুসিয়দের হাত থেকে ম্যাকাবিদের জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের বার্ষিকী ও মন্দিরের পুনঃনিবেদন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হানুক্কাহর উৎসবের সময় এলোন মোরেহ, এখন তার নতুন নাম কেদামিন, প্রতিষ্ঠিত হয়। গাশ এমুনিমের মিথলজিতে *গারিন* পরিণত হয় নতুন হানুক্কাহয়, এক ঐশী সাফল্য, ঈশ্বরের বিজয়। এক গঠনমূলক মুহূর্ত ছিল এটা: স্রোত ঘুরে গেছে বলে মনে হয়েছে; সেক্যুলার যায়নবাদ ঐশী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাসকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছেন লেভিংগার।

১৯৭৭-৭৮ সাল দুটি ছিল গাশ এমুনিমের স্বর্ণযুগ। সদস্যরা দেশময় ঘুরে বেড়িয়েছে, বক্তৃতা দিয়েছে, ওই অঞ্চলের বসতি করতে ইচ্ছুক সেক্যুলারিস্ট ও ধার্মিক দুরকম তরুণদেরই দলে টেনেছে। সারা দেশে গাশের শাখা খোলা হয়।

AMARBOI.COM

গোটা পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে ক্যাডাররা একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে: লক্ষ্য ছিল হাজার হাজার ইহুদিকে এলাকায় আনা ও সব কৌশলগত পাহাড়ী ঘাঁটিতে উপনিবেশ তৈরি। এলাকার ভৌগলিক অবস্থান, জনমিতি ও বসতি স্থাপন বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা হয়। পরিকল্পনা ও প্রচারণার জন্যে প্রশাসনিক সংস্থা স্থাপন করা হয়। এরই একটা ছিল বসতি প্রক্রিয়া সংগঠনের দায়িত্বে নিয়োজিত মেতে মিরতযাই।[১০] প্রায়শঃই লেভিংগারের নেতৃত্বে স্কোয়ার্টাররা তাদের পুরোনো লক্করমার্কা ট্রেইলার নিয়ে রাতের অন্ধকারে জনশূন্য পশ্চিম তীরের কোনও পাহাড়চূড়ায় হাজির হত। সেনাবাহিনী তাদের উচ্ছেদ করতে হাজির হলে নেসেটে ডানপন্থী দলগুলো শ্রমিক দলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে ঠিক ব্রিটিশদের মতো আচরণের অভিযোগ তুলে বসত। চতুর কৌশল ছিল এটা। ইসরায়েলি সরকারকেই এবার নিপীড়কের ভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছিল, গাশ বসতি স্থাপনকারীরাই যেন ইসরায়েলের বীরত্বব্যাঞ্জক অতীতকে ধারণ করেছিল।

অবশ্য, এই বছরগুলোতে গাশ মাত্র তিনটি বসতি স্থাপন করতে পেরেছিল। প্রধানমন্ত্রী ইতযহাক রাবিন যুদ্ধোত্তর এই সময়ে মিশর ও সিরিয়ার সাথে বোঝাপড়ায় উদগ্রীব ছিলেন, ছোটখাট আঞ্চলিক ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। গাশ ও ডানপন্থীদের অব্যাহত চাপ প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রপাগান্ডা প্রয়াস অব্যাহত রাখে গাশ, গোটা পশ্চিম তীর জুড়ে বিশাল সব মিছিল ও পদযাত্রার আয়োজন করে। ১৯৭৫ সালে জনতা তোরাহ স্ক্রোল হাতে অধিকৃত এলাকায় গান গেয়ে, নেচে, হাত তালি দিয়ে মিছিল করে; সেক্যুলারিস্টদের সাথে যোগ দেয় ধার্মিক যায়নবাদীরা। ১৯৭৬ সালের স্বাধীনতা দিবসে প্রায় বিশ হাজার সশস্ত্র ইহুদি পশ্চিম তীরে এক বনভোজনে যোগ দেয়, সামারিয়ার এক অংশ থেকে আরেক অংশে মিছিল করে।[১১] প্রায়শঃই এমনভাবে এইসব জঙ্গী গণমিছিল ও বিক্ষোভগুলো আয়োজন করা হত যেন কোনও নতুন বসতি স্থাপন বা আরেকটি অবৈধ স্কেয়াটের সাথে মিলে যায়। এইসব কর্মকাণ্ড কোনও কোনও ইসরায়েলির মনে এই ধারণা জাগিয়ে দিয়েছিল যে, এইসব এলাকা আবিশ্যিকভাবেই ইহুদিদের, অধিকৃত এলাকায় বস্তি স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রচলিত সংস্কার ভেঙে ফেলতে সাহায্য করেছে।

গাশ ছিল বাস্তববাদী, চতুর ও বুদ্ধিমান। নাস্তিক ও সেকুলারিস্টদের প্রতি আবেদন সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এর অর্থডক্স সদস্যদের জন্যে আবিশ্যিকভাবেই ধর্মীয় আন্দোলন ছিল এটা। র‍্যাবাই কুক হতে কাব্বালিস্টিক ধার্মিকতা লাভ করেছিল তারা। গাশের বিশ্বাস মতে ইহুদি ভূমিতে বসতি স্থাপন ছিল পবিত্রের আওতা বৃদ্ধি ও 'অন্যপক্ষে'র সীমান্তকে দূরে ঠেলে দেওয়া। একটি বসতি ছিল ক্রিশ্চানদের ভাষায় অন্তদীক্ষার মতো, অপবিত্র পৃথিবীতে নতুন ও আরও কার্যকরভাবে স্বর্গীয়কে

AMARBOI.COM

উপস্থিতকারী সুপ্ত করুণার প্রতীক। ইসাক লুরিয়া যাকে বলেছেন *তিক্কুন*, পুনঃস্থাপনের একটি প্রক্রিয়া একদিন যা বিশ্ব ও মহাবিশ্বকে বদলে দেবে। গণমিছিল, মিছিল, সেনাবহিনীর সাথে যুদ্ধ ও অবৈধ বসতি স্থাপন ছিল পরমানন্দ ও মুক্তির বোধ নিয়ে আসা এক ধরনের আচার। সেক্যুলার অগ্রগামী ও পণ্ডিতসুলভ হেরেদিমদের কাছে বহু বছরের হীনবোধের পর কুকবাদীরা সহসা নিজেদের সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে চলে এসে বলে মনে করেছে, এক মহাজাগতিক সংঘাতের সামনের কাতারে স্থান করে নিয়েছে। নিষ্কৃতির আগমন ত্বরান্বিত করে মহাবিশ্বের মৌল ছন্দের সাথে একাত্ম মনে করেছে নিজেদের। পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন, প্রার্থনার সময় সামনে-পেছনে দোল খেত তারা, শক্ত করে চোখ বুজে বিকৃত ও বেদনার্ত চেহারায় চিৎকার করে কাঁদত। এসবই কাব্বালিস্টের ভাষায় *কাওয়ানাহ*'রই চিহ্ন, বিশেষ কোনও নির্দেশনা পালনের সময় ইহুদিদের প্রতীকী ধরন ভেদ করে আচারের আবিশ্যিক তাৎপর্য অবলোকনে সক্ষম করে তোলা নিবিড় মনোসংযোগের প্রয়াস।[১২] *কাওয়ানাহ*র সাথে পরিচালিত কোনও কাজ উপাসককে কেবল ঈশ্বরের কাছাকাছিই নিয়ে যায় না, সেই সাথে স্বর্গ ও পার্থিব জগৎকে বিচ্ছিন্নকারী ভারসাম্যহীনতা সংশোধনেও সাহায্য করে। প্রার্থনার সময় গাশ অ্যাক্টিভিস্টরা কেবল এই পরমানন্দই অনুভব করেনি; রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও তারা একইভাবে দেখেছে। নতুন বসতি স্থাপনের অনুষ্ঠানে র‍্যাবাই কুকের বয়ান ও কান্নার দৃশ্য ছিল 'প্রত্যাদেশ'। ঠিক একইভাবে রামাল্লার কাছের পাহাড় থেকে সেনাবহিনী তাদের বিতাড়নের চেষ্টা করার সময় আর্তনাদ ছেড়ে প্রার্থনার চাদরে স্কোয়ার্টারদের নিজেদের ঢেকে পবিত্র ভূমি রক্তাক্ত নখে আঁকড়ে থাকার দৃশ্যও তাই।[১৩] স্রেফ রাজনৈতিক মুহূর্ত ছিল না এগুলো। অ্যাক্টিভিস্টরা এইসব ঘটনাপ্রবাহের পার্থিব খোলস ভেদ করে বাস্তবতার উৎসমূলের স্বর্গীয় বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করার কথা বিশ্বাস করেছে।

এভাবে রাজনীতি পরিণত হয়েছিল উপাসনার *(আভোদ)* একটা কায়দায়। সিনাগগের উপাসনায় যোগ দেওয়ার আগে ইহুদি *মিকভেহ*-তে স্নান করে। ঠিক একইভাবে গাশ র‍্যাবাইরা ঘোষণা করেছিলেন: 'যেন তা তোরাহর গোপন বিষয় অনুসন্ধানের মতো হওয়ায় রাজনীতির আবর্জনায় ডুব দেওয়ার আগে নিজেদের *মিকভেহ*-তে পবিত্র করে নিতে হবে।'[১৪] উন্মোচক মন্তব্য ছিল এটা, কারণ তা গাশ ধার্মিকতার কেন্দ্রে দ্ব্যার্থবোধকতা প্রকাশ করেছে। রাজনীতি তোরাহর মতোই পবিত্র, কিন্তু—বহুদিন আগে প্রবীন কুক যেমন যুক্তি দেখিয়ে গেছেন—এটা আবর্জনাও। ১৯৬৭ সাল থেকে কুকবাদীরা প্রায়শঃই ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের ধাক্কাকে প্রবীন কুকের প্রিয় ইমেজ, 'আলোর বিস্ফোরণ' হিসাবে অনুভব করে

এসেছে, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যর্থতা, বিপর্যয় ও প্রতিবন্ধকতার অন্ধকারের ব্যাপারেও প্রবলভাবে সচেতন ছিল তারা। ইসরায়েলি বিজয়গুলোকে অলৌকিক ঘটনা বলে তারিফ করা হলেও সেগুলোকে আবার আধুনিক প্রযুক্তি ও সামরিক দক্ষতার হাতে আবির্ভূত বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

সুতরাং কুকবাদীরা আসলে সমানভাবে জাগতিক ও পবিত্রের ব্যাপারে সজাগ ছিল। ঈশ্বরের জন্যে তাদের আকাঙ্ক্ষা পার্থিব বাস্তবতার অস্বচ্ছতা ও অবাধ্য আপোসহীনতা দিয়ে ভারসাম্য পেয়েছিল। একারণেই তাদের প্রার্থনা ও অ্যাক্টিভিজমের বাড়াবাড়ি ও যন্ত্রণা। জীবনের সামগ্রিকতাকে–এমনকি একেবারে অশুচি, গতানুগতিক ও বিকৃত অংশগুলোও–পবিত্রের আচ্ছাদনের নিচে নিয়ে আসাই ছিল তাদের মিশন। কিন্তু হাসিদিমরা যেখানে একাজে আনন্দ ও নতুন হালকা ভাব বোধ করেছে, গাশের পরমানন্দ প্রায়শঃই ক্রোধ ও অসন্তোষে পরিপূর্ণ ছিল। আধুনিক কালের নারী-পুরুষ ছিল তারা। ঈশ্বর ছিলেন আগের চেয়ে ঢের দূরে, লৌকিকতার চাপ সৃষ্টিকারী ও নাছোড় বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যাওয়া ঢের বেশি কষ্টকর ছিল, এখন অনেকেই যাকে সবকিছু মনে করে। গাশ অ্যাক্টিভিস্টরা সেক্যুলার ইসরায়েল রাষ্ট্রে আরবদের কাছ থেকে ভূমি কেড়ে নেওয়ার প্রয়াসে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতাকে জয় করেছিল। ইসরায়েলের সীমান্ত অতিক্রম করে বহুদিন আগে খোয়ানো ভূমিতে উপনিবেশ গড়ে নিজেদের উন্মূল করে মন স্থির করেছে তারা। এরেতয ইসরায়েলে 'প্রত্যাবর্তন' বিভ্রান্তিকর বর্তমানের চেয়ে ঢের বেশি মৌলিক মূল্যবোধ ও মনের অবস্থা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস ছিল।

ক্ষোভ ও *রিকনকুয়েস্তা*র এই আধ্যাত্মিকতায় স্পষ্ট সমস্যা ছিল। ১৯৭৭ সালে ইসরায়েলের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো শ্রমিক দল সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়। ক্ষমতায় আসে মেনাচেম বেগিনের নেতৃত্বাধীন নতুন ডানপন্থী লিকুদ পার্টি। বেগিন বরাবরই জর্দান নদীর উভয় তীরে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলে এসেছেন, তো তাঁর নির্বাচিত হওয়াকে প্রথমে ঈশ্বরের আরেকটি কাজ মনে হয়েছিল। নির্বাচনের অল্পপরেই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটা, বেগিন অশীতিপর র‍্যাবাই কুকের সাথে মারকায হারাভে দেখা করতে গেলে তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নোয়ান তিনি। 'মনে হচ্ছিল বুঝি শরীরের ভেতর আমার হৃৎপিণ্ড বিস্ফোরিত হচ্ছে,' পরে স্মৃতিচারণ করেছেন এই 'পরাবাস্তব দৃশ্যে' উপস্থিত দানিয়েল বেন সিমন। '[কুকের] ফ্যান্টাসি ও কল্পনাগুলো আসলেই বাস্তব হওয়ার এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে।'[১৫] লেভিংগারের খোলামেলা ভক্ত ছিলেন বেগিন, গাশ এমুনিমকে 'প্রিয় সন্তান' বলতে ভালোবাসতেন, তাঁর যুদ্ধবাদী নীতি প্রচার করার সময় প্রায়শঃই বাইবেলিয় পরিভাষা ব্যবহার করতেন।

AMARBOI.COM

নির্বাচনের পর লিকুদ সরকার অধিকৃত এলাকাসমূহে এক ব্যাপক বসতি উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইসরায়েলের ভূমি কমিশনের নতুন প্রধান আরিয়েল শ্যারন বিশ বছরের মধ্যে পশ্চিম তীরে এক মিলিয়ন ইহুদির বসতি স্থাপনের ইচ্ছা ঘোষণা করেন। ১৯৮১ সালের মাঝামাঝি লিকুদ এইসব এলাকায় ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে বিশটি বসতি গড়ে তোলে, যেখানে প্রায় ১৮,৫০০ বসতি স্থাপনকারী বাস করে। ১৯৮৪ সালের আগস্ট নাগাদ সরকারীভাবে বসতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১১৩টি, এগুলোর ভেতর গোটা পশ্চিম তীর জুড়ে ছয়টি উল্লেখযোগ্য শহর ছিল। ৪৬,০০০ উগ্র বসতিস্থাপনকারীর হাতে ঘেরাও হয়ে আরবরা ভীত হয়ে ওঠে এবং কেউ কেউ সহিংসতার আশ্রয় নেয়।[১৬] সরকারের সমর্থনপুষ্ট গাশ এমুনিমের পক্ষে এর চেয়ে জুৎসই রাজনৈতিক অবস্থা আর হতে পারে না। ১৯৭৮ সালে রাফায়েল এইতান পশ্চিম তীরের প্রতিটি বসতির নিরাপত্তার দায়িত্ব বসতিগুলোর হাতে তুলে দেন, সম্প্রদায়কে রক্ষা এবং রাস্তাঘাট ও ক্ষেত-খামার পাহারা দিতে শত শত বসতিস্থাপনকারীকে নিয়মিত সেনাবাহিনী থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল তাদের। ১৯৭৯ সালের মার্চে সরকার করারোপ, সরবরাহ সেবা ও শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা দিয়ে পশ্চিম তীরে পাঁচটি আঞ্চলিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিম তীরের বসতিস্থাপনকারীদের মাত্র ২০ ভাগের যোগানদার থাকলেও গাশ সদস্যরাই সাধারণত মূল দায়িত্ব পেত।[১৭] কার্যত সরকারী কর্মকর্তায় পরিণত হয়েছিল তারা, কিন্তু তা যতই বন্ধুসুলভ হোক না কেন, বহু বছরের সংঘাতের ফলে সরকারের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল গাশ, লিকুদ পার্টির বিজয়ের পর সদস্যরা তাদের নিজস্ব বসতি কর্মকাণ্ড সংগঠিত ও ঐকবদ্ধ করার লক্ষ্যে আরমানা ('কোভেন্যান্ট') এবং তাদের কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে গাশ বসতির কাউন্সিল মোয়েতযেত ইয়েশা প্রতিষ্ঠা করে।

সন্দিহান থাকা গাশের পক্ষে ঠিকই ছিল, কারণ লিকুদের সাথে মধুচন্দ্রিমা ছিল সংক্ষিপ্ত। ২০শে নভেম্বর, ১৯৭৭, শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক জেরুজালেম সফর শুরু করেন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত; পরের বছর ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করেন বেগিন ও সাদাত। ইসরায়েল ১৯৬৭ সালে দখল করে নেওয়া সিনাই পেনিনসুলা মিশরকে ফিরিয়ে দেবে, বিনিময়ে মিশর ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে ও সাধারণ সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। চুক্তি 'শান্তির জন্যে একটা ফ্রেমওয়ার্ক', ইসরায়েল, মিশর, জর্দান ও 'ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধিদের' মধ্যে পশ্চিম তীর ও গাযা স্ট্রিপের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য শান্তি আলোচনার আশা প্রকাশ করেছে। উভয় পক্ষের ক্ষেত্রেই ক্যাম্প ডেভিড বাস্তব চুক্তি ছিল। মিশর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ফিরে পেয়েছে, শান্তি

পেয়েছে ইসরায়েল। সিনাই পবিত্র ভূমি ছিল না; বাইবেলে বর্ণিত প্রতিশ্রুত ভূমির সীমানার অন্তর্ভুক্ত নয়। পশ্চিম তীর আরবদের কাছে ফিরিয়ে না দেওয়ার ব্যাপারে সব সময়ই অটল ছিলেন বেগিন; শান্তির ফ্রেমওয়ার্ক আলোচনা কোনওদিনই হবে না, নিশ্চিত ছিলেন তিনি, কারণ অন্য কোনও আরব রাষ্ট্র সেগুলো সমর্থন করবে না। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের দিন পশ্চিম তীরে বিশটি নতুন বসতি স্থাপন করার সরকারী সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেন বেগিন।

এটা ধার্মিক যায়নবাদী, গাশ এমুনিম বা সাধারণভাবে ইসরায়েলি ডানপন্থীদের সন্তুষ্ট করেনি। ৮ই অক্টোবর, ১৯৭৯ র‍্যাবাই কুকের আশীর্বাদ নিয়ে ক্যাম্প ডেভিডের বিরুদ্ধে লড়াই ও আরও কোনও আঞ্চলিক ছাড় প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে নতুন তেহিয়া ('রেনেইসাঁ) পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এযাত্রা ধার্মিক ও সেক্যুলার রেডিক্যালরা একই রাজনৈতিক দলে একসাথে কাজ করেছিল। ১৯৮১ সালে কুকবাদী ও সাবেক গাহেলেত সদস্য হাইম দ্রুকমান পশ্চিম তীরে আরও বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি করতে নিজস্ব মোরাশা ('ঐতিহ্য') পার্টি গঠন করেন। গাশের চোখে ক্যাম্প ডেভিড মোটেই শান্তি ছিল না। তারা *শালোম* ('শান্তি') ও *শ্লেমুত* ('সামগ্রিকতা') শব্দ দুটির উৎপত্তিগত সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে: সত্যিকারের শান্তির মানে আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের পূর্ণ ভূমির সংরক্ষণ। এখানে কোনও আপোস হতে পারে না। গাশ র‍্যাবাই এলিয়েযার ওয়াল্ডমান যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, ইসরায়েল, যার উপর গোটা পৃথিবীর নিয়তি নির্ভর করা অশুভের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে:

> নিষ্কৃতি কেবল ইসরায়েলের নিষ্কৃতি নয়, বরং গোটা পৃথিবীর নিষ্কৃতি। কিন্তু ইসরায়েলের নিষ্কৃতির উপরই বিশ্বের নিষ্কৃতি নির্ভর করছে। এখান থেকেই সারা পৃথিবীর উপর আমাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সৃষ্টি। ইসরায়েলের গোটা ভূমিতে বাসকারী জনগণের কাছ থেকে মানবজাতির কাছে আবির্ভূত হবে আশীর্বাদ।[১৮]

কিন্তু বাস্তববাদী, সেক্যুলার ধারায় পরিচালিত বিশ্বে এই অতীন্দ্রিয়বাদী আস্থা বাস্তবায়ন অসম্ভব প্রতীয়মান হয়েছে। বেগিনের বাগাড়ম্বর যতই যুদ্ধংদেহী বা বাইবেলিয় হোক না কেন, রাজনীতির বাস্তব *লোগোসের* ভেতর *মিথোসের* হস্তক্ষেপের সুযোগ দানের কোনও ইচ্ছা তাঁর ছিল না। একেবারে গোড়া থেকেই দক্ষতা ও কার্যকারিতা ছিল আধুনিক চেতনার মূলকথা। বাস্তবভিত্তিক রাজনৈতিক বিবেচনা ও নীতিমালায় চরম নীতিমালাকে আশ্রয় দিতে হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

AMARBOI.COM

সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল বেগিনের, শান্তি প্রক্রিয়া চেয়েছিল দেশটি।

আধুনিক রাজনৈতিক বিশ্বে ঈশ্বরের পক্ষে লড়তে চাওয়া মৌলবাদীদের জন্যে বরাবরই এটা বড় সমস্যা হয়ে থাকবে। এই বছরগুলোয় গাশ এমুনিম কিছু পরিমাণ সাফল্য লাভ করেছিল। ১৯৭৮ সালে সরবোন ও মারকায হারাভের ফরাসি স্নাতক শ্লোমো আবিনার পূর্ব জেরুজালেমের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আতেরেত কোহানিম ('ক্রাউন অভ প্রিস্ট') *ইয়েশিভা* প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ইসলামি বিশ্বের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান ডোম অভ দ্য রকের অধিকৃত টেম্পল মাউন্টের কাছেই ছিল *ইয়েশিভাটি*। *ইয়েশিভার* লক্ষ্য ছিল মেসায়াহর আবির্ভাবের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ ও প্রাচীন স্থানে মন্দিরের পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে বাইবেলিয় মন্দিরের বিসর্জন ও প্রিস্টলি কাল্টের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন টেক্সট পাঠ করা। নতুন একটি মন্দির যেহেতু মুসলিম উপাসনালয়ের ধ্বংস বোঝাবে, খোদ *ইয়েশিভার* প্রতিষ্ঠাই ছিল উস্কানীমূলক, কিন্তু আতেরেত কোহানিম ১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অগ্রাহ্য করে ইসরায়েলের অধিকার করে নেওয়া প্রাচীন জেরুজালেম শহরে একটি বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ারও সূচনা করেছিল। *ইয়েশিভা* পুরোনো সিনাগগ নির্মাণ ও আরব জেরুজালেমে জোরাল ইহুদি উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে গোপনে মুসলিম মহল্লার আরব সম্পত্তি কিনতে শুরু করেছিল।[১৯] ১৯৭৯ সালে গাশ এমুনিম নাবলুসের দক্ষিণ পুবের এলোন মোরেহর নতুন বসতি উচ্ছেদের জন্যে ইসরায়েলি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করলে এই বছরগুলোয় অর্জিত দ্বিতীয় সাফল্য দেখা দেয়। গাশ এমুনিম গৃহযুদ্ধ ও অনশন ধর্মঘটের হুমকি দেয়, শেষ পর্যন্ত ১৯৮০ সালের জানুয়ারির প্রথম কেবিনেট বর্তমান বসতিগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপায় অনুসন্ধান ও সুপ্রিম কোর্টের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ভেতরে থেকেই নতুন বসতি স্থাপনের সুযোগ সন্ধানের জন্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। ১৫ই মে, সরকার পশ্চিম তীরে উনষাটটি নতুন বসতি স্থাপনের পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা ঘোষণা করে।[২০]

কিন্তু এইসব বিক্ষিপ্ত সাফল্য সত্ত্বেও গাশ এমুনিমের সোনালি দিনের অবসান ঘটেছিল। নতুন শান্তি ইসরায়েলি জনগণের কাছে জনপ্রিয় ছিল। ১৯৮২ সালে শোচণীয় পরাজয় বরণ করে গাশ। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি পালনের উদ্দেশ্যে ইসরায়েল সিনাইয়ের উপকূলে শ্রমিক দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধিশীল সেক্যুলার শহর ইয়ামিত বসতি থেকে জনগণকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যায়নবাদের 'শান্তির ভাইরাসে' আক্রান্ত হওয়ার ঘোষণা দেন মোশে লেভিংগার।[২১] হাজার হাজার পশ্চিমতীরবাসীকে নেতৃত্ব দিয়ে ইয়ামিতে নিয়ে যান তিনি; পরিত্যক্ত বাড়িঘরে গিয়ে

AMARBOI.COM

ওঠে তারা, তাদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে আইডিএফকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। বেপরোয়া পদক্ষেপ ছিল এটা। বসতি স্থাপনকারীদের রোমের (৬৬-৭২ সিই) বিরুদ্ধে ইহুদি বসতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন লেভিঙ্গার, এই সময় ৯৬০ নারী-পুরুষ ও শিশু রোমান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের বদলে মাসাদা দুর্গে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। গাশ র‍্যাবাইগণ ইসরায়েলের দুজন প্রধান র‍্যাবাইয়ের সাথে পরামর্শ করেন, এঁরা অবশ্য শাহাদৎ বরণের বিরুদ্ধে রায় দেন, এবং আরও একবার শোকে পোশাক ছেঁড়েন র‍্যাবাই লেভিংগার।[২২] বসতিস্থাপনকারীদের উচ্ছেদ করতে আইডিএফ উপস্থিত হলেও ইহুদিদের কারও প্রাণহানি ঘটেনি, তবে শোডাউনের জন্যে প্রস্তুত ছিল গাশ; মুহূর্তের জন্যে ধার্মিক ও সেক্যুলার ইসরায়েল যুদ্ধক্ষেত্রের বিপরীত পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়েছিল।

ইয়ামিতের শেষ অবস্থান হয়তো ভীষণ সত্যিকে অস্বীকার করার কৌশল হয়ে থাকতে পারে। কুকবাদীদের এত আস্থার সাথে প্রত্যাশিত মহাজাগরণ ঘটেনি; হতে পারে নিস্কৃতি আদৌ আসন্ন নয়? এমন ভীরু ভূমি ছাড়দানকারী একটি দেশ কীভাবে পবিত্র হতে পারে? গাশের ধার্মিক সদস্যরা তাদের আরও বেপরোয়া পদক্ষেপের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার এক মেসিয়ানিক প্রত্যাশার 'মহা হতাশা' বোধ করছিল। সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও গাশ বাস্তব জগতে ঈশ্বরের রাজনীতিকে *কার্যকর* করে তুলতে পারেনি। সিনাই থেকে প্রত্যাহারের অল্প আগে মারা যান র‍্যাবাই কুক, তাতে পরিত্যাগের অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কুকের উত্তরাধিকারী হিসাবে একক কোনও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি, আন্দোলনে ফাটল ধরে। কেউ কেউ ইসরায়েলের প্রকৃত চেতনার পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে ধৈর্য, প্রার্থনা ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিপাতের পক্ষে কথা বলে। অন্যরা যুদ্ধের জন্যে তৈরি ছিল।

বেগিন একাই ক্যাম্প ডেভিড প্রশ্নে ধর্মীয় বিরোধিতার মোকাবিলা করছিলেন না। তাঁর মিশরিয় প্রতিপক্ষ আনোয়ার সাদাত নিজ দেশে মুসলিম বিরোধী পক্ষের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। সাদাতের শান্তি উদ্যোগ তাঁকে পশ্চিমে প্রিয়ভাজন ও জনপ্রিয় করে তুলেছিল, কিন্তু সমাজের বহু ক্ষেত্রেই শান্তি জনপ্রিয় হলেও মিশরিয়রা তাদের প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে অনেক বেশি দোলাচলে ভুগছিল। ছয়

AMARBOI.COM

দিনের যুদ্ধের বিপর্যয় সত্ত্বেও নাসেরকে জনগণ দারুণভাবে ভালোবাসত। সাদাত কখনওই সেই ধরনের ভক্তি অনুপ্রাণিত করতে পারেননি। তিনি সব সময়ই রাজনৈতিকভাবে তুচ্ছ বিবেচিত হয়েছেন, ১৯৭১ সালে প্রথমবারের ক্ষমতায় আসার পর তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি অভ্যুত্থান প্রয়াসকে ভণ্ডুল করতে হয়। ১৯৭৩ সালের ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধের তুলনামূলক সাফল্য অবশ্য সেভাবে সাদাতের বৈধতাকে প্রতিষ্ঠা দেয়নি।[২৩] যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করে এবং আরব আস্থা ফিরিয়ে এনে জনগণকে শান্তি প্রক্রিয়ার পথে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তিনি, এই শান্তি মিশরকে সাহায্য করবে ও পশ্চিমের সাথে সম্পর্ক মেরামত করবে বলে বিশ্বাস ছিল তাঁর।

১৯৬৭ সালের পরাজয়ের পর নাসের সমাজতন্ত্র থেকে কিছুটা পিছু হটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের নতুন ধর্মীয় আবহও টের পেয়েছিলেন তিনি। মুসলিম ব্রাদাররা কারাগারে থাকলেও নাসের আবারও তাঁর ভাষণ ইসলামি বুলি দিয়ে সাজাতে শুরু করেছিলেন। সাদাতের অধীনে এই দুটো প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে নাসের নিয়োজিত ১৫০০ সোভিয়েত উপদেষ্টাকে বরখাস্ত করেন তিনি এবং ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধের পর মিশরকে পুঁজিবাদী বিশ্ব বাজারে নিয়ে আসার লক্ষ্যে একটি নতুন নীতিমালা ঘোষণা করেন। এই নতুন অর্থনৈতিক উদ্যোগের নাম দিয়েছিলেন তিনি *ইনফিতাহ* ('খোলা দুয়ার')।[২৪] অবশ্য অর্থনীতিক ছিলেন না সাদাত, আর মিশরের অর্থনৈতিক সমস্যা সব সময়ই অ্যাচিলিসের গোড়ালি ছিল, ইনফিতাহর কারণে এর আরও অবনতি ঘটে। মিশরকে নিশ্চিতভাবেই উন্মুক্ত করে দিয়েছিল: বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক আমদানি পণ্য দেশে প্রবেশ করে। সুবিধাজনক কর ব্যবস্থার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিনিয়োগকারীদের তোষামোদ করা হয়। ফলে মিশর সত্যিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। খোলা দুয়ার উদীয়মান স্বল্পসংখ্যক বুর্জোয়ার পক্ষেও লাভজনক ছিল, বিপুল অর্থের মালিক বনে গিয়েছিল মুষ্টিমেয় মিশরিয়। কিন্তু দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। অনিবার্যভাবে বিদেশী প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি মিশরিয় ব্যবসা; দুর্নীতি ছিল, অভিজাত গোষ্ঠীর বাড়াবাড়ি রকমের ভোগবাদ দারুণ বিতৃষ্ণা ও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল। বিশেষ করে তরুণ সমাজ নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করেছে। এদের মাত্র চার শতাংশ শোভন কাজের প্রত্যাশা করতে পারত; বাকি অংশকে সামান্য সরকারী খাতের বেতনে বেঁচে থাকতে হচ্ছিল, বাড়তি সময়ে রাতে কাজ করে পুষিয়ে নিতে হত–প্রায়শঃই ট্যাক্সি ড্রাইভার, প্লাম্বার ও ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ করতে হত তাদের। ভদ্র আবাস ছিল সাধ্যাতীত ব্যয়বহুল, এর মানে, তরুণ-তরুণীদের প্রায়শঃই বিয়ে করে সংসার পাতার জন্যে বছরের পর

AMARBOI.COM

বছর অপেক্ষায় থাকতে হত। একমাত্র আশা ছিল অভিবাসন। হাজার হাজার মিশরিয় বাড়ি ছেড়ে লম্বা সময়ের জন্যে তেল সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে বাস করতে বাধ্য হয়েছে, এখানে তারা ভালো বেতন পেত, পরিবারের কাছে টাকাকড়ি পাঠাতে পারত ও ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করতে পারত। কৃষকরাও উপসাগরীয় এই যাত্রায় যোগ দিয়েছিল, কেবল বাড়ি নির্মাণ বা ট্র্যাক্টর কেনার মতো পর্যাপ্ত টাকা জমানোর পরেই ফিরে আসত তারা।[২৫] *ইনফিতাহ* সাদাতকে পশ্চিমের কাছে প্রিয় করে তুললেও এর মানে ছিল অধিকাংশ মিশরিয় স্রেফ নিজ দেশে বাস করতে পারছিল না, বাধ্য হচ্ছিল অভিবাসনে।

আমেরিকান ব্যবসা ও সংস্কৃতি শেকড় গেড়ে বসার সাথে সাথে বহু মিশরিয়র কাছে মিশর যেন অচেনা ও পাশ্চাত্য ঠেকছিল। জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন সাদাত। তিনি ও তাঁর স্ত্রী বিলাসী পশ্চিমা জীবনযাত্রা অনুসরণ করতেন, বেশ ঘন ঘন তাদের বিদেশী সেলিব্রিটি ও চিত্রতারকাদের আপ্যায়ন করতে দেখা যেত, তাঁরা অ্যালকোহল পান করতেন বলে সুবিদিত ছিল, অধিকাংশ জনগণের দুর্ভোগ থেকে দূরে কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে সজ্জিত অসংখ্য জাঁকাল রেস্ট হাউসে বিলাস বহুল জীবন যাপন করতেন। সাদাতের সযত্নে গড়ে তোলা ধর্মীয় ইমেজের সাথে এর কোনও মিল ছিল না। সুন্নি ঐতিহ্যে একজন ভালো মুসলিম শাসককে জনগণের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বরং সহজ সরল জীবন যাপন ও যত দূর সম্ভব সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।[২৬] দেশের নতুন ধর্মীয় জোয়ারের সাথে সম্পর্কিত হতে নিজেকে 'ধার্মিক প্রেসিডেন্ট' আখ্যায়িত করে ও দিনে পাঁচবার প্রার্থনায় নত হন বোঝাতে সংবাদ মাধ্যমকে কপালে স্পষ্ট 'ছাপচিহ্ন'সহ মসজিদে প্রার্থনারত অবস্থায় তাঁর ছবি প্রকাশে উৎসাহিত করে অনিবার্যভাবে মুসলিমদের তাঁর অসল আচরণ ও আদর্শের ভেতর তুলনা করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন সাদাত।

তারপরেও উপরে উপরে সাদাত ধর্মের জন্যে ভালো ছিলেন। নিজ শাসনের পক্ষে নাসের থেকে ভিন্ন পরিচয় গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল তাঁর। মুহাম্মদ আলির আমল থেকেই মিশরিয়রা বারবার আধুনিক বিশ্বে পা রাখার প্রয়াস পেয়েছে এবং সেখানে নিজেদের একটা অবস্থান পেতে চেয়েছে। পশ্চিমকে অনুকরণ করেছে তারা, পশ্চিমা নীতিমালা ও আর্দশ গ্রহণ করেছে, স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছে আর আধুনিক ইউরোপিয় ধারায় সংস্কৃতিকে সংস্কারের প্রয়াস পেয়েছে। এর কোনওটাই সফল হয়নি। ইরানিদের মতো অনেক মিশরিয় মনে করেছে এবার 'নিজেদের মাঝে প্রত্যাবর্তন' ও একটি আধুনিক অথচ স্পষ্টভাবে ইসলামি পরিচয় গড়ে তোলার সময় হয়েছে। সাদাত খুশি মনে এটিকে কাজে লাগিয়েছেন। পাশ্চাত্য

AMARBOI.COM

কায়দায় ইসলামকে রাষ্ট্রের অধীন সরকারী ধর্মে পরিণত করতে চেয়েছিলেন তিনি। নাসের যেখানে ইসলামি গ্রুপগুলোর উপর নির্যাতন চালিয়েছেন, সাদাত সেখানে নিজেকে তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে তুলে ধরেছেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের ভেতর বিভিন্ন কারাগার ও শ্রম-শিবিরে ভুগতে থাকা মুসলিম ব্রাদারদের মুক্তি দিয়েছেন। ধর্মীয় বিভিন্ন গ্রুপকে নিয়ন্ত্রণকারী নাসেরের বিভিন্ন কঠোর আইন শিথিল করেছেন, তাদের সভা-সমাবেশ, প্রচারণা ও প্রকাশনার অনুমতি দিয়েছেন। মুসলিম ব্রাদারহুডকে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সোসায়েটি হিসাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া না হলেও ব্রাদাররা প্রচারণা চালাতে এবং নিজেদের পত্রিকা *আল-দাওয়াহ* ('আহ্বান') প্রকাশ করতে পারছিল। মসজিদ নির্মাণের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, ইসলামের জন্যে রেডিওতে সময় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। ইসলামি ছাত্র গ্রুপগুলোকেও প্রশ্রয় দিয়েছেন সাদাত, সমাজতন্ত্রী ও নাসেরবাদীদের কাছ থেকে ক্যাম্পাসের দখল ছিনিয়ে নিতে উৎসাহ দিয়েছেন তাদের। নাসের ধর্মকে দমন করতে চেয়েছিলেন এবং এই নির্যাতনমূলক কৌশল উল্টোফলদায়ী আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে সায়ীদ কুতব প্রচারিত অধিকতর চরম ধার্মিকতার উত্থান ঘটেছিল। সাদাত এবার ধর্মকে নিজের মতলব হাসিলের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এটাও করুণ ভ্রান্তি হিসাব প্রমাণিত হবে।

প্রথম দিকে অবশ্য সাদাতের নীতি সফল মনে হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলিম ব্রাদারহুড যেন যথার্থ শিক্ষা পেয়েছে বলে মনে হয়েছে। কারাগার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত প্রবীন রাজনীতিবিদগণকে সায়ীদ কুতব ও সিক্রেট অ্যাপারেটাসের দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক মনে হয়েছে, হাসান আল-বান্নার অহিংস, সংস্কারমূলক নীতিমালায় ফিরে যেতে চেয়েছেন তাঁরা। ব্রাদাররা মুসলিম আইনে পরিচালিত একটি রাষ্ট্র দেখতে চাইলেও একে কেবল শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত পথেই অর্জন সম্ভব একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করেছে।[২৭] কিন্তু তারপরেও সোসায়েটির আদি আদর্শে ফিরে যাবার দাবি করলেও বাস্তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংগঠনে পরিণত হয়েছিল ব্রাদারহুড। বান্না যেখানে বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আবেদন রেখেছিলেন, পণ্ডিতদের ভাষায় 'নব্য ব্রাদারহুড' সেখানে সাদাতের খোলা দুয়ার নীতি থেকে লাভবান হয়েছিল, বুর্জোয়াদের আকর্ষণ করেছিল। এরা ছিল সমৃদ্ধশালী, আরামপ্রিয় ও শাসকগোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতায় প্রস্তুত। এই নতুন ব্রাদারহুড সাদাতের মিশর থেকে ক্রমবর্ধমানহারে বিচ্ছিন্ন বোধকারী ক্লান্তিকর বঞ্চনার শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। শাসকের বিরোধিতা করার মতো ভিন্ন কোনও অনুমোদিত ধরন না থাকায় অসন্তুষ্টদের অনেকেই আরও চরম ইসলামি পন্থার খোঁজ করেছে।[২৮]

AMARBOI.COM

কিন্তু অচিরেই সাদাতের নীতিমালা এমকি নব্য ব্রাদাহুডকেও ক্ষিপ্ত করে তোলে। এর প্রায় ৭৮,০০০ প্রচার সংখ্যার জার্নাল *আল-দাওয়াহ* প্রতি মাসে ইসলামের চার 'শত্রু'র সংবাদ প্রকাশ করছিল: পাশ্চাত্য ক্রিশ্চান ধর্ম (এর অন্তস্থঃ সাম্রাজ্যবাদকে তুলে ধরার জন্যে সাধারণভাবে *আল-সালিবিয়াহ*, দ্য ক্রুসেড), কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র (আতাতুর্ক কর্তৃক রূপায়িত) ও যায়নবাদ। 'বিশেষ করে 'ইহুদিগোষ্ঠী'কে অন্য তিনশত্রুর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত চূড়ান্ত অশ্লীলতা মনে করা হত। *আল-দাওয়াহ্*র নিবন্ধগুলো মদীনায় পয়গম্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ইহুদিদের নিয়ে কোরানের অনুচ্ছেদসমূহ উদ্ধৃত করত, এবং ইহুদি বিশ্বাস সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য ধারণকারী অনুচ্ছেদগুলো বাদ দিয়ে যেত।[২৯] *আল-দাওয়াহ*'র অ্যান্টি-সেমিটিজম পয়গম্বরের আমল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে দাবি করা হয়, কিন্তু আসলে তা সাম্প্রতিককালে ইসলামি উদ্ভাবন, ইসলামি উৎসের চেয়ে বরং *দ্য প্রটোকল অভ দ্য এল্ডারস অভ যায়ন*-এর উপর বেশি নির্ভর করেছে। সুতরাং, ক্যাম্প ডেভিডের পর নব্য ব্রাদারদের পক্ষে সাদাতের অনুগত থাকা আর সম্ভব ছিল না। গোটা ১৯৭৮ সাল জুড়ে *আল-দাওয়াহ* শাসক গোষ্ঠীর ইসলামি বৈধতাকে প্রশ্ন করে গেছে। ১৯৮১ সালের মে সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী ডোম অভ দ্য রককে শেকলে জড়ানো ও স্টার অভ ডেভিডের ছবিঅলা তালা দিয়ে আটকানো অবস্থায় তুলে ধরে।[৩০]

কিন্তু সাদাতের ঐতিহাসিক জেরুজালেম সফরের সময় অধিকতর চরমপন্থী মুসলিম গোষ্ঠী আলোয় বের হয়ে এসেছিল। এর নেতৃবৃন্দ বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা ও সাবেক সরকারের মন্ত্রী মুহাম্মদ আল-দাহাবির হত্যার অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। মিশরিয়রা এই মুসলিম যুবকদের কাছে প্রথম চার জন 'সঠিক পথে পরিচালিত' *(রাশিদুন)* খলিফার আমল থেকেই ইসলাম পতনের মুখে রয়েছে, সেই সময়ের পর অর্জিত সমস্ত ইসলামি বিকাশ বহুঈশ্বরবাদীতা ছাড়া আর কিছু না, গোটা মিশর প্রেসিডেন্ট ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ *জাহিলিয়াহ* যুগের জেনে ভীষণ ধাক্কা খেয়েছিল। গোষ্ঠীটি ঘোষণা করেছিল যে এই *জাহিলি*কে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে এবং এর ধ্বংসস্তূপের উপর কোরান ও সুন্নাহ ভিত্তিক সত্যিকারের মুসলিম সমাজ গড়ে তুলতে হবে। গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা শুকরি মুস্তাফাকে আল্লাহ নতুন বিধান সৃষ্টি এবং মুসলিমদের ইতিহাসকে ফের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে মনোনীত করেছেন।[৩১]

১৯৬৫ সালে নাসের সরকারের হাতে সোসায়েটি অভ মুসলিম ব্রাদার্সের লিফলেট বিলির দায়ে গ্রেপ্তার ও কারাবন্দি হয়েছিলেন শুকরি, তখন তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর।[৩২] এই সামান্য অপরাধের দায়ে ছয় বছর নাসেরের শিবিরে

কাটিয়েছেন তিনি, এই সময় মাওদুদি ও কুতবের রচনা পাঠ করেছেন এবং আরও অনেক মুসলিম ব্রাদারের মতো নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কারাগারে এইসব চরমপন্থী মুসলিমরা সায়ীদ কুতবের নির্দেশনা মোতাবেক কঠোর বিচ্ছিন্নতার অনুশীলন করেছে। অন্য কারাবন্দি ও প্রবীন, অধিকতর মডারেট ব্রাদারদের থেকে নিজেদের আলাদা কেরে নিয়েছে, *জাহিলি* ঘোষণা করেছে তাদের। অবশ্য কেউ কেউ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কুতব বিশ্বাস করতেন যে, *জাহিলি* সমাজের বিরুদ্ধে *জিহাদ* শুরু করতে তাঁর ভ্যানগার্ডের আরও অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে। প্রথমে অবশ্যই মুহাম্মদীয় কর্মসূচির প্রথম তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে তাদের, নিজেদের আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। কারাবন্দি কোনও কোনও চরমপন্থী তারা এখন 'দুর্বলতা'র একটা পর্যায়ে রয়েছে বলে একমত হয়েছিল, অশুভ শাসকগোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ করার মতো পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত আপাতত *জাহিলি* সমাজেই স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে তারা। কিন্তু শুকরি ছিলেন 'সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা'র *(মাফসালাহ কামিলিয়াহ)* পক্ষের আরও চরমপন্থী দলের সদস্য: তাদের গোষ্ঠীতে যোগ দেয়নি এমন যে কেউ বিধর্মী, প্রকৃত বিশ্বাসীদের তাদের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। সতীর্থ বন্দিদের সাথে কথা বলতে অস্বীকার যেত তারা, প্রায়শঃই লেগে থাকত হাতাহাতি মারপিট।[৩৩]

১৬ই অক্টোবর, ১৯৭১-এ শুকরিকে আবু যাবাল ক্যাম্প থেকে মুক্তি দেওয়া হলে একটি নতুন দল গঠন করেন তিনি; এর নাম দেন সোসায়েটি অভ মুসলিমস। এর সদস্যরা কুতবের ভ্যানগার্ড হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, নিজেদের তাঁর কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজে নিবেদন করেছিল তারা। সেই অনুযায়ী *জিহাদের* প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে মূলধারার সমাজ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। গোটা মিশরিয় সমাজই দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মসজিদে উপাসনা করতে অস্বীকার করে তারা, ধর্মীয় ও সেকুলারিস্ট নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সমাজচ্যুতির *(তাকফির)* ফতওয়া জারি করে। কেউ কেউ শুকরির নিজ আবাস আসিউতের আশপাশের মরুভূমি ও পাহাড়ী গুহায় অভিবাসন করে। বেশিরভাগই বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে সবচেয়ে বঞ্চিত পাড়ার আসবাবপত্রে সাজানো ঘরে থাকত, এখানে সত্যিকারের ইসলামি ধারায় জীবন যাপনের চেষ্টা করত তারা। ১৯৭৬ সাল নাগাদ সোসায়েটি অভ মুসলিমসের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার। তারা বিশ্বাস করেছিল যে আল্লাহ বর্তমান *জাহিলিয়াহ*র ধ্বংসাবশেষের উপর খাঁটি *উম্মাহ* গঠনের লক্ষ্যে তাদের মনোনীত করেছেন। আল্লাহ'র হাতে রয়েছে ওরা। এখন তারা উদ্যোগ গ্রহণ করায় আল্লাহই বাকি কাজ

AMARBOI.COM

শেষ করবেন। সোসায়েটির উপর কড়া নজর রেখেছিল পুলিস, কিন্তু নিরীহ উন্মাদ ও ঝরে পড়াদের দল বলে নাকচ করে দিয়েছিল তাদের।[৩৪] কিন্তু সাদাত ও তাঁর পরমর্শকরা এই তরুণ, মরিয়া মৌলবাদীদের জীবনযাত্রার দিকে একবার নজর দেওয়ার কথা ভাবলে হয়তো দেখতেন এই মুসলিম সম্প্রদায়গুলো খোলা দুয়ার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিবিম্ব ও আধুনিক মিশরের অন্ধকার দিক তুলে ধরেছে।

শুকরির গোটা মিশরিয় সমাজকেই অস্পৃশ্য ঘোষণা করা হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে থাকতে পারে, তবে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল না। সাদাতের মিশরে যতবেশি মসজিদই নির্মিত হয়ে থাকুক না কেন, যে সমাজে একটি ছোট অভিজাত গোষ্ঠীর দখলে সব সম্পদ থাকে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নৈরাশ্যজনক দারিদ্র্যে বাস করে সেই সমাজে ইসলামি বলে কিছু থাকে না। সোসায়েটির সদস্যদের শহরের সবচেয়ে করুণ মহল্লায় *হিজরা* বা 'অভিভাসন' বহু তরুণ মিশরিয়র দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাও তুলে ধরেছে, তাদের মনে হয়েছে মিশরে তাদের জন্যে কোনও জায়গা নেই, নিজ দেশ থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে তাদের। সোসায়েটির কমিউনগুলো তরুণদের হাতে পরিচালিত হত, আরও অনেক মিশরিয় তরুণের মতো তাদের উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহে পাঠিয়েছিলেন শুকরি। সোসায়েটির অনেক সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেছিল, কিন্তু শুকরি ঘোষণা করেছিলেন যে, সেক্যুলার শিক্ষা সময়ের অপচয়; মুসলিমের প্রয়োজন কেবল কোরান। এটা আরেকটা চরম অবস্থান, তবে এতে সত্যির খানিকটা অংশ আছে। ১৯৭০ দশকে বহু মিশরিয়র প্রাপ্ত শিক্ষা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন ছিল। শিক্ষা ও তার পদ্ধতিই কেবল ব্যাপকভাবে অপর্যাপ্ত ছিল না, বরং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া ডিগ্রি এমনকি একজন গ্র্যাজুয়েটের ভালো চাকরি লাভের নিশ্চয়তা দিত না: বিদেশের কোনও বাড়িতে আয়ার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের চেয়ে বেশি বেতন পাওয়ার সুযোগ ছিল।[৩৫]

সোসায়েটি যতদিন লো-প্রোফাইল বজায় রেখেছে, শাসকগোষ্ঠী তাদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু ১৯৭৭ সালে আড়াল ছেড়ে বের হয়ে আসেন শুকরি। ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামি গ্রুপগুলো সোসায়েটির কিছু সদস্যকে প্রলুব্ধ করে নিজেদের দলে নিয়ে গিয়েছিল। এই দলত্যাগীরা শুকরির চোখে মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত ধর্মদ্রোহীতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর শিষ্যরা তাদের বিরুদ্ধে লাগাতার হামলা চালাতে শুরু করে, ফলে হত্যা প্রচেষ্টার দায়ে সোসায়েটির চৌদ্দজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাথে সাথে আক্রমণাত্মক অবস্থানে চলে যান শুকরি। ১৯৭৭ সালের পরবর্তী ছয় মাসে সতীর্থদের মুক্তির দাবিতে প্রচারণা চালিয়ে যান তিনি, খবর কাগজে নিবন্ধ পাঠান, এবং রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারণার প্রয়াস

AMARBOI.COM

পান। এই শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হলে সহিংসতার আশ্রয় নেন শুকরি। সোসায়েটিকে ধর্মদ্রোহী হিসাবে নিন্দা করে একটি প্রবন্ধ লেখায় ৭ই জুলাই মুহাম্মদ আল-দাহাবিকে অপহরণ করেন। অপহরণের এক দিন পর, তিনটি মিশরিয় পত্রিকা এবং সেই সাথে অন্য কয়েকটি মুসলিম দেশ, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস ও লন্ডনেও একটি বার্তা প্রকাশ করেন শুকরি। শিস্যদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি করেন, প্রচারমাধ্যমে সোসায়েটির পাওয়া নেতিবাচক প্রচরণার জন্যে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার উপর জোর দেন এবং শাসকগোষ্ঠীর আইনি ব্যবস্থা ও গোয়েন্দা সেবা সম্পর্কে তদন্ত করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠনের আহ্বান জানান। সাদাত তাঁর গোপন পুলিসের কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে দেবেন, এমন সম্ভাবনাই ছিল না: স্পষ্টতই কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেছেন তার প্রকৃতি বুঝে উঠতে পারেননি শুকরি। কয়েক দিন পরে দাহাবির লাশ আবিষ্কৃত হলে, শুকরি ও তাঁর শত শত শিষ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। দ্রুত বিচার অনুষ্ঠানের পর স্বয়ং শুকরি ও সেসায়েটির পাঁচজন নেতৃস্থানীয় সদস্যকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সংবাদমাধ্যম প্রত্যাখ্যানবাদী ও নিন্দাবাদী আদর্শের জন্যে এই গোষ্ঠীটির নাম দিয়েছিল *তাকফির আল হিজরা* ('সমাজচ্যুতি ও অভিবাসন')।[৩] অনেক মৌলবাদী ধর্মতত্ত্বের মতো ক্রোধ ও প্রান্তিকীকরণের অভিজ্ঞতা থেকে এর উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু শুকরির কাহিনী আমাদের এ কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, এই ধরনের সমাজকে সব সময় উন্মাদ ভাবা ঠিক নয়। ভারসাম্যহীন ও করুণভাবে ভুল বোঝা শুকরি এমন এক প্রতি-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন যা পশ্চিমে দারুণ উৎসাহের সাথে তারিফ করা তাদের নতুন মিশরের অন্ধকার দিক তুলে ধরেছে। আসলে কী ঘটছে তার এক বিকৃত, অতিরঞ্জিত রূপ এবং যাকে আর নিজেদের ভাবতে পারছিল না এমন এক দেশে অসংখ্য তরুণের বিচ্ছিন্নতা তুলে ধরেছে।

ঠিক একই রকম উন্মোচক, কিন্তু অধিকতর সফল ও স্থায়ী ছিল সাদাতের প্রেসিডেন্সির সময় বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আধিপত্য বজায় রাখা ইসলামি ছাত্র সংস্থা *জামাত আল-ইসলামিয়াহ*। শুকরির সোসায়েটির মতো *জামাত* নিজেদের কুতবের ভ্যানগার্ড মনে করত; তবে মূলধারা থেকে রেডিক্যাল প্রত্যাহারের চর্চা করেনি তারা, বরং তাদের চাহিদার প্রতি অন্ধ মনে হওয়া এক সমাজে নিজেদের জন্যে স্থান তৈরি করতে চেয়েছে। মিশরিয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড বা সরবোনের মতো ছিল না। এগুলো ছিল বিশাল, হৃদয়হীন করুণ সুবিধা সম্পন্ন গণশিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সালের ভেতর ছাত্র সংখ্যা ২০০,০০০ থেকে অর্ধ মিলিয়নে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে ভীতিকর জটলা সৃষ্টি হয়েছিল। দুই বা তিনজন ছাত্রকে একই আসনে বসতে হত, লেকচার হল ও ল্যাবরেটরিগুলোয় এমন ভীড়

AMARBOI.COM

লেগে থাকত যে বিশেষত মাইক্রোফোনগুলো প্রায়ই ভাঙা থাকায় শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শোনা ছিল কার্যত অসম্ভব। অতিরিক্ত ভিড় মেয়েদের জন্যে বিশেষ কষ্টকর ছিল, তাদের অনেকেই ঐহিত্যবাহী পটভূমি থেকে আগত ছিল বলে বেঞ্চে বা বাসে করে সমান ঠাসাঠাসি আবাসিক হলে নিয়ে যাওয়ার সময় তরুণদের সাথে ঠেলাঠেলি করা সমানভাবে অসহনীয় মনে করেছে। শিক্ষা ছিল মুখস্ত করার বিষয় এবং পরীক্ষায় সাফল্য নির্ভর করত লেকচার নোট ও প্রফেসরদের দেওয়া ম্যানুয়ালের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির উপর। হিউম্যানিটিজ, আইন, সমাজ বিজ্ঞান 'গারবেজ ফ্যাকাল্টি' হিসাবে পরিচিত ছিল, কার্যত বাতিল। ব্যক্তিগত প্রবণতা যাই হোক না কেন, ছাত্ররা চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফার্মাকোলজি, ওডোন্টোলজি, এঞ্জিনিয়ারিং বা অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে বাধ্য হত, নয়তো সবচেয়ে বাজে প্রফেসরদের কাছে শিক্ষা লাভের জন্যে নিজেদের ছেড়ে দিতে হত; ফলে গ্র্যাজুয়েশনের পর ভালো একটা কাজ পাওয়ার সুযোগ আরও কমে যেত। এমনি পটভূমিতে ছাত্ররা মানবতা বা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ভাববার প্রশিক্ষণ পেত না। বরং নিস্পৃহ ও প্রাণহীনভাবে বিভিন্ন তথ্য হজম করতে হত তাদের। তো আধুনিক সংস্কৃতির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল পৌনঃপুনিকভাবে উপরিগত, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার থেকে গেছে সম্পূর্ণ স্পর্শের বাইরে।[৩৭]

জামাত অল্প কিছু বই-পুস্তক বা প্যামফ্লেট বের করেছিল, কিন্তু ১৯৮০ সালে *আল-দাওয়াহ্*র জন্যে ইসলাম আল-দিন আল-আরিয়ার রচিত একটি নিবন্ধ তাদের মূল ধারণাকে তুলে ধরে। স্পষ্টতই সায়ীদ কুতবই ছিলেন অনুপ্রেরণা; *জামাত* বিশ্বাস করেছে মিশরিয়দের সময় এসেছে বহুদিন ধরে দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকা পাশ্চাত্য ও সোভিয়েত আদর্শ ঝেড়ে ফেলে ইসলামে ফেরার। মিশর এখনও কার্যত বিধর্মীদের হাতে শাসিত হচ্ছে, মহান ধর্মীয় জাগরণ ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হবার নয়।[৩৮] *জামাত* বিভিন্ন ধারণা নিয়ে আলোচনায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং নিজস্ব পরিস্থিতিতে সৃজনশীল ও বাস্তবভিত্তিকভাবে সেগুলো প্রয়োগ করেছে। ১৯৭৩ সালে ছাত্ররা প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে সামার ক্যাম্প স্থাপন করতে শুরু করে।[৩৯] এখানে কোরান পাঠ করত তারা, রাতে একসাথে প্রার্থনা করত ও ইসলামের সোনালি অতীত, পয়গম্বরের জীবন ও ব্রত এবং চার *রাশিদুন*দের জীবন কথা শুনত। দিনের বেলায় আত্মরক্ষার জন্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও ক্লাস করত। কয়েক সপ্তাহর জন্যে ছাত্ররা সম্পূর্ণ ইসলামি কায়দায় জীবন যাপন করত। এক অর্থে এটা ছিল সাময়িক *হিজরা*, মূলধারার সমাজ থেকে এমন জগতে অভিবাসন যেখানে কোরান অনুযায়ী জীবন যাপন করে জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারত। সত্যিকার অর্থে ঐশীগ্রন্থের শিক্ষাকে সমর্থনকারী পরিবেশে বাস

AMARBOI.COM

করার অভিজ্ঞতা লাভ করত। এই শিবিরগুলো শাসকগোষ্ঠীর অনৈসলামিক মুসলিম জীবনাচারের বিপরীতে ইসলামি ইউটোপিয়ার এক ধরনের স্বাদ যোগাত তাদের। যাজক ও বক্তাগণ আধুনিক অভিজ্ঞতার তিক্ত হতাশার কথা তুলে ধরতেন, ইউরোপ বা আমেরিকায় যা হয়তো চমৎকার ফল দিয়েছে, কিন্তু মিশরে কেবল ধনীদেরই কাজে এসেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে ফিরে ক্যাম্পাসে তাদের অভিজ্ঞতার খানিকটা রূপায়িত করার প্রয়াস পেত ছাত্ররা। সরকারী পরিবহনে নিয়মিত হয়রানির শিকার থেকে নিস্তার দিতে নারী ছাত্রদের জন্যে মিনিবাস সেবা চালু করেছিল তারা। লেকচার হলে একই কারণে লিঙ্গের বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দিয়েছে; নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই ইসলামি পোশাক পরার কথা বলেছে। দীর্ঘ আবৃতকারী জোব্বা পাশ্চাত্য কায়দার ডেটিং-এর প্রতি অনুকূল নয় এমন প্রথাগত সমাজে, যেখানে (অর্থনৈতিক কারণে বিয়ে কোনও পছন্দ ছিল না) যৌন হতাশা ছিল মিশরীয় তরুণ সমাজের একটি প্রধান সমস্যা, অনেক বেশি বাস্তবভিত্তিক ছিল। মসজিদে মসজিদে পুনরালোচনার অধিবেশনেরও আয়োজন করে *জমাত*, ছাত্ররা এখানে শোরগোলময়, জনাকীর্ণ আবাসিক হলে সম্ভব নয় এমন নিরিবিলি পরিবেশে পাঠ করার সুযোগ পেত। এইসব কৌশল কার্যকর ছিল। প্রথম নজীরে স্রেফ বিব্রত হওয়া থেকে বাঁচতে একজন ছাত্র ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরতে পারত বা লেকচার হলে বিচ্ছিন্ন সারিতে যোগ দিত, কিন্তু একই সময়ে সেই মেয়েটি সচেতন হয়ে উঠত যে তার মঙ্গলের ক্ষেত্রে *জমাতের* চেয়ে শাসকগোষ্ঠী কম উদ্বিগ্ন। মসজিদে পড়াশোনা করতে উত্তাল ডরমিটরি ছেড়ে ছাত্র ছোট প্রতীকী *হিজরা* পালন করত এবং ইসলামি পটভূমি তার পক্ষে বেশি কার্যকর বলে জানতে পারত।[৪০] অনেক ছাত্রই গ্রামের পটভূমি ও ঐতিহ্যবাহী প্রাক আধুনিক সমাজ থেকে এসেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আধুনিকার অভিজ্ঞতা তাদের কাছে কেবল অচেনা, নৈর্ব্যক্তিক ও হতবুদ্ধিকরই ঠেকেনি, বরং মাঝারি মাপের শিক্ষা লাভের সময় শাসকগোষ্ঠীর সমালোচনায় তাদের সক্ষম করে তুলতে অন্য কোনও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ও দেওয়া হয়নি। এমনি এক বিশ্বে অনেকেই কেবল ইসলামই অর্থ প্রকাশ করে বলে আবিষ্কার করবে।

পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকগণ বিশেষ করে নারীদের বোরখায় ফিরে যাবার দৃশ্যে হতাশ বোধ করেছেন, একে লর্ড ক্রোমারের আমল থেকে ইসলামি পশ্চাদপদতা ও পুরুষতান্ত্রিকার প্রতীক ভেবে এসেছেন তাঁরা। কিন্তু বাস্তব কারণে স্বেচ্ছায় ও পাশ্চাত্য পরিচয় প্রত্যাখ্যানের উপায় হিসাবে ইসলামি পোশাক বেছে নেওয়া মুসলিম নারীদের কাছে ব্যাপারটা সেভাবে অনুভূত হয়নি। বোরখা, স্কার্ফ ও দীর্ঘ

পোশাক উত্তর উপনিবেশিক আমলে ইসলামিস্টদের দারুণ কষ্টের সাথে প্রয়াস পেয়ে আসা 'সেই সত্তায় প্রত্যাবর্তনের' প্রতীক হতে পারে। শত হোক পাশ্চাত্য পোশাকআশাকে পবিত্রতার কোনও ব্যাপার নেই। সব মহিলাকে এই পোশাক পরতে দেখার ইচ্ছা ইসলামিস্টদের কাছে 'পশ্চিম'কে 'বাকি' বিশ্বের মেনে নেওয়ার মতো রীতি হিসাবে দেখার প্রবণতা মনে হয়েছে। বছর পরিক্রমায় বোরখা পরা নারী ইসলামি আত্ম-নির্ভরতা ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির আধিপত্যের প্রত্যাখ্যানের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। আড়াল বেছে নিয়ে নারীটি 'সবকিছু উন্মুক্ত করার' বাধ্যবাধকতাসহ পশ্চিমের যৌন আচারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পশ্চিমা নারী-পুরুষ যেখানে দেহকে জিম ও শরীরচর্চার ক্ষেত্রে মানবীয় ইচ্ছার অধীনে নিয়ে আসার প্রয়াস পেয়েছে এবং সময় ও বয়সের প্রক্রিয়ার কাছে দেহকে দুর্গম করে জীবনকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে, সেখানে আবৃত ইসলামি দেহ আভাসে ঘোষণা করছে যে এটা স্বর্গীয় নির্দেশের অধীন, এই বিশ্ব নয় বরং দুর্জ্ঞেয়মুখী। পশ্চিমে নারী-পুরুষ প্রায়শঃই তাদের অনেক ব্যয়ে অর্জিত তামাটে ও শানালো গায়ের রঙ প্রদর্শন করে বা অনেক সময় অধিকারের প্রতীক হিসাবে জাহির করে। একই রকম পোশাকের স্তরে আবৃত মুসলিম দেহও ইসলামি দর্শনের মানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। একইভাবে সেগুলো পাশ্চাত্য আধুনিকতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের উপর সম্প্রদায়ের কোরানের আদর্শকে তুলে ধরে। অনেকটা একইভাবে শুকরির মুস্তাফা'স কমিউনসের মতোই আবৃত ইসলামি নারীরা আধুনিক চেতনার অন্ধকার দিকের ইঙ্গিতময় সমালোচনা।[৪১]

ইসলামি পোশাকের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একজন নারীকে প্রাক আধুনিকতার প্রাচীন নারীসুলভ আত্মসমর্পণে ফিরে যেতে হবে, এমন কোনও কথা ছিল না। ১৯৮২ সালে মিশরে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, পাশ্চাত্য পোশাক পছন্দকারী নারীদের চেয়ে বোরখা বেছে নেওয়া মেয়েরা বেশি রক্ষণশীল হলেও, বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলামপন্থীর লিঙ্গ প্রশ্নে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বোরখা পরিহিত নারীদের অষ্টাশি শতাংশ বিশ্বাস করে, নারী শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ (বোরখাবিহীন নারীদের ৯৩ শতাংশের বিপরীতে); বোরখা পরা মেয়েদের ৮৮ ভাগ বাড়ির বাইরে নারীদের কাজ করাকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেছে, এবং ৭৭ ভাগ গ্র্যাজুয়েশনের পর কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে (৯৫ ও ৮৫ শতাংশ বোরখাবিহীন নারীদের তুলনায়)। অন্যান্য ক্ষেত্রে তফাৎ আরও ব্যাপক ছিল, তবে বোরখাধারী নারীদের একটা প্রধান অংশ এখনও মনে করে (৫৩ শতাংশ) নারী-পুরুষের সমান রাজনৈতিক ও অধিকার দায়িত্ব থাকা উচিত, এবং নারীদের রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে আসীন হওয়া উচিত (৬৩ শতাংশ)। বোরখাধারী নারীদের কেবল ৩৮

ভাগ মনে করে, নারী-পুরুষের সমান বৈবাহিক অধিকার থাকা উচিত, কিন্তু বোরখাবিহীন নারীদের মাত্র ৬৬ ভাগ বৈবাহিক সমতায় বিশ্বাস রাখে। এটাও কৌতূহলোদ্দীপক যে বোরখাধারী (৬৭ শতাংশ) ও বোরখাবিহীন নারীদের ৫২.৭ শতাংশ) সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বিশ্বাস করে যে, শরীয়াহ্‌রই দেশের আইন হওয়া উচিত।[৪২]

এটা ঠিক যে সকল প্রাক আধুনিক আইনের মতো শরীয়াহ নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধঃস্তন অবস্থায় নমিত করেছে। কিন্তু *উওম্যান অ্যান্ড জেন্ডার ইন ইসলাম-এ* লেয়লা আহমেদ যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, এই নারীরা আল আযহারের মধ্যযুগীয় *ফিকহের* চেয়ে অতীতের আরও অনেক সুন্নি মুসলিম সংস্কারকের মতো কোরান ও সুন্নাহর 'প্রকৃত ইসলামে' ফিরে যাবার প্রয়াস পাচ্ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, 'প্রকৃত ইসলাম' নারীসহ সকলের পক্ষে সাম্য ও ন্যায়বিচারের কথা বলেছে। তবে আহমেদ এটা স্বীকার করেছেন যে, তারা পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দলে টানার শিকার হতে পারে, এবং উল্লেখ করেছেন, কোনও ইসলামি শাসকদল ক্ষমতায় এলেই সাধারণভাবে নারীদের মর্যাদায় অবনতি মৌলবাদের দিকে চালিত করে।[৪৩] পরিস্থিতি খারাপ থাকলে পুরুষদের নারীদের চেয়ে বেশি অধিকার দিয়ে সুপ্ত অসন্তোষ দূর করাটা সহজ। তাসত্ত্বেও এটা ঠিক, ইসলামি পোশাক সব সময় নারী হৃদয়ে সমর্পণের ইঙ্গিত দেয় না। তুর্কি পণ্ডিত নিলুফার গোলে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বোরখাধারী নারীরা প্রায়শঃই জঙ্গী, স্পষ্টভাষী ও উচ্চ শিক্ষিত হয়ে থাকে।[৪৪] বহু বোরখাধারী নারী নতুন মৌলবাদী আক্রমণে সক্রিয় ও অনেক সময় বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আহমেদ এও বলেছেন যে, মিশরে ইসলামি পোশাক অতীতে প্রত্যাবর্তন ছিল না। ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে বহু নারীর পছন্দের পোশাকে ট্র্যাডিশনাল কিছু ছিল না। এক নতুন উদ্ভাবন ছিল এটা, দাদী-নানীদের জোব্বার চেয়ে (লম্বা হাতা ও স্কার্ট বাদে) পশ্চিমা ফ্যাশনের সাথেই বেশি মিল ছিল। প্রকৃতপক্ষেই, একে 'হাফওয়ে হাউস' ও আধুনিক সমাজে উত্তোরণের পোশাক বলা যেতে পারে। এই বছরগুলোতে আগের চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যায় নারীরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ইসলামি পোশাক বেছে নেওয়া নারীদের একটা বিশাল অংশ ছিল প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে অগ্রসর হতে পারা তাদের পরিবারের প্রথম সদস্য, গ্রামীন পটভূমি থেকে এসেছিল তারা। সুতরাং, তাদের পোশাক ছিল পরিবারের পোশাকের 'আধুনিক' রূপ। বড় বড় শহরের বিপজ্জনক আধুনিকতার মুখোমুখি হওয়ার পর–এর কসমোপলিটানিজম, আগ্রাসী ভোগবাদ, বৈষম্য, সহিংসতা ও জনসংখ্যাধিক্য–অতি সহজে পরাস্ত হতে পারত তারা। পোশাক তাদের উপরের

AMARBOI.COM

দিকে চলিষ্ণুতা দাবি করেছে, তবে এটা আবার তাদের অতীতের পোশাকের একটা ধারাবাহিকতারও যোগান দিয়েছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামি পরিচয় ও সম্প্রদায় অনেক সহজে ও শান্তিতে বেদনাদায়ক হতে পারত এমন একটি পরিবর্তন সম্পন্ন করায় তাদের সক্ষম করে তুলেছিল। আমরা দেখেছি, অতীতে ধর্ম মানুষকে একটি প্রচলিত জীবন ধারা ও আদর্শ থেকে অধিকতর আধুনিক জীবনে উত্তরণে সক্ষম করে তুলেছিল। ইসলামি পোশাক নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এমন কৌশলের অন্যতম হতে পারে।[৪৫]

অবশ্য সকল পরিবর্তনই বেদনাদায়ক। ১৯৭০-র দশকে ক্যাম্পাসে ইসলামি *জামাত* তরুণদের আন্দোলন ছিল, তরুণ সমাজকে তাদের হতাশা ও বিভ্রান্তি প্রকাশে সাহায্য করেছে।। অনেক সময়ই সহিংসতায় উপচে পড়েছে। ১৯৭০-র দশকে *জামাত* মিশরের ইসলামি আন্দোলনসমূহের ভেতর সবচেয়ে কম আগ্রাসী ছিল, কিন্তু অধিকতর উগ্র নেতাদের কেউ কেউ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ লাভে আরও কঠোর কৌশল গ্রহণ করবেন। আমেরিকান আরব বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক গাফনি আপার ঈজিপ্টের নতুন ইউনিভার্সিটি অভ মিনিয়ার *জামাহ আল-ইসলামিয়াহ*র উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন, এখানে ছাত্র সংগঠনটি তখনও অবিকশিত ছিল এবং ক্ষুদে ইসলামি ক্যাডারের প্রতিপক্ষ ছিল কম। ইসলামি যোন হিসাবে ছোট ছোট স্থান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু করেছিল তারা: বুলেটিন বোর্ড, কাফেটেরিয়ার একটা ছোট অংশ বা লনের স্টাডি স্পট। ১৯৭৭ সাল নাগাদ প্রতিপক্ষকে বিতাড়িত করার সুবাদে ইসলামিস্টরা ছাত্র ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। কলেজেস অভ আর্ট অ্যান্ড এডুকেশনের মিলিত মাঠে একটা মসজিদ স্থাপন করে তারা, ছাত্ররা এখানে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে মিলিত হত। ইসলামপন্থীরা জায়নামাজ বিছিয়ে, লাউডস্পিকারে প্রার্থনাকে উচ্চকিত করে জায়গাটা দখল করে নিয়েছিল; দাড়িঅলা ছাত্ররা সারাক্ষণ জায়গাটা দখলে রেখে কোরান পাঠ করত।[৪৬]

সেক্যুলার জায়গার এমনি আগ্রাসী অধিকারকে ইসলামকে নতুন করে গড়ে তোলার ও পাশ্চাত্যকৃত বিশ্বে তাকে স্থাপনের আনাড়ী প্রয়াস হিসাবে দেখা যেতে পারে। মিনিয়ার ইসলামপন্থীরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বজনীন সম্প্রসারণ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, মানচিত্র পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছিল তারা। ইসলামি পোশাক বেছে নেওয়ার মতো পার্থিব জায়গাকে মসজিদে পরিণত করা পূর্ণ সেক্যুলারকৃত জীবন যাত্রার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই শামিল বলা যেতে পারে। প্রায় শত বছর ধরে উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যান্য জাতির মতো মিশরিয়দের নিজস্ব ধারায় আধুনিক সভ্যতা গড়ে তোলার অযোগ্য ও ইতিহাস সৃষ্টির অনুপযুক্ত বলে মনে করে আসা

হয়েছে। এখন যত ছোট মাত্রায়ই হোক না কেন, ইসলামপন্থীরা একটা কিছু ঘটাতে যাচ্ছিল। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল তারা, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রান্ত থেকে আরও একবার লাইমলাইটে নিয়ে আসছিল। সিভিল রাইটস বা এথনিক মুভমেন্ট, নারীবাদ বা পরিবেশবাদের মতো মুসলিম সংগঠনগুলো তাদের কাছে শিল্পায়িত আধুনিকতার হাতে চাপা পড়া মূল্যবোধ ও বিভিন্ন ইস্যুকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল ও পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া বৈশ্বিক সমাজের সমরূপতার বিরুদ্ধে স্থানীয় ও নির্দিষ্টতার সজীবতার উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করছিল। অন্য প্রাক আধুনিক আন্দোলনের মতো এটা ছিল প্রতীকী বিউপনিবেশীকরণের প্রয়াস, পশ্চিমকে কেন্দ্র থেকে অপসারিত করার চেষ্টা ও মানবজাতির জন্যে আরও ভিন্ন সম্ভাবনা থাকার সত্য তুলে ধরা। সাদাত যতই পশ্চিমের কাছাকাছি হচ্ছিলেন ও ইসরায়েলের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করছিলেন (ইসলামিস্টদের কাছে যা মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার অল্টারইগো বলে বিবেচিত ছিল), শাসকগোষ্ঠীর সাথে বিচ্ছিন্নতা প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মিনিয়ায় ছাত্ররা আরও বেশি করে সহিংস হয়ে ওঠে। তারা চার্চে আক্রমণ চালায়, ইসলামি পোশাক পরতে অস্বীকৃতি জানানো ছাত্রদের হামলা করে এবং ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক সপ্তাহের জন্যে মিনিউসিপ্যাল গভর্নমেন্ট অফিস দখল করে রাখে। পুলিস তাদের একটি মসজিদ বন্ধ করে দিলে ছাত্ররা এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুর উপর মাঝরাস্তায় শুক্রবারের প্রার্থনা আয়োজন করে, গাড়িঘোড়া চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এরপর ইউনিভার্সিটি সিটি ও ছাত্রদের আবাসিক এলাকা দখল করে বসে এবং ক্রিশ্চান ছাত্রদের জিম্মি হিসাবে আটক করে। দুইদিন পরে বিদ্রোহ দমন করতে উপস্থিত হয় এক হাজার সৈনিক।[৪]

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত *জামাত আল-ইসলামিয়াহ*কে সমর্থন দিয়ে গেছেন সাদাত, কিন্তু মিনিয়ার ঘটনাপ্রবাহ তাঁর মত পাল্টে দেয়। ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৯, আপার ইজিপ্ট সফর করে মিনিয়া ও আসিউতের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির উদ্দেশে ভাষণ দেন তিনি: সরকার ধর্মের এমনি অপব্যবহার আর বরদাশত করবে না। জুন মাসে জেনারেল ইউনিয়ন অভ ইজিপশিয়ান স্টুডেন্টস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, বাজেয়াপ্ত করা হয় তাদের সকল সম্পত্তি। কিন্তু *জামাত* অদৃশ্য হয়ে যাবার মতো এত দুর্বল ছিল না। রমযানের উপবাসের শেষে মিশরের প্রধান প্রধান শহরে সভার আয়োজন করে তারা। কায়রোয় পঞ্চাশ হাজার মুসলিম প্রেসিডেনশল আবিদিন প্যালেসের বাইরে প্রার্থনায় মিলিত হয়ে আভাসে সাদাতকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে তাঁকে অবশ্যই আল্লাহ'র বিধান অনুযায়ী শাসন করতে হবে। গণ্যমান্য মুসলিম ব্রাদার ইউসুফ আল-কারাদাওয়ি সভার উদ্দেশে ভাষণ দিতে উপসাগর থেকে উড়ে

আসেন। এখন দ্বিতীয় রামসেসের মামি সংরক্ষণের দিকেই বেশি মনোযোগি সাদাতকে মনে করিয়ে দেন:

> মিশর মুসলিম দেশ, ফারাওর নয়...*জামাত ইসলামিয়াহ্*র তরুণরা মিশরের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী, অ্যাভিনিউ অভ দ্য পিরামিডস, থিয়েটার অভিনয়, চলচিত্র নয়...মিশর নগ্ন নারী নয়, বরং বোরখাধারী নারী যে স্বর্গীয় আইনের বিধিবিধান মেনে চলে। দাড়ি বেড়ে উঠতে দেওয়া মিশরিয় তরুণ...এটা আল-আযহারের দেশ![৪৮]

দমন ও নির্যাতনের নিজস্ব পরিণতি রয়েছে। ইসলামপন্থী ছাত্ররা এবার ক্যাম্পাসগুলোকে ইসলামি ঘাঁটিতে পরিণত করার প্রয়াস দ্বিগুন করে দিয়েছিল; সিনেমা, থিয়েটার ও বোরখাবিহীন নারীদের উপর আক্রমণের সংখ্যা বেড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও সংবাদ প্রচার শুরু করে তারা। শাসকগোষ্ঠী ও এর সেক্যুলারাইজড রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। *জামাত*কে সংগঠিত হতে দেওয়া হচ্ছিল না, তাদের অনেক সদস্য সহিংস *জিহাদে* নিবেদিত গোপন সেলে যোগ দিয়েছিল।

ইরানি বিপ্লবের পটভূমিতে এইসব ঘটনা ঘটেছিল। সাদাত পশ্চিমের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াসে গর্বের সাথে শাহকে বন্ধু ঘোষণা করার সময় মিশরে ইসলামি উগ্রপন্থীরা শাহর পতন ত্বরান্বিতকারী ইরানি বিপ্লবীদের বিভিন্ন সংবাদে উল্লসিত হত। ১৯৭৮-৭৯ সালের ইরানি বিপ্লব ছিল সন্ধিক্ষণ। ধর্মকে আক্রমণের মুখে বলে মনে করা সারা বিশ্বের মুসলিমদের পক্ষে অনুপ্রেরণা। খোমেনির বিজয় দেখিয়েছিল, ধ্বংস ইসলামের নিয়তি নয়; শক্তিশালী সেক্যুলার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে জিততে পারে। কিন্তু বিপ্লব বহু পশ্চিমাকে ত্রাস ও হতাশায় ভরিয়ে তুলেছিল। যেন বর্বরতা আলোকনের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছে। বহু অপাদমস্তক সেক্যুলারের চোখে খোমেনি ও ইরান যেন ধর্মের সমস্ত ভ্রান্তি এবং এমনকি অশুভকেই–মূর্ত করে তুলেছিল–কারণ বিপ্লব সাধারণভাবে পশ্চিম ও বিশেষ করে আমেরিকার প্রতি বহু ইরানির অনুভূত ঘৃণা তুলে ধরেছিল।

১৯৭০-র দশকের গোড়ার দিকে ইরান যেন সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে। আমেরিকান বিনিয়োগকারীরা ও ইরানি অভিজাত গোষ্ঠী শ্বেত বিপ্লবের কারণে সৃষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবাদে সমানভাবে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। তেহরানে আমেরিকান দূতাবাস, এসপিওনাজের কেন্দ্রের চেয়ে (বিপ্লবীরা যেমন দাবি করেছিল) বরং ধনী আমেরিকানদের ধনী ইরানিদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে

AMARBOI.COM

দেওয়ার জায়গা ছিল।[৪৯] তবে–আবার–কেবল অভিজাতগোষ্ঠীই লাভবান হয়েছিল। রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষ দরিদ্র হয়েছে। সমাজের উচ্চ মহলে অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, পাতি বুর্জোয়া ও শহুরে দরিদ্রদের মাঝে দেখা দিয়েছিল বঞ্চনা ও দুর্নীতি। ১৯৭৩–৭৪ সালের তেলের মূল্য বৃদ্ধির পর অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছাড়া আর কারও বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় ব্যাপক সৃষ্টি হয়েছিল মুদ্রাস্ফীতির। এক মিলিয়ন লোক হয়ে পড়েছিল বেকার, বিদেশি পণ্যের অবাধ আগমনে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে গেছে; ১৯৭৭ সাল নাগাদ মুদ্রাস্ফীতি এমনকি ধনীদেরও প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল। এমনি অসন্তোষ ও হতাশার পরিবেশে দুটি প্রধান গেরিলা সংগঠন সক্রিয় হয়ে ওঠে, আমেরিকান সামরিক ব্যক্তি ও পরামর্শকদের হত্যা করতে থাকে। বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে মুনাফা লুটছিল বলে মনে হওয়ায় ইরানে আমেরিকান অভিবাসীদের ব্যাপারেও যথেষ্ট অসন্তোষ কাজ করছিল। এই বছরগুলোতেই শাহ'র সরকার আগের চেয়ে ঢের বেশি স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল।[৫০]

বহু বিরূপ ইরানি ভিন্নভাবে সংকটের প্রতি সাড়াদানকারী *উলেমাদের* শরণাপন্ন হয়েছে। কুমে সবচেয়ে প্রবীন *মুজতাহিদ* আয়াতোল্লাহ শরিয়তমাদারি শাসকগোষ্ঠীর সাথে যেকোনও ধরনের সংঘাতের বিরোধিতা করেন, যদিও ১৯০৬ সালের সংবিধানের পুনরুজ্জীবন দেখতে উদগ্রীব ছিলেন তিনি। সংবিধানের কঠোর প্রয়োগ ও শাসকগোষ্ঠীর বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বহুবার কারাবরণকারী আয়াতোল্লাহ তালেকানি মেহের্দি বাযারগান ও আবোলহাসান বানি সদরের মতো সাধারণ সংস্কারকদের সাথে কাজ করেছেন, এঁরা ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র চাইলেও যাজকীয় শাসন দেখতে চাননি। তালেকানি যাজকগোষ্ঠীকে সরকারে সুবিধাজনক ভূমিকা দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না; তিনি নিশ্চিতভাবেই খোমেনির ক্যারিশম্যাটিক জুরিস্টের সরকার বেলায়েত-ই ফাকিহর দর্শনের সাথে একমত হননি।[৫১] কিন্তু খোমেনি তখনও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অটল ও আপোসহীন প্রতিরোধের প্রতীক ছিলেন। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ফায়যিয়াহ মাদ্রাসার ছাত্ররা ১৯৬৩ সালে খোমেনির গ্রেপ্তারের বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। ভবনে আক্রমণ চালিয়ে পুলিস একজন ছাত্রকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। সরকার *মাদ্রাসা* বন্ধ করে দেয়, এর নীরব শূন্য ক্যাম্পাস যেকোনও রকম অস্পষ্ট প্রতিবাদের প্রতি শাহ'র মৌলিক বিরোধিতা ও ধর্মের প্রতি তাঁর বৈরিতার প্রতীকী স্মারক হয়ে ছিল।[৫২] জনপ্রিয় কল্পনায় ক্রমবর্ধমানহারে তিনি ধর্মের শত্রু, শহীদ হুসেইনের ঘাতক, এবং লোকে যাঁকে ইমাম সম্বোধন করে সেই খোমেনির শত্রু ইয়াযিদের মতো হয়ে উঠছিলেন।

১৯৭৭ সালের সূচনায় অবশ্য সরকার খানিকটা নরম হয়, এবং জনতার চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নিয়েছে বলে মনে হয়। জিমি কার্টার এর আগের বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁর মানবাধিকারের প্রচারণা ও ইরানের আদালত ও কারাগারের উপর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিরূপ প্রতিবেদন হয়তো শাহকে চলমান অসন্তোষের প্রতি কিছুটা ছাড় দিতে বাধ্য করে থাকতে পারে। তবে সত্যিকার অর্থে তেমন পরিবর্তন হয়নি, তবে সেন্সরশিপ বিধি শিথিল করায় সাহিত্যের এক প্রবল ধারা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের হতাশা তুলে ধরেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ ছিল; কৃষকগণ কৃষিপণ্যের আমদানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, পল্লী অঞ্চলে তা দারিদ্র্য বাড়িয়ে দিয়েছিল; ব্যবসায়ীরা মুদ্রাস্ফীতি ও দুর্নীতি নিয়ে ভাবিত ছিল; আইনবিদগণ সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা হ্রাসকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।[৫৩] কিন্তু তারপরও বিপ্লবের কোনও আহ্বান ছিল না। ইরানের অধিকাংশ *উলেমা* শরিয়াতমাদারির নেতৃত্ব অনুসরণ করছিলেন, প্রথাগত নীরবতার পথ অবলম্বন করে গেছেন তাঁরা। যাজক গোষ্ঠী নয়, বরং ইরানের লেখকগণই ১৯৭৭ সালে সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বাঙ্ময় প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছিলেন। ১০ থেকে ১৯শে অক্টোবর তেহরানের গ্যেতে ইন্সটিটিউটে আনুমানিক ষাটজন নেতৃস্থানীয় ইরানি কবি ও লেখক হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকের সামনে তাঁদের রচনা পাঠ করেন। সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা সত্ত্বেও সাভাক এই কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে বাধা দিতে যায়নি।[৫৪] মনে হচ্ছিল যেন সরকার শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মেনে নিতে শিখছে।

কিন্তু নতুন এই কাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কবিতা সমাবেশের খুব বেশি দিন পরে নয়, শাহ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৭, বেশ কয়েকজন পরিচিত ভিন্নমতাবলম্বীকে গ্রেপ্তার করা হয়, ইরাকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই সাভাকের এজেন্টদের হাতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু বরণ করেন খোমেনির ছেলে মুস্তাফা।[৫৫] আরও একবার নিজেকে ইয়াযিদের ভূমিকায় স্থাপন করেছিলেন শাহ। খোমেনি ইতিমধ্যেই শিয়া আভা আবৃত হয়েছিলেন, নির্বাসিত গোপন ইমামের মতো লাগতে শুরু করেছিল তাঁকে; এবার ইমাম হুসেইনের মতো স্বৈরাচারী শাসকের হাতে তাঁর সন্তান মৃত্যু বরণ করেছেন। সারা ইরান জুড়ে জনতা প্রথাগত ঢঙে মুস্তাফা খোমেনির মৃত্যুতে শোক করার জন্যে কাঁদতে কাঁদতে বুক চাপড়ে সমবেত হয়েছিল। তেহরানে শোকপালনকরীদের উপর আক্রমণ চালায় পুলিস; ১৫, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর তেহরানে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠানে আরও ধরপাকড় ও মারধরের ঘটনা ঘটে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের

AMARBOI.COM

আলামত চোখে পড়েনি। নাজাফে খোমেনি, মুস্তাফাকে যিনি 'চোখের মণি' ডাকতেন, নীরব ছিলেন।

এদিকে ১৩ই নভেম্বর, ১৯৭৭ প্রেসিডেন্ট কার্টারের সাথে আলোচনার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান শাহ। প্রতিদিন আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা ইরানি ছাত্ররা ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের সামনে শাহ'র উদ্দেশে শ্লোগান দেওয়ার জন্যে সমবেত হতে শুরু করে। এক আনুষ্ঠানিক ভোজ সভায় ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিশেষ সম্পর্কের গুরুত্বের উপর আবেগময় ভাষণ দেন কার্টার, ইরানকে 'বিশ্বের উত্তাল এক কোণে স্থিতিশীলতার দ্বীপ'[৫৬] আখ্যায়িত করেন তিনি। ৩১শে ডিসেম্বর ভারত সফর বিরতি দিয়ে ইরানে ঝটিকা সফরে তেহরানে যান কার্টার, এখানেও সরকারের প্রতি তাঁর সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কার্টার শাহ'র প্রতি তাঁর আস্থার কথা প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর তেহরান সফর পবিত্র মহররম মাসের সাথে মিলে গিয়েছিল, যখন কারবালার ট্র্যাজিডি সবার মনে জ্বলজ্বল করতে থাকে, এই বছর খোমেনির কথা ভাবছিল সবাই: শাহ সবে মুস্তাফা খোমেনির প্রথাগত শোকের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষাণা করেছিলেন, সাধারণত মৃত্যুর চল্লিশ দিন পরে এটা অনুষ্ঠিত হত। এমনি ক্রান্তিকালে শাহ'র শাসনকে সমর্থন করার জন্যে বিশেষ সফর করে নিজেকে নিখুঁতভাবে মহাশয়তানের ভুমিকায় স্থাপন করে বসেন কার্টার।

বিপ্লব চলাকালে ও এর পরবর্তী সময়ে তাদের দেশকে শয়তানসুলভ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে শুনে আমেরিকানরা ধাক্কা খেয়েছিল। এমনকি যারা ১৯৫৩ সালের সিআইএ অভ্যুত্থানের পর থেকেই ইরানি জনগণের অনেকের মনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভের কথা জানত তারাও এই দানবীয় ইমেজারিতে বিতৃষ্ণা বোধ করেছে। আমেরিকার নীতি যত ভুলই হয়ে থাকুক, এভাবে নিন্দিত হওয়ার মতো সে নয়। এতে করে ইরানি বিপ্লবীদের সম্পর্কে ধর্মান্ধ, বিকারগ্রস্ত ও ভারসাম্যহীন বলে প্রচলিত ধারণাকেই যেন নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ পাশ্চাত্য জনগণ মহাশয়তানের ইমেজকে ভুল বুঝেছে। খৃস্টধর্মে স্যাটান এক মহাপরাক্রমশালী অশুভ চরিত্র, কিন্তু ইসলামে সে অনেক বেশি সামালযোগ্য। কোরান এমনকি এমনও আভাস দিয়েছে যে শেষ বিচারের দিনে[৫৭] শয়তানকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, আল্লাহ'র সর্ববিজয়ী মহত্ত্বের উপর এমননি তার আস্থা। যেসব ইরানি আমেরিকাকে 'মহাশয়তান' বলেছে, তারা আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দানবীয়ভাবে খারাপ বলছিল না, বরং আরও স্পষ্ট কিছু। জনপ্রিয় শিয়ামতবাদে প্রলুব্ধকারী শয়তান বরং চিরন্তনভাবে অদৃশ্য জগতের আধ্যাত্মিক মূল্য উপলব্ধিতে অক্ষম হাস্যকর এক চরিত্র। এক কাহিনীতে বলা হয়েছে মানবজাতির অধিকার

AMARBOI.COM

নিয়ে আল্লাহ'র কাছে অভিযোগ করেছে সে, কিন্তু সহজেই তুচ্ছ উপহারে সামাল দেওয়া গেছে তাকে। পয়গম্বরদের বদলে বরং গণকদের নিয়েই বেশি সুখে থাকে শয়তান, বাজারই তার মসজিদ, গণস্নানাগারে সে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে, আল্লাহকে কামনা করার বদলে নারী ও মদ তালাশ করে।[৫৮] প্রকৃতপক্ষেই নিরাময় অযোগ্যভাবে তুচ্ছ সে, বাহ্যিক *(যাহির)* বিশ্বের বলয়ে চিরকালের মতো বন্দি হয়ে গেছে, অস্তিত্বের আরও গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ মাত্রার অস্তিত্ব দেখতে অপারগ। বহু ইরানির চোখে মহাশয়তান আমেরিকা ছিল 'মহাগুরুত্বহীনকারী।' পশ্চিমের বার, ক্যাসিনো ও সেক্যুলারিস্ট রেওয়াজ উত্তর তেহরানের আমেরিকান রীতিকে মূর্ত করে যা স্বেচ্ছায় জীবনকে অর্থ প্রদানকারী একমাত্র বাস্তবতা গোপনকে *(বাতিন)* উপেক্ষা করে বলে মনে হয়। এছাড়াও, শয়তান আমেরিকা শাহকে প্রলুব্ধ করে ইসলামের প্রকৃত মূল্যবোধ থেকে সরিয়ে এক উপরিগত সেক্যুলারিজমের জীবনে টেনে নিয়ে গেছে।[৫৯]

ইরানি শিয়াবাদ সবসময়ই দুটি আবেগে অনুপ্রাণিত ছিল: সামাজিক ন্যায়বিচার ও অদৃশ্য *(আল-গায়িব)*। শত শত বছর ধরে পাশ্চাত্যবাসী যেখানে যত্নের সাথে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিতে অনুভূত পার্থিব জগতের যৌক্তিক রীতির উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এসেছে, সেখানে অন্যান্য প্রাক আধুনিক জাতির মতো ইরানি শিয়ারা কাল্ট ও মিথ অনুপ্রাণিত এক গোপন *(বাতিন)* জগতের বোধ লালন করেছে। শ্বেত বিপ্লবের সময় ইরানিরা বিদ্যুৎ, টেলিভিশন ও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা লাভ করেছিল; কিন্তু দেশের ধর্মীয় পুনর্জাগরণ দেখিয়েছে যে, বহু লোকের কাছে এইসব বাহ্যিক *(যাহির)* সাফল্য স্রেফ যথেষ্ট ছিল না। আধুনিকায়ন অত্যন্ত দ্রুতগতির ও অনিবার্যভাবে উপরিগত ছিল। বহু ইরানি তখনও *বাতিনের* তৃষ্ণা বোধ করেছে, মনে করেছে এটা ছাড়া তাদের জীবনের কোনও মূল্য বা তাৎপর্য নেই। আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ উইলিয়াম বীম্যান যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, জীবনের বাস্তুগত তলে আটকা পড়ার অনুভূতি সম্পন্ন একজন ইরানি মনে করেছে তার আত্মা খোয়া গেছে। একটি খাঁটি অন্তস্থঃ জীবনের জন্যে প্রয়াস এখনও ইরানি সমাজের পরমমূল্য ধারণ করে, এত বেশি যে অন্য একজনকে সবচেয়ে সেরা প্রশংসা করতে গিয়ে বলতে পারে 'তার অন্তর *(বাতিন)* ও বাহির *(যাহির)* একই রকম।'[৬০] আধ্যাত্মিকতার জোরাল অনুভূতি ছাড়া বহু ইরানি নিজেদের দিশাহারা মনে করেছে। শ্বেত বিপ্লবের সময় কারও কারও মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে বস্তুবাদ, ভোগ্যপণ্য, বিনোদনের বিদেশী কেতা ও বিদেশী মূল্যবোধ আরোপের ফলে তারা পাশ্চাত্য-আসক্ত হয়ে পড়েছে। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোৎসাহ সমর্থন পুষ্ট শাহকে যেন জাতির আধ্যাত্মিকতার উৎস ইসলাম ধ্বংসের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে

AMARBOI.COM

হয়েছে। খোমেনিকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন তিনি, ফায়যিয়াহ মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছেন, যাজকদের অপমান করেছেন, তাঁদের আয় হ্রাস করেছেন এবং ধর্মতত্ত্বের ছাত্রদের হত্যা করেছেন।

ইরানি বিপ্লব স্রেফ রাজনৈতিক ছিল না। নিশ্চিতভাবেই শাহ'র নিষ্ঠুর ও স্বৈরাচারী শাসন ও অর্থনৈতিক সংকট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে: সেগুলো ছাড়া অভ্যুত্থান হত না। কেবল শাহ'র কবল থেকে উদ্ধার লাভ করতেই আধ্যাত্মিক অস্থিরতা বোধ করেনি এমন বহু ইরানি সেক্যুলারিস্টও শেষ পর্যন্ত *উলেমাদের* সাথে যোগ দেবে; তাদের সমর্থন ছাড়া হয়তো বিপ্লব সফল হত না। তবে ধর্মকে বাতিল করে দেওয়া সেক্যুলারিস্ট রীতির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ছিল এটা, এবং সাধারণ ইরানিরা ভেবেছিল জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মহাশয়তান হিসাবে তুলে ধরার ভেতর দিয়েই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এটা। সঠিক বা ভুলভাবে অনেকেই বিশ্বাস করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উষ্ণ সমর্থন ছাড়া শাহ কখনওই এমন আচরণ করতেন না। পরিকল্পিতভাবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নকারী সেক্যুলার রাজনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গর্ব বোধ করার কথা জানা ছিল তাদের। তারা জানতে পেরেছিল, বহু পশ্চিমা মনে করে কেবল *যাহিরের* প্রতি জোর দেওয়াই প্রশংসার্হ প্রয়োজন। এর পরিণাম, তারা যতদূর বুঝতে পেরেছিল, রাতের ফাঁকা সুখবাদী দক্ষিণ তেহরান। বহু আমেরিকানের ধার্মিক হওয়ার ব্যাপারে ইরানিরা সজাগ থাকলেও তাদের বিশ্বাস কোনও অর্থ প্রকাশ করে বলে মনে হয়নি। জিমি কার্টারের 'ভেতর' আর 'বাহির' 'একরকম' ছিল না। তারা বুঝতে পারেনি ১৯৭৮ সাল নাগাদ নিজ দেশের লোককে হত্যা করতে শুরু করেছেন এমন একজন শাসককে কীভাবে একজন প্রেসিডেন্ট সমর্থন করতে পারেন। 'কার্টার শাহ'র সমর্থন করবেন এটা আমরা আশা করিনি, কারণ তিনি ধার্মিক মানুষ, মানবাধিকার রক্ষার দাবি তুলেছেন,' বিপ্লবের পর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন আয়াতোল্লাহ হুসেইন মন্তেজেরি। 'কেমন করে একজন ধার্মিক ক্রিশ্চান কার্টার শাহ'র পক্ষাবলম্বন করতে পারলেন?'[৬১]

পবিত্র মুহররম মাসে নববর্ষের আগে আগে কার্টার শাহ'র শাসনকে চাঙা করে তুলতে তাঁর সাথে দেখা করেন যখন, চেষ্টা করলেও এর চেয়ে নিখুঁতভাবে নিজেকে খলনায়কের ভূমিকায় স্থাপন করতে পারতেন না তিনি। পরবর্তী উত্তাল বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার চরম কারণে পরিণত হয়েছিল। রাস্তার দেয়াল লিখন কার্টারকে ইয়াযিদের সাথে এক করে দেখেছে, শাহকে হুসেইন ও তাঁর ক্ষুদে সেনাদলকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে পাঠানো সেনাপতি সীমার। রাস্তার এক ড্রয়িংয়ে খোমেনিকে মোজেস, শাহকে

ফারাও হিসাবে হিসাবে আঁকা হতে দেখা গেছে, আর কার্টার হলেন ফারাও/শাহ'র পূজিত মূর্তি।[৬২] মনে করা হয়েছিল যে আমেরিকা শাহকে দূষিত করেছে, এখন ক্রমবর্ধমানহারে শিয়া আলোকে সিক্ত খোমেনি বর্তমান অপবিত্র স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ইসলামি বিকল্প হিসাবে উপস্থিত হচ্ছিলেন।

১৯৭৮ সালের মুহররমের শেষে শাহ্ আবারও নিজেকে শিয়াদের প্রতিপক্ষ হিসাবে তুলে ধরলেন। ৮ই জানুয়ারি আধা সরকারী পত্রিকা *এত্তেলাত* খোমেনির বিরুদ্ধে একটি অপমানকর নিবন্ধ প্রকাশ করে, সেখানে তাঁকে 'অ্যাডভেঞ্চারার, বিশ্বাসবর্জিত ও উপনিবেশবাদের সাথে সম্পর্কিত' বলে উল্লেখ করা হয়। নিবন্ধে জোরের সাথে বলা হয়, তিনি অসচ্চরিত্র জীবন যাপন করেন, ব্রিটিশদের গুপ্তচর ছিলেন, এমনকি এখনও শ্বেত বিপ্লবকে খাট করতে উদগ্রীব বিট্রিশদের কাছ থেকে মাসোহারা নেন।[৬৩] শাহর পক্ষে এই বিদ্রূপাত্মক ও অবিশ্বাস্য আক্রমণ ছিল মারাত্মক ভুল। পর দিন কুমের পথে-ঘাটে চার হাজার ছাত্র নেমে আসে: ১৯০৬ সালের সংবিধান প্রত্যাবর্তন, বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, ফায়যিয়াহ মাদ্রাসা খুলে দেওয়া ও খোমেনিকে ইরানে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়ার দাবি তোলে তারা। কিন্তু ওরা পেয়েছিল গণহত্যা। নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি বর্ষণ করে পুলিস, এবং *উলেমা*দের মতে সত্তর জন ছাত্র নিহত হয় (যদিও সরকার মাত্র দশ জন মারা গেছে বলে দাবি করেছিল)।[৬৪] ১৯৬৩ সালের দাঙ্গার পর এটাই ছিল ইরানের ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী দিন, শাহ'র জন্যে এটা ছিল শেষের সূচনা। উইলিয়াম বীম্যান যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, ইরানিরা অনেক কিছু সহ্য করতে পারলেও অপবিশ্বাসের একটি মাত্র কাজ ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় ভাঙন ডেকে আনতে পারে। একবার এই সীমারেখা অতিক্রম করা হলে আর ফিরে যাবার উপায় থাকে না।[৬৫] লক্ষ লক্ষ সাধারণ ইরানির কাছে কুমে সাম্প্রতিক মিছিলকারীদের উপর গুলি বর্ষণের নির্দেশ দিয়ে শাহ সেই রেখা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। প্রবল ক্রোধ নিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের জবাব দিয়েছিল তারা, শুরু হয়েছিল বিপ্লবের।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বুদ্ধিজীবী, লেখক, আইনবিদ ও ব্যবসায়ীরা শাহ শাসনের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। অবশ্য জানুয়ারি মাসে শিয়াহদের উপর এই প্রকাশ্য হামলার পর নেতৃত্ব *উলেমা*দের হাতে চলে যায়। হত্যাকাণ্ড এতটাই হতবুদ্ধিকর ছিল যে, এমনকি আয়াতোল্লাহ শরিয়তমাদারি পর্যন্ত তাঁর স্বভাবগত শান্তিবাদ ত্যাগ করেন, কঠোর ভাষায় এই গুলিবর্ষণের নিন্দা করেন তিনি। সারা দেশের *উলেমা*দের কাছে একটি সঙ্কেত পৌঁছে দেয় তা। কোনওকিছুই পরিকল্পিত বা আগে থেকে স্থির করা ছিল না। নাজাফ থেকে কোনও রকম কৌশলগত

AMARBOI.COM

নির্দেশনা জারি করেননি খোমেনি। কিন্তু *এত্তেলাতের* নিবন্ধ প্রকাশের মুহূর্ত থেকেই অভ্যুত্থানের অদৃশ্য প্ররোচক ও অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়েছিল তিনি। সংগ্রাম কোনও মৃত্যুর চল্লিশ দিন পরে অনুষ্ঠিত প্রথাগত শোকের দিনে কেন্দ্রিভূত হয়েছিল। সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে পরিণত হয়েছিল এগুলো, এই সময় আরও হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হত; এবং চল্লিশ দিন পরে শেষের শহীদদের স্মরণে লাগাতার মিছিল অনুষ্ঠিত হত। বিপ্লব অদম্য গতিবেগ অর্জন করেছিল। প্রতিটি বিক্ষোভের মধ্যবর্তী চল্লিশ দিন সময় নেতাদের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দিত, বিস্তারিত পরিকল্পনা বা প্রচারণা ছাড়াই নির্ধারিত সময়ে জানতা বুঝে যেত ঠিক কখন সমবেত হতে হবে।

এভাবে ১৮ই ফেব্রুয়ারি, কুম হত্যাকাণ্ডের চল্লিশ দিন পরে *উলেমা* ও *বাজারি*দের নেতৃত্বে শোকার্তদের মিছিল মৃতদের জন্যে শোক পালনের জন্যে রাস্তাঘাটে ভিড় করে নেমে আসে ইরানিরা। ছাত্রী, যাদের অনেকেই শাসকগোষ্ঠী থেকে নিজেদের পৃথক করার জন্যে বোরখা পরেছিল, আর *বাজার* থেকে আগত চাদরে ঢাকা নারীরা প্রায়ই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছে, পুলিসকে যেন সরাসরি তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার চ্যালেঞ্জ করেছে। পুলিস গুলি করেছেও, ফলে আরও শহীদ হয়েছে। বিশেষ করে তাব্রিযের সংঘাত ছিল মারাত্মক। এখানে অন্তত একশো শহীদ প্রাণ হারিয়ে থাকতে পারে এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ছয়শো জনকে। মিছিল থেকে বের হয়ে সিনেমা হল, ব্যাংক ও মদের দোকানে আক্রমণ করেছে (মহাশয়তানের প্রতীক) তরুণরা, কিন্তু কোনও মানুষের উপর হামলা চালানো হয়নি।[৬৬] চল্লিশ দিন পর, ৩০শে মার্চ, আরও একবার তাব্রিযের শহীদদের জন্যে শোক পালন করতে রাস্তায় নেমে আসে শোকপালনকারীরা। এইবার ইয়াযদ-এ মসজিদ থেকে বের হয়ে আসামাত্র আনুমানিক এক শো বিক্ষোভকারীকে হত্যা করা হয়। ৮ই মে, ইয়াযদের শহীদদের সম্মানে নতুন করে আবার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।[৬৭] রাজনৈতিক বন্দিতে ঠাসাঠাসি অবস্থা হয়েছিল জেলখানাগুলোর। মৃত্যুর সংখ্যা নিজ জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো শাসকগোষ্ঠীর নগ্ন আগ্রাসন তুলে ধরেছে।

এটা ছিল চূড়ান্ত আবেগের নাটক। বিক্ষোভকারীরা 'চারদিকে কারবালা, প্রত্যেক দিনই আশুরা'[৬৮] লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করত। শাহাদৎ বরণকারীদের জন্যে প্রযুক্ত শব্দ *শহীদ*-এর মানে ক্রিশ্চান ধর্মের 'সাক্ষী'র মতো। মৃত্যুবরণকারী বিক্ষোভকারীরা অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতের মূল্যবোধকে রক্ষা করতে ইমাম হুসেইনের মতো স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার দায়িত্বের সাক্ষ্য বহন করছে, শাসকগোষ্ঠী যাকে লঙ্ঘন করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হচ্ছে। লোকে বিপ্লব প্রসঙ্গে পরিবর্তনকারী ও পরিশুদ্ধকারী অভিজ্ঞতা হিসাবে কথা বলত; তাদের মনে হয়েছে

AMARBOI.COM

'নিজেদের ও তাদের সমাজকে দুর্বল করে তোলা বিষ থেকে বিশুদ্ধ করে তুলছে তারা এবং সংগ্রামে আবার নিজেদের মাঝে ফিরে যাচ্ছে। এটা স্রেফ রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহারকারী কোনও বিপ্লব ছিল না। বিশেষ করে দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের মাঝে শিয়া পুরাণই একে অর্থ ও পথনির্দেশ দিয়েছে, আরও কঠোর সেক্যুলারিস্ট আদর্শের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অটল থাকত তারা।'[৬৯]

জুন ও জুলাই মাসে অবাধ নির্বাচন ও বহুদলীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে শাহ কিছু ছাড় দেন। এই মাসগুলোয় বিক্ষোভকারীরা অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। একটা বিরতি চলছে বলে মনে হচ্ছিল, এপর্যন্ত শোক মিছিলে যোগ না দিলেও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কেবল মৌখিক প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভকারীদের সমর্থন দিয়ে আসা পাশ্চাত্য শিক্ষিত সেক্যুলারিস্ট ও বুদ্ধিজীবীরা ধরে নিয়েছিল যে যুদ্ধে জেতা গেছে। কিন্তু ১৯শে আগস্ট, ১৯৫৩ সালের পাহলবী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পঁচিশতম বার্ষিকীতে আবাদানের রেক্স সিনেমায় এক অগ্নিসংযোগের ঘটনায় চারশো মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ঘটনার জন্যে সাথে সাথে সাভাককে দায়ী করা হয়। দশ হাজার শোককারী নিমেষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেয়, 'শাহর মৃত্যু চাই! তাকে পুড়িয়ে মারো!' শ্লোগান দিতে থাকে তারা।[৭০] ওয়াশিংটন, লস অ্যাঞ্জেলিস ও দ্য হেগে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভের আয়োজন করে ইরানি ছাত্ররা। শাহ আরও ছাড় দেন: মজলিসের বিতর্ক আরও মুক্ত হয়, শৃঙ্খলাপূর্ণ বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হয়, কিছু সংখ্যক ক্যাসিনো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আবার ইসলামি ক্যালেন্ডার চালু করা হয়।[৭১]

কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল। রমযানের শেষ সপ্তাহে মুসলিমদের সাধারণত মসজিদের রাত্রি জাগরণে ব্যস্ত থাকার সময় চৌদ্দটি ইরানি শহরে বিক্ষোভ চলে, এইসময় পঞ্চাশ থেকে একশো জন লোকের প্রাণহানি ঘটে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর, রমযানের শেষ দিনে তেহরানে এক বিশাল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। জনতা রাস্তায় নামাজের ভঙ্গিতে নত হয়, সৈনিকদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেয় তারা। এই প্রথমবারের মতো গুলিবর্ষণ থেকে বিরত থাকে পুলিস। এই পর্যায়ে–খুবই তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন–মধ্যবিত্ত শ্রেণী যোগ দিতে শুরু করে। মিছিলকারীদের একটা ছোট দল কিছু আবাসিক এলাকায় মিছিল করে এগোনোর সময় চিৎকার করে বলতে থাকে: 'স্বাধীনতা! মুক্তি! এবং ইসলামি সরকার!' ৭ই সেপ্টেম্বর, উত্তর তেহরান থেকে পার্লামেন্ট ভবনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায় এক বিশাল মিছিল, খোমেনি ও শরিয়তির ছবিঅলা প্ল্যাকার্ড ছিল তাদের হাতে, পাহলভী বংশের অবসান ও ইসলামি সরকারের দাবি করছিল তারা।[৭২] শরিয়তি, বাযারগান ও বানি সদরের মতো সাধারণ চিন্তকগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত

অভিজাতগোষ্ঠীকে আধুনিক ইসলামি শাসনের সম্ভবনা সম্পর্কে প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি খোমেনি থেকে ভিন্ন হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদারপন্থীরা বুঝতে পারছিল যে তৃণমূল পর্যায়ে সমর্থন রয়েছে তাঁর তাদের পক্ষে যা কোনওদিনই অর্জন করা সম্ভব নয়, শাহ থেকে নিস্তার পেতে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল তারা। সেক্যুলারিস্ট শাসন ইরানে মহা বিপর্যয়কর ছিল, ভিন্ন কিছুর জন্যে তৈরি ছিল তারা।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিত্যাগ করার পর শাহ'র আর কোনও আশাই ছিল না। নিশ্চয়ই বিপদ টের পেয়েছিলেন তিনি। ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ভোর ৬:০০ টায় সামরিক আইন জারি করা হয়, সকল মহাসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সেদিন সকালে আরেকটি শান্তিপূর্ণ র‍্যালিতে যোগ দিতে জালেহ স্কোয়ারে সমবেত হওয়া বিশ হাজার বিক্ষোভকারীর একথা জানা ছিল না। তারা সভা ভাঙতে অস্বীকৃতি জানালে সৈনিকরা গুলি বর্ষণ করে, ফলে সম্ভবত নয় শো লোক প্রাণ হারায়। এই হত্যাকাণ্ডের পর জনতা মহাক্ষিপ্ত হয়ে পথে পথে ব্যারিকেড তৈরি করে দালানকোঠায় আগুন ধরিয়ে দেয়, এদিকে ট্যাংক থেকে তাদের উপর গুলি বর্ষণ করতে থাকে সৈন্যরা।[৭৩] ১০ই সেপ্টেম্বর, রোববার, সকাল ৮:০০টায় প্রেসিডেন্ট কার্টার ক্যাম্প ডেভিড থেকে শাহকে ফোন করে তাঁর প্রতি সমর্থনের নিশ্চয়তা দেন। এর কয়েক ঘণ্টা পর হোয়াইট হাউস এই ফোনালাপ অনুষ্ঠানের কথা নিশ্চিত করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার বিশেষ সম্পর্কের কথা আবার নিশ্চিত করা হয়। বলা হয় যে, জালেহ স্কয়ারে প্রাণহানির জন্যে প্রেসিডেন্ট দুঃখ প্রকাশ করলেও তিনি শাহ কর্তৃক সদ্য সূচিত রাজনৈতিক উদারীকরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।[৭৪]

কিন্তু জালেহ হত্যাকাণ্ডের পর এমনকি মহাশয়তানের সমর্থনও আর শাহকে রক্ষা করতে পারেনি না। তেল শ্রমিকরা এবার ধর্মঘটে যোগ দিল; এবং অক্টোবরের শেষ নাগাদ আগের তুলনায় তেল উৎপাদন ২৮ শতাংশ হ্রাস পায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নীরব থাকা গেরিলা গ্রুপগুলো আবার সামরিক নেতা ও সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে শুরু করে। ৪ঠা নভেম্বর ছাত্ররা তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ থেকে শাহ'র মূর্তি টেনে নামায়: ৫ই নভেম্বর *বাজার* বন্ধ হয়ে যায়, ছাত্ররা ব্রিটিশ দূতাবাসে হামলা করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের অফিস, সিনেমা হল ও মদের দোকান বন্ধ হয়ে যায়।[৭৫] এই দফা সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করেনি।

এই সময়ের ভেতর ইরাকি সরকার তেহরানের চাপের প্রতি সাড়া দিয়ে খোমেনিকে নাজাফ থেকে বাহিষ্কার করেছিল, প্যারিসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি।

AMARBOI.COM

এখানে সম্প্রতি পুনর্জাগরিত ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেতারা তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন, এক বিবৃতিতে খোমেনি এবং তাঁরা উভয়পক্ষই ১৯০৬ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার কথা বলেন। ২রা ডিসেম্বর, মুহররম মাস এগিয়ে আসার সাথে সাথে রীতি মোতাবেক আবেগী নাটক *রাওদাহ* ও হুসেইনের শাহাদৎ বার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানের বদলে জনগণের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা উচিত বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন খোমেনি। এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রেডিক্যাল সম্ভাবনা সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল। মুহররমের প্রথম দিন রাতে লোকেরা সরকারের কার্ফ্যু উপেক্ষা করে শাহাদৎ বরণে প্রস্তুতির প্রতীক হিসাবে শাদা কাফনের কাপড় পরে রাস্তায় ছুটাছুটি করতে থাকে। অন্যরা ছাদ থেকে লাউডস্পিকারে শাহ বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। বিবিসি দাবি করে যে কেবল এই কয়েক দিনের পুলিস ও সেনাবাহিনীর হাতে সাত শো লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল।[৭৬] ৮-ই ডিসেম্বর তেহরানের উত্তরে বেহেশত-ই যাহরা কবরস্থানে সমবেত হয় ছয় হাজার মানুষ, এখানে বহু শাহীদকে কবর দেওয়া হয়েছিল, 'শাহর মৃত্যু চাই!' শ্লোগান দিচ্ছিল তারা। ইস্ফাহানে বিশ হাজার মানুষ রাস্তায় মিছিল করে, তারপর ব্যাংক, সিনেমা হল ও আমেরিকান টেকনিশিয়ানদের আবাস বিভিন্ন ফ্ল্যাটে আক্রমণ চালায়। ৯ই ডিসেম্বর, আশুরার পূর্বক্ষণে সদ্য কারামুক্ত আয়াতোল্লাহ তালেকানি এক জাঁকাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন, মিছিলটি টানা ছয় ঘণ্টা তেহরানের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে: ৩০০,০০০ থেকে দেড় মিলিয়ন লোক তাতে অংশ নেয়, নীরবে চারজন চারজন করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটে যায়। তাব্রিয, কুম, ইস্ফাহান ও মাশাদেও শান্তিপূর্ণ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।[৭৭]

খোদ আশুরার দিন তেহরানে আরও বড় আকারের মিছিল অনুষ্ঠিত হয়, আট ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল সেটি, প্রায় দুই মিলিয়ন লোক তাতে অংশ নিয়েছিল। মিছিলকারীরা সবুজ, লাল ও কালো পতাকা (যথাক্রমে ইসলাম, শাহাদৎ ও শিয়ার প্রতীক) বহন করে; বিক্ষিপ্তভাবে 'ইরানের স্বৈরাচারকে আমরা খুন করব!' ও 'ইরানে ইয়াঙ্কি শক্তির নাশ ঘটাব!' লেখা ব্যানারও ছিল সেখানে। আগের যেকোনও সময়ের তুলনায় ঢের বেশি ঐক্যবদ্ধ ইরানি জনগণ পাহলভী রাষ্ট্র থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে পারবে, এমন একটা আস্থা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছিল।[৭৮] অনেকেরই মনে হয়েছে যেন ইমাম হুসেইন স্বয়ং সেই আশুরায় তাদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গোপন ইমামের মতো খোমেনি দূর থেকে নির্দেশনা দিচ্ছেন তাদের।[৭৯] বিক্ষোভ শেষে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: খোমেনির প্রতি ইরানের নতুন নেতা হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়, শাহ'র পতন না ঘটা পর্যন্ত ইরানিদের প্রতি ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয়।[৮০]

AMARBOI.COM

তিন দিন পর সেনাবাহিনী শাহপন্থী মিছিল আয়োজনের চেষ্টা চালায়, বিপ্লবী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাত আরও সহিংস রূপ নেয়। সাংবিধানিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে সুপরিচিত উদারপন্থী শাহপুর বখতিয়ারকে নিয়োগ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার শেষ চেষ্টা করেন শাহ। সাভাক ভেঙে দেওয়ার, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দান এবং তাঁর অর্থনৈতিক ও বিদেশ নীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এসব হয়েছিল এক বছর দেরিতে। চাপের মুখে জনগণ এত অসংখ্য প্রতিশ্রুতির কথা শুনেছিল যে, এইসব আর বিশ্বাস করতে পারেনি। ৩০শে ডিসেম্বরকে (ইসলামি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কুম হত্যাকাণ্ডের প্রথম বার্ষিকী ছিল) শোক দিবস ঘোষণা করেন খোমেনি। মাশাদ, তেহরান ও কাযরিনে আরও হত্যার ঘটনা ঘটে; শেষের এই শহীদদের ছবি খোমেনির পাশপাশি প্রদর্শিত হচ্ছিল। ২৩শে ডিসেম্বর মাশাদে সৈনিকরা খোমেনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে সংঘর্ষ বাধে, নিহত হয় বারজন সাধারণ নাগরিক। সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে সমবেত হয় জনগণ, সৈন্যদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তারা, জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত তরুণরা ছিল তাদের নেতৃত্বে। সেনাবাহিনী পিছু হটতে শুরু করে, জনতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে মাটি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে তারা। পরের দিন এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নেমে আসে।[৮১]

মধ্য জানুয়ারির দিকে সবকিছুর অবসান ঘটে। প্রধানমন্ত্রী বখতিয়ার শাহ'র বিদায় নিয়ে আলোচনা করেন, মুখ রক্ষা করতে একে সাময়িক বলে ঘোষণা করা হয়। রাজ পরিবার মিশরে চলে যায়, তাদের স্বাগত জানান সাদাত। বখতিয়ার রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দান, সাভাক বিলোপ, ইসরায়েল ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে তেল বিক্রিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও উল্লেখযোগ্য সামরিক ব্যয় হ্রাসের ঘোষণা দিয়ে বিপ্লব ঠেকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। জনতা, তাদের ভাষায়, ইমামের প্রত্যাবর্তনের জন্যে ফেটে পড়ছিল। ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ খোমেনিকে ফিরে আসার অনুমতি দিতে বাধ্য হন বখতিয়ার।

তেহরানে খোমেনির প্রত্যাবর্তন ছিল বিশ্বকে চিরতরে বদলে দিয়েছে বলে মনে হওয়া বাস্তিলের পতনের মতো সেইসব প্রতীকী ঘটনার মতো। ইরান ও ইরানের বাইরের অঙ্গীকারাবদ্ধ সেক্যুলারিস্টদের কাছে এটা ছিল এক অন্ধকার মুহূর্ত, যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে কুসংস্কারের মহাবিজয়। কিন্তু ইসলাম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে ভেবে ভীত সুন্নি বা শিয়া নির্বিশেষে বহু মুসলিমের কাছে এটা ছিল এক আলোকিত পুনর্জাগরণ। কোনও কোনও ইরানি শিয়ার কাছে খোমেনির প্রত্যাবর্তনকে অলৌকিক ঘটনার মতো মনে হয়েছে; অনিবার্যভাবে গোপন ইমামের অতীন্দ্রিয় প্রত্যাবর্তনের মতো মনে হয়েছে। তিনি তেহরানের রাস্তায় দিয়ে যাওয়ার সময়

AMARBOI.COM

জনতা 'ইমাম খোমেনি'র নামে শ্লোগান দিয়েছে, ন্যায়বিচারের এক নতুন সূচনার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল তারা। আয়াতোল্লাহ শরিয়তমাদারির মতো প্রবীন *মুজতাহিদ*গণ ইমাম খেতাবের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, খোমেনি গোপন ইমান নন দাবি করে সরকারীভাবে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারী নীতি যাই হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ ইরানি জনতার কাছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খোমেনি ইমামই ছিলেন। তাঁর জীবন ও ব্রত স্পষ্টভাবেই আদতে ইতিহাসে ঐশীসত্তার উপস্থিতি ও সক্রিয় থাকার প্রমাণ মেলে। খোদ বিপ্লবের মতো খোমেনি যেন কোনও এক প্রাচীন মিথকে বাস্তবতায় পরিণত করেছিলেন।

খোমেনির প্রত্যাবর্তনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাহা হেজাযি একটি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন যেখানে বহু ইরানির সাগ্রহ প্রত্যাশা ফুটে উঠেছে: 'ইমামের প্রত্যাবর্তনের দিন' এক সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের প্রত্যাশা করেছে। কেউ আর কখনও মিথ্যা বলবে না, চোরের হাত থেকে বাঁচতে দরজা আটকে রাখার দরকার হবে না, সবাই মিলেমিশে খাবে:

ইমামকে ফিরতেই হবে...
যেন ন্যায় আবার সিংহাসনে আসীন হতে পারে,
যাতে অশুভ, বিশ্বাসঘাতকতা আর ঘৃণা
চিরকালের জন্যে মুছে যায় পৃথিবী থেকে।
ইমাম যখন ফিরে আসবেন,
ইরান—এই বিধ্বস্ত, আহত মাতা—
চিরকালের জন্যে মুক্তি পাবে
স্বেচ্ছাচার ও অজ্ঞতা এবং লুটপাট,
অত্যাচার ও বন্দিত্বের শৃঙ্খল থেকে।[৮২]

AMARBOI.COM

পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) একটি হাদিস উদ্ধৃত করতে পছন্দ করতেন খোমেনি, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ছোট *জিহাদ* থেকে বড় *জিহাদে* প্রত্যাবর্তন করছেন তিনি; শারীরিক, রাজনৈতিক যুদ্ধ নয় বরং নিজেকে জয় ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ ও সমাজে ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার অনেক কঠিন, জটিল ও কষ্টকর সংগ্রাম। তেহরানে ফেরার পর খোমেনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে ছোট *জিহাদ* শেষ হয়েছে এবার, অন্তহীন বড় *জিহাদের* সূচনা ঘটতে যাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৌলবাদী পুনর্জাগরণ ১৯৭০-র দশকের শেষের দিকে এতখানি নাটকীয় ছিল না। আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টদের এতটা চরম পন্থা বেছে নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। ইহুদিদের মতো তারা তখনও হলোকাস্ট ও গণহত্যার স্মৃতিতে তাড়িত হচ্ছিল না, কিংবা মুসলিমদের মতো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনেরও শিকার ছিল না। আধুনিক সেক্যুলার সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বোধ করেছে তারা, কিন্তু তাদের নেতারা অন্তত সমৃদ্ধি ও সাফল্য উপভোগ করেছেন। এটাই পরে তাদের অন্যতম সমস্যা প্রমাণিত হবে। বহিরাগত হিসাবে নিজেদের বিশ্বাস সত্ত্বেও আমেরিকায় প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র বেশ ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, শাস্তির ভীতি ছাড়াই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারছিল তারা এবং নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করছিল। তা সত্ত্বেও ১৯৭০-র দশকের শেষ নাগাদ, আমরা যেমন দেখেছি, মৌলবাদীরা তাদের বিগত পঞ্চাশ বছরের নীতি অনুযায়ী সমাজ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করার বদলে আসলে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠা উচিত বলে মনে করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, একটা প্রভাব সৃষ্টি করে আমেরিকাকে ফের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার মতো সুযোগ তাদের রয়েছে। এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, পারিবারিক মূল্যবোধ, গর্ভপাত ও ধর্মীয় শিক্ষার মতো বিভিন্ন ইস্যুতে উল্লেখযোগ্য ইভাঞ্জেলিকাল ভোটার সংগঠিত করা সম্ভব। প্রাচীন ভীতি রয়ে গেলেও নতুন আস্থাও সৃষ্টি হয়েছে।

এই পুনর্জাগরিত মৌলবাদের প্রতীক ছিল জেরি ফলওয়েলের নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মরাল মেজরিটি। অবশ্য খোদ মৌলবাদীদের তরফ থেকে নয় দলটির মূল অনুপ্রেরণা এসেছিল ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটি গঠনকারী তিনজন পেশাদার ডানপন্থী সংগঠকের কাছ থেকে। রিচার্ড ভিগনেরি, হাওয়ার্ড ফিলিপস ও পল ওয়েরিচ রিপাবলিকান পার্টির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, এমনকি উদারপন্থী রিচার্ড শউইকারকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রানিং মেট হিসাবে বেছে নেওয়া রোনাল্ড রেগান হতেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন তাঁরা। প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতিতে সরকারের হস্তক্ষেপ হ্রাসের মতো বিভিন্ন ইস্যুতে রক্ষণশীল হওয়ায় ১৯৬০-র দশকে আমেরিকার সরকারী ও বেসরকারী জীবনে অনুপ্রবেশ করা নৈতিক ও সামাজিক উদারবাদের বিরোধিতার

AMARBOI.COM

লক্ষ্যে একটি নতুন রক্ষণশীল দল গঠন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। ইভাঞ্জেলিকাল ও মৌলবাদী প্রটেস্ট্যান্টদের শক্তি লক্ষ করেছিলেন তাঁরা এবং জেরি ফলওয়েলকেই তাদের প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত মনে করেছেন। আগে থেকেই তাঁর নিজস্ব সমাবেশ, লিবার্টি কলেজ ও টেলিভিশন দর্শক ভিত্তিক এলাকা ছিল।[৮৩] মরাল মেজরিটিতে প্রধান হয়ে ওঠা টিম লাহাই ও গ্রেগ ডিক্সনের মতো মৌলবাদীগণও সুপার চার্চ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেছেন আর কোনও গোষ্ঠী থেকে কোনও রকম নিন্দার ভয় করতেন না তাঁরা। আগে থেকেই অন্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল তাদের: তাঁদের প্রায় সবাই ব্যাপ্টিস্ট ও ব্যাপ্টিস্ট বাইবেল সোসায়েটির ফেলোশিপের সদস্য ছিলেন।

মরাল মেজরিটি নিজেকে স্রেফ মৌলবাদীদের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখেনি। নেতৃবৃন্দ জাতিগত ও রাজনৈতিক ইস্যুতে দৃষ্টিভঙ্গিগত মিল আছে এমন অন্য লোকদের সাথেও সহযোগিতা করতে চেয়েছেন ও আমেরিকার সকল রক্ষণশীলের জন্যে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চেয়েছেন। নতুন গ্রুপটির তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করতে হলে সমমনা রোমান ক্যাথলিক, পেন্টাকোস্টালিস্ট, মরমন, ইহুদি ও সেক্যুলারিস্টদের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল, কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছিল ইভাঞ্জেলিকাল প্রটেস্ট্যান্ট।[৮৪] প্রথমবারের মতো বাস্তবভিত্তিক বিবেচনায় চালিত হয়ে মৌলবাদীরা তাদের বিচ্ছিন্নতাকে একপাশে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল, ছিটমহল ছেড়ে আলিঙ্গন করেছিল আধুনিক জীবনের বহুত্ববাদকে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটেছিল। ফলওয়েল, লাহাই, ডিক্সন ও বব বিলিংটন মৌলবাদী ছিলেন, কিন্তু পল ওয়েরিচ ছিলেন ইহুদি ও হাওয়ার্ড ফিলিপস ও ভিগনেরি ছিলেন ক্যাথলিক। এই বহুত্ববাদ তাঁদের কিছু মৌলবাদী সমর্থন নষ্ট করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় বব জোন্স ফলওয়েলকে 'আমেরিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি'[৮৫] আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আসলে মরাল মেজরিটির সাধারণ সমর্থন প্রধানত প্রটেস্ট্যান্টই ছিল। তৃণমূল সহানুভূতি কেন্দ্রিভূত ছিল দক্ষিণে, ডব্লুএএসপি বৃত্তের বাইরে আন্দোলনের তেমন একটা আবেদন ছিল না। রক্ষণশীল ক্যাথলিকরা মরাল মেজরিটির গর্ভপাত ও সমকামীদের অধিকার ও স্বাধীন স্কুলগুলোর কর অবকাশ সংক্রান্ত অবস্থানে সমর্থন করতে পারলেও অনেকেই মৌলবাদীদের রোমান ক্যাথলিকবাদের প্রতি ঘৃণার কথা ভুলতে পারেনি। একইভাবে ইহুদি, কৃষ্ণাঙ্গ ব্যাপ্টিস্ট ও পেন্টাকোস্টালিস্টরা আন্দোলনের প্রথমসারির নেতা ও পৃষ্ঠপোষকের বর্ণবাদে বিতৃষ্ণা বোধ করবে। উদাহরণ স্বরূপ, সিনেটর জেসি হেলমস সিভিল রাইটস আন্দোলনের উগ্র বিরোধী ছিলেন।[৮৬]

AMARBOI.COM

মরাল মেজরিটির বার্তা নতুন ছিল না। উদার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং আমেরিকার ভবিষ্যতের জন্যে যুদ্ধ করছিল তা। সদস্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্যতাকে অবশ্যই ধর্মীয় হওয়ারতে হবে বলে নিশ্চিত ছিল এবং এর নীতিমালা হবে বাইবেল ভিত্তিক। বর্তমানে আমেরিকা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুব উপকূলে কেন্দ্রিভূত একটি সেক্যুলার অভিজাতগোষ্ঠী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ফলওয়েলের ভাষায় এই উদারবাদীরা 'নীতিহীন সংখ্যালঘুতে' পরিণত হয়েছিল। রক্ষণশীলদের নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল, প্রান্তিক গ্রুপ হিসাবে কল্পনা করা ঠিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করে, অবশ্যই তাদের প্রথাগত মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে। 'আমরা কোটি কোটি–আর ওরা মাত্র কয়েক জন,' দাবি করেছেন টিম লাহাই।[৮৭] 'প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের সাথে মিলে এই দেশ চালানোর মতো যথেষ্ট ভোট আমাদের আছে,' দর্শকদের বলেছেন প্যাট রবার্টসন। 'আর লোকে যখন বলে, "আমাদের যথেষ্ট হয়েছে," আমরা তখন ক্ষমতা নিতে যাচ্ছি।'[৮৮]

১৯৭০ দশকের শেষ ও ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে কিছু মৌলবাদী পুরোনো প্রিমিলেনিয়াল দুঃখবাদের পরিমার্জনা শুরু করেছিল। বিশ্ব সামগ্রিকভাবে অভিশপ্ত, কিন্তু ক্রিশ্চানদের বিশ্বকে ইভাঞ্জেলাইজ করার, গস্পেলের বাণী প্রচার ও একে যত বেশি সম্ভব লোকের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারটি নিশ্চিত করার চেষ্টা করার দায়িত্ব ছিল। ক্রিশ্চানরা তৎপর হলে পরমানন্দের আগেই আমেরিকাকে উদ্ধার করা যেতে পারে। 'আমাদের দেশের কোনও আশা আছে?' ১৯৮০ সালে *ওল্ড টাইম গস্পেল আওয়ারে* প্রশ্ন রেখেছিলেন ফলওয়েল:

> আমি তাই মনে করি। আমরা যেভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি, প্রার্থনা করি, ক্রিশ্চান হিসাবে আমরা যেভাবে গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছি, যেটা কিনা ইচ্ছামাফিক হত্যা, আমরা যেভাবে পর্নগ্রাফির বিরুদ্ধে, মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি, আমেরিকায় ঐতিহ্যবাহী পরিবার ব্যবস্থার ভাঙন, সমকামীদের বিয়ের পক্ষাবলম্বনের বিরুদ্ধে যেভাবে আমরা অবস্থান নিয়েছি, এবং আমরা যেভাবে এই দেশটি যাতে টিকে থাকতে পারে, আর আমাদের সন্তানরা যাতে আমাদের মতো আমেরিকাকে চিনতে পারে সেজন্যে শক্তিশালী জাতীয় প্রতিরক্ষার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছি...আমার মনে হয় ঈশ্বর আরও একবার আমেরিকাকে আশীর্বাদ করার মতো আশা আছে।[৮৯]

AMARBOI.COM

পঞ্চাশ বছরের নীরবতার পর নিউ ক্রিশ্চান রাইট হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে যাওয়া মৌলবাদীরা আক্রমণে চলে গিয়েছিল, কিন্তু যত কিছুর *পক্ষে* ছিল তার চেয়ে বেশি বিষয়ের *বিরোধিতা* করেছে তারা। সকলে মরাল মেজরিটিকে বা এমনকি এর কর্মকাণ্ডকে সমর্থন দেয়নি। কিন্তু এই নতুন উগ্র ক্রিশ্চানরা ছিল গর্ভপাত বিরোধী, সমকামীদের অধিকারের বিরোধী, মাদক বিরোধী। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যেকোনও রকমের দাঁতাতের বিরোধিতা করেছে তারা, দেশটিকে সবসময়ই তারা শয়তানি সাম্রাজ্য মনে করেছে। টেলিভেঞ্জালিস্ট জেমস রবিসনের চোখে, '[ক্রাইস্টের] প্রত্যাবর্তনের আগে শান্তির যে কোনও শিক্ষা ধর্মদ্রোহীতা...ঈশ্বরের বাণী বিরোধী; এটা অ্যান্টিক্রাইস্ট।'[৯০] মরাল মেজরিটি ও নিউ ক্রিশ্চান রাইটের এজেন্ডা বর্জনবাদী ছিল, আমেরিকাকে গ্রাস করার হুমকি সৃষ্টিকারী আসন্ন অশুভের বিরুদ্ধে ক্রুসেড।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের আলোকে যৌনতার উপর গুরুত্ব আরোপ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। নিউ ক্রিশ্চান রাইট ঠিক ইসলামপন্থীদের মতোই নারীর অবস্থান নিয়ে ভাবিত ছিল, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ঢের বেশি অযৌক্তিক ছিল। নারী স্বাধীনতার আন্দোলন মৌলবাদী নারী-পুরুষকে সমানভাবে ত্রাসে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। মরাল মেজরিটির অন্যতম রোমান ক্যাথলিক নেতা ফিলিস শ্ল্যাফির চোখে নারীবাদ একটা 'রোগ,' বিশ্বের সকল দুর্গতির কারণ। ইভ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে নিজ মুক্তি দাবি করার পর থেকেই নারীবাদ এই পৃথিবীতে পাপ এবং এর সাথে 'ভয়, রোগ, বেদনা, ক্রোধ, ঘৃণা, বিপদ, সহিংসতা ও সব ধরনের কদর্যতা বহন করে এনেছে।'[৯১] প্রস্তাবিত সমঅধিকারের সংশোধনী সরকারের কর বৃদ্ধি, সোভিয়েত কায়দার নার্সারি প্রতিষ্ঠা 'ও আমাদের জীবনের অবশিষ্ট সমস্ত দিকের ফেডারালাইজেশনের'[৯২] ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু না। বেভারলি লাহাইয়ের চোখে নারীবাদ 'অসুস্থতার চেয়েও বেশি কিছু'; মার্ক্সবাদী মানবতাবাদীদের শিক্ষা ভিত্তিক 'মৃত্যুর দর্শন এটা...রেডিক্যাল নারীবাদীরা আত্মধ্বংসী; তারা গোটা একটা সভ্যতার মরণ ডেকে আনার চেষ্টা করছে।' এখন স্বামীদের মধ্যমঞ্চে আনার জন্যে সক্রিয় হওয়া ও নিজেদের নারীসুলভ আত্মসউৎসর্গের শিক্ষায় নতুন করে শিক্ষা লাভ করা ক্রিশ্চান নারীর দায়িত্ব। 'আমাদের সমাজকে রক্ষা করা', 'সভ্যতা ও মানবজাতিকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে আসা' তাদের দায়িত্ব।[৯৩] মৌলবাদীদের কল্পনাকে দীর্ঘদিন ধরে তাড়া করে আসা অন্যান্য অশুভের সাথে নারীবাদের সম্মিলন ষড়যন্ত্রভীতিরই প্রমাণ। সমাজের অখণ্ডতা ও এমনকি স্থায়ীত্বকেও নারীদের প্রথাগত অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত করেছে তারা।

AMARBOI.COM

প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদী ও অধিকাংশ গোষ্ঠীর ক্রিশ্চান রক্ষণশীলরা যেন সেক্যুলার মানবতাবাদের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের নপুংসক মনে করেছিল বলে মনে হয়। পুরুষের অক্ষমতা নিয়ে বেশি গভীরভাবে চিন্তিত মনে হয়েছে তাদের। টিম ও বেভারলি লাহাই তাঁদের বেস্ট সেলিং সেক্স ম্যানুয়াল *দ্য অ্যাক্ট অভ ম্যারিজ: দ্য বিউটি অভ সেক্সুয়াল লাভ* (১৯৭৬)-এ দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, আধুনিক পুরুষ 'আগের চেয়ে নিজেদের পৌরুষ সম্পর্কে কম নিশ্চিত'। পুরুষরা অক্ষম, যৌনতার ক্ষেত্রে সমস্যাক্রান্ত, স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে বা অন্য পুরুষের সাথে তুলনায় নিজেদের দক্ষতায় উদ্বিগ্ন।[৯৪] এর তুলে ধরে নারীর আত্ম-প্রতিষ্ঠা। এমনকি মৌলবাদী নারীরা পর্যন্ত এই সাংস্কৃতিক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে; ফলে পুরুষরা 'মেয়েলী' বা এমনকি 'পুরুষত্বহীন' হয়ে পড়ছে।[৯৫] এই ভীতি মৌলবাদীদের সমকামীতা সম্পর্কে ভীতিও তুলে ধরে যাকে তারা নারীবাদের মতোই আমেরিকার পতনের কারণ মহামারী মনে করেছে।[৯৬] 'এটা সর্বোচ্চ ধরনের বিকৃতি,' জোরের সাথে বলেছেন টেলিভিশন অনুষ্ঠানে সমকামীতার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে খ্যাতি লাভ করা জেমস রবিসন। 'এটা ঈশ্বর বিরোধিতা, ঈশ্বরের বাণীর বিরোধিতা, সমাজ বিরোধী, প্রকৃতি বিরোধী। এটা কল্পনা বা বর্ণনা করতে গেলেও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে।'[৯৭] মৌলবাদীরা সমাকমীতাকে শিশুভোগের মতো ভাববার ক্ষেত্রে একমত ছিল। এটা 'সেক্যুলার মানবতাবাদের' শিকারে পরিণত ভাঙা ঘরের পরিণাম হওয়ার ব্যাপারেও নিশ্চিত ছিল তারা।[৯৮] পারিবারিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত মৌলবাদী লেখকগণ আমেরিকার প্রকৃত পুরুষের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে একমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপকভাবে কোনও কোনও মৌলবাদী যেন নারীসুলভ মূল্যবোধের ধর্মে পরিণত হওয়া খোদ ক্রিশ্চান ধর্মেই নির্বীজকরণের সুপ্ত প্রবণতার অস্তিত্ব থাকার বিষয়ে উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে: ক্ষমা, করুণা এবং নমনীয়তা। কিন্তু জেসাস মেয়েলি স্বভাবের ছিলেন না, বলেছেন এডউইন লুই কোল: তিনি ছিলেন 'নির্ভীক নেতা, শয়তানকে পরাস্তকারী, দুরাত্মাকে বিতাড়ন করেছেন, প্রকৃতির উপর ক্ষমতা দেখিয়েছেন, ভণ্ডদের ধরিয়ে দিয়েছেন।'[৯৯] তিনি নিষ্ঠুর হতে পারতেন: ক্রিশ্চানদেরও আগ্রাসী হতে হবে, *ব্যাটল ফর দ্য ফ্যামলি*-তে জোরের সাথে বলেছেন টিম লাহাই। তাদেরও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে।[১০০] এক উগ্র, পৌরুষদীপ্ত ক্রিশ্চান ধর্মের আকাঙ্ক্ষা মরাল মেজরিটির অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতি বৈরিতার কারণও ব্যাখ্যা করে। এটাও তাদের প্রচারণার অংশ ছিল, ঋজু, সক্ষম ও যোদ্ধা পৌরুষকে নতুন করে জীবিত করে তোলা।

অংশত মৌল ভীতি থেকে নিউ ক্রিশ্চান রাইটের তৎপরতা সৃষ্টি হয়েছিল। মৌলবাদীরা অস্পষ্টভাবে নিজেদের নির্বীজ ও গভীরভাবে হীন ভেবেছে। তাদের

AMARBOI.COM

আদর্শে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি, তবে এখন তারা তাদের গোষ্ঠীকে মূলধারার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বহু বছরের নির্দেশের পর সমাজ জীবনে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক প্রচারণামূলক আন্দোলনের মতোই কাজ শুরু করেছিল মরাল মেজরিটি নেটওয়ার্ক। ভোট দানের জন্যে সদস্যদের নিবন্ধন করাই ছিল তাদের মূল কাজ, তাদের সঠিকভাবে ভোট দানের পদ্ধতি শেখানো হয়েছে এবং ভোট দানে সক্ষম ছিল তারা। সক্রিয়তার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতে র‍্যালির আয়োজন করেছে তারা, জনগণকে লবিইং ও নিউজ লেটার তৈরির কাজে শিক্ষিত করে তুলেছে; প্রচার মাধ্যমকে প্রভাবিত করার শিক্ষাও দিয়েছে। যত নিম্ন বা স্থানীয় পর্যায়েরই হোক না, সরকারী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে ক্রিশ্চানদের তাগিদ দেওয়া হয়। উদারপন্থী ও সেক্যুলারিস্টরা ক্রমে জনজীবনে উচ্চকিত নবজন্ম উপস্থিতি সম্পর্কে ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে উঠতে থাকে। পরবর্তী এক দশকে উগ্র ক্রিশ্চানরা মূলধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ উপনিবেশে পরিণত করতে শুরু করে। ১৯৮৮ সালে প্যাট রবার্টসন এমনকি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ক্রিশ্চানরা কোনও কোনও রাজনীতিবিদের পথের কাঁটা হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। বছরের পর বছর পাবলিক অ্যাকশন কমিটিগুলো তাদের দৃষ্টিতে অনাকাঙ্ক্ষিত নীতি প্রচারকারীদেরই পদের জন্যে স্থির করে এসেছে। 'রিপোর্ট কার্ড' বের করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল তারা। এবার ক্রিশ্চান অ্যাক্টিভিস্টরা গান ল-এ 'ভুল' ভোটদানকারী, গর্ভপাতের তহবিলে দানকারী বা সমঅধিকার সংশোধনীতে ভোটদানকারীদের নিশানা করতে শুরু করেছিল। প্রতিরক্ষা, স্কুলে প্রার্থনা বা সমকামীদের অধিকারের বেলায় ভুল দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা পরিবার বিরোধী, আমেরিকা বিরোধী ও ঈশ্বর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে মৌলবাদী অ্যাক্টিভিস্টদের যেন অদক্ষ মনে হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে আধুনিক রাজনীতির খেলা শিখে নেয় তারা। যাজক ও টেলিভিশন উপস্থাপক ছিলেন এরা, জন্মগতভাবে রাজনীতিক নন; কিন্তু তারপরেও বেশ সাফল্য অর্জন কছিলেন। তাঁদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য সম্ভবত সমঅধিকার সংশোধনী প্রতিহত করা। প্রয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্যে তেত্রিশটি রাজ্যের ভোটের দরকার ছিল, ১৯৭৩ সাল নাগাদ তিরিশটি রাজ্য পক্ষে ভোট দিয়েছিল।[১০১] কিন্তু ফিলিস শ্ল্যাফলির প্রয়াস ও স্থানীয় ক্রিশ্চান রাইট অ্যাক্টিভিস্টদের প্রচারণা সংশোধনীর গতি স্তব্ধ করে দেয়: নেব্রাস্কা, টেনেসি, কেনটাকি, ইন্ডিয়ানা ও দক্ষিণ ডাকোটা, তাদের আগের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। তা নাহলে মরাল মেজরিটি এমনকি স্কুলে প্রার্থনা বা গর্ভপাতের মতো বিষয়েও ফেডারেল বা রাজ্য বিধান বদলাতে পারেনি। আরকান-

AMARBOI.COM

স ও লুইসিয়ানায় অবশ্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে ডারউইনের বিবর্তনবাদের পাশাপাশি জেনেসিসের আক্ষরিক শিক্ষা দেওয়ারও পক্ষে বিল গৃহীত হয়েছিল। সাফল্যের এই আপাত অভাব ক্রিশ্চান অ্যাক্টিভিস্টদের অবশ্য হতাশ করেনি, তারা যুক্তি দেখিয়েছে, কংগ্রেসের উভয় কক্ষে একটা অতিরক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে তোলাই তাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য। সেটা অর্জিত হলে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হবে।

মরাল মেজরিটির এই ধরনের রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিজম চালু করার বিশ বছর পর এই বইটি লেখার মুহূর্তে এর দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা পরিমাপ করা সহজ নয়। প্রমাণ রয়েছে যে বিশেষ করে দক্ষিণে আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর ক্রিশ্চানরা ভোট দিচ্ছে, কিন্তু এই ধরনের নেতিবাচক প্রচারণা অনেক সময় হীতে বিপরীত হতে পারে। ক্রিশ্চান রাইট সমর্থক লিন্ডা শাভেয ১৯৮৬ সালে মেরিল্যান্ড মধ্যমেয়াদী নির্বাচনের সময় প্রতিপক্ষকে কমিউনিস্ট ও শিশুঘাতক লেসবিয়ান বলে গালমন্দ করলে সেটা তার পরাজয়ে ভূমিকা রেখে থাকতে পারে।[১০২] ১৯৯৮-৯৯ সালে মনিকা লিউনিস্কির সাথে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের যৌন সম্পর্ক ও পরবর্তী কথিত আদালত অবমাননার দায়ে তাঁকে অপসারণের প্রয়াসও উল্টো ফল দিয়েছিল। যৌন আচরণ সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের একান্ত উত্তর দান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অনিবার্য রাজনৈতিক ডিসেকোর্সের তুচ্ছকরণ ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সম্ভবত ক্লিন্টনের পক্ষে উদারপন্থীদের পাল্টা হামলার কারণ হয়।

তাসত্ত্বেও সত্যি কথা হচ্ছে কেলেঙ্কারীর সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় নেতাদের এক প্রাতরাশ সভায় ভাষণ দান ও কান্নাভরা কণ্ঠে পাপের স্বীকারোক্তি দেওয়া প্রয়োজন মনে করার বাস্তবতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, রাজনীতিবিদগণ এখন আর বিশ্বাসীদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে সেক্যুলারিস্ট পরিহাসের সাথে দেখতে পারছেন না। বিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ উত্তর আমেরিকায় ধর্ম বিবেচনায় আনার মতো শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ফাউন্ডিং ফাদারগণ আলোকনের সেক্যুলার মানবতাবাদের জয়গান গাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক দূরের পথ অতিক্রম করেছে। বিপ্লবের পর থেকে আমেরিকার প্রটেস্ট্যান্টরা উদার প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার উপায় হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করে আসছে; জেরি ফলওয়েল, প্যাট রবার্টসন ও ক্রিশ্চান রাইটের অন্য সদস্যদের মৌলবাদী প্রচারণা স্রেফ এই প্রবণতারই বিংশ শতাব্দীর শেষাংশের প্রকাশ। এইসব ক্রিশ্চান প্রয়াসের ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পবিত্রতা অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে, ওইসব দেশে রাজনীতিবিদরা প্রকাশ্য ও আবেগঘন ধার্মিকতা প্রকাশ করে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

জাতীয় রাজনীতি ছাড়াও ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে ক্রিশ্চান রাইটের কিছু বিশাল বিজয় স্থানীয় পর্যায়ের ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৪ সালে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার কানাওয়া কাউন্টির মৌলবাদী যাজকের স্ত্রী অ্যালিস মুর স্কুল পাঠ্য বইয়ে বাইবেল একটি মিথ বুঝিয়ে এর কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং ক্রিশ্চান ধর্মকে কপটাচারী এবং নাস্তিক্যকে বুদ্ধিদীপ্ত ও আকর্ষণীয় হিসাবে তুলে ধরা 'সেক্যুলার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির' বিরুদ্ধে প্রচারণায় নামেন। ক্রিশ্চানরা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে প্রত্যাহার করে ঘরে বন্দি করে। মুর বিশেষজ্ঞদের প্রতি আস্থাহীনতার দীর্ঘ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন। কানাওয়া কাউন্টির স্কুল কার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত: 'যারা এখানে বাস করে সেই জনগণ নাকি শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, প্রশাসক, অন্য জায়গা থেকে হাজির হওয়া লোকজন যারা আমাদের বলে আসছে কোনটা আমাদের সন্তানের জন্যে ভালো হবে তারা?'[১০৩] ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে সেইন্ট ডেভিড অ্যারিযোনার স্থানীয় ক্রিশ্চানরা তাদের স্কুল থেকে উইলিয়াম গোল্ডিং, জন স্টেইনবেক, জোসেফ কনরাড ও মার্ক টোয়াইনের বই নিষিদ্ধ করতে সক্ষম হয়। ১৯৮১ সালে মেল ও নোরমা গাবলার 'ঈশ্বরকে আবার টেক্সাসের স্কুলে ফিরিয়ে আনতে' একই রকম প্রচারণা শুরু করেন। বর্তমান 'উদার পক্ষপাতের' প্রতি আপত্তি তোলেন তাঁরা, যা কিনা:

> ছাত্রদের নিজস্ব উপসংহারে পৌঁছানোর প্রয়োজন হয় এমন উন্মুক্ত প্রশ্নে দেখা যাবে; ক্রিশ্চানিটি ছাড়া অন্য ধর্ম সংক্রান্ত বিবৃতি; এমন বিবৃতি যাতে তারা মুক্ত উদ্যোগ ব্যবস্থার প্রতি নেতিবাচক চিন্তা করতে চালিত হয়; এমন বিবৃতি যাতে তারা সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট দেশের (অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের নির্দিষ্ট শস্যের বৃহত্তম উৎপাদক); সংযমের কোনও দিক বাদে যৌনতার কোনও দিক; কৃষ্ণাঙ্গ, নেটিভ আমেরিকান ইন্ডিয়ান, মেক্সিকান-আমেরিকান বা নারীবাদীদের অবদানের উপর জোরদানকারী বিবৃতি; এমন বিবৃতি যেগুলো আমেরিকান দাসদের প্রতি সহানুভূতিশীল বা তাদের মালিকদের প্রতি বৈরী; এবং বিবর্তনবাদের সমর্থক সেইসব বিবৃতি, যদি সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করার জন্যে সমান স্থান দেওয়া না হয়।[১০৪]

আদালত গাবলারদের বিরুদ্ধে রায় দেয়, কিন্তু প্রকাশকরা রাজ্যই সব স্কুলের জন্যে টেক্সট বই বাছাই করে বলে বিশাল টেক্সাসের বাজারের ক্ষতির সম্ভাবনায় এতটাই ভীত হয়ে উঠেছিলেন যে, নিজেরাই বই সংশোধন করে ফেলেন তারা।

AMARBOI.COM

প্রচারকারীরা মৌলবাদীদের আধুনিক সংস্কৃতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে আক্রান্ত করে রাখা সকল ভীতি তুলে ধরেছিল: উপনিবেশিকরণ, বিশেষজ্ঞ, অনিশ্চয়তা, বিদেশী প্রভাব, বিজ্ঞান ও যৌনতার ভীতি। তারা অবশ্য মোটা দাগে নিউ ক্রিশ্চান রাইটের ডব্লুএএসপি-মুখীনতাও তুলে ধরেছিল। আমেরিকা হবে শ্বেতাঙ্গ এবং প্রটেস্ট্যান্টদের। ইহুদি ও মুসলিম অ্যাক্টিভিস্টদের মতো মরাল মেজরিটির ক্রিশ্চানরা পবিত্রের আওতা বৃদ্ধি, সেক্যুলারিস্ট রীতির আগ্রাসন ঠেকানো ও ঐশীসত্তাকে পুনঃস্থাপিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করছিল। তাদের বিজয়কে ছোট ও তাৎপর্যহীন মনে হতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজের ধারা শিখেছিল ক্রিশ্চান রাইট; নিজেদের তারা নতুন করে ক্ষমতাশালী করেছে এবং একটা মাত্রা পর্যন্ত এমনভাবে আমেরিকান রাজনীতিকে আবার পবিত্র করে তুলেছিল যা ইউরোপের অধিকতর সেক্যুলার দেশগুলোকে সব সময় বিস্মিত করে এসেছে।

টেক্সাসের বেলায় গাবলারদের বিপক্ষে লড়াইকারী উদারপন্থী সংগঠন পিপল ফর দ্য আমেরিকান ওয়ে যুক্তি দেখিয়েছিল, রক্ষণশীলরা এই ধরনের ১২৪টি বিরোধের ক্ষেত্রে মাত্র ৩৪টিতে জয় লাভ করেছে। উদারবাদীরা নিজস্ব সংগঠন তৈরি করে পাল্টা যুদ্ধ শুরু করছিল। সুতরাং, অগ্রগতি ছিল ধীর, এটা মৌলবাদীদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল, তাদের ধারণা ছিল পরমানন্দ অত্যাসন্ন, এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইতিহাসে সক্রিয়, আপন শক্তিতে ন্যায়পরায়ণদের রক্ষা করছেন। কোনও কোনও মৌলবাদী তাদের নেতারা বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন বলে বিশ্বাস করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮২ সালের গর্ভপাতের পূর্ণ বিলুপ্তির দাবি করার বদলে জেরি ফলওয়েল এর প্রাপ্যতা সীমাবদ্ধ করার অধিকতর বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণাকালে প্যাট রবার্টসন মূলধারার বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্পর্কে রয়েসয়ে শোভন বক্তব্য রাখেন, যদিও মৌলবাদী অর্থডক্সি দাবি করে যে ধর্মদ্রোহী চার্চগুলোকে প্রত্যেক সুযোগেই আক্রমণ করতে হবে।

প্রটেস্ট্যান্ট পুনর্জাগরণের গোড়ার দিকের এই বছরগুলোয় আধুনিক রাজনীতির সমঝোতা দাবি শিখেছিলেন ফলওয়েল ও রবার্টসন। গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে ক্ষমতার জন্যে প্রতিযোগিতা দরকষাকষি ও প্রতিপক্ষের জন্য কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে হয়, সেখানে চরম নীতিমালা সফল হতে পারে না। বিশেষ কিছু নীতিকে অলঙ্ঘনীয় ও সেকারণে আপোসহীন বিবেচনাকারী কোনও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে এর সাথে তাল মেলানো কঠিন। মৌলবাদীরা প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হওয়া সেক্যুলার রাজনীতির বিশ্বে তারা পছন্দ করুক বা না করুক, কোনও কিছুই এভাবে পবিত্র নয়। যেকোনও ধরনের সাফল্য অর্জনের জন্যে ফলওয়েল ও রবার্টসনকে শয়তান বিবেচনা করা প্রতিপক্ষকে ছাড় দিতে হয়েছে। একটা

টানাপোড়েন ছিল: আধুনিক রাজনৈতিক বিশ্বে প্রবেশ করে মৌলবাদীরা আবিষ্কার করেছে যে, তারা কেবল অশুভের সাথে মিশছেই না বরং যেসব বিষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে রাজনীতির মাঠে নেমেছিল সেগুলোর কোনও কোনওটা তাদের প্রভাবিতও করছে। এটা ছিল তাদের সমস্যার একটি দিক মাত্র। শতাব্দীর শেষ দুই দশকে মৌলবাদীরা যেসব সমাধানের দিকে ধাবিত হয়েছে মনে করেছিল সেগুলোর কোনও কোনওটা খোদ ধর্মের পক্ষেই পরাজয় ছিল।

AMARBOI.COM

১০. পরাজয়?
(১৯৭৯–৯৯)

মৌলবাদী *রিকনকুইস্তা* দেখিয়ে দিয়েছিল যে, ধর্ম আর যাই হোক অবলুপ্ত শক্তি ছিল না। ইরানি বিপ্লবের পর পর জনৈক উত্তেজিত মার্কিন সরকারী কর্মকর্তার মতো আর একথা বলার জো ছিল না: 'ধর্মকে আবার কে কবে গুরুত্বের সাথে নিয়েছে?'[১] মৌলবাদীরা ধর্মবিশ্বাসকে ছায়া থেকে বের করে এনে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, আধুনিক সমাজে এক বিশাল জনগণের কাছে এটা আবেদন রাখতে পারে। তাদের বিজয় সেক্যুলারিস্টদের হতাশায় ভরে দিয়েছিল; এটা আলোকন যুগের পোষ মানানো, নম্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে নমিত বিশ্বাস ছিল না। এটা যেন আধুনিকতার মূল্যবোধ উপেক্ষা করে যাচ্ছিল। ১৯৭০ দশকের শেষার্ধের ধর্মীয় আক্রমণ দেখিয়ে দিয়েছিল যে, বিভিন্ন সমাজ মেরুকৃত অবস্থায় রয়েছে; বিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ধার্মিক ও সেক্যুলারিস্টরা আরও বেশি বিভক্ত হয়ে গেছে। এখন আর একে অন্যের ভাষায় কথা বলতে পারছে না এরা, পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারছে না। সম্পূর্ণ খাঁটি যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলবাদ ছিল বিপর্যয়, কিন্তু মৌলবাদীদের মতে এটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের অবৈধ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হওয়ায় এটা বিস্ময়কর ছিল না। কীভাবে আমরা এইসব মৌলবাদকে ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে মূল্যায়ন করব? মৌলবাদীদের বিজয় কি সত্যিকার অর্থে ধর্মের পরাজয়ের সমান, আর মৌলবাদী হুমকীর কি অবসান ঘটেছে?

যারা তখনও বিশেষ করে আলোকনের নীতিমালা মেনে চলত তাদের পক্ষে ইরানের ইসলামি বিপ্লব বিশেষভাবে অস্বস্তিকর ছিল। বিপ্লব কঠোরভাবে সেক্যুলারিস্ট ধরনের হওয়ার কথা ছিল। জাগতিক বাস্তবতা যখন এক নতুন মর্যাদা অর্জন করে ও ধর্মের অতীন্দ্রিয় বলয় হতে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে প্রস্তুত হয়, ঠিক তেমন একটা সময়েই তা সংঘটিত হয় বলে মনে করা হত। হান্নাহ আরেন্দট তাঁর জনপ্রিয় গবেষণা *অন বিভ্যুলুশন* (১৯৬৩)-এ যেমন ব্যাখ্যা করেছেন: 'শেষ পর্যন্ত এমন হতে পারে যে আমরা যাকে বিপ্লব আখ্যায়িত করে থাকি সেটা এক নতুন

AMARBOI.COM

সেক্যুলারিজমের জন্য ডেকে আনা ক্রান্তিকাল মাত্র।'[২] জনপ্রিয় গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে একটি ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব যেন পাশ্চাত্য প্রজ্ঞার এর আপাত আনাড়ী প্রত্যাখ্যানে প্রায় বিব্রতকর দারুণ অতিকল্পনা বলে মনে হয়েছে। ইরানি বিপ্লবের ঠিক অব্যবহিত পর কেউই আশা করেনি যে খোমেনির সরকার টিকে থাকবে। আধুনিক ইসলামি সরকারের মতো ধর্মীয় অভ্যুত্থানের ধারণাটিই স্বাভাবিক যুক্তিতে স্ববিরোধী মনে হয়েছিল।

কিন্তু পশ্চিমাদের এই সত্য মেনে নিতে হয়েছিল যে, অধিকাংশ ইরানি ইসলামি শাসন চায়। বহু আমেরিকান ও ইউরোপিয় পর্যবেক্ষক আস্থার সাথে 'উন্মাদ মোল্লাহদের' উৎখাত করতে যে 'মধ্যপন্থীদের' অবির্ভাবের প্রত্যাশা করেছিলেন, তাদের আবির্ভাব ঘটেনি। বিপ্লবের পর ইরানে জাতীয়তাবাদী ও সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আকাঙক্ষীরা নিজেদের সংখ্যালঘু হিসাবে আবিষ্কার করেছে। অবশ্য, ইসলামি সরকারের রূপ ঠিক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে কোনও ঐকমত্য ছিল না। শরিয়তির অনুসারী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীগণ ত্রাসকৃত যাজকীয় শাসনের সাথে সাধারণ মানুষের শাসন চেয়েছেন। খোমেনির নতুন প্রধানমন্ত্রী মেহেদি বাযারগান অনৈসলামিক পার্লামেন্টারি আইনে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতাসহ একটি *মুজতাহিদদের* কাউন্সিলসহ ১৯০৬ সালের সংবিধানে (রাজতন্ত্র বাদে) ফিরে যেতে চেয়েছেন। কুমের *মাদ্রাসাগুলো* খোমেনির বেলায়েত-ই ফাকিহ'র বাস্তবায়নের জন্যে চাপ দিতে থাকে, কিন্তু আয়াতোল্লাহ শরিয়তমাদারি ও আয়াতোল্লাহ তালেকানি অতীন্দ্রিয়বাদে অনুপ্রাণিত একটি যাজক গোষ্ঠীর হাতে জাতির শাসন ভার তুলে দেওয়ার এই ধারণার প্রবল বিরোধী ছিলেন, কেননা তা শত বছরের শিয়া ঐতিহ্যের লঙ্ঘন করে। এমন এক রাজনীতিতে ভীষণ বিপদের ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা। ১৯৭৯ সালের অক্টোবর নাগাদ মারাত্মক বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল।[৩৮] বাযারগান ও শরিয়তমাদারি খোমেনির অনুসারীদের তৈরি *ফাকিহকে* (খোমেনি) সর্বোচ্চ ক্ষমতদানকারী খসড়া সংবিধান আক্রমণ করেন, যিনি সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং অনায়াসে প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারবেন। সংবিধান একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, একটি মন্ত্রীসভা ও বার সদস্য বিশিষ্ট শরীয়া বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে ভেটো দানের ক্ষমতাসহ একটি কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ানের ব্যবস্থাও রেখিছিল।

খসড়া সংবিধানের বিরোধী পক্ষ শক্তিশালী ছিল। বামপন্থী গেরিলা আন্দোলনগুলো, ইরানের অভ্যন্তরের জাতিগত সংখ্যালঘু ও প্রভাবশালী মুসলিম পিপল'স রিপাবলিকান পার্টি (আয়াতোল্লাহ শরিয়তমাদারি প্রতিষ্ঠিত) প্রবলভাবে এর বিরুদ্ধে ছিল। উদারপন্থী ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমবর্ধমানহারে তাদের

চোখে নতুন সরকারের ধর্মীয় বাড়াবাড়ির কারণে হতাশ হয়ে পড়ছিল: সাবেক শাহর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করে এবার ইসলামি স্বৈরতন্ত্রের কব্জায় পড়তে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল তাদের কাছে। তারা লক্ষ করেছিল, খসড়া সংবিধানে কেবল ইসলামি আইন ও রেওয়াজকে লঙ্ঘন না করার ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা (যার জন্যে উদারপন্থীরা পাহলভীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল) নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বাযারগান বিশেষভাবে স্পষ্টবক্তা ছিলেন। সরাসরি খোমেনিকে আক্রমণ না করার ব্যাপারে সবসময়ই সতর্ক ছিলেন তিনি, তবে ইসলামি বিপ্লবী দলে, তাঁর দাবি অনুযায়ী ইসলামি বিপ্লবের গোটা লক্ষ্যকেই লঙ্ঘনকারী প্রস্তাবিত সংবিধানিক ধারাসমূহের জন্যে দায়ী, তাঁর ভাষায়, প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর ছিলেন।

সঙ্কটের মুখে পড়েছিলেন খোমেনি। ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭৯, এক জাতীয় গণভোটে খসড়া সংবিধানের উপর জনগণের ভোট দানের তারিখ স্থির হয়েছিল। বেলায়েত-ই ফাকিহ পরাস্ত হতে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল। এই পর্যন্ত খোমেনি ছিলেন বাস্তববাদী; পাহলভী সরকারকে উৎখাত করার জন্যে নিপুণভাবে বামপন্থী, ইসলামপন্থী, বুদ্ধিজীবী, জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থীদের কোয়ালিশনকে সামাল দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু ১৯৭৯ সালের শেষ নাগাদ এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন গ্রুপের এই অসম মৈত্রী ভেঙে যেতে বসেছে এবং বিপ্লবের ভবিষ্যৎ–তিনি স্বয়ং বুঝতে পারছিলেন সেটা–বিপদাপন্ন। তখন অজ্ঞাতসারে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মহাশয়তান হিসাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও তেহরানের নতুন ইসলামি সরকারের সম্পর্ক সতর্ক হলেও সঠিক ছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, খোমেনির ইরানে ফিরে আসার অল্প পরেই ছাত্ররা রাজধানীর আমেরিকান দূতাবাসে আক্রমণ চালিয়ে দখল করে নেওয়ার প্রয়াস পায়, কিন্তু খোমেনি ও বাযারগান দ্রুত অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের পদক্ষেপ নেন। তা সত্ত্বেও মহাশয়তান সম্পর্কে আস্থাহীন ছিলেন খোমেনি, আমেরিকা বিনা যুদ্ধে ইরানে তার স্বার্থ ছেড়ে দেবে, এটা বিশ্বাস করতে পারেননি। আমরা অধিকাংশ মৌলবাদীদের যে বৈকল্যে তাড়িত হতে দেখি, সেই একই কারণে খোমেনি বিশ্বাস করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্রেফ উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালের মুসাদ্দিককে উৎখাত করার মতোই নতুন ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে হুমকি দেবে। ২২শে অক্টোবর, ১৯৭৯ মরণব্যধি ক্যান্সারের চিকিৎসা গ্রহণের জন্যে শাহ

AMARBOI.COM

নিউ ইয়র্ক সিটিতে গেলে খোমেনির সন্দেহ যেন নিশ্চিত হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার নিজস্ব বিশেষজ্ঞ ও তেহরানের তরফ থেকে সাবেক শাহকে প্রবেশাধিকার না দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হলেও কার্টারের বিশ্বাস ছিল যে, এই মানবিক সেবার ক্ষেত্রে সাবেক এই অনুগত মিত্রকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

সাথে সাথে মহাশয়তানের বিরুদ্ধে খোমেনির বাগাড়ম্বর আরও জ্বালাময়ী হয়ে ওঠে। শাস্তি প্রদানের জন্যে রেযা শাহকে ইরানে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করেন তিনি, সাবেক সরকারের অনুগত সকল কর্মচারীকে ছাঁটাইয়ের আহ্বান জানান। খোদ ইসলামি ইরানের অভ্যন্তরেই পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল বিশ্বাসঘাতকদের ঘাপটি মেরে থাকার ঘোষণা দেন তিনি, তাদের অবশ্যই জাতির ভেতর থেকে বহিষ্কার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বাযারগান এবং সেই সাথে খসড়া সংবিধানের অন্য বিরোধীরাই যে এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন সেটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ১লা নভেম্বর বিমান যোগে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার বার্ষিকীতে যোগ দিতে গিয়ে কার্টারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জবিগনিউ ব্রেযনিস্কির সাথে করমর্দনরত অবস্থায় ছবি তোলায় খোমেনির চালে হেরে যান বাযারগান। ইসলামি বিপ্লবী দলে তাঁর প্রতিপক্ষ বাযারগানকে অন্যদের সাথে আমেরিকান এজেন্ট হিসাবে গালমন্দ করতে শুরু করে। এমনি উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ৪ঠা নভেম্বর প্রায় তিন হাজার ইরানি ছাত্র তেহরানে আমেরিকান দূতাবাসে আক্রমণ চালিয়ে নব্বইজনকে জিম্মি হিসাবে আটক করে। প্রথমে খোমেনি অচিরেই তাদের মুক্তি নিশ্চিত করবেন এবং আগের মতো ছাত্রদের প্রত্যাহারের নির্দেশ দেবেন বলে মনে হয়েছিল। খোমেনি ছাত্রদের দূতাবাসে হামলার বিষয়টি আগে থেকে জানতেন কিনা আজও তা স্পষ্ট নয়। সে যাই হোক, প্রায় তিনদিন নীরব ছিলেন তিনি। কিন্তু বাযারগান যখন বুঝতে পারলেন, দূতাবাস মুক্ত করার জন্যে খোমেনির সমর্থন পাচ্ছেন না, নিজের রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে ৬ই নভেম্বর বিদেশমন্ত্রী ইব্রাহিম ইয়াযদিসহ পদত্যাগ করলেন তিনি। মাত্র কয়েক দিন আটক রাখার উদ্দেশ্য থাকলেও ছাত্ররা অবাক হয়ে উপলব্ধি করেছিল যে আসলে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর এক প্রধান বিরোধ জন্ম দিয়েছে তারা। খোমেনি ও ইসলামি বিপ্লবী প্রজাতন্ত্র ছাত্রদের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করেন। বিশ্বজুড়ে জিম্মি নাটকের ব্যাপক প্রচার খোমেনিকে এক নতুন নিশ্চয়তা দেয়। মহিলা জিম্মি ও কৃষ্ণাঙ্গ মেরিন গার্ডদের মুক্তি দেওয়া হলেও বাকি বাহান্নজন আমেরিকান কূটনীতিককে ৪৪৪ দিন বন্দি করে রাখা হয় এবং ইরানি রেডিক্যালিজমের প্রতীকে পরিণত হয় এই ঘটনা।

AMARBOI.COM

খোমেনির চোখে জিম্মিরা ছিলেন দৈববর। বাইরের শত্রু মহাশয়তানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে, তাদের আটক ও বিপ্লব উত্তর আমেরিকার প্রতি জন্মানো ঘৃণা এক অভ্যন্তরীণ দুষ্কালে ইরানিদের খোমেনির পেছনে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। বাযারগানের বিদায় এক নিমেষে খসড়া সংবিধানের সবচেয়ে উচ্চকিত বিরোধীর মুছে দিয়েছিল ও বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করেছে। যথারীতি ডিসেম্বরের রেফারেন্ডামে লক্ষণীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নতুন সংবিধান পাস হয়। খোমেনি জিম্মি সংকটকে স্রেফ নিজের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির আলোকেই বিবেচনা করেছিলেন। গোড়াতে বানি সদরের কাছে যেমন ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি:

> তৎপরতার বহু সুবিধা রয়েছে। অমেরিকানরা ইসলামি প্রজাতন্ত্রের স্থায়িত্ব লাভ দেখতে চায় না। জিম্মিদের আটক রেখে নিজেদের অভ্যন্তরীণ কাজ শেষ করব আমরা, তারপর ছেড়ে দেব ওদের। এটা আমাদের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস পাবে না। কোনও ঝামেলা ছাড়াই আমরা সংবিধানকে জনগণের সামনে ভোটের জন্যে তুলে ধরতে পারব, প্রেসিডেন্ট ও সংসদীয় নির্বাচনও অনুষ্ঠান করা যাবে। আমরা এইসব কাজ শেষ করার পরই জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া যাবে।[৫]

খোমেনির জ্বলাময়ী বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও এটা ইসলামের *মিথোসের* বাতলে দেওয়া নীতি ছিল না, বরং এক ধরনের বাস্তবভিত্তিক *লোগোস*। তাসত্ত্বেও সঙ্কট খোমেনির নিজস্ব প্রোফাইলও বদলে দিয়েছিল। একজন বাস্তববাদী রাজনীতিক হয়ে থাকার বদলে তাঁর নিজের দৃষ্টিতেই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উম্মাহ্‌র সংগ্রামে নেতায় পরিণত হয়েছিলেন তিনি; 'বিপ্লব' শব্দটি তাঁর ভাষণে প্রচলিত ইসলামি পরিভাষার অনুরূপ প্রায় পবিত্র মূল্য লাভ করেছিল: একমাত্র তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখেন এবং এর শক্তির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন। একই সময়ে সারা বিশ্বে সঙ্কটের ফলে ইরান ও ইসলাম সম্পর্কে অস্বাভাবিকভাবে নয়া ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ায় খোমেনিকে ভেতরের বাইরের প্রতিপক্ষের হুমকির মুখে বিপ্লবের নাজুকতা সম্পর্কে ঢের বেশি সজাগ করে তুলেছিল। ১৯৮০ সালের মে মাসের শেষের দিকে ও জুলাই মাসের মাঝামাঝি সরকারের বিরুদ্ধে চারটি ভিন্ন ভিন্ন অভ্যুত্থান উন্মোচিত হয়েছিল এবং বছরের শেষ পর্যন্ত সেক্যুলারিস্ট গেরিলা ও খোমেনির বিপ্লবী গার্ডদের ভেতর অবিরাম যুদ্ধ বজায় ছিল। এই দিনগুলোর বিভ্রান্তি ও ভীতি সারা ইরান জুড়ে তথাকথিত বিপ্লবী কাউন্সিলের গজিয়ে ওঠার ভেতর দিয়ে আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল, সরকার

ওএগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। এইসব *কোমিতেহ* বেশ্যাবৃত্তি বা পাহলভীদের অধীনে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকার মতো 'অনৈসলামিক আচরণ'-এর অপরাধে শত শত লোককে হত্যা করে। একটি কেন্দ্রিয় শক্তির পতনের পর এই ধরনের স্থানীয় সংস্থার আবির্ভাব সমাজকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত বিপ্লবের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য বলেই মনে হয়। খোমেনি এই *কোমিতেহ*গুলোর বাড়াবাড়ির নিন্দা করেছেন, এসবকে ইসলামি আইনের পরিপন্থী ও বিপ্লবের সত্যতা বিনষ্টকারী ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেগুলোকে ভেঙে তো দেনইনি বরং শেষ পর্যন্ত নিজের আনুকূল্যে এনে নিয়ন্ত্রণ করেছেন ও তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের সমর্থকে পরিণত করেছেন।[৫] ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরও মোকাবিলা করতে হয়েছিল খোমেনিকে। ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেইনের বাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানে হামলা করে। এর মাঝে, খোমেনি সূচিত সামাজিক সংস্কার কর্মসূচি স্থগিত রাখতে হয়েছিল। এই সময় জুড়ে আমেরিকান জিম্মি একটা উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। কেবল প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পরই ১৯৮১ সালের ২০শে জানুয়ারি (নতুন মার্কিন প্রেসডিন্ট রোনাল্ড রেগানের ক্ষমতা গ্রহণের দিন) তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

অবশ্য জিম্মিদের দুর্ভোগ অনিবার্যভাবে নয়া ইসলমি প্রজাতন্ত্রের ইমেজকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সঙ্কটের সময় মহাশয়তানের বিপুল পাপাচার নিয়ে বড় বড় বুলি সত্ত্বেও এই জিম্মি আটকের ভেতর ধর্মীয় বা ইসলামি কিছু ছিল না। বরং উল্টো। জিম্মি আটকের বিষয়টি সকল ইরানির ভেতর জনপ্রিয় না নাহলেও অনেকেই এর প্রতীকীবাদ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। দূতাবাসকে কোনও বিদেশী দেশের এলাকা মনে করা হয়, এভাবে ছাত্রদের দখলদারি ছিল আমেরিকার সার্বভৌমত্বের উপর আগ্রাসনের মতো। কিন্তু তাসত্ত্বেও অনেকের চোখে ইরানের দূতাবাসে আমেরিকার নাগরিকদের আটকে রাখার ব্যাপারটি জুৎসই মনে হওয়ার কারণ অনেক দশক ধরে ইরানিরা মনে করে এসেছে যে পাহলভী স্বৈরাচারকে সমর্থন দিয়ে আসা দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচণাতেই নিজ দেশে কারাবন্দি ছিল তারা। কিন্তু ধর্ম নয়, এটা ছিল প্রতিশোধের রাজনীতি। দখলের গোড়ার দিনগুলোতে জিম্মেদের কারও কারও হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছিল, তাদের কথা বলতে দেওয়া হয়নি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের পরিত্যাগ করেছে বলে জানানো হয়েছে। পরে জিম্মিদের আরও আরামদায়ক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়,[৬] কিন্তু এই ধরনের নিষ্ঠুরতা ও দুর্ব্যবহার ইসলামসহ সকল প্রধান কনফেশনাল ধর্মের মৌল দর্শনের বিরোধিতা করেঃ বাস্তব দয়ার দিকে চালিত না হলে কোনও ধর্মীয় মতবাদ বা অনুশীলন খাঁটি হতে পারে না। বৌদ্ধ, হিন্দু, তাওবাদী ও সকল একেশ্বরবাদী

AMARBOI.COM

বিশ্বাস একমত পোষণ করে যে পবিত্র বাস্তবতা স্রেফ দুর্জ্ঞয়, 'দূর আকাশে' নয় বরং তিনি প্রতিটি মানুষের অন্তরে বাস করেন; সুতরাং তাকে পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে দেখতে হবে। মৌলবাদী বিশ্বাস, তা সে ইহুদি, ক্রিশ্চান বা মুসলিমই হোক, ক্রোধ ও ঘৃণার ধর্মতত্ত্বে পরিণত হলে এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষেই এই ধরনের জিম্মি আটক বন্দিদের প্রতি আচরণের নির্দিষ্ট ইসলামি আইনের লঙ্ঘন করে। কোরান দাবি করে, মুসলিমদের প্রতিপক্ষের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, নিয়মিত যুদ্ধ ছাড়া বন্দি আটক (যা স্বয়ং আমেরিকান জিম্মি আটক ও তাদের বন্দি রাখা প্রত্যাখ্যান করে) বেআইনি। বন্দিদের সাথে অবশ্যই দুর্ব্যবহার করা যাবে না, বৈরিতা শেষ হয়ে যাবার পর তাদের হয় দয়া প্রদর্শন করে বা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে হবে। কোনও মুক্তিপণ না মিললে বন্দিকে কাজের সন্ধান করার সুযোগ দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে যাতে সে নিজেই সেই অর্থ যোগাতে পারে; তাকে যে মুসলিমের হেফাযতে দেওয়া হয়েছে তাকে অবশ্যই বন্দিকে সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহে সাহায্য করতে হবে।[৭] বন্দিদের প্রতি এই আচরণ সংক্রান্ত একটি হাদিস খোদ পয়গম্বরের প্রতি নির্দেশ করে। 'তোমরা যা খাবে তাকেও তাই খেতে দিতে হবে, একই রকম পোশাক পরতে দিতে হবে, কোনও কঠিন কাজ করতে দিলে তাদের সেই কাজে সাহায্য করতে হবে।'[৮] স্বৈরাচারী সরকারের হাতে তার বাস্তবভিত্তিক কারণে বিদেশের মাটিতে নির্বাসিত শিয়া ইমামদের শ্রদ্ধাকারী শিয়াদের কাছে জিম্মি আটক বিশেষভাবে নিন্দনীয় হওয়া উচিত। এভাবে জিম্মি আটক রাজনৈতিকভাবে হয়তো অর্থপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ধর্মীয় বা ইসলামির কোনওটাই নয়।

মৌলবাদ একটি যুদ্ধংদেহী বিশ্বাস, নিজেকে বৈরী পৃথিবীতে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে যুদ্ধে লিপ্ত মনে করে। এটা দৃষ্টিভঙ্গিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও অনেক সময় বিকৃত করে। আমরা যেমন দেখেছি, খোমেনি বহু মৌলবাদীকে আক্রান্তকারী এমনই বিকৃত ফ্যান্টাসিতে ভুগেছেন। ২০শে নভেম্বর, ১৯৭৯, জিম্মিদের আটক করার অল্প পরে, বেশ কয়েক শো সৌদি আরবের সুন্নি সশস্ত্র মৌলবাদী মক্কার কাবাহ্ দখল করে নেয় এবং তাদের নেতাকে মাহাদী ঘোষণা করে। খোমেনি এই অপবিত্রকরণের নিন্দা করে একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যোগসাজশের ফল বলে বর্ণনা করেছেন।[৯] সাধারণত লোকে যখন বিপদাপন্ন বোধ করে তখনই এই ধরনের ষড়যন্ত্রের ধারণা দেখা দেয়। ইরানের ভবিষ্যৎ ভাবনা ছিল ম্লান। খোমেনির ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান হারে সরকারের বিরুদ্ধে মোহমুক্তি ঘটছিল।

AMARBOI.COM

সরকারের কোনও রকম সমালোচনা বা বিরোধিতাই সহ্য করা হচ্ছিল না। ১৯৮১ সালে খোমেনির সাথে অন্য প্রধান আয়াতোল্লাহদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে; একদিকে শরীয়া আইনে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন আকাঙ্ক্ষী রেডিক্যাল ইসলামিস্ট ও অন্যদিকে বামপন্থী সেক্যুলারিস্ট ও সাধারণদের ভেতর কার্যত যুদ্ধ চলছিল। মাত্র এক বছর প্রেসিডেন্ট থাকার পর বানি সদর ২২শে জুলাই, ১৯৮১ উৎখাত হন; প্যারিসে পালিয়ে যান তিনি। ২৮শে জুন খোমেনির প্রধান যাজকীয় মিত্র আয়াতোল্লাহ বিহিশতি এবং ইসলামি বিপ্লবী দলের পঁচাত্তর জন সদস্য দলীয় হেডকোয়ার্টারে এক বোমা বিস্ফোরণে নিহন হন।[১১] এই পর্যায় অবধি খোমেনি সাধারণদের সরকারের উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্ব দিতে পছন্দ করেছেন, কিন্তু অক্টোবরে হুজ্জাত উল-ইসলাম আলি খামেনিকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার অনুমোদন দেন তিনি। মজলিসে যাজকরা এবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন। ১৯৮৩ সাল নাগাদ সরকারের সকল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করা হয়। বানি সদরের বিদায়ের পর মুজাহিদিন-ই খালক আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিল; ন্যাশনাল ফ্রন্ট, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (মুসাদ্দিকের নাতির নেতৃত্বাধীন) এবং শরিয়তমাদারির মুসলিম পিপল'স রিপাবলিকান পার্টি ভেঙে দেওয়া হয়। খোমেনি ক্রমবর্ধমানহারে 'অভিব্যক্তির সমরূপতা'র উপর জোর দিচ্ছিলেন।[১২]

কোনও একটি বিপ্লবের পর প্রায়শঃই যেমন ঘটে, নতুন শাসকগোষ্ঠী আগেরটির মতোই স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। প্রতিপক্ষের ঘেরাও অবস্থায় আদর্শিক সমরূপতার উপর জোর দিতে শুরু করেছিলেন খোমেনি। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় এটা ছিল এক নতুন বিচ্যুতি। ইহুদিবাদের মতো ইসলাম অনুশীলনের সমরূপতার দাবি করলেও কখনওই মতবাদগত অর্থডক্সির কথা বলেনি। শিয়াদের একজন *মুজতাহিদের* ধর্মীয় আচরণের অনুকরণ *(তাকলিদ)* করার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের সাথে ঐকমত্য পোষণ করার কথা ছিল না তাদের। কিন্তু এখন খোমেনি জোরের সাথে ইরানিদের তাঁর বেলায়েত-ই ফাকিহ মেনে নিতে ও সব ধরনের বিরোধিতা ভুলে যাবার কথা বলছিলেন। 'অভিব্যক্তির ঐক্য', ১৯৭৯ সালে *হাজ্জ* যাত্রীদের উদ্দেশে বলেছিলেন তিনি, 'বিজয়ের আসল রহস্য।'[১৩] সঠিক আদর্শ বেছে না নেওয়া পর্যন্ত জনগণ তিনি তাদের জন্যে যেমন আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতা আশা করছেন সেটা অর্জন করা সম্ভব হবে না। মতামতের প্রশ্নে কোনও গণতন্ত্র থাকবে না; জনগণকে অবশ্যই প্রধান *ফাকিহকে* মেনে চলতে হবে, যাঁর অতীন্দ্রিয় যাত্রা তাঁকে 'প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস' যুগিয়েছে। তখনই তারা ইমামদের পথে চলতে পারবে।[১৪] কিন্তু এর অর্থ স্বৈরাচার ছিল না। বৈরী বিশ্বে টিকতে হলে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। 'ইসলাম আজ শত্রু ও ব্লাসফেমির মুখোমুখি,' আযেরবাইযানের এক

AMARBOI.COM

প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন তিনি। 'আমাদের প্রয়োজন ক্ষমতা। মহান ও প্রশংসিত আল্লাহ'র শরণাপন্ন হয়ে এবং অভিব্যক্তির ঐক্যের ভেতর দিয়ে ক্ষমতা লাভ করা যেতে পারে।'[১৫] পরাশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চাইলে মুসলিমদের অন্তর্কলহে লেগে থাকলে চলবে না। আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ার কারণে দীর্ঘদিন 'দুই জাতিতে' বিভক্ত ইরানকে ঐক্যবদ্ধ ও ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে হলে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

খোমেনি পিতামাতাদের সরকারের প্রতি বৈরী সন্তানদের ত্যাগ করার ও যেসব ইরানি ধর্ম নিয়ে পরিহাস করে তাদের ধর্মদ্রোহী ঘোষণা ও মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য অপরাধে অপরাধী হিসাবে তাদের বিচারের নির্দেশ দিলে বোধগম্যভাবেই পশ্চিমারা ভীত হয়ে উঠেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় এক পবিত্র মূল্যে পরিণত হওয়া বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার আদর্শের লঙ্ঘন ছিল এটা। কিন্তু পশ্চিমারা এটাও লক্ষ করতে বাধ্য হয়েছিল যে খোমেনি কখনওই ইরানি জনগণকে, বিশেষ করে *বাজারি*, *মাদ্রাসা* ছাত্র, অল্প-পরিচিত *উলেমা* ও দরিদ্রদের ভুলে যাননি।[১৬] শাহর আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় এদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এরা আধুনিক রীতিনীত উপলব্ধি করতে পারেনি। পাশ্চাত্য সেক্যুলারিস্টরা যেখানে ঐতিহ্য অগ্রাহ্য করাকে প্রোমিথিয়ান ও বীরত্বসূচক মনে করতে শিখেছে, খোমেনির অনুসারীরা সেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকেই সর্বোচ্চ মূল্যবিশিষ্ট হিসাবে দেখে আসছিল; তারা ব্যক্তির অধিকারকে পরম মনে করেনি। খোমেনিকে বুঝতে পারলেও পশ্চিমকে বুঝতে পারেনি তারা। তখনও ধর্মীয়, প্রাক আধুনিক ঢঙে কথা বলেছে, ভেবেছে, পশ্চিমারা যা বুঝতে পারেনি। কিন্তু নিজেকে পোপিয় আবহ দিচ্ছিলেন না খোমেনি। তিনি জোর দিচ্ছিলেন যে, তাঁর 'ভ্রান্তিহীনতা'র মানে এই নয় যে তিনি ভুল করেন না। তিনি তাঁর প্রতিটি কথাকেই ঐশী অনুপ্রাণিত বাণী ভেবে বসা শিষ্যের প্রতি বিরক্ত বোধ করেছেন। 'আমি গতকাল এমন কিছু বলে থাকতে পারি, যেটা আজ বদলে ফেলেছি, আবার কালও বদলে ফেলব,' ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ানের যাজকদের উদ্দেশে বলেছিলেন তিনি। 'এর মানে এই নয় যে গতকাল আমি একটা বিবৃতি দিয়েছিলাম বলেই একে ধরে বসে থাকতে হবে।'[১৭]

তাসত্ত্বেও 'অভিব্যক্তির ঐক্য' ছিল সীমাবদ্ধ, কেউ কেউ বলবেন, ইসলামের বিকৃতিও। ইহুদি ও ক্রিশ্চান মৌলবাদীরাও—অনেক সময় কঠোরভাবে—কেবল ধর্ম সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক বলে তাদের নিজস্ব ঢঙে গোঁড়া সমরূপতার উপর জোর দিয়েছে। খোমেনির 'অভিব্যক্তির ঐক্য' ইসলামের আবিশ্যিক বিষয়গুলোকে মতাদর্শের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে; খোমেনির নিজস্ব তত্ত্বকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে স্বর্গীয় সত্যি সংক্রান্ত নেহাতই মানবীয় ধারণাকে পরম মর্যাদা দান করে

বহুঈশ্বরবাদীতার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু খোমেনির বিপদাশঙ্কা থেকেও এর সৃষ্টি হয়েছিল। বছরে পর বছর ধর্মের প্রতি ধ্বংসাত্মক এক আগ্রাসী সেক্যুরাইজড শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছিলেন তিনি; সাদ্দামের বিরুদ্ধে লড়তে হাচ্ছিল তাঁকে, ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতি বহির্বিশ্বেও চরম বৈরিতার ব্যাপারে তীক্ষ্ণভাবে সজাগ ছিলেন। 'অভিব্যক্তির ঐক্য' ছিল আত্মরক্ষামূলক উপায়। ইরানকে আরও একবার ইসলামী দেশে পরিণত করে খোমেনি ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্দত এক খোদাহীন বিশ্বে একটা নতুন বিরাট ছিটমহল সৃষ্টি করছিলেন। দমননীতির অভিজ্ঞতা, অনুমিত বিপদ এবং ক্রমবর্ধমান সেক্যুলার বিশ্বের মূল অস্তিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার ধারণা যুদ্ধংদেহী আধ্যাত্মিকতার সৃষ্টি করেছে এবং ইসলামের বিকৃত ছবি তৈরি করেছে। দমনের অভিজ্ঞতা ছিল ভীতিকর, ফলে নিপীড়ক ধর্মীয় দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে।

খোমেনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, বিপ্লব আধুনিক বিশ্বের যৌক্তিক বাস্তববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল। লোকে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, দুর্জ্ঞেয় লক্ষ্য বিশিষ্ট একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে রাজি আছে তারা। 'একটি উন্নত আবাস পেতে কেউ কি তার সন্তানকে শহীদ হওয়ার পথে ঠেলে দিতে রাজি আছে?' ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে কারুশিল্পীদের এক সমাবেশে প্রশ্ন রেখেছিলেন তিনি। 'এটা কোনও ইস্যু নয়। ইস্যু হচ্ছে অন্য জগৎ। শাহাদৎ মানেই ভিন্ন জগতের জন্যে। আল্লাহ'র সকল পয়গম্বর ও সাধুই এই শাহাদৎ কামনা করে এসেছেন...জাতিও এই অর্থ চায়।'[১৭] বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ জীবনের পরম অর্থ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এটা সব সময়ই মিথের এখতিয়ার ছিল। পশ্চিমে মিথলজির পরিত্যাগ কোনও কোনও মহলে এক অনুমিত শূন্যতার জন্ম দিয়েছে, সার্ত্র যাকে ঈশ্বর আকৃতির গহ্বর হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বহু ইরানি তাদের দৈনন্দিন ও রাজনৈতিক জীবনে আকস্মিক অন্তর্মুখীনতায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। খোমেনি বিশ্বাস করেছিলেন, মানুষ তিনমাত্রার প্রাণী; তাদের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত চাহিদা রয়েছে, এবং ধর্মকে কেন্দ্রিয় পরিচয়ে পরিণতকারী একটি রাষ্ট্রের পক্ষে প্রাণ উৎসর্গ করার ইচ্ছা প্রদর্শন করে তাদের সম্পূর্ণ মানবিক পরিচয় উদ্ধারের প্রয়াস পাচ্ছিল তারা।[১৮] স্বয়ং খোমেনি এমনকি সংকটের কালেও রাজনীতির দুর্জ্ঞেয় বৈশিষ্ট্য খুব কমই বিস্মৃত হতেন। ইরান-ইরাক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বানি সদর সাবেক শাহর সামরিক কর্মচারীদের কারাগার থেকে মুক্ত করে সরাসরি অপারেশনে পাঠানো ফলদায়ী হতে পারে বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রত্যাখ্যান করেছেন খোমেনি। তিনি বলেছিলেন, বিপ্লব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংক্রান্ত ছিল না। তিনি ইমাম আলির শাসনের বিরোধিতাকারী সিরিয়ায় উমাঈয়া

AMARBOI.COM

রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধকালীন একটি গল্প বলেছিলেন। সেনাবাহিনী যুদ্ধে রওয়ানা দেওয়ার ঠিক আগে আলি সৈনিকদের উদ্দেশে স্বর্গীয় একত্ব *(তাওহিদ)* সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর কর্মকর্তারা এমন একটা সময়ে এই ধরনের বয়ান উপযুক্ত কিনা জানতে চাইলে আলি জবাব দিয়েছিলেন: 'কোনও পার্থিব লাভালাভের জন্যে নয়, বরং এই কারণেই আমরা মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছি।'[২০] যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল *উম্মাহ্*র ঐক্য রক্ষা করা, যাকে অবশ্যই ঈশ্বরের একত্বের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। মুসলিমরা *তাওহিদে*র জন্যে যুদ্ধ করছিল, সিরিয়া জয় করার জন্যে নয়।

এটা অবশ্যই শ্রদ্ধাযোগ্য, কিন্তু এখানে একটা সমস্যা রয়েছে। মানুষের অর্থ ও *মিথোসে*র প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাদের আবার কঠিন, যৌক্তিক *লোগোস*ও প্রয়োজন। প্রাক আধুনিক সমাজে এই দুটি বলয়কে অবিচ্ছেদ্য মনে করা হয়েছে। কিন্তু মিথকে যেমন যৌক্তিক বা যুক্তিভিত্তিক পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়নি, ঠিক তেমনি একে বাস্তব রাজনীতিতেও প্রকাশ করা যায়নি। এটা কঠিন ছিল, এবং অনেক সময় আবশ্যিকভাবে ধর্ম ও রাজনীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। ইমামতের ধর্মতত্ত্ব দেখিয়েছে যে, অতীন্দ্রিয় দর্শন ও একজন রাষ্ট্রনায়কের প্রয়োজনীয় কঠিন বাস্তববাদীতার ভেতর এক ধরনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে। খোমেনি অনেক সময় *মিথোস* ও *লোগোসে*র সূক্ষ্ম পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছেন। এর ফলেই তাঁর বেশ কিছু নীতি বিপর্যয়কর ছিল। জিম্মি সংকটের পরপর তেলের আয় আকস্মিক হ্রাস ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের অভাবে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আদর্শগত শুদ্ধি পররাষ্ট্র দপ্তর ও শিল্পক্ষেত্রে যোগ্য লোকের অভাব সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমকে বৈরী করে ইরান গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম, খুচরো যন্ত্রাংশ এবং কারিগরি পরামর্শ বাজেয়াপ্ত করেছিল। ১৯৮২ সালে দাগাদ মুদ্রাস্ফীতি চড়ে ওঠে, সৃষ্টি হয়েছিল ভোগ্যপণ্যের মারাত্মক ঘাটতির, বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগে (৫০ ভাগ শহরে)।[২১] জনগণের ভোগান্তি ধর্মীয় দিক থেকে জনকল্যাণকে ক্ষমতায় আসার এজেন্ডার একেবারে সবার উপরে স্থান দানকারী সরকারের পক্ষে বিব্রতকর ছিল। দরিদ্রদের জন্যে যথাসাধ্য করেছেন খোমেনি। পাহলভীদের আমলে সবচেয়ে দুর্দশার শিকার অংশের ভোগান্তি লাঘবে ফাউন্ডেশন ফর দ্য ডাউনট্রডেন প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ফ্যাক্টরি ও ওয়ার্কশপে ইসলামি সংগঠনসমূহ শ্রমিকদের সুদবিহীন ঋণের যোগান দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কন্সট্রাকশন জিহাদ কৃষক সমাজের জন্যে এবং কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক প্রকল্পে, বিশেষ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় নতুন দালানকোঠা নির্মাণের জন্যে তরুণ শ্রমিক নিয়োগ করেছে। কিন্তু ইরাকের সাথে যুদ্ধে কারণে এইসব প্রয়াস মার খেয়ে গেছে, যা খোমেনির সৃষ্টি ছিল না।

অতীন্দ্রিয় ও প্রায়োগিকের মধ্যকার টানাপোড়েন সম্পর্কে সজাগ ছিলেন খোমেনি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, একটি আধুনিক রাষ্ট্রের জনসংশ্লিষ্টতা ও সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রয়োজন। পাশ্চাত্য এর নিজস্ব আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় যেমন আবিষ্কার করেছে, এটাই শিল্পায়িত, প্রযুক্তিয়ায়িত সমাজে কার্যকর একমাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা। আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনগণের কাছে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্যে ইসলামি প্রেক্ষাপট দান করাই ছিল তাঁর বেলায়ত-ই ফাকিহ তত্ত্বের প্রয়াস। প্রধান ফাকিহ ও কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ানস নির্বাচিত মজলিসকে পাশ্চাত্য সেক্যুলারিস্ট আদর্শের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে অক্ষম মুসলিমদের প্রয়োজনীয় একটি অতীন্দ্রিয় ধর্মীয় তাৎপর্য দেবে: বেলায়েত-ই ফাকিহ এভাবে পার্লামেন্টের বাস্তব কর্মকাণ্ডের জন্যে একটি অতীন্দ্রিয় ভিত্তি প্রদান ও আধুনিকতাকে ঐতিহ্যবাহী দর্শনে ধারণ করার একটি প্রয়াস ছিল। কিন্তু নাজাফের *মাদ্রাসায়* বেলায়েত-ই ফাকিহ গড়ে তুলেছিলেন খোমেনি। বলা হয়ে থাকে, কাগজে কলমে ভালো হলেও ইরানের মাটিতে বাস্তব প্রয়োগ করতে গিয়ে সেটা সমস্যাসঙ্কুল প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৮১ সালের গোড়ার দিকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, এবং এই সমস্যা খোমেনিকে বাকি জীবন জ্বালিয়ে মেরেছে।[২২]

১৯৮১ সালে মজলিস সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করবে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই পদক্ষেপের প্রতি খোমেনির সহানুভূতি ছিল। শরীয়াহর বিধানের বিরোধী হলেও জনগণ এতে উপকৃত হত। তিনি এও বুঝতে পারছিলেন যে ইরান এই ধরনের মৌলিক সংস্কার অর্জন করতে না পারলে তা কৃষিভিত্তিক ও সামন্তবাদী রয়ে যাবে, যেকোনও আধুনিকায়ন প্রয়াসই হবে উপরিগত। কিন্তু ভূমি সংস্কার বিল সমস্যার মুখে পড়ে। সংবিধান অনুযায়ী সকল আইনেরই কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ান্স কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার কথা ছিল; তাদের মতে ইসলাম বিরোধী হলে যেকোনও আইন নাকচ করার ক্ষমতা ছিল তাঁদের। কাউন্সিলের বহু *উলেমারই* বিপুল পরিমাণ জমি ছিল, তাদের সামনে বিলটি উপস্থিত করা হলে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাঁরা, তাঁদের সিদ্ধান্তের পক্ষে শরীয়াহ আইনের উল্লেখ করেন। খোমেনি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। যাজকগণের, তিনি বলেন, 'যোগ্যতা নেই এমন কোনও বিষয়ে নাক গলানো উচিত নয়।' সেটা 'ক্ষমার অযোগ্য পাপ হবে, কারণ তাতে যাজকদের প্রতি জাতির মনে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হবে।'[২৩] যাজকগোষ্ঠী ধর্ম ও *ফিকহ* বুঝলেও আধুনিক অর্থনীতি বোঝেন না; ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে অবশ্যই একটি আধুনিক রাষ্ট্র হতে হবে, যেখানে নিজস্ব দক্ষতার ক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন।

কিন্তু অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে। কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ান্স এই ইস্যুতে পিছু হটতে অস্বীকৃতি জানায়, খোমেনি আরও আধ্যাত্মিক কৌশলের আশ্রয় নেন। ১৯৮১ সালের মার্চে যাজকদের একটি দলকে তিনি বলেন: 'নিজেকে সংস্কার না করে কারও অন্যকে সংস্কার করার চিন্তা করা উচিত নয়।' খোদ যাজকগণই স্বার্থপরতা আর অর্থহীন ক্ষমতায় দ্বন্দ্বে ব্যস্ত থাকলে সাধারণ জনগণকে আর ইসলামে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। *উলেমার* প্রতিটি সদস্যকে অবশ্যই দেশের উন্নয়নে বাধার সৃষ্টিকারী এই অহমবাদ অতিক্রম করতে হবে। সমাধান হচ্ছে 'এমন এক পর্যায়ে উঠে আসা যেখানে তুমি...নিজেকে উপেক্ষা করতে পারবে,' উপসংহারে পৌছেছেন খোমেনি, 'যখন প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠার মতো কোনও সত্তা থাকে না, তখন আর কোনও বিরোধ, কোনও সংঘাত থাকে না।'[২৫] খোমেনি অনুসৃত অতীন্দ্রিয় *ইরফান* থেকেই এর সরাসরি উদ্ভব; সন্ধানী আল্লাহ'র নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে নিজেকে পরিবর্তনকারী আল্লাহ'র দর্শনকে ধারণ করতে না পারা পর্যন্ত স্বার্থপর আশাআকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত করে নেয়। কিন্তু আধুনিক রাজনীতির গতিময়তা আধ্যাত্মিক ধ্যানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ান্সের *উলেমাগণ* খোমেনির আবেদনে কান দেননি। রাজনীতি সাধারণভাবে নারী-পুরুষকে সত্তার উন্নত সত্তা দিয়ে আকর্ষণ করে। আধুনিক সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পর বিরোধী স্বার্থের একটা ভারসাম্যের ভেতর দিয়ে কাজ করে, এই ধরনের আত্মবিনাশ দিয়ে নয়। বেলায়েত-ই ফাকিহ'র প্রবর্তনের সময় খোমেনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ান্সের উলেমাগণ অদৃশ্যের অতীন্দ্রিয়, গোপন *(বাতিন)* মূল্যবোধসমূহকে নিশ্চিত করবেন; কিন্তু সে জায়গায় তাদের সাধারণ মরণশীলদের মতোই *যাহিরের* বস্তুবাদে আটকে আছেন বলে মনে হয়েছে।

কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ান্সের সাথে অচলাবস্থার অবসানের লক্ষ্যে *মজলিসের* প্রাণবন্ত বক্তা হোজ্জাত উল-ইসলাম রাফসানজানি খোমেনিকে প্রধান ফাকিহ হিসাবে ভূমি সংস্কার বিল পাসে তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগের আবেদন জানালেন। ইসলামি বিষয়ে সংবিধান প্রধান ফাকিহকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার দিয়েছে। কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ান্সের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারতেন তিনি। রাফসানজানি পরামর্শ দিলেন যে, খোমেনি চাইলে জনগণের কল্যাণে প্রয়োজন হলে একজন জুরিস্টকে কোরান ও সুন্নাহয় প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়নি এমন সব বিষয়ে 'দ্বিতীয় পর্যায়ের' বিধান দেওয়ার ক্ষমতাদানকারী ইসলামি নীতি *মাসলাহাহ*'র উদ্ধৃত করতে পারেন। কিন্তু খোমেনি তেমন কিছু করতে চাননি। তিনি বুঝতে শুরু করেছিলেন যে, প্রধান ফাকিহর অবস্থান আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের যে কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন সেটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। প্রবীন মানুষ ছিলেন তিনি।

ব্যক্তিগত ক্যারিশমা অনুযায়ী তিনি সরকারের সিদ্ধান্তে নাক গলানো ও তা বদলে দিতে থাকলে মজলিস ও কাউন্সিল সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা ও অখণ্ডতা হারাবে, ইসলামি সংবিধান মরণ থেকে রেহাই পাবে না। কাউন্সিল ও মজলিসের এই টানাপোড়েন অব্যাহত ছিল।

ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রতিদিন শাহাদৎ বরণ করে চলা ইরানি শিশুদের উদাহরণ টেনে *উলেমাদের* লজ্জা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন খোমেনি। এই শিশু শহীদরা একটি অতীন্দ্রিয় দর্শনকে বাস্তব নীতিতে পরিণত করার নৈতিক বিপদ তুলে ধরেছে। যুদ্ধ ঘোষণার মুহূর্ত থেকে কিশোররা তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠানোর আবেদন জানাতে মসজিদে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল। তাদের অনেকেই বিপ্লবের সময় রেডিক্যাল হয়ে ওঠা বস্তি ও শ্যান্টি টাউন থেকে এসেছিল। পরে তাদের অনিবার্যভাবে বিষণ্ন ও গম্ভীর জীবনকে অ্যান্টিক্লাইমেক্স হিসাবে আবিষ্কার করে। কেউ কেউ ফাউন্ডেশন ফর দ্য ডাউনট্রডেনে যোগ দিয়েছে বা কন্সট্রাকশন জিহাদে কাজ করেছে, তবে এর সাথে রণক্ষেত্রের উত্তেজনার কোনও তুলনা চলতে পারে না। ইরান যুদ্ধের পক্ষে কারিগরি দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল না; জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছিল, দেশের তরুণরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফাউন্ডেশন ফর দ্য ডাউনট্রডেন অ্যাকশনের জন্যে উদগ্রীব বিশ মিলিয়ন তরুণের এক সেনাবাহিনীর নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়েছিল। বার বছরের কিশোররা যাতে বাবা মায়ের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধে যাবার জন্যে নাম লেখানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সেজন্যে সরকার একটি আইন পাশ করে। ইমামের শিষ্যে পরিণত হবে তারা, মারা গেলে তাদের স্বর্গে স্থান পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ কিশোর রক্তরাঙা পট্টি (শহীদের চিহ্ন) পরে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীড় জমাতে শুরু করেছিল। কেউ কেউ মাইনফিল্ড পরিষ্কার করেছে, সেনাবাহিনীর সামনে থেকে দৌড়ে গেছে এবং প্রায়শঃই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। অন্যরা পরিণত হয়েছিল আত্মঘাতী বোমাহামলাকারীতে, কামিকাযি স্টাইলে ইরাকি ট্যাংকের উপর হামলা করেছে। তাদের অছিয়তনামা লেখাতে বিশেষ লিপিকারদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে, সেগুলোর বেশকয়েকটাই ইমাম খোমেনির কাছে লেখা চিঠির রূপ নিয়েছিল, এবং 'বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে বেহেশতের পথে' যুদ্ধ করার আনন্দ ও তাদের জীবনে তাঁর বয়ে আনা আলোর কথা বলেছে সেগুলো।[২৫]

এই তরুণরা বিপ্লবে খোমেনির বিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। অদৃশ্যের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে 'সাক্ষী' হতে ইমাম হুসেইনের নজীর অনুসরণ করে প্রাণ দিচ্ছিল তারা। এটা ছিল নিগূঢ়বাদের সর্বোচ্চ রূপ, যার মাধ্যমে একজন মুসলিম নিজেকে অতিক্রম করে ঈশ্বরের সাথে ঐক্য অর্জন করে। তাদের প্রবীন পুরুষদের বিপরীতে

AMARBOI.COM

এই শিশুরা আর স্বার্থপরতা ও বস্তুগত জগতের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা 'প্রকৃতির দাস' থাকেনি। ইরানকে তারা 'এমন একটি অবস্থা অর্জনে সাহায্য করছিল যাকে স্বর্গীয় বলে উল্লেখ করা ছাড়া আর কোনওভাবেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়।'[২৬] নারী-পুরুষ যতক্ষণ বস্তু ও পার্থিব বিষয়ের দিকে মনোযোগী থাকবে, মানবেতরে পরিণত হবে তারা। 'মৃত্যু মানে কিছু না নয়,' ঘোষণা করেছিলেন খোমেনি। 'এটাই জীবন।'[২৭] শাহাদৎ বরণ পাশ্চাত্য যৌক্তিক বাস্তববাদীতার বিরুদ্ধে ইরানের বিদ্রোহ ও জাতীয় আত্মার জন্যে মহান জিহাদের ক্ষেত্রে আবিশ্যিক জরুরি অংশে পরিণত হয়েছিল।[২৮] কিন্তু খোমেনির শাহাদৎ বরণ 'কিছু না নয়' বলে জোর দেওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার শিশুকে ভীতিকরভাবে অকাল সহিংস মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার ভেতর নিহিলিজম ছিল। এটা জীবনের পবিত্র অলঙ্ঘনীয়তা সংক্রান্ত এবং প্রয়োজনে আমাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও সন্তানদের জীবন বাঁচানোর সহজাত ত্যাগীদের ধার্মিক ও সেক্যুলারিস্ট সবার পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধ বিরোধী। শিশু শহীদের এই কাল্ট তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসের মৌলবাদীরা সমানভাবে প্রবণ ধর্মের এমন আরেকটি মারাত্মক বিকৃতি। সম্ভবত এর উদ্ভব ঘটেছে আমাদের ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষী শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার ভীতি থেকে। তবে অতীন্দ্রিয়, পৌরাণিক আত্মাকে একটি বাস্তব ভিত্তিক, সামরিক বা রাজনৈতিক নীতিমালায় পরিবর্তনের বিপদটুকুও তুলে ধরে এটা। মোল্লা সদরা সত্তার অতীন্দ্রিয় মৃত্যুর কথা বলার সময় হাজার হাজার তরুণের স্বেচ্ছা শারীরিক মৃত্যুর কথা ভাবেননি। আবার, আধ্যাত্মিক বলয়ে নিপুণভাবে কাজ করে এমন কিছুকেই আক্ষরিক ও প্রায়োগিকভাবে পার্থিব জীবনে অনূদিত হলে তা বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে।

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ করা যে খুবই কঠিন সেটাই পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হতে চলেছিল। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে নাজুক ও অসুস্থ খোমেনি আরও একবার সাংবিধানিক বিভিন্ন ইস্যুতে ভাষণ দেন। এইবার কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ান্স শ্রম আইনে বাধার সৃষ্টি করছিল, তাদের মতে এটা শরীয়াহ বিরোধী ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল ও অভিজাতপন্থী *উলেমাদের* চেয়ে জনপ্রিয় মজলিসের সমর্থক খোমেনি জনগণের কল্যাণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রের মৌলিক ইসলামি ব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকার কথা ঘোষণা করেন। শরীয়াহ ছিল প্রাক শিল্পায়ন বিধি, আধুনিক বিশ্বের বাস্তব প্রয়োজনের নিরীখে তার অভিযোজন প্রয়োজন। খোমিন যেন এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্র চাইলে

AMARBOI.COM

> যেকোনও ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শ্রম...নাগরিক বিষয়াদি, কৃষি বা অন্য কোনও ব্যবস্থা দিয়ে মৌল ইসলামি ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত করতে পারে ও সেবা দিতে পারে...এটা রাষ্ট্রের সাধারণ ও সামগ্রিক নীতিমালার বাস্তবায়নে উপায় হিসাবে একচেটিয়া অধিকার।[২৯]

স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন খোমেনি। এই ধরনের বাস্তব বিষয়ে রাষ্ট্রের অবশ্যই 'একচেটিয়া' অধিকার থাকতে হবে ও প্রথাগত ধর্মের বাধাসৃষ্টিকারী বিধিবিধান থেকে মুক্তি পেতে হবে। দুই সপ্তাহ পরে আরও অগ্রসর হন তিনি। প্রেসিডেন্ট খামেনি তাঁর মন্তব্যকে এটা বোঝাতে ব্যাখ্যা করেন যে, প্রধান ফাকিহর আইনের *ব্যাখ্যা* দেওয়ার অধিকার রয়েছে। খোমেনি জবাবে বলেন, তিনি তেমন কিছু বোঝাতে চাননি। ফাকিহ্ হিসাবে তাঁর নিজস্ব বিধানের কোনও রকম উল্লেখ না করে তিনি পুনরাবৃত্তি করেন যে, সরকার কেবল স্বর্গীয় আইনের ব্যাখ্যা করারই অধিকারী নয়, বরং খোদ আইনেরই বাহন। সরকার আল্লাহ্ কর্তৃক পয়গম্বরকে দান করা সেই স্বর্গীয় আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং 'প্রান্তিক স্বর্গীয় আইনের উপর অগ্রাধিকার রয়েছে তাঁর।' এমনকি প্রার্থনা, রমযানের উপবাস এবং *হাজ্জের* মতো 'স্তম্ভ'গুলোর ক্ষেত্রে এর অগ্রাধিকার আছে:

> সরকারের যেকোনও বৈধ চুক্তি এককভাবে রদ করার ক্ষমতা রয়েছে...সেই চুক্তি যদি ইসলাম ও দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে। ধর্মীয় বা সেক্যুলার যাই হোক না কেন, ইসলামের স্বার্থ বিরোধী হলে তাকে রোধ করতে পারে।[৩০]

শত শত বছর ধরে শিয়ারা বিভিন্ন বলয়ের বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দিয়ে এসেছে: ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পরম *মিথোস* রাজনীতির বাস্তব *লোগোসের* অর্থ যোগালেও তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এখন খোমেনি যেন জনগণের স্বার্থ ও ইসলামের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে সরকারের প্রয়াসে অবশ্যই কোনও বাধা দেওয়া যাবে না বলে জোর দিচ্ছিলেন।

অনেকে ধরে নিয়েছিল যে খোমেনি তাঁর *নিজস্ব* সরকারের কথা বোঝাচ্ছেন এবং তিনি বেলায়েত-ই ফাকিহ্ মতবাদকে ইসলামের 'স্তম্ভগুলোর' চেয়েও উচ্চতর এক পর্যায়ে তুলে আনতে চাইছেন বলে ভেবেছে। পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকগণ খোমেনির বিরুদ্ধে অতিক্ষমতাধর ভাববার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু স্পিকার রাফসানজানি উল্লেখ করেন, খোমেনি ফাকিহ্র কথা বলেননি। খোমেনির সবচেয়ে রেডিক্যাল সমর্থকদের ভীত করে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, 'সরকার' বলে খোমেনি

AMARBOI.COM

মজলিসের কথাই বুঝিয়েছেন। ১২ই জানুয়ারি, ১৯৮৮ এক অসাধারণ বয়ানে রাফসানজানি বেলায়েত-ই ফাকিহ্‌র এক নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেন। আল্লাহ পয়গম্বরের মাধ্যমে কোরানে উম্মাহ্‌র প্রয়োজনীয় সকল আইন প্রকাশ করেননি। তিনি এই ক্ষমতা মুহাম্মদকে (স) প্রদান করেছেন, যিনি তাঁর 'ভাইস-জিরেন্টে' পরিণত হয়েছেন এবং এইসব গৌণ বিষয়ে তাঁকে নিজস্ব সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব দিয়েছেন। এখন প্রধান ফাকিহ ইমাম খোমেনি নিজের ক্ষমতা মজলিসের হাতে তুলে দিয়েছেন, নিজস্ব সহজাত বিবেচনা থেকেই এখন মজলিসকে আইন প্রণয়ন করতে হবে। এর মানে কি তবে ইরান পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিল? কোওনভাবেই না। আইন প্রণয়নের এই অধিকার জনগণ নয়, এসেছে আল্লাহ'র কাছ থেকে, যিনি তাঁর ক্ষমতা পয়গম্বর, ইমাম এবং এখন ইমাম খোমেনিকে দিয়েছেন এবং তারাই–জনগণ নয়–মজলিসের শাসনের বৈধতা দান করেছেন। 'সুতরাং বুঝতেই পারছেন,' তাগিদ দিয়েছেন রাফসানজানি, 'গণতন্ত্র পশ্চিমের চেয়ে ঢের ভালো রূপে উপস্থিত রয়েছে,' কারণ তা আল্লাহয় প্রোথিত। এটা 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্যে, বেলায়েত-ই ফাকিহ্‌র অনুমতিতে স্বাস্থ্যকর সরকার পদ্ধতি।'[৩১] আবারও পশ্চিমের মতোই আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ইরানকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু এবার তা এসেছে ইসলামি মোড়কে যার সাথে জনগণ নিজেদের সম্পর্কিত করতে এবং তাদের নিজস্ব শিয়া ঐতিহ্যের সাথে একে সংযুক্ত করতে পেরেছে।

রাফসানজানি সম্ভবত নিজের সীমার বাইরে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু খোমেনিকে খুশি মনে হয়েছে। ১৯৮৮ সালের বসন্তকালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি যাজকদের কোনও উল্লেখ ছাড়াই স্রেফ মজলিসকে সমর্থন করার জন্যে জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষী জনগণ সুপ্ত ভর্ৎসনা বুঝতে ভুল করেনি, *উলেমারা* অর্ধেক আসন খুইয়েছিল। নতুন মজলিসে ২৭১ সদস্যের মধ্যে ৬৩ জন সদস্য প্রথাগত *মাদ্রাসা* শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন।[৩২] আবার, খোমেনিকে ফলাফলে সন্তুষ্ট মনে হয়েছে। ১৯৮৮ সালের শীতে সংবিধানের সংশোধন আকাঙ্ক্ষী অধিকতর বাস্তববাদী রাজনীতিবিদদের প্রতিও সবুজ সঙ্কেত দান করেছিলেন তিনি। অক্টোবরে *উলেমারা* যাতে দেশের প্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যে তাগিদ দেন তিনি। পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেবেন 'বিশেষজ্ঞরা, বিশেষ করে কেবিনেট মন্ত্রী, উপযুক্ত মজলিস কমিটিসমূহ,...বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা কেন্দ্রগুলো,...উদ্ভাবক, আবিষ্কারকারী এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ বিশেষজ্ঞ।'[৩৩] দুই মাস পরে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে একটি কমিটিকে কাজ করার অনুমতি

AMARBOI.COM

দান করেন তিনি। অধিকতর রেডিক্যাল ইসলামপন্থীরা হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু ইমামের অনুমোদনে বাস্তববাদীরা বিজয়ী হচ্ছিল বলে মনে হয়েছে।

এমনি অন্তর্কলহের প্রেক্ষাপটে মৃত্যুর চার মাস আগে ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ব্রিটিশ ভারতীয় লেখক সালমান রুশদির বিরুদ্ধে ফতওয়া জারি করেন খোমেনি। রুশদি তাঁর *দ্য স্যাটানিক ভার্সেস* উপন্যাসে এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন বহু মুসলিমের কাছে যাকে পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) ব্লাসফেমাস চিত্রায়ন মনে হয়েছে। পয়গম্বরকে এখানে একজন কামুক, প্রতারক ও স্বেচ্ছাচারী হিসাবে তুলে ধরেছেন তিনি–এবং সবচেয়ে বিপজ্জনকভাবে–বলার চেষ্টা করেছেন যে কোরান শয়তানি প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এটা এমন এক উপন্যাস যা অনন্য সাধারণভাবে উত্তর আধুনিক বিশ্বের ঝিম লাগানো দ্বিধা তুলে ধরেছে। যেখানে কোনও সীমা নেই, নিশ্চয়তা নেই, পরিষ্কার বা সহজবোধ্য নির্দিষ্ট পরিচয় নেই। আক্রমণাত্মক অনুচ্ছেদগুলো ছিল এক ধরনের ব্রেক ডাউনে আক্রান্ত ও পাশ্চাত্যের ইসলামবিরোধী কুসংস্কার লালনকারী একজন বিভ্রান্ত ভারতীয় চিত্র তারকার স্বপ্ন ও কল্পনা। ব্লাসফেমি ছিল আঁকড়ে ধরা অতীতের স্মৃতি বাতিল করে প্রাচীন বিভিন্ন সূত্র থেকে মুক্ত একটি স্বাধীন পরিচয় অর্জন করারও প্রয়াস। কিন্তু বহু মুসলিম মুহাম্মদের (স) এই ছবিকে গভীরভাবে আঘাতসৃষ্টিকারী হিসাবে অনুভব করেছে। এটা তাদের নিজস্ব মুসলিম *ব্যক্তিত্বের* পবিত্র কিছুর লঙ্ঘন মনে হয়েছে। ব্রিটেনের অন্যতম উদার মুসলিম ড. যাকি বাদাওয়ি *দ্য গার্ডিয়ান* পত্রিকাকে বলেছেন, রুশদির বাক্যগুলো 'কোনও মুসলিমের আপন বোনকে ধর্ষণ করার চেয়েও ঢের বেশি খারাপ।' প্রতিটি মুসলিম সত্তার ইসলাম চর্চায় পয়গম্বর এমনি অন্তস্থঃ সত্তায় পরিণত হয়েছেন যে উপন্যাসটি 'যেন আপনার দেহে ছুরিকাঘাত করা বা আপনার বোনকে ধর্ষণ করার মতো।'[৩৪] পাকিস্তানে দাঙ্গা হয়েছে, এবং ইংল্যান্ডের ব্র্যাডফোর্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে বইটি পোড়ানো হয়েছে। এখানে পাকিস্তান ও ভারতীয় বংশোদ্ভুত মুসলিমদের এক বিরাট অংশ বাস করে, এরা কেবল ক্রিশ্চান ধর্মের প্রতি আক্রমণের জন্যেই শাস্তি দানকারী ব্রিটিশ ব্লাসফেমি আইনের প্রতি আপত্তি জানিয়েছে। ইংল্যান্ডে ব্যাপক বিস্তৃত কুসংস্কার সম্পর্কে সজাগ ছিল তারা। ১৩ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিসের গুলিবর্ষণের দৃশ্য দেখে খোমেনি ধরে নেন উপন্যাসটা অবশ্যই খারাপ। তাঁর ফতওয়া সারা বিশ্বের মুসলিমদের 'যেখানেই পাওয়া যাক সালমান রুশদি ও তাঁর প্রকাশককে হত্যা করার' নির্দেশ দেয়।

পরের মাসে অনুষ্ঠিত ইসলামিক কনফারেন্সে পঁয়তাল্লিশটি সদস্যের ভেতর চুয়াল্লিশটি দেশ অনৈসলামিক হিসাবে ফতওয়ার নিন্দা করে। ইসলামি বিধানে

AMARBOI.COM

কোনও অভিযুক্তকে বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দান অনুমোদনযোগ্য নয়, অমুসলিম দেশে মুসলিম আইনও প্রয়োগ করা যায় না। ইসলামের আরও একটি বিকৃতি ছিল এই ফতওয়াটি। খোমেনির অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক গুরু মোল্লা সদরা তীব্রভাবে এই ধরনের অনুসন্ধায়ী সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরোধিতা করেছেন। চিন্তার স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। আরও একবার ইসলাম একটি মারাত্মক আঘাত সহ্য করেছে, এই বিশ্বাস থেকে মুসলিম ক্ষোভের উদ্ভব হয়েছিল; বহু বছরের দমন, মর্যাদাহ্রাস ও সেক্যুলারিস্ট হামলা মুসলিম কাণ্ডজ্ঞানকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। ফতওয়া ছিল এক ধরনের যুদ্ধ, পশ্চিমের সেক্যুলার ও উদারপন্থীরা একে সেভাবেই দেখেছে, তারা তাদের সবচেয়ে পবিত্র মূল্যবোধ লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে করেছে। তাদের চোখে, মানবতা–অতিপ্রাকৃত আল্লাহ নন–সকল জিনিসের পরিমাপক; নারী-পুরুষকে অবশ্যই তাদের মননশীলতার সর্বোচ্চ শিখরে ওঠার জন্যে স্বাধীনতা দিতে হবে। মুসলিম, যাদের কাছে আল্লাহ'র সাবভৌমত্বই শেষ কথা, তারা এটা মেনে নিতে পারেনি। রুশদি ঘটনা ছিল সমন্বয়ের অতীত দুটি অর্থভক্তির সংঘাত; কোনও পক্ষই অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারেনি। একই দেশে বাসরত বিভিন্ন গ্রুপ একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ও সম্ভাব্য যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

১৯৮৯ সালের জুন মাসে খোমেনির পরলোকগমনের পরপরই ধার্মিক ও সেক্যুলারিস্টদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমে খোমেনিকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করা হত, তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ইরানিদের বাঁধভাঙা শোকের মাতম দেখে লোকে মহাবিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কফিন ঘিরে জনতা এমন প্রবলভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল যে লাশ উল্টে পড়ে গিয়েছিল; ইমামকে যেন চিরকালের জন্যে নিজেদের কাছে রেখে দিতে চেয়েছিল তারা। অবশ্য, তাঁর মৃত্যুর পর ইসলামি প্রজাতন্ত্র ভেঙে খানখান হয়ে যায়নি। প্রকৃতপক্ষেই, তা ব্যাপক স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে। জিম্মি ইস্যুর মতো *ফতওয়া* পশ্চিমের শত্রুতা যোগালেও ইরান পাশ্চাত্য চেতনার কাছাকাছি অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয়েছে। ৯ই জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে পাশ হওয়া নতুন সংবিধান একটি অধিকতর সেক্যুলার, বাস্তবভিত্তিক ধরনের সরকারের দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ তুলে ধরেছে। প্রধান ফাকিহ্র উপর আর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আরোপ করা হচ্ছিল না, কিংবা খোমেনির মতো জনপ্রিয় গ্রহণযোগ্যতায় অভিষিক্ত হওয়ারও প্রয়োজন ছিল না। তাঁকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ইসলামি আইন জানতে হবে, কিন্তু প্রবীন *মুজতাহিদ* হওয়ার আর দরকার পড়বে না। একাধিক সম্ভাব্য প্রার্থী থাকলে, 'রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি'ই হবে নতুন নেতার চূড়ান্ত যোগ্যতার গুণ। কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ান্স ভেটো প্রয়োগের অধিকার রেখে দিলেও

নতুন এক্সপিডেয়েন্সি কাউন্সিলের মাধ্যমে এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এইসব পরিবর্তনের ফলে মজলিস গার্ডিয়ান্সের বাধার মুখে পড়া বিভিন্ন সংস্কার বাস্তবায়নে সক্ষম হয়।[৩৫]

খোমেনির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের দিন, আয়াতোল্লাহ খামেনিকে ফাকিহ্ ঘোষণা করা হয়; এবং ২৮শে জুলাই, ১৯৮৯, রাফসানজানি নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন। তাঁর কেবিনেট থেকে রেডিক্যালরা বাদ পড়েন; মন্ত্রীদের এক তৃতীয়াংশই ছিলেন পশ্চিমে শিক্ষিত; তারা আরও পাশ্চাত্য বিনোয়াগ ও আরও পুঁজিপতি, অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারের ভূমিকাকে খাট করার প্রতি জোর দিতে থাকেন। তারপরেও সমস্যা থেকে গিয়েছিল। কট্টরপন্থীরা বাস্তববাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখে; কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ান্সের রক্ষণশীলরা তখনও সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারছিলেন, প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন অংশ ক্রটিপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজন যেন ইরানিদের বৃহত্তর বহুত্ববাদ ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের চেয়ে বরং শিয়া ঐতিহ্যের ভিত্তিতে সেক্যুলারিজমের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। লোকে ইসলামি পরিবেশে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের দিকে অগ্রসর হতে পারছিল, সেগুলোর প্রতি আগের চেয়েও কম বৈরী ছিল।

গুরত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বিষয়টি ইরানের অন্যতম নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী আব্দোলকরিম সুরোশের রচনায় লক্ষ করা যেতে পারে। লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন সুরোশ, বিপ্লবের পর খোমেনির সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন। বর্তমানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অংশ নন তিনি, কিন্তু যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করে থাকেন। তাঁর শুক্রবারের ভাষণগুলো ঘনঘন প্রচারিত হয় এবং মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যতম উল্লেখযোগ্য বক্তা তিনি। সুরোশ খোমেনি ও শরিয়তি, এই দুজনকেই শ্রদ্ধা করলেও তাঁদের অতিক্রম করে যান। পশ্চিম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সঠিক, তিনি এমনও বলেছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষে বহু ইরানির তিনটি পরিচয় থাকবে: প্রাক ইসলামি, ইসলামি ও পশ্চিমা; একে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই হবে তাদের। পশ্চিমের সমস্ত কিছুই দূষিত বা আসক্ত করার মতো নয়।[৩৬] কিন্তু সুরোশ পশ্চিমের অতি রেডিক্যাল সেক্যুলারিস্ট রীতি মেনে নেবেন না। তাঁর দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ধর্মের গ্রহণযোগ্য বিকল্পের যোগান দিতে পারে না। মানুষের সব সময়ই তাকে বস্তুর উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার মতো আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন। ইরানিদের আধুনিক বিজ্ঞানের মূল্যবোধ উপলব্ধি করা শিখতে হবে, কিন্তু আবার নিজস্ব শিয়া ঐতিহ্যও ধরে রাখতে হবে।[৩৭] ইসলামকেও অবশ্যই পরিবর্তিত হতে হবে: *ফিকহকে* অবশ্যই আধুনিক শিল্পায়িত বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে,

AMARBOI.COM

নাগরিক অধিকারের দর্শন ও একবিংশ শতকে নিজের শক্তিতে টিকে থাকার মতো একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তুলতে হবে।'[৩৮] সুরোশ আবার *উলেমা* শাসনেরও বিপক্ষে ছিলেন, কারণ 'ধর্মের উদ্দেশ্য অনেক বড়, তাকে কেবল যাজকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।'[৩৯] সুরোশ প্রায়শঃই অধিকতর রক্ষণশীল যাজকদের সামলোচনার মুখোমুখি হতেন, কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা বোঝায় যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র একে পশ্চিমের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার মতো বিপ্লব উত্তর একটি পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৭ সালের ২৩শে মে হোজ্জাত উল-ইসলাম সায়ীদ খাতামি এক ভূমিধস বিজয়ের ভেতর দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে এটা যেন আরও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সম্ভাব্য ৩০ মিলিয়ন ভোটের মধ্যে ২২ মিলিয়নই পেয়েছিলেন তিনি। অবিলম্বে পশ্চিমা জগতের সাথে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সালমান রুশদির বিরুদ্ধে দেওয়া *ফতওয়ার* সাথে তাঁর দেশের সম্পর্কের অবসান ঘটান। পরে ফাকিহ্ আয়াতোল্লাহ খামেনি একে অনুমোদন দেন। তারপরও খাতামি তাঁর সংস্কার পদক্ষেপকে কাউন্সিল অভ গার্ডিয়ান্সের তরফ থেকে বাধাগ্রস্ত হতে দেখেন, কিন্তু তাঁর নির্বাচন জনগণের একটা বড় অংশের পক্ষ থেকে বৃহত্তর বহুত্ববাদ, ইসলামি আইনের আরও কোমল ব্যাখ্যা ও 'হতদরিদ্রদের' জন্যে অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও নারীদের জন্যে আরও প্রগতিশীল নীতিমালা*র আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছিল। ইসলাম থেকে পিছু হটার কোনও ব্যাপার ছিল না। ইরানিরা তখনও তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে শিয়া মোড়কেই আবদ্ধ দেখতে চাইছিল বলে মনে হয়েছে, আধুনিক মূল্যবোধসমূহকে যা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে মনে করা কোনও কিছু থেকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে বলে মনে হয়েছে। এমন হতে পারে যে, কোনও একটি রেডিক্যাল আন্দোলনকে এর আগ্রাসন ও অসন্তোষের ভেতর দিয়ে কাজ করতে দেওয়া হলে তা অন্যান্য ট্র্যাডিশনের সাথে সৃজনশীলভাবে মিথস্ক্রিয়া করতে শিখতে পারে, নিকট অতীতের সহিংসতা এড়িয়ে যায় এবং সাবেক শত্রুর সাথে মৈত্রী গড়ে তোলে।

১৯৮১ সালে পশ্চিমা বিশ্ব সুন্নি মৌলবাদীদের হাতে প্রেসিডেন্ট সাদাতের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে গভীর শোক প্রকাশ করার মুহূর্তে মিশরে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাফল্য উদযাপনের উদ্দেশ্যে

---

* ১৯৯৯ সালের গ্রীষ্মে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যখন ইরানি ছাত্ররা আরও গণতন্ত্রের এবং *উলেমাদের* হাতে বাধাগ্রস্ত হবে না, এমন একটি ইসলামি সরকারের দাবিতে রাস্তায় নেমে এসেছিল।

এক কুচকাওয়াজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সাদাত। কুচকাওয়াজের একটা ট্রাক সহসা ঠিক প্রেসিডেনশাল স্ট্যান্ডের সামনে লাইন ছেড়ে বের হয়ে আসে। ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট খালেদ ইসলামবুলিকে ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে আসতে দেখে সাদাত উঠে দাঁড়ান, তিনি ভেবেছিলেন অফিসারটি তাঁকে স্যালুট করতে যাচ্ছে। কিন্তু তার বদলে মেশিনগানের এক ঝাঁক বুলেট ছুটে আসে। সাদাতের দেহ লক্ষ্য করে ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করতে থাকে ইসলামবুলি, এমনকি নিজে পেটে গুলি খাওয়ার পরেও চিৎকার করে বলছিল, 'কুত্তাটাকে, বেঈমানটাকে আমার হাতে তুলে দাও!' হামলা মাত্র পঞ্চাশ সেকেন্ড স্থায়ী হলেও সাদাত ছাড়াও আরও সাতজন প্রাণ হারিয়েছিল, এবং অন্য আঠাশজন আহত হয়েছে।

আক্রমণের ভয়াবহতায় তীব্র ধাক্কা খেয়েছে পশ্চিমারা। সাদাতকে তারা পছন্দ করত। সাদাত এমন একজন মুসলিম শাসক ছিলেন যাঁকে তারা বুঝতে পারত। তিনি 'ধর্মান্ধ' না হয়েও যেন ধার্মিক ছিলেন; পশ্চিমারা ইসরায়েলের সাথে তাঁর শান্তি উদ্যোগ ও তাঁর খোলা দুয়ার নীতিকে সমীহ করত। আমেরিকান ও ইউরোপিয় যুবরাজ, রাজনীতিক ও প্রেসিডেন্টদের এক বিরাট দল সাদাতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। কোনও আরব নেতা অবশ্য আসেননি, রাস্তায়ও জনতার কোনও ভীড় ছিল না। মিশরিয় জনগণ সাদাতের জন্যে চোখের পানি ফেলেনি, কিংবা পরে ইরানিরা যেমন খোমেনির লাশের চারপাশে করবে তেমনিভাবে তাঁর কফিনের পাশে ভীড় করেনি, শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। আরও একবার আধুনিক পশ্চিম ও মধ্যপ্রাচ্যের অধিকতর প্রথাগত সমাজগুলো বিপরীত মেরুতে সরে গিয়েছিল, এবং ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারেনি তারা।

আমরা যেমন দেখেছি, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মিশরিয় সাদাতের শাসনের সাথে ইসলামের চেয়ে বরং *জাহিলিয়াহ* আমলেরই বেশি মিল বলে মনে করতেন। ১৯৮০ সালে মুসলিম ক্যালেন্ডারের অন্যতম পবিত্র দিনে কায়রোয় গ্রীষ্মকালীন শিবির অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা *জামাত আল-ইসলামিয়াহর* ছাত্র সদস্যরা সালাদিন মসজিদ দখল করে নেয়, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে এবং সাদাতকে একজন 'তার্তার' হিসাবে নিন্দা জানায়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও কেবল নামেই মুসলিম ত্রয়োদশ শতকের অন্যতম মঙ্গোল শাসক ছিলেন তার্তার।[৪০] *জামাতের* অন্য দমিত সদস্যরা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংস *জিহাদে* নিবেদিত গোপন সেলের নেটওয়ার্কে যোগ দেয়। খালেদ ইসলামবুলি ছিল এই জিহাদি সংগঠনের সদস্য।

সাদাত এই মতদ্বৈততা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। বন্ধু শাহ'র নিয়তি বরণ করতে চাননি। ১৯৭৮ সালে তাঁর ভাষায় ল অভ শেম জারি করেন তিনি। প্রতিষ্ঠিত

নিয়ম থেকে চিন্তায়, কথায় বা কর্মে যেকোনও ধরনের বিচ্যুতি নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ও সম্পত্তি ও পাসপোর্টের বাজেয়াপ্তিকরণের শাস্তিযোগ্য হবে। নাগরিকদের উপর সরকারের প্রতি সমালোচনামূলক কোনও সংগঠনে যোগ দান, কোনও প্রচারণায় অংশ গ্রহণ বা 'জাতীয় শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি' করতে পারে এমন কোনও কিছু প্রকাশনার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এমনকি কারও পারিবারিক পরিবেশে মামুলি মন্তব্যও বিনা শাস্তিতে পার পাওয়ার জো ছিল না।[৪১] সাদাতের জীবনের শেষ মাসগুলোতে সরকার আরও বেশি নিপীড়ক হয়ে উঠেছিল। ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সাদাত তাঁর চেনা ১৫৩৬ জন সমালোচককে আটক করেন; তাঁদের ভেতর মন্ত্রীসভার সদস্য, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, যাজক ও ইসলামি গ্রুপের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এভাবে আটক একজন ইসলামিস্ট ছিল সাদাতের ঘাতকের ভাই মুহাম্মদ ইসলামবুলি।[৪২]

আমরা সাদাতের হত্যাকারীর অনুপ্রেরণা সম্পর্কে ইসলামবুলির জিহাদি সংগঠনের আধ্যাত্মিক গুরু আব্দ আল-সালাম ফারাজের নিবন্ধে একটা ধারণা পেতে পারি। হত্যাকাণ্ডের পর, ডিসেম্বরে *আল-ফরিদাহ আল-গায়িবাহ* ('দ্য নেগলেক্টেড ডিউটি') প্রকাশিত হয়েছিল। অ্যাপোলোজিয়া ছিল না এটা, আবার আদতে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যেও লেখা হয়নি। এটা সংগঠনের সদস্যদের মাঝে গোপনে বিলি করা হয়েছিল বলে মনে হয় এবং জঙ্গী মুসলিমরা পরস্পরের সাথে কী বিষয়ে কথা বলছে, কী তাদের উদ্বেগের বিষয়, তাদের ভীতি কী নিয়ে, এসব সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়। মুসলিমদের, যুক্তি তুলে ধরেছেন ফারাজ, একটা জরুরি দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ পয়গম্বর মুহাম্মদকে (স) একটি প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোরানের উদ্ধৃতি দিয়ে ফারাজ তাঁর নিবন্ধের শুরু করেছেন যেখানে দেখা যায় মুহাম্মদের (স) কাছে প্রথম ঐশীবাণী আসার মাত্র তের বছরের ভেতরই আল্লাহ তাঁর নির্দেশ পালনে ব্যর্থ মুসলিমদের প্রতি অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। 'তাদের জন্যে কি এখনও সময় আসেনি' তৎপর হওয়ার? অসন্তোষের সাথে প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ।[৪৩] চৌদ্দশো বছর পরে তিনি কতখানি অধৈর্য হতে পারেন! সুতরাং, মুসলিমদের অবশ্যই আল্লাহ'র ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে। তাদের শান্তিপূর্ণ, অহিংস পদ্ধতিতে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে মনে করা আগের প্রজন্মগুলোর মতো হলে চলবে না। একমাত্র উপায় হচ্ছে *জিহাদ*, পবিত্র যুদ্ধ।[৪৪]

জিহাদই ছিল শিরোনামের 'অবহেলিত দায়িত্ব'। ফারাজ যুক্তি দেখান যে, মুসলিমরা এখন আর এই পবিত্র সহিংসতা প্রয়োগ না করলেও এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শত বছরের ইসলামি ঐতিহ্যের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের

AMARBOI.COM

বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে কুতবের মতোই নিষ্ঠুরভাবে নৈর্বাচনিক হতে হয়েছে ফারাজকে, এবং এই প্রক্রিয়ায় অনিবার্যভাবে বিকৃত মুসলিম দর্শন তুলে ধরেছেন তিনি। আবার, এটা নিপীড়নের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত বিকৃতি ছিল। ফারাজ জোর দিয়ে বলেছেন যে, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় তরবারি। একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি, যেখানে পয়গম্বর ধর্মের স্বার্থে যুদ্ধে অনিচ্ছুক ব্যক্তি এমনভাবে মারা যাবে 'যেন সে কোনওদিন মুসলিম ছিল না, বা যে কিনা কপটাচারে পরিপূর্ণ, কেবল বাহ্যিকভাবেই মুসলিমের ভান করে' বলেছেন বলে কথিত রয়েছে।[৪৫] কোরানে আল্লাহ মুসলিমদের স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'তোমাদের জন্যে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো, যদিও এ তোমাদের পছন্দ নয়।'[৪৬] মুসলিমদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন

> অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে। তাদেরকে বন্দি করবে, অবরোধ করবে ও তাদের জন্যে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওত পেতে থাকবে।[৪৭]

ফারাজের বিশ্বাস ছিল, তরবারির এই পঙক্তি মুহাম্মদের (স) কাছে মুসলিমদের প্রতি শত্রুর সাথে শান্তি স্থাপন ও সৌজন্যের সাথে আচরণের নির্দেশ দানের পঙক্তি অবতীর্ণ হওয়ার অনেক পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং, এগুলো যেসব আয়াতে কোরানকে সহিংতা বিরোধী মনে হয় সেগুলোকে রদ করে দিয়েছে।[৪৮]

কিন্তু ফারাজের একটা সমস্যা ছিল। কোরান কেবল মূর্তিপূজকদের লক্ষ্য করেছে ('যারা আল্লাহ'র পাশে তুচ্ছ বস্তুতে ঐশ্বরিকতা আরোপ করে'), কিন্তু সাদাত নিজেকে মুসলিম দাবি করে বলেছেন, তিনি পাঁচটি 'স্তম্ভ' পালন করেন। মুসলিমরা কীভাবে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে? ফারাজ ইবন তাঈমিয়াহর ফতওয়ায় এর জবাব খুঁজে পেয়েছেন, যিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী মঙ্গোল শাসকগণ আসলে ধর্মদ্রোহী ছিলেন, কারণ তাঁরা শরীয়াহর বদলে নিজেদের বিধান মোতাবেক শাসন করেছেন।[৪৯] মিশরের বর্তমান শাসক, ঘোষণা করেছেন ফারাজ, মঙ্গোলদের চেয়েও খারাপ। মঙ্গোল বিধানে অন্ততপক্ষে কিছু পরিমাণ ক্রিশ্চান ও ইহুদি আইনের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু মিশরের আইনি ব্যবস্থা আজ 'অবিশ্বাসের আইনের' উপর ভিত্তি করে রচিত, বিধর্মীরা এর সৃষ্টি করেছে, উপনিবেশবাদীদের মাধ্যমে মুসলিমদের উপর আরোপ করা হয়েছে।[৫০]

AMARBOI.COM

বর্তমান যুগের শাসকগণ ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন। সাম্রাজ্যবাদের টেবিলে বেড়ে উঠেছে এরা, সেটা ক্রুসেডারিজমই হোক বা কমিউনিজম অথবা যায়নবাদ। নাম ছাড়া তারা ইসলামের কোনও কিছুই ধারণ করে না, যদিও তারা প্রার্থনা করে ও উপবাস পালন করে ও নিজেদের মুসলিম দাবি করে।[৫১]

১৯৮০ সালে যেসব ছাত্র সালাদিন মসজিদ দখল করেছিল, তারাও সাদাতকে মঙ্গোল শাসকদের সাথে তুলনা করেছিল। ফারাজের ধারণাসমূহ চরমপন্থীদের একটা ছোট গ্রুপের মাঝে সীমিত ছিল বলে মনে হয় না। ১৯৮০-র দশক নাগাদ তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে থাকে।

ফারাজ স্বীকার করেছেন যে, ইসলামি আইনে *জিহাদ* সমবেত দায়িত্ব হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। পবিত্র যুদ্ধ শুরু করা কোনও ব্যক্তি বিশেষের কাজ নয়, বরং তা এমন এক সিদ্ধান্ত যা কেবল সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবেই গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু, জোর দিয়ে বলেছেন ফারাজ, *উম্মাহ* বাইরের শক্তির হাতে আক্রান্ত হলেই কেবল এই আইন প্রযোজ্য হতে পারে। আজকের দিনের পরিস্থিতি ঢের বেশি খারাপ, কারণ বিধর্মীরা আসলে মিশর দখল করে নিয়েছে। সুতরাং, যুদ্ধ করার যোগ্যতা রাখে এমন প্রতিটি মুসলিমের পক্ষেই *জিহাদ* দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৫২] এভাবে ইসলামের গোটা জটিল ঐতিহ্য একটা মাত্র বিন্দুতে সংকীর্ণ হয়ে গেছে: সাদাতের মিশরে ভালো মুসলিম হওয়ার একমাত্র উপায় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংস যুদ্ধে অংশগ্রহণ।

তরুণ শিষ্যদের অস্বস্তিতে ফেলে দেওয়া প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ফারাজ। গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করলেও *জিহাদের* সদস্যরা যতদূর সম্ভব নৈতিক আচরণ করার প্রয়াস পাচ্ছিল। পরিকল্পনা গোপন রাখার স্বার্থে কী মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য হবে? অপরাধী শাসকদের হত্যার সাথে সাথে নিরীহ দর্শকদের হত্যার বেলায় কী হবে? মিশরে, পারিবারিক কর্তৃত্ব যেখানে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ, তরুণতর সদস্যরা জানতে চাইছিল, বাবা-মার অনুমতি ছাড়াই এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?[৫৩] ইসরায়েলের হাত থেকে জেরুজালেম মুক্ত করার আগে সাদাতের বিরুদ্ধে *জিহাদে* নামার প্রশ্নে নিশ্চিতভাবেই উদ্বেগ ছিল: কোনটা প্রাধান্য পাবে? ফারাজ উত্তর দিয়েছেন, জেরুজালেমের জন্যে *জিহাদ* কেবল একজন নিবেদিত প্রাণ মুসলিম নেতার নেতৃত্বেই হতে পারে, বিধর্মীর হাতে নয়। তিনি আল্লাহ'র প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে মারাত্মক আস্থাও প্রকাশ করেছেন। একবার সত্যিকারের ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেলে, জেরুজালেম আপনাআপনিই মুসলিম শাসনে ফিরে আসবে।[৫৪] কোরানে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মুসলিমরা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে,

'তোমাদের হাতে আল্লাহ ওদেরকে শাস্তি দেবেন, ওদেরকে অপদস্থ করবেন, ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন ও বিশ্বাসীদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।'[৫৫] (কোরান ৯:১৪) এই টেক্সটের আক্ষরিক পাঠ থেকে ফারাজ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মুসলিমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আল্লাহ 'হস্তক্ষেপ করবেন [এবং] প্রাকৃতিক বিধান পাল্টে দেবেন।' জঙ্গীবাদীরা কি অলৌকিক সাহায্য আশা করতে পারে? ফারাজ বিষণ্নভাবে জবাব দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ।'[৫৬]

সাদাতের হত্যাকাণ্ডের পর কোনও ফলোআপ না হতে দেখে পর্যবেক্ষকরা দারুণ বিস্মিত হয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা অভ্যুত্থানের কোনও পরিকল্পনা করেনি বলে মনে হয়েছে, কিংবা গণ বিক্ষোভের আয়োজনেরও চেষ্টা করেনি। এর কারণ ছিল সম্ভবত প্রেসিডেন্টকে হত্যা করে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর মুসলিমদের ঐশী হস্তক্ষেপের উপর আস্থা। ফারাজ যেন একে নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা বিরাট অসম্ভাব্যতার মুখোমুখী দাঁড়ানোর কথা জানলেও,[৫৭] ফারাজ একে ব্যর্থতার 'নির্বোধ' ভীতি হিসাবে দেখেছেন। মুসলিমের কাজ আল্লাহ'র নির্দেশ পালন করা। 'ফলাফলের জন্যে আমরা দায়ী নই।' 'বিধর্মীদের শাসনের অবসান ঘটলে, সবকিছু মুসলিমদের আয়ত্তে এসে যাবে।'[৫৮]

আরও বহু মৌলবাদীর মতো অক্ষরবাদী ছিলেন ফারাজ। তিনি এমনভাবে ঐশীগ্রন্থ পাঠ করেছেন যেন তার প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, এবং তাকে প্রতিদিনের জীবনে সহজে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করা যাবে। এটা ঐশীগ্রন্থের *মিথোসকে* বাস্তব কর্মতৎপরতার নীলনকশা হিসাবে ব্যবহার করার আরেক বিপদ তুলে ধরে। প্রাচীন আদর্শ ছিল *মিথোস* ও *লোগোসকে* আলাদা রাখা: রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল যুক্তির এখতিয়ার। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে এই সুন্নি মৌলবাদীরা যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে তিক্ত সত্য জানতে পেরেছিল এমনকি সাদাতের ঘাতকরা তাদের বিশ্বাস মতে আল্লাহ'র আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও আল্লাহ হস্তক্ষেপ করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি। সাদাতের মৃত্যুর পর কোনও রকম ঝামেলা ছাড়াই প্রেসিডেন্ট হন হোসনি মোবারক, আর সেক্যুলারিস্ট সরকারই এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় বহাল আছে।

দ্য নেগলেক্টেড ডিউটি-র চিন্তাভাবনা চরমপন্থীদের ছোট একটি দলের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল না বলেই মনে হয়, বরং পর্যবেক্ষকদের ধারণার চেয়ে ব্যাপকহারে সেই সময় মিশরিয় সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৫৯] অল্প সংখ্যক মিশরিয়ই সত্যিকার অর্থে সাদাতের হত্যা চেয়েছিল, বেশির ভাগই হত্যাকাণ্ডে দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাদের অটল ভাব ছিল রীতিমতো লক্ষণীয় ও হিমশীতল। উদাহরণ স্বরূপ, আল-আযহারের শায়খগণ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করলেও সাদাতের বিদায়ে

AMARBOI.COM

তাঁদের শোকাহত মনে হয়নি। হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরপর প্রকাশিত আযহারিয় পত্রিকায় সাদাতের কোনও ছবি ছিল না, হত্যার কথা দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় তীর্যকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। *দ্য নেগলেক্টেড ডিউটি*-র বিরুদ্ধে জোরালভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাঁড়ানো একমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হচ্ছেন মুফতি, ফারাজের নিবন্ধের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন তিনি। তিনি ঘোষণা দেন যে, অন্য একজন আচার পালনকারী মুসলিমকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করা নিষিদ্ধ। *তাকফিরের* (সমাজচ্যুতি) চর্চা কখনওই ইসলামে প্রচলিত ছিল না, কারণ কেবল আল্লাহ্'র পক্ষেই কারও অন্তরের খবর রাখা সম্ভব। তিনি তরবারীর পঙক্তিসমূহকে সেগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন, সপ্তম শতাব্দীর মদিনার বিশেষ পরিবেশের প্রতি সাড়া হিসাবে সেগুলোর উদ্ভব হয়েছে বলে দেখিয়েছেন। মিশরের বিংশ শতাব্দীর পরিস্থিতিতে অক্ষরে অক্ষরে সেগুলোকে প্রয়োগ করা যাবে না। তারপরও ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে প্রধান সুফি সাময়িকী *জার্নাল অভ ইসলামিক মিস্টিসিজম*-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে মুফতি এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে, তাঁর পাঠকরা ফারাজের শিক্ষার সাথে পরিচিত থাকবেন, যদিও *দ্য নেগলেক্টেড ডিউটি* কেবল প্রকাশিত হয়েছিল, সবার পক্ষে তা পড়া সম্ভব ছিল না। এইসব ভাবনা সম্ভবত ভক্ত বলয়ে প্রচারিত হয়ে সাধারণ বুলিতে পরিণত হয়েছিল।[৬০] মিশরিয়দের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হত্যাকাণ্ডকে মহাপাপ মনে করলেও অনেকেই সাদাতের বেলায় নিরাসক্ত বোধ করেছে। নাসেরের মৃত্যুর পর অবস্থা অনেক বদলে গিয়েছিল। মিশরিয়রা এখন তাদের নেতাদের মাঝে সত্যিকারের ইসলামি গুণের দেখা পেতে চাচ্ছিল, সেক্যুলারিস্ট রীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল তারা।

মুবারককে দেশের ধর্মীয় ঝোঁক উপলব্ধি করতে হয়েছিল। তিনি অবিলম্বে ১৯৮১ সালে সাদাতের ক্র্যাকডাউনের সময় আটক সকল বন্দিকে ছেড়ে দেন। ইসলামি আন্দোলনসমূহকে নিয়ন্ত্রণের জোর চেষ্টা করে গেছেন তিনি, কিন্তু কেবল নির্দিষ্ট গ্রুপকে টার্গেট করেছেন। মুসলিম ব্রাদারহুডকে (সরকারীভাবে তখনও স্বীকৃতি পায়নি) দলীয় নির্বাচনে অংশ নিতে এবং সরকারে নিজেদের পক্ষে একটা অবস্থান সৃষ্টি করার অনুমতি দিয়েছেন। সোসায়েটির নতুন রাজনৈতিক সংগঠন দ্য ইসলামিক অ্যালায়েন্স যত্নের সাথে চরমপন্থীদের সাথে দূরত্ব তৈরি করে, মিশেরের কপ্টিক ক্রিশ্চানদের সাথে সম্পর্কন্নোয়ন এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজ করার প্রয়াস পায়। মিশর এখন খুবই ধর্মীয় রাষ্ট্র। বর্তমানে ১৯৬০-র দশকের নাসেরবাদের মতোই ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ব্রাদারস-এর শ্লোগান 'ইসলামই সমাধান' ক্রমবর্ধমান সংখ্যাক মানুষের কাছে আবেদন সৃষ্টি করছে বলে মনে হয়।[৬১] ব্যক্তিগত ধার্মিকতা সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী এখন ম্যাগাজিন ও

AMARBOI.COM

সাময়িকীর চিঠিপত্রের পাতায় প্রাধান্য বিস্তার করছে, প্রচার মাধ্যমে ইসলামি ইস্যু নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় পোশাক এখন সর্বত্র, নারী-পুরুষ ক্লাসরুমে নিয়মিতভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, সাধারণ জীবনে প্রার্থনার নির্দিষ্ট স্থান এখন সাধারণ ব্যাপার।[৬২] মিশরকে পূর্ণ ইসলামি আইনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ও ইসলামকে সংবিধানের ভিত্তি করে তোলার ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা এখনও রয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনে ধর্মীয় প্রার্থীরা শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। মিশর মোটামুটি বহুদলীয়, গণতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু দুর্নীতি এখনও ব্যাপক বিস্তৃত, নির্বাহী স্বৈরাচারী এবং রাষ্ট্রীয় দল কেবল শাসক দল হিসাবে থাকতে রাজি নয়। সন্দেহ আছে যে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জনগণ অধিকতর ধার্মিক নেতাদের পক্ষে ভোট দেবে। এর ফলে ইসলাম মুবারকের সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে।[৬৩]

১৯৭০-র দশকের ধর্মীয় পুনর্জাগরণ পরিপক্কতা লাভ করেছে। মূলধারার অনেকেই, সব বয়স ও সব শ্রেণীর মিশরিয়রা এর অন্তর্ভুক্ত, এখন মৌলবাদের এক ধরনের মডারেট রূপ গ্রহণ করেছে। বেশির ভাগই রাজনীতিতে আগ্রহী নয়, তবে ধর্মের প্রতি আগ্রহের কারণে সামাজিক বা অর্থনৈতিক সংকটের কালে ইসলামি নেতাদের পক্ষে তাদের সংগঠিত করা অনেক সহজ। তরুণদের অনেকেই অবশ্য এখনও মনে করে যে, আধুনিক মিশরিয় সমাজ তাদের স্বার্থের কথা অন্তর দিয়ে ভাবে না। বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও গণিতের ছাত্ররা এখন অধিকতর চরমপন্থী গ্রুপের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তারা দেখছে কঠোর ইসলামি জীবন ধারা সেক্যুলারিস্ট পছন্দের চেয়ে একটা গ্রহণযোগ্য বিকল্পের যোগান দিচ্ছে, গ্রাম্য সংস্কৃতি থেকে আধুনিক শহুরে সংস্কৃতিতে কষ্টকর অভিযাত্রায় সাহায্য করছে এবং এক ধরনের খাঁটিত্ব ও অংশগ্রহণের বোধ দিচ্ছে।[৬৪] এটা তাদের আধুনিক সমাজে অর্জন করা খুবই কঠিন অথচ মানবীয় চাহিদার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা গোষ্ঠীরও যোগান দিচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা পেছনে ঘোরানোর কোনও চেষ্টা করছে না তারা, বরং বর্তমান অবস্থায় শত শত বছর ধরে মুসলিমদের কাজে আসা ইসলামি প্যারাডাইম প্রয়োগের নতুন পথের সন্ধান করছে।

সাদাতের হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে ভীতিকরভাবে বিস্ফোরিত গভীর অসন্তোষ আজও হুসনি মুবারকের দুই দশকের সীমিত উদারীকরণ ও গণতন্ত্রের আংশিক বাস্তবায়নের পরও তলে তলে ধিকিধিকি জ্বলছে। পার্থক্য হচ্ছে, ইসলামিস্টরা এখন অনেক বেশি সংগঠিত। আমেরিকান আরব বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক গাফনি ১৯৯১ সালে আবার মিনিয়া সফর করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছেন, মূল সড়কের পাশের ক্ষুদে মৌলবাদী মসজিদে শুক্রবারে নামাজের উদ্দেশ্যে সমবেত জনতা ১৯৭০-র দশকের তুলনায় এখন ঢের বেশি শৃঙ্খলাপরায়ণ। সেই পুরোনো জরাজীর্ণ ভাব ও উচ্ছৃঙ্খল

AMARBOI.COM

ঔদ্ধত্য বিদায় নিয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের অনেকেরই বয়স ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশের কোঠায়; তারা সর্বজনীন জালাবিয়াহ্ পোশাক পরেছে, সঠিক ইসলামি টুপি মাথায় দিয়েছে। দেখে মনে হয়েছে নিজস্ব দিক ও পরিচয়সহ একটি ভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট উপসংস্কৃতি গড়ে তুলতে যাচ্ছে তারা। গাফনি আরও লক্ষ করেছেন যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যালয়ের অবস্থান বিশাল নতুন সরকারী ভবন রাষ্ট্রের প্রবল প্রতাপ ফুটিয়ে তোলার কথা বুঝিয়েছে। সাবেক ঝামেলার জায়গায় নিয়ন্ত্রণের প্রতীক, এর সাথে কায়রোর চেয়ে বরং মক্কামুখী নিবেদিত প্রাণ ইসলামপন্থীদের কোনও সম্পর্ক নেই বলে মনে হয়েছে।[৬৫] মিশরে উপশমের কোনও লক্ষণ ছাড়াই এক সিযোফ্রেনিক দূরত্বে পাশাপাশি দুটি বলয় অবস্থান করেছে।

এটা বিস্ময়কর নয় যে, 'দুই জাতির' ভেতর যুদ্ধ চলছে। সাময়িক ভিত্তিতে পুলিস ও অতি চরমপন্থী মুসলিম গ্রুপগুলোর ভেতর গুলি বিনিময়ের খবর পাওয়া যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামপন্থীরা যেখানে সেক্যুলার সমাজ থেকে মৌলবাদী বিচ্ছিন্নতায় সন্তুষ্ট, একটি সংখ্যালঘু অংশ সেখানে ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে। ১৯৮৬ সাল থেকে আমেরিকান, ইসরায়েলি ও বিশিষ্ট মিশরিয়দের উপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। ১৯৮৭ সালে ইসলামপন্থীরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সাবেক মন্ত্রী হাসান আবু বাওহা ও সাপ্তাহিক পত্রিকা *আল-মুসাওয়ারের* সম্পাদক নবাবি আহমেদিকে গুলি করে। ১৯৯০ সালের অক্টোবরে তারা মিশরিয় পার্লামেন্টের স্পিকার রিফাত মাহজুবকে হত্যা এবং ১৯৯২ সালে কট্টর সেক্যুলারিস্ট ফারাজ ফোদাকে গুলি করে হত্যা করে। সেই বছরই প্রথম বারের মতো ইউরোপিয় ও আমেরিকান পর্যটকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে।[৬৬] অর্থনীতির ক্ষেত্রে পর্যটন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় হামলা ও নির্বিচার, আনাড়ী গণগ্রেপ্তারের পথ ধরেন মুবারক, ফলে আগুনে যেন ঘি ঢালা হয়। ১৯৯৭ সাল নাগাদ মানবাধিকার গ্রুপগুলো ২০,০০০ সন্দেহভাজন গেরিলাকে বিনা বিচারে মিশরিয় কারাগারে বন্দি রাখার দবি তোলে, অনেককে–আবারও–কেবল নিরীহ প্যামফ্ল্যাট রাখা বা কোনও সভায় যোগদানের ঠুনকো অপরাধে আটক করা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের ১৭ই নভেম্বর সন্ত্রাসী দল *জামাত আল ইসলামিয়াহ* লক্সরে 'এই হামলাই শেষ হামলা নয়, কারণ সরকার যতদিন নিপীড়ন অব্যাহত রাখবে ও ইসলামি আন্দোলনের সন্তানদের হত্যা করে চলবে ততদিন মুজাহিদিনরা কাজ চালিয়ে যাবে'[৬৭] বলে আটান্ন জন বিদেশী পর্যটক ও মিশরিয়কে হত্যা করে। যুদ্ধ চলছে। মরিয়া ভাব ও অসহয়ত্ব সুন্নি মুসলিমদের সংখ্যালঘু অংশকে হত্যার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে ইসলামকে এমন এক মতাদর্শে পরিণত করতে অনুপ্রাণিত করে চলেছে যা ধর্মের সামগ্রিক বিকৃতি।

মিশরের মতো ইসরায়েলও আরও বেশি করে ধর্মীয় দেশে পরিণত হতে চলেছিল। ১৯৮০-র দশকে হেরেদিমের রাজনৈতিক উত্থানের মতো আর কোথাওই তা এতখানি প্রকট ছিল না। আল্ট্রা-অর্থডক্স ইহুদিদের একটি সংখ্যালঘু অংশ ইসরায়েল রাষ্ট্রকে সহজাতভাবে অশুভ ভেবে এসেছে, 'এমন দূষণ যা সকল দূষণকে আবৃত করে, এক সামগ্রিক ধর্মদ্রোহীতা যা অন্যসব ধর্মদ্রোহীকে অন্তর্ভুক্ত করে।'[৬৮] 'এর একেবারে মূলে যায়নবাদ আমাদের ধর্মের আবিশ্যিক বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে,' ১৯৭৫ সালে নেচারেই কারতার নিউজ লেটারে লিখেছেন ইয়েরামিয়েল দোম্ব। 'এ এক পরম অস্বীকৃতি যা খুব গভীরে, একেবারে ভিত্তিতে, শেকড়ে গিয়ে পৌঁছেছে।'[৬৯] তবে অধিকাংশ হেরেদিম এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি। তারা স্রেফ রাষ্ট্রটিকে ধর্মীয় তাৎপর্যবিহীন মনে করেছে ও একে দারুণ নিস্পৃহতার সাথে দেখেছে। এই নিরপেক্ষতা তাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে সক্ষম করে তুলেছিল। হাসিদিম এমনকি তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্রের সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে আটকা পড়া স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গের নিষ্কৃতি লাভ হিসাবে ধর্মীয় আলোকেও দেখতে পেরেছে। শুয়োরের মাংস নিষিদ্ধকরণ বা আরও কঠোর সাব্বাথ পালন উৎসাহিত করণের মতো বিধান জারির লক্ষ্যে চাপ প্রয়োগ করে তারা ইসরায়েলকে মেসিয়ানিক পরিবর্তনের পথে আরও উপযুক্ত করে তুলতে পারবে। লিথুয়ানিয় মিসনাগদিমের আরও বাস্তব সম্মত প্রবণতা ছিল। নিজেদের আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে গভীরভাবে *ইয়েশিভা* বিশ্বে আবদ্ধ করেছিল তারা এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করেছে। রাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ বা বিদেশ নীতির প্রশ্নে তারা সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিল। কোনও একটি দলের পরিবর্তে অন্য কোনও দলকে সমর্থনের ক্ষেত্রে তাদের একমাত্র বিবেচনার বিষয় ছিল *ইয়েশিভোতের* জন্যে এর দেওয়া তহবিলের পরিমাণ ও রাজনৈতিক সমর্থন দানের ইচ্ছা।[৭০]

টিকে থাকাই ছিল হেরেদিমের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৬০-র দশকে থেকেই জেন্টাইল বিশ্বের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কঠোরতা এসেছিল। ১৯৬১ সালে জেরুজালেমে অ্যাডল্ফ এইখমানের বিচার হলোকাস্টের প্রতি নতুন সচেতনতা বোধের দিকে চালিত করেছিল, ফলে হেরেদিম নিজেদের *গোয়েশি* সংস্কৃতি ও এতে

AMARBOI.COM

অংশগ্রহণকারী সেক্যুলার ইহুদিদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে আরও প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। নিজেদের তারা আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হিসাবে দেখেছে, জেন্টাইল বা ইহুদিবাদ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মানে না এমন ধার্মিক বা সেক্যুলার ইহুদির প্রতি বলার মতো কিছুই ছিল না তাদের। আরও একবার দমন ও নির্যাতনের অভিজ্ঞতা ধর্মীয় দিগন্তের সংকীর্ণকরণের দিকে চালিত করেছে ও আদর্শিক সমরূপতার উপর নতুন জোর দিয়েছে। ক্রমবর্ধমানহারে *ইয়েশিভোত* বা হাসিদিক দরবারের বাইরে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপনের ভাষা বা ধারণার কোনওটাই আর হেরেদিমের ছিল না।[৭১] নিজেদের ইসরায়েলি পড়শী ও ডায়াসপোরায় তাদের পূর্বপুরুষদের মতোই জেন্টাইল বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেছে তারা।

কিন্তু হলোকাস্ট সম্পর্কে নতুন সচেতনতা ইহুদিবাদের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে তাদের যারপরনাই সজাগ করে তোলে। তোরাহ রক্ষার লক্ষ্যে তারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে ইচ্ছুক হয়ে উঠেছিল। ১৯৫০ সালে আগুদাহ হেরেদিসের একজন সদস্যের মুখে তাদের প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

> আমরা দুর্বল; শক্তিশালী সরঞ্জাম রয়েছে আমাদের প্রতিপক্ষের হাতে; বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে আমরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি সৃষ্টিকারী ঝড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, ঈশ্বর না করুন। আমাদের অন্তকরণকে ক্ষতবিক্ষতকারী আইন আমাদের অবস্থা আরও করুণ ও অসহনীয় করে তুলবে। আমাদের অবশ্যই নিজেদের রক্ষা করতে হবে ও সরকারের তরফ থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে।[৭২]

কিন্তু ১৯৫০-র দশকে অবস্থা জুৎসই ছিল না। আইডিএফ-এ নারী নিয়োগের প্রশ্নে আগুদাত ইসরায়েল ১৯৫২ সালে শ্রমিক দলীয় সরকার হতে বের হয়ে এসেছিল। সেই থেকে নেসেটে তাদের আর প্রতিনিধিত্ব ছিল না। কিন্তু ১৯৭৭ সালে লিকুদ পার্টির বিজয়ের পর আগুদাত কোয়ালিশন সরকারের সদস্যে পরিণত হয়। আগুদাতের উপদেষ্টা পরিষদ মোয়েতজেত গ'দোলায় হা-তোরাহ (কাউন্সিল অভ তোরাহ সেজেস) এভাবে যায়নবাদীদের হাতে মানসিকভাবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত প্রবীন র‍্যাবাইদের ক্ষমতার একেবারে কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু কয়েক দশক ধরে হাসিদিম ও মিসনাগদিমের পুরোনো বৈরিতা চাপা থাকলেও কাউন্সিলে তা ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে; একই উৎস থেকে পাওয়া তহবিলের জন্যে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে পরস্পরকে শত্রু হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল তারা। ফলে নতুন নতুন হেরেদি পার্টি ও নতুন রাজনৈতিক কুশীলবের আবির্ভাব ঘটতে থাকে।

AMARBOI.COM

উদাহরণ স্বরূপ, পোনোভেয *ইয়েশিভার* প্রধান ও ইসরায়েলে লিথুয়ানিয় ইহুদিদের নেতা র‍্যাবাই এলিয়েযার শ্যাচ ১৯৪৮ সালে আরব দেশগুলো থেকে অভিবাসনকারী সেফারদিক ইহুদিদের প্রভাবের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সেফারদিকদের অনেকেই আগুদাত ইসরায়েলের হাসিদিক সদস্যদের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছিল, বর্ধিত হাসিদিক ভোট মিসনাগদিক *ইয়েশিভোত* থেকে তহবিল অন্যদিকে নিয়ে যাবে ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন শ্যাচ। এই বিপদ মোকাবিলা ও সেফারদিকদের প্রলুব্ধ করতে সেফারদিক প্রধান র‍্যাবাই ভোদিয়া ইয়োসেফের সাথে একটি নতুন সেফারদিক পার্টি শাস তোরাহ গার্ডিয়ান্স গঠন করেন তিনি। ইউরোপিয় ইহুদিদের মতো সেফারদিকদের যায়নবাদের প্রতি সমান বিতৃষ্ণা ছিল না। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টির আগ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে তারা নির্যাতিত হয়নি এবং ঘেটো মানসিকতা গড়ে তোলেনি। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বা সানন্দে রাজনৈতিক জীবনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে তাদের ভেতর কোনও খুঁতখুঁতানি ছিল না। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে শাস নেসেটে চারটি আসনে জয় লাভ করেছিল।

অবশ্য ১৯৮৮ সালে সপ্তম লুবাভিচার র‍্যাবাই র‍্যাবাই শ্যাচ ও মিসনাগদিমের প্রভাব ঠেকানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর সকল অনুসারীকে আসন্ন নির্বাচনে আগুদাতের পক্ষে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৭৩] তিনি চাইছিলেন আগুদাত যেন ইহুদিত্বের আরও কঠোর সংজ্ঞা প্রদানের জন্যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এই পদক্ষেপ ইসরায়েল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কল্যাণের প্রতি হেরেদিমের নিস্পৃহতা তুলে ধরেছে। ইসরায়েলি সরকার রেব্বের ইচ্ছা পূরণ করে মিশ্র বিয়ের ফলে জন্মলাভ করা সন্তান বা সংস্কার র‍্যাবাই কতৃক ধর্মান্তরিত কাউকে অইহুদি ঘোষণা করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারুণ সাফল্যের সাথে ইসরায়েলেল পক্ষে লবিং করেছে এমন বহু আমেরিকান ইহুদিকে ক্ষিপ্ত করে তোলা হত। ইসরায়েলের অস্তিত্বের পক্ষে আমেরিকার সমর্থন যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু লুবাভিচার রেব্বে তার পরোয়া করেননি। তিনি স্রেফ নিজের ব্রতকে ইহুদি বিশ্বে প্রসারিত করতে চেয়েছেন। তাঁর কোনও কোনও প্রতিনিধি নিজেদের ইহুদি মনে করলেও হালাখীয় মানদণ্ড পূরণ করে না এমন সাধারণ লোকদের বেলায় সমস্যায় পড়েছে। ইসলায়েল রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত এই ধরনের লোকদের অ-ইহুদি ঘোষণা করলে লুবাভিচের পক্ষে জীবন অনেক সহজ হয়ে যেত। তবে আগুদাতের হাসিদিক সদস্যদের ভেতর রেব্বের হস্তক্ষেপ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, সুতরাং এর বিরোধিতা করতে র‍্যাবাই শ্যাচ একটি নতুন মিসনাগদিক পার্টি দেগেল হা-তোরাহ (তোরাহ ব্যানার) গঠন করেন।

AMARBOI.COM

ইসরায়েলি জনগণকে বিস্মিত করে ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ধর্মীয় দলগুলো রেকর্ড সংখ্যক আঠারটি আসনে বিজয়ী হয়। ফলাফলে দেখা যায় শ্রমিক ও লিকুদ পার্টির ভেতর ক্ষমতার ভারসাম্য তাদের হাতে রয়েছে। এর আগ পর্যন্ত যারা অর্থডক্সদের ঘৃণা ও তাদের অর্থহীন পশ্চাদপদতা হিসাবে বিবেচনা করে এসেছিল তারাই এবার সরকার গঠনে সাহায্য করার জন্যে তাদের সাথে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানাতে উপঢৌকনসহ হাজির হয়েছিল। হাসিদিম এত গভীরভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরোধী ছিল যে তারা তখনও সেক্যুলার ইহুদিরা ধর্মকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে বিশ্বাস করছিল। তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তারা প্রয়োজনীয় অশুভ, আত্মরক্ষার প্রয়াস হিসাবে বিবেচনা করেছে। একে 'শত্রু-শিবিরে অনুপ্রবেশ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে,' ১৯৯১ সালে লিথুয়ানিয় পত্রিকা *ইয়েতেদ নিমানে* লিখেছেন র‍্যাবাই নাথান গ্রসমান।[৭৪] কিন্তু প্রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ভেবেছিল তারই সরকারে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে হেরেদিম। হলোকাস্টের পর থেকে হেরেদিম হারানো ইউরোপিয় ইহুদি সম্প্রদায়কে ফের গড়ে তোলার সংগ্রাম করে আসছিল। পূর্ব ইউরোপের পুরোনো জীবনকে স্বর্ণযুগ মনে করত তারা, অতীতের মহান র‍্যাবাইদের মাঝে অনুপ্রেরণার সন্ধান করেছে। কিন্তু ১৯৮০-র দশকের শেষ নাগাদ নিজেদের অতিক্রম করে গিয়েছিল তারা। ৭০সিই-তে মন্দির ধ্বংসের পর র‍্যাবাই শ্যাচের মতো আর কোনও ধার্মিক ইহুদিই এতখানি ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেননি। ১৯৮৮ সাল নাগাদ দুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি ও তাঁর সিদ্ধান্তমূলক ভোটের জন্যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রশ্রয় লাভ করেছেন।[৭৫]

২৬শে মার্চ, ১৯৯০ নাটকীয়ভাবে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তেল আভিভের ইয়াদ এলিয়াহু বাস্কেটবল স্টেডিয়াম ইসরায়েলের সেক্যুলার সংস্কৃতির প্রতীকী মন্দির। ইসরায়েলে বাস্কেট বল বলতে গেলে জাতীয় ধর্মের মতোই। এই খেলাটি যায়নবাদীদের নব্য ইহুদি স্বপ্ন তুলে ধরে, এখন আর ঘোলাটে *ইয়েশিভায়* তোরাহর স্তূপের উপর বিষণ্ন চেহারায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে না সে, অর্থডক্সির কালো জোব্বায় আবৃত নয়, বরং কাজের জন্যে উন্মুক্ত, তামাটে, উপযুক্ত, স্বাস্থ্যবান এবং *গোয়িমদের* সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সক্ষম এবং তাদেরই খেলায় তাদের পরাস্ত করার ক্ষমতা রাখে। ১৯৯০ সালের মার্চের সেই সন্ধ্যায় স্টেডিয়াম ম্যাকাবীদের (জাতীয় বাস্কেটবল দল) সমর্থকে নয়, বরং দশ হাজার দাড়িঅলা কাফতান পরা হেরেদিম সমর্থকে পরিপূর্ণ ছিল। আল্ট্রা-অর্থডক্সরা সেক্যুলার ইসরায়েলের আঁতে ঘা দিয়েছে, অন্তত ওই সন্ধ্যায় এর একটি প্রধান দুর্গ অধিকার করে নিয়েছিল। তাছাড়া, ঘটনাটি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়, সারা

দেশে রুদ্ধশ্বাসে ধার্মিক ও সেক্যুলার ইসরায়েলিরা দেখেছে। উপলক্ষ্য? র‍্যাবাই শ্যাচ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন ও আগামী নির্বাচনে কীভাবে ভোট দিতে হবে সে সংক্রান্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্ষমতার ভারসাম্য সেক্যুলার শ্রোতাদের পক্ষে প্রায় দুর্বোধ্য এক অদ্ভুত হিব্রু, আরামাইক ও ইদ্দিশ মেশানো ভাষায় কথা বলা টপহ্যাট আর বাবড়ি চুলধারী র‍্যাবাইয়ের হাতে থাকার ব্যাপারে জাতি সজাগ হয়ে উঠেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় র‍্যাবাই শ্যাচের শ্রমিক ও লিকুদ পার্টির ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

ইসরায়েল ও প্যালেস্তাইনের ভেতর শান্তি প্রক্রিয়া কষ্টকর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু জাতীয় কোয়ালিশন সরকারে তা ভাঙন ধরিয়েছিল। শ্রমিক ও লিকুদ পার্টি ছোট ছোট দলগুলোর সাথে মৈত্রী স্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছিল, ধর্মীয় দলগুলোই এককভাবে বৃহত্তর গোষ্ঠী ছিল। শ্রমিক দল আগুদাত ও শাসের সাথে অনানুষ্ঠানিক চুক্তি করে, কিন্তু শাসের অন্যতম নেতা র‍্যাবাই ইয়োসেফ শ্রমিক মৈত্রী দলের ভাঙন ধরাবে ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন। সেফারদিকরা অতিজাতীয়তাবাদ প্রবণ, আরবদের ঘৃণা করে, শ্রমিক দলের পরিকল্পিত আঞ্চলিক ছাড়ের প্রবল বিরোধী ছিল তারা। শাসের সহপ্রতিষ্ঠাতা র‍্যাবাই শ্যাচ উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি শাস ও দেগেল হা-তোরাহয় তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন ও আসন্ন কোয়ালিশন আলোচনার কথা জানাবেন তাদের।

র‍্যাবাইর দশ মিনিটের ভাষণ বিস্ময়কর ছিল না, তবে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে শোনা ইসরায়েলিদের কাছে অস্পষ্টভাবে অস্বস্তিকর ছিল। সরাসরি কোয়ালিশন আলোচনার কথা উল্লেখ করেননি তিনি, বাকি জাতিকে আচ্ছন্ন করে রাখা কোনও ইস্যু ওঠাননি। স্পষ্টতই প্যালেস্তইনিদের অধিকার, জাতীয় প্রতিরক্ষা বা শান্তির লক্ষ্যে ভূমি বিনিময়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিলেন তিনি। ইসরায়েল রাষ্ট্র সম্পর্কে একটাও ভালো কথা বলেননি। ইহুদি রাষ্ট্রকে ত্রাতা হিসাবে দেখার বদলে হেরেদিম এখন কি 'ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ' সময় কাটাচ্ছে বিষণ্নভাবে তার উল্লেখ করেছেন। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ নয়, র‍্যাবাইয়ের উদ্বেগের বিষয় ছিল ধর্মের বিরুদ্ধে যায়নবাদীদের সূচিত যুদ্ধ। 'আমরা আজ যে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছি [ঐতিহ্যের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে], সেটা আজ শুরু হয়নি, সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই এর সূচনা, কেবল মহাবিশ্বের প্রভু জানেন কী আশা করা যেতে পারে,' প্রবল আবেগের সাথে বলেছেন র‍্যাবাই। কিন্তু পরিণতি নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না: 'ইহুদিকে ধ্বংস করা যাবে না। তাকে হত্যা করা যেতে পারে, কিন্তু তার সন্তান তোরাহর প্রতি অনুগত থেকে যাবে।'

AMARBOI.COM

তাদের শত্রু হিসাবে চিন্তা করাটাই যথেষ্ট খারাপ ছিল, কিন্তু তাদের হতাশ করে শ্রমিকদলীয়রা তাদের পবিত্র সংগঠনসমূহ ও নিজেদের কেবল অ-ইহুদিই নয় বরং বিশেষভাবে ইহুদিবিরোধী হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হতে শুনেছে। 'শ্রমিকরা কি আদৌ পবিত্র?' পরিহাসের সুরে জানতে চেয়েছেন র‍্যাবাই। 'তারা কি নিজেদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি নতুন তোরাহর সন্ধান করেনি?' এইসব *কিব্বুতযনিক* জেন্টাইলদের চেয়ে উন্নত নয়; তারা এমনকি সাব্বাথ বা ইয়োম কিপ্পুর কী তাই জানে না। কেমন করে এই ধরনের লোকদের 'ইহুদি জনগণের জটিল ও আবিশ্যিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যায়?' শ্রমিক দলীয় রাজনীতিকদের সাথে কোনও রফা হতে পারে না। 'ওরা নেসেটে থাকার সময় ধার্মিকতাকে জোরাল করার কোনও আগ্রহ তাদের ছিল না। বরং উল্টো, তারা এমন সব আইন পাশ কারানোর চেষ্টা করেছে যেগুলো ইহুদি ধর্মকে ধ্বংস করে দেবে।'[৭৬] ইয়াদ এলিয়াহু স্টেডিয়ামে সেদিনের সন্ধ্যার তাৎপর্য কেবল র‍্যাবাই শ্যাচের একা, বিনা সহযোগিতায় অনায়াসে ক্ষমতার ভারসাম্য লিকুদ পার্টির দিকে চালিত করাতেই নিহিত ছিল না, বরং তা হেরেদিমের ঘৃণিত অস্পৃশ্য গ্রুপ হতে ক্ষমতার কেন্দ্রে অসাধারণ অভিযাত্রাও চিহ্নিত করেছিল। ঘটনাটি আবার ইসরায়েলে 'দুটি জাতির' অস্তিত্বও তুলে ধরেছে, যারা একে অন্যের ভাষা বোঝে না বললেই চলে এবং তাদের কোনও সম-উদ্বেগও নেই। কেবল জেন্টাইলদের উদ্দেশে পরিচালিত ক্রোধ নয়, বরং সতীর্থ ইহুদিদের বিরুদ্ধেও অসংখ্য হেরেদিমের ধার্মিকতাকে অনুপ্রাণিতকারী গভীর ঘৃণাও তুলে ধরেছে এটা।

চরমপন্থী ধার্মিক যায়নবাদী ও গাশ এমুনিমের সদস্যরাও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল। তারা বিদ্রোহী ছিল, একদিকে তাদের দৃষ্টিতে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ ও অন্যদিকে অর্থডক্সির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সংগঠিত করছিল। ইহুদিদের পক্ষে জীবন ব্যাপকভাবে বদলে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পারছিল যে, ডায়াসপোরার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঐতিহ্যের সাথে ইহুদিদের বেঁধে রাখার আর প্রয়োজন নেই, কারণ মেসিয়ানিক যুগের সূচনা হয়েছে। এটা ছিল শাব্বেতেই যেভির পর প্রথম প্রধান ইহুদি প্রাদুর্ভাব। সেই সময়েও ইহুদিরা নিজেদের ক্রান্তিকালের অধীন ভেবেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে, নজীরবিহীন পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছে তারা। কিন্তু শাব্বেতিয়রা যেখানে ঘেটোর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, গাশ সদস্যরা আঞ্চলিকভাবে নিজেদের সীমাবদ্ধ মনে করেছে। শাব্বেতিয়দের মতোই সীমানার ব্যাপারে দারুণ আচ্ছন্ন ছিল, এবং এরেযত ইসরায়েলের সীমানার প্রতিই বেশি নজর দিলেও তারাও ইহুদিবাদের সীমানা ও সীমা নির্ধারণের জন্যে লড়াই করছিল। সেক্যুলার ও ধার্মিক ইহুদিদের ভেতরকার বাধা অপসারণ করতে চেয়েছে তারা।[৭৭]

AMARBOI.COM

হেরেদিমরা যাই ভেবে থাকুক না কেন, কুকবাদীদের বিশ্বাস ছিল যে, একই সাথে অর্থডক্স ও যায়নবাদী হওয়া সম্ভব। তারা সেক্যুলারিস্টদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মাত্রা ছাড়া যায়নবাদ অসম্পূর্ণ বলেও জোর দিয়েছিল তারা। কিন্তু কঠিন বছর ছিল এগুলো। কুকবাদীরা লিকুদ সরকার কর্তৃক বেঈমানির শিকার হয়েছে বলে ভেবেছে, ইয়ামিত থেকে তাদের বহিষ্কার করেছিল তারা, এবং আরবদের সাথে শান্তি স্থাপন করে নিস্তার প্রক্রিয়াকে থমকে দিয়েছে। ১৯৮৭ সালে সূচিত *ইন্তিফাদা* ('ঝাঁকুনি দেওয়া' বোঝাতে আরবী পরিভাষা) হিসাবে পরিচিত প্যালেস্তাইনি গণবিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত শ্রমিক দলকে পশ্চিম তীরের পবিত্র ভূখণ্ডের নির্দিষ্ট অংশ ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকায় কুকবাদীদের চোখে ক্যাম্প ডেভিডের চেয়েও অগ্রহণযোগ্য মনে হওয়া শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করলে আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়েছে। কুকবাদীরা ক্রমবর্ধমানহারে নিজেদের বৈরী জেন্টাইল বিশ্ব দিয়ে আবদ্ধ মনে করছিল—অনেকটা ডায়াসপোরার ইহুদিদের মতো—কিন্তু আবার সতীর্থ ইহুদিদের দিয়েও, যারা তাদের সাধ্যের রয়েছে বলে মনে হওয়া সম্পূর্ণতা অর্জন থেকে ওদের পিছু টানছিল।

এর ফলে ভূমিতে গাশের অতীন্দ্রিয় আবেগ ক্রোধের তুরীয় আনন্দে পরিণত হয়েছিল, অনেক সময় যা ভীতিকর সহিংসতায় বিস্ফোরিত হতে পারে, প্রথম নজীর আরবদের বিরুদ্ধে। অতীতের আরও আশাবাদী দিনে গাশ বসতি স্থাপনকারীরা অধিকৃত এলাকায় প্যালেস্তাইনিদের 'সাহায্য' ও দুই জাতির মধ্যকার 'ঘৃণার প্রাচীর' ভেঙে ফেলার জন্যে আগমনের ঘোষণা দিয়েছিল, যদিও এই প্রস্তাবের সাথে জড়িত শর্তাবলী অনেপনীয় বৈরিতাপ তুলে ধরে: 'আমরা এসেছি হত্যার পরিবেশ থেকে তোমাদের পরিশুদ্ধ করতে যাতে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছ,' ১৯৭০-র দশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লেভিংগার।[৭৮] তাঁর আচরণ ক্রমবর্ধমানহারে উস্কানীমূলক হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম তীরের আরব শহরে অস্ত্র হাতে আগ্রাসীভাবে হাঁটাচলা করতেন তিনি। কোনও বসতিতে প্যালেস্তাইনি আক্রমণের ঘটনা ঘটলে তিনি তখন অ্যাক্টিভিস্টদের প্রতিশোধমূলক, ভিজিলান্তে হামলায় নেতৃত্ব দিতেন, গাড়ির কাঁচ ভাঙতেন বা দোকান পাটে আগুন লাগিয়ে দিতেন। *ইন্তিফাদার* সূচনা ঘটার পর তিনি বলেছিলেন, যখনই তিনি হেব্রনের কাছে যান, 'আমার ভেতর এক উন্মত্ত চেতনা জেগে ওঠে আমাকে যা শান্তি দেয় না।'[৭৯] ১৯৮৮ সালে, হেব্রনে তাঁর গাড়ির উপর ইটপাটকেল মারা হলে লেভিংগার ঝটপট বের হয়ে হামলাকারীদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করেন, নিজের জুতোর দোকানের সামনে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকা সালাহকে হত্যা করেন, পাথর ছোঁড়ায় তার ভূমিকা ছিল না। পরে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন লেভিংগার, নির্বিচারে গুলি ছুঁড়তে থাকেন, তরকারীর গাড়ি উল্টে দেন এবং চড়া

AMARBOI.COM

গলায় মুখখিস্তি করতে থাকেন। বিচারে তিনি বলেছিলেন, কাউকে হত্যা না করলেও 'একজন আরবকে হত্যা করার সম্মান' পেলে খুশিই হতেন তিনি।[৮০]

এরেতয ইসরায়েলে আরবদের ব্যাপারে কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব ছিল গাশ সদস্যদের। সকলেই একমত ছিল যে, প্যালেস্তাইনিদের এই দেশের উপর কোনও অধিকার নেই, এখানে ওদের জন্যে শান্তিও নিই। ঘৃণা ও বর্জনের এই ধর্মতত্ত্ব অবশ্যই ইহুদি ধর্মবিশ্বাসের বিকৃতি। ইসরায়েলের পয়গম্বরগণ, তোরাহ ও তালমুদের রাব্বিনিক সাধুগণ সকলেই এমনকি যে তাদের জাতির অংশ নয়, কিন্তু তাদের দেশে বাসকারী 'আগন্তুকের' প্রতিও ন্যায় বিচার ও প্রেমময় দয়ার উপর জোর দিয়েছেন।[৮১] জেসাসের প্রবীন সমসাময়িক র‍্যাবাই হিল্লেল স্বর্ণবিধিতে ইহুদিবাদের শিক্ষার সারমর্ম টেনেছেন: 'তোমার নিজের প্রতি যে আচরণ আশা করো না, অন্যের সাথেও সেই আচরণ করো না।'[৮২] তবে মৌলবাদী নৈর্বাচনিকতা নিয়ে কুকবাদীরা কেবল আরও আক্রমণাত্মক বাইবেলিয় অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে, যেখানে ঈশ্বর ইসরায়েলিদের প্রতি প্রতিশ্রুত ভূমি থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের বিতাড়িত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের সাথে কোনও চুক্তি না করতে বলেছেন ও এমনকি তাদের নিশ্চিহ্ন করতে বলেছেন।[৮৩] ইহুদিরা ঈশ্বরের মনোনীত জাতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বোঝাতে চেয়েছে অন্য জাতির পক্ষে অবশ্য পালনীয় আইন কানুনের অধীন নয় তারা, বরং তারা অনন্য, পবিত্র, এবং ভিন্ন। ভূমি দখলের ঈশ্বরের নির্দেশনা, যুক্তি দেখিয়েছেন শ্লোমো আভিনার, আমাদের দেশের জেন্টাইলদের মানবিক ও জাতীয় অধিকার বিবেচনার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[৮৪]

অধিকাংশ কুকবাদী বিশ্বাস করত যে, আরবদের এরেতয ইসরায়েলে থাকবার অনুমতি দেওয়া উচিত, তবে কেবল *গেরিন তোশাভিম* ('অধিবাসী বিদেশী') হিসাবে। যতক্ষণ ইসরায়েল রাষ্ট্রকে মানছে, তাদের সাথে অবশ্যই শোভন আচরণ করতে হবে, কিন্তু কোনওদিনই নাগরিকত্ব বা রাজনৈতিক অধিকার পাবে না তারা। অন্যরা প্যালেস্তাইনিদের এই অধিকারটুকুও দিতে রাজি ছিল না, তাদের অভিবাসী হতে চাপ দিয়েছে। একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী আমেলাকাইটদের নজীর টেনে নিশ্চিহ্নকরণের প্রস্তাব দিয়েছিল—এমনই নিষ্ঠুর জাতি যে ইসরায়লিদের তাদের করুণাহীনভাবে নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঈশ্বর।[৮৫] ১৯৮০ সালে র‍্যাবাই ইসরায়েল হেস বার-ইলান ইউনির্ভার্সিটির সরকারী ম্যাগাজিনে 'জেনোসাইড: আ কামান্ডমেন্ট অভ দ্য তোরাহ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এখানে তিনি যুক্তি দেখান, আলোর কাছে যেমন অন্ধকার প্যালেস্তাইনিরা ইসরায়েলিদের কাছে তাই, তারা আমেলাকাইটদের মতো একই নিয়তি ভোগ করার যোগ্য।[৮৬] একই

AMARBOI.COM

বছর, গাশ বসতি স্থাপনকারী হাইম তযুরিয়া লেখেন যে, ঘৃণা 'স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর':

> প্রতি প্রজন্মে আমরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে রুখে দাঁড়ানোদের পেয়েছি। সুতরাং, প্রত্যেক প্রজন্মেরই আমালেক রয়েছে। আমাদের প্রজন্মের আমেলাকিজম নিজেকে আমাদের পূর্ব পুরুষের ভূমিতে আমাদের জাতীয় রেনেসাঁর প্রতি আরবদের ঘৃণায় গভীরভাবে প্রকাশিত।[৮৭]

১৯৮০ সালের ৩রা মে হেব্রনে ছয়জন *ইয়েশিভা* ছাত্র খুন হয়। এতে চরমপন্থী কিছু কুকবাদী প্রতিশোধ নিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। কিরিয়াত আরবার এক বসতিকারী মেনাচেম লিভনি ও প্রবীন গাশ বসতিস্থাপনকারী ইয়েহুদা এতযিয়ন পাঁচজন আরব মেয়রের গাড়িতে হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তাদের পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্যে বোমা পুঁতে রাখে, যাতে তারা ইহুদি বিরোধী সন্ত্রাসের পরিণতির স্মারক হয়ে থাকেন। এই খবর শোনার পর আনন্দে ফেটে পড়েছিলেন র‍্যাবাই হাইম দ্রুকমানঃ 'এভাবেই যেন ইসরায়েলের শত্রুরা ধ্বংস হয়!'[৮৮] অবশ্য বেশির ভাগ ইসরায়েলি এই আক্রমণের ফলে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত এই ঘটনায় লক্ষ্যবস্তুর মাত্র দুজন মেয়র আহত হন। লিভনি ও এতযিয়নের পক্ষে এই সন্ত্রাসী তৎপরতা সাইডলাইন মাত্র শুনে আরও বেশি বিতৃষ্ণা বোধ করেছে তারা। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে সরকার ইসরায়েলে ইসলামি বিশ্বের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান ডোম অভ দ্য রক উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাকারী ইহুদি আন্ডারগ্রাউন্ড দলের অস্তিত্বের খবর প্রকাশ করে।

১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের সময় আইডিএফ জর্দান থেকে পূর্ব জেরুজালেম ও পুরোনো শহর জয় ও অধিকার করে নেয়। যুদ্ধের অল্পদিন পরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আপত্তি উপেক্ষা করে ইসরায়েল এই এলাকাগুলো অধিগ্রহণ ও জেরুজালেমকে ইহুদি রাষ্ট্রের চিরন্তন রাজধানী ঘোষণা করে। বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ছিল এটা, কেননা ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ জেরুজালেম আন্তর্জাতিক এলাকা হবে বলে ঘোষণা করেছিল; ছয় দিনের যুদ্ধের পর বৈরিতার সময় দখল করা জেরুজালেমসহ বিভিন্ন অঞ্চল ইসলায়েলকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি করেছিল। ৬৩৮ সাল থেকে সংক্ষিপ্ত ক্রুসেডার শাসনের সময়টুকু ছাড়া (১০৯৯–১১৮৭) জেরুজালেম ছিল মুসলিম শহর; জেরুজালেম, মুসলিমরা যাকে *আল-কুদস* ('পবিত্র') বলে, মক্কা-মদিনার পর ইসলামি বিশ্বের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। ৬৯১ সালে নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া ডোম অভ দ্য রক ছিল প্রধান মুসলিম নির্মিত সৌধ,

একে আব্রাহামের ছেলেকে উৎসর্গ করার স্থান হিসাবে বিশ্বাস করা হয়; পরবর্তীকালের ট্র্যাডিশন উল্লেখ করেছে যে পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) এই রক থেকেই স্বর্গে অতীন্দ্রিয় যাত্রা শুরু করেছিলেন। এই স্থানটি ইহুদি বিশ্বের কাছেও গভীরভাবে পবিত্র, কারণ টেম্পেল মাউন্টের উপর এই ডোম নির্মিত হয়েছে, রাজা সলোমন নির্মিত মন্দিরের স্থান হিসাবে বিশ্বাস করা হয় একে।

অবশ্য শত শত বছর ধরে জেরুজালেমে মুসলিম ও ইহুদিদের ভেতর টানাপোড়েন ছিল না; ইহুদিরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, ৭০ সিই-তে রোমানদের হাতে বিধ্বস্ত তাদের মন্দিরটি কেবল মেসায়াহর হাতেই আবার পুনর্নির্মিত হতে পারে, সুতরাং মুসলিমদের হারাম আল-শরীফ (সবচেয়ে মহান অভয়স্থান) আখ্যায়িত এই এলাকা নিয়ে তাদের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ইহুদি বিশ্বের পবিত্রতম স্থান ছিল ডোম অভ দ্য রকের ঠিক নিচে প্রথম শতাব্দী সিই-তে সম্রাট হেরোদ নির্মিত মন্দিরের শেষ চিহ্ন পশ্চিম প্রাচীর। অটোমান সুলতান সুলেইমান দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট (১৪৯৪-১৫৬৬) ইহুদিদের এটাকে আনুষ্ঠানিক স্যাংকচুয়ারি বানানোর অনুমতি দেন এবং বলা হয়ে থাকে, তাঁর দরবারের স্থপতি সিনান সেখানে সাধারণ উপাসনালয়ের নকশা করেছিলেন।

আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ পবিত্র নগরে মুসলিম ও ইহুদিদের এই সম্প্রীতির কালের অবসান ঘটায়, এবং ১৯২০-র দশকে থেকে পবিত্র এলাকাটি বহু সহিংসতা প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব জেরুজালেম ও পুরোনো শহর জর্দানের অধিকারে থাকার সময় ইহুদিদের পশ্চিম প্রাচীর সফরের অনুমতি ছিল না, পুরোনো শহরের ইহুদি এলাকার প্রাচীন সিনাগগগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে ইহুদিদের পশ্চিম প্রাচীরে প্রত্যাবর্তন ছিল ছয় দিনের যুদ্ধের অন্যতম আবেগঘন দৃশ্য, এমনকি সেক্যুলার ইহুদিদের কাছেও গভীরভাবে আধ্যাত্মিক ঘটনা হিসাবে তা অনুভূত হয়েছে।

যুদ্ধের পর ইসরায়েল জেরুজালেম অধিগ্রহণ করার সময় কথা দিয়েছিল যে, ক্রিশ্চান ও মুসলিমরা তাদের পবিত্র স্থানে অনিরুদ্ধ প্রবেশাধিকার পাবে। মুসলিমরা হারাম আল-শরীফের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, যদিও সরকারী এই নীতি অতিজাতীয়তাবাদী ইসরায়েলি ও অতি চরমপন্থী ধার্মিক যায়নবাদীদের কারওই পছন্দ ছিল না, তাদের কথা ছিল একে ইহুদিদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য আনুষ্ঠানিক ইহুদি অবস্থান অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। মেসায়াহ নিষ্কৃতি না আনা পর্যন্ত মন্দির নির্মাণ করা যাবে না; এটা ছিল শত বছরের পরিক্রমায় টাবুর শক্তি অর্জনকারী নিষেধাজ্ঞা।

AMARBOI.COM

অবশ্য ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে এর পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। লিভনি ও এতযিয়ন নিষ্কৃতির ভূমিকা হিসাবে মন্দির পুনর্নির্মাণে উৎসাহী একমাত্র ইহুদি চরমপন্থী ছিল না। পবিত্র স্থান ডোম অভ দ্য রক 'দূষিত' অবস্থায় কেমন করে সেখানে মেসায়াহ ফিরতে পারেন? অন্য মৌলবাদীদের মতো তাদের বিশ্বাস ছিল, সকল সতর্কতা উড়িয়ে তাদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে ও মেসায়াহর জন্যে পথ তৈরি করার লক্ষ্যে টেম্পল মাউন্ট থেকে এই মুসলিম উপসনালয়টিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তারা প্রথম পদক্ষেপ নিলে, ঈশ্বর নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাসের এই কর্মকে পুরস্কৃত করে ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করবেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মেসায়াহকে প্রেরণ করে উদ্ধার করবেন ইসরায়েল জাতিকে। লিভনি ও এতযিয়ন ও তাদের সতীর্থ ষড়যন্ত্রকারীরা বিশ্বাস করত, ইসরায়েলি সরকার আরবদের হারাম আল-শরীফ, টেম্পল মাউন্টের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দিয়ে মহাপাপ করেছে। তাদের চোখে ডোম অভ দ্য রক ছিল এক ধরনের 'অশ্লীলতা' ও 'আমাদের প্রজন্মের সকল আধ্যাত্মিক ভ্রান্তির মূল কারণ।'[৮৯]

ইহুদি আন্ডারগ্রাউন্ডের অন্যতম প্রধান আদর্শিক নেতা ভদ্র, মৃদুভাষী কাব্বালিস্ট ইয়েগুয়া বেন শোশান বিশ্বাস করতেন, ডোম অভ দ্য রক নিষ্কৃতিকে ব্যহতকারী তাঁর চোখে শয়তানি প্রভাবে অনুপ্রাণিত 'অপরপক্ষের' অশুভ শক্তির আবাস। তিনিই ক্যাম্প ডেভিড আলোচনার সময় লিভনি ও এতযিয়নের কাছে 'অশ্লীলতা' দূর করার প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। ডোমের ধ্বংসের ভেতর দিয়ে তাদের শক্তি নষ্ট হবে, নিমেষে বন্ধ হয়ে যাবে অভিশপ্ত শান্তি প্রক্রিয়া। আর কিছু না হোক, এই নাটকীয় কাজটি বিশ্বব্যাপী ইহুদি জনগণকে ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে সচেতন করে তুলবে ও শত্রুর সাথে এই সমন্বয়ের আলোচনা পরিত্যাগে বাধ্য করবে।

এক সংকট মুহূর্ত ছিল এটা। ডোম অভ দ্য রকের বোমা বর্ষণে শান্তি কেবল প্রক্রিয়ারই অবসান ঘটাত না, নিশ্চিতভাবেই প্রথম বারের মতো গোটা মুসলিম বিশ্বের ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে মিলিত হওয়ার যুদ্ধের সূচনা ঘটাত। ওয়াশিংটনের কৌশলবিদগণ একমত প্রকাশ করেছেন যে, ঠাণ্ডাযুদ্ধের পটভূমিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরব ও ইসরায়েলের সমর্থক থাকায় ডোম অভ দ্য রকের ধ্বংস তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও সূচনা ঘটাতে পারত।[৯০] পারমাণবিক বিপর্যয়ের অপচ্ছায়া অবশ্য এই কুকবাদীদের বিচলিত করেনি। তারা নিশ্চিত ছিল, এই পৃথিবীর বুকে প্রলয়ের সূচনা ঘটিয়ে ঐশী জগতে শক্তিকে সক্রিয় করে তুলে ঈশ্বরকে তাদের পক্ষে হস্তক্ষেপে ও ইসরারেয়লকে বাঁচাতে মেসায়াহকে পাঠাতে 'বাধ্য' করবে।[৯১]

AMARBOI.COM

কাব্বালিস্টিক ভাবনার উন্মত্ত রূপ এটা। কর্মতৎপরতার নীল নকশা হিসাবে মৌলবাদীদের মিথলজিকে ব্যবহারের ভীতিকর নজীর। বাস্তব ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনায় অযৌক্তিক কিছুই ছিল না। লিভনি আইডিএফ-এর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল। দুবছর ধরে হারাম আল-শরীফকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়াশোনা এবং গোলান মালভূমির সামরিক শিবির থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক সংগ্রহ করেছিল। আটাশটি নিখুঁত বোমা বানিয়েছিল সে যেগুলো দিয়ে ডোম ধ্বংস হলেও আশপাশের এলাকার কোনও ক্ষতি হত না।[৯২] আক্রমণের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল ওরা। কেবল কাজের অনুমোদন দেওয়ার মতো একজন র‍্যাবাই না পাওয়ায় আটকে ছিল।

ডোম অভ দ্য রক পরিকল্পনা যুক্তি বর্জন, অলৌকিকের উপর আস্থা ও ইহুদি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো এক ধরনের নিহিলিজমের নজীর তুলে ধরেছে। এই বিপর্যয়কর মেসিয়ানিজম আধুনিক অভিজ্ঞতার দীর্ঘদিনের অংশ মৃত্যুতৃষাকে প্রকাশ করেছে। গাশ এমুনিমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করায় এটা আবার আত্মবিনাশীও ছিল। স্বর্ণযুগে ইসরায়েলি সাধারণের কোনও কোনও অংশের মাঝে অর্জিত আস্থা আর কোনও দিন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

র‍্যাবাই মেয়ার কাহানে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন নৈতিক নিহিলিজমে বৈশিষ্ট্যায়িত ছিল। অধিকাংশ ইসরায়েলিদের ভীত করে ১৯৮৪ সালে ১.২ শতাংশ ভোটে নেসেটে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।[৯৩] নিউ ইয়র্ক সিটিতে শুরু হয়েছিল তাঁর কর্মজীবন, এখানে ইহুদিদের উপর কৃষ্ণাঙ্গ তরুণদের পরিচালিত হামলার বদলা নিতে ইহুদি প্রতিরক্ষা সংগঠিত করেছিলেন তিনি। ১৯৭৪ সালে ইসরায়েলে পৌঁছান তিনি, এবং শেষ পর্যন্ত কিরিয়াত আরবায় থিতু হন, এখানে সংগঠনের নাম পাল্টে কাচ ('এভাবে!') রাখেন। এবার তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় আরবদের হয়রানি করে এরেতয ইসরায়েল থেকে বিদায়ে বাধ্য করা। কাহানের মৌলবাদ প্রায় আদিআদর্শমূলক ছিল। তাঁর ইহুদিবাদ এতটাই রিডাকশনিস্ট ও নিষ্ঠুরভাবে নৈর্বাচনিক ছিল যে তা ধর্মবিশ্বাসের মারাত্মক ক্যারিকেচারে পরিণত হয়েছিল। 'ইহুদিবাদে একাধিক বাণী নেই,' একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে বলেছিলেন তিনি। 'বাণী একটাই। এবং সেই বাণী হচ্ছে ঈশ্বর যা চান তাই করা।' বাণী স্রেফ এই: 'ঈশ্বর এই দেশে এসে আমাদের একটি ইহুদি রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে বলেছেন।'[৯৪] পবিত্রতার ইহুদি মতবাদ (কোদেশ: 'বিচ্ছিন্নতা', 'আলাদাভাবে অবস্থান করা'), আচারের ভেতর দিয়ে প্রতীকীভাবে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যকার পার্থক্যকে উদযাপন করেছিল, এখন কাহানের ব্যাখ্যায় তা অনন্যভাবে রাজনৈতিক অর্থ নিয়েছিল: 'ঈশ্বর চান আমরা আমাদের নিজেদের দেশে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করি, যাতে বিদেশীদের

সাথে আমাদের সম্ভাব্য কম সম্পর্ক থাকে।'[৯৫] অর্থাৎ, আরবদের বিদায় নিতে হবে। আব্রাহামের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি গোত্রপিতাদের আমলের মতো আজও বৈধ রয়েছে, সুতরাং আরবরাই দখলদার।[৯৬] জেনেসিসের *মিথোস* এভাবে জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল। এই রিডাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিসঙ্গতভাবেই ভয়ানক সন্ত্রাসের মেসিয়ানিক দর্শনের দিকে চালিত করে। ছয় দিনের যুদ্ধের বিজয়ের পর ইহুদিরা 'নিষ্কৃতির উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল।' ইহুদিবাদের একক নির্দেশনার কারণে তাদের ব্রত পরিষ্কার। তাদের উচিত ছিল এলাকা অধিকার করে আরবদের বহিষ্কার করে 'টেম্পল মাউন্ট থেকে জেন্টাইলদের বিভীষিকা' দূরীভূত করা। তারা কাজটা করলে অনায়াসে সানন্দে উপস্থিত হত নিষ্কৃতি। ইসরায়েল ব্যর্থ হওয়ায় মেসায়াহ আসবেন বটে, কিন্তু সেটা হবে হলোকাস্টের চেয়েও ভয়ানক ব্যাপক অ্যান্টি-সেমিটিক বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে, শেষ পর্যন্ত যা সকল ইহুদিকে ঈশ্বরের নির্দেশনা মানতে ও ইসরায়েল বাস করতে বাধ্য করবে।[৯৭]

ধ্বংস ও মৃত্যুর এই অন্ধকার দর্শন গভীরভাবে নিহিলিস্টিক। এটা ঘৃণা ও প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায়ও ভরপুর। ধর্ম সম্পর্কে কাহানের ভীতিকর বিকৃত দর্শন নির্যাতন ও দমনের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার প্রভাব তুলে ধরে, সুযোগ দিলে যা আত্মার গভীরে প্রবেশ করে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। কাহানের ধর্মতত্ত্ব সর্বত্র শত্রু দেখতে পায়, ক্রিশ্চান, নাৎসি, কৃষ্ণাঙ্গ, রাশিয়ান বা আরব যাই হোক না কেন, শত্রু শেষ পর্যন্ত এক এবং অদ্বিতীয়। সবকিছুই ইহুদি ভোগান্তি এবং সেই ভোগান্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধের অবস্থান থেকে দেখা হয়। ইসরায়েল রাষ্ট্র ইহুদিদের জন্যে কোনও আশীর্বাদ ছিল না, বরং জেন্টাইলদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের প্রতিশোধ:

> ঈশ্বর ইহুদিদের জন্যে বা তার ন্যায়বিচার ও ভালো কাজের পুরস্কার হিসাবে এই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেননি। এর কারণ তিনি, সব প্রশংসা তাঁর, স্থির করেছেন যে তাঁর পক্ষে আর তাঁর নামের অপবিত্রকরণ এবং তাঁর নামে নামকরণকৃত জাতিকে নিয়ে পরিহাস, অসম্মান ও নির্যাতন সহ্য করা সম্ভব নয়, সুতরাং, তিনি ডায়াসপোরার সম্পূর্ণ বিপরীত ইসরায়েল রাষ্ট্রকে অস্তিত্ব দিয়েছেন।[৯৮]

যখনই জেন্টাইলের হাতে কোনও ইহুদি প্রহৃত বা ধর্ষিত হচ্ছে, ঈশ্বরের নাম অপবিত্র হচ্ছে: 'ইহুদি অপমানিত হলে ঈশ্বর গ্লানি বোধ করেন!' তবে এর উল্টোটাও সত্য। সহিংস প্রতিশোধ *কিদ্দুশ হা-শেম*, ঈশ্বরের নামের পবিত্রকরণ:

'বিস্মিত জেন্টাইল বিশ্বের মুখের উপর একজন ইহুদির মুষ্ঠাঘাত গত দুই সহস্র বছরে দেখা যায়নি, এটাই *কিদ্দুশ হা-শেম*।'[৯৯]

> এই আদর্শই একজন কাহানেবাদী বারুচ গোল্ডস্তেইনকে ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ কেভ অভ দ্য প্যাট্রিয়ার্কে পুরিম উৎসবের সময় উনত্রিশ জন প্যালেস্তাইনি উপাসককে হত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ২৪শে আগস্ট, ১৯২৯ প্যালেস্তাইনিদের হাতে নিহত উনষাট জন ইহুদির প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল সে। প্রতিশোধের এই কাজটি খোদ ইসরায়েলে ইসলামি অনুপ্রাণিত সন্ত্রাসের বৃদ্ধি ডেকে এনেছিল।

১৯৬৭ সালের পর বিশ্বব্যাপী মুসলিম ধর্মীয় পুনর্জাগরণে প্যালেস্তাইনিরা জড়িত হয়নি। আরবদের পরাজয়ে তাদের সাড়া রাজনৈতিক, সেক্যুলারিস্ট, ও জাতীয়তাবাদী ছিল। ইয়াসির আরাফাত প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে পুনর্গঠিত করেন এবং প্যালেস্তাইনি সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে গেরিলা অপারেশন, সন্ত্রাস ও কূটনীতির সূচনা করেন। এটা চরমভাবে সেক্যুলার আন্দোলন ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে পিএলও জাতীয়তাবাদীরা গাযা স্ট্রিপে অারিয়াল শ্যারন কর্তৃক দমনের শিকার হলে শেখ আহমাদ ইয়াসিন মুজামাহ ('কংগ্রেস') নামে একটি মুসলিম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন; এই প্রতিষ্ঠানটি মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সম্পর্কিত ধরনের কল্যাণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। ১৯৮৭ সাল নাগাদ মুজামাহ স্ট্রিপে *যাকাত* (ইসলামি কর), তেল সমৃদ্ধ উপসাগরীয় দেশগুলো ও মুজামাহকে সমর্থন করেন পিএলওকে খাটো করার আশায় ইসরায়েলের সমর্থনে তারা একটি দাতব্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, যার ভেতর ক্লিনিক, মাদকাসক্তি নিরাময় কার্যক্রম, তরুণ সংঘ, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ও কোরান ক্লাস অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পর্যায়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে আগ্রহী ছিলেন না ইয়াসিন। তিনি সংস্কারক ছিলেন, ইসলামি প্রেক্ষাপটে গাযায় আধুনিকতার ফল বয়ে আনতে চেয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে প্যালেস্তাইনের আত্মার পক্ষেও লড়াই করছিলেন তিনি: তাঁর বিশ্বাস ছিল, প্যালেস্তাইনি জনগণের সাংস্কৃতিক পরিচয় সেক্যুলার না হয়ে মুসলিম হওয়া উচিত। মুজামাহর জনপ্রিয়তা দেখায় যে, বহু প্যালেস্তাইনি একমত হয়েছিল। আরাফাতকে নিয়ে তারা গর্ব করলেও তাঁর সেক্যুলারিস্ট রীতি কেবল পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষার সুফল লাভ করা এক অভিজাত গোষ্ঠীর কাছেই অর্থপূর্ণ ছিল।[১০০]

মিশরের জিহাদ সংগঠনের অনুরূপ আন্ডারগ্রাউন্ড সেলের নেটওয়ার্ক ইসলামিক জিহাদের আদর্শ ছিল আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামিক জিহাদ প্যালেস্তাইনি

AMARBOI.COM

ট্র্যাজিডিকে ধর্মীয় পরিভাষায় ব্যাখ্যা করে সায়ীদ কুতবের আদর্শ প্রয়োগ করেছে। তাদের বিশ্বাস ছিল, বর্তমানে প্যালেস্তাইনের সেক্যুলার সমাজ *জাহিলি*। ইসলামিক জিহাদের সদস্যরা নিজেদের ভ্যানগার্ড মনে করেছে, 'ঔদ্ধত্যের শক্তির বিরুদ্ধে--সারা বিশ্বের সমস্ত উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে' যুদ্ধ করছে, ব্যাখ্যা করেছেন তাদের আদর্শিক নেতা শেখ আউদা। *উম্মাহ্‌র* ভবিষ্যতের স্বার্থে লড়াই করছে তারা। মুজামাহ্‌র বিপরীতে ইসলামিক জিহাদ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে আগ্রহী ছিল। এর লক্ষ্য ছিল ধর্মীয়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিম প্রাচীরে আইডিএফ-এর এক পরিচিতি অনুষ্ঠানে সৈনিক ও সাধারণ মানুষের সমাবেশে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে এর কর্মীরা এক নবনিযুক্তের পিতাকে হত্যা করে। এই সময় পর্যন্ত সংগঠনটি গাযা থেকে পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।[১০১]

১৯৮৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর *ইন্তিফাদা* নামে পরিচিত জনপ্রিয় প্যালেস্তাইনি গণজাগরণ গাযায় শুরু হয়ে পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সাল থেকে প্যালেস্তাইনিদের একটা গোটা প্রজন্ম ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অধীনে এইসব অঞ্চলে বেড়ে উঠেছে; প্যালেস্তাইনি স্বাধীনতা আনতে ব্যর্থ পিএলও নেতৃত্বের উপর অধৈর্য এবং তাদের চোখে এক নিপীড়ক বিদেশী শক্তির অধীনে বাস করে প্রতিদিন অপমান ও ভোগান্তির শিকার হয়ে হতাশার শিকার হয়ে পড়েছিল তারা। ইসরায়েলিদের আশা ছিল তাদের শাসনাধীনে অধিকৃত এলাকার আরবরা এক সময় হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু ১৯৮৭ সাল নাগাদ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। একটি প্যালেস্তাইনি রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। এই নতুন বিদ্রোহের তরুণ নেতৃত্ব দখলদারিকে খাট করার দিকে প্রযুক্ত হয়; প্রতিটি প্যালেস্তাইনিকে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করে তারা, তো নারী ও শিশু বন্দুক ও শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া না করে ইসরায়েলি সৈন্যদের লক্ষ্য করে ইটপাথর ছুঁড়েছে। *ইন্তিফাদা* আরব বিশ্ব ও অভ্যন্তরীণ সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করেছিল; ইসরায়েলি শান্তি আন্দোলনেরও গতি বাড়িয়েছিল তা, কারণ এটা জোরালভাবে প্যালেস্তাইনিদের যেকোনও মূল্যে ইসরায়েলি আধিপত্য থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের ইচ্ছা তুলে ধরেছিল। *ইন্তিফাদা* ইতযহাক রাবিনের মতো অপেক্ষাকৃত কট্টরপন্থীদের উপরও প্রভাব রেখেছিল, সৈনিক হিসাবে আইডিএফ ব্যবহার করে নারী ও শিশুদের নতি স্বীকার করানোর অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রী হলে রাবিন পিএলও-র সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তুতি নেন, এবং পরের বছর ইসরায়েল ও পিএলও অসলো চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

AMARBOI.COM

কিন্তু *ইন্তিফাদার* গোড়ার দিকের দিনগুলোতে প্যালেস্তাইনি সংগ্রামকে নিশ্চিতভাবে নিহিলিস্টিক ইসলামি মাত্রা দিয়ে একটি নতুন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। *ইন্তিফাদার* নেতৃত্ব সেক্যুলারিস্ট ছিল, কিন্তু মুজামাহর কিছু সদস্য হামাস (হাকামাত আল-মুকাওয়ামাহ আল-ইসলামিয়াহ: ইসলামি রেনেসাঁ মুভমেন্ট) প্রতিষ্ঠা করেন, এই সংগঠন ইসরায়েলি দখলদারি ও প্যালেস্তাইনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে একই সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্যালেস্তাইনের মুসলিম পরিচয়ের স্বার্থে সেক্যুলারিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ছিল তারা, তরুণরা দল বেঁধে হামাসে যোগ দিয়েছে। অনেকেই শরণার্থী শিবির থেকে আগত, বাকিরা ছিল মধ্যবিত্ত ও উচু পদের কর্মী। আবারও, নির্যাতনের মুখে জন্ম নেওয়া সহিংস আন্দোলন ছিল এটা। ১৯৯০ সালের ৮ই অক্টোবর হারাম আল-শরীফে সতের জন প্যালেস্তাইনি উপাসককে হত্যার পর হামাস সন্ত্রাস বেড়ে ওঠে। নিশ্চিহ্নতার ভীতিতে তাড়িত হামাস ইসরায়েলের দালাল ধরে নিয়ে প্যালেস্তাইনিদের উপরও হামলা করে। 'আমাদের শত্রুরা সকল শক্তি দিয়ে আমাদের জাতির অস্তিত্ব মুছে ফেলার চেষ্টা করছে,' ১৯৯৩ সালে ব্যাখ্যা করেছিলেন একজন মুখপাত্র। সুতরাং ইসরায়েলের সাথে যেকোনও রকমের সহযোগিতাই 'মারাত্মক অপরাধ।'[১০২] ইসলামিক জিহাদের মতো হামাস আরব-ইসরায়েল বিরোধকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখেছে। এর সদস্যদের বিশ্বাস ছিল, জনগণের ধর্মীয় দায়িত্ব অবহেলাই প্যালেস্তাইনি ট্র্যাজিডি সৃষ্টির কারণ; কেবল ইসলাম ফিরে গেলেই প্যালেস্তাইনিরা ইসরায়েলি শাসন ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হবে।[১০৩] হামাস বিশ্বাস করেছে যে, ইহুদি ধর্মের কারণেই ইসরায়েলের সাফল্য এসেছে, ইসরায়েল ইসলামের ধ্বংস নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।[১০৪] সুতরাং, আত্মরক্ষার স্বার্থে যুদ্ধ করার দাবি তুলেছে তারা। বারুচ গোল্ডস্তেইন হেব্রনে প্যালেস্তাইনি উপসকদের হত্যা করার পর হামাস জীবনের বিনিময়ে জীবন নেওয়ার শপথ করেছিল। অ্যাক্টিভিস্টরা শোকের চল্লিশ দিন পেরুনোর অপেক্ষা করার পর একজন আত্মঘাতী বোমাবর্ষণকারী অধিকৃত এলাকায় নয়, মূল ইসরায়েলের আফুলায় সাতজন ইসরায়েলি নাগরিককে হত্যা করে। এক সপ্তাহ পরে, ১৯৯৪ সালের ১৩ই এপ্রিল, আরেকজন আত্মঘাতী বোমাবর্ষণকারী হাদেরায় এক জনাকীর্ণ বাসে পাঁচজন ইসরায়েলিকে হত্যা করে। সহিংসতা নতুন সহিংসতার জন্ম দেয়।

এই আত্মঘাতী বোমাবর্ষণকারীরা আগের বছর স্বাক্ষরিত অসলো চুক্তি সম্পর্কে বহু ইসরায়েলিকে সতর্ক করে তোলে। এই চুক্তির ভেতর দিয়ে পিএলও ১৯৪৮ সালের সীমানার ভিত্তিতে ইসরায়েলের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে সহিংসতা ও সন্ত্রাসের অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিনিময় পাঁচ বছরের জন্যে পশ্চিম তীর ও গাযা স্ট্রিপে প্যালেস্তাইনিদের সীমিত স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া

AMARBOI.COM

হয়েছিল। এই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অধিকৃত এলাকায় ইসরায়েলি বসতি, প্যালেস্তাইনি শরণার্থীদের জন্যে ক্ষতিপূরণ ও জেরুজালেমের ভবিষ্যতের মতো বিষয়গুলো নিয়ে চূড়ান্ত অবস্থানগত আলোচনা শুরু হবে। কিন্তু ইসরায়েলে আত্মঘাতী বোমাবর্ষণকারীদের অস্তিত্ব ইঙ্গিত বহণ করেছে যে আরাফাত তাঁর সেক্যুলারিস্ট সরকারের বিরোধিতাকারী ইসলামি জঙ্গীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি এবং কোনও কোনও ইসরায়েলি, বিশেষ করে রাজনৈতিক বর্ণালীর ডানে অবস্থানকারীরা অসলোয় ইসরায়েলি নিরাপত্তা জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্যে রাবিনকে দোষারোপ করেছে।

কুকবাদী র‍্যাবাইগণ অসলো চুক্তিতে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন: পবিত্র ভূমি বিসর্জন দিয়ে সরকার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। ফলে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে আইডিএফ অধিকৃত এলাকা হতে লোকজন সরিয়ে নিতে শুরু করলে র‍্যাবাই অভ্রাহাম শাপিরা এবং চৌদ্দজন গাশ র‍্যাবাই সৈনিকদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করার নির্দেশ দেন। এটা গৃহযুদ্ধ ঘোষণারই সামিল ছিল। অন্য র‍্যাবাইরা প্রশ্ন তুলেছেন রাবিন *রোদেফ* ('অনুসারীতে') পরিণত হয়েছেন কিনা, যিনি সক্রিয়ভাবে ইহুদির জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দেন এবং সে কারণে ইহুদি আইন মোতাবেক মৃত্যুদণ্ড পাবার যোগ্য।[১০৫] ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯৫, হেসদার *ইয়েশিভার* সাবেক ছাত্র দুর্দান্ত সেনা সদস্য ও বার ইলান ইউনিভার্সিটির ছাত্র ইয়েল আমির তেল আভিভে এক শান্তি মিছিলের সময় রাবিনকে হত্যা করে। পরে সে বলেছে ইহুদি পাঠ তাকে রাবিনকে ইহুদি জাতির শত্রু *রোদেফ* হওয়ার ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করেছে; তাঁকে হত্যা করা তার দায়িত্ব ছিল।[১০৬]

সাদাতের হত্যাকাণ্ডের মতো রাবিনের হত্যাকাণ্ডও মধ্যপ্রাচ্যে দুটি যুদ্ধ চলার কথা তুলে ধরেছে। একটা আরব-ইসরায়েল বিরোধ; অন্য যুদ্ধটি ইসরায়েল ও মিশরের মতো নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে সেক্যুলারিস্ট ও ধার্মিকদের ভেতর। কেবল ধার্মিক ইহুদিরা এক গভীর স্তরে নির্যাতিত ও আক্রান্ত হওয়ার বোধ লালন করছিল না। ইসলায়েলের সেক্যুলারিস্টরাও একইভাবে ধার্মিক ইহুদিদের হাতে প্রত্যাখ্যাত ও আক্রান্ত মনে করেছে। জেরুজালেমের হেরেদি এলাকায় চলাচলের সময় জনপ্রিয় ইসরায়েলি লেখক আমোস ওয স্মৃতিচারণ করেছেন যে, আদি যায়নবাদীরা অর্থডক্স ইহুদিবাদকে ঘৃণা করত এবং এই বাস্তবতাকে চারপাশের বিশ্ব ও তাদের অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইত। ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার এক বিস্ফোরণে তারা বিশ্বকে 'জলাভূমি, মৃত শব্দের স্তূপ ও নিভন্ত প্রাণ হিসাবে বর্ণনা করেছে।' এমনি সেক্যুলার ঘৃণার প্রতি হেরেদিম করুণার সাথে সাড়া দিয়েছে। নেচারেই কারতার সদস্যদের আবাস এক মহল্লার দেয়ালে ওয কালো স্বস্তিকা ও গ্রাফিতি দেখতে

AMARBOI.COM

পানঃ 'যায়নবাদী হিটলারপন্থীদের মৃত্যু চাই।' 'টেডি কোলেক [জেরুজালেমের শ্রমিক দলীয় মেয়র] নিপাত যাক!' শিক্ষক দোভ সাদানের কথাও মনে পড়ে গিয়েছিল ওযের। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, যায়নবাদ স্রেফ ইহুদিবাদের ইতিহাসে সাময়িক পর্ব, অর্থডক্স ইহুদবাদ আবার ফিরে আসবে, 'যায়নবাদকে হজম করে নেবে।' এই আল্ট্রা অর্থডক্স পাড়ায় হাঁটতে গিয়ে ওয হেরেদি ইহুদিবাদের শক্তি দেখে বিপর্যস্ত ও অভিভূত বোধ করেছেন, 'ফুলে ফেঁপে উঠে আপনার নিজের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বকেই হুমকি দিচ্ছে ও আপনার নিজস্ব জগতের শেকড় কুরে কুরে খাচ্ছে, আপনার এবং আপনার মতো যারা তাদের বিদায়ের পর এর সমস্ত কিছু অধিকার করে নিতে তৈরি হচ্ছে।'[১০৭] সেক্যুলারিস্ট ইসরায়েলিরাও যেন ধার্মিক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়ে নিশ্চিহ্নতা ও অযৌক্তিক ত্রাসের বোধে আক্রান্ত হয়।

সমস্যার মূলে স্পর্শ করেছেন ওয। মৌলবাদী ও সেক্যুলারিস্টরা–যেকোনও ধর্মেরই হোক–যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণ তারা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন পবিত্রতার ধারণা লালন করে। গাশ এমুনিমের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ওয একে 'একটি নিষ্ঠুর ও অনমনীয় গোষ্ঠী' আখ্যায়িত করেছেন, 'ইহুদিবাদের অন্ধকার কোণে' যার জন্ম হয়েছে এবং 'আমাদের কাছে যা কিছু পবিত্র ও প্রিয় তাকে ধ্বংস করার হুমকি দিচ্ছে।' সেক্যুলারিস্ট উদারপন্থীদের পক্ষে–তারা ইহুদি, ক্রিশ্চান বা মুসলিমই হোক–ব্যক্তির স্বয়ত্তশাসন ও বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তির মতো আলোকন মূল্যবোধসমূহ অলঙ্ঘণীয় ও পবিত্র। এই ধরনের ইস্যুতে তারা আপোস বা ছাড় দিতে পারে না। উদারবাদী বা সেক্যুলার পরিচয়ের পক্ষে এই নীতিমালা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সেগুলো হুমকির মুখে পড়লে লোকে মনে করে তাদের খোদ অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মৌলবাদীরা যেমন সেক্যুলারিস্টদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে আক্রান্ত থাকে, ঠিক তেমনি ওযের মতো একজন উদারপন্থীও গাশকে হুমকি মনে করেছেন 'আমাদের উপর এক বর্বর ও উন্মাদ রক্ততৃষা টেনে আনবে'। গাশের আসল লক্ষ্য, তিনি বলেছেন, নাবলুস বা হেব্রন অধিকার নয়, বরং,

> ইসরায়েল রাষ্ট্রের উপর ইহুদিবাদের কুৎসিত ও বিকৃত ভাষ্য চাপিয়ে দেওয়া। এই কাল্টের আসল মতলব হচ্ছে আরবদের বহিষ্কার করা যাতে পরে ইহুদিদের উপর নির্যাতন চালানো যায়, তাদের মিথ্যা পয়গম্বরদের নিষ্ঠুরতার অধীনে আমাদের সবাইকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়।[১০৮]

ধার্মিক ও সেকুলারিস্টদের প্রত্যেকেই পরস্পরের দিকে ভীতির সাথে তাকায়। কেউ অপরকে স্পষ্ট দেখতে পায় না। উভয় পক্ষই অপর পক্ষের বাড়াবাড়ি, নিষ্ঠুরতা ও অহিষ্ণুতার কথা বলে এবং অন্তস্তলে আঘাত করে, শান্তি স্থাপন করতে পারে না।

আমেরিকাতেও মেরুকরণ ও বৈরিতা ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় মৌলবাদীদের অনেক বেশি সংযত ও আইননিষ্ঠ মনে হয়েছে। মৌলবাদীরা তাদের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করেনি, বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়নি বা জিম্মি আটক করেনি। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমেরিকান ধর্মের ক্ষেত্রে এক গভীর খাদ অস্তিত্ববান ছিল। জরিপে দেখা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধার্মিক জনগণ পরিষ্কার প্রায় সমান পরস্পর বৈরী শিবিরে বিভক্ত। ১৯৮৪ সালে পরিচালিত এক গ্যালপ পোলে দেখা গেছে ৪৩ শতাংশ আমেরিকান নিজেদের 'উদারপন্থী' আখ্যায়িত করেছে এবং ৪১ শতাংশ 'রক্ষণশীল'; এবং প্রধান গোষ্ঠীগুলো ঠিক মাঝখানে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীই বিভাজন 'মারাত্মক' বলে দাবি করেছে; 'অপর পক্ষ' সম্পর্কে তারা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে, যা অন্যান্য কুসংস্কারের মতোই বৃহত্তর যোগাযোগ স্থাপিত হলেও হ্রাস পায়নি।[১০৯] অন্যান্য জরিপে দেখা গেছে মাত্র ৯ শতাংশ আমেরিকান নিজেদের 'মৌলবাদী' বলে স্বীকার করলেও প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদের মৌল বিধিগুলো আরও ব্যাপকভাবে পালন করা হয়েছে।

> ৪৪ শতাংশ বিশ্বাস করে জেসাস ক্রাইস্টের মাধ্যমেই নিস্কৃতি এসেছে।
> ৩০ শতাংশ নিজেদের 'পুনর্জন্মলাভকারী' হিসাবে বর্ণনা করেছে।
> ২৮ শতাংশ বিশ্বাস করে বাইবেলের প্রতিটি শব্দ আক্ষরিকভাবেই পড়তে হবে।
> ২৭ শতাংশ বাইবেলে বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক ভ্রান্তি থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।[১১০]

আমেরিকান মৌলবাদের সাফল্য সম্পূর্ণ জেরি ফলওয়েল ও অন্য টেলিভেঞ্জালিস্টদের দক্ষ বিপনন কার্যক্রমের ফলে হয়নি। আমেরিকান সংস্কৃতি ও

AMARBOI.COM

ধর্মীয় জীবনে ধর্মবিশ্বাসের এই অক্ষরবাদী ধরনের উপাদানের অস্তিত্ব ছিল, যা এক উর্বর ভূমির যোগান দিয়েছে।[১১১]

১৯৮০-র দশকে অবশ্য মৌলবাদ এক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। কোনও প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ড ঘটেনি, বা সন্ত্রাসী কোনও অভিযানের ব্যাপার ছিল না। তার বদলে মৌলবাদী আর্দশ চরিত্রগতভাবে বিধ্বংসী ও নিহিলিস্টিক এক কেলেঙ্কারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, টেলিভেঞ্জালিস্টদের তা তুচ্ছতা, অর্থ-লুণ্ঠন ও যৌন ষড়যন্ত্রের এক অথৈ সাগরে নিক্ষেপ করেছিল। ১৯৮৭ সালের টেলিভিশন কেলেঙ্কারীর পেছনে আমেরিকান মৌলবাদের প্রকৃতির কোনও অবদান সংক্রান্ত কিছু কি ছিল?

মতবাদের ক্রিশ্চান উদ্বেগের কারণে প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদ আমাদের বিবেচিত অন্যান্য আন্দোলন থেকে এক ভিন্ন দিক গ্রহণ করেছিল। অনুশীলনের উপর ইহুদি ও মুসলমিদের গুরুত্ব আরোপের মানে ছিল এই দুটি ধর্মের মৌলবাদীরা তাদের ঐতিহ্যের মিথকে আদর্শে পরিণত করেছে। এইসব মিথগুলোকে বাস্তব জাগতিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছিল বলেই তাদের কোনও কোনও বাড়াবাড়ির ঘটনা ঘটেছিল। তারা দক্ষতার আধুনিক মানদণ্ডকে অর্জন করতে চেয়েছে, যেখানে কোনও 'সত্য'কে গুরুত্বের সাথে নিতে হলে তাকে কার্যকর হতে হয়। ইহুদি ও মুসলিম মৌলবাদীরা বাস্তব ফল অর্জনের জন্যে তাদের *মিথোই*কে বাস্তব *লোগোই*তে পরিণত করেছিল। প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা মিথকে ভিন্নভাবে বিকৃত করেছে। তারা ক্রিশ্চান মিথকে বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত করে এমন এক সংকরের সৃষ্টি করেছিল যা ভালো বিজ্ঞান বা ভালো ধর্মের কোনওটাই নয়। এটা গোটা আধ্যাত্মিকতার ট্র্যাডিশনকে পাল্টে দিয়েছে; ফলে বিরাট চাপের সৃষ্টি হয়েছে, কারণ ধর্মীয় সত্য প্রকৃতিগতভাবে যৌক্তিক নয় এবং তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা স্বজ্ঞামূলক ও অতীন্দ্রিয়কে উপেক্ষা করতে চায় বলে তারা অবচেতন, ব্যক্তিত্বের গভীরতর প্রবণতার সাথে সম্পর্কও হারিয়ে ফেলেছিল। এর ফলে আমেরিকান পুনর্জাগরণ অনেক সময় অরাজক ও উন্মাদসুলভ ছিল। ১৯৮০-র দশকের শেষের দিকে কোনও কোনও মৌলবাদী এই যৌক্তিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে তৈরি হয়েছিল। আমরা যেমন দেখেছি, যৌনতা মৌলবদীদের পক্ষে সমস্যা-সঙ্কুল ছিল, তাদের অনেককেই সক্ষমতা ও লিঙ্গ সীমা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে। সম্ভবত বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর সেটার যৌন রূপ পরিগ্রহ করার ব্যাপারটি বিস্ময়কর ছিল না।

টেলিভিশন ও এর সাথে অনেক সময় দেখা দেওয়া গণতোষামোদ আধ্যাত্মিকভাবে অসতর্কদের পক্ষে ফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিত্বের কাল্টে সংশ্লিষ্ট

AMARBOI.COM

নার্সিসিজম আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকে বৈশিষ্ট্যায়িত করা অহমকে অতিক্রম করার সাথে কেবল বেমানানই নয়, বরং টেলিভেঞ্জালিস্টরা বাস্তবের সাথেও সম্পর্ক খোয়াতে পারেন। সফল নেটওয়ার্কগুলো যে বিপুল অংকের টাকাকড়ির মালিক হতে পেরেছিল তার সাথে পার্থিব সম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রয়াস ত্যাগের গস্পেল দাবি খাপ খায় না। উত্তর ক্যারোলিনার পিটিএল (প্রেইজ দ্য লর্ড অ্যান্ড পিপল দ্যাট লাভ)-এর জিমি ও টামি ফেই বেকার তাদের অতি বিলাসী জীবনযাত্রার কারণে বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। *শার্লোট অবজার্ভার* বেশ কয়েক বছর ধরে বলে আসছিল যে, দর্শকদের উৎসর্গ করা ও টাকাপয়সা দরিদ্রদের বিলিয়ে দেওয়ার তাগিদ দিলেও বেকারদ্বয় এক ওশান ফ্রন্ট কন্ডোমিনিয়ামের পেছনে ৩৭৫,০০০ ডলার ও মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু আয়নার পেছনে ২২,০০০ ডলার খরচ করেছেন।[১১২] এসবই লিঞ্চবার্গের জেরি ফলওয়েলের গোষ্ঠীর চেয়ে দুরন্ত, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণই যার বৈশিষ্ট্য।

বেকারদ্বয় প্রধানত তাদের ক্রিশ্চান থিম পার্ক হেরিটেজ ইউএসএ-র জন্যে পরিচিত, ডিজনি কায়দায় আমেরিকায় ইভাঞ্জেলিকাল অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে, বিপুল সংখ্যক দর্শককে তা আকৃষ্ট করেছে। এক কৌতূহলোদ্দীপক নিবন্ধে আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ সুসান হার্ডিং বলেছেন, বেকারদ্বয় খুবই সচেতনভাবে ফলওয়েলের সাধারণ জ্ঞানের ধার্মিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মৌলবাদকে এক নতুন উত্তর আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন।[১১৩] উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই আমেরিকান মৌলবাদীরা আধুনিকতার চ্যালেঞ্জের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ যৌক্তিক করে তোলার মাধ্যমে সাড়া দিয়ে এসেছে। তারা যুক্তির গুণ ও কাণ্ডজ্ঞানের উপর জোর দিয়েছে, কল্পনা ও ফ্যান্টাসিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এক ধরনের শোভন অক্ষরবাদকে আলিঙ্গন করেছে; বিশ্বকে একটি আবদ্ধ কক্ষে পরিণত করেছে তারা যেখানে সত্যি ভ্রান্তি থেকে একেবারেই ভিন্ন ও স্পষ্ট, সত্যিকারের বিশ্বাসীরা সেক্যুলারিস্ট ও উদার ক্রিশ্চানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বিচ্ছিন্নতার নীতি ছিল তাদের; মৌলবাদীরা এমন এক প্রতি-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল যার ঈশ্বরহীন মূলধারা যা নয় তার সবই হওয়ার কথা ছিল: এটা এমন এক বিশ্বাস যা সন্দেহ, উন্মুক্ত প্রশ্ন ও আধুনিক বিশ্বের পরিবর্তনশীল ভূমিকা চ্যালেঞ্জ করতে ইস্পাত কঠিন নিশ্চয়তা ও ক্ষমতাক্রমের যোগান দেয়। হেরিটেজ ইউএসএ অবশ্য অন্যান্য প্রাক আধুনিক সংস্কৃতির মতো বিভিন্ন ঘরানা, নাটক, আমোদ ও জাঁকাল দৃশ্য দিয়ে বৈশিষ্ট্যায়িত ছিল।

ধর্মবিশ্বাসকে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক করে তুলে মৌলবাদীরা ধর্মকে অস্বাভাবিক চেহারা দিয়েছিল। প্রকল্প ও স্বাধীন অনুসন্ধান ভিত্তিক ডারউইনের বৈজ্ঞানিক

যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সময় মৌলবাদীরা যেমন বেকনিয় আদর্শ আঁকড়ে ছিল ঠিক তেমনি এখন বেকারদ্বয় ফলওয়েলদের মতো প্রাচীনপন্থী মৌলবাদীদের যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিলেন। হার্ডিং যেমন দেখিয়েছেন, আমেরিকান ইতিহাসের বর্ণনায় হেরিটেজ ইউএসএ বিচিত্র মিশ্রণে বিভিন্ন ধরনের একটা মিশেল। সত্য বাস্তবভিত্তিক বলে জোর দেওয়ার বদলে হেরিটেজ ইউএসএ-র প্রদর্শন সামগ্রীগুলো পার্কে তাদের কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক সংযোজন তুলে ধরে। শপিং মল ছিল ভিক্টোরিয়ান ও উপনিবেশিক স্থাপত্যের জগাখিচুরি, স্টাইল ও কালের সারগ্রাহী মিশ্রণ যা সত্য প্রতিপাদনের কোনও প্রয়াস পায়নি। প্রবেশ পথে বিলি গ্রাহামের 'আসল' আবাস প্রদর্শিত হয়েছে, কিন্তু আদি স্থান থেকে স্থানান্তরের অংশ হিসাবে তার দেয়ালে থিম পার্কে এর ভাঙা ও পুনর্নির্মাণের ছবি ছিল। জেরুজালেমের উপরের কামরার একটা 'হুবহু' প্রতিলিপি রয়েছে (যেখানে জেসাস লাস্ট সাপারে অংশ গ্রহণ ও ইউক্যারিস্ট সূচনা করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়), কিন্তু ইচ্ছা করেই একে রিপ্রোডাকশনের মতো তৈরি করা হয়েছে। এক টেলিভিশন স্টুডিওতে চার্চ সার্ভিস অনুষ্ঠিত হত, আর ফলওয়েলের বিপরীতে বেকরদ্বয় কখনওই নিয়মিত কমিউনিয়ন সার্ভিস বা সারমন সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেননি। সবসময়ই আক্ষরিক মৌলবাদী বিশ্বের চেয়ে পারফরম্যান্স, দর্শন ও ফ্যান্টাসির উপর জোর দেয়া হয়েছে।

হার্ডিং মত প্রকাশ করেছেন যে, বেকারদ্বয় ঈশ্বরের অন্তহীন ভালোবাসার উপর জোর দিলেও এক অন্তহীন ক্ষমার লোকজ ধর্মতত্ত্বও গড়ে তুলছিলেন, যা আগেই স্বর্গীয় ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বলে প্রায় পাপকে নাকচ করার মতোই ছিল।[১১৪] আমরা দেখেছি, অতীতে নৈতিকতা বিরোধী বিদ্রোহ অনেক সময় ক্রান্তিকালেই সূচিত হয়েছে। কোনও কোনও বিশ্বাসীর কাছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রাচীন নিয়ম ও জীবনধারা মানানসই বোধ হয় না, নিজেদের রুদ্ধ ভেবে নতুন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে তারা। প্রাচীন টাবু লঙ্ঘন করে স্বস্তি পায়। অনেকে এমনকি 'পবিত্র পাপে'র মতো ধর্মতত্ত্বও গড়ে তুলেছে। ১৯৮১ সালের মার্চে জাতিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা কেলেঙ্কারীর সংবাদ প্রকাশ পাওয়ার পর মনে হয়েছিল এই ধরনের কিছু একটা পিটিএল বলয়েও ঘটে থাকতে পারে। *শার্লট অবজার্ভার* অভিযোগ তোলে যে ১৯৮০ সালে জিম বেকার লং আইল্যান্ডের এক চার্চ সেক্রেটারি জেসিকা হানকে মাদক সেবণ করিয়ে বলাৎকার করার পর তার মুখ বন্ধ রাখতে ২৫০,০০০ ডলার দিয়েছেন।[১১৫] এই পর্যবেক্ষণের পথ বেয়েই জানা যায় যে ট্যামি ফেই কান্ট্রি ও ওয়েস্টার্ন সিঙ্গার গ্যারি প্যাক্সটনের প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘাটিয়েছিলেন তিনি। এমনি নোংরা সত্য প্রকাশ পেলেও বেকারদ্বয় অবশ্য

AMARBOI.COM

গ্লানিতে কুকড়ে যাননি, বরং তাদের বিশাল টেলিভিশনে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও ক্ষমার কথা বলে জনগণের সামনে অনুশোচনা করেছেন।

লিঞ্চবার্গে ফলওয়েলের গোষ্ঠীর রক্ষণশীল প্রাক আধুনিক ধর্মের বিধিনিষেধ আঁকড়ে থাকার প্রয়াস ছিল; মানুষকে প্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা মেনে নিতে সাহায্য করেছে। এইসব বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ নাকচ করে দেওয়া হলে কী ঘটে বেকারদের কাহিনী সেটাই তুলে ধরে। অন্য মৌলবাদী আন্দোলন যেখানে দমনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, বেকারদের উত্তর আধুনিক ক্রিশ্চানিটি বিংশ শতাব্দীর শেষপাদের 'সবকিছুই চলা'র বিশ্বাস তুলে ধরেছে। হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ থাকায় বেকাররা মনে করেছিলেন তাঁরা যা ইচ্ছে করতে পারেন। কোনও সীমা নেই, হেরিটেজ ইউএসএ সত্য ও কল্পনার মতোই ভালো-খারাপের প্রাচীন শ্রেণী বিভাগ অনায়াসে মুছে ফেলা সম্ভব। খৃস্টধর্মের বিকৃতি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এরপর নতুন আতঙ্ক আলোর মুখ দেখে। জিম বেকার পিটিএল থেকে ইস্তফা দেন এবং জেরি ফলওয়েলকে সাময়িক কেয়ার টেকারের ভূমিকা পালন করে নেটওয়ার্কটিকে বাঁচাতে বলেন। জিম এরপর কেলেঙ্কারী ফাঁসকারী জিমি সোয়াগার্টের উপর চড়াও হয়ে বলেন যে, সোয়াগার্ট পিটিএল দখল করে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছিলেন। সোয়াগার্ট তাঁর দিক থেকে বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের কাজ করে যাচ্ছিলেন। এই সময় সোয়াগার্ট সম্ভবত সবচেয়ে সফল টেলিভেঞ্জালিস্ট ছিলেন। ১৪৫টি দেশে তাঁর শো প্রদর্শিত হওয়ার দাবি ছিল তাঁর, পৃথিবীর অর্ধেক বাড়িতেই দেখা যায়। কিন্তু লুইসিয়ানার বার্টন রুঁশে এক পতিতার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছিলেন তিনি। পত্রে গল্প বিক্রি করে দেওয়া এই মহিলা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সোয়াগার্ট আচরিক অসম্মান ও অমর্যাদা করার চেয়ে যৌনতায় কম আগ্রহী ছিলেন। তিনি আত্মবিনাশকেও আলিঙ্গন করছিলেন বলে মনে হয়েছে, কারণ তিনি জানতেন মোটেলে লোকে তাঁকে দেখেছে ও চিনতে পেরেছে, কিন্তু তারপরেও সবকিছু ভেঙে পড়ার আগ পর্যন্ত সেখানে যাওয়া অব্যাহত রেখেছেন। আরেক যাজক মারভিন গোরমান মারফত তাঁর অসঙ্গত আচরণ ফাঁস হয়েছিল, নিজের শোতে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন সোয়াগার্ট।[১১৬]

সোয়াগার্ট পেন্টাকোস্টালিস্ট ছিলেন। আগের দিনে পেন্টাকোস্টালিজম ছিল মৌলবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর, যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে স্বর্গীয় সত্যকে অনির্বচনীয়তা দেওয়ার প্রয়াস। সুতরাং, যুক্তি বিসর্জন দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত অবচেতনে প্রবেশের শৃঙ্খলাহীন বিপদকে আলিঙ্গন করার ঝুঁকি সব সময়ই ছিল। কিন্তু সর্বোচ্চ অবস্থায় আদি পেন্টাকোস্টালিজম অন্তর্ভুক্তি ও জাতিগত ও শ্রেণী

AMARBOI.COM

বিভেদের সহানুভূতিপূর্ণ ভাঙন দিয়ে বৈশিষ্ট্যায়িত হয়েছিল। তবে সোয়াগার্ট ঘৃণার আদর্শ প্রচার করেছেন। সমকামীদের বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় মুখখিস্তি করে বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি, প্রায় নিশ্চিতভাবেই নিজস্ব যৌন প্রবণতা সম্পর্কিত অবদমিত উদ্বেগই তুলে ধরেছে। তিনি অন্যান্য যাজক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ইভাজেঞ্জালিস্টদের উপরও ভীষণভাবে চড়াও হয়েছিলেন, মরাল মেজরিটির জাজমেন্টাল ক্রুসেডেও যোগ দিয়েছিলেন। দয়া ও যুক্তির শৃঙ্খলার কারণে আরোপিত সংযম ঝেড়ে ফেলে সোয়াগার্ট এমন এক ধার্মিকতা বেছে নিয়েছিলেন যা আমাদের বিবেচিত অন্যান্য কিছু আন্দোলনের মতো নিজস্ব দিক থেকে আত্মবিনাশী ও নিহিলিস্টিক।

আমেরিকান সাংবাদিক লরেন্স রাইট সোয়াগার্টের আবেগময় প্রচারণার কায়দায় আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে সোয়াগার্ট যৌক্তিক আধুনিকতার কঠোরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন। এটা 'উদ্ধতভাবে আবেগময়' ছিল, রাইটের ছেলেবেলার ধর্মের 'উষর বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশোধন' থেকে আলোক বর্ষ দূরে। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর একটা অংশ সোয়াগার্টের 'আমার নিজস্ব ব্যস্ত, বিচারিক, পরিহাসময় মানসিকতার পরমানন্দময় পরিত্যাগের'[১১৭] প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। এবং সোয়াগার্টের দর্শকরাও তাই, যারা তাঁর অর্গাজিমিক প্রাচরণায় তুরীয় আনন্দে সাড়া দিয়েছিল:

> নিজের অবচেতনের গভীর থেকে গভীরে ডুবে যান তিনি, যুক্তি ও সচেতন অর্থকে পাশ কাটিয়ে গভীরে বুদ্বুদ তুলতে থাকা ছিন্নভিন্ন আবেগ, অবদমিত ভীতি ও নামহীন আকাঙ্ক্ষায় অবতরণ করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ওঠানামা করতে থাকে, কাঁপে, তাঁর ব্যাকরণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়, কিন্তু তারপরেও আকাঙ্ক্ষার ভীতু কাঁচা স্নায়ু বেয়ে উঠে যান। তিনি জানেন সেটা কোথায় থাকে। লোকে তাঁকে টানা ভীতি ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেখে, কারণ এই স্নায়ুই বিশ্বাসের সাথে বাঁধা। ভালোবাসা ও উদ্ধার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা–তিনি শেষে যখনই স্নায়ু স্পর্শ করেন, তখনই অশ্রু বইতে শুরু করে, দর্শক হাত তুলে উঠে দাঁড়ায়, কাঁদে, প্রভুর তারিফ করে, অজানা ভাষায় কথা বলতে থাকে, আর এই রোমাঞ্চকর পাবলিক এক্সপোজারের আনন্দ ও বেদনায় কাঁপতে থাকে।[১১৮]

জন অভ দ্য ক্রস, ইসাক লুরিয়া বা মোল্লাহ সদরার মতো সেরা প্রাক আধুনিক আধ্যাত্মিকতা এর সাথে ধর্মের কোনওই সম্পর্ক নেই দাবি করে এই ধরনের আবেগীয় বাড়াবাড়ি এড়িয়ে গেছেন; তাঁরা জোর দিয়ে বলেছেন, অন্তস্থঃ যাত্রা ছিল শান্ত, শৃঙ্খলিত এবং যুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ। অন্তত চল্লিশ বছর বয়স এবং বিবাহিত না

হওয়া পর্যন্ত কাউকেই কাব্বালায় যোগ দানের অনুমতি দেওয়া হত না, তাকে যৌন ভারসাম্য অর্জন করতে হত। জ্ঞানের অধিকতর স্বজ্ঞাপ্রসূত পথ অবহেলাকারী আধুনিক বিশ্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অতীন্দ্রিয় লোককথা হারিয়ে ফেলেছে। সোয়াগার্টের সাফল্য এক অতি যৌক্তিক বিশ্বে লোকের পরমানন্দের জন্যে আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে, তবে আবার এই ধরনের অনুসন্ধানের ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ার বিষয়টিও তুলে ধরেছে। সোয়াগার্টের উন্মাদনার সাথে আধ্যাত্মিকতার চেয়ে তাঁর যৌন চাহিদারই বেশি সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়, যা তাঁকে বাটন রুঁশ মোটেলে (ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রাইটের ভাষা ব্যবহার করে বলা যায়) 'রোমাঞ্চকর পাবলিক এক্সপোজারে'র দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

কিন্তু তারপরেও মৌলবাদী বিশ্বাসের ব্যর্থতা কেলেঙ্কারীর সময় টেলিভেঞ্জালিস্টদের পরস্পরের প্রতি প্রদর্শিত ক্রোধ ও ঘৃণার চেয়ে অন্য কোনও কিছুতেই এত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি। জেসিকা হানের সাথে বেকারের যৌন সম্পর্কের খবর পাওয়ার পর সোয়াগার্ট 'ফ্রেঞ্চ পুডলের উপর পিট বুলডগের মতো জিমি বেকারের উপর হামলে পড়েছিলেন,' স্মৃতিচারণ করেছেন সোয়াগার্টের এক সাবেক সহকারী। 'স্রেফ তাঁকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলেছেন।'[১১৯] এরপর পিটিএলকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসা জেরি ফলওয়েলের উপ চড়াও হন বেকার, তাঁর বিরুদ্ধে নেট ওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ পেতে পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর অভিযোগ আনেন। সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এর প্রতিশোধ নেন ফলওয়েল, এখানে জি বেকারের সাথে সমকামী সম্পর্ক ছিল এমন দাবিদারদের শপথ গ্রহণের পর দেওয়া এফিডেফিট উপস্থাপন করেন তিনি, তার সাথে ট্যামি ফেইর একটা চিরকুট, চুপ থাকার জন্যে পিটিএল-এর কাছে থেকে তিনি কী পেয়েছেন তার একটা তালিকা: জিমের জন্যে বছরে ৩০০,০০০ ডলার, ও নিজের জন্যে ১০০,০০০ ডলার; পিটিএল-এর সব রেকর্ড ও বইয়ের রয়্যালটি; ওদের ৪০০,০০০ ডলারের ম্যানশন, দুটি গাড়ি, নিরাপত্তা প্রহরী, আইনি ফি, এবং সেই সাথে বেকারদের দারুণভাবে অনিয়মিত আর্থিক অবস্থাকে সামাল দেওয়ার প্রয়াসরত অ্যাকাউন্ট্যান্টদের পারিশ্রমিক। মহা মৌলবাদী প্রতিষ্ঠানটি যেন এক বন্ধ্যা, রুচিহীন *কুল-দে-স্যাকে* পরিণত হয়েছিল। কেলেঙ্কারীর আগের বছর আস্থায় পরিপূর্ণ ছিলেন ফলওয়েল। মরাল মেজরিটির নতুন রাম রেখেছিলেন, 'দ্য লিবার্টি ফেডারেশন' এবং এর বহু সদস্য ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে স্থানীয়, রাজ্য ও ফেডারেল পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু পিটিএল বিপর্যয়ের পর ১৯৮৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর মরাল মেজরিটি ও লিবার্টি ফেডারেশন-এর প্রেসিডেন্সি থেকে ইস্তফা দেন ফলওয়েল; তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবার ঘোষণা দেন।

AMARBOI.COM

রোনাল্ড রেগানের বেলায় যেমন করেছিলেন সেভাবে আর কখনওই কোনও প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর পক্ষে কাজ করবেন না ও কোনও আইনের পক্ষে লবি করবেন না। কেলেঙ্কারীর পথ ধরেই তাঁর নিজস্ব *ওল্ড টাইম গস্পেল আওয়ারের* আয় কমে যায়, তাঁর নিজস্ব গস্পেল মিনিস্ট্রিতে ফিরে যেতে বাধ্য হন ফলওয়েল।[১২০] আজও মাঝে মাঝে জাতির অসুস্থতা নিয়ে বিলাপ করার জন্যে আবির্ভূত হন বটে, কিন্তু ঝড়ের বেগে আমেরিকাকে দখল করে নেওয়ার মতো ধর্মীয় রক্ষণশীলদের একটা আসন্ন কোয়ালিশন গড়ে তোলার মতো আশা করতে পারেন না। প্যাট রবার্টসনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানোর প্রয়াস ব্যর্থ হলে ১৯৭৯ সালে সূচিত মৌলবাদী আক্রমণও ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। অপদস্থ নিউ ক্রিশ্চান রাইট অমর্যাদাকরভাবে উবে গেছে বলে মনে হয়েছে। ক্রিশ্চানরা ব্যক্তিগতভাবে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনার চেষ্টা ও লবি করে গেলেও সাধারণভাবে মৌলবাদী হুমকির অবসান ঘটেছে বলেই ধরে নেওয়া হয়।

অবশ্য, মৌলবাদের মৃত্যু ঘটেনি। সত্যি বলতে আমেরিকায় তা এক নতুন ও চরম পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮৭, আপস্টেট নিউ ইয়র্কের এক নবজন্ম লাভকারী ক্রিশ্চান র‍্যান্ডাল টেরি তিন শো 'উদ্ধারকারীকে' নেতৃত্ব দিয়ে নিউ জার্সির চেরি হিলের এক অ্যাবর্শন ক্লিনিকে নিয়ে আসে। এখানে প্রায় এগার ঘণ্টা ধরে প্রার্থনা, শ্লোক গাওয়া এবং মহিলাদের ক্লিনিকে প্রবেশে বাধা দিয়ে তাদের বর্ণনা মতে 'নরকের দ্বারপ্রান্তে' ধর্মসভার আয়োজন করে। দিন শেষে 'উদ্ধারকারীদের' ২১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তবে বিজয়ীর সুরে উল্লেখ করে টেরি, 'কোনও শিশু প্রাণ হারায়নি।'[১২১] এটা ছিল মূলধারার সংস্কৃতিকে সহজাতভাবে খুনে বর্ণনা করে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী অপারেশন রেসকিউর প্রথম অ্যাকশন। ইমেজারি ছিল জঙ্গী। ১৯৮৮ সালে আটলান্টায় ডেমোক্রেটিক কনভেনশনের সময় এই আন্দোলনটি টেরির ভাষায় 'আটলান্টা অবরোধ' শুরু করেছিল, তখন শহরের অ্যাবরশন ক্লিনিকে প্রবেশে বাধা দানের অপরাধে তের শোরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন থেকেই কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে উদ্ধার দিবস পালন করে আসছে তারা এবং সম্ভাব্য উদ্ধারকারীদের জন্যে নারীবাদ ও উদার সরকারের অশুভের উপর ও তাদের লবিং কৌশল শেখাতে প্রশিক্ষণ লেকচারের ব্যবস্থা করেছে। নিজেদের 'অপারেশনকে' তারা 'বাইবেলিয় ঔদ্ধত্য' বলে বর্ণনা করেছে। ফলওয়েল ও রবার্টসনের বিপরীতে আইনের বাইরে গিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন টেরি। তাঁর লক্ষ্য ছিল মৌলবাদী: এমন এক 'রাষ্ট্র গড়ে তোলা যেখানে আবারও জুডো-ক্রিশ্চান নীতি আমাদের রাজনীতি, আমাদের বিচার ব্যবস্থা ও আমাদের সরকারী নৈতিকতার ভিত্তি হবে;

AMARBOI.COM

মানবতাবাদের অনিশ্চিত সাগরে ভাসমান কোনও জাতি নয়, বরং এমন এক দেশ 'হাইয়ার ল' যার অটল তলদেশ।'

কেবল অ্যাবরশন নিয়েই অভিযান ছিল না, ঠিক যেমন স্কোপস ট্রায়াল স্রেফ বিবর্তন সংক্রান্ত ছিল না। ১৯২০-র দশকের উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ানের মতো টেরি ও তাঁর উদ্ধারকারীদের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁরা সেক্যুলার আধুনিকতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রকাশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। টেরি বিশ্বাস করেছেন যে, অপারেশন রেসকিউ সফল না হলে, 'আমেরিকা টিকে থাকবে না।' কিন্তু আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি: 'আমাদের রয়েছে জনগণের সেনাদল,' জোর দিয়েছেন তিনি, এবং এই অপারেশনের ফলে 'শিশু হত্যা হ্রাস পাবে, শিশু নীল ছবি ও নীল ছবি, ইচ্ছা মৃত্যু, শিশু হত্যাকে অনুসরণ করবে...আমরা সংস্কৃতিকে আবার ফিরিয়ে নেব।'[১২২] এটা ছিল আসন্ন বিপর্যয়কে প্রতিহত করে আমেরিকার সভ্যতাকে উদ্ধার করার লড়াই।

টেক্সাসের অর্থনীতিবিদ গ্যারি নর্থ ও তাঁর শ্বশুর রেডুশাস জন রাশদুনি প্রতিষ্ঠিত রিকনস্ট্রাকশন আন্দোলনও সেক্যুলার মানবতাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তবে মরাল মেজরিটির চেয়ে ঢের বেশি চরম রূপে। পুনর্গঠনবাদীরা আরও অধিকতর উদ্দীপ্তকারী আদর্শের খাতিরে প্রাচীন প্রিমিলেনিয়াল নৈরাশ্যবাদ বিসর্জন দিয়েছিল। মুসলিম মৌলবাদীদের মতো নর্থ ও রাশদুনি মূলত ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব নিয়েই উদ্বিগ্ন ছিলেন। এমন একটি ক্রিশ্চান সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা অবশ্যই শয়তানকে পরাস্ত করে মিলেনিয়াল রাজ্যের উদ্বোধন ঘটাবে। পুনর্গঠনবাদের মূল ধারণা ছিল আধিপত্য। ঈশ্বর অ্যাডাম ও পরে নোয়াহকে বিশ্বকে পরাস্ত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ক্রিশ্চানরা উত্তরাধিকারসূত্রে এই নির্দেশ লাভ করেছে, ক্রাইস্টের দ্বিতীয় আগমনের *আগেই* পৃথিবীর বুকে জেসাসের শাসন কায়েমের দায়িত্ব রয়েছে তাদের উপর। তবে ঈশ্বর যেহেতু আধুনিক রাষ্ট্রকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেবেন তাই এটা অর্জনের জন্যে ক্রিশ্চানের কোনও তৎপরতা চালাতে হবে না। ক্রিশ্চানরা স্রেফ ঈশ্বরের দেওয়া বিজয় লুফে নেবে।

ইতিমধ্যে পুনর্গঠনবাদীরা সেক্যুলার রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাবার পর অধিকার করে নেওয়ার জন্যে নিজেদের প্রশিক্ষিত করে তুলছে।[১২৩] সহানুভূতির রীতি বিসর্জনের ভেতর দিয়ে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিশ্চান ধর্মের সম্পূর্ণ বিকৃতিতে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের আগমন ঘটার পর চার্চ ও রাষ্ট্রের আর কোনও বিভাজন থাকবে না। গণতন্ত্রের আধুনিক ধর্মদ্রোহীতার বিনাশ ঘটবে এবং কঠোর বাইবেলিয় ধারায় সমাজ নতুন করে সংগঠিত হবে। এর মানে বাইবেলের প্রতিটি আইনকে আক্ষরিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। দাস প্রথা সূচিত হবে; জন্মনিয়ন্ত্রণ থাকবে না (কারণ বিশ্বাসীদের অবশ্যই 'বৃদ্ধি ও বহুগুন' হতে হবে); ব্যাভিচারী, সমকামী,

ব্লাসফেমাস, জ্যোতির্বিদ ও ডাইনীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। বাইবেল যেমন নির্দেশ দিয়েছে, অবিরাম অবাধ্য শিশুদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে। কঠোর পুঁজিবাদী অর্থনীতি আরোপ করতেই হবে; সমাজবাদী ও বামপন্থার দিকে যারা ঝুঁকে আছে তারা পাপী। ঈশ্বর দরিদ্রদের পক্ষে নন। প্রকৃতপক্ষে, নর্থ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, দুষ্কৃতি ও দারিদ্র্যের ভেতর নিবিড় সম্পর্ক[১২৪] রয়েছে। করের অর্থ কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে না, কারণ, 'অলসদের ভর্তূকী দান অশুভকে ভর্তূকী দানেরই শামিল।'[১২৫] তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে, নৈতিক বিকৃতি, পৌত্তলিকতা ও ডাকিনীবিদ্যার প্রতি আসক্তির কারণেই নিজেদের উপর অর্থনৈতিক সমস্যা ডেকে এনেছে তারা। বাইবেলে বিদেশী সাহায্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১২৬] বিজয়ের অপেক্ষা করার মুহূর্তে—হয়তো এখনও বেশ সময় লাগবে বলে স্বীকার করেছেন নর্থ—ক্রিশ্চানদের অবশ্যই ঈশ্বরের নীল নকশা অনুযায়ী পৃথিবীকে গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে এবং এইসব বাইবেলিয় রীতির সাথে খাপ খাওয়া সরকারী নীতিমালার সমর্থন করতে হবে।

নর্থ ও রাশদুনির কল্পিত ডোমিনিয়ন ছিল সমগ্রবাদী। অন্য কোনও দর্শন বা নীতির কোনও স্থান নেই, প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহের জন্যে গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতার লেশমাত্র নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আদর্শের জনপ্রিয়তা লাভের সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবেই ক্ষীণ; তবে বলা হয়েছে, পরিবেশগত বা বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে একটি কর্তৃত্বপরায়ণ খৃষ্টীয় চার্চ আলোকনের উদার রাজনীতিকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। ক্রিশ্চানিটি হাজার হোক পুঁজিবাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল, জেসাসের বহু শিক্ষার ক্ষেত্রেই তা আগন্তুক ছিল। ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফ্যাসিস্ট আদর্শকে সমর্থনের কাজেও একে ব্যবহার করা যেতে পারে।[১২৭]

রাশদুনি পেন্টাকোস্টালিজমকে বিতৃষ্ণার সাথে দেখলেও অধিকতর রক্ষণশীল কিছু পেন্টাকোস্টালিস্ট রিকন্সট্রাকশন ধর্মতত্ত্বে আগ্রহ দেখিয়েছিল। প্যাট রবার্টসনকে একজন ক্রান্তিকালীন ব্যক্তিত্ব মনে হয়েছে। পেন্টাকোস্টালিজম ও পুনর্জাগরণবাদের ঝোঁক বিশিষ্ট ব্যাপ্টিস্ট ছিলেন তিনি। নর্থের মতো তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, দ্বিতীয় আগমন দূরবর্তী হতে পারে—এই বিশ্বাস তাঁকে প্রচলিত প্রিমিলেনিয়াল মৌলবাদ থেকে আলাদা করেছিল।[১২৮] রবার্টসন বিশ্বাস করতেন যে, ইতিমধ্যে ক্রিশ্চানদের বাইবেলিয় নিয়মের ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ে তুলতে ক্ষমতায় নিজেদের অবস্থান তৈরি করা উচিত।[১২৯] ভার্জিনিয়া বিচের তাঁর ইউনিভার্সিটির নাম পাল্টে রিজেন্ট ইউনিভার্সিটি রেখেছিলেন তিনি; রিজেন্ট হচ্ছেন, ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'যিনি সার্বভৌমের অনুপস্থিতিতে শাসন করেন।' কলেজটির

উদ্দেশ্য রাজ্যের আগমন ঘটলে এর সাত শো ছাত্রকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে তৈরি করা।[১৩০] আমেরিকায় *দ্য ফান্ডামেন্টালস* (১৯১০–১৫) প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই মৌলবাদ পাল্টে গেছে। একদিকে উত্তর আধুনিক, উন্মূলতার প্রবণতা দেখানোর পাশাপাশি অন্যের সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেছে।

মৌলবাদ অদৃশ্য হয়ে যাবে না। আমেরিকায় ধর্ম দীর্ঘ দিন ধরে সরকারের বিরোধী পক্ষকে আকার দিয়ে এসেছে। এর উত্থান-পতন সব সময়ই আবর্তনমূলক ছিল, এবং গত কয়েক বছরের ঘটনাপ্রবাহ দেখায় যে, এখনও রক্ষণশীল ও উদারপন্থীদের ভেতর মধ্যবর্তী যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, যা অনেক সময় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ১৯৯২ সালে এখনও প্রাচীনপন্থী মৌলবাদ আঁকড়ে থাকা জেরি ফলওয়েল ঘোষণা করেছিলেন, বিল ক্লিন্টনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ভেতর দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শয়তানের মুক্তি ঘটেছে। ক্লিন্টন, বজ্রকণ্ঠে বলেছেন ফলওয়েল, 'সমকামীদের' ক্ষমতা দখল করার সুযোগ করে দিয়ে সামরিক বাহিনী ও জনগণকে ধ্বংস করে দেবেন। ফেডারেল আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত ক্লিনিকে অ্যাবরশনের অনুমতি দান, ভ্রূণ টিস্যু নিয়ে গবেষণা, সমকামীদের অধিকারের সরকারী অনুমোদন 'ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণার'[১৩১] আলামত।

১৯৯৩ সালে যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে। ১৯৯৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ব্যুরো অভ অ্যালকোহল, টোব্যাকো অ্যান্ড ফায়ার আর্মস টেক্সাসের ওয়াকোয় ডেভিড কোরেশের ব্রাঞ্চ ডেভিডিয়ানদের সীমানায় হানা দেয়, কারণ তিনি অস্ত্র মওজুত করছেন বলে জানা গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, বহু টেক্সান ও ব্রাঞ্চ ডেভিডিয়ানের মতো (সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট-এর একটি দলছুট অংশ) দর্শনীয় অস্ত্রভাণ্ডার থাকলেও সরকারের বিরুদ্ধে তাদের কোনও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ছিল না বলেই মনে হয়। আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ক্ষমতা ও বৈধতা প্রদর্শন। কিন্তু তা উল্টো ফল দেয়। পরিণামে এফবিআই কর্তৃক চৌহদ্দী ঘেরাও হয়ে যায়, ডেভিডিয় দালানকোঠা পোড়ানো হয় ও আশিজন নারী, পুরুষ ও শিশুর মৃত্যু ঘটে। আসলে প্রদর্শিত হয়েছিল গোষ্ঠীটি সম্পর্কে সরকারের অজ্ঞতা, অবরুদ্ধ ডেভিডিয়দের সামনে নিজেদের অসহায়ত্ব এবং ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের করুণ অপারগতা।

অন্যদিকে অধিকতর চরমপন্থী ক্রিশ্চানরা নিশ্চিতভাবেই সেক্যুলার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একটি ফ্যাসিস্ট গ্রুপ ক্রিশ্চান আইডেন্টিটি-র কথা এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি, তার কারণ তা মৌলবাদকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে তারা এবং প্রকৃতপক্ষে মৌলবাদকে নাকচ করে দেয়। আইডেন্টিটির সদস্যরা তুরীয় আনন্দের ধারণাকে ঘৃণা করে, তাদের বিশ্বাস এর ফলে আমেরিকান

AMARBOI.COM

ধর্ম নপুংসক হয়ে গেছে: উত্তাল সময়ে তারা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অকুস্থলে উপস্থিত থাকতে চায়। ভীষণভাবে অ্যান্টি-সেমিটিক এই গোষ্ঠীটি যায়নবাদের পক্ষে মৌলবাদীদের সমর্থন ঘৃণা করে, একে তারা মহাপাপ মনে করে। তাদের দৃষ্টিতে ইহুদিরা আর্য জাতির কাছ থেকে মনোনীত জাতির উপাধী কেড়ে নিয়েছিল এবং এখন পবিত্র ভূমিও চুরি করেছে, ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনেই থাকা উচিত ছিল এর। অন্তিম কালের যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে ঘটবে, এটা তারা বিশ্বাস করে না, বরং সেটা ঘটবে আমেরিকায়। এক নতুন হলোকাস্টের ভবিষ্যদ্বাণী করে তারা, এতে শ্বেতাঙ্গ জাতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং, তারা নিজেদের সেই বিপর্যয়ের জন্যে প্রস্তুত করছে। ফেডারেল সরকারের অত্যাসন্ন ধ্বংস দেখতে পাচ্ছে তারা, যাকে তারা শয়তান ও ইহুদিদের আধিপত্যে থাকা এবং আর্য জাতির ধ্বংসের লক্ষ্যে নিবেদিত যগ (যায়নিস্ট অকুপেশন গভর্নমেন্ট) আখ্যায়িত করে। কেউ কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিম দূরবর্তী কোণে উপপন্থী গ্রুপে নিজেদের সংগঠিত করেছে। এখানে তারা আত্মরক্ষার কৌশল শেখে, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে ও শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। কেউ কেউ যগের উপর প্যারামিলিটারি হামলা চালায়, সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করে, অন্যরা অ্যাবরশন ক্লিনিকে বোমাবর্ষণ করে, অগ্নিসংযোগ করে।[১৩২] এই ধরনের আদর্শই ১৯৯৫ সালের ১৯শে এপ্রিল টিমোথি ম্যাকভেইকে ওকলাহোমা সিটিতে ফেডারেল বিল্ডিংয়ের উপর বোমা হামলায় প্ররোচিত করেছিল।

ক্রিশ্চান আইডেন্টিটির কর্মকাণ্ড ও আদর্শ চিত্রায়িত করা কঠিন। এটা কোনও একরৈখিক আন্দোলন নয়, বরং বিভিন্ন সম্পর্কিত সংগঠনের একটা মৈত্রী। এদের সদস্য সংখ্যা কম, মাত্র হাজার পঞ্চাশেক হতে পারে।[১৩৩] কিন্তু প্রবণতা হিসাবে ক্রিশ্চান আইডেন্টিটি উদ্বেগজনক। মৌলবাদীদের মতো তারা ভীতি ও অসন্তোষের কারণে জগৎ থেকে পিছু হটেছে এবং আবার দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। অধিকাংশ চরম ধরনের মৌলবাদীর মতো এর সদস্যরা সর্বত্র ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায় এবং ক্রোধ ও অসন্তোষের ধর্মতত্ত্ব গড়ে তোলে। কিন্তু অতি ফ্যাসিবাদী আদর্শ, মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রের সরকারের প্রতি খাঁটি ঘৃণা ও আধুনিক বিশ্ব থেকে প্রত্যাহারের চরম রূপের কারণে মৌলবাদীদের ছাড়িয়ে গেছে তারা। এখন আর বাইবেলিয় ভ্রান্তিহীনতা ও মতবাদ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ক্রিশ্চান আইডেন্টিটি আমেরিকায় নিজেদের জন্যে একটি আলাদা আর্য রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে চায়। ক্রিশ্চান আইডেন্টিটি আমেরিকার ইতিহাসে নজীরবিহীন বিচ্ছিন্নতা ও ত্রাসের আদর্শ গড়ে তুলেছে। পুনর্গঠনবাদের মতো আইডেন্টিটি সম্প্রদায়ের শিথিল কনফেডারেশনটি ছোট, কিন্তু তারপরও ভবিষ্যতে অসহায়ত্ব, হতাশা ও অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্যে ধর্মকে

ব্যবহার করার অস্বস্তিকর ইঙ্গিত। সেক্যুলারিস্ট প্রতিষ্ঠান ও মূলধারার গোষ্ঠীগুলো মনে করতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৌলবাদী হুমকি মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু সংখ্যক ক্রিশ্চানের ধারণা মতো যুদ্ধ এখনও চলছে, ফেডারেল সরকারকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে, এবং সংঘাত নিশ্চিতভাবেই একবিংশ শতাব্দীতে অব্যাহত থাকবে।

ধর্ম শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যায়নি। কোনও কোনও মহলে অন্য যেকোনও সময়ের চেয়ে তা উগ্র হয়ে উঠেছে। তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের সবকটাতেই মৌলবাদীরা ধর্মকে ব্যক্তি পর্যায়ে অবনত করার বা একে দমনের বিরুদ্ধে সক্রোধে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে এবং তাদের বিশ্বাস মতো একে ধ্বংস থেকে উদ্ধার করে এনেছে। কঠিন সংগ্রাম ছিল এটা এবং এই প্রক্রিয়ায় ধর্মবিশ্বাস প্রায়শঃই বিকৃত হয়েছে; এটা ধর্মের পরাজয় তুলে ধরে। কিন্তু মৌলবাদ এখন আধুনিক বিশ্বের অংশে পরিণত হয়েছে। এটা ব্যাপক হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, উদ্বেগ ও ক্রোধ তুলে ধরে যা কোনও সরকারই নিরাপদে উপেক্ষা করতে পারে না। এই পর্যন্ত মৌলবাদের সাথে সামলে ওঠার প্রয়াস খুব একটা সফল হয়নি; অতীত থেকে আমরা কী শিক্ষা নিতে পারি যা আমাদের ভবিষ্যতে আরও সৃজনশীলভাবে মৌলবাদের ধারণ করা ভীতিকে সামাল দিতে সাহায্য করবে?

AMARBOI.COM

পরিশিষ্ট

প্রাক আধুনিক রক্ষণশীল আমলে আমাদের পূর্বপুরুষের মতো আমরা ধার্মিক হতে পারব না, তখন ধর্মবিশ্বাসের মিথ ও আচার মানুষকে কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার সীমাবদ্ধতা মেনে নিতে সাহায্য করেছে। এখন আমরা ভবিষ্যৎমুখী, এবং আমাদের ভেতর যারা আধুনিক বিশ্বের যুক্তিবাদে গড়ে উঠেছি তাদের পক্ষে আর প্রাচীন ধরনের আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমরা নিউটনের চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন নই, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণই বৈজ্ঞানিক চেতনায় পরিপূর্ণ পাশ্চাত্য বিশ্বের অন্যতম পথিকৃত। মিথলজি উপলব্ধি তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে। আমরা প্রচলিত ধর্মকে আপন করে নেওয়ার যত চেষ্টাই করি না কেন, সত্যকে বাস্তব, ঐতিহাসিক এবং প্রয়োগযোগ্য হিসাবে দেখার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে আমাদের। অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, ধর্মবিশ্বাসকে গুরুত্বের সাথে নিতে হলে এর মিথসমূহকে অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণযোগ্য হতে হবে ও আধুনিকতার প্রত্যাশা অনুযায়ী তাকে বাস্তবক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হতে হবে। বিশেষ করে ইউরোপে বিংশ শতাব্দীতে এমন ট্র্যাজিডি মোকাবিলাকারী বর্ধিত সংখ্যক মানুষ ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যুক্তিকে যারা সত্য প্রকাশ করার একমাত্র পথ হিসাবে দেখে, তাদের পক্ষে এটা নৈতিক ও সৎ অবস্থান। বিজ্ঞানীরা যেমন প্রথম জোরের সাথে বলবেন, যৌক্তিক *লোগোস* প্রায়োগিক অনুসন্ধানের অতীতে অবস্থানরত চরম অর্থ সংক্রান্ত কোনও জবাব দিতে পারে না। আমাদের শতকের গণহত্যামূলক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুক্তির কিছুই বলার থাকে না।

সুতরাং আধুনিক সংস্কৃতির কেন্দ্রে এক শূন্যতা বিরাজ করছে, পশ্চিমা মানুষ তাদের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের গোড়ার দিকে যাকে অনুভব করেছিল। মহাবিশ্বের শূন্যতা বুঝতে পেরে ভীতিতে কুকড়ে গেছেন পাসকাল; মানুষকে এই জড় মহাবিশ্বের একমাত্র অধিবাসী হিসাবে দেখেছেন দেকার্তে; হবস কল্পনা করেছেন ঈশ্বর মহাবিশ্ব থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন; নিৎশে ঈশ্বরের প্রয়াণ ঘোষণা করেছেন: মানবজাতি দিশা হারিয়েছে ও এক অসীম শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু অন্যরা ধর্মের বিদায়ে নিজেদের মুক্ত ভেবেছেন; ধর্মের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থেকে

AMARBOI.COM

স্বাধীনতা লাভ করেছেন। আধুনিক চেতনায় ঈশ্বর আকৃতির গহ্বরের অস্তিত্বের কথা স্বীকারকারী সার্ত্রে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আমাদের মুক্তিকে নাকচকারী উপাস্যকে অস্বীকার করা এখনও আমাদের দায়িত্ব রয়ে গেছে। আলবার্তো কামু (১৯১৩–৬০) বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান নারী-পুরুষকে মানবজাতির প্রতি তাদের সকল মনোযোগ ও ভালোবাসা নিবদ্ধ করতে সক্ষম করে তুলবে। অন্যরা তাদের বিশ্বাসকে আলোকনের প্রতি নিবদ্ধ করেছেন, এমন ভবিষ্যতের কথা ভেবেছেন যেখানে মানবজাতি আরও যৌক্তিক ও সহিষ্ণু হয়ে উঠবে; এক দূরবর্তী কাল্পনিক ঈশ্বরের বদলে ব্যক্তির পবিত্র স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করবে। তাদের জন্যে অন্তর্দৃষ্টি, দুর্জ্ঞেয়তা আর পরমানন্দ নিয়ে আসা আধ্যাত্মিকতার সেক্যুলার ধরন গড়ে তুলেছেন তাঁরা, যা তাঁদের আত্মা ও মনের নিজস্ব শৃঙ্খলা গড়ে তুলেছে।

তাসত্ত্বেও এক বিশাল সংখ্যক মানুষ এখনও ধার্মিক হতে চায় ও বিশ্বাসের নতুন ধরন গড়ে তুলতে চেয়েছে তারা। মৌলবাদ ঠিক তেমনি আধুনিক ধর্মীয় পরীক্ষার অন্যতম নজীর। আমরা যেমন দেখেছি, এটা ধর্মকে আন্তর্জাতিক এজেন্ডার একেবারে কেন্দ্রে স্থাপন করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাত্রার সাফল্য ভোগ করেছে। কিন্তু প্রায়শঃই তা কনফেশনাল ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ কিছু পবিত্র মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। মৌলবাদীরা ডগমাসমূহকে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্যি দাবি করে অথবা তাদের জটিল মিথলজিকে কাঠামো আদর্শে পরিণত করে ধর্মের *মিথোসকে লোগোসে* পরিণত করেছে। এভাবে তারা জ্ঞানের দুটি পারস্পরিক সম্পূরক উৎস ও ধরনকে গুলিয়ে ফেলেছে, প্রাক আধুনিক মানুষ যাকে সাধারণত বিচ্ছিন্ন রাখাই শ্রেয়তর বলে স্থির করত। মৌলবাদী অভিজ্ঞতা এই রক্ষণশীল দর্শনের সত্যি তুলে ধরেছে। ক্রিশ্চানিটির সত্যিগুলো বাস্তব ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণযোগ্য বলে জোর দিয়ে আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের এক ক্যারিকেচার সৃষ্টি করেছে। যেসব ইহুদি ও মুসলিম অন্য সেক্যুলার আদর্শের সাথে পাল্লা দিতে তাদের ধর্মকে যুক্তিভিত্তিক, পদ্ধতিগতভাবে উপস্থাপন করেছে তারাও তাদের ঐতিহ্যকে বিকৃত করেছে, নিষ্ঠুর নির্বাচনের ভেতর দিয়ে একক বিন্দুতে এনে ঠেকিয়েছে। ফলে সবাই আরও সহিষ্ণু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহানুভূতিশীল শিক্ষাকে অবহেলা করেছে এবং ক্রোধ, অসন্তোষ ও প্রতিশোধের ধর্মতত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে। ক্ষেত্র ভেদে এটা এমনকি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু হত্যাকে অনুমোদন দানের কাজে ধর্মকে ব্যবহার করে বিকৃতও করেছে। এমনকি এই ধরনের সন্ত্রাসের বিরোধিতাকারী মৌলবাদীদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকেও তাদের মতের সাথে যারা একমত পোষণ করে না তাদের বেলায় বর্জনবাদী ও নিন্দুক প্রবণ হতে দেখা যায়।

কিন্তু মৌলবাদী হিংস্রতা আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির মানুষের উপর চরম কঠিন চাহিদা আরোপ করার কথা মনে করিয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের ক্ষমতাবান করেছে, আমাদের দিগন্ত প্রসারিত করেছে এবং আমাদের অনেককেই আরও সুখী ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে সক্ষম করে তুলেছে। কিন্তু তারপরেও এটা প্রায়শঃই আমাদের আত্মঅহমকে ভোঁতা করে দিয়েছে। কিন্তু একই সময়ে আমাদের যৌক্তিক বিশ্বদৃষ্টি মানুষই সকল বস্তুর মানদণ্ড ঘোষণা করে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর অশোভন নির্ভরতা থেকে মুক্তি দিলেও পাশাপাশি আমাদের নাজুকতা, আক্রম্যতা আর মর্যাদার ঘাটতিও তুলে ধরেছে। কোপার্নিকাস আমাদের মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করে প্রান্তিক ভূমিকায় অবনত করেছিলেন। কান্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, আমাদের ধারণা আমাদের মাথার বাইরের বাস্তবতার সাথে মেলে কিনা সে ব্যাপারে আমরা কখনওই নিশ্চিত হতে পারব না। ডারউইন বোঝাতে চেয়েছেন, আমরা পশুমাত্র; এবং ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, সম্পূর্ণ যৌক্তিক প্রাণী হওয়া দূরে থাক, মানুষ আসলে অবচেতনের শক্তিশালী, অযৌক্তিক শক্তির করুণাধীনমাত্র, কেবল অনেক প্রয়াসের মাধ্যমেই যার নাগাল পাওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষেই এটা আধুনিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তির কাল্ট সত্ত্বেও আধুনিক ইতিহাস ডাইনী শিকার ও বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, এসব ছিল যুক্তিহীনতার বিস্ফোরণ। একসময় সেরা রক্ষণশীল ধর্মের প্রাচীন মিথ, লিটার্জি ও অতীন্দ্রিয় অনুশীলনের যোগানো মননের গভীর কন্দরে পৌঁছানোর ক্ষমতা বাদে যুক্তি অনেক সময় আমাদের সাহসী নতুন বিশ্বে দিশা হারিয়ে ফেলে বলে মনে হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষে মানবজাতির দিকে আগের চেয়ে বেশি আলোকিত ও সহিষ্ণু পর্যায়ে অগ্রসর হওয়ার উদার মিথ এই গ্রন্থে বিবেচিত অন্য যেকোনও মিলেনিয়াল মিথের চেয়ে ফ্যান্টাস্টিক মনে হচ্ছে। 'উচ্চতর' মিথিকাল সত্যির বন্ধন ছাড়া যুক্তি অনেক সময় দানবীয় হয়ে উঠতে পারে ও এমন সব অপরাধ সংগঠিত করতে পারে যেগুলো মৌলবাদীদের হাতে সংগঠিত যেকোনও নিষ্ঠুরতার চেয়ে বড় না হলেও কাছাকাছি।

আধুনিকতা সুবিধাজনক, উদার ও মানবিক ছিল, কিন্তু প্রায়শঃই এটা বিশেষ করে গোড়ার দিকে নিষ্ঠুর হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছে। বিশেষ করে আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আগ্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী ও অচেনা মনে করা উন্নতশীল দেশে এটা বেশি সত্যি ছিল। আমাদের বিবেচিত মুসলিম দেশগুলোতে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া খুবই কষ্টকর ও ভিন্ন ছিল। পশ্চিমে এটা স্বাধীনতা ও উদ্ভাবনে বৈশিষ্ট্যায়িত হয়েছে; মিশর ও ইরানে এর সাথে পরনির্ভরতা ও অনুকরণ জড়িত ছিল, মুসলিম সংস্কারক ও আদর্শবাদীগণ সূক্ষ্মভাবে এ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। এইসব দেশে তা

আধুনিকতার সুর পল্টে দেবে। আপনি ভুল উপাদানে (টাটকা ডিমের বদলে শুকনো ডিম, ময়দার বদলে চাল) আর ভুল সরঞ্জাম দিয়ে কেক বানাতে গেলে পরিণতি রান্নার বইয়ের ফলের সাথে মিলবে না; সেটা মজাদার হতে পারে, কিন্তু আবার দারুণ নোংরাও হতে পারে। স্থানীয় জ্ঞান ও রান্নার দক্ষতা কাজে লাগিয়ে হাতের কাছে প্রাপ্য উপাদান ও কৌশল ব্যবহার করে রীতির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করাই অনেক ভালো। আফগানি, আব্দুহ, শরিয়তি এবং খোমেনির মতো ইসলামিস্টগণ তাদের নিজস্ব ও ভিন্ন কেক বানাতে মুসলিম উপাদান ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিতে ভাবতে পারছিল না এমন কোনও কোনও পশ্চিমার পক্ষে বিশেষ করে সহিংস ও নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশকারী ধর্মের এই পুনর্জাগরণ উপলব্ধি কঠিন ছিল। আধুনিক সমাজ ঘনঘন 'দুটি জাতিতে' বিভক্ত হয়েছে; সেক্যুলারিস্ট ও ধার্মিক একই দেশে বাস করেও পরস্পরের ভাষায় কথা বলতে পারেনি বা একই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্থিতি দেখতে পারেনি। এক পক্ষের কাছে যাকে পবিত্র ও ইতিবাচক মনে হয়েছে অন্য পক্ষ তাকে দানবীয় ও পরিহাসের সাথে দেখেছে। সেক্যুলারিস্ট ও ধার্মিক, দুই পক্ষই পরস্পরের কারণে নিজেদের গভীরভাবে হুমকির মুখে মনে করেছে, এবং দুটি সম্পূর্ণ সমন্বয়ের অতীত বিশ্বদৃষ্টির সংঘাত লাগলে, সালমান রুশদির ক্ষেত্রে যেমন, বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে। এটা অস্বাস্থ্যকর ও সহজাতভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। মৌলবাদ বিদায় নিচ্ছে না। কোনও কোনও স্থানে তা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে বা আরও চরম রূপ ধারণ করছে। উদার সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান সেতু তৈরি করার লক্ষ্যে ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা এড়াতে কী করতে পারে?'

দমন ও নির্যাতন স্পষ্টতই জবাব নয়। তা অনিবার্যভাবে পাল্টা আক্রমণ ডেকে আনে। মৌলবাদী ও সম্ভাব্য মৌলবাদীদের আরও চরম করে তুলতে পারে। স্কোপস ট্রায়ালে অপদস্থ হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা আরও প্রতিক্রিয়াশীল, আপোসহীন ও আক্ষরবাদী হয়ে উঠেছিল। নাসেরের নির্যাতন শিবিরে সুন্নি মৌলবাদের চরমপন্থী ধরন আবির্ভূত হয়েছে এবং শাহর ক্র্যাকডাউন ইসলামি বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করতে সাহায্য করেছে। মৌলবাদ এক যুদ্ধংদেহী ধর্মবিশ্বাস; অত্যাসন্ন বিনাশ আশঙ্কা করে থাকে। এটা বিস্ময়কর নয় যে, ইহুদি মৌলবাদীরা, তা সে যায়নবাদী বা আল্ট্রা-অর্থডক্স, যাই হোক, এখনও হলোকাস্টের ভীতি ও অ্যান্টি-সেমিটিক বিপর্যয়ের ভীতিতে তাড়িত হয়। সেক্যুলারাইজেশনকে যারা আগ্রাসী হিসাবে প্রত্যক্ষ করেছে নির্যাতন তাদের আত্মায় গভীর দাগ ফেলেছে ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত করেছে, একে এভাবে সহিংস ও অসহিষ্ণু করে তুলেছে।

মৌলবাদীরা সর্বত্র ষড়যন্ত্র দেখে ও অনেক সময় এমন ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যাকে দানবীয় মনে হয়।

এবং এখনও সেক্যুলার, বাস্তব উদ্দেশ্যে মৌলবাদকে ব্যবহার করার প্রয়াসও উল্টো ফলদায়ী। সাদাত তাঁর শাসনকে বৈধতা দিতে মিশরের মুসলিমদের তোয়াজ করেছেন, নিজের শাসনের ভিত্তি গড়ে তুলতে *জামাত আল-ইসলামিয়াহ্*র সমর্থন আদায়ের প্রয়াস পেয়েছেন। পিএলও-কে খাট করার প্রয়াসে ইসরায়েল প্রাথমিকভাবে হামাসকে সমর্থন দিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস করুণ ও মারাত্মকভাবে সেক্যুলারিস্ট রাষ্ট্রের উপর পাল্টা আঘাত হেনেছে। এই ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের আরও ন্যায্য ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন অবশ্যই করতে হবে।

প্রথমত, এটা শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ধর্মতত্ত্ব ও আদর্শগুলো ভীতিতে প্রোথিত। মতবাদ সংজ্ঞায়িত করার আকাঙ্ক্ষা, প্রতিবন্ধক সৃষ্টি, সীমানা স্থাপন, আইন কোঠরভাবে পালন করা যাবে এমন এক পবিত্র ছিটমহলে বিশ্বাসীদের বিচ্ছিন্ন করার বিষয়গুলো নিশ্চিহ্নতার ভীতি থেকে উদ্ভূত হয়, যা সকল মৌলবাদীকে এক সময় না এক সময় বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে সেক্যুলারিস্টরা তাদের নিশ্চিহ্ন করতে ক্ষেপে উঠেছে। আধুনিক বিশ্ব, যাকে উদারপন্থীদের কাছে দারুণ উত্তেজনাকর ঠেকে, মৌলবাদীদের কাছে তাকেই ঈশ্বরবিহীন, সকল অর্থ হতে বঞ্চিত এবং এমনকি শয়তানিসুলভ মনে হয়। কোনও রোগী এই ধরনের প্যারানয়েড, ষড়যন্ত্রে ভরা ও প্রতিশোধ প্রবণ ফ্যান্টাসিসহ কোনও থেরাপিস্টের কাছে এলে নিঃসন্দেহে তিনি তাকে অপ্রকৃতিস্থ বলে শনাক্ত করবেন। আধুনিকতার বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের চোখে দানবীয় প্রিমিলেনিয়াল দৃষ্টিভঙ্গি গণহত্যামূলক স্বপ্ন লালন করে ও মানবজাতি এক ভয়ানক সমাপ্তির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে বলে কল্পনা করে, এটা বহু প্রটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীর মনে আধুনিকতার সৃষ্ট ভীতি ও হতাশারই পরিষ্কার ইঙ্গিত বহন করে। আমরা মৌলবাদীদের কর্মসূচিকে প্রভাবিতকারী নিহিলিজম দেখেছি। এই ধরনের ভীতিকে যুক্তি দিয়ে বোঝা বা নির্যাতনমূলক পদ্ধতিতে দূর করা সম্ভব নয়। এমনকি একজন উদারপন্থী বা সেক্যুলারিস্ট এই ভীতি পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত না হলেও আরও কল্পনা নির্ভর সাড়া হবে এই বৈকল্যের গভীরতা উপলব্ধির করার প্রয়াস।

দ্বিতীয়ত, এইসব আন্দোলন যে কোনওভাবেই অতীতে প্রাচীনপন্থী পশ্চাদপসরণ নয় সেটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ; এগুলো আধুনিক, উদ্ভাবনী এবং আধুনিকায়নসুলভ। প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা বাইবেলকে প্রাক আধুনিক আধ্যাত্মিকতার অধিকতর অতীন্দ্রিয়, উপমাগত পদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন

AMARBOI.COM

আক্ষরিক, যৌক্তিক উপায়ের পাঠ করে। খোমেনির বেলায়েত-ই ফাকিহ্ ছিল শত শত বছরের শিয়া ঐতিহ্যের খোলনালচে পাল্টানো। মুসলিম চিন্তাবিদগণ একটি স্বাধীনতার ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছেন ও একটি সাম্যাজ্যবাদ বিরোধী আদর্শ সৃষ্টি করেছেন যা কিনা তাদের কালের অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের আন্দোলনের অনুরূপ। এমনকি আল্ট্রা-অর্থডক্স ইহুদিরা পর্যন্ত, যাদের আধুনিক সমাজ থেকে দৃঢ়ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলে মনে হয়েছিল, তারাও তাদের *ইয়েশিভোতকে* আবিশ্যিকভাবেই আধুনিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলে আবিষ্কার করেছে। তোরাহ পরিপালনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের কঠোরতা গ্রহণ করেছিল তারা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে যাতে বিগত দুই সহস্র বছরে ধার্মিক ইহুদিরা ভোগ করেনি এমন ক্ষমতা এনে দিয়েছিল।

আমরা আগাগোড়া দেখেছি যে ধর্ম প্রায়শঃই মানুষকে আধুনিকতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করেছে। শাব্বেতিয়বাদ, মেথডিজম ও ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদ ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিমদের ব্যাপক পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত করেছে ও তাদের নতুন ধারণার প্রতি অগ্রসর হতে সক্ষম করে তুলতে একটা পরিপ্রেক্ষিত দিয়েছে। যেসব আমেরিকানের প্রজাতন্ত্রের ফাউন্ডিং ফাদারবৃন্দের ডেইজমের প্রতি কোনও ফুরসত ছিল না, তারা মহাজাগরণের মহান সংগ্রামে তৈরি হয়েছিল। মুসলিমরাও তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিকতার গতিময়তা দিয়ে ধর্ম ও রাজনীতির বিচ্ছিন্নতার মতো আদর্শের উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষেই, ইউরোপেও সেক্যুলারিজম ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে ধার্মিক হওয়ার নতুন উপায় হিসাবেই প্রথমে দেখা হয়েছিল। আমাদের বিবেচিত অতি সাম্প্রতিক বেশ কিছু আন্দোলনও আধুনিকায়নসুলভ ছিল। হাসান আল-বান্না, শরিয়তি, এবং এমনকি খোমেনিসহ প্রত্যেকে মুসলিমদের পশ্চিম থেকে আমদনি করা বিভিন্ন আদর্শ থেকে তাদের অনেক বেশি পরিচিত ইসলামিক প্রেক্ষিতে আধুনিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। কেবল এভাবেই তারা 'নিজেদের কাছে ফিরে যেতে পারত' এবং যারা বাধ্য হয়ে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গিয়েছিল তাদের গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ও গণতান্ত্রিক শাসনের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারত। এটা পবিত্র প্রেক্ষিতে আধুনিকতাকে নতুন করে স্থাপন করারও প্রয়াস ছিল। প্রাক আধুনিক ধর্ম সব সময়ই *মিথোস* ও *লোগোসকে* সম্পূরক হিসাবে দেখেছে। ইসলামি সংস্কারকগণ সরকারের বাস্তবভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে ধর্মীয় ও অতীন্দ্রিয়বাদী কাঠামোর ভেতর প্রত্যক্ষ করবেন।

এটা সেক্যুলারের আধিপত্যের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের বিদ্রোহেরও অংশ বটে। এটা ঈশ্বরকে ফের রাজনৈতিক বলয়ে ফিরিয়ে আনার একটা উপায় যেখানে থেকে

AMARBOI.COM

তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্নভাবে মৌলবাদীরা আধুনিকতার বিচ্ছিন্নতা প্রত্যাখ্যান করেছে (চার্চ ও রাষ্ট্রের, সেক্যুলার ও জাগতিক) এবং নতুন করে হারানো সামগ্রিকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। ধার্মিক যায়নবাদীরা ধর্ম থেকে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী সেক্যুলারিস্ট যায়নবাদীদের 'বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' করেছিল। তারা ডায়াসপোরায় যতটা সম্ভব ছিল পবিত্র ভূমিতে তারচেয়ে আরও বেশি করে ঈশ্বর ও তোরাহ পেতে চেয়েছে। খোমেনি ও শরিয়তি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, রাজনীতি থেকে পবিত্রকে বাদ দেওয়া অসম্ভব; কুতব মিশরে *জাহিলি* হিসাবে আখ্যায়িত সেক্যুলারিস্ট শাসকগোষ্ঠীর খোদাহীনতার নিন্দা করেছেন। এখনও যারা আধুনিকতার সেক্যুলার যুক্তিবাদকে আলিঙ্গন করে উঠতে পারেনি তারা অস্তিত্বের অদৃশ্য মাত্রা সম্পর্কে সজাগ, এবং রাজনীতিতে তার প্রতিফলন দেখতে ইচ্ছুক। সেজন্যে তারা কম আধুনিক হবে কেন সেটা তারা বুঝতে পারে না, যদিও তারা আভাসে স্বীকার করে যে, এর মানে হবে প্রাক আধুনিক ধর্মের কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কচ্যুতি। ধর্মের মৌলবাদী সংস্কারের মানে দাঁড়ায় এমন এক অ্যাক্টিভিজম যাকে এতদিন অবধি অধর্মসুলভ মনে করা হলেও এখন তা গুরুত্বপূর্ণ। ধার্মিক যায়নবাদী এবং মৌলবাদী ক্রিশ্চান ও মুসলিমরা সবাই গতিশীলতা ও বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেছে যাতে আধুনিক সমাজের অগ্রযাত্রা ও বাস্তবভিত্তিক গতির সাথে তাল মেলানো যায়।

স্রষ্টার পক্ষে এই লড়াই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের কেন্দ্রে অবস্থান করা শূন্যতাকে ভরে তোলার একটি প্রয়াস। মৌলবাদীদের পরিহাস না করে সেক্যুলারিস্ট প্রতিষ্ঠান অনেক সময় তাদের প্রতি-সংস্কৃতির প্রতি তীক্ষ্ণ ও নিবিড় দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে লাভবান হতে পারে। শুকরি মুস্তাফার কমিউনসমূহ সাদাতের খোলা দুয়ার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল; মুসলিম ব্রাদারদের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য সাম্রাজ্যসমূহ এবং *জামাত আল-ইসলামিয়াহ্*র সদস্যদের গৃহীত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ বর্তমান সরকারের ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিহীনতাকে তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেছে। এই আন্দোলনগুলোর জনপ্রিয়তা ও শক্তি দেখায় যে, সেক্যুলারিস্ট প্রবণতা সত্ত্বেও মিশরের জনগণ এখনও ধার্মিক হতে চায়। ইরানের খোমেনির কাল্টও তাই: সরকারের সাথে বিরোধ জোরাল হয়ে ওঠার সাথে সাথে খোমেনি ক্রমেই আরও অধিকহারে ইমামদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করছিলেন, শাহর স্বৈরাচারী ব্যক্তিত্বের বিপরীতে নিজেকে বহু ইরানির কাছে স্পষ্টতই আকর্ষণীয় শিয়া বিকল্প হিসাবে তুলে ধরছিলেন। একইভাবে ইহুদি *ইয়েশিভোত* সেক্যুলারিস্ট শিক্ষার বাস্তববাদী প্রকৃতির বিপরীত রূপ ধারণ করেছে; ঈশ্বর ও তাঁর আইনকে বাতিল করে দিয়েছে বলে মনে হওয়া এক সমাজে *ইয়েশিভা* ছাত্ররা ঐশী সত্তার

AMARBOI.COM

সাথে সাক্ষাৎ লাভের লক্ষ্যে পড়াশোনা করেছে, কেবল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্যে নয়, এবং তোরাহ পাঠকে আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে তাদের জীবনের মৌল বিষয়ে পরিণত করেছে। এইসব বিকল্প সমাজ গড়ে তোলার সময় মৌলবাদীরা তাদের এমন সংস্কৃতির প্রতি মোহমুক্তি দেখিয়েছে যা আর সহজে আধ্যাত্মিকতাকে স্থান দিতে পারছিল না।

যুদ্ধংদেহী বলেই সমাজকে আবার পবিত্র করে তোলার অভিযান আগ্রাসী ও বিকৃত হয়ে গেছে। ধর্মীয় জীবনে আবশ্যক বলে সকল ধর্মে জোর দেওয়া সহানুভূতির ঘাটতি রয়েছে এর, এবং নুমিনাসেরও কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তার বদলে এটা বর্জন, ঘৃণা এবং এমনকি সহিংসতার আর্দশ প্রচার করেছে। কিন্তু মৌলবাদীদের ক্রোধের উপর একচেটিয়া অধিকার নেই। তাদের আন্দোলনসমূহ প্রায়শঃই ধর্ম ও এর অনুসারীদের প্রতি সামান্যই সম্মান প্রদর্শনকারী এক আগ্রাসী সেক্যুলারিজমের সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিকশিত করে। সেক্যুলারিস্ট ও মৌলবাদীরা অনেক সময় বৈরিতা ও পাল্টা অভিযোগের ক্রমবর্ধমান ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে বলে মনে হয়। মৌলবাদীরা যদি তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার স্বার্থে প্রতিপক্ষের আরও সহানুভূতিপূর্ণ মূল্যায়ন করে, সেক্যুলারিস্টদেরও অবশ্যই আধুনিক সংস্কৃতিকে এর সেরা অবস্থায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতকারী উদারতা, সহিষ্ণুতা ও মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে আরও বেশি বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং নিজেদের আরও সহানুভতির সাথে তাদের অসংখ্য মৌলবাদী প্রতিবেশীর অনভূত ভীতি, উদ্বেগ ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে, কোনও সমাজই যাকে নিরাপদে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

শেষ

AMARBOI.COM

নির্ঘণ্ট

আগুদাত ইসরায়েল (হিব্রু)। 'দ্য ইউনিয়ন অভ ইসরায়েল'; ১৯১২ সালে অর্থডক্স ইহুদিদের প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দল।

আলম আল-মিথাল (আরবী)। 'খাঁটি কল্পনার জগৎ'; মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদীদের দিব্যদর্শনের উৎস মানসিক অবস্থার এক বলয় এবং সৃজনশীল কল্পনার আসন।

আলিম (আরবী)। *উলেমা* দেখুন।

আলিয়াহ (হিব্রু)। সত্তার অধিকতর পর্যায়ে 'আরোহণ'। যায়নবাদীরা *ডায়াসপোরা* থেকে পবিত্র ভূমিতে অভিবাসন বোঝাতে ব্যবহার করেছে।

অ্যান্টিক্রাইস্ট। কিছু সংখ্যক নিউ টেস্টামেন্ট লেখকদের মতে অন্তিম দিবসের আগমন ঘোষণাকারী মিথ্যা পয়গম্বর। অ্যান্টিক্রাইস্ট হবে বিশ্বাসযোগ্য প্রতারক, সে সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রিশ্চানকে ধর্মদ্রোহীতার পথে টেনে নিয়ে যাবে এবং বুক অভ রেভেলেশনে পূর্বাভাস দেওয়া যুদ্ধে পরাস্ত হবে।

আশুরা (আরবী)। 'সত্য'; মুহররমের দশম দিবস, আধুনিক ইরাকের কারবালা প্রান্তরে পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) পৌত্র হুসেইনের আত্মত্যাগের বার্ষিকী।

অ্যাপোক্যালিপ্স 'ভীবষ্যদ্বাণী'; নিউ টেস্টামেন্টের শেষ পুস্তকের গ্রিক শিরোনাম, এখানে সেইন্ট জন বর্ণিত অন্তিমকালের বর্ণনা রয়েছে বলে সাধারণভাবে ধারণা করা হয়। পরিভাষাটি ক্রাইস্টের দ্বিতীয় আগমন ও মানবজাতির ধ্বংসের দিকে চালিত বিভিন্ন বিপর্যয়কর ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত।

অ্যাশকেনাযিক জু। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ইহুদি সম্প্রদায়, স্প্যানিশ সেফারদিক বা মধ্যপ্রাচ্যীয় উৎসের বিপরীতে সাধারণভাবে জার্মানিক ও ইদ্দিশ সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করা হয়।

আভোদাহ (হিব্রু)। 'কাজ, শ্রম।' বাইবেলের আমলে পরিভাষাটি মন্দিরে সেবা বোঝাতে প্রযুক্ত হত।

আওক্বাফ (আরবী)। এক বচন: *ওয়াকফ*। ধর্মীয় ভবন বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্যে ধর্মীয় অনুদান।

AMARBOI.COM

আয়াতোল্লাহ। *আরবী আয়াত আল্লাহ* থেকে, 'আল্লাহর নিদর্শন'; বিংশ শতাব্দীতে ইরানে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা নেতৃস্থানীয় *মুজতাহিদের* উপাধী।

ব্যাপ্টিস্ট চার্চ। ১৬৩০-র দশকে একটি স্বাধীন গোত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কালভিনিস্টিক গোষ্ঠী। বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ঘোষণা দেওয়ার পর প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে দীক্ষা দেওয়া হত। ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন কিছু ব্যাপ্টিস্ট সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকান কলোনিগুলোয় পাড়ি জমায়।

বাতিন (আরবী)। অস্তিত্ব ও ধর্মের 'গোপন' মাত্রা যাকে ইন্দ্রিয় বা যৌক্তিক ভাবনা দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, কিন্তু অতীন্দ্রিয়, স্বজ্ঞামূলক অনুশীলনের মাধ্যমে শনাক্ত করা যায়।

বাজারি (আরবী)। বাজারের বণিক ও কারুশিল্পীদের সদস্য।

বে (তুর্কি)। অটোমান সেনাবাহিনীর কমান্ডার বা জেনারেল।

বিদাহ (আরবী)। উদ্ভাবন বা প্রচলিত ইসলামি রেওয়াজ বা বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি।

চালুতয (হিব্রু)। বহুবচন: চালুতযিম। যায়নবাদী অগ্রগামী।

কংগ্রেশনালিস্ট চার্চ: স্থানীয় সমাবেশের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা ও কোনও প্রতিষ্ঠানের আরোপিত নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী কালভিনিস্ট। সদস্যরা আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার এক কোভেন্যান্টে পরস্পরের প্রতি সম্পর্কিত থাকে। ইংল্যান্ডে নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক কংগ্রেশনালিস্টই সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নেদারল্যান্ডস ও আমেরিকান কলোনিতে চলে গিয়েছিল। চার্চ বিশেষ করে নিউ ইংল্যান্ডে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কনভার্সো (স্প্যানিশ)। বহুবচন: কনভার্সোস। 'ধর্মান্তরিত'; গোড়ার দিকে আধুনিক স্পেনে জোরপূর্বক রোমান ক্যাথলিসিজমে পরিণত ইহুদি।

দেভেকুত (হিব্রু)। ঈশ্বরের সাথে 'সংশ্লিষ্টতা'; ঐশী সত্তা সম্পর্কে চিরন্তন সচেতনতা, হাসিদিমে কেবল যাদ্দিক দিয়েই অর্জনযোগ্য।

ডায়াসপোরা। প্যালেস্তাইনের বাইরে বিক্ষিপ্ত ইহুদিদের সম্প্রদায়সমূহ। *গালুত* (হিব্রু, নির্বাসন) নামেও পরিচিত।

দিবান (তুর্কি)। আক্ষরিক অর্থে 'নিচু গদিমোড়া আসন'; অটোমান সাম্রাজ্যে সুলতান বা তাঁর প্রাদেশিক গভর্নরের দরবার মহল, এখানে বিচারকাজ পরিচালিত হত।

এদাহ হেরাদিস (হিব্রু)। জেরুজালেমে আল্ট্রা-অর্থডক্স হেরেদিম সম্প্রদায়।

AMARBOI.COM

এন সফ (হিব্রু)। 'অন্তহীন'; গডহেডের কাব্বালিস্ট পরিভাষা, স্বর্গীয় সত্তা, মানবজাতির পক্ষে দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু নিজেকে যিনি চরমকে মানবজাতির সীমিত উপলব্ধিতে অভিযোজিতকারী সৃষ্টিতে ও দশটি পর্যায়ক্রমিক উৎসারণে *(সেফিরদ)* প্রকাশ করেছেন।

এস্কাটোলজি। গ্রিক 'চূড়ান্ত বস্তুসমূহের জ্ঞান' হতে; ইতিহাসের অবসান সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ, যার ভেতর মেসিয়ানিজম, শেষ বিচার এবং বিশ্বাসীদের চূড়ান্ত বিজয় অন্তর্ভুক্ত।

ফালসাফাহ (আরবী)। 'দর্শন'; একটি নিগূঢ় দার্শনিক আন্দোলন, কোরানের প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের সাথে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের গ্রিক যুক্তিবাদের সংশ্লেষ ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছিল।

ফাতওয়াহ (আরবী)। ইসলামি আইনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পণ্ডিতের মত বা সিদ্ধান্ত।

ফায়লাসুফ (আরবী)। *ফালসাফার* চর্চাকারী।

ফেদায়িন (আরবী)। মুক্তিযোদ্ধা।

ফেলাহিন (আরবী)। মিশরিয় কৃষকসমাজ।

ফিকহ (আরবী)। ইসলামি জুরিসপ্রুডেন্স, পবিত্র ইসলামি আইনের গবেষণা ও প্রয়োগ।

ফাকিহ (আরবী)। জুরিস্ট, *ফিকহ* চর্চাকারী।

গাওন (হিব্রু)। প্রথম সারির ইহুদি পণ্ডিত ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ।

গাহেলেত (হিব্রু)। 'জ্বলন্ত অঙ্গার'; ধার্মিক যায়নবাদী মৌলবাদীতে রূপান্তরিত অর্থডক্স ছাত্রদের গৃহীত নাম, র‍্যাবাই য্ভি ইয়েহুদা কুকের শিক্ষার ভিত্তিতে আদর্শকে গড়ে তুলেছিল তারা।

গালুত (হিব্রু)। নির্বাসন।

গায়েব (আরবী)। অদৃশ্য, পবিত্র, বা দুর্জ্ঞেয়।

গাযু (আরবী)। সামরিক আক্রমণ, অভিযান।

গুলুউ (আরবী)। 'অতিরঞ্জন'; বিশেষ করে শিয়াদের প্রাথমিককালে কোনও মতবাদের কোনও বৈশিষ্ট্যের উপর বেশি জোরদানকারী 'চরম' অনুমান (দেখুন শিয়া ইসলাম)।

গাশ এমুনিম (হিব্রু)। 'বিশ্বাসীদের গোত্র'; ধার্মিক ও সেক্যুলার ইহুদিদের প্রতিষ্ঠিত যায়নবাদী প্রেশার গ্রুপ, ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে ইসরায়েল কর্তৃক অধিকৃত এলাকায় বসতি স্থাপন উৎসাহিত করাই এদের লক্ষ্য ছিল।

AMARBOI.COM

হাবাদ (হিব্রু)। *হোখমাহ* (প্রজ্ঞা), *বিনাহ* (বুদ্ধিমত্তা) ও *দা'থ* (জ্ঞান)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ; অষ্টাদশ শতাব্দীতে র‍্যাবাই শ্নেয়ুর যালমান প্রতিষ্ঠিত হেসেদিক আন্দোলনের নাম, পরে লুবাভিচ রাশিয়ায় থিতু হয়েছিল। একারণে এই গোষ্ঠীটি লুবাভিচ হাসিদিম নামেও পরিচিত।

হাদিস (আরবী)। বহুবচন: আহাদিস। 'ঐতিহ্য'; পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) দালিলিক প্রতিবেদন, কোরানে লিপিবদ্ধ হয়নি কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ও পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক উত্তর প্রজন্মের জন্যে লিখিত হয়েছে।

হাজ্জ (আরবী)। মক্কায় তীর্থযাত্রা।

হালাখাহ (হিব্রু)। তোরাহয় প্রাপ্ত ৬১৩টি স্বর্গীয় নির্দেশনা ও পরবর্তীকালে তালমুদে গড়ে ওঠা আইন ও লোককথা ভিত্তিক ইহুদি আইনি ব্যবস্থা।

হেরিদিম (হিব্রু)। বিশেষণ: *হেরেদি*। 'কম্পিত জন'; আল্ট্রা-অর্থোডক্স ইহুদি।

হাসিদিম (হিব্রু)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাল শেম তোভ প্রতিষ্ঠিত একটি অতীন্দ্রিয় আন্দোলন।

হাসকালাহ (হিব্রু)। 'আলোকন'; অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোজেস মেন্দেলসন প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন; ইহুদিবাদের অভ্যন্তরে ইউরোপিয় আলোকনের মূল্যবোধসমূহের প্রসার চেয়েছে ও ইহুদিদের মূলধারার সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করার প্রয়াস পেয়েছে।

হিজরাহ (আরবী)। 'অভিবাসন'; মূলত পরিভাষাটি পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সহচরদের ৬২২ সিই-তে মক্কা থেকে মদিনায় অভিবাসন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়; ইসলামি ক্যালেন্ডারের প্রথম বছর। ইসলামকে পরিত্যাগকারী সমাজ থেকে প্রত্যাহার বোঝানোর লক্ষ্যে মুসলিম মৌলবাদীরা পরিভাষাটি গ্রহণ করেছে।

ইজমাহ (আরবী)। কোনও আইনি সিদ্ধান্তকে বৈধতা দানকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের 'ঐকমত্য'।

ইজতিহাদ (আরবী)। 'স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগ'; সমসাময়িক পরিস্থিতিতে শরীয়াহ প্রয়োগের লক্ষ্যে যুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার। চৌদ্দ শতকে অধিকাংশ মুসলিম '*ইজতিহাদের* দুয়ার' বন্ধ হয়ে গেছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও স্থির করে যে পণ্ডিতদের অবশ্যই তাদের নিজস্ব যুক্তিভিত্তিক অন্তর্দৃষ্টির বদলে অতীতের কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করতে হবে। *শিয়া* ইসলাম অবশ্য, '*ইজতিহাদের* দুয়ার বন্ধ' করেনি।

ইমাম (আরবী)। 'নেতা'; মূলধারার ইসলামে একজন ইমাম স্রেফ মুসলিম সমাবেশের প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেন। শিয়া ইসলামে পরিভাষাটি পয়গম্বর মুহাম্মদের

AMARBOI.COM

(স) সেইসব বংশধরদের কথা বোঝায় যাঁরা ঐশী জ্ঞান ধারণ করেন বলে বিশ্বাস করা হয় ও কেবল তাঁরাই বিশ্বাসীদের ভ্রান্তিহীন পথ প্রদর্শক।

ইনফিতাহ (আরবী)। ১৯৭২ সালে পশ্চিমের কাছে মিশরিয় অর্থনীতির 'উন্মুক্তকরণ'।

ইরফান (আরবী)। ইরানি অতীন্দ্রিয় ঐতিহ্য।

ইসলাহ (আরবী)। 'সংস্কার'; ইবন তায়মিয়াহ অনুপ্রাণিত আন্দোলনের মতো আন্দোলন, কোরান ও সুন্নাহর মৌল মূল্যবোধে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ইসলামি সম্প্রদায়কে পুনর্জাগরিত করার প্রয়াস।

ইসলাম (আরবী)। আল্লাহ'র কাছে 'আত্মসমর্পণ'। মুসলিম হচ্ছেন সেই নারী বা পুরুষ যিনি ঐশী সত্তা ও অস্তিত্বের মৌল বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম যারা তাদের বিশ্বাস পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) সুন্নাহয় নিবেদন করেন তারা সুন্নি হিসাবে পরিচিত; কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালনকারী শিয়া মুসলিমরা সংখ্যালঘু অংশ।

জাহিলিয়াহ (আরবী)। বিশেষেণ: *জাহিলি*। 'অজ্ঞতার কাল।' মূলতঃ পরিভাষাটি প্রাক ইসলামি আরবে প্রযুক্ত হত। বর্তমানে মুসলিম মৌলবাদীরা যেকোনও সমাজ, এমনকি সাধারণভাবে তাদের চোখে আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ'র সার্বভৌমত্ব মানতে অস্বীকৃতি জানানো মুসলিম সমাজকে বোঝাতেও প্রয়োগ করে থাকে।

জামাহ আল-ইসলামিয়াহ (আরবী)। বহুবচন: *জামাত*। 'ইসলামি পার্টি'; ১৯৭০-র দশকে মিশরের গড়ে ওঠা ইসলামি ছাত্র সংগঠন।

জানিসারি (তুর্কি)। 'নতুন বাহিনী'; অটোমান সাম্রাজ্যের ক্র্যাক দাস পদাতিক বাহিনী।

জিহাদ (আরবী)। 'সংগ্রাম।' সাধারণভাবে ইসলামি সম্প্রদায় বা ব্যক্তি মুসলিমের খারাপ অভ্যাস সংস্কারের অন্তস্থঃ প্রয়াস। পরিভাষাটি বিশেষ করে ধর্মের সেবায় যুদ্ধ ঘোষণা বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়।

কাবাহ (আরবী)। মক্কার চৌকো আকৃতির উপাসনালয়, ইসলামি বিশ্বের পবিত্রতম স্থান।

কাব্বালাহ (হিব্রু)। ইহুদি অতীন্দ্রিয় ঐতিহ্য।

কাওয়ানোত (হিব্রু)। 'অভিনিবেশ'; ধ্যানমূলক অনুশীলন, ইহুদি আধ্যাত্মিকতায় স্বর্গীয় নাম গঠনকারী হরফের উপর ধ্যান।

কেহিল্লাহ (হিব্রু)। ইউরোপিয় ডায়াসপোরায় ইহুদি সম্প্রদায়ের পরিচালনা সংস্থা।

AMARBOI.COM

কারবালা। ইরাকের কুফার বাইরের প্রান্তর যেখানে ৬৬০ সিই-তে উমাঈয়া বাহিনী কর্তৃক তৃতীয় শিয়া ইমাম, পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) পৌত্র হুসেইন নিহত হন। বর্তমানে কারবালা শিয়া মুসলিমদের অন্যতম পবিত্র ও তীর্থস্থান।

কিব্বুতয (হিব্রু)। সমাজবাদী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত যায়নবাদী কৃষি সংগঠন।

নেসেট (হিব্রু)। ইসরায়েল রাষ্ট্রের সংসদ।

কুকবাদী। র‍্যাবাই য্‌ভি ইয়েহুদা কুকের শিক্ষা অনুসরণকারী ধার্মিক যায়নবাদী।

কোরান (আরবী)। 'আবৃত্তি'; পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) কাছে প্রত্যাদিষ্ট ঐশী অনুপ্রেরণাজাত গ্রন্থ।

লোগোস (গ্রিক)। 'বাণী'; যৌক্তিক, যুক্তিপূর্ণ বা বৈজ্ঞানিক ডিসকোর্স।

লুবাভিচ হাসিদিম। *হাবাদ* দেখুন।

মাদ্রাসা (আরবী)। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বা সেমিনারি, এর পাঠ্যক্রম ধর্মীয় বিষয়, বিশেষ করে ইসলামি আইনের প্রতি জোর দেয়।

মজলিস (আরবী)। ইরানের প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ।

মামলুক (আরবী)। 'দাস'; ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নিকট প্রাচ্যে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠাকারী ক্রিশ্চান দাস বাহিনী, তবে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে অটোমানদের হাতে পরাস্ত হয়। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে মুহাম্মদ আলির হাতে পরাজয় বরণ করার আগ পর্যন্ত মামলুক অধিনায়কগণ মিশরের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মারজা-ই তাকলিদ (আরবী)। 'অনুকরণের আদর্শ'; সর্বোচ্চ পদমর্যাদার *মুজতাহিদের* জন্যে প্রযোজ্য উপাধী, যাঁর সিদ্ধান্ত তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া শিয়াদের জন্যে বাধ্যতামূলক। নির্দিষ্ট একটা সময়ে একজন মাত্র মারজা ছিলেন, অন্য সময়ে বেশ কয়েকজন মারজাইয়ের একটি সংস্থা।

মারানো (স্প্যানিশ)। 'শূকর'; জোরপূর্বক ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণকারী ও তাদের বংশধর স্প্যানিশ ইহুদি সম্প্রদায়।

মাসকিলিম (হিব্রু)। এক বচন: *মাসকিল*। 'আলোকিত জন'; *হাসকালাহ্‌র* অনুসারী।

মিলেনিয়াম। মানব ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে যে হাজার বছরের শান্তি ও ন্যায় বিচারের কাল আসবে বলে কিছু ক্রিশ্চান বিশ্বাস করে, শেষ বিচারের দিনে তার অবসান ঘটবে। ক্রিশ্চানরা এই বিশ্বাসকে হিব্রু পয়গম্বর ও কিছুসংখ্যক নিউ টেস্টামেন্ট লেখকদের ভবিষ্যদ্বাণীর আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে।

AMARBOI.COM

মিসনাগদিম (হিব্রু)। 'প্রতিপক্ষ।' মূলত প্রতিপক্ষকে বোঝাতে *হাসিদিম*দের প্রযুক্ত পরিভাষা (*হাসিদিম* দেখুন)। এখন তা অতীন্দ্রিয় প্রার্থনার বদলে তোরাহ পাঠের উপরই আধ্যাত্মিকতাকে স্থান দানকারী লিথুয়ানিয় আল্ট্রা-অর্থডক্স ইহুদিদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

মুফতি (আরবী)। ইসলামি আইনের উপদেষ্টা।

মুজাহিদিন (আরবী)। পবিত্র মুক্তিযোদ্ধা, ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত যুদ্ধে নিয়োজিত।

মোল্লাহ (আরবী)। মসজিদের দেখভাল করার জন্যে নিয়োজিত মুসলিম কর্মচারী।

মিথোস (গ্রিক)। 'মিথ'; গ্রিক *মাস্তেরিয়ন* থেকে উদ্ভূত, 'মিস্ট্রি',বা মিস্টিসিজমের' মতো শব্দ: মুখ বা চোখ বন্ধ করা। নীরবতা ও স্বজ্ঞামূলক অন্তর্দৃষ্টিতে প্রোথিত জ্ঞানের এক ধরন যা জীবনের অর্থ যোগায় কিন্তু যৌক্তিক পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। প্রাক আধুনিক বিশ্বে পৌরাণিক জ্ঞানকে *লোগোসের* সম্পূরক হিসাবে দেখা হত।

নিও-অর্থডক্স। উনবিংশ শতাব্দীতে র‍্যাবাই স্যামুয়েল রাফায়েল হার্শচ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইহুদি আন্দোলন। প্রচলিত অর্থডক্সির সাথে আধুনিকতার কিছু অন্তর্দৃষ্টিকে সমন্বিত করার প্রয়াস পেয়েছিল।

নেচারেই কারতা (আরামাইক)। 'শহরের অভিভাবক'; আল্ট্রা-অর্থডক্স ইহুদি গোষ্ঠী, যায়নবাদ ও ইসরায়েল রাষ্ট্রকে অশুভ মনে করে।

অকাল্টেশন। দশম শতাব্দীতে আল্লাহ কর্তৃক 'গোপন ইমাম' হিসাবে পরিচিত দ্বাদশ ইমামের গোপনে থাকার মতবাদ প্রকাশকারী শিয়া। শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, শেষ আমলে ন্যায় বিচারের কালের সূচনা করার জন্যে ফিরে আসবেন তিনি।

ওপেন ডোর পলিসি। *ইনফিতাহ* দেখুন।

ফিলাক্ট্রিজ। *তেফিলিন* দেখুন।

ইসলামের স্তম্ভ। ইসলামের পাঁচটি অবশ্যকরণীয় অনুশীলন, সকল মুসলিমের পক্ষে বাধ্যতামূলক: *শাহাদার* আবৃত্তি (আল্লাহ'র একত্ব ও মুহাম্মদের (স) পয়গম্বরত্বে বিশ্বাসের ঘোষণা), দৈনন্দিন প্রার্থনা, রমযান মাসে উপবাস পালন, দান ও *হাজ্জ*।

পোস্টমিলেনিয়ালিজম। ক্রিশ্চানরা তাদের নিজেদের গুণবলে মিলেনিয়াম প্রতিষ্ঠা করার পর জেসাসের ফিরে আসার পরকালতত্ত্বীয় বিশ্বাস। হাজার বছরের এই শান্তি ও ন্যায়ের কালের পর জেসাস আবার পৃথিবীতে এসে শেষ বিচারের নেতৃত্ব দেবেন।

AMARBOI.COM

প্রিমিলেনিয়ালিজম। মিলেনিয়ামের আগেই জেসাসের পৃথিবীতে আবিশ্যিকভাবে ফিরে আসার মৌলবাদী বিশ্বাস। মানব সমাজকে এমনভাবে ঈশ্বরবিহীন কল্পনা করা হয়েছে যে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি জেসাস ক্রাইস্টকে পৃথিবীতে পাঠাবেন এবং বুক অভ রেভেলেশনের বর্ণিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার পর জোসাস রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন ও হাজার বছর পৃথিবী শাসন করবেন। এই কালের শেষে শেষ বিচার ইতিহাসের অবসান ঘটাবে।

প্রেসবিটারিয়ানিজম। এক ধরনের কালভিনবাদ স্কটল্যান্ডে এর জন্ম, অব্যাহত সংস্কারে অঙ্গিকারাবদ্ধ, বাইবেল ভিত্তিক বিশ্বাস, যাজকদের বদলে প্রবীনদের সরকার (গ্রিক: *প্রেসবুতেরোই*), এবং সকল চার্চ সদস্যের অংশগ্রহণ।

পিউরিটান। ষোড়শ শতাব্দীর চার্চ অভ ইংল্যান্ডের সদস্য, মূলত যারা ধর্মের এলিযাবেথিয় সমাধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়িয়েছিল ও প্রটেস্ট্যান্টবাদের অধিকতর খাঁটি রূপ চেয়েছে, অ্যাংলিকান চার্চের 'পোপিশ' অনুশীলনকে আক্রমণ করেছে।

কাজি (আরবী)। শরীয়াহ প্রয়োগকারী বিচারপতি।

র‍্যাপচার। মনোনীতদেরই শেষ দিনের বিভীষিকা থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মিলেনিয়ামের অপেক্ষায় থাকার জন্যে ক্রাইস্টের সাথে বাতাসে 'তুলে নেওয়া'র ক্রিশ্চান মৌলবাদী মতবাদ। (১ থেসালোনিয়ান্স ৪: ১৭)।

রাশিদুন (আরবী)। পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) সহচর ও নিকটতম উত্তরাধিকারী চার 'সঠিক পথে পরিচালিত' খলিফা: আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি ইবন আবি তালিব। সুন্নি মুসলিমরা (*সুন্নি মুসলিম দেখুন*) *রাশিদুনদের* ইসলামি নীতিমালা অনুসারে শাসনকারীকে একমাত্র শাসক মনে করে। শিয়া (*শিয়া ইসলাম* দেখুন) অবশ্য প্রথম তিন *রাশিদুনকে* স্বীকার করে না, তারা আলি ইবন আবি তালিবকে প্রথম ইমাম হিসাবে মানে।

রাওদাহ (আরবী)। তৃতীয় শিয়া ইমাম হুসেইনের শাহাদৎ বরণ উপলক্ষ্যে শোক প্রকাশে গীত শোকগীতি।

রিকনকুয়েস্তা (স্প্যানিশ)। প্রকৃত বিশ্বাসীদের সমাজ পুনর্বিজয়।

রিফর্ম জুদাইজম। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলন পাশ্চাত্য চিন্তা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আলোকে ইহুদিবাদকে যৌক্তিকীকরণ ও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছিল। বর্তমানে রিফর্ম জু প্রত্যাদেশের উপলব্ধির ক্ষেত্রে অর্থডক্সদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। একে তারা প্রগতিশীল ও উন্মুক্ত এবং সেকারণে তোরাহর পরিবর্তনশীল ভিন্ন ব্যাখ্যা দানকারী মনে করে।

রোশ ইয়েশিভা (হিব্রু)। বহুবচন: *ইয়েশিভোত*। *ইয়েশিভার* প্রধান বা অধ্যক্ষ।

AMARBOI.COM

সেফারদিক জু। মূলতঃ এই পরিভাষাটি স্পেন থেকে নির্বাসিত ইহুদিদের বোঝাতে ব্যবহৃত হত; পরে অ্যাশকেনিযিয় ইহুদিদের থেকে আলাদা করার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যীয় বংশোদ্ভুত ইহুদিদের বেলায়ও সম্প্রসারিত হয়।

শাব্বেতিয়ানিজম। তুর্কি ইহুদি পণ্ডিত ও অতীন্দ্রিয়বাদী শাব্বেতেই যেভিই (১৬২৬–৭৬) মেসায়াহ, এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত সপ্তদশ শতাব্দীর একটি ইহুদি অন্দোলন; শাব্বেতেইবাদ বিংশ শতাব্দীতে অবশেষে হারিয়ে যায়।

শরীয়াহ (আরবী)। 'জলাশয়ের পথ'; ইসলামের পবিত্র আইন; কোরান, সুন্নাহ ও হাদিস থেকে গৃহীত। এই অপরিবর্তনীয়, স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত আইনকে একমাত্র সঠিক জীবনধারা বলে মনে করা হয়, একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ন্ত্রণ করে।

শেখিনাহ (হিব্রু)। পৃথিবীতে স্বর্গীয় উপস্থিতি। কাব্বালাহর কোনও কোনও ধরনে *শেখিনাহ*কে প্রতীকীভাবে *এন সফ* থেকে করুণভাবে বস্তু জগতে মানুষের সাথে নির্বাসিত বিচ্ছিন্ন নারী সত্তা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

শিয়া ইসলাম। ইসলামের সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী সুন্নি থেকে ধর্মতত্ত্বীয়ভাবে ভিন্ন, কিন্তু আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) বংশধরদেরই মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। অনুসারীদের শিয়া মুসলিম বা শিয়া বলার কারণ তারা পয়গম্বরের চাচাত ভাই ও মেয়ে-জামাই আলি ইবন আবি তালিবের মাধ্যমে তাঁর বংশধরদের স্বর্গীয় অনুপ্রাণিত নেতাদের (ইমাম দেখুন) শ্রদ্ধা করে। শিয়াহদের আন্দোলনের সামষ্টিক পরিভাষা হচ্ছে আলির 'দল'।

শুরাহ (আরবী)। 'ঐকমত্য'; ইসলামি আইনি নীতি যেখানে কোনও আইনি বিধির জন্যে কোনওভাবে গোটা সম্প্রদায়ের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

সুফি, সুফিবাদ। আরবী শব্দ *তাসাউফ থেকে*; সুন্নি ইসলামের অতীন্দ্রিয় ঐতিহ্য।

সুন্নাহ (আরবী)। 'রীতি'; উত্তর পুরুষের জন্যে সহচর ও পরিবারের সদস্যদের হাতে সংগৃহীত পয়গম্বর মুহাম্মদের (স) স্বভাব ও ধর্মীয় অনুশীলন, একে আদর্শ ইসলামি রীতি মনে করা হয়। এভাবে এগুলোকে ইসলামি আইনে স্থান দেওয়া হয়েছে যাতে মুসলিমরা পয়গম্বরের (স) আদি আদর্শ চরিত্রের যত বেশি সম্ভব কাছাকাছি পৌছতে পারে। *সুন্নাহ* পরিভাষাটি (বিশেষণ: *সুন্নি*) ইসলামের মূল শাখাও বোঝায় (দেখুন *সুন্নি ইসলাম*)।

সুন্নি ইসলাম। ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধরন, পয়গম্বরের (স) *সুন্নাহয়* ভক্তি নিবেদন করে। অনুসারীরা *সুন্নি মুসলিম* বা *সুন্নি* নামে পরিচিত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে

AMARBOI.COM

শিয়া মুসলিমদের থেকে পার্থক্য করে না, কিন্তু শাসকদের পয়গম্বর মুহাম্মদ (স) ও তাঁর মেয়ে-জামাই অলি ইবন আবি তালিবের মাধ্যমে বংশধরদেরই মুসলিম সম্প্রদায়ের শাসক হতে হবে এটা মনে করে না। ইসলামের এই ধরনটির সমবেত নাম *সুন্নাহ*।

তাজদিদ (আরবী)। 'নবায়ন'; সংস্কার আন্দোলন যা পরবর্তীকালের বিধান ও চর্চা প্রত্যাখ্যান করে কোরান ও সুন্নাহয় প্রত্যাবর্তনের ভেতর দিয়ে খাঁটি ইসলামে ফিরে যাওয়া প্রয়াস পেয়েছিল।

তালমুদ (হিব্রু)। 'পাঠ, শিক্ষা'; সিই প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ নাগাদ প্যালেস্তাইন ও বাবিলনের র‍্যাবাইদের মত ও বিবৃতি ধারণকারী রচনা ও সেগুলোর ব্যাখ্যা।

তাকিয়াহ (আরবী)। 'ডিসিমুলেশন'; রক্ষণশীল শিয়া মতবাদ (*শিয়া ইসলাম* দেখুন) যেটি বিশ্বাসীকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হুমকির মুখে পড়লে সঠিক মত গোপন করার অনুমতি দেয়।

তাকলিদ (আরবী)। 'অনুকরণ'; অতীতের কর্তৃপক্ষ, ইসলামি আইনের চারটি স্বীকৃত মতবাদের চলমান আইনি সিদ্ধান্ত বা স্বীকৃত *ফাকিহ* বা *মুজতাহিদের* আইনি সিদ্ধান্ত অনুসরণ।

তাওহিদ (আরবী)। 'ঐক্য পরিণত'; মুসলিমদের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গীয় ঐক্য তারা যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অনুকরণ করতে চায়, তাদের প্রতিষ্ঠান ও অগ্রাধিকারকে সমন্বিত করে ও আল্লাহ'র সার্বিক সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে।

তাযিয়াহ (আরবী)। হুসেইনের শাহাদৎ বার্ষিকী বর্ণনা করা আবেগী নাটক।

তেফিলিন (হিব্রু)। *শেমার* শব্দ ধারণ করা ছোট চামড়ার বাক্স: 'শোন, হে ইসরায়েল! প্রভুই ঈশ্বর, ঈশ্বর একজন!' ডিউটেরোনমি ৬: ৪–৯ অনুযায়ী সাপ্তাহিক সকালের প্রার্থনার সময় ইহুদি পুরুষরা কপালে ও বাম হাতে বেঁধে রাখে।

তিক্কুন (হিব্রু)। 'পুনঃস্থাপন'; কাব্বালিস্টিক আধ্যাত্মিকতায় নিষ্কৃতির প্রক্রিয়া যেখানে প্রার্থনা, আচার এবং আইনের প্রতি ভক্তিপূর্ণ আনুগত্য *শেখিনাহ্*র নির্বাসনের অবসান ঘটাবে ও গডহেডের সাথে সকল বস্তুর ঐক্য পুনঃস্থাপন করবে।

তোরাহ (হিব্রু)। 'শিক্ষা'; পরিভাষাটি ইহুদি ঐশীগ্রন্থের প্রথম পাঁচটি পুস্তক ও মোজসের আইন পেন্টাটিউকের প্রতি ইঙ্গিত করে।

উলেমা (আরবী)। এক বচন: *আলিম*। 'পণ্ডিত ব্যক্তি'; সুন্নি ও শিয়া ইসলামে আইন ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের অভিভাবক।

উম্মাহ (আরবী)। মুসলিম সম্প্রদায়।

AMARBOI.COM

উসুলি (আরবী)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রাধান্য লাভকারী *শিয়া ইসলামের* একটি মতবাদ। উসুলিরা ঘোষণা করেছিল যে শিয়াদের *মুজতাহিদের* আইনি সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া এবং নিজের বিবেচনাবোধের উপর বিশ্বাস রাখার বদলে তাঁর ধর্মীয় আচরণ অনুসরণ করা উচিত।

বেলায়েত-ই ফাকিহ (আরবী)। 'জুরিস্টের ম্যান্ডেট'; ১৯৭০-র দশকের গোড়ার দিকে আয়াতোল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির গড়ে তোলা তত্ত্ব যেখানে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, শরীয়ায় প্রকাশিত আল্লাহ'র ইচ্ছার সাথে সমাজের সমরূপতা নিশ্চিত করার জন্যে একজন *ফাকিহ্*রই শাসন করা উচিত। এরই ব্যাপক ভিত্তিক জনপ্রিয়তা শিয়া অর্থডক্সি থেকে বিপ্লবী সরে যাওয়া।

ওয়াকফ। *আওক্বাফ* দেখুন।

ইয়েশিভা (হিব্রু)। বহুবচন: *ইয়েশিভোত*। ক্রিয়া পদ 'বসা' থেকে; ইহুদি ধর্মীয় একাডেমি যেখানে ছাত্ররা তালমুদ ও অন্যান্য রাব্বিনিক সাহিত্য পাঠের দায়িত্ব নেয়।

যাদ্দিক (হিব্রু)। 'ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি'; *হাসিদিমে যাদ্দিক* তিনিই যিনি *দেভেকুতের* কৌশল আয়ত্ত করেছেন এবং অনুসারীদের স্বর্গীয় বলয়ে প্রবেশাধিকার দিতে পারেন।

যাহির (আরবী)। 'প্রকাশিত'; আল্লাহ'র বাহ্যিক প্রকাশ ও বাহ্যিক বিশ্ব; *বাতিনের* বিপরীতে ঐশীগ্রন্থের সাধারণ, আক্ষরিক অর্থও বটে।

যাকাত (আরবী)। 'শুদ্ধতা'; আয়ের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের কর বোঝাতে ব্যবহৃত পরিভাষা, দরিদ্রকে যা দিতেই হবে। ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ।

যিমযুম (হিব্রু)। 'প্রত্যাহার'; লুরিয় কাব্বালায় গডহেড *এন সফ* ঈশ্বর নন এমন একটি স্থান সৃষ্টি করার জন্যে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এভাবে বস্তুগত মহাবিশ্বের জন্যে স্থান তৈরি করেছেন তিনি।

AMARBOI.COM

তথ্যসূত্র

সূচনা

১. আব্দেল সালাম সিদাহারেদ ও আনশিরাভান এহতেশামি (সম্পা.) *ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম* (বোল্ডার, কলো., ১৯৯৬), ৪ ।

২. মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী, 'কনক্লুশন: অ্যান ইন্টেরিম রিপোর্ট অন আ হাইপোথেটিকাল ফ্যামিলি,' *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড* (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯১), ৮১৪-৪২ ।

৩. জোহানেস স্লোয়েক, *ডিভোশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ* (অনু. হেনরিক মোসিন; বার্লিন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৬), ৫৩–৯৬ ।

৪. মির্চা এলিয়াদ, *প্যাটার্নস ইন কম্প্যারেটিভ রিলিজিয়ন* (অনু. রোজমেরি শীদ; লন্ডন, ১৯৫৮), ৪৫৩-৫৫ ।

৫. স্লোয়েক, *ডিভোশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ*, ৭৫-৭৬ ।

৬. প্রাগুক্ত, ৭৩-৭৪; টমাস এল. টম্পসন, *দ্য বাইবেল ইন হিস্ট্রি: হাউ রাইটার্স ক্রিয়েট আ পাস্ট* (লন্ডন, ১৯৯৯), ১১-৩৩ ।

৭. স্লোয়েক, *ডিভোশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ*, ৫৪-৫২, ৬৮-৭১ ।

৮. ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *হোলি ওয়ার: দ্য ক্রুসেডস অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন টুডে'জ ওয়ার্ল্ড* (লন্ডন, ১৯৮৮; নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯১), ৩-৭৫, ১৪৭-২৭৪ ।

৯. স্লোয়েক, *ডিভোশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ*, ১৩৪ ।

১. ইহুদি: অগ্রগামী (১৪৮২—১৭০০)

১. পল জনসন, *আ হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ* (লন্ডন, ১৯৮৭), ২২৯; ইরমিয়াহু ইয়োভেল, *স্পিনোযা অ্যান্ড আদার হেরেটিক্স, ১: দ্য মারানো অভ রিজন* (প্রিন্সটন, এন.জে., ১৯৮৯), ১৭-১৮ ।

২. জনসন, *আ হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ*, ২৩০; ফ্রেডেরিখ হিয়ার, *দ্য মেডিয়াভেল ওয়ার্ল্ড ১১০০—১৩৫০* (অনু. জেনেট সন্দহেইমার; লন্ডন, ১৯৬২), ৩১৮ ।

৩. ইয়োভেল, *দ্য মারানো অভ রিজন*, ১৭ ।

৪. জনসন, *আ হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ*, ২১৭-২৫ ।

৫. প্রাগুক্ত, ২১৭-২৫; হাইম ম্যাকোবি, *জুদাইজম অন ট্রায়াল: জুইশ ক্রিশ্চান ডিবেটস ইন দ্য মিডল এজেস* (প্রিন্সটন, এন.জে., ১৯৮২); হাইমে বেইনার্ত, *কনভার্সোস অন ট্রায়াল: দ্য ইনকুইজিশন ইন সিউদাদ রিয়াল* (জেরুজালেম, ১৯৮১), ৩–৬।

৬. জনসন, *আ হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ*, ২২৫-২৯।

৭. প্রাগুক্ত, ২৩০-৩১।

৮. গার্শোম শোলেম, *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, (লন্ডন, ১৯৫৫), ২৪৬-৪৯।

৯. গার্শোম শোলেম, *শাব্বেতেই সেভি, দ্য মিস্টিক্যাল মেসায়াহ* (লন্ডন ও প্রিন্সটন, এন.জে., ১৯৭৩), ১১৮–১৯।

১০. প্রাগুক্ত, ১৯।

১১. প্রাগুক্ত, ৩০-৪৫; শোলেম, *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, ২৪৫–৮০; গার্শোম শোলেম, 'দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন কাব্বালিজম', শোলেম-এর *দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন জুদাইজম অ্যান্ড আদার এসেজ অন জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১), ৪৩-৪৮।

১২. জোহানেস স্লোয়েক, *ডিভোশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ* (অনু. হেনরিক মোসিন; বার্লিন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৬), ৭৩–৭৬।

১৩. শোলেম, *শাব্বেতাই সেভি*, ৫৪।

১৪. প্রাগুক্ত, ২৩-২৫; আর. জে. ওয়েরব্লোয়েস্কি, 'মেসিয়ানিজম ইন জুইশ হিস্ট্রি,' মার্ক সেপারস্তেইন (সম্পা.) *এসেনশিয়াল পেপারস ইন মেসিয়ানিক মুভমেন্টস ইন জুইশ হিস্ট্রি*-তে (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯২), ৪৮।

১৫. শোলেম, *শাব্বেতাই সেভি*, ৩৭-৪২।

১৬. রিচার্ড এল. রুবিনস্তেইন, *আফটার অশউইৎয: রেডিক্যাল থিওলজি অ্যান্ড কনটেম্পোরারি জুদাইজম* (ইন্ডিয়ানাপোলিস, ইন্ড., ১৯৬৬)।

১৭. আর. জে. ওয়েরবলোইস্কি, 'দ্য সেফেদ রিভাইভাল অ্যান্ড ইটস আফটারমাথ,' আর্থার গ্রিন (সম্পা.), *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, ২ খণ্ড, (লন্ডন, ১৯৮৬, ১৯৮৯), ২য়, ১৫-১৯।

১৮. গার্শোম শোলেম, *অন দ্য কাব্বালাহ অ্যান্ড ইটস সিম্বোলিজম* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৫), ১৫০।

১৯. লরেন্স ফাইন, 'দ্য কনটেম্পলেটিভ প্র্যাকটিস অভ ইয়েহেদুন ইন লুরিয়ানিক কাব্বালাহ,' গ্রিন (সম্পা.) *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, ২য়, ৭৩-৭৮।

AMARBOI.COM

২০. প্রাগুক্ত, ৮৯-৯০; ওয়েরব্লোয়েস্কি, 'দ্য সেফেদ রিভাইভাল অ্যান্ড ইটস আফটারমাথ,' ২১-২৪; লুইস জ্যাকবস, 'দ্য আফলিফটিং অভ দ্য স্পার্কস ইন লেটার জুইশ মিস্টিসিজম,' গ্রিন (সম্পা.), *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, ২য়, ১০৮-১১।

২১. ওয়েরব্লোয়েস্কি, 'দ্য সেফেদ রিভাইভাল অ্যান্ড ইটস আফটারমাথ,' ১৭; জ্যাকব কাতয, 'হালাকাহ অ্যান্ড কাব্বালাহ অ্যাজ কম্পিটিং ডিসিপ্লিনস অভ স্টাডি,' গ্রিন, (সম্পা.), *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, ২য়, ৫২-৫৩।

২২. ইয়োভেল, *দ্য মারানো অভ রিজন*, ৯১, ১০২।

২৩. প্রাগুক্ত, ২৬-২৭।

২৪. ওয়াই. বায়ের, *হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ ইন ক্রিশ্চান স্পেইন* (ফিলাদেলফিয়া, ১৯৬১), ২৭৬-৭।

২৫. ইয়োভেল, *দ্য মারানো অভ রিজন*, ৮৮-৮৯।

২৬. প্রাগুক্ত, ৯৩।

২৭. ফেরনান্দো দে রোয়াস, *লা সেলেস্তিনা*, দৃশ্য ২৭।

২৮. ইয়োভেল, *দ্য মারানো অভ রিজন*, ১৮-১৯।

২৯. প্রাগুক্ত, ১৯-২৪।

৩০. প্রাগুক্ত, ৫৪-৫৭।

৩১. প্রাগুক্ত, ৫১।

৩২. ভূমিকা, *এপিস্তোলা ইনভেক্তা কন্ত্রা প্রাদো*, ইয়োভেল-এ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, ৫১-৫২।

৩৩. প্রাগুক্ত, ৫৩।

৩৪. প্রাগুক্ত, ৭৫-৭৬।

৩৫. প্রাগুক্ত, ৪২-৫১।

৩৬. প্রাগুক্ত, ৫৭-৭৩।

৩৭. প্রাগুক্ত, ৪-১৩, ১৭২-৭৪।

৩৮. বারুচ স্পিনোযা, *আ থিয়োলাজিকো-পলিতিকাল ট্রিতাইজ* (অনু. আর.এইচ.এম. এলউইস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫১), ৭।

৩৯. আর.এম. সিলভারম্যান, *বারুচ স্পিনোযা: আউটকাস্ট জু, ইউনিভার্সাল সেজ* (নর্থউড, ইউকে., ১৯৯৫), ১৫৪-৭০।

৪০. প্রাগুক্ত, ১৭৫-৯১।

৪১. ইয়োভেল, *দ্য মারানো অভ রিজন*, ৩১-৩২।

AMARBOI.COM

৪২. ডেভিড রুদাভস্কি, *মডার্ন জুইশ রিলিজিয়াস মুভমেন্টস: আ হিস্ট্রি অভ ইমানসিপেশন অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্টস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৭), ২৮-৩৩, ৯৫।

৪৩. বার্নার্ড লুইস, *দ্য জুজ অভ ইসলাম* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৮২), ২৪-৪৫।

৪৪. জনসন, *আ হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ*, ২৫৯।

৪৫. শোলেম, *শাব্বেতেই সেভি*, ১৩৯।

৪৬. প্রাগুক্ত, ১২৩-৩৮।

৪৭. প্রাগুক্ত, ১৬২।

৪৮. প্রাগুক্ত, ১৯৮।

৪৯. প্রাগুক্ত, ২০৪, ২০৬

৫০. প্রাগুক্ত, ২২৭।

৫১. প্রাগুক্ত, ২৩৭-৩৮।

৫২. প্রাগুক্ত, ২৪৩-৫৯, ২৬২-৬৭, ৩৭০-৪২৬।

৫৩. শোলেম, *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, ৩০৬-০৭।

৫৪. শোলেম, *শাব্বেতেই সেভি*, ৩৬৭, ৪০৩।

৫৫. প্রাগুক্ত, ৭২০-২১; ৮০০-৮০১।

৫৬. প্রাগুক্ত, ৭৯৬-৯৭।

৫৭. শোলেম, *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, ৩১২-১৫।

৫৮. শোলেম, *শাব্বেতেই সেভি*, ৬১৮-২৩।

৫৯. প্রাগুক্ত, ৬২২-৩৭; ৮২৯-৩৩।

৬০. প্রাগুক্ত, ৮৪০-৪১।

৬১. প্রাগুক্ত, ৭৪৮।

৬২. শোলেম, *মেজর ট্রেন্ডস ইন জুইশ মিস্টিসিজম*, ৩০০-৩০৪।

৬৩. গার্শোম শোলেম, 'দ্য ক্রিপটো-জুইশ সেক্ট অভ দ্য দোনমেহ,' শোলেম-এর *দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন জুদাইজম*-এ, ১৪৭-৬৬।

৬৪. সেইং নাম্বার ২১৫২, 'রিডেম্পশন থ্রু সিন,' শোলেম-এর *দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া ইন জুদাইজম*-এ উদ্ধৃত, ১৩০।

৬৫. সেইং নাম্বার ১৪১৯, প্রাগুক্তে।

৬৬. প্রাগুক্ত, ১৩৬-৪০।

২. মুসলিম: রক্ষণশীল চেতনা (১৪৯২–১৭৯৯)

১. মার্শাল জি.এস. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম: কনশিয়েন্স ইন আ ওয়ার্ল্ড অভ সিভিলাইজেশন*, ৩ খণ্ড (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৭৪), ২য়, ৩৩৪-৬০।

২. প্রাগুক্ত, ৩য়, ১৪-১৫।

৩. প্রাগুক্ত, ২য়, ৪০৬-৭।

৪. প্রাগুক্ত, ৩য়, ১০৭-২৩।

৫. জোহানেস স্লোয়েক, *ডিভোশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ,* (অনু. হেনরিক মোসিন; বার্লিন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৬), ৮৯-৯০।

৬. কোরান ৮০: ১১। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কোরানের টেক্সট মুহাম্মদ আসাদ, *দ্য মেসেজ অভ দ্য কুরান* থেকে নেওয়া হয়েছে (জিব্রাল্টার, ১৯৮০)। [বাংলা অনুবাদ বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের *কোরান শরীফ: সরল বঙ্গানুবাদ* থেকে নেওয়া–অনুবাদক]।

৭. কোরান ৩৫: ২৪-২৬।

৮. কোরান ২: ১০০; ১৩: ৩৭; ১৬: ১০১; ১৭: ৪১; ১৭: ৮৬।

৯. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম,* ১ম, ৩২০-৪৬, ৩৮৬-৮৯।

১০. প্রাগুক্ত, ২য়, ৫৬০; ৩য়, ১১৩-২২। অ্যালবার্ট হুরানি, *আরাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ, ১৭৯৮-১৯৩৯* (অক্সফোর্ড, ১৯৬২), ২৫-৩৬।

১১. জন ভোল, 'রিনিউয়াল অ্যান্ড রিফর্ম ইন ইসলামিক হিস্ট্রি,' জন এসপোসিতো (সম্পা.), *ভয়েসেস অভ রিসার্জেন্ট ইসলাম*-এ (নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৮৩)।

১২. মাজিদ ফাখরি, *আ হিস্ট্রি অভ ইসলামিক ফিলোসফি* (নিউইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৭০), ৩৫০-৫৪; হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম,* ২য়, ৪৭০-৭১।

১৩. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম,* ১ম, ৩৮৩-৪০৯, ৪১৬-৩৬; ২য়, ১৯৪-৯৮; হেনরি করবিন, *ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন ইন দ্য সুফিজম অভ ইবন আরাবি* (অনু. ডব্লু. ট্রাস্ক; লন্ডন, ১৯৭০), ১০-২৯; ৭৮-৭৯।

১৪. পি.এম. হোল্ট, 'দ্য প্যাটার্ন অভ ইজিপশিয়ান পলিটিক্যাল হিস্ট্রি ফ্রম ১৫১৭-১৭৯৮,' পি.এম. হোল্ট (সম্পা.), *পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ ইন মডার্ন ইজিপ্ট: হিস্ট্রিক্যাল স্টাডিজ ফ্রম দ্য অটোমান কনকোয়েস্ট টু দ্য ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক* (লন্ডন, ১৯৬৮), ৮০-৮২।

১৫. প্রাগুক্ত, ৮২-৮৬।

১৬. আরাফ লুফতি আল-সায়ীদ মারসত, 'দ্য রোল অভ দ্য উলেমা ইন ইজিপ্ট ডিউরিং দ্য আর্লি নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি,' হোল্ট (সম্পা.), *পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ ইন মডার্ন ইজিপ্ট*-এ, ২৬৪-৬৫।

১৭. গেমাল এল-দিন শায়াল, 'সাম আসপেক্টস অভ ইন্টেলেকচুয়াল অ্যান্ড সোশ্যাল লাইফ ইন এইটিন্থ সেঞ্চুরি ইজিপ্ট,' হোল্ট (সম্পা.), *পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ ইন মডার্ন ইজিপ্ট*-এ, ১১৭-২৩।

AMARBOI.COM

১৮. আরাফ লুফতি আল-সায়ীদ মারসত, 'দ্য উলেমা অভ কায়রো ইন দ্য এইটস্থ অ্যান্ড নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরিজ, নিক্কি আর. কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্টস অ্যান্ড সুফিজ: মুসলিম রিলিজিয়াস ইন্সটিটিউশনস ইন দ্য মিডল ইস্ট সিন্স ১৫০০* (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৭২), ১৫৪ ।

১৯. মারসত, 'দ্য রোল অভ দ্য উলেমা ডিউরিং দ্য আর্লি নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরি,' ২৬৭-৬৯ ।

২০. প্রাগুক্ত, ২৭০; ড্যানিয়েল ক্রেসিলিয়াস, 'ননআইডিওলজিক্যাল রেসপন্সেস অভ দ্য ইজিপশিয়ান উলেমা টু মর্ডানাইজেশন,' কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্টস অ্যান্ড সুফিজ*-এ, ১৭২ ।

২১. ক্রেসিলিয়াস, 'ননআইডওলজিক্যাল রেসপন্সেস,' ১৬৭-৭২ ।

২২. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম*, ৩য়, ১২৬-৪১, ১৫৮-৫৯ ।

২৩. হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ*, ৪১-৪৪ ।

২৪. ভোল, 'রিনিউয়াল আন্ড রিফর্ম ইন ইসলামিক হিস্ট্রি,' ৩৭, ৩৯-৪২; হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম*, ৩য়, ১৬০-৬১; হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ*, ৩৭-৩৮ ।

২৫. আর.এস. ও'ফাহে, 'পিয়েটিজম, ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড মিস্টিসিজম: অ্যান অল্টারনেটিভ ভিউ অভ দ্য এইটিন্থ অ্যান্ড নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড'; ১২ই নভেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে নর্দান ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত ভাষণ ।

২৬. মুজান মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম: দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড ডক্ট্রিনস অভ টুয়েলভার শিয়াজম* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৫), ২৭-৩৩ ।

২৭. ম্যাগাল বাকহার্স্ট, 'তাযিয়াহ অ্যান্ড ইটস ফিলোসফি,' পিটার জে. চেলকাওয়িস্কি (সম্পা.), *তাযিয়াহ, রিচুয়াল অ্যান্ড ড্রামা ইন ইরান* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৯), ৯৮-১০২; মাইকেল জে ফিশার, *ইরান: ফ্রম রিলিজিয়াস ডিসপিউট টু রিভোল্যুশন* (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস ও লন্ডন, ১৯৮০), ১৯-২০; হামিদ আলগার, 'দ্য অপোজিশনাল রোল অভ দ্য উলেমা ইন টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ইরান,' কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্টস অ্যান্ড সুফিজ*-এ, ২৩৩ ।

২৮. মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ৩৫-৩৮; ৪৬-৪৭ ।

২৯. প্রাগুক্ত, ৩৭, ৬৯-৭০, ১৪৫-৫৮; আব্দুলআযিয আব্দুলহুসেইন স্যাচেদিনা, *ইসলামিক মেসিয়ানিজম: দ্য আইডিয়া অভ দ্য মাহদি ইন টুয়েলভার শিয়াজম* (আলবানি, ১৯৮১), ১৪-৩৯ ।

৩০. মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ৪৩-৪৫ ।

AMARBOI.COM

৩১. ইবন বাবুয়া, 'কামাল আল-দিন,' মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*-এ ১৬৪, ১৬১-৯০; স্যাচেদিনা, *ইসলামিক মেসিনিয়াজম*, ২৪-৩০, ৭৮-১১২, ১৫০-৮৩।

৩২. ফিশার, *ইরান*, ২৫-২৬।

৩৩. স্যাচেদিনা, *ইসলামিক মেসিয়ানিজম*, ১৫১-৫৯।

৩৪. নিক্কি আর. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন: অ্যান ইন্টারপ্রিটেটিভ হিস্ট্রি অভ মডার্ন ইরান* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮১), ১০; স্যাচেদিনা, *ইসলামিক মেসিয়ানিজম*, ৩০।

৩৫. হুয়ান আর. কোল, 'ইমামি জুরেসপ্রুডেন্স অ্যান্ড দ্য রোল অভ দ্য উলেমা: মোর্তাজা আনসারি অন ইমোলিউটিং দ্য সুপ্রিম এক্সামপ্লার,' কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্টস অ্যান্ড সুফিজ*-এ, ৩৬-৩৭; হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম*, ২য়, ৩২৩-২৪, ৪৭২-৭৬।

৩৬. স্যাচেদিনা, *দ্য ইসলামিক মেসিয়ানিজম*, ১১০-১২।

৩৭. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম*, ৩য়, ২২-২৩, ৩০-৩৩।

৩৮. 'দ্বাদশবাদীরা' 'সপ্তবাদীদের' চেয়ে ভিন্ন—এরা কেবল প্রথম সাত জন ইমামের বৈধতা স্বীকার করে, ইসমাইলি বা ফাতিমিয় নামেও পরিচিত।

৩৯. মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ১০১-০৯।

৪০. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম*, ৩য়, ২৩।

৪১. মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ১১০-১৩।

৪২. মার্টিন রিসেব্রেদট, *পায়াস প্যাশনস: দ্য ইমারজেন্স অভ মডার্ন ফান্ডামেন্টালিজম ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড ইরান* (অনু. ডন রেনো; বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১০২-০৩।

৪৩. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ১৬-১৭।

৪৪. মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ১১৪-১৬।

৪৫. বাকতাশ, 'তাযিয়াহ অ্যান্ড ইটস ফিলোসফি,' ১০৫।

৪৬. মেরি হেগল্যান্ড, 'টু ইমেজেস অভ হুসেইন: অ্যাকোমোডেশন অ্যান্ড রিভোল্যুশন ইন অ্যান ইরানিয়ান ভিলেজ,' নিক্কি আর. কেদ্দি, (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইরান: শিয়াজম ফ্রম কোয়ায়েটিজম টু রিভোল্যুশন* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৩), ২২১-২৫।

৪৭. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম*, ৩য়, ৪২-৪৬; মঙ্গোল বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট: সোশিও রিলিজিয়াস থট ইন কাজার ইরান* (সিরাকুজ, এন.ওয়াই., ১৯৮২), ২৮-৪৭।

AMARBOI.COM

৪৮. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম*, ৩য়, ৪৩।

৪৯. ফাখরি, *আ হিস্ট্রি অভ ইসলামিক ফিলোসফি*, ৩৪০।

৫০. ফিশার, *ইরান*, ২৩৯-৪২।

৫১. মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ১১৭-২৩, ২২৫; বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ২১-২৩।

৫২. বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ৩০।

৫৩. নিক্কি আর. কেদ্দি, 'উলেমা'জ পাওয়ার ইন মডার্ন ইরান,' কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্ট অ্যান্ড সুফিজ*-এ ২২৩; মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ১১৭-১৮।

৫৪. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২১-২২; মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ১২৪-২৬।

৫৫. কেদ্দি, 'উলেমা;জ পাওয়ার ইন মডার্ন ইরান,' ২২৬।

৫৬. মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ১২৭-২৮; কোল, 'ইমামি জুরিসপ্রুডেন্স অ্যান্ড দ্য রোল অভ দা উলেমা,' ৩৯-৪০; বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ২২-২৩; হামিদ আলগার, 'দ্য অপোজিশনাল রোল অভ দ্য উলেমা,' ২৩৪-৩৫।

৫৭. জর্জ অ্যানেসলি, *দ্য রাইজ অভ মডার্ন ইজিপ্ট, আ সেঞ্চুরি অ্যান্ড আ হাফ অভ ইজিপশিয়ান হিস্ট্রি, ১৭৯৮-১৯৫৭* (ডারহাম, ইউ.কে., ১৯৯৪), ৪-৫।

৩. *ক্রিশ্চান সাহসী নতুন বিশ্ব (১৪৯২–১৮৭০)*

১. রবিন ব্রিগস, 'এমব্যাটলড ফেইথস: রিলিজিয়ন অ্যান্ড নেচারাল ফিলোসফি,' ইউয়ান ক্যামেরন (সম্পা.), *আর্লি ইউরোপ*-এ (অক্সফোর্ড, ১৯৯৯), ১৯৭-২০৫।

২. মার্শাল জি.এস, হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম: কনশিয়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন আ ওয়ার্ল্ড অভ সিভিলাইজেশন*, ৩ খণ্ড, (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৭৪), ৩য়, ১৭৯-৯৫।

৩. নরমান ক্যান্টর, *দ্য স্যাক্রেড চেইন: আ হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৪; লন্ডন, ১৯৯৫), ২৩৭-৫২।

৪. রিচার্ড মারিয়াস, *মার্টিন লুথার, দ্য ক্রিশ্চান বিটুইন গড অ্যান্ড ডেথ* (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস, ও লন্ডন, ১৯৯৯), ৭৩-৭৪, ২১৪-১৫, ৪৮৬-৮৭।

AMARBOI.COM

৫. অ্যালিস্টার ই. ম্যাকগ্রাথ, *রিফর্মেশন থট: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮), ৭৩-৭৪; *আ লাইফ অভ জন কালভিন: আ স্টাডি ইন দ্য শেপিং অভ ওয়েস্টার্ন কালচার* (অক্সফোর্ড, ১৯৯০), ৭০।

৬. মারিয়াস, *মার্টিন লুথার*, ১০১-০৪, ১১১, ৪৪৩।

৭. জারোশ্লাভ পেলিক্যান, *দ্য ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশন: আ হিস্ট্রি অভ দ্য ডেভেলপমেন্ট অভ ডক্ট্রিন*, ৫ খণ্ড, ৪র্থ, *রিফর্মেশন অভ চার্চ অ্যান্ড ডগমা* (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৮৫), ১৬৫-৬৭।

৮. জোশুয়া মিচেল, *নট বাই রিজন অ্যালোন: রিলিজিয়ন, হিস্ট্রি অ্যান্ড আইডেন্টিটি ইন আর্লি মডার্ন পলিটিক্যাল থট* (শিকাগো, ১৯৯৩), ২৩-৩০।

৯. ম্যাকগ্রাথ, *জন কালভিন*, ১৩০-৩২।

১০. রিচার্ড টারনাস, *দ্য প্যাশন অভ দ্য ওয়েস্টার্ন মাইন্ড: আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য আইডিয়াজ দ্যাট হ্যাভ শেপড আওয়ার ওয়ার্ল্ড ভিউ* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯১), ৩০০।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. বেন্টলিকে লেখা চিঠি, ১০ই ডিসেম্বর, ১৬৯২, আইজাক নিউটনের *দ্য করেসপন্ডেন্স অভ ইসাক নিউটন*-এ (সম্পা. এ.এইচ. টার্নবুল ও এল. টিলিং, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯৫৯), ২২৩-২৫।

১৩. রিচার্ড এস. ওয়েস্টফল, 'দ্য রাইজ অভ সায়েন্স অ্যান্ড দ্য ডিক্লাইন অভ অর্থডক্স ক্রিশ্চানিটি: আ স্টাডি অভ কেপলার, দেকার্তে অ্যান্ড নিউটন,' ডেভিড সি. লিন্ডবার্গ ও রোনাল্ড এল. নাম্বারস (সম্পা.), *গড অ্যান্ড নেচার: হিস্ট্রিকাল এসেজ অন দ্য এনকাউন্টার বিটুইন ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড সায়েন্স* (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৮৬), ২৩১।

১৪. প্রাগুক্ত, ২৩১-৩২।

১৫. গ্রেগরি অভ নিসা, 'নট থ্রি গডস,' ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *আ হিস্ট্রি অভ গড: দ্য ফোর থাউজ্যান্ড ইয়ার কোয়েস্ট অভ জুদাইজম, ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড ইসলাম*-এ (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৩), ১১৬-১৮। [একুশে বই মেলা-২০১০ উপলক্ষ্যে বর্তমান অনুবাদকের অনুবাদে রোদেলা প্রকাশনী থেকে *স্রষ্টার ইতিবৃত্ত* নামে প্রকাশিত হয়েছে।]

১৬. টারনাস, *দ্য প্যাশন অভ ওয়েস্টার্ন মাইন্ড*, ৩০০।

১৭. রেনে দেকার্তে, *দিসকোর্স দে লা মেইথদে*, ২য়, ৬: ১৯।

১৮. মিচেল, *নট বাই রিজন অ্যালোন*, ৫৮, ৬১।

AMARBOI.COM

১৯. ব্লেইজ পাসকাল, *পেনসিস* (অনু. এ. জে. ক্রেইলশেইমার; লন্ডন, ১৯৬৬), ২০৯।

২০. জন লক, *লেটার কনসার্নিং টলারেশন* (ইন্ডিয়ানোপলিস, ইন্ড., ১৯৫৫)।

২১. জন টোল্যান্ড, *ক্রিশ্চানিটি নট মিস্টেরিয়াস* (১৬০৬), জারোস্লাভ পেলিক্যানের *দ্য ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশন*-এ, ৫ম, *ক্রিশ্চান ডক্ট্রিন অ্যান্ড মডার্ন কালচার (সিন্স ১৭০০)* (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৮৯), ৬৬-৬৯।

২২. প্রাগুক্ত, ১০১।

২৩. ইম্যানুয়েল কান্ট, 'হোয়াট ইজ এনলাইটেনমেন্ট?' *অন হিস্ট্রি*-তে, (সম্পা. লুইস বেক হোয়াইট; ইন্ডিয়ানাপেলিস, ইন্ড., ১৯৬৩), ৩।

২৪. টারনাস, *দ্য প্যাশন অভ দ্য ওয়েস্টার্ন মাইন্ড*, ৩৪১-৪৮।

২৫. ইম্যানুয়েল কান্ট, *রিলিজিয়ন উইদিন দ্য লিমিটস অভ রিজন অ্যালোন* (১৭৯৩)।

২৬. ইম্যানুয়েল কান্ট, *ক্রিটিক অভ প্র্যাকটিক্যাল রিজন* (১৭৮৮)।

২৭. প্যাট্রিক মাস্টারসন, *অ্যাথিজম অ্যান্ড এলিয়েনেশন: আ স্টাডি অভ দ্য ফিলোসফিক সোর্সেস অভ কনটেম্পোরারি অ্যাথিজম* (ডাবলিন, ১৯৭১), ৩০।

২৮. নরমান কোন, *ইউরোপ'স ইনার ডেমনস* (লন্ডন, ১৯৭৬)।

২৯. নরমান কোন, *দ্য পারস্যুট অভ দ্য মিলেনিয়াম: রিভোল্যুশনারি মিলেনারিয়ানস অ্যান্ড মিস্টিক্যাল অ্যানারকিস্টস অভ দ্য মিডল এজেস* (লন্ডন, ১৯৫৭), ৩০৩–১৮।

৩০. ডেভিড এস. লাভজয়, *রিলিজিয়াস এনথুসিয়াজম ইন দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড: হেরেসি টু রিভোল্যুশন* (ক্যামব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৮৫), ৬৭-৯০।

৩১. প্রাগুক্ত, ৬৯।

৩২. প্রাগুক্ত, ১১২।

৩৩. পেলিক্যান, *ক্রিশ্চান ডক্ট্রিন অ্যান্ড মডার্ন কালচার*, ১১৮।

৩৪. জন বাটলার, *অ্যাওয়াশ ইন আ সি অভ ফেইথ, ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড দ্য আমেরিকান পিপল* (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৯০), ৩৬–৬৬।

৩৫. প্রাগুক্ত, ৯৮–১২৮।

৩৬. লাভজয়, *রিলিজিয়াস এনথুসিয়াজম ইন দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড*, ১১৩।

৩৭. আর. সি. লাভলেস, 'পিউরিটান স্পিরিচুয়ালিটি: দ্য সার্চ ফর আ রাইটলি রিফর্মড চার্চ,' লুইস দুপ্রে ও ডন ই. স্যালিয়ার্স (সম্পা.), *ক্রিশ্চান স্পিরিচুয়ালিটি: পোস্ট রিফর্মেশন অ্যান্ড মডার্ন*-এ (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৯), ৩১৩–১৫।

AMARBOI.COM

৩৮. জনাথান এডওয়ার্ডস, 'আ ফেইথফুল ন্যারেটিভ অভ দ্য সারপ্রাইজিং ওয়ার্ক অভ গড ইন নার্থাম্পটন, কানেক্টিকাট,' শেরউড এলিয়ট ওয়ার্ট (সম্পা.), *স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়াকেনিং: ক্লাসিক রাইটিংস অভ দ্য এইটিন্থ সেঞ্চুরি টু ইন্সপায়ার অ্যান্ড হেল্প টুয়েন্টিয়েন্থ সেঞ্চুরি রিডারস*-এ (ট্রিং, ১৯৮৮), ১১০।

৩৯. প্রাগুক্ত, ১১৩।

৪০. রুথ এইচ. ব্লচ, *ভিশনারি রিপাবলিক: মিলেনিয়াল থিমস ইন আমেরিকান থট (১৭৫৬–১৮০০)* (ক্যাম্ব্রিজ, ইউ.কে., ১৯৮৫), ১৪-১৫।

৪১. প্রাগুক্ত, ১৮–২০।

৪২. বাটলার, *অ্যাওয়াশ ইন আ সি অভ ফেইথ*, ১৬০।

৪৩. প্রাগুক্ত, ১৫০।

৪৪. *প্র্যাক্টিক্যাল ডিসকোর্সেস অন দ্য অকেশন অভ দ্য অর্থকোয়েকস, নভেম্বর ১৭৫৫* (বস্টন, ১৭৬০), ৩৬৯-৭০।

৪৫. *সেভেন ডিসকোর্সেস* (পোর্টসমাউথ, ১৭৫৬), ১৬৮।

৪৬. ব্লচ, *ভিশনারি রিপাবলিক*, ৩৭-৫৮।

৪৭. প্রাগুক্ত, ৬০-৬১।

৪৮. বাটলার, *অ্যাওয়াশ ইন আ সি অভ ফেইথ*, ২১৮–২৬।

৪৯. ব্লচ, *ভিশনারি রিপাবলিক*, ৭৭-৮৫।

৫০. প্রাগুক্ত, ৬৫-৬৭।

৫১. বাটলার, *অ্যাওয়াশ ইন আ সি অভ ফেইথ*, ১৯৮।

৫২. ব্লচ, *ভিশনারি রিপাবলিক*, ৮১-৮৮।

৫৩. *আ ভ্যালেডেক্টরি অ্যাড্রেস টু দ্য ইয়াং জেন্টলমেন হু কমেন্সড ব্যাচেলরস অভ আর্টস, জুলাই ২৫*, ১৭৭৬ (নিউ হাভেন, কন., ১৭৭৬), ১৪।

৫৪. লাভজয়, *রিলিজিয়াস এনথুসিয়াজম ইন দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড*, ২২৬।

৫৫. প্রাগুক্ত।

৫৬. টমাস পেইন, *কমন সেন্স অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৫), ৫৯।

৫৭. ব্লচ, *ভিশনারি রিপাবলিক*, ৫৫।

৫৮. প্রাগুক্ত, ৬০-৬৩।

৫৯. প্রাগুক্ত, ২৯, ৩১।

৬০. বাটলার, *অ্যাওয়াশ ইন আ সি অভ ফেইথ*, ২৬২–৬৫।

৬১. জন এফ. উইলসন, 'রিলিজিয়ন, গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার ইন দ্য নিউ অমেরিকান নেশন,' মার্ক এ. নোল (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড আমেরিকান*

AMARBOI.COM

পলিটিক্স: ফ্রম দ্য কোলোনিয়াল পিরিয়ড টু দ্য ১৯৮০'স (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯০)।

৬২. বাটলার, *অ্যাওয়াশ ইন আ সি অভ ফেইথ*, ২২২।

৬৩. প্রাগুক্ত, ২১৬।

৬৪. টিমোথি ডিউইট, *দ্য ডিউটি অভ অ্যান আমেরিকান* (নিউ হাভেন, ১৭৯৮), ২৯-৩০।

৬৫. বাটলার, *অ্যাওয়াশ ইন আ সি অভ ফেইথ*, ২১৬।

৬৬. প্রাগুক্ত, ২১৯।

৬৭. হেনরি এস. স্টাউট, 'রেটোরিক অ্যান্ড রিয়েলিটি ইন দ্য আর্লি রিপাবলিক: দ্য কেস অভ দ্য ফেডারেলিস্ট ক্লার্গি,' নোল (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড আমেরিকান পলিটিক্স*-এ, ৬৫–৬৬, ৭৫।

৬৮. নাথান ও. হাচ, *দ্য ডেমোক্রেটাইজেশন অভ আমেরিকান ক্রিশ্চানিটি* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৯), ২২।

৬৯. প্রাগুক্ত, ২৫–১২৯।

৭০. প্রাগুক্ত, ৬৮-১৫৭।

৭১. প্রাগুক্ত, ৯।

৭২. প্রাগুক্ত, ৩৬-৩৭, ৬৮-৭১।

৭৩. প্রাগুক্ত, ১১৫-২০।

৭৪. প্রাগুক্ত, ১৩৮–৩৯।

৭৫. প্রাগুক্ত, ৭১।

৭৬. প্রাগুক্ত, ৫৭।

৭৭. পল বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বী নো মোর: প্রফিসি বিলিফ ইন মডার্ন আমেরিকান কালচার* (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৯২), ৮৩-৮৪।

৭৮. প্রাগুক্ত, ৮৩।

৭৯. প্রাগুক্ত, ৮২।

৮০. ডেনিয়েল ওয়াকার হাউই, 'রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন দ্য অ্যান্টিবেলাম নর্থ,' নোল (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড আমেরিকান পলিটিক্স*-এ, ১৩২–৩৩; জর্জ এম. মার্সডেন, 'আফটারওয়ার্ড,' প্রাগুক্তে, ৩৮২-৮৩।

৮১. রবার্ট পি. সুয়েরেনগা, 'এথনো-রিলিজিয়াস পলিটিকাল বিহেভিয়র ইন দ্য মিড-নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি,' নোল (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড আমেরিকান পলিটিক্স*-এ, ১৫৮; হাচ, *দ্য ডেমোক্রেটাইজেশন অভ আমেরিকান ক্রিশ্চানিটি*, ১৯৮-২০০।

AMARBOI.COM

৮২. রুথ এইচ. ব্লচ, 'রিলিজিয়ন অ্যান্ড আইডিওলজিকাল চেঞ্জ ইন দ্য আমেরিকান রিভোল্যুশন,' নোল (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড আমেরিকান পলিটিক্স*-এ, ৫৫-৫৬।

৮৩. বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বী নো মোর*, ৮২।

৮৪. রবার্ট সি. ফুলার, *নেমিং দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট: দ্য হিস্ট্রি অভ অ্যান আমেরিকান অবসেশন* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫), ৯৫।

৮৫. সুয়েরেনগা, 'এথনো-রিলিজিয়াস পলিটিকাল বিহেভিয়র,' ১৫৯-৬০; মার্সডেন, 'আফটারওয়ার্ড', ২৮৩–৮৪।

৮৬. হাউই, 'রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন দ্য অ্যান্টিবেলাম নর্থ,' ১২৫–২৮; সুয়েরেনগা, 'এথনো-রিলিজিয়াস পলিটিক্যাল বিহেভিয়র,' ১৫২–৫৮।

৮৭. বাটলার, *অ্যাওয়াশ ইন আ সি অভ ফেইথ*, ২৭০।

৮৮. *দ্য এসেন্স অভ ক্রিস্চানিটি* (অনু. জর্জ এলিয়ট; নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭), ৩৩।

৮৯. কার্ল মার্ক্স, 'ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিকাল ম্যানুস্ক্রিপ্টস,' *কার্ল মার্ক্স: আর্লি রাইটিংস*-এ, (অনু. ও সম্পা. টি. বি. বোরোমোর; লন্ডন, ১৯৬৩), ১৬৬–৬৭।

৯০. জেমস আর. মুর, 'জিওলজিস্টস অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটারস অভ জেনেসিস ইন দ্য নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি,' লিন্ডবার্গ ও নাম্বারস (সম্পা.), *গড অ্যান্ড নেচার*-এ, ৩৪১–৪৩।

৯১. *এসেজ অ্যান্ড রিভিউজ*, ৪র্থ সংস্ক., (লন্ডন, ১৮৬১)।

৯২. ওয়েন চ্যাডউইক, *দ্য সেক্যুলারাইজেশন অভ দ্য ইউরোপিয়ান মাইন্ড ইন দ্য নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি* (ক্যাম্ব্রিজ, ইউ.কে., ১৯৭৫), ১৬১–৮৮।

৯৩. পিটার গে, *আ গডলেস জু: ফ্রয়েড, অ্যাথিজম অ্যান্ড দ্য মেকিং অভ সাইকোঅ্যানালিসিস*-এ উদ্ধৃত (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৭), ৬–৭।

৯৪. টি.এইচ. হাক্সলি, *সায়েন্স অ্যান্ড ক্রিস্চান ট্র্যাডিশন* (নিউ ইয়র্ক, ১৮৯৬), ১২৫।

৯৫. ফ্রেডেরিখ নিৎশে, *দ্য গে সায়েন্স* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৪), ১৮১।

৯৬. প্রাগুক্ত।

৪. ইহুদি ও মুসলিম: আধুনিক হলো (১৭০০–১৮৭০)

১. পল জনসন, *আ হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ* (লন্ডন, ১৯৮৭), ৩০৯।

২. ইরমানিয়াহু ইয়োভেল, *ডার্ক রিডল: হেগেল, নিৎশে অ্যান্ড দ্য জুজ* (ক্যাম্ব্রিজ, ইউ.কে., ১৯৯৮), ৩-২০, ৮৩-৯৭।

AMARBOI.COM

৩. 'অন দ্য জুইশ কোয়েশ্চেন,' *কার্ল মার্ক্স: আর্লি রাইটিংস*-এ (অনু. ও সম্পা. টি.বি. বোরোমোর; লন্ডন, ১৯৬৩)।

৪. বেনযিয়ন দিনুর, 'দ্য অরিজিন্স অভ হাসিদিজিম অ্যান্ড ইটস সোশ্যাল অ্যান্ড মেসিয়ানিক ফাউন্ডেশনস,' গার্শোম ডেভিড হানদার্ত (সম্পা.), *এসেনশিয়াল পেপারস অন হাসিদিজম: অরিজিন্স টু প্রেজেন্ট* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯১), ৮৬–১৬১।

৫. সিমন ডাবনাও, 'দ্য ম্যাগিদ অভ মিয়েদযাইরযেক্য, হিজ অ্যাসোসিয়েটস অ্যান্ড দ্য সেন্টার ইন ভোলহিনিয়া', হানদার্ত, *এসেনশিয়াল পেপারস*-এ, ৫৮।

৬. গার্শোম শোলেম, 'দ্য নিউট্রালাইজেশন অভ মেসিয়ানিজম ইন আর্লি হাসিদিজম', *দ্য মেসিয়ানিক আইডিয়া অ্যান্ড আদার এসেজ অন জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১), ১৮৯–২০০; 'দেভেকুত অর কমিউনিয়ন উইদ গড,' প্রাগুক্তে, ২০৩–৩৭; লুইস জ্যাকবস, 'দ্য আপলিফটিং অভ দ্য স্পার্ক্স ইন লেটার জুইশ মিস্টিসিজম,' আর্থার গ্রিন (সম্পা.), *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, ২ খণ্ড (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৮৬, ১৯৮৮), ২য়, ১১৬–২৫; জ্যাকবস, 'হাসিদিক প্রেয়ার,' হানদার্ত, *এসেনশিয়াল পেপারস*-এ, ৩৩০–৪৮।

৭. বেনযিয়ন দিনুর, 'দ্য মেসিয়ানিক-প্রফেটিক রোল অভ দ্য বা'ল শেম তোভ,' মার্ক সেপারস্তেইন (সম্পা.), *এসেনশিয়াল পেপারস অন মেসিয়ানিক মুভমেন্টস ইন জুইশ হিস্ট্রি* (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯২), ৩৭৮–৮০।

৮. ডাবনাও, 'দ্য ম্যাগিদ অভ মিয়েদযাইরযেক্য,' ৬৫।

৯. প্রাগুক্ত, ৬১।

১০. শোলেম, 'দ্য নিউট্রালাইজেশন অভ মেসিয়ানিজম ইন আর্লি হাসিদিজম,' ১৯৬–৯৮।

১১. লুইস জ্যাকবস (সম্পা.), *দ্য জুইশ মিস্টিকস* (লন্ডন, ১৯৯০; নিউ ইয়র্ক, ১৯৯১), ২০৮–১৫।

১২. 'হাবাদ' পরিভাষাটি তিনটি কাব্বালিস্টিক স্বর্গীয় গুণাবলীর সমন্বয়ে তৈরি সংক্ষিপ্ত রূপ: *হোখমাহ* (প্রজ্ঞা), *বিনাহ* (বুদ্ধিমত্তা) ও *দা'ত* (জ্ঞান)।

১৩. র‍্যাচেল এলিয়র, 'হাবাদ: দ্য কনটেমপ্লেটিভ অ্যাসেন্ট টু গড,' গ্রিন (সম্পা.), *জুইশ স্পিরিচুয়ালিটি*-তে, ২য়, ১৫৮–২০৩।

১৪. জ্যাকবস, 'হাসিদিক প্রেয়ার,' ৩৫০–৫৫।

১৫. জনাথান ম্যাগোনেট, *দ্য এক্সপ্লোরার'স গাইড টু জুদাইজম* (লন্ডন, ১৯৯৮), ১১।

AMARBOI.COM

১৬. ডেভিড রুদাভস্কি, *মডার্ন জুইশ রিলিজিয়াস মুভমেন্টস: আ হিস্টি অভ ইমানসিপেশন অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট*, পরি. সংস্ক. (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৭), ৮৫।

১৭. নরমান ক্যান্টর, *দ্য স্যাক্রেড চেইন, আ হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৪; লন্ডন, ১৯৯৫), ২৩৬–৩৭।

১৮. প্রাগুক্ত, ২৪৭–৪৮।

১৯. ইংল্যান্ডের ইহুদিদের অলিভার ক্রমওয়েল পুনর্বাসিত করেন এবং পরে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে এক আইনি সুপারিশ বলে প্রশাসনিক বৈষম্যের ফলে অন্য 'ভিন্নমতাবলম্বীদের' সাথে আইনি স্বীকৃত দেওয়া হয়।

২০. ক্যান্টর, *দ্য স্যাক্রেড চেইন*, ২৪১–৫৬।

২১. রুদাভস্কি, *মডার্ন জুইশ রিলিজিয়াস মুভমেন্টস*, ১৫৭–৬৪।

২২. প্রাগুক্ত, ২৮৬–৮৭।

২৩. প্রাগুক্ত, ২৯০।

২৪. জুলিয়াস গাতমান, *ফিলোসফিজ অভ জুদাইজম, দ্য হিস্ট্রি অভ জুইশ ফিলোসফি ফ্রম বিবলিকাল টাইমস টু ফ্রানয রোজেনভিগ* (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৪), ৩০৮–৫১।

২৫. রুদাভস্কি, *মডার্ন জুইশ রিলিজিয়াস মুভমেন্টস*, ১৮৮, ১৯৪–৯৫, ২০১–০৪।

২৬. প্রাগুক্ত, ২১৮–১৯।

২৭. স্যামুয়েল সি. হেইলমান ও মেনাচেম ফ্রেইডমান, 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টলিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড* (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯১), ২১১–১৫; চার্লস সেলেনগাত, 'বাই তোরাহ অ্যালোন: ইয়েশিভা ফান্ডামেন্টালিজম ইন জুইশ লাইফ,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *অ্যাকাউন্টিং ফর ফান্ডামেন্টালিজমস* (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৪), ২৩৯–৪১; মেনাচেম ফ্রেইডমান, 'হাবাদ অ্যাজ মেসিয়ানিক ফান্ডামেন্টালিজম,' প্রাগুক্তে, ২০১।

২৮. হাইম সোলোভেইতচিক, 'মাইগ্রেশন, অ্যাকাল্টুরেশন অ্যান্ড দ্য নিউ রোল অভ টেক্সট,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *অ্যাকাউন্টিং ফর ফ্যান্ডামেন্টালিজমস*, ৩৩৩-৩৪।

২৯. রুদাভস্কি, *মডার্ন জুইশ রিলিজিয়াস মুভমেন্টস*, ২১৯-৪৩।

৩০. অ্যান্ড্রু এ. প্যাটন, *আ হিস্ট্রি অভ দ্য ইজিপশিয়ান রিভোল্যুশন*, ২ খণ্ড, (ট্রোবনার, জার্মানি, ১৮৭৬), ১ম, ১০৯–১১।

৩১. জর্জ অ্যানেসলি, *দ্য রাইজ অভ মডার্ন ইজিপ্ট: আ সেঞ্চুরি অ্যান্ড আ হাফ অভ ইজিপশিয়ান হিস্ট্রি* (ডারহাম, ইউ.কে., ১৯৯৪), ৭।

AMARBOI.COM

৩২. গ্যাস্টন ওয়েইট, (সম্পা. ও অনু.), *নিকোলাস তার্ক, ক্রোনিক ডি'ইজিপতে: ১৭৯৮-১৮০৪* (কায়রো, ১৯৫০), ৭৮।

৩৩. ইয়োসেফ এম. চৌয়েরি, *ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম* (লন্ডন, ১৯৯০), ১৯।

৩৪. আরাফ লুতফি আল-সায়ীদ মারসত, 'দ্য উলেমা অভ কায়রো ইন দ্য এইটিন্থ অ্যান্ড নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিজ,' নিক্কি আর. কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্টস অ্যান্ড সুফিস: মুসলিম রিলিজিয়াস ইন্সটিটিউশনস ইন দ্য মিডল ইস্ট সিন্স ১৫০০* (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৭২), ১৬১-৬২; ড্যানিয়েল ক্রেসিলিয়াস, 'ননআইডিওলজিকাল রেসপন্সেস অভ দ্য ইজিপশিয়ান উলেমা টু মর্ডানাইজেশন,' প্রাগুক্তে, ১৭৩–৭৫।

৩৫. বাসাম তিবি, *আরব ন্যাশনালিজম, আ ক্রিটিকাল এনকোয়ারি*, ২য় সংস্ক., (অনু. মারিওন ফারুক স্লাগলেত ও পিটার স্লাগলেত; লন্ডন, ১৯৯০), ৮২।

৩৬. মারসত, 'দ্য উলেমা অভ কায়রো,' ১৬২।

৩৭. অ্যানেসলি, *দ্য রাইজ অভ মডার্ন ইজিপ্ট*, ২৮–৩৮।

৩৮. প্রাগুক্ত, ৫১–৫৬।

৩৯. প্রাগুক্ত, ৫৭–৫৯।

৪০. প্রাগুক্ত, ৫৯–৬০।

৪১. প্রাগুক্ত, ৬২।

৪২. মারসত, 'দ্য রোল অভ দ্য উলেমা ইন ইজিপ্ট ডিউরিং দ্য আর্লি নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি,' পি.এম. হোল্ট (সম্পা.), *পলিটিকাল অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ ইন মডার্ন ইজিপ্ট: হিস্ট্রিকাল স্টাডিজ ফ্রম দ্য অটোমান কনকোয়েস্ট টু দ্য ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক* (লন্ডন, ১৯৬৮), ২২৭–২৮।

৪৩. অ্যানেসলি, *দ্য রাইজ অভ মডার্ন ইজিপ্ট*, ৬১।

৪৪. আলি মুবারিকের এক জরিপ থেকে, ক্রেসিলিয়াসের 'ননআইডিওলজিকাল রেসপন্সেস অভ দ্য ইজিপশিয়ান উলেমা,' ১৮১–৮২।

৪৫. প্রাগুক্ত, ১৮০–৮৯; মারসত, 'দ্য রোল অভ দ্য উলেমা,' ২৭৮–৭৯।

৪৬. অ্যালবার্ট হুরানি, *অ্যারাবিক ইন দ্য লিবারেল এজ*, ১৭৯৮–১৯৩৯ (অক্সফোর্ড, ১৯৬২), ৪২–৪৩।

৪৭. প্রাগুক্ত, ৪৬–৪৯।

৪৮. অ্যানেসলি, *দ্য রাইজ অভ মডার্ন ইজিপ্ট*, ১২৯–৪১, ১৫২।

৪৯. প্রাগুক্ত, ১৪৭।

৫০. প্রাগুক্ত, ১৫৩–৫৫।

AMARBOI.COM

৫১. জেরার্দ দে নর্বাল, *অব্রেস* (সম্পা. অ্যালবার্ট বেগিন ও জাঁ রিখটার; প্যারিস, ১৯৫২), ৮৯৫ ।

৫২. মাইকেল জাইলসনান, *রিকগনাইজিং ইসলাম: রিলিজিয়ন অ্যান্ড সোসায়েটি ইন দ্য মডার্ন মিডল ইস্ট* (লন্ডন, ১৯৯০), ১৯৯ ।

৫৩. প্রাগুক্ত, ১৯৮–২০১ ।

৫৪. নিক্কি আর. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন: অ্যান ইন্টারপ্রেটিভ হিস্ট্রি অভ মডার্ন ইরান* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮১), ৩৭-৩৮ ।

৫৫. প্রাগুক্ত, ২৫, ৩৮-৩৯, ৪২-৪৩; কেদ্দি, 'দ্য রুটস অভ দ্য উলেমা'স পাওয়ার ইন মডার্ন ইরান,' কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্টস অ্যান্ড সুফিজ*, ২১৪–১৫ ।

৫৬. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ৪৪–৪৭, ৫৬–৬৩ ।

৫৭. হুয়ান আর. কোল, 'ইমামি জুরিসপ্রুডেন্স অ্যান্ড দ্য রোল অভ দ্য উলেমা: মোরতাযা আনসারি অন ইমোলিউয়েটিং দ্য সুপ্রিম এক্সাম্পলার,' কেদ্দি (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইরান: শিয়াজম ফ্রম কোয়াইটিজম টু রিভোল্যুশান-*এ (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৩), ৪১ ।

৫৮. জে.এম. তানকোয়েন, *আ ন্যারেটিভ অভ আ জার্নি ইনটু পারসিয়া অ্যান্ড রেসিডেন্স ইন তেহরান* (অনু. উইলিয়াম রাইট, লন্ডন, ১৮২০), ১৯৬–২০১ ।

৫৯. উইলিয়াম বীম্যান, 'কালচারাল ডাইমেনশান অভ পারফরম্যান্স কনভেনশনস ইন ইরানিয়ান তাযিয়াহ,' পিটার জে. চেলকোওস্কি (সম্পা.), *তাযিয়াহ, রিচুয়াল অ্যান্ড ড্রামা ইন ইরান*-এ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৯), ২৬ ।

৬০. মাইকেল জে. ফিশার, *ইরান: ফ্রম রিলিজিয়াস ডিসপিউট টু রিভোল্যুশন* (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৮০), ২০, ১৭৬ ।

৬১. মার্শাল জি. এস. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম: কনশিয়েন্স ইন আ ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন*, ৩ খণ্ড। (শিকাগো ওলন্ডন, ১৯৭৪), ৩য়, ১৫৫ । মঙ্গোল বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট: সোশিও রিলিজিয়াস থটস ইন কাজার ইরান* (সিরাক্রুজ, এন.ওয়াই., ১৯৮২), ৩৭–৫৮ ।

৬২. বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ৬০-৮৬ ।

৬৩. প্রাগুক্ত, ৮৭–৯১ ।

৬৪. প্রাগুক্ত, ৯০-৯৭, ১০১–০৯ ।

৬৫. প্রাগুক্ত, ৯৭–১০০ ।

৬৬. প্রাগুক্ত, ১১০–১৬ ।

৬৭. প্রাগুক্ত, ১১৮–২৫ ।

৬৮. প্রাগুক্ত, ১২৭–২৯ ।

AMARBOI.COM

৫. যুদ্ধরেখা (১৮৭০—১৯০০)

১. জর্জ স্টেইনার, *ইন ব্লুবিয়ার্ড'স ক্যাসল: সাম নোটস টুওয়ার্ড দ্য রি-ডিফিনিশন অভ কালচার* (নিউ হাভেন, কন., ১৯৭১), ১৭-২৭।

২. উইলিয়াম ব্লেক, *মিল্টন*, ভূমিকা।

৩. স্টেইনার, *ইন ব্লুবিয়ার্ড'স ক্যাসল*, ২৩-২৪।

৪. আই.এফ. ক্লার্ক, *ভয়েসেস প্রফেসাইসিং ওয়ার: ফিউচার ওয়ারস ১৭৬৩-৩৭৪৯*, পরি. সংস্ক. (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯২), ৩৭-৮৮।

৫. চার্লস রয়েস্টার, *দ্য ডেস্ট্রাকটিভ ওয়ার: উইলিয়াম টেকুমসেহ শেরম্যান, স্টোনওয়েল জ্যাকসন অ্যান্ড দ্য আমেরিকানস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৯১), ৮২।

৬. অ্যালান টি. নোলান, *লী কনসিডার্ড: জেনারেল রবার্ট ই. লী অ্যান্ড সিভিল ওয়ার হিস্ট্রি* (চ্যাপেল হিল, এন.সি., ১৯৯১), ১১২-৩৩; চার্লস বি. স্ট্রযিয়ার, *অ্যাপোক্যালিপস: অন দ্য সাইকোলজি অভ ফান্ডামেন্টালিজম ইন আমেরিকা* (বস্টন, ১৯৯৪), ১৭৩—৭৪, ১৭৭।

৭. রবার্ট সি. ফুলার, *নেমিং দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট: দ্য হিস্ট্রি অভ আমেরিকান অবসেশন* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫), ১১১, ১৪৮।

৮. পল বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বী নো মোর: প্রোফিসি বিলিফ ইন মডার্ন আমেরিকান কালচার* (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৯২), ৮৭-৯০; জর্জ এম. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার: দ্য শেপিং অভ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ইভাঞ্জেলিজম, ১৮৭০-১৯২৫* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮০), ৫০-৫৫; স্ট্রযিয়ার, *অ্যাপোক্যালিপ্স*, ১৮৩-৮৫।

৯. ২ থেসালোনিয়ানস ২: ৩-৮।

১০. ১ থেসালোনিয়ানস ৪: ১৬।

১১. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ৫৭—৬৩।

১২. প্রাগুক্ত, ১৪-১৭; ন্যান্সি আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড*-এ (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯১), ৮—১২।

১৩. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ৫৫।

১৪. জোহানেস স্লোয়েক, *ডিভোশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ* (অনু. হেনরিক মোসিন; বার্লিন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৬), ৮৩।

১৫. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ১১০—১৭।

১৬. 'ইন্সপিরেশন,' *প্রিন্সটন রিভিউ* ২, এপ্রিল ১১, ১৮৮১।

AMARBOI.COM

১৭. বেনিয়ামিন বি. ওয়ারফেল্ড, *সিলেক্টেড শর্টার রাইটিংস অভ বেনিয়ামিন বি. ওয়ারফেল্ড*, ২ খণ্ড। (সম্পা. জন বি. মীবার; নাটলি, এন.জে., ১৯০২), ২য়, ৯৯–১০০।

১৮. চার্লস হজ, *হোয়াট ইজ ডারউইনিজম?* (প্রিন্সটন, এন.জে., ১৮৭৪), ১৪২।

১৯. প্রাগুক্ত, ৬০।

২০. প্রাগুক্ত, ১৩৯।

২১. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ২২–২৫; ফুলার, *নেমিং দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট*, ১১১–১২।

২২. ফেরেনক মরটন সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড অভ প্রটেস্ট্যান্ট আমেরিকা, ১৮৮০-১৯৩০* (ইউনিভার্সিটি, আলা., ১৯৮২), ১৬–৩৪; ৩৭–৪১; আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ১১–১২।

২৩. মিসেস হাম্পফ্রি ওয়ার্ড, *রবার্ট এলসমেয়ার* (লিঙ্কন, নেব., ১৯৬৯), ৪১৪।

২৪. *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, এপ্রিল ৫, ১৮৯৪।

২৫. প্রাগুক্ত, ফেব্রুয়ারি ১, ১৮৯৭।

২৬. প্রাগুক্ত, এপ্রিল ১৮, ১৮৯৯।

২৭. *ইউনিয়ন সেমিনারি ম্যাগাজিন*, ১৯, ১৯০৭–৮।

২৮. সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ২৪, ৩৫–৪১।

২৯. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ৩০, ৭৮; বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বী নো মোর*, ৯৩।

৩০. সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ৭৫।

৩১. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ১২।

৩২. ফুলার, *নেমিং দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট*, ৯৮–৯৯।

৩৩. যিগমান্ত বওম্যান, *মডার্নিটি অ্যান্ড দ্য হলোকাস্ট* (ইথাকা, এন.ওয়াই., ১৯৮৯), ৪০–৭৭।

৩৪. পল জনসন, *আ হিস্ট্রি অভ দ্য জুজ* (লন্ডন, ১৯৮৭), ৩৬৫।

৩৫. প্রাগুক্ত, ৩৮০।

৩৬. মেনাচেম ফ্রেইডমান, 'হাবাদ অ্যাজ মেসিয়ানিক ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *অ্যাকাউন্টিং ফর ফান্ডামেন্টালিজমস* (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৪), ৩৩৫–৩৬।

৩৭. আর্থার হার্টযবার্গ, *দ্য যায়নিস্ট আইডিয়া* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৯), ১০৬।

AMARBOI.COM

৩৮. আভিয়েযার রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম, যায়নিজম, অ্যান্ড জুইশ রিলিজিয়াস রেডিক্যালিজম* (অনু. মাইকেল সুইরস্কি ও জনাথান চিপম্যান; শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১৬–১৮।

৩৯. প্রাগুক্ত, ২২–২৫, ৪৯।

৪০. লরেন্স জে. সিলবারস্তেইন, 'রিলিজিয়ন, আইডিওলজি, মডার্নিটি, থিওরেটিকাল ইস্যুজ ইন দ্য স্টাডি অভ জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম,' সিলবারস্তেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পারসপেক্টিভ: রিলিজিয়ন, আইডিওলজি অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অভ মডার্নিটি* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১৩–১৫।

৪১. মঙ্গোল বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট: সোশিওরিলিজিয়াস থট ইন কাজার ইরান* (সিরাক্রুজ, এন.ওয়াই., ১৯৮২), ১৩৩–৭৮।

৪২. সাদ কিতাবা, চিঠি ৩৭, বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ১৬০।

৪৩. পাহারথনা ইযিরাত, প্রাগুক্তে, ১৬১।

৪৪. বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ৪৪।

৪৫. কুহনিখানি ই-সিরাত, বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ১৬১।

৪৬. বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ১৭৪–৭৯।

৪৭. নিক্কি আর. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন: অ্যান ইন্টারপ্রেটিভ হিস্ট্রি অভ ইরান* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৮১), ৬৬–৬৭।

৪৮. অ্যালবার্ট হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ, ১৭৯৮–১৯৩৯* (অক্সফোর্ড, ১৯৬২), ৬৯–১০৯; বাসাম তিবি, *দ্য ক্রাইসিস অভ পলিটিকাল ইসলাম: আ প্রি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালচার ইন দ্য সায়েন্টিফিক টেকনোলজিকাল এজ* (সল্ট লেক, ইউটাহ, ১৯৮৮), ১০৩–৪; তিবি, *আরব ন্যাশনালিজম, আ ক্রিটিকাল এনকোয়ারি*, ২য় সংস্ক., (অনু. মারিয়ন ফারুক স্লাগলেত ও পিটার স্লাগলেত; লন্ডন, ১৯৯০), ৮৪–৮৮।

৪৯. হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ*, ৬৯।

৫০. অ্যালবার্ট হুরানি, *আ হিস্ট্রি অভ দ্য আরব পিপলস* (লন্ডন, ১৯৯১), ৩০৪–০৫।

৫১. হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ*, ৭৭–৭৮।

৫২. প্রাগুক্ত, ৮১।

৫৩. প্রাগুক্ত, ১৯৫-৯৭, ২৪৫–৫৯; তিবি, *আরব ন্যাশনালিজম*, ৯৯–১০৫।

৫৪. নিক্কি আর. কেদ্দি, *ইসলামিক রেসপন্স টু ইম্পেরিয়ালিজম: পলিটিকাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস রাইটিংস অভ সায়ীদ জামাল আল-দিন 'আল-আফগানি'* (বার্কলি,

AMARBOI.COM

১৯৬৮); বায়াত, *মিস্টসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ১৩৪–৪৮; হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ*, ১০৮–৯২; মাজিদ ফাখরি, *আ হিস্ট্রি অভ ইসলামিক ফিলোসফি* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৭০), ৩৭২–৭৫।

৫৫. হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ*, ১২৭–২৮।

৫৬. তিবি, *দ্য ক্রাইসিস অভ পলিটিকাল ইসলাম*, ৭০।

৫৭. হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ*, ১২৩–২৪।

৫৮. প্রাগুক্ত, ১২৬; বায়াত, *মিস্টিজিম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ১৪৮।

৫৯. কেদ্দি, *ইসলামিক রেসপন্স টু ইম্পেরিয়ালিজম*, ১৮৭।

৬০. তিবি, *দ্য ক্রাইসিস অভ পলিটিকাল ইসলাম*, ৯০।

৬১. বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট*, ১৪৭।

৬২. কোরান ১৩: ১১।

৬৩. ই. কেদুরি, *আফগানি অ্যান্ড আব্দুহ: অ্যান এসে অন রিলিজিয়াস আনবিলিফ অ্যান্ড পলিটিকাল অ্যাক্টিভিজম ইন মডার্ন ইসলাম* (লন্ডন, ১৯৬৬), ৪৫।

৬৪. আর্নস্ট রেনান, *হিস্তোরি জেনেরেলে এত সিস্তেরেম কম্প্যারে দেস ল্যাঙ্গুয়েস সেমিতিক্স* (সম্পা. এইচ. পিসিয়ারি; প্যারিস, ১৯৫৫), ১৪৫–৪৬; রেনান, *ল'ইসলামিসমে এত লা সায়েন্স* (প্যারিস, ১৮৮৩)।

৬৫. *দ্য ফিলোসফি অভ ল*, অনুচ্ছেদ ২৪৭, ২৪৮।

৬৬. মার্শাল জি.এস.হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম: কনশিয়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন আ ওয়ার্ল্ড অভ সিভিলাইজেশন*, ৩ খণ্ড (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৭৪), ৩য়, ২০৮; তিবি, *দ্য ক্রাইসিস অভ পলিটিকাল ইসলাম*, ১–২৫।

৬৭. ইভেলিন ব্যারিং, লর্ড ক্রোমার, *মডার্ন ইজিপ্ট*, ২ খণ্ড (নিউ ইয়র্ক, ১৯০৮), ২য়, ১৪৬–৪৭।

৬৮. প্রাগুক্ত, ২য়, ১৮৪।

৬৯. ইয়োসেফ এম. চৌয়েরি, *ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম* (লন্ডন, ১৯৯০), ৩৬।

৭০. ফাখরি, *আ হিস্ট্রি অভ ইসলামিক ফিলোসফি*, ৩৭৬–৮১; তিবি, *আরব ন্যাশনালিজম*, ৯০–৯৩; হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ*, ১৩০–৬১; হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম*, ৩য়, ২৭৪–৭৬।

৭১. হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ*, ১৩১–৩২।

৭২. জর্জ অ্যানেসলি, *দ্য রাইজ অভ মডার্ন ইজিপ্ট: আ সেঞ্চুরি অ্যান্ড আ হাফ অভ ইজিপশিয়ান হিস্ট্রি*, ১৭৯৮–১৯৫৭, (ডারহাম, ইউ.কে., ১৯৯৪), ৩০৮–০৯।

৭৩. হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ*, ১৩৭।

৭৪. প্রাগুক্ত, ১৪৪।

AMARBOI.COM

৭৫. প্রাগুক্ত, ১৩৭–৩৯।

৭৬. প্রাগুক্ত, ১৫৪–৫৫।

৭৭. লেইলা আহমেদ, *উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার ইন ইসলাম: হিস্ট্রিকাল রুটস অভ আ মডার্ন ডিবেট* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৯২), ১৬০।

৭৮. প্রাগুক্ত, ১৩৯–৪০।

৭৯. প্রাগুক্ত, ১৪৪–৫৬।

৮০. ব্যারিং, *মডার্ন ইজিপ্ট*, ২য়, ১৩৪, ১৫৫, ৫৩৮–৩৯।

৮১. আহমেদ, *উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার ইন ইসলাম*, ১৫৪।

৮২. প্রাগুক্ত, ১৬০–৬১।

৮৩. প্রাগুক্ত, ১৬৩–৬৭।

৬. *মৌলবিষয় (১৯০০–২৫)*

১. ডব্লু.বি. ইয়েটস, 'দ্য সেকেন্ড কামিং,' ৩–৮।

২. পিটার গে, *আ গডলেস জু: ফ্রয়েড, অ্যাথিজম অ্যান্ড দ্য মেকিং অভ সাইকোঅ্যানালিসিস* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৭), ৩৯–৫০।

৩. রবার্ট টি. হ্যান্ডি, 'প্রটেস্ট্যান্টট থিওলজিক্যাল টেনশনস অ্যান্ড পলিটিকাল স্টাইলস ইন দ্য প্রগ্রেসিভ পিরিয়ড,' মার্ক এ. নোল (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড আমেরিকান পলিটিক্স: ফ্রম দ্য কলোনিয়াল পিরিয়ড টু দ্য ১৯৮০'স* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯০), ২৮২–৮৮।

৪. *ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড দ্য সোশ্যাল অর্ডার* (নিউ ইয়র্ক, ১৯১২), ৪৫৮।

৫. ফেরেন্ক মর্টন সযাসয়, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড অভ প্রটেস্ট্যান্ট আমেরিকা, ১৮৮০–১৯৩০* (ইউনিভার্সিটি, আলা., ১৯৮২), ৪২–৫৫।

৬. প্রাগুক্ত, ৫৬–৫৭।

৭. চার্লস ও. এলিওট, 'দ্য ফিউচার অভ রিলিজিয়ন,' *হার্ভার্ড থিওলজিকাল রিভিউ* ২০, ১৯০৯।

৮. জর্জ এম. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার: দ্য শেপিং অভ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ইভাঞ্জেলিজম, ১৮৭০–১৯২৫* (নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৮০), ১১৭–২২।

৯. সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ৭৮–৮১; ন্যান্সি টি. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড*-এ, (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৭৪), ২২।

AMARBOI.COM

১০. দানিয়াল, ১১: ১৫; জেরেমিয়াহ ১: ১৪।

১১. রবার্ট সি. ফুলার, *নেমিং দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট: দ্য হিস্ট্রি অভ অ্যান আমেরিকান অবসেশন* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫), ১১৫–১৭; পল বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বী নো মোর: প্রফিসি বিলিফ ইন মডার্ন আমেরিকান কালচার* (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস. ও লন্ডন, ১৯৯২), ১০১–০৫; মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ১৪১–৪৪, ১৫০, ১৫৭, ২০৭–১০।

১২. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ৯০–৯২; ফুলার, *নেমিং দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট*, ১১৯। প্রিমিলেনিয়ালিস্ট ছিলেন না উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ানের মতো এমন প্রেসবিটারিয়ানরা, একে ঈশ্বরের চোখে মানুষের সাম্য তুলে ধরা কালভিনিয় সাফল্য মনে করে গণতন্ত্র সম্পর্কে আরও আশাবাদী হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন।

১৩. বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বী নো মোর*, ১৯২; মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ১৫৪–৫৫।

১৪. সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ৮৫।

১৫. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ১৪৭–৪৮।

১৬. সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ৮৬।

১৭. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ১৪৭–৪৮।

১৮. *দ্য কিং'স বিজনেস*, ১৯, ১৯১৮।

১৯. 'আনপ্রিন্সিপলড মেথডস অভ প্রোস্টমিলেনিয়ালিস্টস,' প্রাগুক্তে।

২০. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ১৪৭।

২১. প্রাগুক্ত, ১৬২।

২২. সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ৯১।

২৩. প্রাগুক্ত, ৯৪–৯১।

২৪. *দ্য ওয়াচম্যান-এক্সামিনার*, জুলাই, ১৯২০; ফুলার, *নেমিং দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট*, ১২০।

২৫. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ১৮২–৮৩।

২৬. প্রাগুক্ত, ১৫৭–৬০, ১৬৫-৭৫, ১৮০-৮৪; সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ৯৪–১০০।

২৭. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ১৭১–৭৪।

২৮. সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ১০২।

২৯. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ২৬; মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ১৬৯–৮৩; রোনাল্ড এল.

নাম্বারস, *দ্য ক্রিয়েশনিস্টস: দ্য ইভোল্যুশন অভ সায়েন্টিফিক ক্রিয়েশনিজম* (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস, ও লন্ডন, ১৯৯২), ৪১–৪৪, ৪৮-৫০; সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ১০৭–১৮।

৩০. জে. বন্ডইউনের প্রতি, মার্চ ২৭, ১৯২৩, নাম্বারস, *দ্য ক্রিয়েশনিস্টস*-এ, ৪১।

৩১. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার*, ১৮৪–৮৯; আর. লরেন্স মুর, *রিলিজিয়াস আউটসাইডারস অভ আমেরিকানস* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৬), ১৬০-৬৩; সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ১১৭–৩৫; নাম্বারস, *দ্য ক্রিয়েশনিস্টস*, ৯৮–১০৩।

৩২. *ইউনিয়ন সেমিনারি ম্যাগাজিন*, ৩২ (১৯২২); সযাসয, *দ্য ডিভাইডেড মাইন্ড*, ১১০।

৩৩. 'দ্য ইভোল্যুশন ট্রায়াল,' *ফোরাম*, ৭৪ (১৯২৫)।

৩৪. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড মডার্ন আমেরিকান কালচার*, ১৮৭।

৩৫. প্রাগুক্ত, ১৮৭–৮৮।

৩৬. মুর, *রিলিজিয়াস আউটসাইডারস*, ১৬১–৬৩।

৩৭. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড মডার্ন আমেরিকান কালচার*, ২১৭।

৩৮. *দ্য কিং'স বিজনেস*, ৪০, ১৯২২।

৩৯. দ্য অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস ২: ১–৬।

৪০. জোয়েল, ৩: ১–৫।

৪১. হার্ভে কক্স, *ফায়ার ফ্রম হেভেন: দ্য রাইজ অভ পেন্টাকোস্টাল স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড দ্য রিশেপিং অভ রিলিজিয়ন ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫), ৪৮–৭৪।

৪২. রোমানস ৮: ২৬; কক্স, *ফায়ার ফ্রম হেভেন*, ৮৭।

৪৩. কক্স, *ফায়ার ফ্রম হেভেন*, ৬৩।

৪৪. প্রাগুক্ত, ৭৬–৭৭।

৪৫. প্রাগুক্ত, ৫৭, ৬৯–৭১।

৪৬. প্রাগুক্ত, ৬৩।

৪৭. প্রাগুক্ত, ৬৭।

৪৮. প্রাগুক্ত, ৮১–১২২।

৪৯. প্রাগুক্ত, ৮১।

৫০. 'দ্য অ্যাইস্থেটিকস অভ সাইলেন্স,' *আ সুজান সনতাগ রীডার*-এ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৮২), ১৯৫।

৫১. প্রাগুক্ত; কক্স, *ফায়ার ফ্রম হেভেন*, ৯১–৯২।

AMARBOI.COM

৫২. কক্স, *ফায়ার ফ্রম হেভেন*, ৭৫।

৫৩. অ্যাশার গিন্সবার্গ (আহাদ হা-আম), 'স্লেভারি ইন দ্য মিডস্ট অভ ফ্রিডম,' *কম্প্লিট রাইটিংস* (জেরুজালেম, ১৯৬৫), ১৬০।

৫৪. আমোস এলোন, *দ্য ইসরায়েলিটিস, ফাউন্ডারস অ্যান্ড সান্স*, পরি. সংস্ক., (লন্ডন, ১৯৮৪), ১০৫, ১১২।

৫৫. এলিয়েযার শিউইড, *দ্য ল্যান্ড অভ ইসরায়েল: ন্যাশনাল হোম অর ল্যান্ড অভ ডেস্টিনি* (অনু. ডেবোরাহ গ্রেনিমান; নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৫), ১৫৮।

৫৬. আর্থার হার্যবার্গ (সম্পা.), *দ্য যায়নিস্ট আইডিয়া* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৯), ৩৭৭।

৫৭. আসলে দ্বিতীয় যায়নবাদী কংগ্রেস এই ধরনের কোনও ঘোষণাই দেয়নি, যদিও তা এই সময়ে যায়নবাদে সেক্যুলারিজমের কথা প্রকাশ করে।

৫৮. 'ক্রুকস অভ দ্য নেগেভ,' আভিয়েযার রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম, যায়নিজম অ্যান্ড জুইশ রিলিজিয়াস রেডিক্যালিজম*-এ (অনু. মাইকেল সুইরস্কি ও জনাথান চিপম্যান; শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৩), ৯৫।

৫৯. 'অন যায়ন,' রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ৮৯।

৬০. 'ইউলোজি,' রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ৯৯।

৬১. 'এদার হা ইয়াকেল,' রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ১০৭।

৬২. 'ওরোত,' রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ১০২।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. এম. সোতাহ, ৯: ৭।

৬৫. 'ওরোত,' রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ১০৮।

৬৬. প্রাগুক্ত, ১০৪-১১।

৬৭. 'আর্পেল্লি তোহার,' রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ১০৫।

৬৮. 'ওরোত হা কোদেশ,' রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ১১৭।

৬৯. কুক, 'দ্য ওয়ার,' হার্যবার্গ, *দ্য যায়নিস্ট আইডিয়া*-এ, ৪২৩।

৭০. বার্নার্ড আভিশাই, *দ্য ট্র্যাজিডি অভ যায়নিজম: রিভোল্যুশান অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি ইন দ্য ল্যান্ড অভ ইসরায়েল* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৫), ৯৪।

৭১. 'ইগ্গেরত হা রেগাতি,' রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ১২০।

৭২. 'ওরোত,' রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ১২০।

৭৩. 'ইগ্গেরোত হা রেইয়াহ, রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ১২১।

৭৪. অ্যালান এল. মিটেলম্যান, 'ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড পলিটিকাল ডেভেলপমেন্ট: দ্য কেস অভ আগুদাত ইসরায়েল,' লরেন্স জে. সিলবারস্তেইন (সম্পা.), *জুইশ*

AMARBOI.COM

ফান্ডামেন্টলিজম ইন কম্প্যারেটিভ পার্সপেক্টিভ: রিলিজিয়ন, আইডিওলজি অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অভ মডার্নিটি (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯৩), ২২৫–৩১।

৭৫. প্রাগুক্ত, ২৩১।

৭৬. প্রাগুক্ত, ২৩৪।

৭৭. প্রাগুক্ত, ২৩৫।

৭৮. ইয়োসেফ এম. চৌয়েরি, *ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম*, (লন্ডন, ১৯৯০), ৬৪।

৭৯. মার্শাল জি. এস. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম: কনশিয়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন আ ওয়ার্ল্ড অভ সিভিলাইজেশন*, ৩ খণ্ড, (শিকাগো ও লন্ডান, ১৯৭৪), ৩য়, ১৭১।

৮০. অ্যালবার্ট হুরানি, *অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ, ১৭৯৮–১৯৩৯* (অক্সফোর্ড, ১৯৬২),. ১৭০–৮৩।

৮১. প্রাগুক্ত, ১৮৩–৮৯।

৮২. প্রাগুক্ত, ২৪০–৪৩।

৮৩. প্রাগুক্ত, ২২৪, ২৩০।

৮৪. প্রাগুক্ত, ২৪৩–৪৪।

৮৫. প্রাগুক্ত, ২৪২।

৮৬. আযার তাবারি, 'দ্য রোল অভ দ্য ক্লার্গি ইন মডার্ন ইরানিয়ান পলিটিক্স,' নিক্কি আর. কেদ্দি, (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইরান: শিয়াজম ফ্রম কোয়াটিজম টু রিভোল্যুশন* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৩), ৫৭।

৮৭. নিক্কি আর. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন: অ্যান ইন্টারপ্রেটিভ হিস্ট্রি অভ মডার্ন ইরান* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮১), ৭২–৭৩।

৮৮. মঙ্গোল বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট; সোশিওরিলিজিয়াস থট ইন কাজার ইরান* (সিরাক্রুজ, এন.ওয়াই., ১৯৮২), ১৮৪–৮৬।

৮৯. নিক্কি আর. কেদ্দি, 'দ্য রুটস অভ দ্য উলেমা'স পাওয়ার ইন মডার্ন ইরান,' কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্টস অ্যান্ড সুফিজ: মুসলিম রিলিজিয়াস ইন্সটিটিউশনস ইন দ্য মিডল ইস্ট সিন্স ১৫০০* (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস, ও লন্ডন, ১৯৭২), ২২৭।

৯০. হামিদ আলগার, 'দ্য অপোজিশনাল রোল অভ দ্য উলেমা ইন টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ইরান,' কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্টস অ্যান্ড সুফিজ*, ২৩১–৩৪।

৯১. প্রাগুক্ত, ২৩৭–৩৮; রিজেব্রডট, *পায়াস অ্যান্ড প্যাশন: দ্য ইমারজেন্স অভ মডার্ন ফান্ডামেন্টালিজম ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড ইরান* (অনু. ডন

AMARBOI.COM

রেনেআ; বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১০৯–১০; তাবারি, 'দ্য রোল অভ শিয়া ক্লারগি,' ৫৮।

৯২. আলগার, 'দ্য অপোজিশনাল রোল অভ দ্য উলেমা,' ২৩৮।

৯৩. প্রাগুক্ত, ২৩৮–৪০; তাবারি, 'দ্য রোল অভ দ্য ক্লারগি,' ৫৮–৫৯।

৯৪. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ৮২।

৭. প্রতি-সংস্কৃতি (১৯২৫–৬০)

১. জর্জ স্টেইনার, *ইন ব্লুবিয়ার্ড'স ক্যাসল: সাম নোটস টুয়ার্ড দ্য রিডিফিনিশন* অভ *কালচার* (নিউ হাভেন, কন., ১৯৭১), ৩২।

২. যিগমান্ত বঅমান, *মডার্নিটি অ্যান্ড দ্য হলোকাস্ট* (ইথাকা, এন.ওয়াই., ১৯৮৯), ৭৭–৯২।

৩. স্টেইনার, *ইন ব্লুবিয়ার্ড'স ক্যাসল*, ৪৭–৪৮।

৪. স্যামুয়েল সি. হেইলমান ও মেনাচেম ফ্রেইডমান, 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড*-এ, (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯১), ২২৩।

৫. আভিয়েযার রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম, যায়নিজম অ্যান্ড জুইশ রিলিজিয়াস রেডিক্যালিজম* (অনু. মাইকেল সুইরস্কি ও জনাথান চিপমান; শিকাগো ও লন্ডন, ১৯০৩), ৪৩।

৬. *তা ইয়েল মোশে*-এর ভূমিকা, রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*-এ, ৬৫।

৭. রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*, ৪৫।

৮. প্রাগুক্ত, ৫০–৫১।

৯. প্রাগুক্ত, ৬৩–৬৫।

১০. প্রাগুক্ত, ৫৪–৫৫।

১১. প্রাগুক্ত, ৪২।

১২. প্রাগুক্ত, ৫৩। *হেসেদ* (ভালোবাসা), ও *দিন* (ক্ষমতা, কঠিন বিচার) হলো কাব্বালাহর দুটি ঐশী প্রকাশ; এদের সতর্কতার সাথে পরস্পরের বিপরীতে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়, নইলে ঈশ্বরের 'কঠোর বিচার' বিশ্বকে ছেয়ে ফেলবে।

১৩. ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *জেরুজালেম: ওয়ান সিটি, থ্রি ফেইথস* (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৬), ১১০।

১৪. জে.টি. হাগিগাহ, ২: ৭।

AMARBOI.COM

১৫. হেইলমান ও ফ্রেইডমান, 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ,' ২২৬-২৯; জেরাল্ড ক্রোমার, 'উইথড্রয়াল অ্যান্ড কনকোয়েস্ট: টু আসপেক্টস অভ হেরেদি রেসপন্স টু মডার্নিটি,' লরেন্স জে. সিলবারস্তেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পারসপেক্টিভ: রিলিজিয়ন, আইডিওলজি অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অভ মডার্নিটি* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১৬৬–৬৮; রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*, ৭৭।

১৬. রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*, ৬৭।

১৭. প্রাগুক্ত, ৬৭।

১৮. প্রাগুক্ত, ৬৯।

১৯. প্রাগুক্ত, ৭১।

২০. হেইলমান ও ফ্রেইডমান, 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ,' ২১৬–১৮।

২১. এহুদ স্প্রিনযাক, 'থ্রি মডেলস অভ রিলিজিয়াস ভায়োলেন্স: দ্য কেস অভ জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েল,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড দ্য স্টেট* (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৩), ৪৬৫–৬৯।

২২. রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*, ৬০।

২৩. হেইলমান ও ফ্রেইডমান, 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ,' ২২০।

২৪. মাইকেল রোজেনাক, 'জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েলি এডুকেশন,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড সোসায়েটি* (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৩), ৩৮৩–৮৪।

২৫. মিশনেহ্ বীত স্মারন (লেকউড, ১৯৮০), হাইম সোলোভেইতচিক, 'মাইগ্রেশন, অ্যাকাল্টুরেশন অ্যান্ড দ্য নিউ রোল অভ টেক্সটস,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *অ্যাকাউন্টিং ফর ফান্ডামেন্টালিজমস*-এ (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৪), ২৪৭।

২৬. প্রাগুক্ত, ২৫০–৫১।

২৭. প্রাগুক্ত, ২০২।

২৮. মেনাচেম ফ্রেইডমান, 'দ্য মার্কেট মডেল অ্যান্ড রিলিজিয়াস রেডিক্যালিজম,' সিলবারস্তেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পারসপেক্টিভ*, ১৯৪।

২৯. এক্সোডাস, ২৩: ১০; লেভিটিকাস ২৫: ১–৭।

AMARBOI.COM

৩০. হেইলমান ও ফ্রেইডম্যান, 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ,' ২২৯–৩১।

৩১. ফ্রেইডম্যান, 'দ্য মার্কেট মডেল,' ১৯৪।

৩২. প্রাগুক্ত, ১৯৭–২০৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১৯৪।

৩৪. সোলোভেইতচিক, 'মাইগ্রেশন, অ্যাকালচুরেশন অ্যান্ড দ্য নিউ রোল অভ টেক্সটস,' ২১০, ২২০–২১; রোজেনাক, 'জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েলি এডুকেশন,' ৩৮২–৮৯।

৩৫. ডেভিড হফম্যান, রোজনেক-এ, 'জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েলি এডুকেশন,' ৩৮৫।

৩৬. প্রাগুক্ত, ৩৮২।

৩৭. মেনাচেম ফ্রেইডম্যান, 'হাবাদ অ্যাজ মেসিয়ানিক ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *অ্যাকাউন্টিং ফর ফান্ডামেন্টালিজমস*, ৩৩৭–৪১।

৩৮. প্রাগুক্ত, ৩৪০–৫১।

৩৯. রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*, ১৮৬–৮৭।

৪০. প্রাগুক্ত, ১৮৮–৯২।

৪১. ন্যান্সি টি. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড-এ*, ৩২–৩৩; জর্জ এম. মার্সডেন, *ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড আমেরিকান কালচার: দ্য শেপিং অভ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ইভাঞ্জেলিক্যালিজম ১৮৭০–১৯২৫* (নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৮০), ১৯৪।

৪২. কুয়েন্টিন শুলতয, 'দ্য টু ফেসেস অভ ফান্ডামেন্টালিস্ট হাইয়ার এডুকেশন,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড সোসায়েটি-তে*, ৪৯৯।

৪৩. মেল্টন রাইট, *ফোর্ট্রেস অভ ফেইথ: দ্য স্টোরি অভ বব জোন্স ইউনিভার্সিটি* (গ্রিনভিল, এস.সি., ১৯৮৪), ২৯৫।

৪৪. বব জোন্স ২য়, *কর্নব্রেড অ্যান্ড ক্যাভিয়ার* (গ্রিনভিল, এস.সি., ১৯৮৫), ২১৭।

৪৫. *বুলেটিন: আন্ডারগ্র্যাজুয়েট*, ১৯৯০–৯১।

৪৬. শুলতয, 'দ্য টু ফেসেস অভ ফান্ডামেন্টালিস্ট হাইয়ার এডুকেশন,' ৫০২।

৪৭. বব জোন্স ২য়, *কর্নব্রেড অ্যান্ড ক্যাভিয়ার*, ২০৩–৪, ১৬৩, ১৬৫।

৪৮. আর. লরেন্স মুর, *রিলিজিয়াস আউটসাইডারস অ্যান্ড দ্য মেকিং অভ আমেরিকানস* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৬), ১১৬।

AMARBOI.COM

৪৯. রবার্ট সি. ফুলার, *নেমিং দ্য অ্যান্টিক্রাইস্ট: দ্য হিস্ট্রি অভ অ্যান আমেরিকান অবসেশন* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫), ১৩৭–৩৮; আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ৩৫।

৫০. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ২৯, ৩৭।

৫১. হার্বার্ট লকইয়ার, *কাম্মুস অভ প্রফিসি: আর দিজ দ্য লাস্ট ডেইজ?* (গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, মিচ., ১৯৪২), ৬৬, ৭১।

৫২. ২ পিটার ৩: ১০।

৫৩. পল বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বী নো মোর: প্রফিসি বিলিফ ইন মডার্ন আমেরিকান কালচার* (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৯২), ১১৭–১৮।

৫৪. *ফান্ডামেন্টাইলস্ট জার্নাল*, মে, ১৯৮৮।

৫৫. বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বী নো মোর*, ১৮৭–৮৯।

৫৬. যেকারিয়াহ ১৩: ৮।

৫৭. জন ভালভুর্দ, *ইসরায়েল অ্যান্ড প্রফিসি* (গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, মিচ., ১৯৬২)।

৫৮. রিচার্ড পি. মিচেল, *দ্য সোসায়েটি অভ দ্য মুসলিম ব্রাদারস* (নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৬৯), ১–৪।

৫৯. জন এসপোসিতো, 'ইসলাম অ্যান্ড মুসলিম পলিটিক্স,' এসপোসিতো (সম্পা.), *ভয়েসেস অভ রিসার্জেন্ট ইসলাম*-এ (নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৮৩), ১০।

৬০. মিচেল, *সোসায়েটি অভ মুসলিম ব্রাদারস*, ৪–৫।

৬১. প্রাগুক্ত, ৭।

৬২. প্রাগুক্ত, ৬।

৬৩. প্রাগুক্ত, ৭, ১৮৫–৯।

৬৪. প্রাগুক্ত, ১৪, ২৩২–৩৪।

৬৫. প্রাগুক্ত, ৮। এই রচনা ও ভাষণ সন্দেহজনক হতে পারে, কিন্তু তা সেরাতে বান্না কর্তৃক প্রতিষ্ঠা লাভ করা মুসলিম ব্রাদারদের প্রাথমিক গোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা দেয়।

৬৬. প্রাগুক্ত, ৯–১৩, ৩২৮।

৬৭. এ. আবিদি, *জর্দান: আ পলিটিকাল স্টাডি* (লন্ডন, ১৯৬৫), ১৯৭।

৬৮. মিচেল, *সোসায়েটি অভ মুসলিম ব্রাদারস*, ২৬০, ৩০৮, ২২৪, ২২৬–২৭।

৬৯. প্রাগুক্ত, ২৩৩।

৭০. প্রাগুক্ত, ২৩৬–৩৯।

৭১. প্রাগুক্ত, ১৯৫–৯৮।

৭২. প্রাগুক্ত, ২৮৭।

AMARBOI.COM

৭৩. প্রাগুক্ত, ২০০–০৪।

৭৪. প্রাগুক্ত, ২৮৮–৮৯।

৭৫. প্রাগুক্ত, ২৭৪–৮১।

৭৬. প্রাগুক্ত, ২৮১।

৭৭. প্রাগুক্ত, ২৩৫, ২৪০–৪১।

৭৮. প্রাগুক্ত, ২৪৫–৫৩।

৭৯. প্রাগুক্ত, ২৪২।

৮০. মুহাম্মদ আল-গাজ্জালি, মিচেল, প্রাগুক্তে, ২২৯।

৮১. মিচেল, *সোসায়েটি অভ মুসলিম ব্রাদারস*, ২০৫–০৬।

৮২. প্রাগুক্ত, ২০৬।

৮৩. মার্শাল জি.এস. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম: কনশিয়েন্স অ্যান্ড কালচার ইন আ ওয়ার্ল্ড অভ সিভিলাইজেশন*, ৩ খণ্ড, (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৭৪), ৩য়, ১৭১।

৮৪. আনোয়ার সাদাত, *রিভোল্ট অন দ্য নাইল* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭), ১৪২–৪৩।

৮৫. মিচেল, *সোসায়েটি অভ মুসলিম ব্রাদারস*, ১৬, ৩১৩–১৮।

৮৬. প্রাগুক্ত, ৩১২।

৮৭. প্রাগুক্ত, ৭০।

৮৮. প্রাগুক্ত, ৩১৯।

৮৯. এই অভিযোগ মিথ্যা ছিল, বান্নার মৃত্যুর পর সোসায়েটি অন্তকোন্দলে এতটাই ভীষণভাবে বিপর্যস্ত ছিল যে কোনও অভ্যুত্থান ঘটানোর মতো ক্ষমতা তার ছিল না।

৯০. প্রাগুক্ত, ১৫২–৫৩।

৯১. মার্টিন রিজেব্রড্ট, *পায়াস প্যাশন: দ্য ইমারজেন্স অভ মডার্ন ফান্ডামেন্টালিজম ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড ইরান* (অনু. ডন রেনঅ; বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১১০–১৩; নিক্কি আর. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন, অ্যান ইন্টারপ্রেটিভ হিস্ট্রি অভ মডার্ন ইরান* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮১), ৮৭–১১২।

৯২. মুজান মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম: দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড ডক্ট্রিন্স অভ টুয়েলভার শিয়াজম* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৫), ২৫১; কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ৯৩–৯৪।

৯৩. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ৯৬–৯৭।

৯৪. প্রাগুক্ত, ৯৫।

AMARBOI.COM

৯৫. প্রাগুক্ত, ৯০, ১১০।

৯৬. মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ২২৬; রিজেব্রদট, *পায়াস প্যাশন*, ১১১–১২; আযার তাবারি, 'দ্য রোল অভ শিয়া ক্লারগি ইন মডার্ন ইরানিয়ান পলিটিক্স', কেদ্দি (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স: শিয়াজম ফ্রম কোয়ায়েটিজম টু রিভোল্যুশন* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৩), ৬০; শাহরুগ আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কনটেম্পোরারি ইরান: ক্লারগি-স্টেট রিলেশনস ইন দ্য পাহলভী পিরিয়ড* (আলবানি, এন.ওয়াই., ১৯৮০), ৩৮–৪০।

৯৭. তাবারি, 'দ্য রোল অভ দ্য শিয়া ক্লারগি,' ৬৩।

৯৮. আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কনটেম্পোরারি ইরান*, ৫৮–৫৯।

৯৯. প্রাগুক্ত, ২৭।

১০০. তাবারি, 'দ্য রোল অভ দ্য শিয়া ক্লারগি,' ৬০–৬৪।

১০১. ইয়ান রিচার্ড, 'আয়াতোল্লাহ কাশানি: প্রিকারসর অভ দ্য ইসলামিক রিপাবলিক?' কেদ্দি (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স*, ১০১–২৪।

১০২. প্রাগুক্ত, ১০৮।

১০৩. প্রাগুক্ত, ১০৭–০৮।

১০৪. প্রাগুক্ত, ১০৮।

১০৫. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ১৩২–৪১।

১০৬. প্রাগুক্ত, ১৪২–৪৫।

১০৭. রিচার্ড, 'আয়াতোল্লাহ কাশানি,' ১১৮।

৮. সংগঠন (১৯৬০–৭৪)

১. জে.এল. তালমন, *দ্য অরিজিন্স অভ টোটালিটারিয়ান ডেমোক্র্যাসি* (লন্ডন, ১৯৫৩)।

২. ড্যানিয়াল ক্রেসিলিয়াস, 'ননআইডিওলজিকাল রেসপন্সেস অভ দ্য ইজিপশিয়ান উলামা টু মডার্নাইজেশন,' নিক্কি আর. কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্টস অ্যান্ড সুফিজ, মুসলিম রিলিজিয়াস ইন্সটিটিউশনস ইন দ্য মিডল ইস্ট সিন্স ১৫০০* (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস, ও লন্ডন, ১৯৭২), ২০৫–০৮।

৩. ইয়োসেফ এম. চৌয়েরি, *ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম* (লন্ডন, ১৯৯০), ৯২।

৪. চার্লস টি. অ্যাডামস, 'মাওদুদি অ্যান্ড দ্য ইসলামিক স্টেট', জন এসপোসিতো (সম্পা.), *ভয়েসেস অভ রিসার্জেন্ট ইসলাম*-এ (নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৮৩); চৌয়েরি, *ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিম*, ৯৪–১৩৯।

AMARBOI.COM

৫. অ্যাডামস, 'মাওদুদি অ্যান্ড দ্য ইসলামিক স্টেট,' ১০১।

৬. মাওদুদি, *ইসলামিক ওয়ে অভ লাইফ* (লাহোর, ১৯৭৯), ৩৭।

৭. চৌয়েরি, *ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম*, ১০৯।

৮. মাওদুদি, *জিহাদ ইন ইসলাম*, (লাহোর, ১৯৭৬), ৫–৬।

৯. অ্যাডামস, 'মাওদুদি অ্যান্ড দ্য ইসলামিক স্টেট,' ১১৯–২০।

১০. *জিহাদ ইন ইসলাম*।

১১. জন ও. ভোল, 'ফান্ডামেন্টালিজম ইন দ্য সুন্নি আরব ওয়ার্ল্ড: ইজিপ্ট অ্যান্ড দ্য সুদান,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড* (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯১), ৩৬৯–৭৪; ইভন্নে হাদ্দাদ, 'সায়ীদ কুতব: আইডিওলগ অভ ইসলামিক রিভাইভাল,' এসপোসিতো (সম্পা.), *ভয়েসেস অভ ইসলামিক রিনভাইভাল*-এ; চৌয়েরি, *ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম*, ৯৬–১৫১।

১২. হাদ্দাদ, 'সায়ীদ কুতব,' ৭০।

১৩. ভোল, 'ফান্ডামেন্টালিজম ইন দ্য সুন্নি আরব ওয়ার্ল্ড,' ৩৬৯।

১৪. হাদ্দাদ, 'সায়ীদ কুতব,' ৬৯।

১৫. *কুতব, ইসলাম অ্যান্ড ইউনিভার্সাল পীস* (ইন্ডিয়ানাপোলিস, ইন্ড., ১৯৭৭), ১২২।

১৬. *ফি যিলাল আল-কোরান*, ১ম, ৫৫৬; চৌয়েরি, *ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম*-এ, ১২২।

১৭. প্রাগুক্ত, ১ম, ৫১০, চৌয়েরি, প্রাগুক্ত-এ, ১২৪।

১৮. প্রাগুক্ত, ৩য়, ১২৫৫, চৌয়েরি, প্রাগুক্তে, ১৩১।

১৯. *মাইলস্টোন* (দিল্লি, ১৯৮৮), ২২৪।

২০. *দিস রিলিজিয়ন অভ ইসলাম* (গ্যারি, ইন্ড, এন.ডি.), ৬৫।

২১. প্রাগুক্ত, ৬৫, ৩৮।

২২. হাদ্দাদ, 'সায়ীদ কুতব,' ৯০।

২৩. প্রাগুক্ত, ১৩০।

২৪. প্রাগুক্ত, ৮৮–৮৯।

২৫. *মাইলস্টোন*, ৮১।

২৬. কোরান ৫: ৬৫; ২২: ৪০–৪৩; ২: ২১৩–১৫।

২৭. কোরান ৪৯: ১৩।

২৮. কোরান ২: ২৫৬।

২৯. *মাইলস্টোনস*, ৯০।

AMARBOI.COM

৩০. *ফি যিলাল আল-কোরান*, ২য়, ৯২৪–২৫।

৩১. প্রাগুক্ত, ২য়, ১১১৩, ১১৩২, ১১৬৪।

৩২. মার্টিন রিজেব্রেদট, *পায়াস প্যাশন: দ্য ইমারজেন্স অভ মডার্ন ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড ইরান* (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১১৬–১৮; নিক্কি আর. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোলুশন: অ্যান ইন্টারপ্রেটিভ হিস্ট্রি অভ মডার্ন ইরান* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮১), ১৫৩–৮৩; মেহরযাদ বোরোজার্দি, *ইরানিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট: দ্য টরমেন্টেড ট্রায়াম্ফ অভ নেটিভিজম* (সিরাক্রুজ, এন.ওয়াই., ১৯৯৬), ২৫–৩১।

৩৩. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ১৬০–৮০।

৩৪. বোরুজারদি, *ইরানিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস*, ২৭; চৌধুরি, *ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম*, ১৫৬।

৩৫. বোরুজার্দি, *ইরানিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস*, ৪৯।

৩৬. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ১৪৪।

৩৭. বোরুজারদি, *ইরানিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস*, ৬৫।

৩৮. জালাল আল-ই আহমাদ, *অক্সিডেন্টোসিস: আ প্লেগ ফ্রম দ্য ওয়েস্ট* (অনু. আর. ক্যাম্পবেল, সম্পা. হামিদ আলগার; বার্কলি, ১৯৮৪), ৩৪, ৩৭।

৩৯. বোরুজারদি, *ইরানিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস*, ৭৪–৭৫।

৪০. প্রাগুক্ত, ৭২–৭৫।

৪১. শাহরুগ আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কনটেম্পোরারি ইরান: ক্লারগি-স্টেট রিলেশনস ইন দ্য পাহলভী পিরিয়ড* (আলবানি, এন.ওয়াই., ১৯৮০), ৮১–৮৩।

৪২. রিজেব্রদট, *পায়াস প্যাশন*, ২০–২১; আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কনটেম্পোরারি ইরান*, ১১৭–২৯; বোরুজারদি, *ইরানিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস*, ৮১–৮৩।

৪৩. হামিদ আলগার, 'দ্য অপোজিশনাল রোল অভ দ্য উলামা ইন টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ইরান,' কেদ্দি (সম্পা.), *স্কলারস, সেইন্ট অ্যান্ড সুফিজ*, ২৪৫–৪৬।

৪৪. হামিদ আলগার, 'দ্য ফিউশন অভ দ্য মিস্টিক্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইন দ্য পারসোনালিটি অ্যান্ড লাইফ অভ ইমাম খোমেনি,' স্কুল অভ অরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, লন্ডন-এ প্রদত্ত লেকচার, জুন ৯, ১৯৯৮।

৪৫. মাইকেল জে. ফিশার, 'ইমাম খোমেনি: ফোর লেভেলস অভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং,' এসপোসিতো (সম্পা.), *ভয়েসেস অভ রিসার্জেন্ট ইসলাম*-এ, ১৫৪–৫৬।

AMARBOI.COM

৪৬. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ১৫৮–৫৯; মুজান মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম: দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড ডক্ট্রিন্স অভ টুয়েলভার শিয়াজম* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৫), ২৫৪; আলগার, 'দ্য অপোজিশনাল রোল অভ দ্য উলামা,' ২৪৮।

৪৭. মোমেন, *ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ২৫৪।

৪৮. ফিশার, 'ফোর লেভেলস অভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং,' ১৫৭।

৪৯. উইলেম এম. ফ্লোর, 'দ্য রিভোল্যুশনারি ক্যারেক্টার অভ দ্য উলামা: উইশফুল থিংকিং অর রিয়েলিটি?' নিক্কি আর. কেদ্দি (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইরান: শিয়াজম ফ্রম কোয়ায়েটিজম টু রিভোল্যুশন*-এ (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৮৩), পরিশিষ্ট, ৯৭।

৫০. আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কনটেম্পোরারি ইরান*, ১২৯–৩১।

৫১. আলগার, 'দ্য অপোজিশনাল রোল অব দ্য উলামা,' ২৫২।

৫২. আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কনটেম্পোরারি ইরান*, ১৩৮।

৫৩. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২১৫–৫৯; শাহরুগ আখাভি, 'শরিয়তি'স সোশ্যাল থট,' কেদ্দি (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স*-এ, ১৪৫–৫৫; আব্দুলআযিয স্যাচেদিনা, 'আলি শরিয়তি: আইডিওলগ অভ দ্য ইসলামিক রিভোল্যুশন,' এসপোসিতো (সম্পা.), *ভয়েসেস অব রিসার্জেন্ট ইসলাম*-এ; মাইকেল জে. ফিশার, *ইরান: ফ্রম রিলিজিয়াস ডিসপিউট টু রিভোল্যুশন*-এ (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৮০), ১৫৪–৬৭; বোরুজার্দি, *ইরানিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস*, ১০৬–১৫।

৫৪. আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কনটেম্পোরারি ইরান*, ১৪৪।

৫৫. স্যাচেদিনা, 'আলি শরিয়তি,' ২০৯–১০।

৫৬. আখাভি, 'শরিয়তি'স সোশ্যাল থট,' ১৩০–৩১।

৫৭. স্যাচেদিনা, 'আলি শরিয়তি,' ১৯৮–২০০।

৫৮. বোরুজার্দি, *ইরানিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস*, ১০৮।

৫৯. শরিয়তি, *হাজ্জ* (তেহরান, ১৯৮৮), ৫৪–৫৬।

৬০. আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কনটেম্পোরারি ইরান*, ১৪৬–৪৯।

৬১. শরিয়তি, *দ্য সোশিওলজি অভ ইসলাম* (বার্কলি, ১৯৭৯), ৭২।

৬২. শাহরুগ আখাভি, 'শরিয়তি'স সোশ্যাল থট,' কেদ্দি (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স*-এ, ১৩২।

৬৩. মার্শাল জি. এস. হজসন, *দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম: কনশিয়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন আ ওয়ার্ল্ড অভ সিভিলাইজেশন*, ৩ খণ্ড (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৭৪), ২য়, ৩৩৪–৬০।

AMARBOI.COM

৬৪. মঙ্গোল বায়াত, *মিস্টিসিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট: সোশিওরিলিজিয়াস থট ইন কাজার ইরান* (সিরাক্রুজ, এন.ওয়াই., ১৯৮২), ৫–৮ ।

৬৫. ফিশার, *ইরান*, ১৫৪–৫৫ ।

৬৬. আলি শরিয়তি, *কমিউনিটি অ্যান্ড লিডারশীপ*, (এন.পি., ১৯৭২), ১৬৫–৬৬ ।

৬৭. স্যাচেদিনা, 'আলি শরিয়তি,' ২০৩ ।

৬৮. আখাভি, 'শরিয়তি'স সোশ্যাল থট,' ১৩৪ ।

৬৯. আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কনটেম্পোরারি ইরান*, ১৫৩–৫৪ ।

৭০. আখাভি, 'শরিয়তি'স সোশ্যাল থট, ১৪৪ ।

৭১. সায়ীদ রুহুল্লা খোমেনি, *ইসলাম অ্যান্ড রিভোল্যুশন* (অনু. ও সম্পা. হামিদ আলগার, বার্কলি, ১৯৮১), ২৮ ।

৭২. প্রাগুক্ত, ২৯ ।

৭৩. আসফ হুসেইন, *ইসলামিক ইরান: রিভোল্যুশন অ্যান্ড কাউন্টার রিভোল্যুশন* (লন্ডন, ১৯৮৫), ৭৫ ।

৭৪. খোমেনি, *ইসলাম অ্যান্ড রিভোল্যুশন*, ৩৭৪ ।

৭৫. ফিশার, 'ফোর লেভেলস অভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং,' ১৫৯ ।

৭৬. খোমেনি, *ইসলাম অ্যান্ড রিভোল্যুশন*, ৩৫২–৫৩ ।

৭৭. মাইকেল রোজেনাক, 'জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েলি এডুকেশন,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর.স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড সোসায়েটি (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৩), ৩৯২ ।

৭৮. প্রাগুক্ত, ৩৯১ ।

৭৯. প্রাগুক্ত, ৩৯২ ।

৮০. প্রাগুক্ত, ৩৯৫ ।

৮১. গিদিয়ন আরন, 'দ্য রুটস অভ গাশ এমুনিম,' *স্টাডিজ ইন কনটেম্পোরারি জুদাইজম*, ২য়, ১৯৮৬; আরন, 'জুইশ রিলিজিয়াস যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড*-এ ২৭০–৭১; আরন, 'দ্য ফাদার, দ্য সান অ্যান্ড দ্য হোলি ল্যান্ড,' আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা), *স্পোকমেন ফর দ্য ডেসপাইজড: ফান্ডামেন্টালিস্ট লীডার ইন দ্য মিডল ইস্ট*-এ (শিকাগো, ১৯৯৭), ৩১৮–২০; স্যামুয়েল সি. হেইলমান, 'গাইডস অভ দ্য ফেইথফুল, কনটেম্পারারি রিলিজিয়াস যায়নিস্ট র‍্যাবাইজ,' প্রাগুক্তে, ৩২৯-৩০ ।

৮২. মা'রিভ-এর সাক্ষাৎকার (১৪ নিসান ৫৭২৩, ১৯৬৩), আভিয়েযার রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম, যায়নিজম, অ্যান্ড জুইশ রিলিজিয়াস রেডিক্যালিজম*-এ (অনু. মাইকেল সুইরস্কি ও জনাথান চিপম্যান; শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৩), ৮৫ ।

AMARBOI.COM

৮৩. আরন, 'দ্য ফাদার, দ্য সান, অ্যান্ড দ্য হোলি ল্যান্ড,' ৩১০।

৮৪. প্রাগুক্ত, ৩১১।

৮৫. ইয়ান এস. লাস্টিক, *ফর দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য লর্ড: জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েল* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮), ৮৪।

৮৬. রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*, ১২৭।

৮৭. আরন, 'দ্য ফাদার, দা সান, অ্যান্ড দ্য হোলি ল্যান্ড,' ৩১০।

৮৮. প্রাগুক্ত, ৩১২।

৮৯. হ্যারল্ড ফিশ, *দ্য যায়নিস্ট রিভোল্যুশন: আ নিউ পারসপেক্টিভ* (তেল আভিব ও লন্ডন, ১৯৭৮), ৭৭, ৮৭।

৯০. আরন, 'জুইশ রিলিজিয়াস যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ২৭১।

৯১. হিলখোত ত্শভা ৯: ২।

৯২. হেইলমান, *গাইডস অভ দ্য ফেইথফুল*, ৩৫৭।

৯৩. এহুদ স্প্রিনযাক, 'থ্রি মডেলস অভ রিলিজিয়াস ভায়োলেন্স: দ্য কেস অভ জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েল,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড দ্য স্টেট*-এ (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৩), ৪৭২।

৯৪. আরন, 'জুইশ রিলিজিয়াস যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ২৭৭।

৯৫. উরিয়েল তাল, 'ফাউন্ডেশনস অভ আ পলিটিকাল ট্র্যাডিশন ইন ইসরায়েল,' মার্ক সেপারস্তেইন (সম্পা.), *এসেনশিয়াল পেপারস ইন মেসিয়ানিক মুভমেন্টস অ্যান্ড পারসোনালিটিজ ইন জুইশ হিস্ট্রি*-তে (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯২), ৪৯৫; এহুদ স্প্রিনযাক, 'দ্য পলিটিক্স, ইন্সটিটিউশনস অ্যান্ড কালচার অভ গাশ এমুনিম, লরেন্স জে. সিলবারস্তেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পারসপেক্টিভ: রিলিজিয়ন, আইডিওলজি অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস* অভ *মডার্নিটি*-তে (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১১৯।

৯৬. মাইকেল লিনেশ, *রিডীমিং আমেরিকা: পিয়েটি অ্যান্ড পলিটিক্স ইন দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট* (চ্যাপেল হিল, এন.সি., ও লন্ডন, ১৯৯৫), ১-২।

৯৭. ন্যান্সি টি. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড*-এ, ৩৯-৪০; স্টিভ ব্রুস, *দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল* অভ *দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট: কনজারভেটিভ প্রটেস্ট্যান্ট পলিটিক্স ইন আমেরিকা, ১৯৭৮-৮৮* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯০), ৪৬-৪৭।

AMARBOI.COM

৯৮. নাথান ও. হাচ, *দ্য ডেমোক্র্যাটাইজেশন অভ আমেরিকান ক্রিশ্চানিটি* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৯), ২১৮।

৯৯. লিনেশ, *রিডীমিং আমেরিকা*, ১০।

১০০. ক্রুস, *রাইজ অ্যান্ড ফল অভ দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট*, ৩৮–৪০।

১০১. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ৪০–৪১; ক্রুস, *রাইজ অ্যান্ড ফল অভ দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট*, ৬৮–৬৯।

১০২. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ৪২।

১০৩. সুসান রোজ, 'ক্রিশ্চান ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড এডুকেশন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড সোসায়েটি-*তে, ৪৫৫।

১০৪. প্রাগুক্ত, ৪৫৬–৫৮।

১০৫. *প্রো-ফ্যামিলি ফোরাম, ইজ হিউম্যানিজম মোলেস্টিং ইওর চাইল্ড?* (ফোর্ট ওঅর্থ, টেক্স., ১৯৮৩)।

১০৬. ডি. বোলিয়ের, *লিবার্টি অ্যান্ড জাস্টিস ফর সাম: ডিফেন্ডিং আ ফ্রি সোসায়েটি ফ্রম দ্য রেডিক্যাল রাইট'স হোলি ওয়ার অন ডেমোক্র্যাসি* (ওয়াশিংটন ডি.সি., ১৯৮২), ১০০।

১০৭. টিম লাহাই, *দ্য ব্যাটল ফর দ্য ফ্যামিলি* (ওল্ড তাপ্পান, এন.জে., ১৯৮২), ৩১–৩২।

১০৮. টিম লাহাই, *দ্য ব্যাটল ফর দ্য মাইন্ড*, (ওল্ড তাপ্পান, এন.জে., ১৯৮০), ১৮১।

১০৯. জন ডব্লু. হোয়াইটহেড (জন কনলোনের সাথে), 'দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অভ দ্য রিলিজিয়ন অভ সেক্যুলার হিউম্যানিজম অ্যান্ড ইটস ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট ইমপ্লিকেশনস,' *টেক্সাস টেক ল রিভিউ*, ১০, ১৯৭৮।

১১০. *দ্য সেকেন্ড আমেরিকান রিভোল্যুশন* (ওয়েস্টচেস্টার, ইল., ১৯৮২), ১১২।

১১১. প্যাট ক্রুকস, *দ্য রিটার্ন অভ দ্য পিউরিটানস*, ২য় সংস্ক., (ফ্লেচার, এন.সি., ১৯৭৯), ১৪।

১১২. প্রাগুক্ত, ৯২–৯৪।

১১৩. ফ্রাংকি শেফার, *আ টাইম ফর অ্যাংগার: দ্য মিথ অভ নিউট্রালিটি* (ওয়েস্টচেস্টার, ইল., ১৯৮২), ১২২।

১১৪. রাস ওয়ালটন, *ওয়ান নেশন আন্ডার গড* (ন্যাশভিল, টেন., ১৯৮৭), ১০। ইটালিক্স ওয়ালটনের।

AMARBOI.COM

১১৫. ওয়ালটন, *এফএসসিএস! ফান্ডামেন্টালস ফর আমেরিকান ক্রিশ্চানস* (নিয়াক,. এন.ওয়াই., ১৯৭৯), ৬২।

১১৬. প্যাট রবার্টসন, *আমেরিকা'স ডেট উইদ ডেস্টিনি* (ন্যাশভিল, টেন., ১৯৮৬), ৬৮, ৭৩।

১১৭. জন ইদসমোর, *গড অ্যান্ড সিজার: বিবলিকাল ফেইথ অ্যান্ড পলিটিকাল অ্যাকশন* (ওয়েস্টচেস্টার, ইল., ১৯৮৪), ৮৮।

১১৮. জন রাশদুনি, *দিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিপাবলিক: স্টাডিজ ইন দ্য নেচার অভ মিনিং অভ আমেরিকান হিস্ট্রি* (নিউটলি, এন. জে., ১৯৬৪), ৩৭।

১১৯. লিনেশ, *রিডীমিং আমেরিকা*, ১৫৪।

১২০. *দ্য ব্যাটল ফর দ্য মাইন্ড*, ২১৮–১৯।

১২১. হাল লিন্ডসে, *দ্য ১৯৮০জ: কাউন্টডাউন টু আর্মাগেদন* (গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, মিচ., ১৯৮০), ১৫৭।

১২২. ব্রুস, *রাইজ অ্যান্ড ফল অভ দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট*, ৪৭।

১২৩. প্যাট রবার্টসন, *দ্য সিক্রেট কিংডম* (ন্যাশভিল, টেন., ১৯৮২), ১০৮–০৯।

১২৪. সুজান হার্ডিং, 'কনটেস্টিং রেটোরিকস ইন দ্য পিটিএল স্ক্যান্ডাল,' সিলবারস্তেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পারসপেক্টিভ*, ৬৩।

১২৫. ব্রুস, *রাইজ অ্যান্ড ফল অভ দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট*, ৪৭–৪৮।

১২৬. কুয়েন্টিন শুলতয, 'দ্য টু ফেসেস অভ ফান্ডামেন্টালিস্ট হাইয়ার এডুকেশন,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড সোসায়েটি*, ৫০৫।

১২৭. প্রাগুক্ত।

১২৮. জেরি ফলওয়েল (এলমার টাউন্স-এর সাথে), *চার্চ অ্যাফেয়ার্স* (ন্যাশভিল, টেন., ১৯৭১), ৪১।

৯. আক্রমণ (১৯৭৪–৭৯)

১০.

১. গিদিয়ন আরন, 'জুইশ যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড-এ*, (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯১), ২৯০।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. এক্সোডাস ১৯:৭।

AMARBOI.COM

৫. লরেন্স জে. সিলবারস্তেইন, 'রিলিজিয়ন, আইডিওলজি, মডার্নিটি: থিওরোটিকাল ইস্যুজ ইন আ স্টাডি অভ জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম,' সিলবারস্তেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পারসপেক্টিভ: রিলিজিয়ন, আইডিওলজি অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অভ মডার্নিটি* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১৭।

৬. আরন 'জুইশ আয়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ৩০৩।

৭. প্রাগুক্ত, ৩১২।

৮. রবার্ট আই. ফ্রেইডমান, *যিলটস ফর যায়ন: ইনসাইড ইসরায়েল'স ওয়েস্ট ব্যাংক সেটলমেন্ট মুভমেন্ট* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৯২), ২০।

৯. স্যামুয়েল সি. হেইলমান, 'গাইডস অভ দ্য ফেইথফুল: কনটেম্পারারি রিলিজিয়াস যায়নিস্ট র‍্যাবাইজ,' আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *স্পোকমেন ফর দ্য ডেসপাইজড: ফান্ডামেন্টালিস্ট লীডারস অভ দ্য মিডল ইস্ট* (শিকাগো, ১৯৯৭), ৩৩৮।

১০. আরন, 'জুইশ যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ২৭৯; এহুদ স্প্রিনযাক, 'দ্য পলিটিক্স, ইন্সটিটিউশনস অ্যান্ড কালচার অভ গাশ এমুনিম,' সিলবারস্তেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পারসপেক্টিভ*-এ ১৩১–৩২।

১১. আরন, 'জুইশ যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ২৮০।

১২. প্রাগুক্ত, ৩০৮।

১৩. প্রাগুক্ত, ৩০০।

১৪. প্রাগুক্ত, ৩১৫।

১৫. *হারেতয* (এপ্রিল ১৪, ১৯৮৬), ইয়ান এস. লাস্টিক, *ফর দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য লর্ড: জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েল*-এ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮), ৩৭।

১৬. প্রাগুক্ত, ৪২।

১৭. লাস্টিক, 'জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড দ্য ইসরায়েলি-প্যালেস্তাইনিয়ান ইম্পাসে,' সিলবারস্তেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পারপেক্টিভ*-এ, ১৪১।

১৮. *আরতযাই* ৩, ১৯৮৩, লাস্টিক, *ফর দ্য লর্ড অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড*-এ, ৮২–৮৩।

১৯. হেইলমান, 'গাইডস অভ দ্য ফেইথফুল,' ৩৩৯।

২০. আরন, 'জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম,' ২৮১।

২১. হেইলমান, 'গাইডস অভ দ্য ফেইথফুল,' ৩৪১।

২২. ফ্রেইডমান, *যিলটস ফর যায়ন*, ৪১।

AMARBOI.COM

২৩. মোহামেদ হেইকেল, *অটাম অভ ফিউরি: দ্য অ্যাসাসিনেশেন অভ সাদাত* (লন্ডন, ১৯৮৪), ৩৬–৩৯।

২৪. প্রাগুক্ত, ৯৪–৯৬।

২৫. জাইলস কেপেল, *দ্য প্রফেট অ্যান্ড ফারাও: মুসলিম এক্সট্রিমিজম ইন ইজিপ্ট* (অনু. জোন রথসচাইল্ড; লন্ডন, ১৯৮৫), ৮৫; হেইকেল, *অটাম অভ ফিউরি*, ৯৪–৯৭।

২৬. এটা সুন্নিদের সম্মানিত চতুর্থ খলিফা ও শিয়াদের প্রথম ইমাম আলি ইবন আবি তালিবের শিক্ষা। আসাফ হুসেইন, *ইসলামিক ইরান, রিভোল্যুশন অ্যান্ড কাউন্টার-রিভোল্যুশন* (লন্ডন, ১৯৮৫), ৫৫।

২৭. কেপেল, *প্রফেট অ্যান্ড ফারাও*, ১২৫–২৬।

২৮. রুডল্ফ পিটারস, *জিহাদ ইন ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড মডার্ন ইসলাম: আ রীডার* (প্রিন্সটন, এন.জে., ১৯৯৬), ১৫৩–৫৪।

২৯. কোরান ২: ৪৭, ৫: ৬৪, ৭৮, cf. ৬১: ৬, ২৯: ৪৬, ২: ১২৯-৩২।

৩০. কেপেল, *প্রফেট অ্যান্ড ফারাও*, ১১৩।

৩১. প্রাগুক্ত, ৭৮–৮৪।

৩২. প্রাগুক্ত, ৭২।

৩৩. প্রাগুক্ত, ৭৪–৭৬।

৩৪. প্রাগুক্ত, ৭৬–৭৮।

৩৫. প্রাগুক্ত, ৮৫–৮৬, ৮৯–৯১।

৩৬. প্রাগুক্ত, ৯৪–৯৬।

৩৭. প্রাগুক্ত, ১৩৫–৩৮।

৩৮. প্রাগুক্ত, ১৫২–৫৫।

৩৯. প্রাগুক্ত, ১৩৮–৩৯।

৪০. প্রাগুক্ত, ১৪৩–৪৪।

৪১. নিলুফা গোলে, *দ্য ফরবিডেন মডার্ন: সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ভেইলিং* (অ্যান আরবর, মিচ., ১৯৯৬), ১৩৫–৩৭।

৪২. লেইলা আহমেদ, *উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার ইন ইসলাম: হিস্ট্রিকাল রুটস অভ আ মডার্ন ডিবেট* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৯২), ২২৬–২৮।

৪৩. প্রাগুক্ত, ২২৯–৩২।

৪৪. গোলে, *দ্য ফরবিডেন মডার্ন*, ২২।

৪৫. আহমেদ, *উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার ইন ইসলাম*, ২২০–২৫।

৪৬. প্যাট্রিক ডি. গাফনি, *দ্য প্রফেট'স পুলপিট: ইসলামিক প্রিচিং ইন কনটেম্পোরারি ইজিপ্ট* (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস, ও লন্ডন, ১৯৯৪), ৯১–১১২।

৪৭. প্রাগুক্ত, ৯৭–১০৭।

৪৮. *কেপেল, প্রফেট অ্যান্ড ফারাও*, ১৫০–৫১।

৪৯. উইলিয়াম বীম্যান, 'ইমেজেস অভ দ্য গ্রেট স্যাটান: রিপ্রেজেন্টেশন অভ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইন দ্য ইরানিয়ান রিভোল্যুশন,' নিক্কি আর. কেদ্দি (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইরান: শিয়াজম ফ্রম কোয়ায়েটিজম টু রিভোল্যুশন* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৭২), ২০৩।

৫০. নিক্কি আর. কেদ্দি, (সম্পা), *রুটস অভ রিভোল্যুশন: অ্যান ইন্টারপ্রেটিভ হিস্ট্রি অভ মডার্ন ইরান* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮১), ২৮২–৮৩; মেহরযাদ বোরুজারদি, *ইসলামিক ইন্টেলেকচুয়ালস অ্যান্ড ওয়েস্ট: দ্য টরমেন্টেড ট্রায়াম্ফ অভ নেটিভিজম* (সিরাক্রুজ, এন.ওয়াই., ১৯৯৬), ২৯–৪২।

৫১. শাহরুগ আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কনটেম্পোরারি ইরান: ক্লার্গি-স্টেট রিলেশনস ইন দ্য পাহলভী পিরিয়ড* (আলবানি, এন.ওয়াই., ১৯৮০), ১৬৮; নিক্কি আর. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২০৯–১১।

৫২. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২৬০।

৫৩. প্রাগুক্ত, ২৮৩।

৫৪. বোরুজারদি, *ইরানিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস*, ৫০–৫১।

৫৫. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২৪২; মাইকেল জে. ফিশার, *ইরান: ফ্রম রিলিজিয়াস ডিসপিউট টু রিভোল্যুশন* (ক্যাম্ব্রিজ,. ম্যাস. ও লন্ডন, ১৯৮০), ১৯৩।

৫৬. গ্যারি সিক, *অল ফল ডাউন: আমেরিকা'স ফেইটফুল এনকাউন্টার উইদ ইরান* (লন্ডন, ১৯৮৫), ৩০।

৫৭. কোরান, ৭: ৯–১৫।

৫৮. বীম্যান, 'ইমেজেস অভ দ্য গ্রেট স্যাটান,' ১৯৬।

৫৯. প্রাগুক্ত, ২৫৭–৭৩।

৬০. প্রাগুক্ত, ১৯২।

৬১. প্রাগুক্ত, ২১৫।

৬২. প্রাগুক্ত, ২১৬।

৬৩. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২৪৩।

৬৪. প্রাগুক্ত; ফিশার, *ইরান*, ১৯৪।

AMARBOI.COM

৬৫. বীম্যান, 'ইমেজেস অভ দ্য গ্রেট স্যাটান,' ১৯৮–৯৯।

৬৬. ফিশার, *ইরান*, ১৯৫; *কেদ্দি, রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২৪৬–৪৭।

৬৭. মুজান মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম: দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড ডক্ট্রিন্স অভ টুয়েলভার শিয়াজম* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৫), ২৮৪।

৬৮. প্রাগুক্ত, ২৮৮।

৬৯. ফিশার, ইরান, ১৮৪।

৭০. প্রাগুক্ত, ১৯৬–৯৭।

৭১. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২৪৯–৫০।

৭২. ফিশার, *ইরান*, ১৯৮–৯৯।

৭৩. সিক, *অল ফল ডাউন*, ৫১; কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২৫০; ফিশার, *ইরান*, ১৯৯। সরকার দাবি করেছে যে বিক্ষোভকারীদের মাত্র ১২২ নিহত হয়েছিল, অন্যদিকে ২০০০ জন আহত হয়েছে। অন্যরা ৫০০ থেকে ১০০০-এর মতো প্রাণ হারানোর দাবি করে।

৭৪. সিক, *অল ফল ডাউন*, ৫১–৫২।

৭৫. ফিশার, *ইরান*, ২০২।

৭৬. প্রাগুক্ত, ২০৪।

৭৭. প্রাগুক্ত, ২০৫।

৭৮. প্রাগুক্ত। কেদ্দি, (*রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২৫২–৫৩) মনে করেন বিক্ষোভে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ যোগ দিয়েছিল।

৭৯. মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ২৮৮।

৮০. কেদ্দি, *রুটস অভ রিভোল্যুশন*, ২৫২–৫৩।

৮১. ফিশার, *ইরান*, ২০৭–০৮।

৮২. আমির তাহেরি, *দ্য স্পিরিট অভ আল্লাহ: খোমেনি অ্যান্ড দ্য ইসলামিক রিভোল্যুশন* (লন্ডন, ১৯৮৫), ২২৭।

৮৩. স্টিভ ব্রুস, *দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অভ দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট: কনজারভেটিভ প্রটেস্ট্যান্ট পলিটিক্স ইন আমেরিকা ১৯৭৮–১৯৮৮* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯০), ৫৬–৬৫।

৮৪. প্রাগুক্ত, ৯০।

৮৫. ন্যান্সি টি. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড*-এ, ৪৬।

৮৬. ব্রুস, *রাইজ অ্যান্ড ফল অভ দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট*, ৮৬–৮৯।

AMARBOI.COM

৮৭. টিম লাহাই, *দ্য ব্যাটল ফর দ্য মাইন্ড* (ওল্ড তাপ্পান, এন.জে., ১৯৮০), ১৭৯।

৮৮. রিচার্ড এ. ভিগনেরি, *দ্য নিউ রাইট: উই'র রেডি টু লীড* (ফলস চার্চ, ভা., ১৯৮১), ১২৬।

৮৯. সুজান হার্ডিং, 'ইমাজিনিং দ্য লাস্ট ডেইজ: দ্য পলিটিক্স অভ অ্যাপোক্যালিপ্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *অ্যাকাউন্টিং ফর ফান্ডামেন্টালিজমস*-এ (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৪), ৭০।

৯০. পল বয়ার, *হোয়েন টাইম শ্যাল বী নো মোর: প্রফিসি বিলিফ ইন মডার্ন আমেরিকান কালচার* (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস. ও লন্ডন, ১৯৯২), ১৪৫।

৯১. ফিলিস শ্ল্যাফলি, *দ্য পাওয়ার অভ দ্য ক্রিশ্চান উওম্যান* (সিনসিনাটি, ওহাইও, ১৯৮১), ১১৭।

৯২. প্রগুক্ত, ৩০।

৯৩. বেভারলি লাহাই, *দ্য রেস্টলেস উওম্যান* (গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, মিচ., ১৯৮৪, ৫৪, ১২৬।

৯৪. টিম ও বেভারলি লাহাই, *দ্য অ্যাক্ট অভ ম্যারিজ: দ্য বিউটি অভ সেক্সুয়াল লাভ* (গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, মিচ., ১৯৭৬), ২৮৫, ১৭৩।

৯৫. টিম লাহাই, *সেক্স এডুকেশন ইন দ্য ফ্যামিলি* (গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস, মিচ., ১৯৮৫), ১৮৮।

৯৬. টিম লাহাই, *হাউ টু বী হ্যাপি ধ্রু মেরিড* (হুইটন, ইল., ১৯৬৮), ১০৬।

৯৭. জেমস রবিসন, *থ্যাংক্স গড আই'ম ফ্রি: দ্য জেমস রবিসন স্টোরি* (ন্যাশভিল, টেন., ১৯৮৮), ১২৪।

৯৮. জেরি ফলওয়েল, *লিসেন, আমেরিকা!* (গার্ডেন সিটি, এন.ওয়াই., ১৯৮০), ১৮৫।

৯৯. এডউইন লুইস কোল, *ম্যাক্সিমাইজড ম্যানহুড: আ গাইড ফর ফ্যামিলি সারভাইভাল* (স্প্রিংডেল, পা., ১৯৮২), ৬৩।

১০০. টিম লাহাই, *দ্য ব্যাটল ফর দ্য ফ্যামিলি* (ওল্ড তাপ্পান, এন.জে., ১৯৮২), ২৩।

১০১. ব্রুস, *রাইজ অ্যান্ড ফল অভ নিউ ক্রিশ্চান রাইট*, ৯৫।

১০২. প্রাগুক্ত, ১০৬–০৭।

১০৩. এ. ক্রফোর্ড, *থান্ডার অন দ্য রাইট: দ্য নিউ রাইট অ্যান্ড দ্য পলিটিক্স অভ রিসেন্টমেন্ট* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৮০), ১৫৬–৫৭।

১০৪. এ. ওয়েইসম্যান, 'বিল্ডিং আ টাওয়ার অভ বাবেল,' *টেক্সাস আউটলুক*, উইন্টার, ১৯৮২, ১৩।

AMARBOI.COM

১১. পরাজয়? (১৯৭৯—৯৯)

১. গ্যারি সিক, *অল ফল ডাউন: আমেরিকা'জ ফেইটফুল এনকাউন্টার উইদ ইরান* (লন্ডন, ১৯৮৫), ১৬৫ ।

২. হান্নাহ আরেনড্‌ট, *অন রিভোল্যুশন* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৩), ১৮ ।

৩. শাহরুগ আখাভি, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন কম্প্যারেটিভ ইরান: ক্লার্গি-স্টেট রিলেশনস ইন দ্য পাহলভী পিরিয়ড* (আলবানি, এন.ওয়াই., ১৯৮০), ১৭২–৭৯; মুজান মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম: দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড ডক্ট্রিন্স অভ টুয়েলভার শিয়াজম* (নিউ হাভেন., কন., ও লন্ডন, ১৯৮৫), ২৮৯–৯২ ।

৪. বাকের মোইন, *খোমেনি, লাইফ অভ দ্য আয়াতোল্লাহ* (লন্ডন, ১৯৯৯), ২২৭–২৮ ।

৫. সিক, *অল ফল ডাউন*, ২০০ ।

৬. প্রাগুক্ত, ২৩১–৩৩; ৩৬০ ।

৭. কোরান, ৮: ৬৮, ৪৭: ৫, ২: ১৭৮ ।

৮. মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান, *ইসলাম, ইটস মেসেজ ফর মডার্ন ম্যান* (লন্ডন, ১৯৬২), ১৮২ ।

৯. মাইকেল জে. ফিশার, *ইরান: ফ্রম রিলিজিয়াস ডিসপিউট টু রিভোল্যুশন* (ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস., ও লন্ডন, ১৯৮০), ২৩৫ ।

১০. মোমেন, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু শিয়া ইসলাম*, ২৯৩–৯৭ ।

১১. প্রাগুক্ত, ২৯৩–৯৫ ।

১২. গ্রেগরি রোজ, 'বেলায়েত-ই ফাকিহ অ্যান্ড রিকভারি অভ ইসলামিক আইডেন্টিটি ইন দ্য থট অভ আয়াতোল্লাহ খোমেনি,' নিক্কি আর. কেদ্দি (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইরান: শিয়াজম ফ্রম কোয়ায়েটিজম টু রিভোল্যুশন* (নিউ হাভেন, কন., ও লন্ডন, ১৯৮৩) ।

১৩. ফরেইন ব্রডকাস্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস (এফবিআইএস), অক্টোবর ১, ১৯৭৯ ।

১৪. খোমেনি, 'দ্য গ্রেটার জিহাদ,' ড্যানিয়েল ব্রুমবার্গ, 'খোমেনি'স লিগাসি: ইসলামিক রুল অ্যান্ড ইসলামিক সোশ্যাল জাস্টিস'-এ, আর.স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *স্পোকমেন ফর দ্য ডেসপাইজড: ফান্ডামেন্টালিস্ট লীডার ইন মিডল ইস্ট*-এ (শিকাগো, ১৯৯৭), ৩৫ ।

১৫. এফবিআইএস. ডিসেম্বর ২৪, ১৯৭৯ ।

AMARBOI.COM

১৬. মাইকেল জে. ফিশার, 'ইমাম খোমেনি: ফোর লেভেলস অভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং,' জন এসপোসিতো (সম্পা.), *ভয়েসেস অভ রিসার্জেন্ট ইসলাম*-এ (নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ড, ১৯৮৩), ১৭১।

১৭. এফবিআইএস, ডিসেম্বর ১২, ১৯৮৩।

১৮. ক্রমবার্গ, 'খোমেনি'স লিগাসি,' ৪০।

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. ফিশার, 'ফোর লেভেলস অভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং,' ১৬৯।

২১. হোমা কাতুযিয়ান, 'শিয়াজম অ্যান্ড ইসলামিক ইকোনোমিকস: সদর অ্যান্ড বানি সদর,' কেদ্দি, (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স*, ১৬১–৬২।

২২. ঘটনাপ্রবাহের এই ভাষ্যের জন্যে দেখুন ক্রমবার্গ, 'খোমেনি'জ লিগাসি,'।

২৩. এফবিআইএস, ফেব্রুয়ারি ১১ ও ১২, ১৯৯১, ক্রমবার্গ, 'খোমেনি'স লিগাসি,' ৫৪।

২৪. এফবিআইএস, মার্চ ২১, ১৯৮১, প্রাগুক্তে, ৫৬।

২৫. আমির তাহেরি, *দ্য স্পিরিট অভ আল্লাহ: খোমেনি অ্যান্ড দ্য ইসলামিক রিভোল্যুশন* (লন্ডন , ১৯৮৫), ২৮৬।

২৬. এফবিআইএস, অক্টোবর ২৯, ১৯৮০, ক্রমবার্গ, 'খোমেনি'জ লিগাসি'-তে, ৫৬।

২৭. এফবিআইএস, মে ২, ১৯৭৯, প্রাগুক্তে, ৪০।

২৮. ক্রমবার্গ, 'খোমেনি'জ লিগাসি,' ৫৫–৫৬।

২৯. এফবিআইএস, ডিসেম্বর ২৪, ১৯৮৭, ক্রমবার্গ-এ, ৫৯।

৩০. এফবিআইএস, জানুয়ারি ৭, ১৯৮৮, প্রাগুক্তে, ৬০।

৩১. এফবিআইএস, জানুয়ারি ১৯, ১৯৯৮, প্রাগুক্তে, ৬৩।

৩২. ক্রমবার্গ, 'খোমেনি'জ লিগাসি,' ৬৪–৬৫।

৩৩. এফবিআইএস, অক্টোবর ৪, ১৯৮৮, প্রাগুক্তে, ৬৬।

৩৪. মেলাইজ রুথভেন, *আ স্যাটানিক অ্যাফেয়ার: সালমান রুশদি অ্যান্ড দ্য রেজ অভ ইসলাম* (লন্ডন, ১৯৯০), ২৯।

৩৫. ক্রমবার্গ, 'খোমেনি'জ লিগাসি,' ৬৭–৬৮।

৩৬. আব্দোলকরিম সুরোশ, 'থ্রি কালচারস': মেহরযাদ বোরুজারর্দি, *ইরানিয়ান ইন্টেলেকচুয়ালস অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট: দ্য টরমেন্টেড ট্রায়াম্ফ অভ নেটিভিজম* (সিরাক্রুজ, এন.ওয়াই., ১৯৯৬), ১৬২।

৩৭. ফারহাঙ রাজাই, 'ইসলাম অ্যান্ড মডার্নিটি,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড সোসায়েটি*-তে, (শিকাগো, ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১১৩।

AMARBOI.COM

৩৮. ফারহাঙ জাহানপুর, 'আব্দোলকরিম সুরোশ,' অপ্রকাশিত রচনা।

৩৯. *কিয়ান*, ৫, ১৯৫৫।

৪০. মোহামেদ হেইকেল, *অটাম অভ ফিউরি: দ্য অ্যাসাসিনেশন অভ সাদাত* (লন্ডন, ১৯৮৪ সংস্ক.), ২৩০।

৪১. প্রাগুক্ত, ১১৮–১৯।

৪২. প্রাগুক্ত, ২৪১–৪২।

৪৩. কোরান ৫৭: ১৬।

৪৪. জোহানেস জে. জি. জানসেন, *দ্য নেগলেক্টেড ডিউটি: দ্য ক্রিড অভ সাদাত'স অ্যাসাসিনস অ্যান্ড ইসলামিক রিসার্জেন্স ইন দ্য মিডল ইস্ট* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৮৮), ১৬২।

৪৫. প্রাগুক্ত, ১৮৩–৮৪।

৪৬. কোরান, ২: ২১৬।

৪৭. কোরান ৯: ৫।

৪৮. জানসেন, *নেগলেক্টেড ডিউটি*, ১৯৫।

৪৯. প্রাগুক্ত, ১৬৭–৮২।

৫০. প্রাগুক্ত, ১৬৭।

৫১. প্রাগুক্ত, ১৬৯।

৫২. প্রাগুক্ত, ১৯৯।

৫৩. প্রাগুক্ত, ২০০।

৫৪. প্রাগুক্ত, ১৯২–৯৩।

৫৫. কোরান ৯: ৪।

৫৬. জানসেন, *নেগলেক্টেড ডিউটি*, ৯০, ১৯৮।

৫৭. প্রাগুক্ত, ২০০।

৫৮. প্রাগুক্ত, ২০১–০২।

৫৯. প্রাগুক্ত, ৪৯–৮৮।

৬০. প্রাগুক্ত, ৬০, ৭১।

৬১. প্যাট্রিক ডি. গাফনি, *দ্য প্রফেট'স পুলপিট: ইসলামিক প্রিচিং ইন কনটেম্পোরারি ইজিপ্ট* (বার্কলি, লস অ্যাঞ্জেলিস ও লন্ডন, ১৯৯৪), ২৬০।

৬২. অ্যান্ড্রিয়া বি. রুগ, 'রিশেপিং পারসোনাল রিলেশনস ইন ইজিপ্ট,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড সোসায়েটি*-তে, ১৫২, ১৬৮–৭০।

৬৩. গাফনি, *দ্য প্রফেট'স পুলপিট*, ২৬০–৬১।

AMARBOI.COM

৬৪. রুগ, 'রিশেপিং পারসোনাল রিলেশন্স ইন ইজিপ্ট,' ১৫৩–৬২।

৬৫. গাফনি, *দ্য প্রফেট'স পুলপিট*, ২৬২–৬৪।

৬৬. প্রাগুক্ত, ২৬১–৬২।

৬৭. স্টিভ নেগাস, 'কারনেজ অ্যাট লাক্সর,' *মিডল ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল*, নভেম্বর ২১, ১৯৯৭।

৬৮. 'কান্ট্রেস মিসায়ন,' আভিয়েযার রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম, যায়নিজম অ্যান্ড জুইশ রিলিজিয়াস রেডিক্যালিজম*-এ (অনু. মাইকেল সুইরস্কি ও জনাথান চিপম্যান; শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৩), ৬৯।

৬৯. হা হোমাহ, প্রাগুক্তে, ৬৮।

৭০. প্রাগুক্ত, ১৫১–৫৯; চার্লস সেলেনগাত, 'বাই তোরাহ অ্যালোন: ইয়েশিভা ফান্ডামেন্টালিজম ইন জুইশ লাইফ,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *অ্যাকাউন্টিং ফর ফান্ডামেন্টালিজমস*-এ (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৪), ২৫৭–৫৮।

৭১. রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*, ১৪৮–৫০।

৭২. প্রাগুক্ত, ১৬৪।

৭৩. স্যামুয়েল সি. হেইলমান ও মেনাচেম ফ্রেইডম্যান, 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড*-এ (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯১), ২৪৩–৫০।

৭৪. রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*, ১৪৮।

৭৫. হেইলমান ও ফ্রেইডম্যান, 'রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড রিলিজিয়াস জুজ,' ২৫৪।

৭৬. প্রাগুক্ত, ২৫৩; সেলেনগাত, 'বাই তোরাহ অ্যালোন,' ২৩৬।

৭৭. গিদিয়ন অ্যারন, 'জুইশ যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড*-এ, ২৯৪–৯৫।

৭৮. প্রাগুক্ত, ২৯৩।

৭৯. স্যামুয়েল সি. হেইলমান, 'গাইডস অভ দ্য ফেইথফুল: কন্টেম্পোরারি রিলিজিয়াস যায়নিস্ট র‍্যাবাইজ,' অ্যাপলবী (সম্পা.), *স্পোকমেন ফর দ্য ডেসপাইজড*, ৩৪৫।

৮০. প্রাগুক্ত।

৮১. লেভিটিকাস ১৯: ৩৩–৩৪।

৮২. শাব্বাত ৩১A।

৮৩. এক্সোডাস ২৩: ২৩–৩৩; জোশুয়া ৬: ১৭–২১, ৮: ২০–২৯, ১১: ২১–২৫।

AMARBOI.COM

৮৪. 'দ্য মেসিয়ানিক লিগাসি,' *মোরাশা* ৯; ইয়ান এস. লাস্টিক, *ফর দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য লর্ড: জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েল* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮), ৭৫–৭৬।

৮৫. ১ স্যামুয়েল ১৫: ৩।

৮৬. *বাত কোল*, ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৮০।

৮৭. 'দ্য রাইট টু হেইট,' *নেকুদাহ*, ১৫; এহুদ স্প্রিনযাক, 'দ্য পলিটিক্স, ইন্সটিটিউশনস অ্যান্ড কালচার অভ গাশ এমুনিম,' লরেন্স জে. সিলবারস্টেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পারসপেক্টিভ: রিলিজিয়ন, আইডিওলজি অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অভ মডার্নিটি* (নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৯৩), ১২৭।

৮৮. এহুদ স্প্রিনযাক, *দ্য অ্যাসেনডেন্স অভ ইসরায়েল'স ফার রাইট* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯১), ৯৭।

৮৯. প্রাগুক্ত, ৯৪–৯৫।

৯০. আরন, 'জুইশ যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' ২৬৭–৬৮।

৯১. রাভিতস্কি, *মেসিয়ানিজম*, ১৩৩–৩৪; স্প্রিনযাক, *অ্যাসেনড্যান্স অভ ইসরায়েল'স ফার রাইট*, ৯৬।

৯২. স্প্রিনযাক, *অ্যাসেনড্যান্স অভ ইসরায়েল'স ফার রাইট*, ৯৭–৯৮।

৯৩. প্রাগুক্ত, ২২০।

৯৪. রাফায়েল মার্গি ও ফিলিপে সিমোনোত, *ইসরায়েল'স আয়াতোল্লাহ: মেয়ার কাহানে অ্যান্ড দ্য ফার রাইট ইন ইসরায়েল* (লন্ডন, ১৯৮৭), ৪৫।

৯৫. প্রাগুক্ত।

৯৬. স্প্রিনযাক, *অ্যাসেনড্যান্স অভ ইসরায়েল'স ফার রাইট*, ২২৩–২৫।

৯৭. প্রাগুক্ত, ২৪৯।

৯৮. স্প্রিনযাক, 'থ্রি মডেলস অভ রিলিজিয়াস ভায়োলেন্স: দ্য কেস অভ জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন ইসরায়েল,' মার্টিন ই. মার্টি ও আর. স্কট অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড দ্য স্টেট* (শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৯৩), ৪৭৯।

৯৯. প্রাগুক্ত, ৪৮০।

১০০. বেভারলি মিল্টন-এডওয়ার্ডস, *ইসলামিক পলিটিক্স ইন প্যালেস্তাইন* (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৬), ৭৩–১১৬।

১০১. প্রাগুক্ত, ১১৬–২৩।

১০২. প্রাগুক্ত, ১৪৯।

AMARBOI.COM

১০৩. প্রাগুক্ত, ১৮৪–৮৫ ।

১০৪. প্রাগুক্ত, ১৮৬ ।

১০৫. হেইলমান, 'গাইডস অভ দ্য ফেইথফুল,' ৩৫২–৫৩ ।

১০৬. প্রাগুক্ত, ৩৫৪ ।

১০৭. আমোস ওয, *ইন দ্য ল্যান্ড অভ ইসরায়েল* (অনু. মরিস গোল্ডবার্গ-বারতুরা: লন্ডন, ১৯৮৩), ৬, ৯ ।

১০৮. চার্লস লিবম্যান কর্তৃক উদ্ধৃত, 'জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড দ্য ইসরায়েলি পলিটি,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড সোসায়েটি*-তে, ৭৯ ।

১০৯. রবার্ট ওয়াথনাউ, 'কুইদ অবসকুরাম: দ্য চেঞ্জিং টেরেইন অভ চার্চ-স্টেট রিলেশনস,' মার্ক এ. নোল (সম্পা.), *রিলিজিয়ন অ্যান্ড আমেরিকান পলিটিক্স: ফ্রম দ্য কোলোনিয়াল পিরিয়ড টু দ্য ১৯৮০জ*,-এ (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯০), ১৪ ।

১১০. রবার্ট ওয়াথনাউ ও ম্যাথ্যু পি. লসন, 'সোর্সেস অভ ক্রিশ্চান ফান্ডামেন্টালিজম ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *অ্যাকাউন্টিং ফর ফান্ডামেন্টালিজমস*-এ, ২০ ।

১১১. প্রাগুক্ত, ২৬–২৭ ।

১১২. স্টিভ ব্রুস, *দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অভ নিউ ক্রিশ্চান রাইট: কনজারভেটিভ প্রটেস্ট্যান্ট ইন আমেরিকা ১৯৭৮–৮৮* (অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯০), ১৪৩ ।

১১৩. সুজান হার্ডিং, 'কনটেস্টিং রেটোরিক্স ইন দ্য পিটিএল স্ক্যান্ডাল,' সিলবারস্তেইন (সম্পা.), *জুইশ ফান্ডামেন্টালিজম ইন কম্প্যারেটিভ পারসপেক্টিভ*-এ ।

১১৪. প্রাগুক্ত, ৬৭ ।

১১৫. ব্রুস, *রাইজ অ্যান্ড ফল অভ দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট*, ১৪৪ ।

১১৬. লরেন্স রাইট, *সেইন্টস অ্যান্ড সিনারস* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৩), ৮১–৮২ ।

১১৭. প্রাগুক্ত, ৮২ ।

১১৮. প্রাগুক্ত, ৭২–৭৩ ।

১১৯. প্রাগুক্ত, ৭৯ ।

১২০. ব্রুস, *রাইজ অ্যান্ড ফল অভ দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট*, ১৪৪–৪৫, ১৯৩ ।

১২১. ফে গিন্সবার্গ, 'সেভিং আমেরিকা'জ সোলস: অপারেশন রেসকিউ'জ ক্রুসেড অ্যাগেইন্সট অ্যাবরশন,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা,), *ফান্ডামেন্টালিজমস অ্যান্ড স্টেট*-এ, ৫৫৭ ।

AMARBOI.COM

১২২. প্রাগুক্ত, ৫৬৮।

১২৩. ন্যান্সি টি. আম্মারমান, 'নর্থ আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিজম,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *ফান্ডামেন্টালিজমস অবজার্ভড*-এ, ৪৯–৫৩; মাইকেল লিনেশ, *রিডীমিং আমেরিকা: পিয়েটি অ্যান্ড পলিটিক্স ইন দ্য নিউ ক্রিশ্চান রাইট* (চ্যাপেল হিল, এন.সি., ও লন্ডন, ১৯৯৫), ২২৬।

১২৪. গ্যারি নর্থ, *ইন দ্য শ্যাডো অভ দ্য প্লেন্টি: দ্য বিবলিকাল ব্লুপ্রিন্ট ফর ওয়েলফেয়ার* (ফোর্ট ওর্থ, টেক্সাস,১৯৮৬), xiii।

১২৫. প্রাগুক্ত, ৫৫।

১২৬. নর্থ, *দ্য সিনাই স্ট্রেটেজি: ইকোনোমিকস অ্যান্ড দ্য টেন কমান্ডমেন্টস* (টাইলার, টেক্স., ১৯৮৬), ২১৩–১৪।

১২৭. জেরেমি রিফকিন ও টেড হাওয়ার্ড, *দ্য ইমার্জিং অর্ডার: গড ইন দ্য এজ অভ স্কেয়ারসিটি* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৯), ২৩৯।

১২৮. হার্ভে কক্স, *ফায়ার ফ্রম হেভেন: দ্য রাইজ অভ পেন্টাকোস্টাল স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড রিশেপিং অভ রিলিজিয়ন ইন দ্য টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫), ২৮৭–৮৮।

১২৯. লিনেশ, *রিডীমিং আমেরিকা*, ২২৮।

১৩০. কক্স, *ফায়ার ফ্রম হেভেন*, ২৯০।

১৩১. সুজান হার্ডিং, 'ইমাজিনিং দ্য লাস্ট ডেইজ: দ্য পলিটিক্স অভ অ্যাপোক্যালিপ্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ,' মার্টি ও অ্যাপলবী (সম্পা.), *অ্যাকাউন্টিং ফর ফান্ডামেন্টালিজমস*-এ, ৭৫।

১৩২. মাইকেল বারকিন, *রিলিজিয়ন অ্যান্ড রেসিস্ট রাইট: দ্য অরিজিন্স অভ দ্য ক্রিশ্চান আইডেন্টিটি মুভমেন্ট* (চ্যাপেল হিল, এন.সি., ১৯৯৪)।

১৩৩. প্রাগুক্ত, ১৮৭, ১০৯।

AMARBOI.COM

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বরাবরের মতো আমার লিটারেরি এজেন্ট ফেলিসিটি ব্রায়ান, পিটার গিন্সবার্গ এবং অ্যান্ড্রু নার্নবার্গ ও আমার সম্পাদকবৃন্দ জেন গ্যারেট, মাইকেল ফিশউইক ও রবার্ট আমারলানকে ধন্যবাদ জানাতেই হচ্ছে। অনেক বছর ধরে ওদের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আমার পক্ষে নিবেদিতপ্রাণ পরিশ্রম একাধারে অপরিহার্য ও আনন্দের উৎস হয়ে আছে। আমি নফে'র প্রডাকশন টিমের—মেলভিন রোসেনথাল (প্রডাকশন এডিটর), অ্যানথিয়া লিংম্যান (ডিজাইনার), ক্লেয়ার ব্র্যাডলি অঙ (প্রডাকশন ম্যানেজার) এবং প্রচ্ছদ শিল্পী আর্চি ফারগুসন—দক্ষ, ধৈর্যশীল কাজের জন্যেও কৃতজ্ঞ।

ফেলিসিটি ব্রায়ানের অফিসের মাইকেল টপহ্যাম ও ক্যারল রবিনসনকেও তাদের অব্যাহত সাহায্য ও সংকট মুহূর্তে প্রশান্ত সমর্থনের জন্যে ধন্যবাদ জানাতে হয়। ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটিতে সেন্টার ফর মুসলিম-ক্রিশ্চান আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর আমন্ত্রণ জানানোয় জন এস্পোসিতোকে ধন্যবাদ জানাই, (এর প্রতিটি সদস্যের সমৃদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে), এবং আমাকে উদার আতিথেয়তা দেওয়ার জন্যে তাঁর স্ত্রী জানেটকে। রোজি টোলেমাশেকেও ধন্যবাদ, তিনটি অনন্য মাস আমার সহকারী হিসাবে কাজ করেছে সে, কিন্তু পরে শিশু লিযির দেখাশোনা করতে বিদায় নিয়েছে, জোহানেস স্লোয়েকের রচনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ আমার ওলন্দাজ অনুবাদক হেসরিক মোসেনকেও। সবশেষে, কেট জোন্স ও জন ট্যাকাবেরিকে হতাশার মুহূর্তে ওদের মহান বন্ধুত্ব আর আর লেখালেখির দীর্ঘ মাসগুলোতে আমার সামান্য খাবারকে সম্পূর্ণতাদানকারী অসাধারণ সব খাবার রান্না করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

AMARBOI.COM